প্রদীপ

সচিত্র মাসিক পত্র।

তৃতীয় ভাগ।

২০৮। ২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

(পৌষ, ১৩০৬ হইতে—অগ্রহায়ণ, ১৩০৭ পর্য্যন্ত)

কলিকাতা
২৬, স্কট্স্ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে, সান্ন্যাল এণ্ড কোম্পানির দ্বারা
মুদ্রিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

তৃতীয় ভাগ। | পৌষ, ১৩০৬। | ১ম সংখ্যা।

সুন্দরবনের ভীষণ ঘটনাবলী।*

বঙ্গোপসাগরের উত্তর উপকূলভাগ যে ভীষণ অরণ্যে আচ্ছাদিত, তাহার নাম সুন্দরবন। এই ভূভাগ গঙ্গানদীর বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শাখানদী দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়াছে। এই স্থান জোয়ারের সময় যখন জলমগ্ন থাকে, তখন হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন সমুদ্রগর্ভ হইতে একটী প্রকাণ্ড অরণ্য উত্থিত হইয়াছে। উপরে যে শাখানদীগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে, নৌকাযোগে তাহার কোনওটীর মধ্যে প্রবেশ করিলে চতুর্দ্দিকে কেবল লম্বা লম্বা ঘাস ও বড় বড় গাছ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার শাখায় শাখায় প্রকাণ্ড সর্পাকৃতি লতারজ্জুসকল জড়াইয়া রহিয়াছে। চারিদিক্ নিস্তব্ধ; মধ্যে মধ্যে কেবল সহিষ্ণুতার অবতারস্বরূপ দুই একটী বক চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া, অথবা উজ্জ্বলবর্ণবিশিষ্ট দুই একটি মাছরাঙ্গা জীবিকাসংগ্রহের জন্য ইতস্ততঃ উড্ডীয়মান হইয়া কিঞ্চিন্মাত্র সজীবতার পরিচয় দেয়; কখনও কখনও বা সুদূর অরণ্যগর্ভ হইতে আগত নানাপ্রকার অদ্ভুত অস্পষ্ট ধ্বনি শ্রবণ করিয়া হৃদয় নানারূপ কল্পনা ও ভয়ে আন্দোলিত হইতে থাকে; কদাচ কখনও কোনও দূরগামী নৌকার ক্ষেপণীপাতধ্বনি তালে তালে এই ভীষণ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কর্ণকুহরে প্রবেশ করে; কখনও বা গ্রীষ্মসমাগমে উচ্চভূভাগের নদীর জল হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে এই নিম্নভূভাগের অপেক্ষাকৃত গভীরতর স্রোতের প্রতিকূলে দুই একখানি প্রকাণ্ড বাষ্পীয় পোতকে সফেন তরঙ্গরাজি উৎক্ষেপ করত ঝক্ ঝক্ শব্দে সুদূর বনস্থলী প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে উভয়কূলস্থ বৃক্ষরাজির মধ্য দিয়া মহাবলে স্রোতের বেগ পরাভূত করিয়া চলিয়া যাইতে দেখা যায়। হিংস্রজন্তুর ত কথাই নাই; কোথাও বা একটা ব্যাঘ্র সন্তরণ দ্বারা নদী পার হইয়া নূতন শিকারভূমির অন্বেষণে যাইতেছে; কোথাও বা একদল বন্যশূকর একটা প্রকাণ্ডকায় বরাহকে অগ্রণী করিয়া একটী ক্ষুদ্রস্রোত পার হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে তাহাদের দুই একটা কুম্ভীরের করাল কবলে পতিত হইয়া প্রাণ হারাইতেছে।

এখানে স্থলে বন্যজন্তুদ্বারা যেমন বহুসংখ্যক লোক নিহত হয়, এখানকার অসংখ্য নদীতেও সেইরূপ ঝটিকা ও বানে অনেকে প্রাণ হারায়। পূর্ণিমা অমাবস্যায় মধ্যে মধ্যে নদীতে এতজোরে বান ডাকে যে তাহার বলে বড় বড় কিস্তিও উল্টাইয়া যায়। বঙ্গোপসাগরের উত্তর উপকূলভাগ দৈর্ঘ্যে প্রায় দুই শত মাইল; তাহার পশ্চিমাংশ ঘন বৃক্ষাবলী সমাচ্ছন্ন—ইহাই সুন্দরবন; কিন্তু ইহার পূর্ব্বাংশ বৃক্ষহীন জলাভূমি মাত্র। এখানকার ভূমি এত নিম্ন যে

* সিবিলিয়ান্ এ. র‍্যাট্রে সাহেবের জীবনের কতকগুলি ঘটনা।

জোয়ারের সময় যদিও সমুদ্রের জল সাধারণতঃ আট হাতের অধিক উচ্চ হয় না, তথাপি সমুদ্রকূল হইতে উত্তরে কুড়ি মাইল পর্য্যন্ত স্থান জলমগ্ন হইয়া যায়।

পূর্ব্বে লোকে সুন্দরবনের সর্ব্বত্রই বৃক্ষ কর্ত্তন ও আবাদাদি করিত। ইদানীং গবর্ণমেণ্টের আদেশে অরণ্যরক্ষা ও কাষ্ঠ সরবরাহের জন্য ইহার মধ্যস্থিত বহুবিস্তীর্ণ অনেক ভূভাগে বৃক্ষকর্ত্তন নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু অবশিষ্ট অংশে যাহাতে আবাদ ও লোকের বসতি হয় তদুদ্দেশে গবর্ণমেণ্ট অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। যাহারা প্রথমে জঙ্গল কাটিয়া কোনও স্থান আবাদ করে, তাহাদিগকে প্রথম কয়েক বৎসর রাজস্ব দিতে হয় না; তাহার পরেও বহুদিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে নামমাত্র সামান্য কিছু কর দিতে হয়। এই সুবিধার জন্য অনেকেই এই সকল ভূমি জমা লইয়া থাকে এবং ইতিমধ্যে সুন্দরবনের অনেক অংশ পরিষ্কৃত ও কর্ষিত হইয়াছে। কিন্তু এখানকার কৃষকদিগের জীবন বহুবিপদসঙ্কুল; তাহারা কখনও বা ক্রোধোন্মত্ত বন্য বরাহ-কর্ত্তৃক নিহত হয়; কখনও বা ব্যাঘ্রের হস্তে প্রাণ হারায়; কখনও বা ম্যালেরিয়া জরে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, কারণ, এই জলসিক্ত নিম্নভূমিগুলিকে ম্যালেরিয়া বাষ্পের জন্মস্থান বলা যাইতে পারে। উপরিলিখিত বর্ণনা কেহ কেহ অতিরঞ্জিত মনে করিতে পারেন, কিন্তু নিম্নোক্তরূপ ঘটনা নিতান্ত বিরল নহে। আমি একবার সুন্দরবনের কোনও স্থলে জঙ্গলকাটা দেখিতে গিয়াছিলাম; সেখানে আমার অনুচরগণ আমাকে একজন কৃষকের মৃতদেহ দেখাইল; উহা ব্যাঘ্রের নখাঘাতে এরূপ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে যে ঐ ব্যক্তির মুখের আকৃতি কিরূপ ছিল কিছুই বুঝা যায় না। শুনিলাম উহার সঙ্গীকে ব্যাঘ্রে ধরিয়া নিকটস্থ বনে লইয়া গিয়াছে। তাহারা দুই জনে রাত্রিতে তাহাদের ক্ষেত্রে চৌকি দিতেছিল, এমন সময় সহসা বাঘ আসিয়া তাহাদের একজনকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ও অপরকে লইয়া প্রস্থান করিয়াছে।

এইস্থলে খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকদিগের ধর্ম্মোৎসাহের জলন্ত প্রমাণস্বরূপ একটী ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একস্থলে দেখিলাম দুইজন বেল্‌জিয়মদেশীয় রোমান কাথোলিক প্রচারক একখানি দেশীয় লাঙ্গলে দুইটী কঙ্কালসার বলীবর্দ্দ যোজনা করিয়া নগ্নপদে ভূমিকর্ষণ করিতেছেন। তাঁহাদের পরিচ্ছদ ছিন্ন, দেহ ম্যালেরিয়া জরে কৃশ ও পাণ্ডুবর্ণ। "তোমরা স্বর্ণ, রৌপ্য, বা পিত্তল সঙ্গে লইবে না; ভ্রমণের জন্য দ্রব্যাধার (ব্যাগ) লইবে না, একাধিক জামা লইবে না, এবং পাদুকা বা যষ্টি লইবে না।" প্রচারকদিগের প্রতি ঈশার এই নিদেশবাক্য ইঁহারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেছেন। ইঁহাদের ইতিহাস অতি সংক্ষিপ্ত। ব্রসেল্‌স্ নগরের একটী শ্রেষ্ঠ কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া ইঁহারা প্রচারব্রত গ্রহণ করেন এবং অবশেষে ভারতবর্ষে আসিয়া এই বিপদসঙ্কুল স্থানকে আপনাদের কার্য্যক্ষেত্র মনোনীত করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ দীনভাবে জীবন যাপন করিতেছেন।

অনেক বৎসর পূর্ব্বে একবার আমি দুইজন সঙ্গীর সহিত সুন্দরবনের মধ্যস্থলে মাতলানদীর তীর হইতে অনতিদূরে কতকগুলি পূর্ত্তকার্য্যের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। খানিকটা বনকাটা স্থানের মধ্যস্থলে, দরমার বেড়া দেওয়া একখানা চালাঘরে আমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। জ্যোৎস্না রাত্রিতে বেড়ার ফাঁক দিয়া আমরা প্রায়ই দেখিতে পাইতাম, আমাদের গৃহের চতুর্দ্দিকের পরিষ্কৃত ভূমিতে ব্যাঘ্র বিচরণ করিতেছে। আমাদের তত্ত্বাবধানাধীন পূর্ত্তকার্য্যে যে সকল কুলি কাজ করিত তাহাদের মধ্যে দুই একজনকে ব্যাঘ্রে লইয়া গেলে অন্যান্য সকলে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইত। আমাদের তিনজনের মধ্যে একজন না একজনকে জরে শয্যাগত থাকিতে হইত। আমাদের ভৃত্যগণের মধ্যে যাহারা সুস্থদেহ তাহারাও ভয়ে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল এবং পলায়ন করা অত্যন্ত দুরূহ বলিয়াই চলিয়া যাইত না।

একদিন অপরাহ্নে নিকটস্থ গ্রামবাসী কতকগুলি লোক আসিয়া সংবাদ দিল যে পূর্ব্ব রাত্রে একটা ব্যাঘ্রে তাহাদের দুইটা গরু লইয়া গিয়াছে; এবং ঐ ব্যাঘ্রের উৎপাতে তাহাদের গ্রামে বাস করা ভার হইয়াছে। এই কারণে তাহাদিগকে ঐ ব্যাঘ্রের উৎপাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তাহারা আমাদিগকে নিতান্ত ব্যগ্রতার সহিত অনুরোধ করিতে লাগিল। আমি তৎক্ষণাৎ একাকী ঐ গ্রামের দিকে যাত্রা করিলাম। আমার সঙ্গে মুঙ্গেরের কারখানার প্রস্তুত একটী দোনলা বন্দুক ছিল। মুঙ্গেরে এক সময়ে ইংরেজী বন্দুকের অনুকরণে যে সকল

বন্দুক প্রস্তুত হইত তাহা নিতান্ত মন্দ নহে। তাহাতে ভাল ভাল ইংরেজ নির্ম্মাতাদের নামও খোদা থাকিত। আমার বন্দুকেও সেইরূপ ছিল। কিন্তু ইহার একটী মহৎ দোষ ছিল যে ছুঁড়িবার সময় দুইটী ঘোড়া একেবারে পড়িয়া গিয়া দুইটী নলই একসঙ্গে আওয়াজ হইয়া যাইত। সুতরাং উহাতে দোনলা বন্দুকের সুবিধা কিছুই পাওয়া যাইত না। যাহা হউক, এই অস্ত্রে সজ্জিত হইয়াই আমি ব্যাঘ্রের লীলাভূমিতে উপস্থিত হইলাম। সেখানে গিয়া দেখি বহু লোকের সমাগম হইয়াছে; তাহার মধ্যে নগ্নদেহ স্ফীতোদর বালকের সংখ্যাই অধিক। তাহারা সকলেই বানরের ন্যায় মুখভঙ্গি করিতেছিল এবং সকলে এক সঙ্গে কথা কহিতেছিল।*

আমার বয়স তখন অল্প। বোধ হয় আমাকে তরুণবয়স্ক দেখিয়া গ্রামবাসিগণ মনে করিয়াছিল যে, আমি যে কার্য্যের জন্য আসিয়াছি তাহা আমাদ্বারা সুসম্পন্ন হইবে না। কারণ, আমি ব্যাঘ্রটাকে তাড়া দিবার জন্য কয়েক জন লোক দিতে বলিলে সে কথায় তাহারা কর্ণপাত না করিয়া কেবল আমাকে দূরস্থিত একটা ছোট জঙ্গল দেখাইয়া দিয়া বলিল,—'বাঘটাকে ঐ ঝোপের মধ্যে যাইতে দেখা গিয়াছে।' যৌবনকালে মানুষ প্রায়ই যে একটু উদ্ধত ও অপরিণামদর্শী হয়, ইহা একটী প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। আমি গ্রামবাসীদিগকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া বলিলেও, আমার উদ্ধত বাক্যের জন্যই হউক অথবা ভয় বশতঃই হউক, তাহারা কিছুতেই বাঘটাকে তাড়া দিবার জন্য লোক দিতে সম্মত না হওয়াতে আমি আমার বন্দুকের দুইটী চুঙ্গিতে অপেক্ষাকৃত একটু অধিক পরিমাণে বারুদ ঠাসিয়া একাকীই সেই ঝোপের দিকে চলিয়া গেলাম। গ্রামবাসিগণ একটা উচ্চ বাঁধের উপর হনুমানের ন্যায় সারি দিয়া বসিয়া এই ঘটনার পরিণাম প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

বাঘটা যে জঙ্গলের ভিতর আশ্রয় লইয়াছিল তাহার নীচে এমন কাঁটাবন যে তাহার ভিতর দিয়া সোজা হইয়া চলা যায় না। লম্বা হইয়া শুইয়া কতকটা হামাগুড়ি দিবার মত চলিতে হয়। ভিতরে এত অন্ধকার যে প্রথমে আমি কিছুই দেখিতে পাই নাই। আমি যে

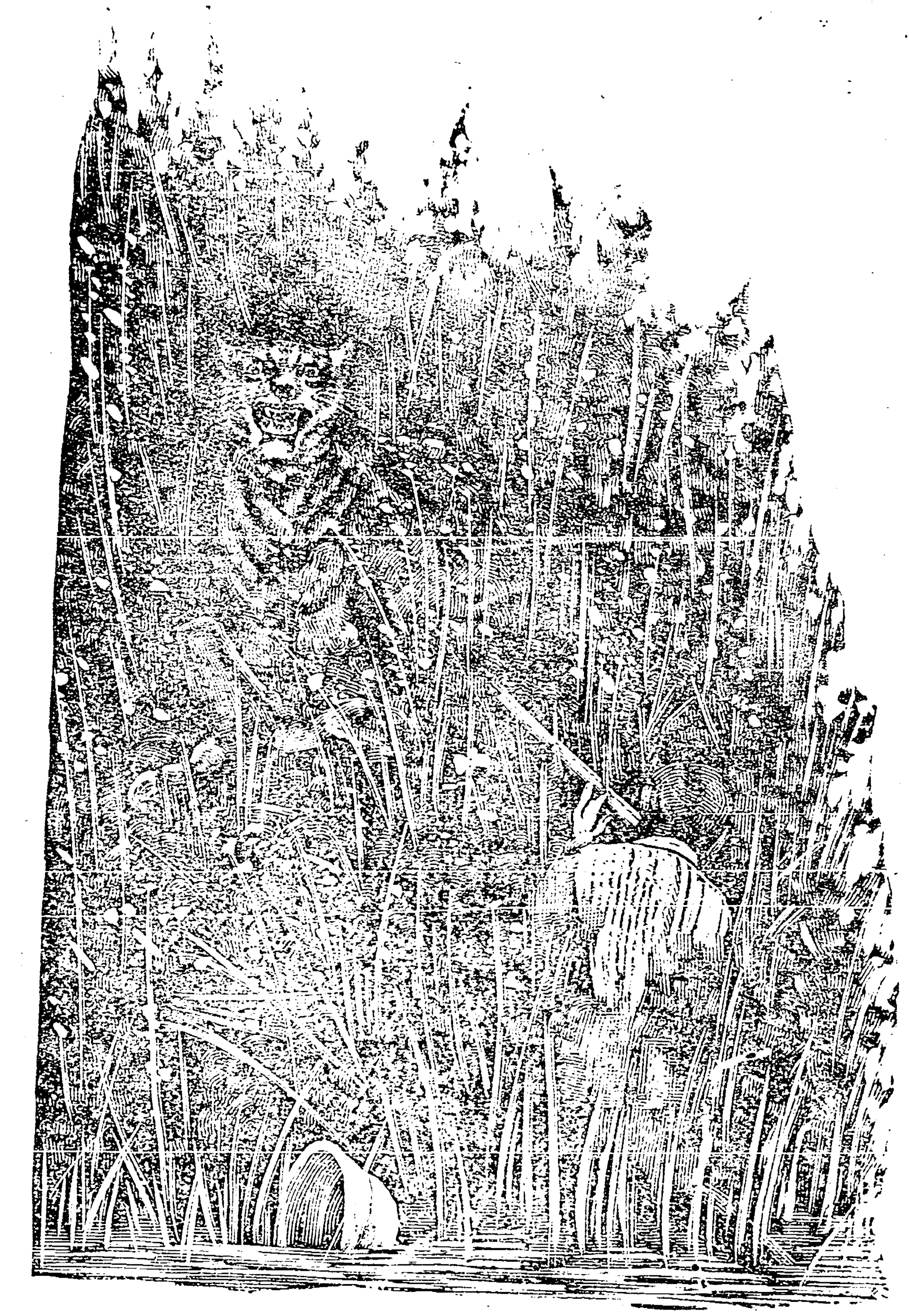

একেবারে ব্যাঘ্রের মুখে আসিয়া পড়িয়াছি তাহা অগ্রে বুঝিতেই পারি নাই। ক্রমে সেই ক্ষীণালোকে চক্ষু একটু অভ্যস্ত হইয়া আসিলে দেখিতে পাইলাম—আমার সম্মুখে, ছয়-পদক্ষেপ-পরিমিত স্থান দূরে একটা কি অস্পষ্ট পদার্থ রহিয়াছে। তাহার পর আমার চক্ষের সমক্ষে হঠাৎ যে দৃশ্য প্রকটিত হইল তাহাতে আমার বক্ষঃস্থল দুরদুর করিতে লাগিল ও ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল—আমি সভয়ে দেখিলাম সেই অস্পষ্ট পদার্থ আর কিছুই নহে, সেই ব্যাঘ্রটা এবং তাহার পার্শ্বে একটা অর্দ্ধভুক্ত গাভী পড়িয়া রহিয়াছে, এবং আমি একেবারে তাহার সম্মুখে উপস্থিত! আমার বন্দুকের গুণাগুণের কথা পাঠককে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমি অনেক কষ্টে চিত্তসংযত করিয়া, জানুতে ভর দিয়া দাঁড়াইলাম এবং বন্দুকের ঘোড়া টানিলাম। কর্ণ বধির করিয়া একেবারে দুইটী চুঙ্গীই আওয়াজ হইয়া

* পাঠকের যেন স্মরণ থাকে যে, আমরা একজন ইংরেজ সিবিলিয়ানের মনের ভাব যতদূর পারি, তাঁহার নিজের কথায় প্রকাশ করিতেছি।

গেল। পর মুহূর্ত্তেই কে যেন আমাকে ধাক্কা দিয়া চিৎ করিয়া ফেলিয়া দিল—তাহার পর কি হইল কিছুই জানি না।

পরদিবস প্রাতঃকালে পিয়ালিগ্রামে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। কৃশকায় গ্রাম্য কুক্কুরগুলা থাকিয়া থাকিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে; ভয়বিহ্বল স্ত্রীলোকগণ অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতবদনে দণ্ডায়মান হইয়া অনুচ্চস্বরে কথাবার্ত্তা কহিতেছে; নগ্নদেহ বালকবালিকাগণ তাহাদের অঞ্চল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে; দুই জন গ্রাম্য চৌকিদার গ্রামবাসীদিগের নিকট হইতে ছলেবলে দুগ্ধ, তরিতরকারি প্রভৃতি আহার্য্য আদায় করিয়া গ্রামের মণ্ডলের বাটীর দিকে চলিয়াছে; সেখানে ঐ প্রদেশের দারোগা স্বকীয় দলবল সহ (রেট্‌লি ব্যাটে) সাহেবের মৃত্যুর তদারক করিতে আসিয়াছেন। দারোগা একখানি গালিচার উপর বসিয়া আছেন; পার্শ্বে তাঁহার মুন্সী বসিয়া রিপোর্ট লিখিতেছে; পশ্চাতে কয়েকজন পুলিস-প্রহরী দাঁড়াইয়া আছে। দারোগার সহিত দক্ষিণার টাকা সম্বন্ধে মণ্ডল গোপালদাসের অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে; কারণ গোপালদাস তখনও গালিচার পার্শ্বে মাথা কুটিতে কুটিতে বলিতেছে, "আমাকে মারুন আর কাটুন, আমি আর একটী পয়সাও দিতে পারিব না।" প্রাঙ্গণে কতকগুলি ভয়ত্রস্ত গ্রামবাসী দণ্ডায়মান হইয়া অপাঙ্গদৃষ্টিতে পুলিসের কার্য্যকলাপ দেখিতেছে; তাহাদের ভাব দেখিয়া নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে সেখানে দাঁড় করাইয়া রাখা হইয়াছে। ক্রমে নিম্নলিখিতরূপ রিপোর্ট প্রস্তুত হইল;—

"মহামহীম

শ্রীলশ্রীযুক্ত ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট মহাশয়

সমিপেষু।

ধর্ম্মাবতার—গত রাত্রিতে পিয়ালিগ্রামের মণ্ডল গোপালদাস উক্ত গ্রামের চৌকিদার ইশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে থানায় আসীয়া এই মর্ম্মে এজেহার দেয় জে মাৎলানদীর এঞ্জিনিয়ারিং কার্জ্জের ভারপ্রাপ্ত রেট্‌লি সাহেব তাহাদের গ্রামে বাঘ স্বীকার করিতে আশীয়াছিলেন এবং তাহাদের নিসেদ অগ্রাঝ্য করিয়া সাহেব বাঘের অন্নেসনে জংগলে প্রেবেস করিয়া মারা পড়ীয়াছেন। এই শংবাদ প্রাপ্তো মাত্রে গোলাম মজকুর সরেজমিনে তদারকের নিমিত্য ঘটনাস্থলে উপস্থীত হইয়া নিচের তালীকাভূক্ত বেক্তিগণের এজেহার গ্রহন করে। উক্ত এজেহার এই সংগে পাঠান হইল। উক্ত এজেহার দিষ্টে পষ্ট জানা জায় যে, সাহেব যে মারা পড়ীয়াছেন সে বীসয়ে কোন শন্ধহ নাই। এ বীসয়ে গ্রামের বাসিন্দাগণের কতদুর দোস আছে তাহার তদারক চলীতেছে। গোলাম মজকুর চৌকিদার ও গ্রামবাসিদের লইয়া জংগলে যথাশাদ্ধ অনুশন্ধান করিয়াছে। (বাস্তবিক কেহ কোন অনুসন্ধানই করে নাই।) কিন্তু লাসের কোনরুপ চীর্ণ পাওয়া যাইতেছে না। পুলিসকর্ম্মচারি জবরদস্ত খাঁকে আরও বিসেশ করিয়া লাস অনুশন্ধান করিবার জন্নে ঘটনাস্থলে রাখিয়া গোলাম মজকুর মন্দ্বান্নে থানায় ফিরিয়া আসিয়া হুজুরে এই রীপোর্ট পেশ করিতেছে। ইতি তারীক ইত্যাদি।"

জবরদস্ত খাঁ।

রিপোর্ট লেখা প্রায় শেষ হয় হয়—এমন সময় উপস্থিত ব্যক্তিগণ আমাকে সশরীরে সেখানে আসিতে দেখিয়া যে কতদূর আশ্চর্য্যান্বিত হইল তাহা বর্ণনা করা যায় না। আমার কপালের একস্থান কাটিয়া গিয়া তাহা হইতে রক্ত পড়িতেছিল; আমার পরিচ্ছদ ছিন্ন ও রক্তাক্ত এবং তাহার অনেক স্থানে কর্দ্দমের দাগ লাগিয়াছিল।

আমার আগমনে গ্রামবাসিগণ যে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি অভাবনীয়-

রূপে মৃত্যু মুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছি বলিয়া যে তাহারা আনন্দিত হইয়াছিল তাহা নহে। তাহারাই সাহেবকে (আমাকে) খুন করিয়াছে এই ভয় দেখাইয়া পুলিস যে তাহাদিগের নিকট হইতে টাকা আদায়ের জন্য তাহাদিগকে পীড়ন করিতেছিল, সেই পীড়নের হস্ত হইতে রক্ষা পাইল বলিয়াই তাহাদের এত আনন্দ। আমার আগমনে দারোগা ও তাহার অনুচরবর্গের মুখে প্রথমে যে বিস্ময়ের ভাব দেখা গিয়াছিল ক্রমে তাহা বিরক্তির ভাবে পরিণত হইল; এবং তাহারা শীঘ্রই তথা হইতে প্রস্থান করিল। ফল কথা এই যে, ভয় ও ঔদাসীন্যবশতঃ কি পুলিসের লোক, কি গ্রামবাসিগণ, কেহই আমার কোনও অনুসন্ধান করে নাই। আমার অদর্শনই তাহাদের নিকট আমার মৃত্যুর যথেষ্ট প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

আমার জীবন রক্ষার ইতিহাস অতি সংক্ষিপ্ত। বন্দুকে অতিরিক্তমাত্রায় বারুদ ঠাসা ও দুইটী চুঙ্গীর একসঙ্গে আওয়াজ হইয়া যাওয়া এই উভয় কারণে বন্দুকের বাঁট হইতে নল ছাড়িয়া যায়। সৌভাগ্যক্রমে নল ফাটিয়া যায় নাই; কিন্তু আওয়াজের পর নল পিছু হটিয়া এরূপ বেগে আসিয়া আমার কপালে লাগিয়াছিল যে তাহাতেই আমি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া যাই। অনেকক্ষণ পরে চৈতন্যলাভ হইলে আমি কোনওক্রমে হামাগুড়ি দিয়া জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া অনতিদূরবর্ত্তী একখানি খালি নৌকায় আশ্রয় লই এবং তথায় রাত্রিযাপন করিয়া পর দিবস প্রাতে পিয়ালিগ্রামে উপস্থিত হই। ব্যাঘ্রটার মস্তকের অধিকাংশ বন্দুকের গুলিতে উড়িয়া গিয়াছিল। আমি যখন ব্যাঘ্রের সম্মুখে উপস্থিত হই তখন বোধ হয় সে অতিরিক্ত মাত্রায় ভোজন করিয়া অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় বসিয়াছিল এবং সেই জন্যই আমাকে আক্রমণ করে নাই। ইহাই আমার জীবনরক্ষার কারণ বলিয়া মনে হয়।

একবার ভ্রমণ করিতে করিতে আমাকে সুন্দরবনের একটী নদী পার হইতে হয়। একেত খেয়া নৌকাগুলি অতি কদর্য্য, তাহার উপর আমাদের নৌকাখানি স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল—হাট বার বলিয়া সে দিন তাহারা হাটে যাইতেছিল। স্রোত ও বায়ু উভয়ই প্রবল থাকাতে নদীতে অত্যন্ত ঢেউ হইতেছিল। আমরা প্রায় অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিয়াছি, এমন সময় দেখা গেল অনতিদূরে একটা বাঘ আমরা যে কূলের দিকে যাইতেছি সেই কূলের উদ্দেশে সাঁতার দিয়া যাইতেছে। দেখিয়া বোধ হইল সে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে—কারণ, এক একটা ঢেউ তাহার মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইবার পর সে অত্যন্ত হাঁপাইতে হাঁপাইতে ভাসিয়া উঠিতেছিল। দেখিতে দেখিতে আমাদের নৌকা স্রোতের বেগে আড়া-আড়িভাবে বাঘের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল; সেও আপনার প্রাণ বাঁচাইবার জন্য নৌকারদিকে আসিতে লাগিল। স্ত্রীলোকগুলি ভয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নৌকার অপরপার্শ্বে ঝুঁকিয়া পড়াতে নৌকা ডুবিয়া যাইবার উপক্রম হইল। ব্যাঘ্র যাহাতে নৌকার পার্শ্বদেশ ধরিতে না পারে তাহার উপায় করা ভিন্ন আমাদের রক্ষা নাই দেখিয়া আমি একটা দাঁড় লইয়া তাহার মস্তকে এরূপ ভাবে আঘাত করিতে লাগিলাম যাহাতে সে জলের উপর মাথা তুলিতে না পারে। আমার

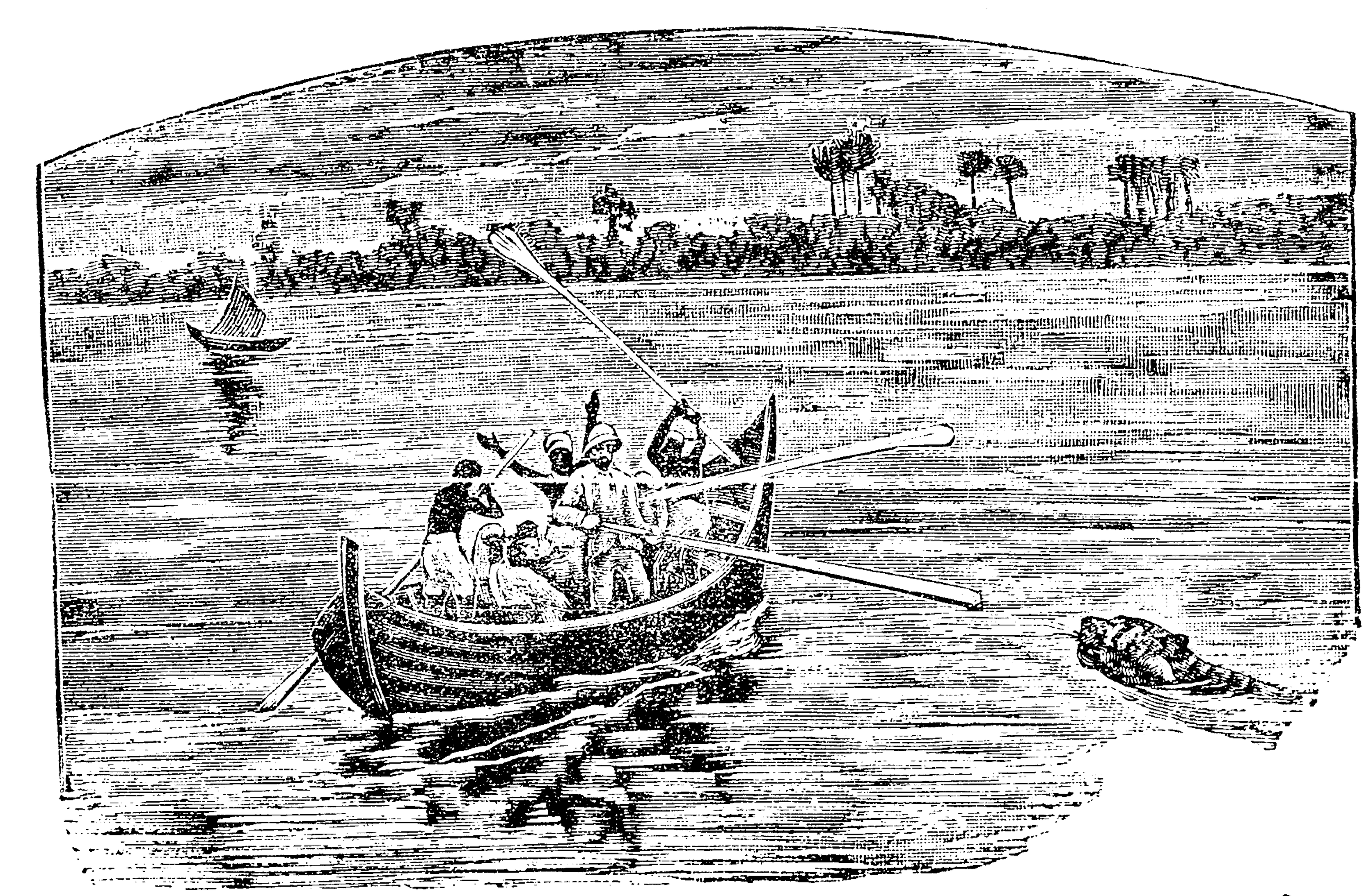

দেখাদেখি দুই জন দাঁড়ীও সেইরূপ করিতে লাগিল। মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া বাঘটা রাগে একটা দাঁড় জোরে

কামড়াইয়া ধরিল; কিন্তু ক্রমাগত দাঁড়ের আঘাত খাইতে খাইতে সে আর জলের উপর মাথা তুলিতে পারিল না এবং গর্জ্জন করিতে করিতে নদী-গর্ভে চির-নিমগ্ন হইল; আর তাহাকে দেখা গেল না।

সে যাত্রা আমি দূরস্থিত কোনও গ্রামে একটা চুরি ও খুনের তদারকে যাইতেছিলাম। সেখানে উপস্থিত হইলে তাম্বু ফেলা হইল। অতিরিক্ত ক্লান্তিবশতঃ আমি সন্ধ্যার পরেই নিদ্রাগত হইলাম; আমার আরদালি তাম্বুর প্রবেশ-দ্বারের নিকট বিশ্রাম করিতে লাগিল। কতক্ষণ নিদ্রা গিয়াছিলাম বলিতে পারি না। হঠাৎ কে যেন দৌড়িয়া তাম্বুর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং অন্ধকারে আমার উপর পড়িয়া গেল; নিমেষ মধ্যে খাট, মশারি, চেয়ার, টেবিল সমস্ত পড়িয়া একাকার হইয়া গেল; লোকটা কষ্টেসৃষ্টে সেই সকল জিনিস পত্রের মধ্য হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিতে করিতে ভয়বিজড়িত স্বরে বলিল, "বাঘ, সাহেব! বাঘ!" আমি স্বর শুনিয়া বুঝিলাম—সে আর কেহ নহে, আমার আরদালি।

অতি কষ্টে একটা আলোক সংগ্রহ হইলে, আমি আরদালির পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহিরে গেলাম। পূর্ণিমার চন্দ্রালোকে চারিদিক্ ধপ্ ধপ্ করিতেছে। এমন সুন্দর জ্যোৎস্না গ্রীষ্মপ্রধান দেশ ব্যতীত আর কুত্রাপি নয়নগোচর হয় না। আরদালি বলিল, সে তাম্বুর প্রবেশদ্বারস্থ ক্ষুদ্র বস্ত্রাবাসের মধ্যে বসিয়া তাহাদের দেশীয় প্রথানুসারে গান করিতে করিতে ঝিমাইতেছিল, এমন সময় সম্মুখে কয়েক-পদমাত্র দূরে এক ব্যাঘ্র দেখিয়া সে চমকিত ও একেবারে জাগরিত হইয়া উঠিল; ভয়ে তাহার বাক্য রুদ্ধ ও চলৎশক্তি রহিত হইয়া গেল—সে এইভাবে বসিয়া দেখিতে লাগিল বাঘটা লেজ আছড়াইতেছে ও রাগে ঘড়্ঘড় শব্দ করিতে করিতে দাঁত বাহির করিতেছে।

খানিক পরে বাঘটা সেখান হইতে চলিয়া গেল; কিন্তু যাইবার সময়েও যেন কি করিবে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া মধ্যে মধ্যে থামিতে লাগিল। বোধ হয় সে তাম্বুটাকে বাঘধরা ফাঁদ মনে করিয়া থাকিবে। আমি দেখিলাম নরম বেলে মাটির উপর ব্যাঘ্রের পদচিহ্ন রহিয়াছে—দেখিয়াই বোধ হইল ব্যাঘ্রটা খুব বড়—এবং সে যে আরদালির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া পরে চলিয়া গিয়াছে তাহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল। আমরা সেই রাত্রিতেই অনেক দূর পর্য্যন্ত ঐ পদচিহ্ন অনুসরণ করিতে করিতে একটা ছোট নদীর ধারে একটা জঙ্গলের নিকট উপস্থিত হইলাম। তাহার পর আর কিছু দেখিতে পাইলাম না।

আমি যে চুরির তদারকে গিয়াছিলাম, তাহার কিছুই কিনারা করিতে পারিলাম না। ধরা পড়িবার ভয়ে চোরেরা যে ভয়ানক উপায় অবলম্বন করিয়াছিল তাহার জন্যই অনুসন্ধান অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। একজন সামান্য তালুকদারের গৃহের মাটির দেয়ালে সিঁধ দিয়া রাত্রিতে চোর প্রবেশ করে। ঐ গর্ত্তের মধ্য দিয়া কতক-গুলি বাসন পার করিয়া দিবার সময় উহার পতনশব্দে গৃহস্থদিগের নিদ্রাভঙ্গ হয়। তাহারা উঠিয়া গোলমাল করাতে চোরেরা সিঁধের গর্ত্ত দিয়া পলাইতে আরম্ভ করে। গৃহস্থগণ যখন আলোক জ্বালিয়া গর্ত্তের নিকট উপস্থিত হইল তখন সকলে পলাইয়াছে, কেবল একজন পলাইতে পারে নাই; তাহার পদদ্বয় তখনও ঘরের ভিতরে; গৃহস্থগণ তাহার পা ধরিয়া টানিতে লাগিল, চোরেরা বাহির হইতে তাহার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ "টগ্-অব-ওয়ার" খেলার মত টানাটানি করিতে করিতে গৃহস্থগণ হঠাৎ চিৎ হইয়া পড়িয়া গেল; উঠিয়া দেখে চোরের মুণ্ডহীন দেহটা ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। চোরেরা তাহাদের সঙ্গীকে ছাড়াইয়া লইয়া যাইতে অসমর্থ হইয়া, পাছে সে ধরা পড়িলে দলশুদ্ধ ধরা পড়ে, এই ভয়ে তাহার মুণ্ড কাটিয়া লইয়া প্রস্থান করিয়াছে!

এখানকার ছোট বড় সমস্ত নদীতেই অসংখ্য কুম্ভীর দেখিতে পাওয়া যায়। নদীতে যে এত কুম্ভীর থাকিতে পারে তাহা না দেখিলে বিশ্বাসই হয় না। প্রায় অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় নদীর তীরে ৩ ফীট লম্বা শাবক হইতে আরম্ভ করিয়া ১৬ ফীট লম্বা বৃহৎ বৃহৎ কুম্ভীর পর্য্যন্ত সারি সারি নদীর দিকে সম্মুখ করিয়া ভীষণ রক্তবর্ণ মুখ ব্যাদানপূর্ব্বক রৌদ্র পোহাইতেছে; একটু ভয় পাইলেই তাহারা ঝুপঝাপ করিয়া জলে পড়িয়া যায়। ইহাদের উপদ্রবও বড় সামান্য নহে; ইহারা রাত্রিতে নদীতীর হইতে অনেক দুর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়া গরু বাছুর

প্রভৃতি ধরিয়া আনে। ইহারা লেজের ঝাপ্টা মারিয়া বড় বড় গরুর পা একেবারে ভাঙ্গিয়া দেয় এবং তাহার পর তাহাদিগকে টানিয়া নদীতে আনিয়া অবসর মত আহার করে; (কখনও কখনও দিনের বেলা নদীর ধারের মাঠ হইতে গরুর খোঁটা উপ্ড়াইয়া মুখ দিয়া তাহাদের গলার দড়ি টানিতে টানিতে তাহাদিগকে নদীর ভিতর লইয়া যায়।) একবার একজন জেলের ছেলে একটা ছোট নদীতে মাছ ধরিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ তাহাকে কুম্ভীরে ধরে। সংবাদ পাইয়া অনেক লোকজন আসিয়া কুম্ভীরটাকে লাঠি ও ইট্ মারিতে লাগিল; সে তাহা গ্রাহ্য না করিয়া স্রোতে গা ভাসান দিয়া যাইতে যাইতে বোধ হয় তাহার শিকারকে বাগাইয়া ধরিবার জন্য প্রথমে তাহাকে

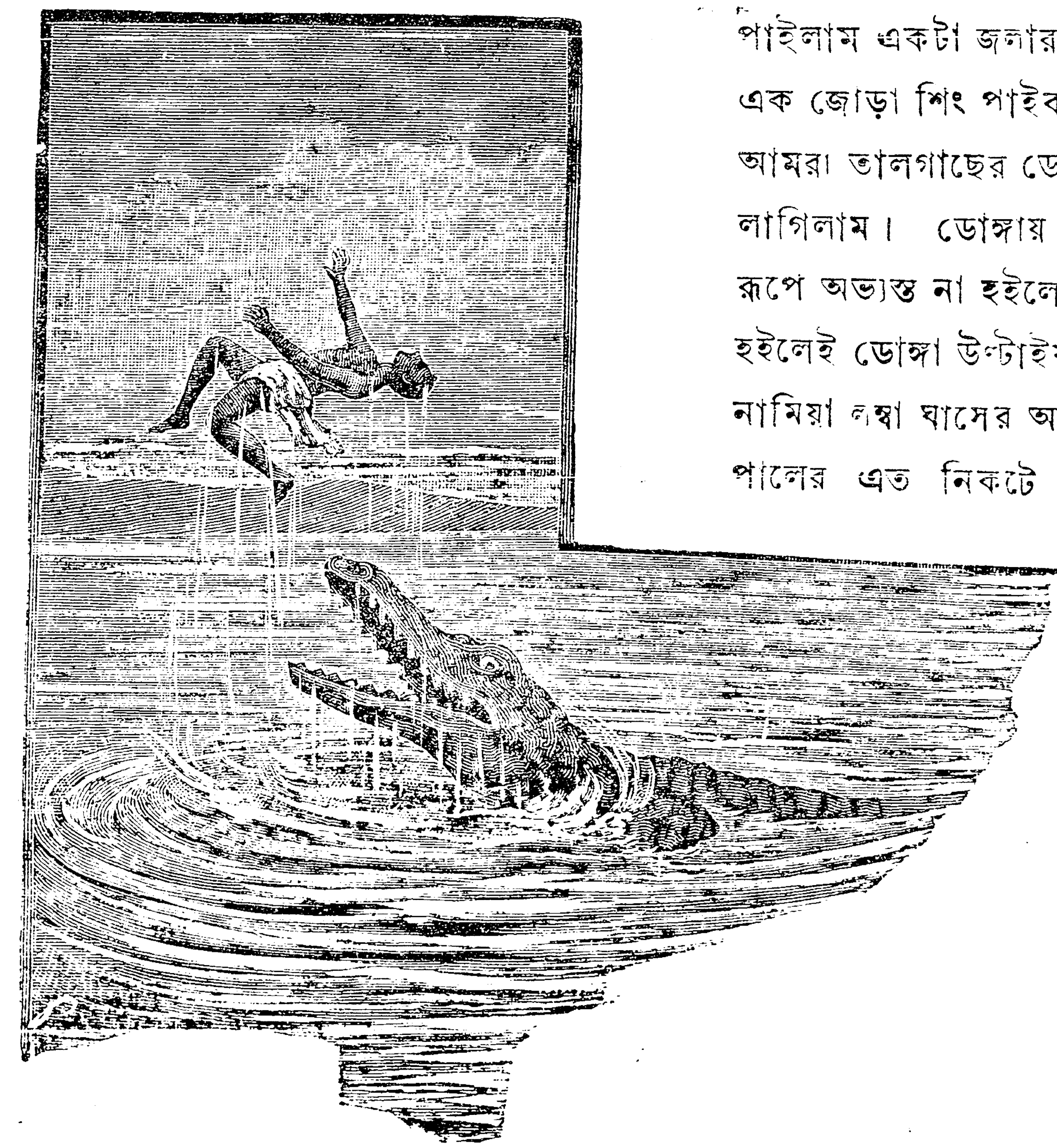

শূন্যে খানিক দুর ছুঁড়িয়া দিয়া পুনরায় হাঁ করিয়া ধরিয়া লইল এবং পরক্ষণেই তাহাকে লইয়া পঙ্কিল জলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এখানে কখনও কখনও দলে দলে বন্য-মহিষ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে জলাভূমিতে অনেক বন্যমহিষ দেখা যাইত; এই সকল জলা সুন্দরবনের শত শত বিঘা স্থান ব্যাপিয়া আছে। মহিষ বড় ভয়ানক জন্তু। ইহারা যখন দলবদ্ধ হইয়া থাকে, তখন ব্যাঘ্র পর্য্যন্ত ইহাদিগকে আক্রমণ করিতে সাহসী হয় না। অপেক্ষাকৃত সম্পত্তিশালী কৃষকগণ প্রায়ই বহুসংখ্যক মহিষ পুষিয়া থাকে। অনেক সময় অল্পবয়স্ক বালকগণ ইহাদিগের দলের মধ্যে একটার পৃষ্ঠে বসিয়া নির্ভয়ে ইহাদিগকে চরাইয়া লইয়া বেড়ায়। ব্যাঘ্রের সাধ্য কি যে মহিষের দলের মধ্য হইতে তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া যায়? তাহারা মহিষের পৃষ্ঠে নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া প্রায়ই দেখিতে পায় দুই একটা মহিষ শাবক বা রুগ্ন মহিষের প্রত্যাশায় অদূরে ব্যাঘ্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

একবার আমরা দল বাঁধিয়া যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলাম একটা জলার ধারে কতকগুলা বন্যমহিষ চরিতেছে। দেখিয়া এক জোড়া শিং পাইবার জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইল। তখন আমরা তালগাছের ডোঙ্গায় চড়িয়া তাহাদিগের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ডোঙ্গায় কষ্টেসৃষ্টে দুইজন লোক বসিতে পারে। উত্তমরূপে অভ্যস্ত না হইলে ডোঙ্গা চালান বড় কঠিন। একটু অসাবধান হইলেই ডোঙ্গা উল্টাইয়া যায়। সে যাহা হউক আমরা জলার ধারে নামিয়া লম্বা ঘাসের আড়ালে আড়ালে একহাঁটু কাদা ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে পালের এত নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম যে, সেখান হইতে সহজে অনেক মহিষকে গুলি করা যায়। আমাদের গুলির আঘাতে একটা মহিষ পড়িয়া গেল। তাহা দেখিয়া সমস্ত মহিষ মাথা নোয়াইয়া আমাদের দিকে আসিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি পলাইতে গিয়া আমাদের ডোঙ্গাগুলি সব উল্টাইয়া গেল। আমরা সেই উল্টান ডোঙ্গা ধরিয়া কোনও ক্রমে গভীর জলে আসিয়া পড়িলাম। মহিষেরা অনেক দূর পর্য্যন্ত আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিল; অবশেষে জল গভীর দেখিয়া রাগে মাথা নাড়িতে নাড়িতে চলিয়া গেল। সে যাহা হউক এই শিকার উপলক্ষে আমার প্রাণান্ত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। মহিষের পাল চলিয়া গেল দেখিয়া আমরা মৃত মহিষটার শৃঙ্গ অধিকার করিবার জন্য একটা বক্র পথে খানিকটা ঘুরিয়া

তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম। এরূপ করিবার কারণ এই যে, সোজা পথে গেলে মহিষের পালের দৃষ্টিপথে পড়িবার সম্ভাবনা ছিল। মহিষটাকে মৃত মনে করিয়া আমি তাহার লাঙ্গুল ধরিয়া টানিতে টানিতে মহানন্দে চীৎকার করিয়া আমার দলস্থ লোকদিগকে ডাকিতেছি, এমন সময় কি সর্ব্বনাশ!—মহিষটা হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া মাথা নাড়িয়া আমাকে গুঁতাইতে আসিল! কিন্তু আমি তাহার

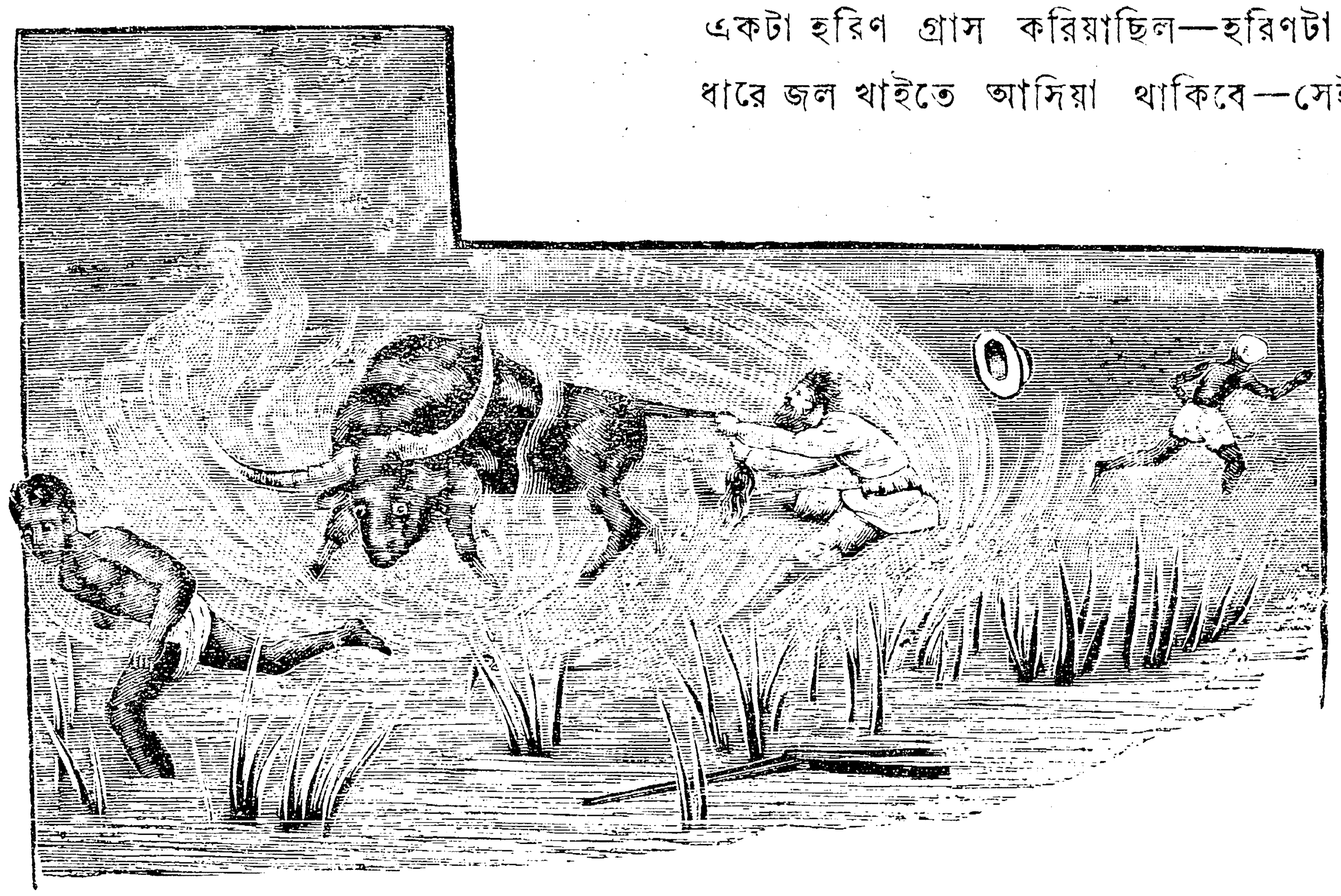

লাঙ্গুল দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকাতে তাহার সে অভিপ্রায় ব্যর্থ হইয়া গেল; সে কেবল আমাকে লইয়া লাটিমের মত ঘুরিতে লাগিল। সেই ভীষণ মুহূর্ত্তে একবার হাত ছাড়িয়া গেলেই সে নিশ্চয় আমার প্রাণ বিনাশ করিবে এই আশঙ্কায় আমি প্রাণপণে তাহার লাঙ্গুল ধরিয়া তাহার সহিত ঘুরিতে লাগিলাম; আমার মাথার টুপি উড়িয়া গেল; লোকজন ভয়ে দৌড়িয়া যে যেদিকে ইচ্ছা পলাইতে লাগিল; আমি নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া প্রাণরক্ষা সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িয়াছি, এমন সময় মহিষটা গতাসু হইয়া পড়িয়া গেল; আমি সে যাত্রাও বাঁচিয়া গেলাম।

আমরা মহিষ শিকার শেষ করিয়া তাম্বুতে ফিরিয়া আসিতেছি, এমন সময় একজন দেশীয় লোক দৌড়িয়া আসিয়া সংবাদ দিল, সে নিকটে এক নদীর ধারে দুইটা শৃঙ্গবিশিষ্ট একটা অজগর সর্প দেখিয়াছে। যদিও তাহার কথায় আমাদের বিশ্বাস হইল না, তথাপি আমরা তাহার সহিত সেই নদীর ধারে গিয়া দেখি সত্যসত্যই নদীর অপর পাড়ে একটা প্রকাণ্ড বোয়াসর্প রহিয়াছে এবং তাহার মস্তকের দুই পার্শ্বে প্রায় দুই হাত লম্বা দুইটী শৃঙ্গ দেখা যাইতেছে। সে একটা গাছের গুঁড়িতে লেজ জড়াইয়া আমাদের দিকে সম্মুখ করিয়া নদীর ঢালু তীরের উপর শয়ন করিয়াছিল। সে যখন সরিয়া যাইতে আরম্ভ করিল তখন আমরা এই ব্যাপারের রহস্যোদ্ভেদে সমর্থ হইলাম। সে একটা হরিণ গ্রাস করিয়াছিল—হরিণটা বোধ হয় নদীর ধারে জল খাইতে আসিয়া থাকিবে—সেই হরিণের শৃঙ্গ দুইটা গিলিতে না পারাতে উহা তাহার মুখের দুইপার্শ্ব দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল এবং সেই জন্যই তাহাকে শৃঙ্গবিশিষ্ট সর্পের ন্যায় দেখাইতেছিল।

আমি একবার পাল্কীশুদ্ধ বাঘের ঘাড়ের উপর পড়িয়াছিলাম। এই ঘটনা সুন্দরবনের সুদূর পশ্চিমে একস্থলে ঘটিয়াছিল। যে স্থানে এ ঘটনা ঘটে, সেখানে খাজনা লইয়া কৃষকদের সহিত গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদের গোলযোগ ঘটায় আমাকে তাহার তদারকে যাইতে হইয়াছিল। আমাকে যে পথ দিয়া যাইতে হইয়াছিল, সেখানে লোকজনের বসতি অধিক নাই—মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট জঙ্গল—এই সকল জঙ্গলে ব্যাঘ্র বাস করে। আমাকে প্রথম খানিকটা পথ পাল্কী করিয়া যাইতে হইয়াছিল। পাল্কী এক বিষম যন্ত্রণাদায়ক বাহন; ইহাতে পা নামাইয়া রাখিবার স্থান নাই এবং ইহা এত নীচু যে ইহার মধ্যে বসিয়া বা শুইয়া থাকা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

আমার সঙ্গে চারিজন বাহক, চারিজন অতিরিক্ত বাহক ও রাত্রে মশাল ধরিবার জন্য একজন লোক—সর্ব্বশুদ্ধ নয় জন লোক ছিল।

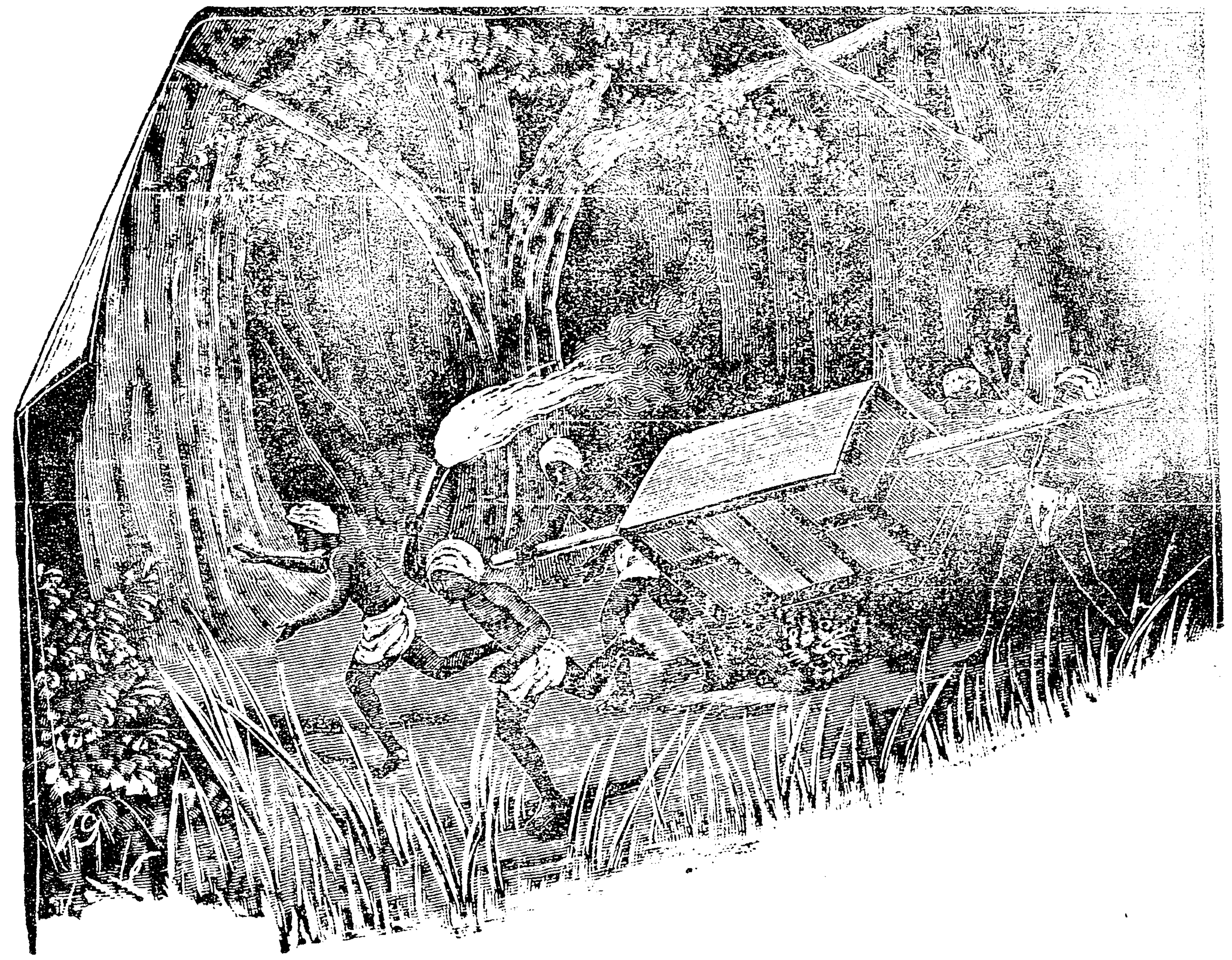

আমরা একটা জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাইতেছিলাম। রাত্রি ঘোর অন্ধকার; তাহার উপর মশালের আলোকে অন্ধকার আরও গাঢ়তর দেখাইতেছিল; আমার একটু নিদ্রা আসিয়াছিল—এমন সময় হঠাৎ ভীষণশব্দে পাল্কী নীচে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে এক বিকট গর্জ্জন শ্রুত হইল ও কে যেন পাল্কী কাৎ করিয়া ফেলিয়া দিল। তাহার পর চারিদিক্ একেবারে নিস্তব্ধ! আমি বাহির হইবার চেষ্টা করিতে গিয়া দেখি, পাল্কীর দরজা এমন আট্‌কাইয়া গিয়াছে যে কিছুতেই খোলা যায় না। অবশেষে সবলে পদাঘাত করিতে করিতে একখানা দরজা ছুটিয়া গেল। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম কেহ কোথাও নাই—লোকজন সব পলায়ন করিয়াছে। তখন পাল্কীখানি সোজা করিয়া ও দরজা ঠিক করিয়া লইয়া তাহারই মধ্যে কোনও মতে রাত্রি যাপন করিলাম।

প্রভাতে বাহকগণ ফিরিয়া আসিলে শুনিলাম, হঠাৎ একটা ব্যাঘ্র পাল্কীর নীচে দিয়া দৌড়িয়া যাইবার চেষ্টা করাতে তাহারা ভয়ে তাহার পৃষ্ঠের উপর পাল্কী ফেলিয়া পলাইয়া যায়। এইরূপে ঘাড়ের উপর পাল্কী পড়াতে বাঘ বেচারা নিশ্চয়ই খুব ভয় পাইয়া গর্জ্জন করিয়া থাকিবে এবং তাহার এই অবস্থা হইতে পলায়নের চেষ্টাতেই পাল্কী কাৎ হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল। আমাকে অবশিষ্ট পথ হস্তিপৃষ্ঠে যাইতে হইয়াছিল। প্রজাগণ উত্তেজিত হইয়াছিল বলিয়া আমি দুইজন বন্দুকধারী পুলিশ প্রহরী সঙ্গে লইয়া ছিলাম। আমার হাতীর উপর হাওদা ছিল না; হাতীর পিঠে একখানা সতরঞ্চ বাঁধিয়া তাহারই উপর কোনও মতে বসিতে হইয়াছিল।

আমরা কিয়দ্দূর না যাইতে যাইতে একটা ঝোপের মধ্য হইতে একটা প্রকাণ্ড ভল্লুক আসিয়া আমাদের হস্তীকে আক্রমণ করিল। হাতীটা শিকারে অভ্যস্ত ছিল না বলিয়া ভয়ে পশ্চাৎ ফিরিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিল। এই অবস্থায় একহস্তে বন্দুক লইয়া অপর হস্তের সাহায্যে শতরঞ্চ ধরিয়া হস্তীর পৃষ্ঠে বসিয়া থাকা যে কি কষ্টকর তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারিবে না। তাহার উপর আমার দুই পার্শ্বস্থ প্রহরিদ্বয় যে ভাবে বন্দুকের সঙ্গীন খাড়া করিয়া ধরিয়াছিল, তাহাতে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গেলে আমাকে নিশ্চয় সঙ্গীনে বিদ্ধ হইতে হইত। সে যাহা হউক আমি অনেক চেষ্টার পর একবার ভালুকটাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুঁড়িলাম; কিন্তু ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে হাতীটা একপার্শ্বে ঘুরিয়া যাওয়াতে গুলি ভল্লুককে না লাগিয়া মাহুতের স্কন্ধদেশ ভেদ করিয়া চলিয়া গেল এবং হতভাগ্য মাহুত ভূতলে পতিত হইল। এই ঘটনার পর হস্তী প্রাণপণে দৌড়িতে আরম্ভ করিল; প্রহরিদ্বয় একে একে সড়িয়া পড়িল এবং ভল্লুক তাহাদিগকে লক্ষ্য না করিয়া

হস্তীর পশ্চাৎ পদে নখাঘাত করিতে করিতে তাহার অনুসরণ করিল। আমি পড়িয়া যাইবার ভয়ে বন্দুক ফেলিয়া দিয়া অতিকষ্টে হস্তিপৃষ্ঠস্থ সতরঞ্চ দুই হাতে ধরিয়া বসিয়া রহিলাম, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে হস্তী একটা বৃক্ষের তলদেশে আসিলে তাহার একশাখা ধরিয়া বৃক্ষের উপর উঠিয়া বসিলাম।

এই দুঃখময় ঘটনার অবশিষ্টাংশ সবিস্তারে বর্ণন করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে হাতীটাকে যখন পরে খুঁজিয়া পাওয়া গেল, তখন দেখা গেল ভল্লুকে তাহার পশ্চাৎপদ ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিয়াছে। আমি প্রথমে আশঙ্কা করিয়াছিলাম যে মাহুতের হাত কাটিয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সে অস্ত্রপ্রয়োগ ব্যতীতই ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল।

এইস্থলে একটা নরখাদক ব্যাঘ্রের গল্প বোধ হয় পাঠকদিগের অপ্রীতিকর হইবে না। এক দিন আমি আমার ঘরে বসিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পুস্তক পাঠে নিযুক্ত ছিলাম; গ্রীষ্মাতিশয্যবশতঃ ঘরের দরজা জানালা সমস্ত

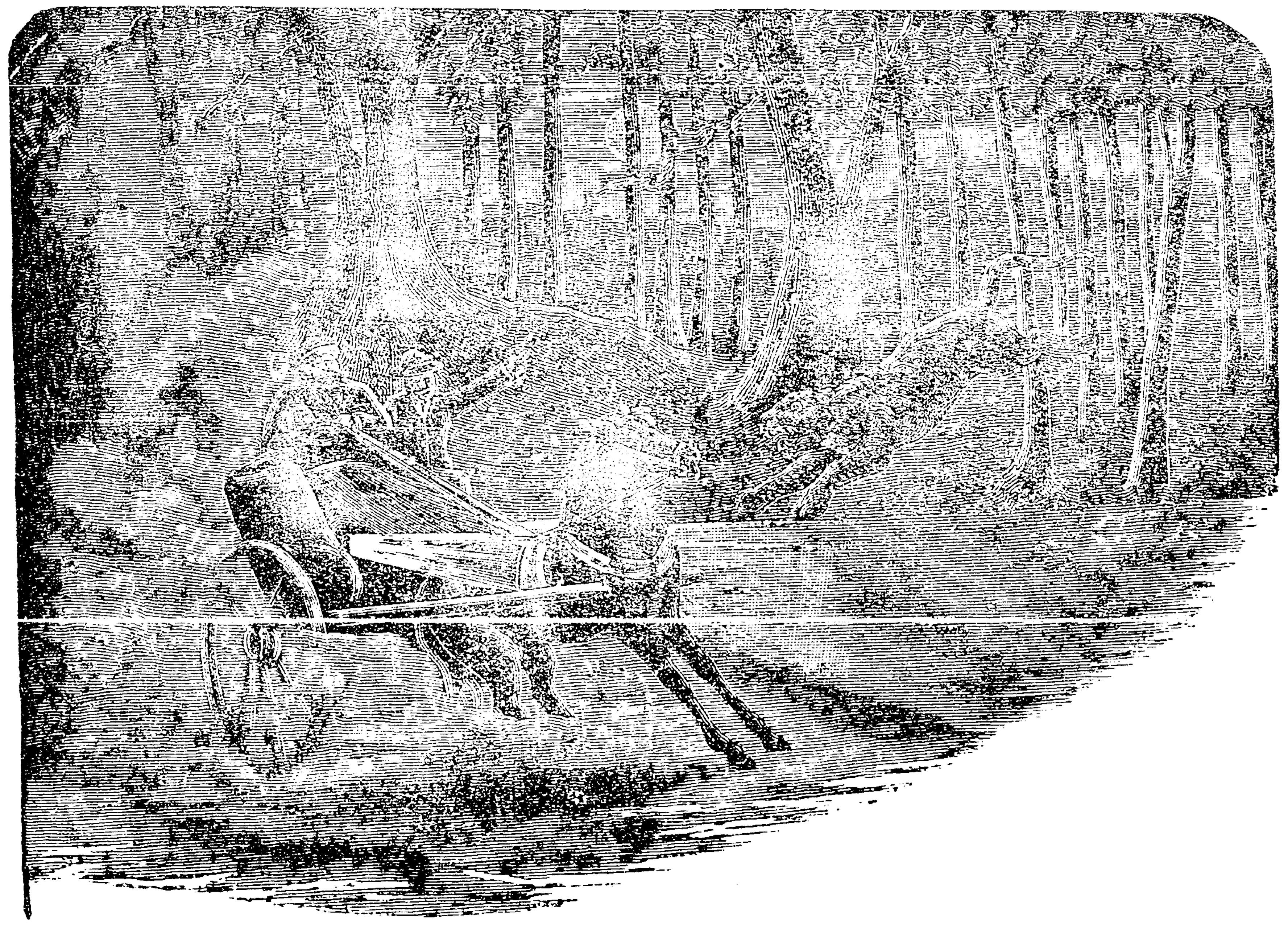

খোলা ছিল। হঠাৎ বহিঃস্থ বারাণ্ডায় আমার আরদালির পদশব্দ শুনিয়া অথবা তাহাকে নড়িয়া বেড়াইতে দেখিয়া আমার সেই দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। আমার বোধ হইল সে যেন বারাণ্ডার থামের পশ্চাতে থাকিয়া অপর পার্শ্বস্থ কাহারও সহিত লুকোচুরি খেলিতেছে।

ইহা দেখিয়া আমার একটু আশ্চর্য্য বোধ হইল; ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য আমি আস্তে আস্তে বারাণ্ডায় বাহির হইয়াই দেখি বারাণ্ডার সম্মুখস্থ গাড়ীরাস্তার পার্শ্বস্থিত সব্‌জির ঝোপের ভিতর দিয়া এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র পদচারণ করিতেছে! সে একবার মাত্র আমার দিকে চাহিয়া, যে থামের পশ্চাতে আরদালি ভয়ে অর্দ্ধমৃতবৎ দাঁড়াইয়াছিল, সেই থামের সম্মুখে বেড়াইতে লাগিল। আমিও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় কিয়ৎক্ষণ বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া তাহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম—সে একবার শিকারী বিড়ালের মত গুড়ি মারিয়া বসিতেছে, আবার উঠিয়া ঝোপের ছায়ায় ছায়ায় বেড়াইতেছে—এইরূপ করিতে করিতে হঠাৎ একদিকে চলিয়া গেল, আর তাহাকে দেখা গেল না। বোধ হয় আমার ঘরে যে উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছিল তাহা দেখিয়াই হউক, অথবা আমাকে চুপে চুপে আসিয়া বারাণ্ডায় দাঁড়াইতে দেখিয়াই হউক ব্যাঘ্রটার মনে কোনওরূপ সন্দেহ হইয়া থাকিবে এবং সেই জন্যই সে চলিয়া গিয়াছিল।

পর দিন সন্ধ্যার সময় নিকটস্থ এক নীলকুঠি হইতে দুইজন বন্ধু নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। সায়ংকালীন আহারের পর আমি তাঁহাদিগকে গাড়ী করিয়া রাখিয়া আসিতে গিয়াছিলাম। আমার বাটী হইতে নীলকুঠি প্রায় একক্রোশ দুরবর্ত্তী; একটা জঙ্গলের পার্শ্বস্থিত একটী সংকীর্ণ পথ দিয়া সেখানে যাইতে হয়; জঙ্গলটী রাস্তা অপেক্ষা একটু উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত। আমরা প্রায় অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিয়াছি, এমন সময় আমাদের ঘোটক

যেন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং প্রায় সেই সঙ্গে সঙ্গেই বিকট গর্জ্জন করিয়া এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র জঙ্গলের দিক্ হইতে এক লম্ফে আমাদের ঘোটকের মুখের নিকট দিয়া রাস্তার অপর দিকে গিয়া পড়িল। বোধ হয় ঘোড়াটা পূর্ব্ব হইতেই ব্যাঘ্রটাকে দেখিতে পাইয়া তাহার লম্ফ প্রদানের সময় একটু পিছু হটিয়াছিল, নতুবা বাঘটা একেবারে ঘোড়ার মাথার উপর আসিয়া পড়িত। সে যাহা হউক, ব্যাঘ্র এইরূপে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে পর আমাদের ঘোটক ভয়ে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া ভয়ানক বেগে ছুটিতে লাগিল এবং একদৌড়ে নীলকুঠিতে আসিয়া উপস্থিত হইল আমরা সে যাত্রা কোনও মতে বাঁচিয়া গেলাম।

এই ব্যাপারটী এত অল্প সময়ের মধ্যে ও এরূপ অতর্কিতভাবে ঘটিয়াছিল যে, সমস্ত পথ আমাদের মধ্যে এ সম্বন্ধে কোনও কথাবার্ত্তা হয় নাই। কিন্তু নীলকুঠিতে আসিয়া গাড়ী থামিবামাত্র আমরা আমাদের বিপদের কথা মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মৃত হইয়া সকলে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিলাম। কুঠির কর্ত্তা আমাদের হাস্য দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। তিনি একটু কোপনস্বভাবের লোক। আমরা যখন কুঠিতে উপস্থিত হই তখন তিনি খালি গায়ে পাজামা মাত্র পরিধান করিয়া, লাঠিহাতে তাঁহার পাখাকুলির অনুসরণে কুঠির চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন—সে পাখা টানিতে টানিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের হাস্যের কারণ শুনিয়া তাঁহার ক্রোধের উপশম হইল। কুলি বেচারাও সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল।

ব্যাঘ্রের প্রকৃতিই এই যে, তাহারা প্রথম উদ্যমে শিকার ধরিতে না পারিলে চোরের মত একদিকে চলিয়া যায়; আমরা পথে যে ব্যাঘ্রের সম্মুখে পড়িয়াছিলাম সে নিশ্চয় এই কারণেই প্রথম উদ্যমে বিফলমনোরথ হইয়া পরে আর আমাদিগের অনুসরণ করে নাই। সে যাহা হউক এই ঘটনার পর এক সপ্তাহের মধ্যে ঐ ব্যাঘ্রটাই দিবা দ্বিপ্রহরে একজন রাখালকে লইয়া প্রস্থান করিয়াছিল। রাখাল আমার কুঠির নিকটেই গরু চরাইতেছিল।

অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে, ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর বহু সহস্র লোক বিষধর সর্পের হস্তে প্রাণ হারায় এবং সেখানকার সাহেবদের মধ্যেও এমন লোক খুব অল্পই আছেন যাঁহার জীবনে কখনও এই ভীষণ জন্তু-সংসৃষ্ট কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই।

একদিন রাত্রিতে আমি টেবিলের পার্শ্বে বসিয়া পড়িতে পড়িতে অভ্যাসবশতঃ অন্যমনস্ক ভাবে আমার চটি জুতার উপর আস্তে আস্তে পা ঠুকিতেছিলাম। এরূপ করা বোধ হয় অনেকেরই অভ্যাস আছে। সে যাহা হউক অল্পক্ষণ পরেই কোনও কারণে বাহিরে যাওয়া আবশ্যক হওয়াতে আমি পাদুকাবিহীন অবস্থায় দাঁড়াইয়া উঠিলাম এবং চেয়ারখানি একদিকে সরাইয়া দিয়া হেঁট হইয়া টেবিলের তলায় চটিজুতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু সেখানে যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল—দেখিলাম আমি যেখানে জুতা আছে মনে করিয়াছিলাম সেখানে একটী গোখুরা সাপ কুণ্ডলী পাকাইয়া রহিয়াছে এবং জুতাজোড়াটী চেয়ারের একপার্শ্বে পড়িয়া আছে! আমি জুতা মনে করিয়া ভীষণ কালসর্পের গাত্রে পা ঠুকিতেছিলাম!

এরূপ অবস্থাতেও যে সর্প আমাকে দংশন করে নাই তাহার কারণ এই যে, শীতকালে সর্পগণ নিতান্ত নির্জ্জীব হইয়া পড়ে—এবং এই ঘটনা জানুয়ারি মাসে ঘোর শীতের সময় ঘটিয়াছিল। ঐ সর্পটী এমন নির্জ্জীব হইয়াছিল যে, লাঠির আঘাত করিতে করিতে তবে সে স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়াছিল। সে যাহা হউক সে যদি আমাকে দংশন করিত, তাহা হইলে আমার দশা কি হইত তাহা কিয়দ্দিন পরের একটী ঘটনা দ্বারা আমার চক্ষের সম্মুখে উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল।

গবর্ণমেণ্টের নিয়ম অনুসারে কেহ বিষধর সর্প ধরিয়া আনিতে পারিলে তাহাকে পুরস্কার দেওয়া হয়। তদনুসারে একজন দেশীয় লোক একদিন একটা গোখুরা সর্প আমাকে দেখাইতে লইয়া আসে। সে ভাল সাপ খেলাইতে জানিত না। তথাপি সে বাহাদুরী দেখাইবার জন্য একটা হাঁড়ির ভিতর হাত পুরিয়া পাকা খেলোয়ারের মত সাপের মুখের নিকট নাড়িতে লাগিল। এইরূপ করিতে করিতে সর্পটা ক্রমে উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং খাড়া হইয়া ফণা বিস্তার করতঃ হাঁড়ির তলায় জোরে ছোবল মারিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে সে কেবল নিজের মুখেই আঘাত পাইতে লাগিল; অবশেষে লোকটাকে

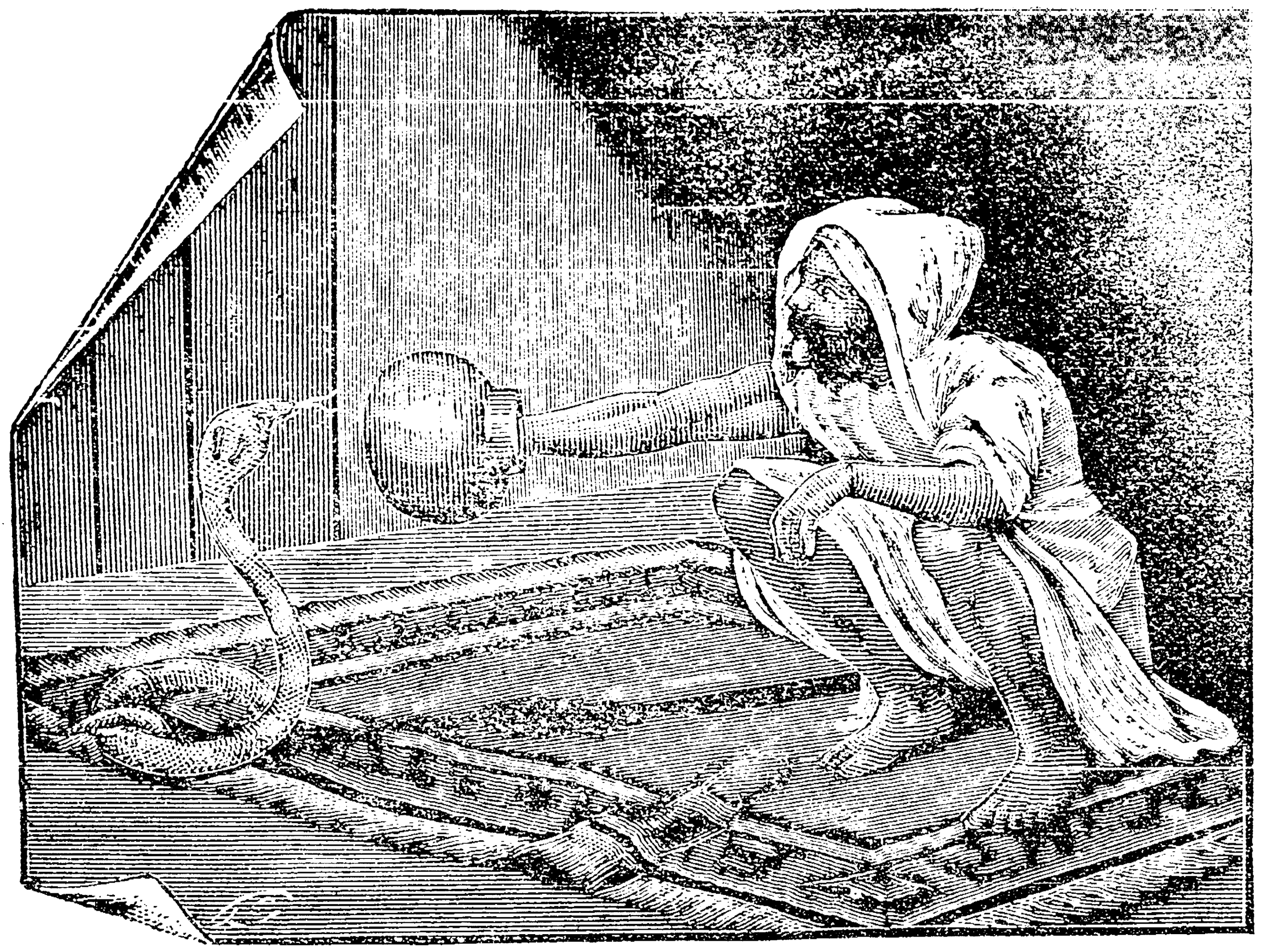

কেন না প্রত্যেক বস্তুরই উপাদানকারণ থাকার নিয়ম আছে। * এইরূপ বিচার করিতে করিতে তিনি জড় ও চেতন (প্রকৃতি ও পুরুষ) এই দুই মূল পদার্থ স্বীকার করিলেন। প্রকৃতি জড়ময়ী ও আদিম কারণ। প্রকৃতির পরিণাম (বিকার) হইতে বিশ্বব্যাপার উৎপন্ন হইতেছে। এই প্রকৃতির অন্তরালে যে দুর্জ্ঞেয় কারণ বিদ্যমান আছে তাহা প্রমাণ করিতে পারেন নাই বলিয়া মহর্ষি কপিল সূত্র করিয়াছেন "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।" প্রমাণ নাই বলিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব অসিদ্ধ।

কপিল স্থির করিলেন বিশ্বব্যাপার প্রকৃতির পরিণাম ভিন্ন আর কিছুই নহে। তৎপরে

একবার অসাবধান পাইয়া সাপটা একেবারে তাহার হাতের কব্‌জিতে দংশন করিল। হতভাগ্য লোকটা তাহার পর এক ঘণ্টার মধ্যে ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

(১৮৯৯, ফেব্রুয়ারি মাসের *Wide World* পত্রিকা হইতে গৃহীত।)

—০—

প্রাচীন ভারতে অনুসন্ধিৎসা।

সাঙ্খ্য ও বৈশেষিক দর্শনে, চরক ও সুশ্রুত প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে যে সকল তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে, তাহা পাঠে জানা যায় প্রাচীন ভারতে অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল। প্রমাণ ভিন্ন কিছুতেই পার্য্যমাণে বিশ্বাস করা হইত না। হিন্দুজাতি চিরদিন ঈশ্বরপরায়ণ। কিন্তু হিন্দুদিগের প্রধান দার্শনিক কপিল ঋষি ঈশ্বরেরও অস্তিত্বের প্রমাণ চাহিয়াছিলেন। তিনি এতদুর প্রমাণপ্রিয় ছিলেন যে, ঈশ্বরের অস্তিত্বপ্রমাণ করিতে পারেন নাই বলিয়া "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এইরূপ সূত্র লিখিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। আত্মা আছে, কেননা আত্মা নাই ইহা কেহ প্রমাণ করিতে পারেন না। * পূর্ব্বে কোন বস্তু না থাকিলে কোন বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে না। †

* অস্তিহ্যাত্মা নাস্তিত্ব সাধনাভাবাৎ।
† নাবস্তুনো বস্তু সিদ্ধিঃ। সাঙ্খ্য প্রবচন। ১।৭৮ সূত্র।

কণাদমুনি পরমাণুবাদ প্রবর্ত্তিত করিলেন। তিনি বলিলেন "পরমাণু সৎস্বরূপ নিত্য পদার্থ, তাহার আর কারণ নাই।" † বাৎসায়ন তৎকৃত ভাষ্যে লিখিয়াছেন যাহা হইতে অল্পতর আর কিছু নাই তাহাই পরমাণু। ‡ এইরূপে পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা জড়জগতের আলোচনা হইয়াছিল এবং অনুসন্ধিৎসা চলিয়াছিল।

ধন্বন্তরির শিষ্য মহামতি সুশ্রুত তদীয় নামে যে গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন তাহাতে শোধিত শবের ভিতর তন্ন তন্ন করিয়া অস্থি, শিরা, ধমনী প্রভৃতি দেখিবার উপদেশ আছে; মূঢ়গর্ভ ও মূলগর্ভের চিকিৎসা প্রকরণে এবং শারীর স্থানে ধাত্রীবিদ্যা ও অস্ত্রচিকিৎসা (সার্জ্জারী) আলোচিত হইয়াছে। যে যে রোগগুলি অস্ত্রসাধ্য এবং যে যে রোগে যন্ত্র প্রয়োগ প্রয়োজনীয় সুশ্রুতের নিদানে সেই সেই রোগেরই বিবরণ আছে। ফলতঃ প্রত্যক্ষ দর্শন ও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা এই শাস্ত্রের অনেক বিষয় সমর্থিত হইয়াছে। তাহার প্রমাণস্বরূপ কয়েকটা কথা এস্থলে উদ্ধৃত হইল। "আর যদি শল্যহর্ত্তা সেই সকল অঙ্গের নিঃসংশয় জ্ঞান ইচ্ছা করেন, মৃতদেহ শোধন করিয়া সেই সকল অঙ্গ সম্যক্‌রূপে প্রত্যক্ষ করিবেন। প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ও শাস্ত্রদৃষ্ট উভয় হইলে সমাসতঃ অতিশয়

* উপাদান-নিয়মাৎ। ঐ ১।১১৪ „
† সদকারণবন্নিত্যম্। বৈঃ দঃ ৪ অ, ১ আ, ১ সূ।
‡ "যতো নাল্পতরমস্তি স পরমাণুঃ।" ন্যায় সূত্রভাষ্য।

জ্ঞানবিবর্দ্ধক হয়। * মৃত দেহের অঙ্গ প্রত্যক্ষ চাক্ষুষ দর্শন করিলে ও শাস্ত্রার্থে অবগতি থাকিলে আয়ুর্ব্বেদে বিশারদ হওয়া যায়। প্রত্যক্ষ দর্শন ও শাস্ত্র পাঠ দ্বারা সন্দেহ নিরাকৃত করিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবে।" যন্ত্র একশত এক এবং বিংশতি শস্ত্র। †

মহামতি শাক্যসিংহ উপদেশ দিলেন, পর্য্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ এই দুই উপায়ে পরীক্ষা করিয়া যখন দেখিতে পাইবে তোমার জ্ঞাতব্য বিষয় যুক্তিসঙ্গত, তখনই তাহা গ্রহণ করিবে; নতুবা কেবল আপ্তোপদেশের উপর নির্ভর করিবে না। ‡ জ্ঞান ও দয়ার অবতার মহাত্মা শাক্যসিংহের এই সদুপদেশ যদি ভারতবাসিগণ আদর করিতেন ও তদনুসারে চলিতেন, তবে বিজ্ঞান পথে তাঁহারা অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারিতেন। মহাকবি কালিদাস ও বাক্‌পটু বাগ্‌ভট দৃঢ়তার সহিত নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন যে, সাধুরা পরীক্ষা করিয়া যাহা ভাল তাহা গ্রহণ করেন; মূঢ়েরা অন্যের বুদ্ধিতে চলে; ঋষিপ্রণীত হইলেই আদৃত হইবে না; যুক্তিযুক্ত বাক্যই গ্রাহ্য। §

কিন্তু হায় দুঃখের কথা কি বলিব! এই অনুসন্ধিৎসা বৃত্তি ও স্বাধীন চিন্তাশীলতা অবশেষে এক প্রকার লুপ্ত হইল। প্রাচীন ঋষিরা অভ্রান্ত—এই ভ্রমাত্মক মত সর্ব্বত্র প্রচলিত হওয়াতে মানবের চিন্তাশীলতা স্থগিত হইল, বিজ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করিবার পথ রুদ্ধ হইল।

এইরূপে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, সাংখ্য ও বৈশেষিক দর্শনে এবং চরক ও সুশ্রুতাদি বৈদ্যক গ্রন্থে বিজ্ঞানালোচনা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মধ্যযুগে 'ঋষিরা অভ্রান্ত' এই ভ্রমাত্মক মত সমর্থিত হওয়াতে বিজ্ঞানের আলোচনা যথারীতি হইতে পারে নাই। প্রাচীনকালে জ্ঞানরাজ্যের পথপ্রদর্শক মহাত্মারা বলিয়াছেন,—

"যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যৎতু তৃণবৎত্যাজ্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥
বৃহস্পতি বচন।

দ্রব্যাণি নহি নির্দ্দেষ্টুং শক্যং কার্ৎস্নেন নামভিঃ।"
চরক।

সর্ব্বঃ সর্ব্বং ন জানাতি সর্ব্বজ্ঞোনাস্তি কশ্চন।
জ্ঞানস্য পরিনিষ্ঠাস্তি নৈকত্র পুরুষে ক্বচিৎ॥"
মহাভারত।

বালক হইতেও যুক্তিযুক্ত বাক্য গ্রহণ করিবে, কিন্তু অন্যবাক্য (অযৌক্তিক কথা) ব্রহ্মা বলিলেও তাহা তৃণবৎ ত্যাজ্য। সমস্ত দ্রব্যের নাম নির্দ্দেশ অসম্ভব। সকলে সকল বিষয় জানে না; কেহই সর্ব্বজ্ঞ নহেন, একমাত্র পুরুষে সমস্ত জ্ঞান বিদ্যমান নাই।

প্রাচীন আর্য্যগণ কেবল যুক্তিযুক্ত বাক্য গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; ম্লেচ্ছগণের নিকট হইতেও জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা করিতে ও তাঁহাদিগকে ঋষিবৎ মান্য করিতে উপদেশ দিয়াছেন। * মহামতি আর্য্যভট্টের যবন শিষ্য ছিল। তিনি ম্লেচ্ছ শিষ্যগণের শিক্ষার জন্য দশগীতিকা পরিশিষ্ট নামে জ্যামিতিশাস্ত্র লিখিয়াছিলেন †। পাণিনি সূত্রের বার্ত্তিককার যবন শিষ্যের বিষয় অবগত ছিলেন এবং চরকমুনি বাহ্লীক-

* তস্মান্নিঃসংশয়ং জ্ঞানং হর্ত্রা শল্যস্যবাঞ্ছতা।
শোধয়িত্বা মৃতং সম্যগ দ্রষ্টব্যোঽঙ্গবিনিশ্চয়ঃ॥
প্রত্যক্ষতো হি যদ্দৃষ্টং শাস্ত্রদৃষ্টঞ্চ যদ্ভবেৎ।
সমাসতস্তদুভয়ং ভূয়োজ্ঞানবিবর্দ্ধনম্॥
শরীরে চৈব শাস্ত্রে চ দৃষ্টার্থঃ স্যাদ্ বিশারদঃ।
দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং সন্দেহমবাপোহ্যাচরেৎ ক্রিয়াম্॥
সুশ্রুত শারীরস্থান ৫ম অ।

† "যন্ত্রশতমেকোত্তরম্। বিংশতিঃ শস্ত্রাণি॥"
ঐ সূত্রস্থান ৭।৮ অ।

‡ After observation and analysis, when it agrees with reason * * * then accept it. Buddha in Kalam Sutta.

§ "সন্তঃ পরীক্ষ্যাণ্যতরদ্ভজন্তে
মূঢ়ঃ পর প্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ॥"
মালবিকাগ্নি মিত্র।
ঋষি প্রণীতে প্রীতিশ্চেন-মুক্ত্বা চরক সুশ্রুতৌ।
ভেড়াদ্যাঃ কিং ন পঠ্যন্তে তস্মাদ্ গ্রাহ্যং সুভাষিতম্॥
বাগ্‌ভট।

* ম্লেচ্ছা হি যবনাস্তেষু সম্যক্ শাস্ত্রমিদং স্থিতম্।
ঋষিবৎতেঽপি পূজ্যন্তে কিং পুনর্ব্বেদবিদ্দ্বিজঃ॥
গর্গ সংহিতা।

† সংপ্রত্যারব্ধে ম্লেচ্ছান্তেবাসিনা-
মববোধায় গোলমেবানুসরতি।

দেশীয় প্রধান ভিষক্ কঙ্কায়নের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।* কিন্তু মধ্যযুগের বা ভারতের অধঃপাতের দিনে স্মৃতিতে ঘোষিত হইল—"ন বদেৎ যাবনীং ভাষাং প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি।" প্রাণ কণ্ঠগত হইলেও যবনভাষা বলিবে না। মহামতি শঙ্করাচার্য্য, কপিল, কণাদও বৌদ্ধ দর্শন খণ্ডন করিবার জন্য তর্কজাল বিস্তার করিয়া জড়জগতের আলোচনার পথপ্রদর্শক দর্শনগুলির প্রতি দোষারোপ ও তীব্র মন্তব্য করিলেন; এমন কি কণাদকে অর্দ্ধ বৈনাশিক নাম দিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না এবং স্বাধীন চিন্তাশীল বৌদ্ধগণকে বৈনাশিক নামে অভিহিত করিয়া জগতের নিকট তাঁহাদিগকে ঘৃণিত করিতে প্রয়াস পাইলেন।† তিনি বলিলেন, "সুগত পরস্পর বিরুদ্ধ বাহ্য বস্তুবাদ, বিজ্ঞানবাদ ও সর্ব্বশূণ্যবাদ উপদেশ করিয়া আপনার অসম্বদ্ধ প্রলাপিতা ব্যক্ত করিয়াছেন, অথবা তিনি প্রজা (লোক) বিদ্বেষী ছিলেন। প্রজাগণ বিরুদ্ধার্থ গ্রহণে বিমুগ্ধ হউক, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল‡।"

কণাদ পরমাণুবাদ প্রবর্ত্তিত করিয়া জড়জগতের আলোচনায় ও অনুসন্ধানে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু শঙ্কর বলিলেন, "শ্রুতিবিরুদ্ধ ও অসার তর্ককলুষিত বলিয়া শ্রুতিপ্রবণ শিষ্ট মনু প্রভৃতি ঋষি পরমাণুবাদ গ্রহণ করেন নাই।" তাঁহার ন্যায় মহামতি ব্যক্তির কথানুসারে তৎপরবর্ত্তী পণ্ডিতেরা জড়জগতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত মনে করেন নাই। এইরূপে ভারতের স্বাধীন চিন্তাশীলতা লুপ্ত হওয়াতে ভারতবাসিগণ দিন দিন হীন হইতে লাগিলেন; পৌরাণিকগণ কল্পনার রাজ্য বিস্তার করিয়া বাস্তব পদার্থের আলোচনা হইতে লোকদিগকে বিমুখ করিলেন। ভারত হইতে বিজ্ঞান চর্চ্চা দূরীভূত হইল।

ধন্বন্তরিপ্রোক্ত অস্ত্রচিকিৎসা কালক্রমে লুপ্ত হইল। অস্ত্র, ক্ষার ও অগ্নিকর্ম্ম প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া কিরূপে সহজ উপায়ে চিকিৎসা হইতে পারে তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া কোন কোন চিকিৎসক কল্পনারাজ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন*। এমন কি কেহ কেহ অস্ত্র চিকিৎসাকে আসুরী চিকিৎসা বলিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না।† প্রাচীনকালে কেবল বৈদ্যজাতিতে চিকিৎসা বিদ্যা আবদ্ধ ছিল না, সকল জাতি আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতে পারিতেন; এমন কি শূদ্রজাতিকে সুশ্রুতও ঐ বিদ্যা অধ্যয়ন করাইবার জন্য অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন।‡ যখন শূদ্রের আয়ুর্ব্বেদ পাঠ অধিকার ছিল, তখন শূদ্রপক্ক ঔষধও লোকে সেবন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। কিন্তু আধুনিক আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে দেখিতে পাই অন্য জাতি কর্ত্তৃক পক্ব ঔষধ সর্ব্ব জাতির অস্পৃশ্য; অতএব কেবল বৈদ্য জাতিকেই ঔষধ পাকে নিযুক্ত করিবে। মোহবশতঃ দ্বিজাদি বর্ণ কর্ত্তৃক পাচিত ঔষধ সেবন করিলে শূদ্রকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে এবং ব্রাহ্মণকে জাতিহীন হইতে হয়।§ যাহা সার্ব্বজনীন ছিল তাহা এইরূপে সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ হওয়ায় অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি এই দুর্ভাগ্য ভারতে বহুদিন হইল লুপ্ত হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস।

হিন্দুজাতির ইতিহাসে অযোধ্যা চিরকাল অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। দিলীপ ও রঘু, দশরথ ও

---

* "যবনানী যবন লিপ্যাম্।"
কাত্যায়ন।
কাত্যায়নশ্চ বাহ্লীকো বাহ্লীকভিষজাংবরঃ॥
চরক সূত্রস্থান।

† "বৈশেষিকের সিদ্ধান্ত কুযুক্তিমূলক, বেদবিরুদ্ধ ও শিষ্টগণের অগ্রাহ্য বলিয়া পরিত্যাজ্য। বৈশেষিকগণ অর্দ্ধবৈনাশিক। বৌদ্ধও বৈনাশিক। যখন অর্দ্ধ বৈনাশিকের মত অগ্রাহ্য, তখন সর্ব্ব বৈনাশিকের মতও অগ্রাহ্য, তাহা বলা বাহুল্য। শ্রেয়ঃকামী পুরুষের পক্ষে বৌদ্ধমত সর্ব্ব প্রকারে অগ্রাহ্য।" বেদান্ত দর্শন ২।২।২৬।৩২।

‡ অপিচ বাহ্যার্থবিজ্ঞানশূন্যবাদত্রয়মুপদিশতা
সুগতেন স্পষ্টীকৃতমাত্মনোঽসম্বদ্ধ প্রলাপিত্বং,
প্রদ্বেষো বা প্রজাসু বিরুদ্ধার্থ প্রতিপত্ত্যা বিমূহেয়ু
রিমা প্রজা ইতি। বেদান্ত দর্শন ২।২।৩২ সূত্রভাষ্য।

* সুখোপায়েন হে নাথ শস্ত্রক্ষারাগ্নিভির্বিনা।
দুর্ব্বলানাঞ্চভীরূণাং চিকিৎসাং বক্তুমর্হসি॥
রসেন্দ্র চিন্তামণি ৫৪ পৃঃ।

† আসুরী মানুষী দৈবী চিকিৎসা ত্রিবিধা মতা।
ভৈষজ্য রত্নাবলী।

‡ শূদ্রমপি কুলগুণ সম্পন্নং * * *
অধ্যাপয়েদিতোকে। শুশ্রুত, শূদ্রস্থান ২য় অ।

§ অন্য জাতিকৃতঃ পাকোহ্যস্পৃশ্যঃ সর্ব্বজাতিভিঃ।
ইতি বিজ্ঞায় মতিমান্ বৈদ্যং পাকে নিয়োজয়েৎ॥
মোহাদ্ দ্বিজাতি বর্ণাদ্যৈঃ পাচিতে খাদিতে সতি।
প্রায়শ্চিত্তীভবেচ্ছূদ্রোজাতিহীনো ভবেদ্দ্বিজঃ॥
ভৈষজ্য রত্নাবলী।

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

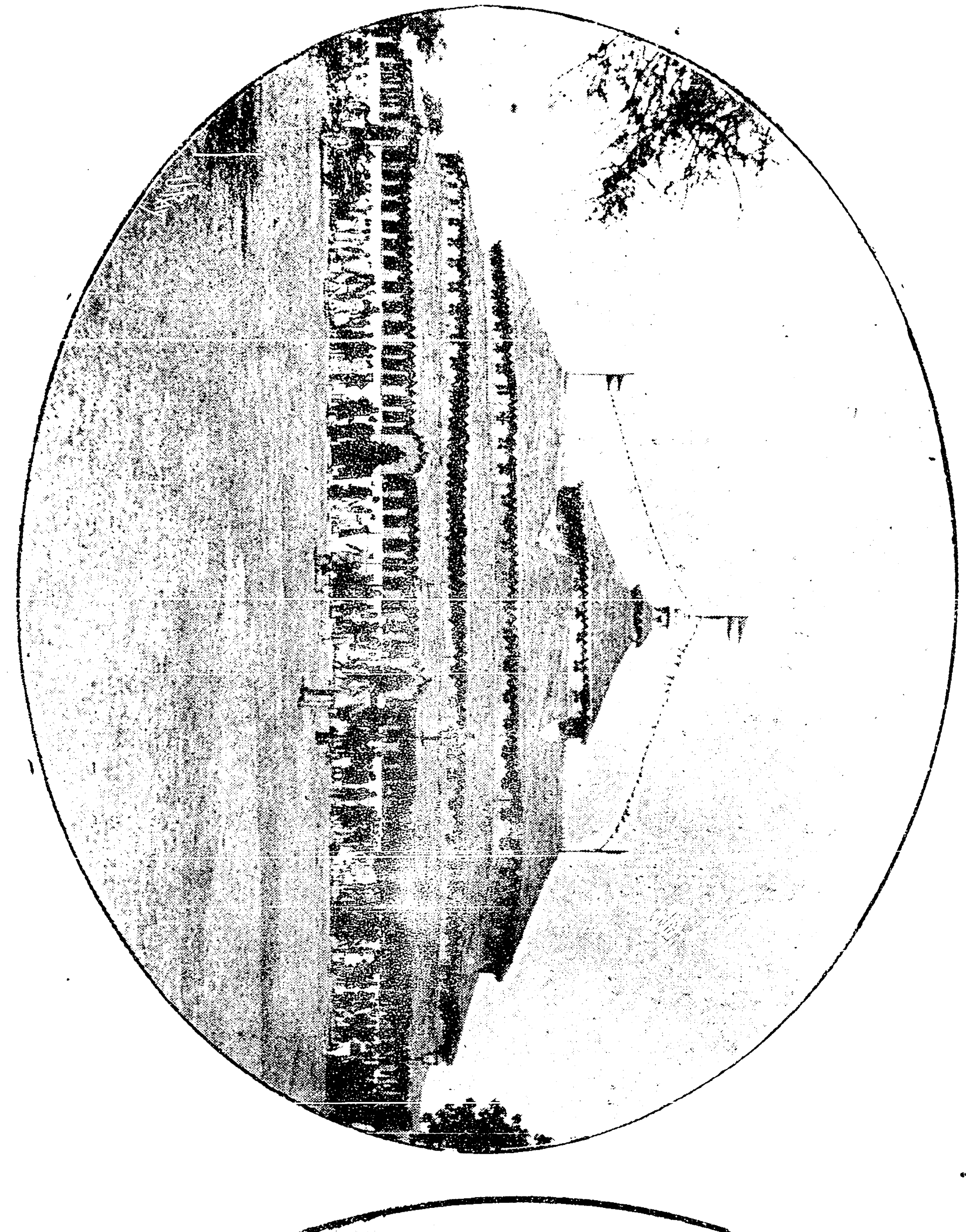

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস মণ্ডপ।

শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ বর্ম্মা।

কিন্তু কলিকাতা ও হাবড়া সমস্ত বঙ্গদেশ নয়। অনেক বক্তা অনেকবার বলিয়াছেন, বাঙ্গালীর উৎসাহ খড়ের আগুনের মত।' কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়। ১৫ বৎসরের রাজনৈতিক আন্দোলনে যথেষ্ট ফল লাভ হয় নাই বলিয়া নিরস্ত হওয়া উচিত নয়। একটা জাতির জীবনে ১৫ বৎসর অতি অল্প সময়। আর ফল যে কিছুই হয় নাই তাহাও ত নয়। ইংরাজ স্বাধীন জাতি; তথাপি রাজনৈতিক অধিকার লাভ ও সংস্কার সাধনার্থ ইংরাজকে কত বৎসর করিয়া কত পরিশ্রম, কত অর্থব্যয়, কত রক্তপাত করিতে হইয়াছে; আমাদের রক্তপাতের প্রয়োজন নাই। কিন্তু সময় ও অর্থব্যয়ে কৃপণতা করিলে চলিবে কেন? ১৫ বৎসর আমরা যদি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ক্রমাগত আন্দোলন করিতাম, তাহা হইলেও বা আমাদের নিরাশ হইবার বা দুঃখ করিবার, কিছু দাবী থাকিত। কিন্তু আমাদের কংগ্রেসের জাগ্রত অবস্থা বৎসরে ৩।৪ দিন মাত্র। তাহার উপর আমরা একটি দুটি নয়, প্রতি বৎসর ১৫।২০টি বিষয়ে আমাদের দুঃখ অভিযোগ রাজদ্বারে উপস্থিত করি। এই সমুদয় বিষয় মনে রাখিয়া বিচার করিলে আমাদের নিরাশ হইবার কারণ নাই। স্বাধীন ইংরাজকে কিরূপ আন্দোলন করিতে হয়, তাহার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে, ইংলণ্ডে বিদেশ হইতে যে সমুদয় শস্য আমদানী হইত, তাহার উপর ট্যাক্স দিতে হইত। তাহাতে রুটি প্রভৃতি দুর্মূল্য হওয়ায় জনসাধারণের অসুবিধা হইত। এই অসুবিধা নিবারণার্থ ট্যাক্স যাহাতে উঠিয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে মাঞ্চেষ্টর সহরে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে একটি সভা স্থাপিত হয়। ৮ বৎসর অবিরাম আন্দোলনের পর এই ট্যাক্স উঠিয়া যায়। এই আন্দোলনে বহুলক্ষ টাকা খরচ হয়। সুতরাং বহুসংখ্যক বিষয়ে ১৫ বৎসর ধরিয়া বৎসরের মধ্যে কয়েক দিনব্যাপী আন্দোলন করিয়া যদি পরাধীন আমরা বিন্দুমাত্রও ফললাভ না করিতাম, তাহা হইলেও নিরাশ হইবার কথা ছিল না।—এবার মান্দ্রাজ হইতেও অতি অল্পসংখ্যক প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। মধ্যপ্রদেশ হইতে কেহই আসেন নাই। কারণ বোধ হয় এই যে লক্ষ্ণৌ হইতে মান্দ্রাজ অনেক দুর এবং মধ্যপ্রদেশে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ চলিতেছে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত ভূতপূর্ব্ব কোন কংগ্রেসের সভাপতিই এবার উপস্থিত ছিলেন না। শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয় গুরুতর পীড়াক্রান্ত থাকায় যাইতে পারেন নাই বলিয়া টেলিগ্রাফ্ করিয়াছিলেন। অপর কাহারও কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। আমাদের নেতাদের এরূপ ঔদাসীন্য পরিতাপের বিষয়। যাত্রার দলের অধিকারী হইবার সময় উপস্থিত, অন্য সময়ে নয়, এরূপ নেতার সংখ্যাবৃদ্ধি সুলক্ষণ নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যাঁহারা প্লেগাক্রান্ত স্থান হইতে কংগ্রেসে গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সহর হইতে দুরে গোমতীর পরপারে পুরানিয়া নামক গ্রামের নিকটে মাঠের মধ্যে তাঁবুতে বাস করিতে হইয়াছিল। বন্দীর মত তাঁহাদের উপর পুলিশ পাহারা ছিল। বিনাঅনুমতিতে তাঁহাদের সহরে যাইবার যো ছিল না। আমরা পুরানিয়া গিয়াছিলাম। পশ্চিমে মাছির বড় উপদ্রব। কিন্তু পুরানিয়ার তাঁবুতে যেরূপ মাছির আধিক্য দেখিয়াছিলাম, এমন আর কোথাও দেখি নাই। মশার উৎপাতও কম নয়। তাহার উপর শীত। এই সকল প্রতিকূল অবস্থা-সত্ত্বেও যাঁহারা স্বদেশ বাৎসল্য বশতঃ প্লেগাক্রান্ত স্থান সমূহ হইতে কংগ্রেসে যোগ দিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা ধন্য। কিয়ৎ পরিমাণে প্লেগের জন্য এবং কিয়ৎ পরিমাণে উপযুক্ত স্থানাভাবে ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশের প্রতিনিধিগণের একস্থানে বাসের বন্দোবস্ত হইয়া উঠে নাই। সকল প্রদেশের প্রতিনিধিগণ একত্র বাস করিলে, পরস্পরের সহিত আলাপ পরিচয় ও সংস্পর্শ বশতঃ যে ঘনিষ্টতা জন্মে, যে প্রকার জাতীয় ঐক্য সংসাধিত হয়, এবং অপরবিধ সামাজিক সুবিধা ঘটে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোক ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিলে তাহা হয় না।

কংগ্রেস্ মণ্ডপে প্রবেশ করিলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশের লোকের ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছদের উপর দৃষ্টি পড়ে। মহারাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিগণ সকলেই জাতীয় পরিচ্ছদ পরিয়া গিয়াছিলেন। অপর প্রদেশবাসীদিগের মধ্যে এরূপ ঐক্য দৃষ্ট হয় নাই। কয়েকজন বাঙ্গালী প্রতিনিধি ধুতি পরিয়া গিয়াছিলেন।

২৭ শে ডিসেম্বর ২ টার সময় কংগ্রেসের প্রথম

অধিবেশন আরম্ভ হয়। প্রথমে অভ্যর্থনা কমিটির সভা-

শ্রীযুক্ত মুন্সী বংশীলাল সিংহ।

পতি মুন্সী বংশীলাল সিংহ সংক্ষেপে সকলের অভ্যর্থনা করেন। শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ তিনি নিজের রচিত বক্তৃতা নিজে পড়িতে পারেন নাই। এ অঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার পণ্ডিত বিষণ নারায়ণ দর্ উহা পাঠ করেন। মুন্সী বংশীলাল লক্ষ্ণৌয়ের একজন বিখ্যাত উকীল, তাঁহার কিছু জমীদারীও আছে। আমরা শুনিয়াছি, তাঁহার প্রজাগণকে ঋণের জন্য মহাজনের আশ্রয় লইতে হয় না। তিনিই তাহাদের রাজা, মহাজন, পিতামাতার মত। তাঁহার বক্তৃতা হইতে আমরা জানিতে পারি যে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস জনসাধারণের কংগ্রেস, ধনী শ্রেনী ইহাতে যোগ দেন নাই। পণ্ডিত বিষণ নারায়ণ দর্ এ অঞ্চলে সুবক্তা এবং সুলেখক বলিয়া পরিচিত। এ প্রদেশে তাঁহার মত চিন্তাশীল ইংরাজীলেখক আর কেহ আছেন বলিয়া আমরা জানি না। তিনি বংশীলাল সিংহের বক্তৃতা পাঠ কালে নিজ হৃদয়ের সমুদয় ভাবস্রোত উহাতে ঢালিয়া দিয়াছিলেন। এই বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তাঁহার দীর্ঘ, পুরুষোচিত আকৃতি মুখের সৌম্য ও প্রফুল্ল ভাব তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার পূর্ব্বেই দর্শকগণের মনে তাঁহার প্রতি অনুকূলভাবের উদ্রেক করিয়াছিল। তিনি বাগ্মী নহেন। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা বেশ সারগর্ভ হইয়াছিল। উহাতে বাগ্মীর উত্তেজনা ছিল না, কিন্তু উহা চিন্তাশীলের চিন্তা, জানপদ বর্গের বন্ধুর সার্ব্বজনীন সহানুভূতি, এবং প্রকৃত রাষ্ট্রনীতিজ্ঞের মিতভাষা মিতভাবে পূর্ণ ছিল। বক্তৃতাটি আশার সুরে বাঁধা ছিল; ইহাই উহার বিশেষত্ব।

এবারকার বক্তৃতাগুলির মধ্যে বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু কালীচরণ বন্দোপাধ্যায়, বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার, কুমারী গার্ল্যাণ্ড, মিঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ, মিঃ ওয়াচা, লালা রামপ্রসাদ বর্ম্মা, মিঃ মুধোলকর, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, প্রভৃতির বক্তৃতা বেশ হইয়াছিল। কিন্তু গত মান্দ্রাজ কংগ্রেসে শ্রীযুক্ত আনন্দ মোহন বসু মহাশয়ের বক্তৃতার মত বক্তৃতা একটীও হয় নাই। কংগ্রেসের অনেক বক্তৃতার প্রধান দোষ এই যে উহা বাক্যাড়ম্বরে পূর্ণ। একটি বিষয়ে অনেক দিন চিন্তা করিলে, বহু অধ্যয়ন করিলে বক্তৃতা যেরূপ হয়, কংগ্রেসে সেরূপ বক্তৃতা বেশী শুনা যায় না। তাহার কারণ বক্তা নির্ব্বাচন অধিবেশনের অতি অল্প সময় থাকিতে করা হয়। এবার সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য ৪৫ জন সভ্য লইয়া একটি কংগ্রেস কমিটি গঠিত হইয়াছে। উহার একজন অবৈতনিক সম্পাদক ও একজন বেতন ভোগী সহকারী সম্পাদক থাকিবেন। তাঁহার আফিসের জন্য ৫,০০০ টাকা খরচ হইবে। এই কমিটি সম্বৎসর কংগ্রেসের কাজ করিবেন এবং সময় থাকিতে কংগ্রেসের আলোচ্য বিষয় এবং বক্তা নির্ব্বাচন করিবেন। এই কমিটি যদি নিজ কর্ত্তব্য সাধনে অবহেলা না করেন, তাহা হইলে আগামী বার হইতে ভাল বক্তৃতা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হইবে। প্রাদেশিক কমিটি সমূহ প্রচারক রাখিয়া, পুস্তকাদি ছাপাইয়া এবং অন্যান্য উপায়ে, সম্বৎসর জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষা সাধন করিবেন। সভ্যসমাজে থাকিতেই হইলে মানুষকে

কি কি কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়, আশা করি প্রাদেশিক কমিটি সকল জন-সাধারণকে তদ্বিষয়ে উপদেশ দিবার বন্দোবস্তও করিবেন। লী ওয়ার্ণার সাহেবের রচিত (Lee Worner) বিদ্যালয় পাঠ্য the citizen of India নামক যে এক খানি পুস্তক আছে, আমাদের বিবেচনায় তদ্রূপ একখানি পুস্তক ভারতীয় ভাষা সমূহে রচিত ও প্রচারিত হইলে প্রভূত উপকার হয়। আমরা যেমন রাজনৈতিক অধিকার চাই, তেমনি সভ্যসামাজিকের কর্ত্তব্যগুলিও পালন করা আমাদের উচিত।

প্রসঙ্গক্রমে এবারকার কংগ্রেসের কতকগুলি বিশেষত্বের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। আরও কয়েকটি বিশেষত্বের কথা উল্লিখিত হইতেছে। এবার অভর্থনা কমিটি প্রতিনিধিগণের নিকট বাসাহারের জন্য টাকা লন নাই। অথচ এবিষয়ে তাঁহাদের বন্দোবস্ত ভালই হইয়াছিল। কংগ্রেসের ব্যয় মোটামুটি বিষ হাজার হইবে। এরূপ সুন্দর ও এরূপ বৃহৎ মণ্ডপ, সকল বিষয়ে এরূপ সুন্দর বন্দোবস্তসত্বেওএতঅল্প টাকায় সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ বিশেষ মিতব্যয়িতার পরিচায়ক। কংগ্রেসের কোন অধিবেশনই বোধ হয় এত অল্পব্যয়ে সম্পন্ন হয় নাই। ইহার যথেষ্ট কারণও ছিল। এবারকার কার্য্যকারিগণ বেতনভোগী লোকের উপর অধিক নির্ভর করেন নাই। যথাসম্ভব নিজেরাই সমুদয় কাজ করিয়াছিলেন। মণ্ডপ নির্ম্মাণ, চেয়ার প্রভৃতি আস্‌বাব্‌ সরবরাহ, বক্তৃতা রিপোর্ট করা প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য দেশায় লোকের দ্বারাই হইয়াছিল। এইরূপই হওয়া উচিত। এবারকার আর একটি বিশেষত্ব দেশীয় ভাষায় বক্তৃতার প্রাচুর্য্য। সভাপতি নিজে যে কয়টি প্রস্তাব সভার সমক্ষে উপস্থিতি করেন, তদ্ভিন্ন আর সকলগুলির উপরই উর্দ্দু বা হিন্দীতে বক্তৃতা হইয়াছিল। ইহাতে ইংরাজীভাষানভিজ্ঞ লোকেও কংগ্রেসের কার্য্য ও উপকারিতা বুঝিতে পারে, সুতরাং কংগ্রেসের প্রতি তাহাদের সহানুভূতি জন্মে। আমরা আশা করি অতঃপর যে যে প্রদেশে অধিবেশন হইবে, তত্তৎস্থানের ভাষায় এইরূপ বক্তৃতা হইবে।

একারকার কংগ্রেসের সুবন্দোবস্ত ও সাফল্যের জন্য যদি কোন একজন লোক প্রশংসাভাজন হইয়া থাকেন, তবে তাহা অভ্যর্থনা কমিটীর অন্যতম সম্পাদক মুন্সী গঙ্গাপ্রসাদ বর্ম্মা। ইনি উত্তর পশ্চিম প্রদেশেও অযোধ্যার ভারতবাসী কর্ত্তৃক পরিচালিত প্রধান ইংরাজী সংবাদপত্র এড্‌ভোকেটের সত্ত্বাধিকারী ও সম্পাদক। পূর্ব্বে যে ধাতু দ্রব্য ঢালাইয়ের কারখানার উল্লেখ করা হইয়াছে, ইনি তাহার একজন প্রধান উদ্যোক্তা। ইনি সম্প্রতি সাধারণের হিতার্থ একটি লাইব্রেরী ও পাঠাগার স্থাপন করিয়াছেন। উহার দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে যে সভা হয়, তাহাতে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সভাপতির কার্য্য করেন। গঙ্গাপ্রসাদ বর্ম্মার চেহারা পুরুষকার ব্যঞ্জক। তিনি বাস্তবিকই অযোধ্যাপ্রদেশের একজন "পুরুষ-বাচ্চা"। সকল সৎকার্য্যেই তাঁহার সহানুভূতি আছে। ইতি। ২২শে পৌষ, ১৩০৬।

দিন বিভাগ।

কোন বিচিত্র কারণে কটকে সরকারি ঘড়িতে মান্দ্রাজের সময় দেখান হইতেছে। কটক ও মান্দ্রাজের কালান্তর অল্প নহে, ২৩ মিনিট। অনেকেই কটকী ওজন জানেন, ১০৫ তোলায় সের। এখন অবধি কটকী সময় গণিতে হইবে। সরকারি ঘড়িকে মান্দ্রাজী করিতে দেখিয়া অপর সাধারণে গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় নিজের নিজের ঘড়িকে মান্দ্রাজী করিতে বসিয়াছে। বিচিত্র বটে। যাঁহারা বিলম্বে শয্যা ত্যাগ করিতে, বিলম্বে আহার করিতে, বিলম্বে কর্ম্মস্থানে যাইতে ভাল বাসেন, মান্দ্রাজী ঘড়ি দ্বারা তাঁহাদের সুবিধা হইয়াছে। আর একটি সুবিধা হইয়াছে। রেলে যাইবার সময় কটকের ঘড়িকে মান্দ্রাজী করিতে হয় না। পূর্ব্ব হইতেই ঘড়ি মান্দ্রাজী হইয়াছে।

পূর্ব্বপশ্চিমে অবস্থিত দুইটি দূরবর্ত্তী স্থানের ঘড়িকে এক করিলে অসুবিধাই অধিক, সুবিধা নাই বলিলেই চলে। মান্দ্রাজে ও কটকে ভূমিকম্প হইলে, গ্রহণ হইলে ঘটনার কালান্তর গণনা করিতে হইবে না। এই প্রকার নৈসর্গিক ঘটনার কাল নিরূপণ সম্বন্ধে সুবিধা হইবে, অর্থাৎ সামান্য গণনা-শ্রম লাঘব হইবে। এতদ্ভিন্ন কোন সুবিধা নাই। বিষয়টি বিচার যোগ্য। বিচারের পূর্ব্বে এ দেশের দিনগণনা ও দিনবিভাগ সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ৯ প্রকারে কালবিভাগ করিতেন। সূর্য্যসিদ্ধান্তে,——

ব্রাহ্মং দিব্যং তথা পিত্র্যং প্রাজাপত্যং গুরোস্তথা।
সৌরং চ সাবনং চান্দ্রং আর্ক্ষং মানানি বৈ নব॥

এই নয় প্রকার কালগণনার মধ্যে আমরা সৌর, চান্দ্র, আর্ক্ষ বা নাক্ষত্র ও সাবন কাল নিত্য গণনা করিয়া থাকি। অন্য পাঁচটি পুরাতন স্মৃতিতে দেখা যায়। বিলাতি ঘড়ি আসিবার পর আমরা মধ্যম সাবন কাল গণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। ইহাদের উপর আবার মান্দ্রাজি কাল!

বেদের সময়ে ত্রিবিধ কাল গণিত হইত, সাবন, চান্দ্র, সৌর। ক্রমশঃ নববিধ গণনা প্রচলিত হইয়াছিল। ব্রাহ্ম্য দিনের নাম কল্প। ইহার পরিমাণ এক সহস্র মহাযুগ বা চারিশত বত্রিশ কোটি সৌর বৎসর। দিন যত বড়, ব্রহ্মার রাত্রিও তত বড়। বর্ত্তমান দিনের নাম শ্বেতবরাহকল্প।

প্রাজাপত্য বা মনুর কাল ৭১ যুগে পূর্ণ হয়। ইহাও কম নহে; ৩০ কোটি ৬৭ লক্ষ ২০ হাজার সৌরবর্ষ। মন্বন্তরের দিনরাত্রি বিভাগ নাই।

দিব্য অহোরাত্র আমাদের ১ বর্ষ। রবির উত্তরায়ণ কাল দিব্য দিন, দক্ষিণায়ন কাল দিব্যরাত্রি। ৬ সৌর মাসে দিব্য দিন। দিব্য রাত্রির পরিমাণও তত।

বার্হস্পত্য কালগণনায় বৃহস্পতি বা গুরুর এক রাশিভ্রমণকাল গুরুর ১ বৎসর। উহার পরিমান এক সৌরবর্ষ। পাঁচবার রাশিচক্র ভ্রমণ কালে বৃহস্পতির ৬০ বৎসর। বার্হস্পত্য গণনায় মাস ও দিন নাই।

১ চান্দ্রমাসে পিত্র্য অহোরাত্র। কৃষ্ণপক্ষে পিতৃগণের দিন, শুক্লপক্ষে তাঁহাদের রাত্রি।

সাবন, চান্দ্র, নাক্ষত্র, ও সৌরমানে দিন, মাস, বৎসর গণিত হইয়া থাকে। এই চারিটি আমাদের নিত্য ব্যবহারে আসে। সাবনমানে অশৌচ শুদ্ধি, বারগণনা, চলিত মাস গণনা হইয়া থাকে। চান্দ্রমানে বিবাহ, ব্রত, উপবাস, যাত্রাদি ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। নাক্ষত্রমান জ্যোতিষে লাগে। নক্ষত্র নামে বৈশাখাদি চান্দ্র ও সৌর মাসের নাম হইয়াছে। সৌরমানে দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি, বিষুব, অয়ন, সংক্রান্তি, মাস, ঋতু, বৎসর গণিত হইয়া থাকে।

ঋগ্বেদের সময় হইতে সাবনমান গণিত হইতেছে। এক অহোরাত্রে সোমযাগের তিনবার সবন হইত। ইহা হইতে সাবনদিবস অহোরাত্র বাচক হইয়া পড়ে। অর্থাৎ এক সূর্য্যোদয় হইতে অপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত কাল এক সাবন দিবস। অহোরাত্র বুঝাইতে বেদে অহন্ শব্দের প্রয়োগ আছে। পূর্ব্বকালে রবি সোম বারাদি গণনা ছিল না। এমন কি, মহাভারতের সময়েও ছিল না। * বেদের সময়ে ১ অহ, ২ অহ, ৩ অহ, ক্রমে ৬ অহে ১ ষড়হ, ৫ ষড়হে ১ মাস গণিত হইত। এইরূপে ৩০ সাবন দিনে ১ সাবন মাস, ১২ সাবন মাসে ১ সাবন বৎসর হইত। তৎকালে ৩৬০ দিনে বৎসর গণিত হইত। তাহা হইতেই চক্র বা বৃত্তকে ৩৬০ অংশে বিভক্ত করিবার রীতি চলিত হইয়াছে।

* বলা আবশ্যক বর্ত্তমান মহাভারত খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীর পূর্ব্বের নহে।

সাবন দিবসবিভাগ অনেক প্রকার আছে। দুই ভাগ করিলে পূর্ব্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণ; পরিমাণ ১৫ দণ্ড। তিন ভাগ করিলে পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ণ, অপরাহ্ণ; পরিমাণ ১০ দণ্ড। চারিভাগ করিলে পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ণ, অপরাহ্ণ, সায়াহ্ণ; পরিমাণ ৭॥০ দণ্ড বা প্রহর। পাঁচ ভাগ করিলে প্রাতঃ, সঙ্গব, মধ্যাহ্ণ, অপরাহ্ণ, সায়ং; পরিমাণ ৬ দণ্ড। বার ভাগ করিলে হোরা বা ঘণ্টা; পরিমাণ ২॥০ দণ্ড। পনর ভাগ করিলে মুহূর্ত্ত; পরিমাণ ২ দণ্ড। ত্রিশ ভাগ করিলে দণ্ড বা ঘটি; পরিমাণ ২৪ মিনিট।

সমুদায় অহোরাত্রের পরিমাণ সমান নহে। উহাদের হ্রাসবৃদ্ধি আছে। কাজেই অহোরাত্রের সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা মিনিটও ছোট বড় করিতে হয়। আজ (১৬ সেপ্টেম্বর) অপেক্ষা ২৩ ডিসেম্বর ৫১ সেকেণ্ড বড়। এরূপ ছোট বড় সময় গণনা বিজ্ঞান সম্মত নহে। য়ুরোপে প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হ্রাসবৃদ্ধিশীল সাবন দিবস গণনা চলিত। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে পারিসে এরূপ দিনগণনা পরিত্যক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে ঘড়ি তত সূক্ষ্ম চলিত না। সূক্ষ্ম চলিলেও ছায়াযন্ত্র সূর্য্যঘড়ি অনুসারে ঘড়ির কাঁটা এ দিক্ ও দিক্ সরাইতে হইত। ক্রমশঃ ঘড়ি ঠিক চলিতে লাগিল। তখন মধ্যম সাবন দিবসগণনা চলিত হইল। এ বিষয় পরে বলা যাইতেছে।

চান্দ্রদিনের সামান্য নাম তিথি। চন্দ্র সূর্য্য একত্র হইলে অমাবস্যা শেষ হয়। সূর্য্য অপেক্ষা চন্দ্রের গতি অধিক। অমাবস্যার পর সূর্য্যকে ছাড়িয়া চন্দ্র পূর্ব্বদিকে চলিয়া যায়। যে সময়ে উভয়ের অন্তর ১২ অংশ হয়, তাহার নাম তিথি। এইরূপে তিথিগণনা বহু পূর্ব্বকালে সহজ ছিল না। প্রথমে সহজ বিভাগ, তার পর কাল্পনিক বিভাগ হইয়াছে। বৈদিক সময়ে সহজ বিভাগ ছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে তিথি শব্দের অর্থ আছে। এক চন্দ্রাস্ত হইতে চন্দ্রোদয় পর্য্যন্ত তিথি। * অমাবস্যার পর ১ রাত্রি, ২ রাত্রি, ৩ রাত্রি ইত্যাদি গণিতে গিয়া তিথির ব্যবহার দাঁড়াইয়াছে। যেমন ৩০ সাবন দিবসে ১ সাবন মাস, তেমনই ৩০ চান্দ্রদিনে বা তিথিতে ১ চান্দ্রমাস। অমাবস্যা হইতে অমাবস্যা, বা পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমা চান্দ্রমাস। ঘড়ির সময়ে চান্দ্রমাসে ২৯ দিনে ১২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট। কাজেই কাল্পনিক তিথির পরিমাণ প্রায় ২৩ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট পড়ে। যাহা হউক, ৩০ তিথিতে চান্দ্রমাস, ১২ চান্দ্রমাসে চান্দ্রবৎসর। চান্দ্রবৎসরে ৩৫৪ সাবন দিন।

সৌরবর্ষ অপেক্ষা চান্দ্রবর্ষ প্রায় ১০।১১ দিন কম। উভয়ের সমতা রক্ষা নিমিত্ত অধিমাস কল্পনা হইয়াছে।

সাবন দিন ছোট বড় হয়, চান্দ্রদিনও ছোট বড় হয়। ছোট বড় দিন লইতে বিজ্ঞান সম্মত নয়। নাক্ষত্র দিনের হ্রাসবৃদ্ধি নাই। কোন তারার এক উদয় হইতে অন্য উদয় পর্য্যন্ত নাক্ষত্র দিন। কিংবা যাম্যোত্তর বৃত্তকে দুইবার অতিক্রম করিবার মধ্যবর্ত্তী কাল। ঘড়ির সময়ে উহা ২৩ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট ৪ সেকেণ্ড। নাক্ষত্র দিনের হ্রাস বৃদ্ধি নাই বটে, কিন্তু দৈনিক কাজকর্ম্মে এই গণনায় সুবিধা হয় না। কারণ যাম্যোত্তর বৃত্তে তারাটার আসিবার স্থিরতা নাই। ঋতুভেদে উহা কখন প্রাতে, কখন মধ্যাহ্ণে, কখন মধ্য রাত্রে, সকল সময়েই যাম্যোত্তর বৃত্তে আসিয়া থাকে। আমাদের পক্ষে নাক্ষত্র দিন ব্যবহারোপযোগী না হইলেও জ্যোতির্ব্বিদেরা নাক্ষত্রকাল প্রদর্শনার্থ ঘড়ি রাখিয়া থাকেন। যাহা হউক, ৩০ নাক্ষত্র দিনে এক নাক্ষত্র মাস, ১২ নাক্ষত্র মাসে এক নাক্ষত্র বৎসর। এ সকল কাল্পনিক বিভাগ। নাক্ষত্র বৎসরের ব্যবহার নাই।

ইংরাজিতে যাহাকে সৌর দিন (Solar day) বলে, আমরা তাহাকে কুদিন বা পৃথিবীর দিন বলিয়া থাকি। আমাদের সৌরদিনের অর্থ ইংরাজির মত নহে। যে সময়ে সূর্য্য স্বীয় চক্রাকার পথের ১ অংশ গমন করেন, তাহাকেই আমরা সৌরদিন বলি। কিন্তু সকল সৌরদিন সমান নহে! ২ জুলাই সৌরদিনে ঘড়ির প্রায় ২৫ ঘণ্টা, ১ জানুয়ারি প্রায় ২৩ ঘণ্টা হয়।

এমন সৌরদিন গণনায় সুবিধা হয় না। কিন্তু সৌরমাস চলিত আছে। ৩০ অংশ যাইতে সূর্য্যের যত সময় লাগে, তাহাই সৌরমাস। সূর্য্যের গতি সমান থাকিলে সৌরদিনগুলি ও সৌরমাসগুলি সমান হইত। যাহা হউক, বৈশাখাদি নামগুলির উৎপত্তি বিশাখাদি নক্ষত্র ধরিয়া হইয়াছে। এই সকল নাম সৌরমাসেরও বটে, চান্দ্রমাসেরও বটে। প্রাচীন বৈদিককালে চান্দ্রমাসের অন্য নাম ছিল।

* যাং পর্য্যস্তমিয়াদভ্যুদিয়াদিতি সা তিথিঃ ॥
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ

য়ুরোপের জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি প্রভৃতি সৌর মাস গণনা কাল্পনিক। কোন মাসে ২৮ সাবন দিবস, কোন মাসে ৩১ সাবন দিবস। আমাদের বৈশাখাদি মাস পরিমাণে সমান নয় বটে, তথাপি এই মাসগুলি বৈজ্ঞানিক। সূর্য্যপথকে ১২ ভাগ করিলাম। এক এক ভাগ যাইতে যত দিন, যত দণ্ড পল লাগে, তাহাকেই মাস বলি। এইরূপ, য়ুরোপের ও আমাদের সৌরবর্ষ গণনা এক নহে: আমাদের সৌরবর্ষ নাক্ষত্রিক, য়ুরোপের সাম্পাতিক। সাম্পাতিক বর্ষ অপেক্ষা নাক্ষত্রিক সৌরবর্ষ ২০ মিনিট ২৩ সেকেণ্ড বড়।

তবে, সৌর, সাবন, চান্দ্রদিন সমান থাকে না। নাক্ষত্র দিন সমান থাকে বটে, কিন্তু ব্যবহারযোগ্য নহে। অথচ ঘড়িতে বরাবর সমান সময় দেখিতে চাই। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত মধ্যম সাবন দিবস অথবা মধ্যম কুদিন (Mean solar day) কল্পনা আবশ্যক হইয়াছে। বলা বাহুল্য, সাবন ও মধ্যম সাবন দিবসের মধ্যে দিনবিশেষে ১৫। ১৬ মিনিটের প্রভেদ পড়ে। ১১ ফেব্রুয়ারি সূর্য্য ঘড়ির ১৫ মিনিট আগে আগে যায়। সূর্য্য বলেন ১২টা বাজাও, ঘড়ি বলে ১৫ মিনিট পরে বাজিব। এইরূপ, ২ নবেম্বর ঘড়িতে যখন ১২টা দেখায়, সূর্য্যের তখন ১২ টা হইতে ১৬ মিনিট থাকে। বৎসরে কেবল ৪ দিন উভয়ের গতি সমান হইয়া থাকে। ১৬ এপ্রেল, ১৪ জুন, ১ সেপ্টেম্বর, ২৪ ডিসেম্বর উভয় ঘড়ি সমান যায়।

মধ্যম সাবন দিবসের উৎপত্তি, হ্রাসবৃদ্ধিশীল সাবন দিবস ভাঙ্গিয়া মাঝামাঝি লইয়া হইয়াছে। কাজেই যে ঘড়ির কাঁটা বরাবর ঠিক সমান চলে, সে ঘড়ির ২৪ ঘণ্টায় মধ্যম সাবন দিবস হয়। ইহাতে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে. ঘড়ির চাকাগুলা নিয়ত সমবেগে চলিলে কাঁটা সরাইতে হয় না। কিন্তু একটু অসুবিধাও আছে। ঘড়ির গণনায় পূর্ব্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণ সকল দিন সমান হয় না। কোন কোন দিন পূর্বাহ্ণ অপেক্ষা অপরাহ্ণ প্রায় আধ ঘণ্টা ছোট বড় হয়। দুই একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

আজ ১ আশ্বিন কলিকাতায়

সূর্য্যোদয়	৫ ঘ ৪৮ মি	দিবামান	১২ ঘ ১৪ মি
সূর্য্যাস্ত	৬ ১	পূর্ব্বাহ্ণে	৬ ১২
		অপরাহ্ণে	৬ ২
		অন্তর	১০

১৭ কার্ত্তিক

সূর্য্যোদয়	৬ ঘ ৬ মি	দিবামান	১১ ঘ ১৫ মি
অস্ত	৫ ২১	পূর্ব্বাহ্ণে	৫ ৫৪
		অপরাহ্ণে	৫ ২১
		অন্তর	৩৩ মি

১ ফাল্গুন

সূর্য্যোদয়	৬ ঘ ৩৬ মি	দিবামান	১১ ঘ ১৭ মি
অস্ত	৫ ৫৩	পূর্ব্বাহ্ণে	৫ ২৪
		অপরাহ্ণে	৫ ৫৩
		অন্তর	২৯ মি

মনে করি যেন ঐ ঐ দিন কটকেও উপরিউক্ত সময়ে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত হইবে। তাহা হইলে কটকের মান্দ্রাজী ঘড়িতে,

১৭ কার্ত্তিক

সূর্য্যোদয়	৫ ঘ ৪৩ মি	দিবামান	১১ ঘ ১৫ মি
অস্ত	৪ ৫৮	পূর্ব্বাহ্ণে	৬ ১৭
		অপরাহ্ণে	৫ ৫৮
		অন্তর	১ ঘ ১৯ মি

১ ফাল্গুন

সূর্য্যোদয়	৬ ঘ ১৩ মি	দিবামান	১১ ঘ ১৭ মি
অস্ত	৫ ৩০	পূর্ব্বাহ্ণে	৫. ৪৭
		অপরাহ্ণে	৫ ৩০
		অন্তর	১৭ মি

ইত্যাদি—

সুতরাং কটকে মান্দ্রাজি ঘড়ি রাখিলে সুবিধা কিছুই নাই, বরং অসুবিধাই অধিক। কর্ত্তৃপক্ষেরা এ সকল বিষয় চিন্তা করিয়াছিলেন কিনা, বলিতে পারি না। একেই ত এখানে যে ওড়িয়া পাঁজি চলে, তাহা পুরীর নিমিত্ত গণিত হইয়া থাকে। পুরী ও কটকের সময় এক নহে: সেই প্রভেদের উপর মান্দ্রাজি প্রভেদ আসিয়া পড়িতেছে: কোন দিকেই সুবিধা নাই।

বার বা দিন আরম্ভ সম্বন্ধেও গোলযোগ হইতেছে। সূর্য্যোদয় হইতে দিনপ্রবৃত্তি গণনা ত আছেই, সাবন দিন গণনায় সূর্য্যোদয়ই আদি। সূর্য্যোদয়, মধ্যাহ্ণ, সূর্য্যাস্ত ও মধ্যরাত্রি,—এই চারি সময় হইতেই এদেশে পূর্ব্বকালের জ্যোতিষিগণ দিবারম্ভ গণনা করিতেন। কালক্রমে

আমাদের জ্যোতিষে মধ্যরাত্রি হইতে দিন গণনা চলিত হইয়াছে। ইহাও বহুকালের কথা। ইংরাজি জ্যোতিষে মধ্যাহ্ন হইতে দিন গণনা করা হইয়া থাকে, কিন্তু সাবন দিন গণনায় মধ্য রাত্রি আদি ধরা হইয়া থাকে। কিন্তু পৃথিবীর সকল স্থানে সূর্য্যোদয়, মধ্যাহ্ন, বা মধ্যরাত্রি একই সময়ে হয় না। ইংলণ্ডে গ্রীণবিচ স্থানের মধ্যাহ্ন জ্যোতিষে গণ্য, আমাদের দেশে উজ্জয়িণীর মধ্যরাত্রি জ্যোতিষে গণ্য হইয়া থাকে।

সাবন দিন গণনায় সূর্য্যোদয়ে দিবা আরম্ভ হয়। কিন্তু এখানে মান্দ্রাজি ঘড়ি রাখিলে তাহাতেও বিঘ্ন। ঘড়ি বলিবে, সূর্য্যোদয় হয় নাই; সূর্য্য বলিবেন, আমি ২৩ মিনিট পূর্ব্বে ক্ষিতিজের উপরে উঠিয়াছি। যখন সাবন দিন গণনাতেই বিঘ্ন, তখন এই হিন্দুর দেশে তিথি নক্ষত্র যোগাদির সময় অবধারণে বিশেষ বিঘ্ন। পাঁজি বলিবে, আজ একাদশী বেলা ৯ টা পর্য্যন্ত আছে; ঘড়ি বলিবে ৯ টা ২৩ মিনিট। ঘড়ি দেখিয়া শুভ যোগ বিবাহ দিতে গিয়া অশুভ যোগে বিবাহ হইতে পারিবে। সাধারণ লোকে ঘড়ির মারপেঁচ বুঝিবে না। যখন বুঝিবে তখন বলিবে বিলাতি জিনিসে ম্লেচ্ছাচার হইল। সুতরাং যাহাদিগকে দিবারাত্রির প্রত্যেক ভাগ সূক্ষ্মরূপে জানিতে হয়, তাহাদিগের পক্ষে ঘড়ি দ্বারা স্থানভেদ লোপ করা ভাবনার বিষয়। প্রত্যেক ধর্ম্মকর্ম্মে শুভাশুভ মুহূর্ত্ত নিরূপণে ঘড়ির প্রদর্শিত সময় হইতে ২৩ মিনিট বিয়োগ করা আবশ্যক হইবে। আমার প্রতিপক্ষ বলিতেছেন, "রেলে যাইবার সময় ২৩ মিনিট যোগ করিতে হইবে না।" ইনি বৎসরে একবার বঙ্গদেশে যাইতে ইচ্ছা রাখেন!

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

—০—

দাসীর শ্রাদ্ধে দানসাগর।

"দাসীর শ্রাদ্ধে দানসাগর" কথাটী শুনিলেই আপাততঃ মনে হয় যে ইহা "ক্ষুদ্র কার্য্যে বৃহদাড়ম্বর" সূচক একটী প্রবাদ বাক্য। আজকাল পিতামাতার শ্রাদ্ধেই অনেক ধনী সন্তান "দানসাগর" করিয়া উঠিতে পারেন না, তাহাতে "দাসীর শ্রাদ্ধে দানসাগর" প্রবাদবাক্য মনে করা কিছুতেই অসঙ্গত নহে। কিন্তু কিছু কাল পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গের এক ব্রাহ্মণ জমিদার প্রকৃতই দাসীর মৃত্যুতে দানসাগর শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই শ্রাদ্ধ দেখিয়াছেন এখনও এমন অনেক বৃদ্ধ জীবিত আছেন। যে যশস্বী ভূস্বামী এই অসাধারণ কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, ঢাকা জেলার অধিকাংশ অধিবাসীর নিকটই তাঁহার নাম সুপরিচিত। "দাসীর শ্রাদ্ধে দানসাগর" কথাটী বলিলেই ইহারা বুঝিবেন যে রোয়াইলের জমিদার স্বর্গীয় রাজমোহন রায়ের গুণগান করা হইতেছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা রাজমোহনের সম্বন্ধে দু'একটী কথা "প্রদীপ" পাঠকের গোচর করিব।

ঢাকা জেলার এক অতি প্রাচীন এবং সম্ভ্রান্ত বংশে রাজমোহনের জন্ম। এই জেলার পশ্চিমাংশের তিনটী অতি প্রাচীন বংশের নামোল্লেখ করিতে একটী প্রচলিত কথা আছে "করকালে" (কালিয়) "কাশ্যপ"। প্রথম কর উপাধিতে, মাণিকগঞ্জ মহকুমার আমডানা গ্রামের কায়স্থ কর বংশ * দ্বিতীয় কালিয় শব্দে পাবনা জেলার পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত ভারেঙ্গা গ্রামনিবাসী বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ প্রসিদ্ধ চৌধুরী বংশ। † এবং তৃতীয় কাশ্যপ গোত্রের নামে এই গোত্রজ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ রোয়াইলের সুপরিচিত জমিদার বংশ সূচিত হইয়া থাকে। রাজমোহন এই শেষোক্ত বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত রমণীমোহন রায় বর্ত্তমান সময়ে রোয়াইলের সর্ব্বপ্রধান জমিদার। রোয়াইল ঢাকা জেলার সদর বিভাগের সাভাড় থানার অন্তর্গত। সদর এবং মাণিকগঞ্জ বিভাগস্থিত চাঁদপ্রতাপ পরগণা ইঁহাদের জমিদারী। রোয়াইলের কাশ্যপ পরিবার বাঙ্গালার রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অতি উচ্চ শ্রোত্রিয় বলিয়া বহু দিন হইতে সুপরিচিত। রাজমোহনের জন্মের বহু পূর্ব্বেও এ বংশের গৌরব ছিল। কিন্তু রাজমোহন ক্ষণজন্মা পুরুষ। তাঁহার নামই ইদানীং এই বংশকে সমধিক উজ্জ্বল করিয়াছে। রাজমোহন কেবল যে এক দাসীরশ্রাদ্ধে দানসাগর করিয়াছিলেন, তাহা নহে; নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াতেও তাঁহার অসাধারণ ব্যয় ছিল। রোয়াইলের জমিদার বংশই চিরদিন চাঁদপ্রতাপ সমাজের নেতা। রাজমোহন তাঁহার সময়ে এই নেতৃত্ব অতিশয় গৌরব ও প্রতিষ্ঠার সহিত করিয়া গিয়াছেন।

* এই বংশের এক বংশধর শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ রায় বর্ত্তমান সময়ে ঢাকা জেলার বাল্লাগ্রামে সবরেজিষ্ট্রার ও অনরেরিমাজিষ্ট্রেট।

† শ্রীযুক্ত বাবু উমেশনারায়ণ চৌধুরী এবং পাবনা জজকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী প্রভৃতি এই বংশ সম্ভূত এবং ভারেঙ্গার অধিবাসী।

আজকালি যেমন দেশের অধিকাংশ লোকের দানের উদ্দেশ্যই গবর্ণমেণ্টের নিকট নাম কেনা, তেমনই কিছুকাল পূর্ব্বে অনেক স্থলেই বাঙ্গালীর অর্থব্যয়ের উদ্দেশ্য ছিল সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করা। তখন পল্লীগ্রামেই সমাজ ছিল। পল্লীগ্রামের সমাজই জীবন ছিল। পরস্পর নিকটবর্ত্তী সমাজে সমাজে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। সামান্য সামান্য বিষয় লইয়াও সামাজিক কলহ হইত। এখন আমরা এইরূপ কলহ ইত্যাদি হইতে একরূপ নিষ্কৃতি পাইয়াছি সত্য, কিন্তু সামাজিক জীবনও যেন নাই বলিলেই চলে। অধুনা বিভিন্ন সমাজের উজ্জ্বল অংশ সকল বিচ্ছিন্ন ও অসংলগ্নভাবে সহরে নগরে উপনগরে জেলা অথবা মহকুমার সদরে বিরাজ করিতেছেন। পল্লীগ্রাম একরূপ সমাজশূন্য হইয়াছে। তখনকারদিনে যাঁহারা সহরে নগরে থাকিতেন, তাঁহাদেরও দৃষ্টি থাকিত সেই স্বগ্রামস্থ সমাজের প্রতি। বিদেশে থাকিয়াও তাঁহারা আপনার সমাজের লোকের উপকার আর বাড়ীতে যাইয়া তাঁহাদেরই আদর অভ্যর্থনা ও অর্চ্চনা করিতেন। এখন সে ভাব চলিয়া গিয়াছে। আজকাল অবস্থার আঘাতে অনেকেরই যেন জীবনের মূলমন্ত্র "খাও দাও"। "পার ত কিছু পয়সা বাঁচাও।" বলা বাহুল্য এক দিকে সমাজের লোকের সমাজের প্রতি যেমন অনাস্থা হইয়াছে, অন্য দিকে সমাজপতিদিগেরও প্রভুত্ব ও দায়িত্বের তেমনই হ্রাস হইয়াছে। এখন তাঁহারাও অনেকেই সহরে যাইয়া দেশস্থ ভূ-সম্পত্তির আয় সেখানেই ব্যয় করিতেছেন। দেশের সামাজিক ক্রিয়া কাণ্ডের প্রতি তেমন দৃষ্টি নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ পরিবর্ত্তন অধিক দিনের নহে। পল্লীগ্রামে প্রাচীন ভাবাপন্ন অর্থবান লোক যাঁহারা আছেন, তাঁহারা এখনও সময়ে সময়ে এক এক প্রকাণ্ড ভোজের অথবা প্রচুর ফলাহারের আয়োজন করিয়া থাকেন। বাঙ্গালার পুরাতন রাজবাড়ীগুলিতে আহারের পারিপাট্য এখনও উঠিয়া যায় নাই। প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখক তাহার পঠদ্দশায় কোন সাধারণের হিতকর কার্য্যের নিমিত্ত বাঙ্গালার এক রাজার সহিত সাক্ষাত করিতে গিয়াছিলেন। ভূস্বামী আলাপে আপ্যায়িত করিয়া সন্ধ্যার সময়ে রাজবাড়ীতে জলযোগের নিমন্ত্রণ করেন। লেখক জলযোগের স্থানে উপস্থিত হইয়া প্রচুর আয়োজন দেখিয়াই একরূপ স্তম্ভিত হন। জৈষ্ঠ মাস। সুমিষ্ট ফল সে সময়ে যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা সমস্তই ছিল। অধিকন্তু মিষ্টান্ন ক্ষীর সর প্রভৃতি এতই অধিক ছিল, যে তাহা লেখকের দর্শনেন্দ্রিয় ও রসনেন্দ্রিয়ের অপরিমিত তৃপ্তি সাধন করিলেও তাহার অধ্যয়নক্লিষ্ট দেহের উদর নামক গহ্বরে তাহাদের স্থান সংকুলান হইবে না ভাবিয়া তাহার অতিশয় ক্ষোভ জন্মিয়াছিল! লেখক দেখিলেন পার্শ্বস্থ একটী বিস্তৃত দালানে প্রায় অর্দ্ধ শত লোকের জন্য ঐরূপ উপকরণের খাদ্য রহিয়াছে। অনুসন্ধানে জানিলেন নিকটস্থ পঞ্চাশ ষাইট জন ব্রাহ্মণ প্রত্যহ সন্ধ্যার পরে রাজ বাড়ীতে জলযোগ করিয়া থাকেন। ইহাতে তাহার সহসাই মনে হইল, বর্ত্তমান শতাব্দির প্রথমাংশে বঙ্গের জমিদার গৃহে ব্রাহ্মণ ভোজনের পরে জন্মগ্রহণ করিয়া বিসূচিকা দেবী উপযুক্ত স্থানেই আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। আহার সম্বন্ধে এত কথা শুনিয়া পাঠক হয়ত মনে করিতেছেন, প্রবন্ধ লেখক একজন অতিশয় ভোজনপটু উদর-সর্ব্বস্ব লোক। আমরা এ অপবাদ স্বীকার করিয়া লইয়াও বলিতেছি যে, নিতান্ত অবান্তর ভাবে এ কথার অবতারণা করি নাই। আমরা দেখাইলাম যে সে দিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের জমিদার গৃহে সমাজের লোকের উদর তৃপ্তির ব্যবস্থা এইরূপ ছিল। রাজমোহন জমিদার। চাঁদপ্রতাপ পরগণার ব্রাহ্মণদিগকে তিনি এইরূপ ভাবেই খাওয়াইতেন। এক একটী ক্রিয়াকাণ্ডোপলক্ষে তিনি ব্রাহ্মণ ভোজনের যেরূপ ব্যবস্থা করিতেন তাহার বিবরণ শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। চাঁদপ্রতাপ নিবাসী ব্রাহ্মণগণ এখনও এক বাক্যে কহিয়া থাকেন যে এমন খাওয়ান কেহই খাওয়াইতে পারিবে না। রাজমোহনের জীবনের যেন মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল ব্রাহ্মণদিগকে আকণ্ঠ ভোজন করাইয়া—ও তাহাদিগকে দান করিয়া তাহাতে প্রতিষ্ঠালাভ। তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল যে আহার্য্য দ্রব্য যাহা কিছু আয়োজন করা হইবে, তাহার যে কোন দ্রব্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা যতই চাহিবেন ততই পাইবেন।

এই প্রতিজ্ঞা পালনার্থ তিনি এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিতেন। ঢাকার অনেক দোকানদারের সহিত তাঁহার এইরূপ বন্দবস্ত ছিল যে, তিনি যত ইচ্ছা দ্রব্য সামগ্রী আনিবেন। ব্যাপার সমাধা হইয়া গেলে উদ্বৃত্ত দ্রব্য দোকানদারকে ফেরত লইতে হইবে। কথিত আছে একবার ব্রাহ্মণভোজন প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময়ে রাজমোহন ব্রাহ্মণদিগের সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আর কি চাই?" কতকগুলি ব্রাহ্মণ পূর্ব্ব হইতেই একটা ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন; তাঁহারা কহিলেন, শুনিয়াছি কিসমিসে বড় পরিপাক করে—আমরা কিছু কিছু কিসমিস চাই। রাজমোহন আদেশ করিলে তৎক্ষণাৎ বাড়ীর ভিতর হইতে দুই মণ কিসমিস আনীত হইল। পরিবেশনকারীরা রাজমোহনের কথামত দুই এক পাতে এক এক গণ্ডূষ দিতে আরম্ভ করিলেই ব্রাহ্মণেরা কহিলেন "আর না। আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।" মাণিকগঞ্জ মহকুমার মহাদেবপুর গ্রামে রাজমোহনের কতকগুলি জ্ঞাতি আছেন। ইঁহাদের একজন সে দিন কহিলেন, একবার শ্রাবণ মাসে কোন ক্রিয়া উপলক্ষে তিনি রোয়াইলে রাজমোহনের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ভোজনের পূর্ব্বে রাজমোহন তাহাকে বাড়ীর ভিতরে লইয়া জল খাওয়াইতেছেন। তিনি দেখিলেন একটী ঘরে প্রায় এক সহস্র ফজলী আম সজ্জিত রহিয়াছে। কহিলেন "এত আম সংগ্রহ হইয়াছে?" রাজমোহন হাসিয়া কহিলেন—"আম দেখিবে এস।" এই বলিয়া ভিতর বাড়ীর নিকটে একটী খালের ধারে লইয়া দেখাইলেন কয়েক খানি নৌকায় তিন চারি সহস্র আম্র রহিয়াছে। কহিলেন ইহারা ব্রাহ্মণ ভোজন পর্য্যন্ত থাকিয়া যাহা লাগিবে তাহা দিয়া অবশিষ্ট আম লইয়া ঢাকায় যাইবে।" এই জন্যই রাজমোহনের বাড়ীর ব্রাহ্মণ ভোজনের এত নাম। ক্রিয়া কাণ্ড ব্যতীত অন্য সময়ে কোন ভদ্রলোক তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলে রাজমোহন তাহার ভোজনের এমন ব্যবস্থা করিতেন যে, আগন্তুক খাদ্য দ্রব্যের প্রাচুর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। রাজমোহনের নিয়ম ছিল যে, তাঁহার নিজের বাড়ীতে এবং অন্যান্য তিন চারি সরিকের বাড়ীতে সর্ব্বদাই এক এক স্থানে চার পাঁচটী চুল্লী রন্ধনোপযোগী অবস্থায় থাকিত। অভ্যাগত কেহ আসিলেই এই সমস্ত চুল্লী জ্বালিয়া দেওয়া হইত এবং এক কিংবা দেড় ঘণ্টার মধ্যে বিশ বাইশটী ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইত। রোয়াইলের বাড়ীর এই নিয়ম এখনও উঠিয়া যায় নাই। এখনও অনেক অনিমন্ত্রিত ভদ্রলোক তথায় যাইয়া বিশ বাইশটী ব্যঞ্জন দিয়াই আহার করিয়া থাকেন। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, অন্যকে ভালরূপে আহার করাইবার আগ্রহ রাজমোহনের কত অধিক ছিল। বস্তুত তিনি অন্যের আহারে এতই তৃপ্তি বোধ করিতেন যে, যে সমস্ত ব্রাহ্মণেরা নিয়মিত ভোজনান্তে অধিক আহার করিতে পারিতেন রাজমোহন তাঁহাদিগকে অধিক হারে দক্ষিণা দিতেন। তখনকার দিনে ব্রাহ্মণেরাও বিলক্ষণ ভোজনপটু ছিলেন। অধিকাংশ ব্রাহ্মণই ভোজনশেষে পাঁচ সাতসের দধি সন্দেশ উদরস্থ করিতে পারিতেন। দেশের যেরূপ সময় পড়িয়াছে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে আজকাল যেরূপ অম্ল অজীর্ণ অগ্নিমান্দ্যের অধিকার বাড়িতেছে, তাহাতে কিছু কাল পরে এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা গল্পের বিষয়ীভূত হইবেন সন্দেহ নাই। রাজমোহনের ন্যায় লোকের সঙ্গে সঙ্গে এরূপ ব্রাহ্মণগণ সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, ইহা একরূপ সুখের বিষয়ই বলিতে হইবে।

রাজমোহনের দান সম্বন্ধে এখনও বিশেষ কিছু বলা হয় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রাহ্মণভোজন আর ব্রাহ্মণদিগকে দান ইহাই তাঁহার জীবনের মুখ্যব্রত ছিল। তিনি এমনই মুক্তহস্ত ছিলেন যে, অনেক সময়ে তাঁহার ব্যয় দেখিয়া তাঁহার আত্মীয়েরা পর্য্যন্ত বিস্মিত হইতেন। একবার রাজমোহন চাঁদপ্রতাপ সমাজের যে সকল ব্রাহ্মণ দানগ্রহণে সম্মত তাঁহাদের প্রত্যেককেই এক একটী স্বর্ণোপবীত দান করিয়াছিলেন। কিন্তু "দাসীর শ্রাদ্ধে দানসাগর"ই তাঁহার নাম অমর করিয়া রাখিয়াছে। এই দাসী শূদ্রজাতীয়া। সে তাঁহাকে মানুষ করিয়াছিল। রাজমোহন তাহাকে ধাই (ধাত্রী) মা বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার গর্ভধারিণীও বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু মা থাকিতেও বড়মানুষের ছেলেরা যেমন দাসীর কোলে মানুষ হইয়া থাকেন, রাজমোহন সেই ভাবেই এই দাসী কর্ত্তৃক লালিত পালিত হইয়াছিলেন। রাজমোহন তাহাকে মাতার ন্যায় সম্ভ্রম করিতেন। তাহার মৃত্যুতে তিনি শোকবিহ্বল হইয়াছিলেন এবং তাহার গর্ভজ পুত্রকে দিয়া দানসাগর

শ্রাদ্ধ করাইয়াছিলেন। এ কাজ তিনি কেবল নামের জন্য করেন নাই। হৃদয়ের অকৃত্রিম ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা ইহাতে ছিল। ভক্তি কৃতজ্ঞতা ছিল বলিয়াই এই একশ্রাদ্ধ তাঁহার অন্যান্য সমস্ত কাজ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে এবং তাঁহার নাম পূর্ব্ববঙ্গে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। রাজমোহন আপনার জননীর শ্রাদ্ধে করিয়াছিলেন স্বর্ণের ষোড়শ। আর এই ধাত্রীর শ্রাদ্ধে করিয়াছিলেন রৌপ্যের ষোড়শ। তথাপি লোকে এই রৌপ্যের দানসাগরেরই গৌরব অধিক করিয়া থাকে। করিবার কারণও আছে।

রাজমোহনের স্বভাবে দু একটী দোষও ছিল। মনুষ্যস্বভাব একবারে নির্দ্দোষ হয় না। রাজমোহন বড়ই কৌশলী লোক ছিলেন। যে জমিদারীতে অন্যে ত্রিশ হাজার টাকা আদায় করিতে পারে, রাজমোহন তাহাতেই পঞ্চাশ হাজার টাকা আদায় করিতে পারিতেন। অথচ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তিনি প্রজার প্রতি কখনও উৎপীড়ন করিতেন না। প্রজাগণ তাঁহার প্রতি অনুরক্তই ছিল। রাজমোহন কিছু অহঙ্কারীও ছিলেন। আপনার আভ্যন্তরিক অবস্থা তিনি কখনও অন্যকে জানিতে দিতে চাহিতেন না। তিনি আপনাকে সর্ব্বদাই অতিশয় ধনবান দেখাইতে চাহিতেন। এ সম্বন্ধে একটী কৌতুকাবহ গল্প আছে। যেবারে রাজমোহন ব্রাহ্মণদিগকে স্বর্ণোপবীত দান করেন, সেইবার তিনি স্বয়ং কলিকাতায় স্বর্ণক্রয় করিতে গিয়াছিলেন। তথায় তাঁহাকে কোন একজন লোক কথা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"মহাশয়ের জমিদারীর আয় কত?" রাজমোহন উত্তর করিলেন "লাখনয়।" রাজমোহনের ভূসম্পত্তির আয় লক্ষ টাকার কম। কিন্তু প্রশ্নকারী ন'লাখ টাকা বুঝিলে রাজমোহনের আপত্তি ছিল না। রাজমোহনের ন্যায় ব্যক্তির চরিত্রে এইরূপ দুর্ব্বলতা বড়ই দুঃখজনক সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার অন্যান্য সদ্গুণাবলী স্মরণ করিয়া ইহা উপেক্ষা করিতে পারি। তাঁহার সম্পূর্ণ চরিত্র দেখাইবার নিমিত্তই আমরা ইহার উল্লেখ করিলাম। এক কথা বলা যাইতে পারে যে, রাজমোহন ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকদিগের জন্য যে অপরিমিত অর্থরাশি ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা দরিদ্রকে দান করিলে জগতের অধিকতর উপকার সাধিত হইত। এটী এখনকার হিসাবের কথা। রাজমোহনের সময়ে সমাজের অধিকাংশ ব্রাহ্মণই যে দানের উপযুক্ত পাত্র ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সময়ের পরিবর্ত্তনে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে মসজীবির সংখ্যা বৎসর বৎসরই বৃদ্ধি পাইতেছে। তথাপি এখনও দেশে উপায়হীন ব্রাহ্মণের সংখ্যা অল্প নহে। ফলতঃ যে ভাবেই বিবেচনা করি না কেন, রাজমোহনের চরিত্র যে কিছুকাল পূর্ব্বের বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ ভূস্বামীর ও সমাজপতির এক অতি উজ্জ্বল আদর্শ তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ আদর্শ প্রায় অদৃশ্য হইয়া আসিল বলিয়া আমরা তাঁহার জীবনের স্থূল স্থূল দু'চারিটী কথা প্রদীপে পত্রস্থ করিলাম। রাজমোহন জীবনে অসংখ্য সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু ইহা বোধ হয় সর্ব্ববাদি সম্মত যে, তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য "দাসীর শ্রাদ্ধে দানসাগর।"

শ্রীচন্দ্রশেখর কর।

—o—

ঐতিহাসিক তথ্যের পরিণাম।

এক্ষণে বঙ্গদেশে বহু পরিমাণে কৃতবিদ্যের আবির্ভাব হইতেছে। বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় যে, ইহাদিগের অনেকেই মাতৃভাষাসেবী। অনেকেই চিন্তাতরঙ্গের গতিরোধে অসমর্থ। সুতরাং বৃথাকার্য্যে সেই দুর্দ্দম চিন্তা স্রোতকে ধাবিত না করিয়া প্রবন্ধ রচনায় নিয়োগ করিয়াছেন।

স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবু, আর রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরকে এই মহৎ কর্ত্তব্যের পথপ্রদর্শক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বঙ্কিম বাবু বঙ্গদর্শনে যেমন উপন্যাসের প্রচারপটু, সেইরূপ বাঙ্গালীর হৃদয়ে জটিল দার্শনিক তত্ত্ব সকল অনুমিত করিতেও ত্রুটি করেন নাই। তাহার সঙ্গে বঙ্গের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারেও তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি দুই একটী সামান্য বিষয় ব্যতীত, উপন্যাসের অঙ্গভঙ্গিতেই বঙ্গের ঐতিহাসিক চিত্র অঙ্কনে প্রয়াসী ছিলেন। বঙ্গে মোসলমান রাজত্বের অবসান, এবং ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত, এই সন্ধিকালেই ঘোরতর বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে। বঙ্কিম বাবু, সম্ভবতঃ রাজকীয় পদে প্রতিষ্ঠিত থাকায়, নানা কারণে সেই ঘোরতর ঝাটিকাকুল সময়ের ধারাবাহী আলোচনায় সাহসী ছিলেন না; অথবা ইচ্ছাপূর্ব্বকই সে পথে অগ্রসর হন নাই। তবে, "আনন্দমঠ" "দেবী চৌধুরাণী" প্রভৃতি উপন্যাসে

তাঁহার হৃদ্‌গত ঐতিহাসিক কল্পনা অনেকটা পরিব্যক্ত হইয়াছে। আর তৎসাময়িক বাঙ্গালীর সমাজ গঠনের উপদেশও কিয়ৎ পরিমাণে পরিস্ফুট হইয়াছে মাত্র। ফলতঃ তাহাতে এই পরাধীন জাতির এক স্বপ্ন-কল্পিত অনুতাপময় সুখ দুঃখ ভোগ ভিন্ন আর কিছুই হয় নাই। তাহাতে লোক সমাজে জাতীয় জীবন-খেলার একটা উদ্ভট হৈ চৈ বা কল্পনামাত্র বৃদ্ধি করিয়াছে। তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসে, হেম বাবুর কবিতায় তৎকালের অধ্যয়নশীল ছাত্রদিগের হৃদয় স্বদেশ ও মাতৃভাষার সেবায় উদ্বোধিত করিয়াছে। আর তাহার ফলেই আজি আমরা নানা পুস্তকে, বিবিধ প্রবন্ধে সেই ছাত্র-হৃদয়-উপ্তবীজের শাখা পল্লবিত বৃক্ষ দেখিতে পাইতেছি। আর তাহাতেই এখন আর কৃতবিদ্য সমাজে মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নাই। ইহা অবশ্যই স্বদেশ, স্বসমাজ, বিশেষতঃ বঙ্গভাষার সৌভাগ্য।

বঙ্কিম বাবু একপক্ষে শিক্ষাগুরু হইলেও, তাঁহার আখ্যায়িকার লালিত্যে যে বঙ্গদেশের ঐতিহাসিক সত্যের বিকৃতি ঘটিয়াছে, তাহা না বলিয়া উপায় নাই। আমাদের শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিকসত্য-উদ্ঘাটননিপুণ শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয়, সীতারামের এবং সিরাজের ঐতিহাসিক কলঙ্ক অপনয়ন করিয়া বঙ্গবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কলঙ্কবিলেপিত সত্য উদ্ধার করিতে গেলেই, সেই সত্য যে উপন্যাস কিম্বা কাব্যের দ্বারা বিকৃত হইয়াছে, তাহা প্রমাণ করা স্বভাবিক, এবং অতীব কর্ত্তব্য। অতএব তদুপলক্ষে "সীতারাম" উপন্যাস প্রণেতা বঙ্কিম বাবু আর "পলাশীর যুদ্ধ" প্রণেতা নবীন বাবুর ভ্রম দেখান অন্যায় হয় নাই। এই সূত্রে অক্ষয় বাবু কোন কোন মনস্বী সমালোচক কর্ত্তৃক ঘোরতর আক্রান্ত হইয়াছেন। অনেক বাদানুবাদও চলিতেছে। নাটক, আখ্যায়িকা, এবং কাব্য-লেখকদিগের সহিত প্রকৃত ইতিহাসের কোন সম্বন্ধ নাই, ইহাই প্রতিবাদকারিগণের অমোঘাস্ত্র। ইহার পোষকে মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল, আর ইংরেজ কবিচূড়ামণি সেক্‌সপিয়রের ঐতিহাসিক নাটকাদিকে দৃষ্টান্ত স্থলে গ্রহণ করা হইয়াছে। ফলতঃ দুই চারি জন কৃতিপুরুষ যাহা করিবেন, তাহাকেই বেদবৎ বিশ্বাস করা নিতান্তই অর্ব্বাচীনতা ভিন্ন আর কিছু নহে। তাঁহাদিগের গ্রন্থ কাব্যাংশে জগতে অতুলণীয় হইলেও, তদ্দ্বারা সমাজের কি হিতাহিত হইয়াছে তাহা অবশ্যই ভাবিবার বিষয়। যদি তাঁহাদিগের দ্বারা সমাজের কোন অনিষ্ট হইয়া থাকে, তবে ভগবানের অবতার হইলেও সামাজিক বিচারে তাঁহাদের অপরাধ অমার্জ্জণীয়।

কালিদাস মহাভারত হইতে অভিজ্ঞান শকুন্তল, আর বাল্মীকি কৃত রামায়ণের ছায়া লইয়া রঘুবংশ রচনা করেন। রঘুবংশের——"অথবা কৃতবাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ—" কবিতাতেই তাহা প্রকাশিত আছে। বৃত্তান্তে কিন্তু মহাভারতোক্ত শকুন্তলা হইতে কালিদাসের শকুন্তলার বিস্তর পার্থক্য। ফলতঃ তাহাতে তত দোষা-বহ হয় নাই। হিন্দুগণ মহাভারতকে মহাপ্রামাণ্য ইতিহাস বলিয়া আবহমান মান্য করিয়া থাকেন। অতএব ভারতরূপ সমুদ্রের দুই চারিটা তরঙ্গ-ফেন লইয়া শকুন্তলা, নৈষধ, বেণীসংহার, কিরাতার্জ্জুণীয় প্রভৃতি বিস্তর নাটক ও কাব্য রচিত হইলেও, ভারত, সেই হিন্দুকুলের মহাপ্রামাণ্য ভারতই আছে। আর শকুন্তলাদি কাব্যের ভূমিকায় বঙ্কিম বাবুর সীতারামের ন্যায় "ইহা ইতিহাস নহে—উপন্যাস" এই কথা না থাকিলেও সে গুলি যে কবিকপোলকল্পিত, এ কথা হিন্দুমাত্রকে বুঝাইতে আর প্রমাণ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বিদেশায়ের হাতে পড়িয়া সেই কল্পনাই যে সত্যের স্থান অধিকার করে নাই, তাহাই বা কিরূপে বলিব। রামায়ণের সূর্য্যবংশপর্য্যায়, আর রঘুবংশের পর্য্যায়ে দিলীপ হইতে দশরথ পর্য্যন্ত অনেক গুলি পুরুষকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। হিন্দুদিগের মধ্যে রামায়ণের পর্য্যায় মহাপ্রামাণ্য, আর রঘুবংশ কল্পিত কাব্য, এ বিশ্বাস অবশ্যই আছে। কিন্তু মহাত্মা টড্ সাহেব বহু পরিশ্রমে, বহু অনুসন্ধানে যে সত্য উদ্ধার করিয়া কলির মহাভারত "রাজস্থান" লিখিয়াছেন, তাহাতে দীলিপ হইতে দশরথ পর্য্যন্ত সূর্য্য বংশ পর্য্যায়ে রামায়ণ উপেক্ষা করিয়া কাব্য রঘুবংশকে মান্য করিয়াছেন। ইহা দ্বারা কি ঐতিহাসিক সত্যের বিকৃতি ঘটে নাই ? তবে অধুনাতন বিজ্ঞ সমাজে বাল্মীকি রামায়ণও কল্পিত কাব্য রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। এমন কি বংশপর্য্যায়, কি যুগপর্য্যায় সমস্তই বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। কুরুপাণ্ডব যুদ্ধঘটনা, রামরাবণের যুদ্ধের

পূর্ব্ব যুগে স্থান পাইতেছে। তাহা বলিয়া উপায় কি ? কিন্তু, কুসংস্কারই হউক, আর সুসংস্কারই হউক, হিন্দু সমাজের স্থায়ী কাল পর্য্যন্ত মহাভারত ও রামায়ণ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়াই হিন্দুর হৃদয়ে বিরাজ করিবে।

"পলাশীর যুদ্ধ" ও "সীতারাম" উপন্যাস কাব্য হইলেও ইতিহাসের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এই জাতীয়ইতিহাসবিহীন দেশে, পুস্তক পাঠক্ষম বাঙ্গালী মাত্রের হৃদয়েই তাহার চিত্র গাঢ় অঙ্কিত। যাঁহারা বাঙ্গালার ইতিহাস না পড়িয়াছেন, যাঁহারা সীতারাম সম্বন্ধে মহাত্মা ষ্টুয়ার্টও ওয়েষ্ট ল্যাণ্ডের ইতিহাস স্পর্শও করেন নাই, তাঁহারা 'সীতারাম' আর 'পলাশীরযুদ্ধ' পাঠেই ইতিহাসে অভিজ্ঞ হইয়াছেন। এরূপ স্থলে তদ্বিরুদ্ধে ঐতিহাসিকের লেখনী-ধারণ যে কিরূপ ক্লেশকর তাহা সহজে প্রতিপন্ন হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বঙ্কিম বাবু সীতারামের ভূমিকায় উহা যে 'ইতিহাস নহে' উপন্যাস—এই কৈফিয়ৎ দিলেও, উপন্যাসের মধ্যে ঐতিহাসিক বিবরণ অস্থিমজ্জায় বিজড়িত থাকায় সাধারণ পাঠকের পক্ষে বিশ্লেষণ করা দুঃসাধ্য।

অতএব অক্ষয় বাবু শপথ করিয়া সীতারামের ঐতি-হাসিক সত্য লোক-চক্ষুর গোচরীভূত করিলেও সর্ব্ব-সাধারণকে বুঝাইতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। তবে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, যাহারা মুর্খ, ইতিহাস পড়ে না, ইতিহাস তাহাদিগের জন্য নহে। এ কথার কিছুই মূল্য নাই। জাতি সাধারণের দেহ ধরিতে গেলে কৃতবিদ্য-গণ, তাঁহার মস্তিষ্কের দুই চারিটী অণু ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাঁহারা জাতীয় ইতিহাসকে ইংরেজী পাদটীকা দ্বারা কেবল কৃতবিদ্য সমাজকে কৈফিয়ত দিয়াই নিরস্ত হইতে ইচ্ছা করেন, আমরা তাঁহাদিগকে ইতিহাস আলো-চনা অপেক্ষা অন্য বিষয়ে দিন যাপনে অনুরোধ করি।

বঙ্কিম বাবুর 'সীতারামে'র পরিণাম অস্ফুট। তাহা গ্রাম্যলোকের কাল্পনিক গল্পেই পর্য্যবসিত; আর ঐতি-হাসিক সীতারামের পরিণাম দুর্ব্বোধ্য জল্পনায় মাত্র আচ্ছন্ন নহে। সীতারামের বীর-বিক্রম, তাঁহার লোকরঞ্জনশক্তি, এবং প্রগাঢ় অধ্যবসায় বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসেও আছে। তাঁহার নিকট ভূষণার ফৌজদার ও নবাবের ফৌজ পুনঃ পুনঃ পরাজিত ও লাঞ্ছিত হওয়ায় সুদূর দিল্লীর সিংহাসন পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়াছিল। তখন, কুম্‌কী দ্বারা বন্যহস্তী ধরার ন্যায়, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের জমীদারদিগের মধ্যে স্বজাতি ধ্বংসকর কূটনীতি বিস্তৃত করা হইল। নাটোরের রাজা রামজীবন, এবং তাঁহার পুত্র কুমার কালিকাপ্রসাদ (কালু কোঙর) সেই নীতির প্রধান নেতা হইলেন। সে সময়ে দিঘাপতিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সৌভাগ্যশালী ও বুদ্ধিমান যুবক দয়ারাম রায়, ধীরে ধীরে নাটোর মন্ত্রিসভায় স্থান লাভ করিয়াছেন। তিনি বুদ্ধিমান এবং তেজস্বী। তিনি সীতারামকে ধৃত করিবার জন্য নানা ফন্দী আঁটিতে লাগিলেন। ধর্ম্মে হউক আর অধর্ম্মে হউক, তিনি সীতারামকে ধৃত করিয়া স্বদেশে আপনার ক্ষমতা প্রদর্শন নিমিত্ত, মুরশিদাবাদে না পাঠাইয়া, নাটোর রাজধানীতে আনয়ন করিলেন। সীতারামের গৃহলুণ্ঠিত-দ্রব্য-পূর্ণ শকট সকলও নাটোরদ্বারে উপস্থিত হইল। কেবল সীতা-রামের সৌভাগ্যবর্দ্ধক বলিয়া ৺ লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা * ও কৃষ্ণজীকে দয়ারাম দিঘাপাতিয়ায় স্বভবনে লইয়া গেলেন। নাটোর রাজধানীর যে আঁধারকোঠা নামক অন্ধকার গৃহে সীতারাম বন্দী ছিলেন, তাহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান। তবে ইহা পুরুষানুক্রমিক আপ্তবাক্য ভিন্ন অন্য কোন ঐতিহাসিকের গ্রন্থে স্থান পায় নাই। কিশোরী চাঁদ মিত্র এক একটা গল্প ধরিয়া নিজের মনোমত মসলা দিয়া "Rajah of Rajshahi" লিখিয়া কোন কোন সম্ভ্রান্তবংশের কৃতজ্ঞতাঋণে মুক্ত হইতে পারেন; কিন্তু

---

* ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবের গ্রন্থে এই শিলা নড়াইলের বাবুদিগের গৃহে গমনের কথা লিখিত আছে। কিন্তু রাজা রামজীবন ও কালিকাপ্রসাদের পর দত্তক রাজা রামকান্ত, তাঁহার অভাবে মহারাণী ভবানী এবং তাঁহার জীবিত সময়েই মহারাজা রামকৃষ্ণের রাজত্ব কালে নড়াইলের বাবুদিগের জমীদারীর প্রতিষ্ঠাতা কালীশঙ্কর রায় প্রাদুর্ভূত হন। মহারাজা রামকৃষ্ণের শেষ জীবনের দরবারে কালীশঙ্কর রায় মন্ত্রী হইয়া সৌভাগ্য লাভ করেন। এবং মহারাজা বিশ্বনাথের প্রথম রাজত্বেও কালীশঙ্কর রায় কিছু দিবস মন্ত্রিত্ব করিয়া আশ্বিনের কিস্তীর লাটের সময় নাটোর রাজত্বের নানা স্থান হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া যে নাটোর ত্যাগ করেন, সেই তাঁহার শেষ চাকুরী। প্রবাদ যে, সেই অর্থের দ্বারা নীলামে নাটোরের অনেকগুলি সম্পত্তি ক্রয় করেন। অতএব রামজীবন ও রামকৃষ্ণের সময় ত্রিশ বৎসরের অধিক ব্যবধান। সীতারামের পতন সময়ের বহু পরে নড়াইলের সৌভাগ্য। অতএব লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ নড়াইল অপেক্ষা দিঘাপতিয়ায় আনয়ন করাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

সেই ভ্রমসঙ্কুল পুস্তক কোন ইতিহাসের পাদটীকায় প্রমাণ স্বরূপ গৃহিত হইলে বড়ই দুঃখের বিষয়। এ সম্বন্ধে অক্ষয় বাবুকেও আমি নির্দ্দোষ বলি না। তিনিও "সীতারাম রায়" নামক প্রবন্ধের এক স্থানের পাদ টীকায় "রাজা অব্ রাজসাহীকে" গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য তিনি যে বিষয়ের সমর্থন জন্য ঐ পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই বিষয় সত্য কিনা জানি না, আর সত্য হইলেও সেই 'বস্তাপচা' কপোল কল্পিত পুস্তকের নাম গ্রহণ করিলেও দোষ আছে। কেননা পরবর্ত্তী কোন লেখক সম্ভবতঃ অক্ষয় বাবুর পুস্তকে নাম দেখিয়া "রাজা অব্ রাজসাহীকে" প্রমাণ্যরূপে গ্রহণ করিয়া ভ্রান্তি জালে পতিত হইতে পারেন। ফলতঃ নবাব নাজীমের নিকট হইতে সীতারামের জমিদারী ও চাকলে ভূষণার কতকাংশ সুচতুর রাও রঘুনন্দন লইয়া নাটোর রাজত্বের সীমা রেখা বৃদ্ধি করেন। আবার নাটোর রাজধানী হইতে লুঠের রৌপ্য থালা প্রভৃতির সহিত ভূষণা প্রভৃতি কয়খানা গ্রাম দয়ারাম রায় পুরস্কার লাভ করেন। ঠাকুরদ্বয় ও প্রাপ্ত সম্পত্তি, অদ্যাপি দিঘাপাতিয়ার রাজধানীতেই রহিয়াছে। পুরুষ পরম্পরায় আপ্তবাক্যের সহিত এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ সমাবেশে সীতারামের পরিণাম আর কিম্বদন্তি মাত্রে পর্য্যবসিত হইতে পারে না।

বঙ্কিম বাবু ঐতিহাসিক সীতারামকে লইয়া বাঙ্গালী যুদ্ধকুশল স্বাধীনচেতা নির্ভীক বীরের অবতারণা করিয়া বাঙ্গালীর কলঙ্কমোচন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহার সঙ্গে সেই সময়ে বঙ্গদেশে কিরূপ প্রকৃতির লোকের আবির্ভাব হইলে ভাল হইত, সেই কল্পনা জড়াইয়া রমার সৃষ্টি করিয়া বঙ্কিম বাবুর প্রিয় ভগবদ্গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া ভাল করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। তিনি ইতিহাসোক্ত সীতারামকে গ্রহণ না করিয়া, কল্পিত উপন্যাসে কল্পিত নায়ক নায়িকা সংগ্রহ করিলে, উপন্যাসের রসোভঙ্গ হইত না। আর ঐতিহাসিকেরও প্রমাদ ঘটিত না।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কাব্য রঘুবংশ ঐতিহাসিক টড্ সাহেবের অভ্রান্ত বলিয়া বোধ হইয়াছে। এখন বঙ্গদেশে গৌরাঙ্গ মাহাত্ম্য প্রকটনের নিমিত্ত বিস্তর বৈষ্ণব কবির জীবনী লিখিত হইতেছে; তৎসমুদয়ে বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতা সকল অভ্রান্ত ঐতিহাসিক সত্যের প্রমাণস্থলে পাদটীকায় উদ্ধৃত হইতেছে। এতদ্দ্বারা আর পঞ্চাশৎ বর্ষ পরে বঙ্কিম বাবুর "সীতারাম" আর "পলাশীর যুদ্ধ" ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের পাদটীকায় যে স্থান পাইবে না, তাহার ভরসা কি আছে? যে বঙ্গদেশে ধরাবাহিক ইতিহাস নাই, আর তাহা নিরপেক্ষভাবে লিখিবার উপায়ও নাই, সেই দেশে কাব্য, নাটক, আখ্যায়িকা কোন কোন সময়ে ইতিহাসের স্থান অধিকার করিয়া থাকে। ইউরোপে ধারাবাহিক বহু ইতিহাস থাকিলেও রাজকবি টেনিসন্, বহুল ইতিহাস পাঠ করিয়া, তবে ঐতিহাসিক কবিতা লিখিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। যদিচ মহাকবি সেক্স্পীয়রের ঐতিহাসিক নায়ক নায়িকা সংক্রান্ত নাটকাদিতে ইতিহাস প্রধান ইউরোপের কোন অপকার হয় নাই, তথাপিও মহাত্মা টেনিসনের এত সাবধানতা কেন?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মানব, বড়ই প্রয়োজনের দাস; গৃহস্থ ধার্ম্মিক হইতে সর্ব্বত্যাগী যোগী পর্য্যন্ত প্রয়োজনার্থ অসাধ্য কার্য্যেও উদ্যুক্ত হইয়া থাকেন। কাহারও প্রয়োজন, কার্য্যদ্বারা স্পষ্টীকৃত, কাহারও বা কপটতায় আচ্ছন্ন। কিন্তু সেই প্রয়োজন যখন প্রতিযোগিতায় সংঘর্ষ হয়, তখন প্রতিদ্বন্দ্বিদ্বয় ঘোরতর কপটী হইলেও পরস্পরের নিকট পরস্পরের হৃদয় উদ্ঘাটনে বিলম্ব হয় না। আবার এইরূপ সংঘর্ষে কেহ কেহ দিশাহারা হইয়া যান। যিনি শত শত বার যে প্রবাদকে ঘৃণায় অবহেলা করেন, তিনিই আবার জিগীষার উদ্দীপনায় আত্মহারা হইয়া যাহা হাতে আইসে তাহাই লিখিয়া ফেলেন। একজন মিতভাষিণীর সহিত, অন্য মুখরা প্রতিবেশিনীর কলহ আরম্ভ হয়। মুখরা অভ্যস্ত কবিতার ন্যায় গালি বর্ষণ করিতেছে। প্রতিদ্বন্দ্বিনী কি বলিতেছে তাহা শুনিবার পর্য্যন্ত অবকাশ নাই। মিতভাষিনী প্রথমেই দুই চারিটী উত্তর দিয়া বসিয়া থাকিল। পরে মুখরা বলিতে বলিতে যখন শ্রান্তা হইল, তখন অল্পভাষিণী "তুই যাহা যাহা বলিতেছিস্ তুই তাহাই যত বলিবি, আমারও ঐ উত্তর বলে জানিস্।" বলিয়া নীরব হইলে, মুখরা কিছুকাল ঝগড়া করিয়া সহজেই নিরস্তা হয়। ভারতযুদ্ধের অবসানে শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রথমে গান্ধারীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তখন গান্ধারী তাঁহাকে উভয়কুলের বন্ধু বলিয়া দুই চারিটী কথা বলিলেই, শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার কুরুসভায়

সন্ধির প্রস্তাব, দুর্য্যোধনের ধৃষ্টতা, কুমন্ত্রণা, পাণ্ডবদিগের প্রতি অমানুষী অত্যাচার ইত্যাদি কৈফিয়ত দিলেন, স্বয়ং যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করিয়া উভয়কুলে সমদর্শিতা পর্য্যন্ত প্রমাণ করিলেন। কিন্তু গান্ধারী এবং কৃষ্ণের বিপরীতমুখী প্রয়োজনে ঘোর সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। তাহাতেই কৃষ্ণচরিত্র গান্ধারী যেরূপ সহজে বুঝিয়াছিলেন, অন্যে সেরূপ বুঝিতে পারেন নাই। ইহাতেই অল্পমাত্র কয়টী কথাতেই শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছিলেন। যদুপতি ঈশ্বরাবতার কিম্বা অসাধারণ নীতিকুশল হইলেও নিরুত্তর। অবশেষে শূন্যহৃদয়ে মনস্বিনী সাধ্বী গান্ধারীর অভিসম্পাত শিরোধার্য্য করিয়াও "যদুবংশের ক্ষয় অনিবার্য্য তাহা পূর্ব্বেই জানি, আপনার শাপে আর বেশী কি হইবে" বলিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। "শ্রীকৃষ্ণ! তুমি ইচ্ছা করিলেই উভয় কুলে শান্তি স্থাপন করিতে পারিতে, কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই কর নাই" গান্ধারীর এইরূপ ভাবযুক্ত স্বল্পাক্ষর উক্তিতেই কৃষ্ণ হৃদয় প্রকাশিত হইয়াছে। সেইরূপ সংঘর্ষে বর্ত্তমান ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লেখকদিগের প্রয়োজন প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তাঁহাদের কথা কাহারও সত্য তথ্য আবিষ্কারে যত্ন, কাহারও বা তাহাতে কলঙ্ক নিক্ষেপ দ্বারা সাধারণে প্রতিপত্তি লাভই প্রয়োজন। কিন্তু শেষোক্ত প্রয়োজন সাধনের সময় কেহ কেহ যে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া থাকেন ইহাই দুঃখের বিষয়। তিনি যে প্রবাদকে অবিশ্বাস করেন, স্থল বিশেষে তাহার আশ্রয় লইয়া প্রধান সম্মানিত বংশের কুলে কালী দিতেও বিমুখ হন না।

বর্ত্তমান বর্ষের সাহিত্য পত্রিকার "সিরাজচরিত্র" লেখক সিরাজের ইন্দ্রিয়পরায়ণতা প্রমাণ করিতে গিয়া প্রসিদ্ধ নাটোর বংশের প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর বিধবা কন্যা তারাকে লইয়া যে কয়টী কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ধৃষ্টতার একশেষ হইয়াছে। "সিরাজের করালকবল হইতে রাজকুমারী তারার উদ্ধারের কথা নানারূপে কথিত হইলেও বাঙ্গালী পাঠকের তাহা অবিদিত নাই।" * এই শেষোক্ত কুটিল ঈঙ্গিত করিবার প্রমাণ কি তিনি পাইয়াছেন? আর, জন-প্রবাদে এ বিষয়ে তাঁহার ঈঙ্গিতের অনুকূলে কিছু আছে বলিয়া কোন্ পাঠকই বা জ্ঞাত আছেন? এরূপ স্থলে সাপ লইয়া খেলা করা তাঁহার সুবুদ্ধির কার্য্য হয় নাই। তিনি "ধান ভানিতে মহীপালের গীত" আরম্ভ করিয়া আপন ধৃষ্টতার একশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; ঈঙ্গিতে রাজকুমারীর কলঙ্ক প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন কি না, প্রস্তাবিত কয় পংক্তি পাঠ করিলেই প্রতিপন্ন হয়। অবশ্য মোসলমানকুলোদ্ভব "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরও বা" আকবরের কীর্ত্তিকাহিনী কাহারই অবিদিত নাই। তথাপি আকবরকে মোগল কুলে প্রহ্লাদ বলিয়াছেন। ইহাতে বালক সিরাজের ইন্দ্রিয়পরায়ণতা অধিক কলঙ্কের নহে। হুসেন কুলি যেরূপ পাপিষ্ঠ, তাহাতে সিরাজের মত ক্ষমতাশালী লোকের তৎকালীক পদ্ধতিমতে তাহাকে সবংশে নিধন করা আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে।

আর একটা কথা, মুতাক্ষরিণকার সিরাজের কুটুম্ব হইলেও মিরজাফরের নবাবী আমলের নিমকের বলে ও কোম্পানীর প্রদত্ত বৃত্তির উৎসাহে যে সিরাজের মস্তকে অযথা কলঙ্ক আরোপ করেন নাই, তাহারই বা প্রমাণ কি? যে দেশে সম্পত্তির জন্য মার কলঙ্ক, পুত্রের মুখে বিচারালয়ে পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়, সে দেশে মিরজাফরের নিমক খাইয়া মুতাক্ষরিণকার যে তাদৃশ ঘৃণিত কার্য্য করিতে প্রয়াসী হন নাই, তাহারই বা প্রমাণ কি? ক্রমে প্রবন্ধ বাড়িয়া গিয়াছে, নতুবা প্রতিবাদকের প্রমাণের বিরুদ্ধে আরও অনেক কথাই বলা যাইতে পারিত।

শ্রীগিরীশচন্দ্র লাহিড়ী।

* সাহিত্য—বৈশাখ, ১৩০৬—৫১ পৃষ্ঠা।

—০—

পুস্তক সমালোচনা।

পদ্মা।*

বাঙ্গালা দেশে শুধু গীতি কবিতার প্রাচুর্য্য লক্ষ্য করিয়া সমালোচকগণ মধ্যে মধ্যে দুঃখ করিয়া থাকেন; যে ক্ষেত্রে ইক্ষুই বেশী জন্মে, সে স্থানে শাল সেগুণ না জন্মিলে আক্ষেপ করিবার কারণ কি? প্রকৃতি স্থান বিশেষ কি দ্রব্য বিশেষে যাবতীয় উৎকৃষ্ট গুণ আবদ্ধ রাখেন নাই; সুতরাং কোমল কুসুমে বনস্পতির দৃঢ়তা নাই বলিয়া গাঁথা মালা পদ দলিত করা উচিত হইবে না। বঙ্গদেশে যদি

* পদ্মা—শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত, কলিকাতা ২৬ নং স্কটস্ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ১॥০ টাকা।

জয়দেব, চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিগণের সময় হইতে সরস্বতীর কোমল মূর্ত্তিই পূজিত হইয়া থাকে এবং এ দেশে যদি কবিতাদেবী কোমল বণিতারূপেই বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়া থাকেন, তবে তাহাতে ক্ষোভের কারণ কি? যদি ইক্ষু ভিন্ন এখানে অন্য কোন ফসলের ভাল উৎপত্তি না হয়, তবে আমরা তাহা লইয়াই জগতের বিপণিতে উপস্থিত হইব; বসোরা ত গোলাপের জন্যই বিখ্যাত, বঙ্গদেশও গীতি কবিতার জন্য প্রসিদ্ধ থাকিবে।

বস্তুতঃ বাঙ্গালীর জীবনে যশঃস্পৃহা, দেশহিতৈষণা ভুবন বিজয়ী প্রতাপ অর্জ্জন প্রভৃতি উচ্চাকাঙ্ক্ষার সমারোহ কিছু মাত্র দেখা যায় না। আমাদের দাম্পত্য গৃহে নানারূপ উজ্জ্বল মধুর আনন্দের উৎস আছে, দেবতার নিকট ভক্তিময় প্রণাম ও আত্মসমর্পণ আছে এবং রোগ শোক দারিদ্র্য পীড়িত পর্ণকুটীরে করুণ মর্ম্মের বিলাপ-লহরী আছে। এ উপকরণ গীতি-কবিতার; আমরা কাব্য ও নাটকের উপযোগী গূঢ় মহিমা যুক্ত বৈভব কোথায় পাইব? রামায়ণ ও মহাভারতের বীররস অভিনেতাগণ আমাদের রঙ্গমঞ্চে উদ্ভট গুম্ফের স্তরে অর্দ্ধ পরিব্যক্ত ভ্রুকুটি দেখাইয়া হাস্যাস্পদ হন, কিন্তু যখন করুণ রসের পালা আরম্ভ হয়—তখন আমাদের গ্রামের অশিক্ষিত কবিগণও বৃদ্ধ বাল্মীকি এবং ব্যাসের কথা গুলিতে প্রাণ ঢালা নূতন ক্রন্দনের তান জুড়িয়া দেন, তৎশ্রবণে শ্রোতাগণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিভোর হইয়া পড়েন। আমরা কখনও সাহেবী কোটপ্যান্টে, কখনও মুসলমানী ইজার চাপকানে, কখনও ইংরেজী বক্তৃতায় বা পার্শীর বয়েৎ দ্বারা যে সকল ভাবের অভিনয় করিতে যাই, তাহা ব্যঙ্গ কবিতার সৃষ্টিপক্ষে কিছু সহায়তা করিতে পারে এই পর্য্যন্ত।

গীতি কবিতায়ই আমরা সিদ্ধ হস্ত, গীতি কবিতা দ্বারাই বঙ্গীয় কবির লেখনী মাল্য চন্দন অর্জ্জন করিয়াছে; সে সব পুরাতন কবিগণ ত নির্ম্মল ও উচ্চ প্রেমের কাহিনী গাহিয়া গাহিয়া বাঙ্গালীকে এত দিন মুগ্ধ রাখিয়া ছিলেন, বৈষ্ণব কবি লেখনী ধরিলেই নায়িকার জন্য অজস্র উপমা রাশি নির্গত করিতে থাকিতেন; তৎপ্রসঙ্গে Butler এর Hudibras এর চেষ্টা মনে পড়ে—

"For rhetoric he could not ope
His mouth but out flew a trope."

সেই এক ঘেয়ে মৃদঙ্গনাদসমন্বিত পীযূষ মাখা প্রেম-গীতির আস্বাদন করিতে করিতে বাঙ্গালী পাঠকের অতি মিষ্টাহারে বীত-স্পৃহা জন্মিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, বাঙ্গালী কবিগণ অন্যান্য বিষয়ে একটু মনোযোগী হইয়াছেন। শুধু শর্করা আর ভাল লাগে না; সেই শত বার শ্রুত, পুনশ্চ শ্রুত, পূর্ব্বরাগ, কারণ মান, অকারণ মান, ভবন বিরহ, সম্ভোগ মিলন, রসোদ্গার, অভিসার, দানলীলা, মাথুর, বিরহান্তে পুনর্মিলন আর কত বার শোনা যায়? এ সমস্ত গীতি লহরীতে লহরীতে প্রাচীন সাহিত্য ভাসাইয়া দিয়া গিয়াছে। এখন নবযুগ আগত; স্বদেশ প্রেম, জাতীয় উন্নতি, অসম্প্রদায়িক সুন্দর সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম-নীতি, প্রভৃতি উচ্চভাব জাতীয় জীবনে উদ্রিক্ত হইয়াছে; এখনও কিন্তু এই সব ভাব সম্বন্ধে জীবনে কোন কৃতকার্য্যতা লাভ হয় নাই, সুতরাং ঘটনাবহুল মহিমাদৃপ্ত কাব্য গ্রন্থ লিখিবার সময় আসে নাই। তবে অভিপ্রায় অঙ্কুরিত হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। একটি অপূর্ব্ব সংগীতের মত দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ কাহিনী বাঙ্গালী অতি সন্তর্পণে মনে মনে পোষণ করিতেছেন, সে ভাবটিও গীতি-কবিতার বিষয়ের অন্তর্গত। হেমবাবু যে তীব্র জ্বালাময়ী ভাষায় জাতিকে উদ্বোধন করিয়া ছিলেন, তাহা সংযত, সংশোধিত ও সুশৃংখল করিয়া স্বদেশানুরাগ প্রচার করিবার সময় হইয়াছে। বঙ্গদেশের কবিতার এই অভিনব যুগকে "রবিন্দ্রীয় যুগ" বলিয়া অভিহিত করা যায়।

আজ যে পুস্তকখানি সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার কোন কোন কবিতায় রবির কিরণ বড় স্পষ্টরূপে বিম্বিত হইয়াছে, কিন্তু এই নূতন কবি নবছন্দে, ভাষার অনন্যসাধারণ শব্দৈশ্বর্য্য দেখাইয়া যে সঙ্গীত-লহরীর সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, ইনি সুসঙ্গত মৌলিক রসধারায় বঙ্গসাহিত্য সমৃদ্ধ করিবার জন্য সম্পূর্ণরূপে শক্তিশালী; তিনি "মধুর করুণ রস অধিশ্বরি" বলিয়া বঙ্গভাষাকে আবাহন করিয়াছেন, আমাদের বোধ হয় যেন তিনি সেই সব গুণ নিজে আয়ত্ত করিয়াই এ ক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াছেন। বঙ্গভাষা সম্বন্ধে কবিতাটির কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"ছিলা মুগ্ধা কামপুষ্পিত শয়নে,
শিরীষ কোমল বচন রচনে,

ভাঙ্গিল কুহক দুন্দুভির স্বনে
জাগিয়া উঠিলে কবে?
রৌদ্র, বীররসে উঠিলে মাতিয়া,
বাঁশরী আলাপ ক্ষণেক ভুলিয়া,
তেজস্বিনী সমা দিলে কাঁপাইয়া,
বিস্ময় মানিনু সবে।
* * * *
আবার যথায় ব্রজ কুঞ্জবন,
"ললিত লবঙ্গলতার শীলন"
ভুলিয়া, শুনিব গাহিছে কেমন
তোমার বৈষ্ণব কবি।
"সহিতে না পারি মুরলীর ধ্বনি"
প্রেমে মাতোয়ারা ধায় গোপধনি
দেখিব তথায় রাজা ব্রজমণি
ভক্তের মাধুর্য্য ছবি!
প্রতীচ্য প্রাচ্যের ভাব সংমিশ্রণে
সেজেছ কি এক অপূর্ব্ব ভূষণে;
ধ্রুব জ্যোতি সম উজলি কিরণে
সাহিত্য জগদাকাশে।
মধুর ভাণ্ডার আনিলে লুটিয়া,
ত্রিদিবের গন্ধ আনিলে বহিয়া
নব আনন্দে উঠিলে ফুটিয়া
কোমল কোরকাবাসে!
অয়ি সালঙ্কারে! স্বভাব সুন্দরি!
মধুর করুণ-রস অধিশ্বরি!
কবিতার চির প্রিয় সহচরি!
আরো এস চলি কাছে!
ধন্য, ধন্য, হে ভাব বিচিত্রে।
নহ তুমি দীনা,—তব ছত্রে ছত্রে
যৌবন পুলক; তব পত্রে পত্রে
বসন্ত চুমিয়া আছে।

পাঠক দেখিবেন জয়দেবের "ললিত লবঙ্গলতা"র সঙ্গে নব কবির "কামপুষ্পিত শয়নে" ও "বসন্ত চুমিয়া আছে" প্রভৃতি কেমন এক তানে মিশিয়া কোমল মধুর হইয়াছে। প্রমথ বাবুর স্বদেশীয় সঙ্গীতগুলির মুক্ত উচ্ছাস ব্যাকুল প্রাণের তৃষা ও অবলীলাময় ছন্দসম্পদে পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট হইবে। "তোরা দেখিস্ কি আর" কবিতায় স্বদেশীয় ভ্রাতাগণকে যে তিনি ভৈরব রাগে ঝঙ্কৃত তীব্র ও মধুর গঞ্জনা দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের স্বদেশ দুঃখে কাতরতা ও গভীর ভালবাসা প্রীতি মিশ্র ক্ষোভের সহিত পাঠকের নিকট বহিয়া আনিয়াছে। নিম্নে দুইটী অংশ উদ্ধৃত হইল ঃ—

"তোরা দেখিলি ত চেয়ে, গেল ওরা চলে;
তোদিগে' ছলি,' চরণে দলি!
কালের উন্নতি স্রোতোমুখে গিয়া,
ওই যায় ওরা ভরা পাল দিয়া;
গর্ব্বভরা প্রাণ উঠিছে ফুলিয়া
হর্ষে উছলি।
তোরা তরঙ্গে ডরালি, ওরা তাই দেখে
ঐ খল খলি
হাসে কেবলি!
* * *
এ যদি না পার, অদৃষ্টেরে দোষি, চল,
পাতাল খুঁজি, যা আছে পুঁজি—
কোথায় সে কোন শতস্তর তলে
রবি শশি হীন ছন্ন রসাতলে,
ঘুমায়ে থাকি গে' নিরয় কবলে,
মাথাটি গুঁজি!
তোরা দেখিস কি আর! আছে আরো বাকি
ডুবিতে বুঝি,
মরিতে বুঝি!

পদ্য কাব্যের শব্দ গুলির পশ্চাতে একটি ঝঙ্কার আছে, তাহা শুনিয়া অর্থ পরিগ্রহ হইবার পূর্ব্বে কর্ণ মুগ্ধ হইয়া যায়; প্রেমের কথা অপেক্ষা স্বদেশের কথা বলিতেই কবি বিশেষ পটু, তথাপি তাঁহার প্রেমগীতি গুলিও বেশ সরস হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে, কোন কোন কবিতায় গানের ধ্বনি কবিতার ছত্র হইতে বিচ্ছুরিত হইতেছে, "উৎকণ্ঠিত" শীর্ষক একটি প্রেমগীতি এস্থলে উদ্ধৃত হইল ঃ—

"সখি, যদি ফিরে দেখা হয় একদিন
বসন্ত প্রভাতে;—
অদর্শনে সন্ধ্যা বেলা, খেনে কি যাইত খেলা?
রহিতে কি অশ্রুমুখী প্রমোদের রাতে!
ব'লো ব'লো সলজ্জ ছলনে,
সেই দিন মধুর মিলনে!
চাহিবে কি স্নিগ্ধ চক্ষে? মরমের ভাষা
ফুটিবে তখন?
পরিবে কি নববেশ, চিক্কণ কুঞ্চিত কেশ
গণ্ড ঝাঁপি নামিবে কি চুমিতে চরণ,
মধুরিমা বিকাশি আননে!
সেই দিন মধুর মিলনে?

কি ভাবে হেরিবে ধরা! স্বভাবের শোভা
মঞ্জু কুঞ্জ বন?
সে দিন কুসুম ফুটি, উল্লাসে পড়িবে লুটি
বিচ্ছুরি কি ধরণীর শ্যাম আস্তরণ
হেলি দুলি সোহাগ পবনে।
সেই দিন মধুর মিলনে?
কেমনে যাইব কাছে, কি আমি শুধাব?
কি হবে সম্ভাষ!
শত অপরাধী হিয়া, রবে পদে লুটাইয়া;
সলজ্জ অপাঙ্গে চাহি হরিবে কি ত্রাস
অধরান্তে মৃদু হাস্য সনে!
সেই দিন মধুর মিলনে?
ভিক্ষারে ভেবোনা ছেলে খেলা, ক'রো ক'রো
সংশয় ভঞ্জন!
তব সে করুণা স্পর্শে, শিহরি শিহরি হর্ষে
স্মৃতির নিকুঞ্জে মোর উঠিবে গুঞ্জন!
মর্ত্ত্যে স্বর্গ হেরিব নয়নে,
সেই দিন মধুর মিলনে!
যদি নাহি হইবে সদয়, নাহি দিও নিঠুর দর্শন!
আশারে দুরাশা ভাবি', অনন্ত বিরহ যাপি'
মুগ্ধ আমি দুঃখে সুখ করিব সৃজন!
জাগিব না নিষ্ফল স্বপনে,
সেই দিন মধুর মিলনে!"

এইরূপ কবিতাগুলির ছন্দোবদ্ধ পংক্তি নিচয় হইতে কণ্ঠস্বরের লীলাজনিত মাধুর্য্য ক্ষরিত হইতেছে। স্ব-জাতিকে উদ্বোধন করিতে যাইয়া কবি যে সকল গীতি লিখিয়াছেন, তাহাতে গান ও চীৎকার এই দুই অসদৃশ দ্রব্য এক মর্ম্মস্পর্শী পরিবেদনার ছন্দে আবদ্ধ হইয়া তীব্র ও মধুর রসের উৎস স্বরূপ হইয়াছে। 'প্রার্থনা' নামক দীর্ঘ কবিতাটির প্রায় সমগ্র অংশ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সমালোচনা কালে গত ভাদ্র মাসের নব্যভারত পত্রিকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমরা পাঠকগণকে সেই কবিতাটি পড়িতে অনুরোধ করি।—

"রুদ্র মন্দ্রে বঙ্গ সিন্ধু আসুক তাণ্ডবে
লক্ষ ফণা তুলি!
মহা ধৈর্য্য ভাঙ্গি, ধরা জাগুক আক্রোশে
ডগমগে দুলি'।
নভশ্চর নীরে চর অন্তিম আতঙ্কে
উঠিবে শিহরি
অনুতপ্ত বিপন্ন মানবে লুটাইবে
হাহাকার করি'।
শেষে সংহারিয়া, আদেশিও বিধিরে
হইতে সুধীর
কালাগ্নিরে শোভিতে সুন্দর সুশীতল
বহিতে সমীর!"

প্রভৃতি পড়িলে অনুমিত হয়, এই গীতি কবিতাগুলির একটি প্রখর শক্তিশালী মেরুদণ্ড আছে, তদভাবে অনেক গীতি কবির রচনা কোমল ও সুন্দর হইয়াও ভুঁইচাঁপার ন্যায় মাটী ফুঁড়িয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে না; প্রমথ বাবুর মৃদুতম গীতিগুলির মধ্যেও এক স্থির ধৈর্য্য ও দৃঢ় একাগ্রতা বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার প্রতিভার কাব্য গঠনোপযোগী শক্তি প্রদান করিতেছে। প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিয়া কবি বলিতেছেন,———

"উদ্দামঝঞ্ঝা, জলদ গর্জ্জন
বর্ষণ ঘন, অনুভাকম্পন,
পুষ্পিত বীথি, বিটপী নর্ত্তন
কহ্লার ভরা সরসী,
প্রভাত শান্ত গোধূলি মলিন,
মধ্যাহ্ন দীপ্তি, নিশা স্বপ্নলীন,—
বৈচিত্র্যে নিত্য রাখিছ নবীন,
কোমল করে পরশি'।
হাস—ঝরিবে মুকুতা সঘনে
চাহ—ভাতিবে চৌদিক কিরণে
গাহ—উঠিবে ঝঙ্কার ভুবনে
ভরিবে শূন্য সম্পদে!"

এই কবিতাটিও "কোমল ও প্রখরে"র মিশ্রনে সুন্দর হইয়াছে; শব্দের উপরে কবির যেরূপ অধিকার আছে, তাহা ক্ষুদ্র কবিতা "বাদলায়" ও বিশেষরূপ দৃষ্ট হয়, শব্দের নিপুন সন্নিবেশ হেতু মনে হয় যেন ছত্রগুলিতে বৃষ্টির টুপ টাপ শব্দ এবং বর্ষার জড় সিক্তভাব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

"ক্ষীণদীপালোক" দেখিয়া কবি নিজের সহিত উহার অবস্থার তুলনা করিয়া বলিতেছেন, অজ্ঞাত সূক্ষ্মরূপে ধীর প্রভাতে তৈলকণা লাভ করিয়া যেরূপে দীপটি পুষ্ট হইতেছে, প্রকৃতি যেন সেইভাবে "স্বপুরন্ধ্রপথে" "বিরাট সাম্রাজ্যের গূঢ়নীতিবিত্ত্ব" কিম্বা "কোন দুর্লভ কবিত্ব" কণা তাঁহাকে প্রদান করিয়া ধন্য করেন,—দীপটী যেরূপ

কণিকা মাত্র "তৈল" পাইয়া "আরো দাও" বলিয়া কামনা জানাইতেছে, তিনিও সেইরূপ প্রকৃতির কণিকা মাত্র অনুগ্রহ লাভ করিয়া অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় প্রকৃতির দ্বারে চির-যাচ্‌না জানাইতেছেন, নির্ব্বাণ পাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে যাচনার শেষ নাই। এই ভাবের কয়েকটি কবিতায় প্রমথ বাবুর কল্পনা তাঁহাকে বাস্তব সৌন্দর্য্যের অতীত এক অজ্ঞাত মনোরাজ্যে লইয়া গিয়াছে, পাঠক কবির সৃষ্ট এই ঊর্দ্ধ ব্যোমদেশে উঠিয়া নব আনন্দ লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই।

ক্রমশঃ—

———০———

মায়াবিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঈপ্সিত, চির-দয়িত, এস হে! নয়নের মণি, প্রাণের উত্তমার্দ্ধ, কোথায় তুমি! আমি তোমার পথ চাহিয়া, কোথায় তুমি! তুমি শুনিলে না, বুঝিলে না, আমার দিকে চাহিলে না—দেখ, আমি তোমার জন্য অস্থির চিত্ত হইয়া তোমার পথ চাহিয়া আছি। কখন তোমায় সকল কথা বলিতে পারি নাই, আজ বলিব। শুন——

এ কি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম? কাহার কণ্ঠস্বর আমার শ্রবণকুহরে বাজিতেছিল? কি এ প্রহেলিকা?

স্বপ্নের অপেক্ষা সত্য আরও প্রহেলিকাময়। আকাশে শুক্ল চতুর্দ্দশীর চন্দ্র উঠিয়াছে, পর্ব্বতের উপর দেবদারু বৃক্ষমূলে আমি শয়ন করিয়া রহিয়াছি। পর্ব্বততলে বিশাল হ্রদ বায়ুবিহনে নিস্তরঙ্গ, স্থির নির্ম্মল জলে শত শত চন্দ্রবিম্ব প্রতিবিম্বিত হইতেছে। জলে কুমুদ, কহ্লার, অগণিত লোহিত পদ্ম মুদিত, প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে—চারি দিকে নয়নাভিরাম অতি মনোহর অতুলনীয় দৃশ্য, ঘন নীল মহীরুহ সমাকীর্ণ তুঙ্গশিখর পর্ব্বতশ্রেণী, নিম্নে সেই স্নিগ্ধ শীতল দুরবগাহ সলিলরাশি, পার্শ্বে গাঢ় হরিদ্বর্ণ বহুদূর বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র—সর্ব্বোপরি ফুল্ল জ্যোৎস্নার মায়াময়ী ছায়া। এমন দৃশ্য কখন দেখি নাই। বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, এত বিচিত্র সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ কখন দেখি নাই। অতি গোপনে, এই দুস্তীর্ণ পর্ব্বতমালার অন্তরালে, প্রকৃতি কৃপণের মত এত ঐশ্বর্য্য সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। যে দিকে চাহিয়া দেখি সকলই নূতন, সকলই অলৌকিক। এমন পর্ব্বত, নদী, হ্রদ কোথাও দেখি নাই, এমন বৃক্ষ, এমন ফুল কোথাও দেখি নাই, এমন শস্য, এমন তৃণও কোথাও দেখি নাই। এ কোন্ মায়াপুরে উপনীত হইলাম? শীত এ পর্য্যন্ত আগত হয় নাই। শীতকালে তুষারে চারিদিক আচ্ছন্ন হয়, তখন এ স্থানে বাস অসম্ভব। অপরাহ্নে এই স্থানে উপনীত হইয়া পথশ্রান্তি অপনোদন করিবার মানসে এই মনোহর বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়াছিলাম। শয়ন করিয়া নিদ্রিত হই। নিদ্রাভঙ্গে দেখি রাত্রি হইয়াছে, অপহৃত দিবালোকের পরিবর্ত্তে জ্যোৎস্নালোকে প্রকৃতি সুষুপ্তির হাসি হাসিতেছে। আমি বিগত-নিদ্রালস্যজড়িত চক্ষে সেই অপূর্ব্ব নিসর্গ-সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম।

স্বভাবতঃই সে স্থানে মনুষ্যসমাগম বিরল। এক্ষণে নিশাকালে চারিদিক একেবারে নিস্তব্ধ। সহসা দূরাগত ক্ষীণ সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণে পশিল। ধ্বনি না প্রতিধ্বনি, না পূর্ব্বশ্রুত গীতের স্মৃতি মাত্র? আবার দূর হইতে গীত শ্রুত হইল, কণ্ঠধ্বনি নিকটে আসিতে লাগিল। চারিদিকে চাহিয়া কোথা হইতে সঙ্গীতের শব্দ আসিতেছে প্রথমে স্থির করিতে পারিলাম না। অবশেষে দেখিলাম, দূর হইতে তরণী আসিতেছে, হ্রদের স্থির জলে দূরে ছায়া দেখা যাইতেছে। সেই তরণী হইতে সঙ্গীতধ্বনি উঠিতেছে। আমি পর্ব্বত হইতে হ্রদের কূলে অবতরণ করিতে লাগিলাম, তরণী নিকটে আসিতে লাগিল। দেখিলাম অতি অপরূপ সুন্দরী যুবতীগণ ক্ষেপণী হস্তে নৌকা চালিত করিতেছে, মধ্যে এক সুন্দরী যুবতী বসিয়া গীত গাহিতেছে। তালে তালে ক্ষেপণী পড়িতেছে, তালে তালে চরণে নূপুর শিঞ্জিত হইতেছে, তালে তালে নৌকা চলিতেছে। এক পার্শ্বে এক তেজস্বী পুরুষ বসিয়া অর্দ্ধমুদ্রিত নয়নে সেই রূপভঙ্গ, ক্ষেপণীনিক্ষেপ দর্শন করিতেছে ও আলস্য সহকারে সেই গীত শ্রবণ করিতেছে। পার্শ্বে কয়েক জন অনুচর। স্বর উঠিতেছে পড়িতেছে, ক্ষেপণী উঠিতেছে পড়িতেছে, কণ্ঠ কম্পিত হইতেছে, স্থির জলে এবং বায়ুতে যেন স্পন্দন তরঙ্গ উঠিতেছে। জ্যোৎস্নায় ক্ষেপণী-স্রুত জলবিন্দু জলিতেছে, যুবতীদিগের অঙ্গের অলঙ্কার জ্যোৎস্নালোকে জলিতেছে। নৌকা কখন বামে কখন দক্ষিণে যাইতেছে, কখন ঘুরিতেছে, কখন জলের উপর নৃত্য করিতেছে, আর সেই নিস্তব্ধ আকাশ পরিপূরিত করিয়া, দূর পর্ব্বতগুহা প্রতিধ্বনিত করিয়া নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গীতধ্বনি উঠিতেছে।

এই ত কাব্যপরিচিত অপ্সরাপুরী! এই ত ইন্দ্রালয়! হয় ত চিরযৌবনসম্পন্না উর্ব্বশী এবং রম্ভা এই জ্যোৎস্নালোকে মানস সরোবরের বক্ষে গান করিতেছে! হয় ত এই পুরুষ স্বয়ং ইন্দ্র কিম্বা অর্জ্জুন তুল্য অতিথি! বিস্ময়ের উপর বিস্ময় উদয় হইতে লাগিল। এমন নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় নাই, কিন্তু মনুষ্যলোকে এমন রূপ ও ত কখন দেখি নাই! কে বলে গন্ধর্ব্বলোক পৌরাণিক উপন্যাস মাত্র? অপ্সরলোক ত প্রত্যক্ষ দেখিতেছি!

কৌতূহল আগ্রহে আমি জলের তীরে দাঁড়াইয়াছিলাম। তরণী আসিয়া সেই স্থানে লাগিল। তরণীতে উপবিষ্ট

সেই পুরুষ আমার দিকে কটাক্ষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কে?"

কয়েক জন অনুচর ও দাঁড়বাহিনী কয়েকটী রমণী নৌকা হইতে উঠিয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

একজন অনুচর ব্যঙ্গস্বরে কর্কশ ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুই?"

আমার পরিধানে গৈরিক বসন, মস্তকে দীর্ঘ রুক্ষ কেশ, এখনও জটা পড়ে নাই। কিছু সঙ্কুচিত, কিছু ভীত হইয়া বলিলাম, "আমি সাধু।" সাধু বলিতে সকল রকম বিরাগী সন্ন্যাসী বুঝায়।

অনুচরবর্গ হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহাদের দেখা দেখি স্ত্রীলোকেরাও হাসিয়া উঠিল। সঙ্গীত শব্দ যেমন মধুর ও কোমল শুনাইতেছিল, হাস্য ধ্বনি আর তেমন শুনাইল না। প্রথম প্রশ্নকর্ত্তা বলিল, "সাধুর ভেকে অনেক চোর বেড়ায়। তোকে ত চোরের মত দেখাইতেছে।" রমণীগণ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। নৌকায় বসিয়া পুরুষ সস্মিতমুখে রঙ্গ দেখিতেছিল।

আমি বিপদে পড়িলাম। ইহারা কে, কিছু জানি না। আমি সাধু না হই, নির্দ্দোষ পথিক, আমাকে বিদ্রূপ করিয়া ইহাদের কি লাভ? পুরুষ ও স্ত্রীলোক মিলিয়া যেরূপ করিয়া আমাকে ঘিরিয়াছে তাহাতে পলায়নও অসম্ভব। বলিলাম, "চোর হইলে কি আমি এই পর্ব্বতে বসিয়া থাকিতাম? আমি বিদেশী পথিক, এ স্থানে আজই আসিয়াছি। আমাকে তোমরা ত্যাগ কর, এরূপ করিয়া বিদ্রূপ করিও না।"

অনুচরগণ আমাকে আরও বিদ্রূপ করিতে লাগিল, রমণীগণ হাসিতে লাগিল। নৌকায় সে পুরুষ উপবেশন করিয়াছিল সে ডাকিয়া বলিল, "উহাকে নৌকায় লইয়া আইস।" অনুচরেরা বলপূর্ব্বক আমাকে ধরিয়া নৌকায় তুলিল। রমণীগণ পূর্ব্বের মত ক্ষেপণী ধরিয়া নৌকা গভীর জলে লইয়া চলিল।

যে রমণী গীত গাহিতেছিল সে আমার পার্শ্বে বসিল। আমার অঙ্গে তাহার অঙ্গ স্পর্শ হইল। চারিদিকে অপর রমণীগণ ঘিরিয়া বসিল। রমণীব্যূহের মধ্যে আমি বন্দী হইলাম। সেই পুরুষ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। পুনরায় গীতধ্বনি উঠিল—আলস্য লালসাপূর্ণ, কাতর প্রণয় সাধনার গীতি—কখন কণ্ঠ বাষ্পপূর্ণ হইয়া, রুদ্যমান হইয়া ভঙ্গ হইয়া যায়, কখন তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মত আসিয়া হৃদয়ে আঘাত করে, আবার করুণাকাতর রাগিণীতে হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে প্রবেশ করে। সঙ্গে সঙ্গে অলঙ্কার শিঞ্জন, হৃদয়ভেদী দীর্ঘ সুবর্ণশলাকার ন্যায় কটাক্ষ, অথবা কটাক্ষে বিদ্যুতের ক্ষণপ্রভা। থাকিয়া থাকিয়া রোমহর্ষক অঙ্গস্পর্শ, কখন পার্শ্বে রমণীর করতালিধ্বনি, কখন নূপুর নিক্কণ, কখন ক্ষেপণীর পতন শব্দ, কখন জলের মৃদু মৃদু ভঙ্গরব।

রূপ এবং সঙ্গীতের মোহ আমার চিত্ত হইতে তিরোহিত হইতেছিল। বিস্ময়, বিরক্তি এবং আশঙ্কা হৃদয়কে অধিকার করিতেছিল। এ পুরুষ কে? এই রমণীগণ কেন আমাকে বেষ্টন করিয়াছে? আমি রিক্তহস্ত উদাসীন, আমাকে লইয়া ইহারা কি করিবে? কোথায় আমাকে লইয়া যাইতেছে? কিছু স্থির করিতে না পারিয়া পূর্ব্বের ন্যায় নীরব রহিলাম। কিছু দূর গিয়া হ্রদের তীরে নৌকা লাগিল। তীরে অট্টালিকা। নৌকা ত্যাগ করিয়া সকলে সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। আমি অন্যত্র গমন করিবার মানসে অন্য দিকে গমন করিতে উদ্যত হইলাম। অমনি একটী যুবতী আমার হস্ত ধারণ করিল, বলিল, "কোথা যাও?"

আমি বলিলাম, "আমি বিরাগী, এ অট্টালিকায় প্রবেশ করিবার প্রয়োজন কি? আমি ভিক্ষা করিয়া দিনাতিপাত করি। তোমাদের মঙ্গল হউক, আমার হস্ত ত্যাগ কর, আমি অন্যত্র গমন করি।"

সেই যুবাপুরুষ এতক্ষণে প্রথমবার কথা কহিল, মধুর অথচ ব্যঙ্গস্বরে কহিল, "বিরাগীর পক্ষে অট্টালিকাও যেমন কুটীরও তদ্রূপ। যেখানে তোমাকে লইয়া যাইবে সেইখানে গমন করিবে।"

আর এক জন যুবতী দ্বিতীয় হস্ত ধারণ করিল। দেখিলাম, বল প্রকাশ বৃথা। যদি বলপূর্ব্বক রমণীদিগের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করি তাহা হইলে অনুচরগণ আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে। আমি বল প্রকাশ না করিয়া রমণীদিগের সহিত চলিলাম।

অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া দেখি প্রশস্ত কক্ষসমূহ বহুবিধ বহুমূল্য উপকরণে সজ্জিত। উজ্জ্বল আলোকে গৃহ আলোকিত হইয়াছে। রমণীগণ আমাকে লইয়া গিয়া একটী মনোহর কক্ষে উপবেশন করাইল। সে স্থানে সেই পুরুষ এবং তাহার অনুচরদিগকে দেখিতে পাইলাম না; কেবল কয়েকটী রমণী। তাহারা অত্যন্ত সমাদর পূর্ব্বক আমাকে অভ্যর্থনা করিল। এক জন আমাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া পার্শ্বের গৃহে হস্তমুখ প্রক্ষালনের নিমিত্ত সুবাসিত জল দেখাইয়া দিল। হস্তমুখাদি ধৌত করিয়া আমি সেই স্নানাগারের বহির্দ্বার মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলাম। দেখি, দ্বার বাহির হইতে বন্ধ। পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি দুইটী রমণী অন্য দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে, আমাকে ফিরিতে দেখিয়া একজন কহিল, "তুমি পথ ভুলিয়া গিয়াছ? ও দিকে পথ নয়, এ দিকে আইস।" আমি লজ্জিত হইয়া পূর্ব্বের গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

গৃহের মধ্যস্থলে রৌপ্য-থালায় নানাবিধ উৎকৃষ্ট আহার্য্য সামগ্রী সজ্জিত রহিয়াছে। রমণীগণ আমাকে আহার করিতে অনুরোধ করিল। সমস্ত দিন অনশনে গিয়াছিল, আহারের জন্য পীড়াপীড়ির প্রয়োজন হইল না।

আহারান্তে জল দেখিতে না পাইয়া পানীয় চাহিলাম। একটী রমণী সুরাপাত্র আনয়ন করিয়া আমার হস্তে দিল। আমি বিস্মিত হইয়া পাত্র তাহাকে প্রত্যর্পণ করিলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি জল চাহিতেছি, আমাকে সুরা দিলে কেন? সুরা আমার পানীয় নহে, আমাকে কিঞ্চিৎ শীতল জল দাও।"

রমণী বলিল, "সুরা এবং জল তোমার পক্ষে তুল্য। যাহা পাইবে তাহাই পান করিবে।"

আমি কহিলাম, "না, অমৃত এবং গরল তুল্য নহে। আমি কখন সুরাপান করিব না।"

"তবে শরবৎ আনিয়া দিই?"

"শুধু জল পাইলেই আমি চরিতার্থ হইব।"

দ্বিতীয় বার গিয়া রমণী শরবৎ লইয়া আসিল, জল আনিল না। অগত্যা আমি তাহাই পান করিয়া আচমন করিলাম। শরবৎ মিষ্ট, সুগন্ধ বিশিষ্ট, অত্যন্ত উপাদেয়, কিন্তু কিসের গন্ধ তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। আহারান্তে দুইটী রমণী আমাকে একটী রম্য শয়নগৃহে লইয়া গেল। প্রাসাদের ভিতরে প্রবেশ করিয়া পর্য্যন্ত কোন পুরুষ দেখিতে পাই নাই। ইহাতে আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম; কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই, প্রবৃত্তিও হইতেছিল না। শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া রমণীদ্বয় পর্য্যঙ্কে আমার জন্য শয্যা রচনা করিয়া দিল। একজন জিজ্ঞাসা করিল, "আর কিছু প্রয়োজন আছে?"

আমি বলিলাম, "না, এখন তোমরা যাও, আমি শয়ন করি।"

দ্বিতীয় রমণী কহিল, "পদ সংবাহন করিব? তাহা হইলে উত্তম নিদ্রা আসিবে।"

অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া কহিলাম, "না না, কিছু করিতে হইবে না, তোমরা আপন আপন স্থানে গমন কর।"

রমণীদ্বয় বাহিরে গমন করিলে অত্যন্ত সাবধানে দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমি শয়ন করিলাম। পর্য্যঙ্কে শয়ন না করিয়া ভূতলে শয়ন করিলাম।

অলক্ষ্যে বাদ্যধ্বনি উঠিল। অতি মৃদু মৃদু, ধীরে ধীরে কোথায় বাদ্য বাজিতে লাগিল। ধীরে ধীরে আমার দেহে যেন মাদকতার মত সেই শব্দ প্রবেশ করিতে লাগিল। তৎপরে যে অবস্থা উপস্থিত হইল তাহা নিদ্রা কি তন্দ্রা কিম্বা জাগ্রতাবস্থায় স্বপ্ন মাত্র তাহা এ পর্য্যন্ত নিরূপণ করিতে পারি নাই। সেই শ্রুতিমধুর শব্দ যেন ক্রমে দূরে যাইতে লাগিল, অবশেষে মিলাইয়া গেল। সহসা চক্ষে যেন তীব্র আলোক পতিত হইল, চক্ষু উন্মীলিত হইল। দেখি, শয়নগৃহ মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখর আলোকে ঝলসিত হইতেছে। সে আলোক চক্ষে সহ্য হইল না, চক্ষু মুদিত করিলাম। আবার চক্ষু খুলিলাম—দেখিলাম আলোকের তেজ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছে। ক্রমে জ্যোতি কোমলতর হইতে লাগিল, কভু নীল, কভু লোহিত, কভু হরিদ্রাবর্ণ—আলোক নানা বর্ণ ধারণ করিতে লাগিল। অকস্মাৎ সেই আলোকে দুইটী অপ্সরাতুল্য কিশোরী নৃত্য করিতে করিতে আমার সম্মুখে উপনীত হইল। পদক্ষেপ এত লঘু যে ধরণীতে পড়িতেছে কি না বুঝিতে পারা যায় না। তাহারা কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিল, এরূপ প্রশ্ন আমার মনে একবারও উদয় হইল না। নর্ত্তকীদ্বয় সহসা অদৃশ্য হইল। নির্ঝর শব্দ শুনিতে পাইলাম, কোথায় যেন ঝর ঝর রবে অবিশ্রান্ত জল পড়িতেছে। বিহঙ্গ কাকলী যেন কাননে শ্রুত হইল। কত পুষ্পের সুগন্ধ বহিয়া আসিতে লাগিল, কত রূপের ছবি চক্ষের সম্মুখে আসিল, কত আনন্দ-অভিনয় হৃদয়কে পুলকিত করিতে লাগিল। সহসা ঝটিকার সম্মুখে প্রদীপের ন্যায় সমস্ত নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। অন্ধকারে আমি স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। সে অবস্থাও জাগরণের অথবা সুষুপ্তির তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

গভীর রাত্রে, কিম্বা রাত্রিশেষে, অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল। এবার একেবারে সংশয় রহিত হইলাম। দেখিলাম, মাণিক্যখচিত সুবর্ণপ্রদীপ হস্তে অবগুণ্ঠনবতী রমণী আমার শিরোদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমি শয্যা ত্যাগ করিয়া, অর্থাৎ গালিচামণ্ডিত গৃহতল হইতে, একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। এ রমণী কেমন করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল? দ্বার যেমন রুদ্ধ ছিল সেইরূপ রহিয়াছে, অন্য কোথাও প্রবেশ পথ দেখিতে পাইলাম না। এমন সময় রমণী জিজ্ঞাসা করিল, "পথিক, রাত্রে উত্তম নিদ্রা হইয়াছিল?"

দেবী সরস্বতীর পদ্মাঙ্গুলির আঘাতে যেরূপ বীণা ঝঙ্কার দিয়া উঠে, রমণীর বাক্যে আমার হৃদয়ে সেইরূপ ঝঙ্কার উঠিল। মানবকণ্ঠে যে এরূপ মধু থাকে পূর্ব্বে তাহা জানিতাম না। কেবল স্বর মিষ্ট নহে। যেন সেই কণ্ঠ শুনিবা মাত্র কত পূর্ব্বস্মৃতি মনে উঠিতে লাগিল, যেন ভবিষ্যতের স্বর্ণদ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া গেল, যেন হৃদয়ের মূলকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। আমি রমণীর কথায় উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি এখানে কেমন করিয়া আসিলে?"

অবগুণ্ঠনের অন্তরালে মনে হইল রমণী যেন মৃদু মৃদু হাসিল। সেই অমৃতনিস্যন্দিনী স্বরে কহিল, "এ আমার গৃহ। আমার গৃহে যেখানে যখন ইচ্ছা যাইতে পারি। তুমি পর্য্যঙ্ক ত্যাগ করিয়া ধরণীতে শয়ন করিয়াছিলে কেন?"

প্রশ্নের উত্তরে আমি পুনরায় প্রশ্ন করিলাম, "তুমি কে?"

উচ্ছ্বসিত জলতরঙ্গের ন্যায় রমণী হাসিয়া উঠিল, কহিল, "আমি গৃহকর্ত্রী। যে প্রশ্ন তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ তাহা আমারই জিজ্ঞাসা করা শোভা পায়। তুমি কে?"

"আমি পথিক, ভিক্ষুক। আমাকে বন্দী করিয়া তোমার কি ফল হইবে?"

রমণী আবার হাসিল, বলিল, "বন্দীর কি এইরূপ শয়ন গৃহ? এ গৃহে কি তোমার সহিত বন্দীর ন্যায় আচরণ হইয়াছে?"

''আমি বৈরাগ্যব্রতাবলম্বী, বিলাস চাহি না। আমাকে বলপূর্ব্বক এ গৃহে লইয়া আসিয়াছে। যদি তুমি এই গৃহের কর্ত্রী হও ত আমাকে মুক্ত করিয়া দাও, আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া যাই।"

"আইস, তোমাকে মুক্ত করিয়া দিতেছি," বলিয়া রমণী গৃহের প্রাচীরে হস্তস্পর্শ করিল। তৎক্ষণাৎ প্রাচীরে একটী দ্বার মুক্ত হইয়া গেল। এ কৌশল না দেখিলে প্রত্যয় করা যায় না। রমণী সেই দ্বার দিয়া বাহির হইল, আমি তাহার পশ্চাৎ নিষ্ক্রান্ত হইলাম। পশ্চাৎ হইতে দেখিলাম রমণীর আপাদমস্তক বিচিত্র শুভ্র বসনে আচ্ছাদিত, কোমল পদক্ষেপে গমন করিতে লাগিল। কয়েকটী কক্ষ অতিক্রম করিয়া রমণী আর একটা দ্বারের সম্মুখে উপনীত হইল। আমার নিকটে আসিয়া আমার কর্ণে মৃদু মৃদু কহিল, "এই দ্বার খুলিলেই তুমি যথেচ্ছা গমন করিতে পার। যাইবার পূর্ব্বে কোন কথা বলিবার নাই?"

আমার শরীর পুলকাঞ্চিত হইল। কহিলাম, "একটা কথা——" যাহা বলিতে যাইতেছিলাম বলিতে পারিলাম না। লজ্জায় অধোবদন হইলাম।

রমণী কহিল, "কি বলিতেছিলে, বল।"

আমি কহিলাম, "সে কথা বলা আমার পক্ষে পাপ। তুমি দ্বার মুক্ত কর, আমি বাহির হইয়া যাই।"

রমণী আবার আমার কানে কানে বলিল, "আমি বলিব? তুমি যাইবার পূর্ব্বে একবার আমার মুখ দেখিতে চাও।"

এই ইচ্ছাই আমার মনে উদয় হইয়াছিল। কোন কথা কহিতে না পারিয়া আমি মস্তক অবনত করিলাম।

রমণী কহিল, "এ ইচ্ছা তোমার আজ নূতন হয় নাই। এ দিকে দেখ।"

পার্শ্বে একটা দ্বার মুক্ত করিয়া রমণী একটী গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার অনুজ্ঞা মত আমিও সেই গৃহে প্রবেশ করিলাম। রমণী প্রদীপ তুলিয়া দেখাইল, গৃহের প্রাচীরে নানাবিধ, বহুসংখ্যক সন্ন্যাসীর বেশ রহিয়াছে। রমণী কহিল, "যাহারা এই বেশ ধারণ করিত তাহারা সকলেই আমার মুখ একবার দেখিতে চাহিয়াছিল। পার্শ্বের গৃহে দেখ!" সেই গৃহের পার্শ্বে আর একটী গৃহ। তাহার প্রাচীরে বহুসংখ্যক বহুমূল্য পরিচ্ছদ রহিয়াছে। রমণী কহিল, "ইহারাও সকলে আমার মুখ দেখিতে চাহিয়াছিল। তুমি আপনার বেশ ত্যাগ করিয়া অন্য বেশ ধারণ কর, পরে আমাকে অবগুণ্ঠন মোচন করিতে বলিও।

আমি বিনয়পূর্ব্বক কহিলাম, "এরূপ কৌতূহল আমি ত্যাগ করিয়াছি। তোমাকে অবগুণ্ঠন মোচন করিতে হইবে না। দ্বার মুক্ত কর, আমি বাহির হইয়া যাই।"

রমণী কহিল, "এমন কথা আমাকে কেহ বলে নাই। সকলে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াই যে আমার মুখ দেখিতে পাইত তাহা নয়। কিন্তু তুমি আমার মুখ দেখিবার ইচ্ছাই ত্যাগ করিয়াছ। তোমার কথায় আমি প্রীত হইয়াছি।"

আমি কহিলাম, ''তোমার নিকট আমি মুক্তি প্রার্থনা করিতেছি, অপর কিছু প্রার্থনীয় নাই।''

রমণী আমার হস্ত স্পর্শ করিল—মলয়বাহিত সৌরভের ন্যায় মৃদুস্পর্শ, কিন্তু সেই স্পর্শে আমার আপাদমস্তক তীব্র বৈদ্যুতিক তরঙ্গে কম্পিত হইয়া উঠিল। মৃদু মৃদু, ঈষৎ কম্পিতস্বরে রমণী কহিল, "তুমি বার বার ঐ কথা কেন বলিতেছ? তুমি ত বন্দী নও যে মুক্তি প্রার্থনা করিতেছ। আর যদি বন্দীই হও ত রূপের, প্রেমের বন্দী, রমণীর কোমল বাহুলতার বন্দী, সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া পলায়ন করিতে চাহিতেছ কেন? আমি রূপসী কি কুৎসিতা না দেখিয়াই চলিয়া যাইবে?"

আমি কহিলাম, "রূপের মোহই যদি অন্বেষণ করিব তাহা হইলে এ বেশ ধারণ করিয়া এই দুর দেশে ভ্রমণ করিতেছি কেন? তুমি যে সকল কথা কহিতেছ তাহা শ্রবণ করাও আমার পক্ষে নিষিদ্ধ।"

রমণী কহিল, "তোমার নবীন যৌবন, বৈরাগ্যের কথাই তোমার মুখে কঠোর শুনায়। আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়, আইস আমি স্বয়ং তোমাকে পথ দেখাইয়া দিতেছি।"

দ্বার মুক্ত করিয়া রমণী প্রদীপ নির্ব্বাপিত করিল। দেখিলাম বাহিরে অল্প অন্ধকার, প্রভাত আগত প্রায়। রমণী আমাকে পথ দেখাইয়া অগ্রে চলিল। অল্প দূর গিয়া অতি মনোহর উদ্যানে প্রবেশ করিলাম। উদ্যানে লতাবেষ্টিত কুঞ্জগৃহের মধ্যে রমণী আমাকে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং পার্শ্বে বসিল।

আমি উঠিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু রমণী আমার হস্ত ধারণপূর্ব্বক আমাকে নিবারণ করিল। তাহার পর মৃদু মৃদু আমার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিল। ক্রমশঃ আমার চিত্ত বিহ্বল হইল। অবশেষে অস্থিরচিত্তে রমণীর হস্ত ধারণ করিয়া কহিলাম, "তোমার অবগুণ্ঠন মোচন কর, তোমার মুখ দেখিব। অতৃপ্তনয়নে কতক্ষণ তোমার অবগুণ্ঠন দেখিব?"

এই কথা আমি বলিবা মাত্র রমণী চকিতের ন্যায় আমার পার্শ্ব ত্যাগ করিয়া দূরে গিয়া দাঁড়াইল। মধুর ব্যঙ্গসূচক হাস্যধ্বনি শুনিতে পাইলাম। তাহার পর রমণী দ্রুতগমনে চলিয়া গেল।

প্রভাত হইয়াছে। সূর্য্যোদয়ের সূচনা হইতেছে। অকস্মাৎ মোহ ভঙ্গ হইয়া অত্যন্ত আত্মগ্লানি উপস্থিত

হইল। বেগে পলায়ন করিবার প্রয়াস করিলাম। কোথায় পলায়ন করিব? উদ্যানের চারি দিকে উচ্চ প্রাচীর, প্রাচীরের উপর উঠিবার অথবা তাহা লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই। ব্যর্থ প্রয়াস হইয়া উদ্যানের একান্তে উপবেশন করিলাম।

সূর্য্যোদয়ের কিছু পরে পূর্ব্বরাত্রির পরিচিত একটী যুবতী আমাকে ডাকিতে আসিল। তাহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "অবগুণ্ঠনবতী এই গৃহকর্ত্রী কে?"

যুবতী হস্ত দ্বারা আমার মুখ রোধ করিয়া কহিল, "ও কথা আর কখনও জিজ্ঞাসা করিও না। যদি নিজে জানিতে পার ত জানিবার চেষ্টা করিও। আর কাহারও কাছে জিজ্ঞাসা করিলে বিপদ ঘটিবে।"

যুবতীর মুখ দেখিয়া বোধ হইল বিদ্রূপ নহে। অগত্যা আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

দিবাভাগে অবগুণ্ঠনবতী রমণীকে আর দেখিতে পাইলাম না। রাত্রিকালে আমাকে গৃহের বাহিরে ডাকিয়া লইয়া গেল। আবার সেইরূপ জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। অট্টালিকার সম্মুখে সেই হ্রদ। সোপানশ্রেণীর তলে সেই তরণী রহিয়াছে। সেই পুরুষ সেইরূপ হাস্যমুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার সঙ্কেত মত তাহার পার্শ্বে গমন করিলাম। দুই জনে একত্রে সোপান অবতরণ করিতে লাগিলাম। পুরুষ কহিল, "তুমি এখনও বেশ পরিবর্ত্তন কর নাই?"

আমি কহিলাম, "কেন, বেশ কেন পরিবর্ত্তন করিব?"

পুরুষ কহিল, "এখানে যে আসে সেই করে। তুমি বাদ যাইবে কেন?"

আমি কহিলাম, "বল প্রয়োগ করিলে আমি নিরুপায়। কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক আমি কখন বেশ পরিবর্ত্তন করিব না।"

পুরুষ কহিল, "মূর্খ, আমিও তোমার মত একদিন ঐ কথা বলিয়াছিলাম।"

বিস্মিত হইয়া কহিলাম, "তুমিও বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছ? তুমিও কি অবগুণ্ঠনবতী রমণীর মুখ —— ?"

পুরুষের মুখ ভয়ে শুষ্ক ও মলিন হইয়া গেল। আমার কথায় বাধা দিয়া কহিল, "চুপ কর। ও সকল কথার কখন উল্লেখ করিও না।"

পূর্ব্ব রাত্রির মত জল-বক্ষে আবার সঙ্গীত-ধ্বনি উঠিল। সেইরূপ রূপের উচ্ছ্বাস, সেইরূপ তালের মিলন, তরণীর সেইরূপ আনন্দ-হিল্লোল। অবশেষে তরণী হ্রদের পর পারে উপনীত হইবা মাত্র আমি লম্ফ দিয়া তীরে উঠিলাম। কহিলাম, "তোমাদের আনন্দ তোমাদের থাকুক, আমি আর তোমাদের সঙ্গে যাইব না।" বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলাম। পশ্চাতে হাস্য তরঙ্গ উঠিল। ফিরিয়া দেখিলাম, রমণীগণ নৌকা হইতে উঠিয়া হাসিতে হাসিতে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে, অনুচরগণ বেগে ধাবিত হইতেছে। আমি যথাসাধ্য বেগে ধাবমান হইলাম, কিন্তু পথ আমার অপরিচিত, স্থান বন্ধুর, এরূপ স্থানে যাতায়াতের অভ্যাস নাই। অনুচরেরা অবলীলাক্রমে বেগে আসিতে লাগিল, তাহাদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশা ত্যাগ করিতে হইল। কিছু দূর উপরে উঠিয়া দেখি, নিকটেই কয়েকটী কুটীর। তখন আমি সহায়তা পাইবার আশায় উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিলাম। অনুচরেরাও আসিয়া আমাকে ধরিল।

এমন সময় কুটীর হইতে জটাজূটধারী কয়েকটী মহাকায় পুরুষ নির্গত হইলেন। আমার গৈরিক বেশ দেখিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে একজন অতি গম্ভীরস্বরে অনুচরদিগকে কহিলেন, "ইহাকে মুক্ত কর!"

তাঁহাদিগের বিশাল মূর্ত্তি দেখিয়া অনুচরগণ আমাকে ত্যাগ করিয়া বিষণ্নমুখে ফিরিয়া গেল। আমি সেই পুরুষদিগের অনুবর্ত্তী হইয়া কুটীরে প্রবেশ করিলাম।

——০——

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যে কুটীরে প্রবেশ করিলাম তাহার অভ্যন্তরে একজন সন্ন্যাসী উপবিষ্ট ছিলেন। মুখশ্রী অত্যন্ত প্রশান্ত, চক্ষু অত্যন্ত উজ্জ্বল। তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া আমি সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম। আমার সঙ্গে যে কয়জন সন্ন্যাসী ছিলেন তাঁহারা যাহা দেখিয়াছিলেন বিবৃত করিলেন। তাঁহাদের কথা শ্রবণ করিয়া আসনস্থ সন্ন্যাসী আমাকে কহিলেন, "কোন চিন্তা নাই, অদ্য রাত্রে বিশ্রাম কর। কল্য তোমায় সকল কথা জিজ্ঞাসা করিব।"

অনুচরগণ আরও লোকবল লইয়া আমায় না ধরিতে আইসে আমি সেই আশঙ্কা প্রকাশ করিলাম। সন্ন্যাসী কহিলেন, "কোন আশঙ্কা নাই, এ স্থান উপদ্রুত হইবে না। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া বিশ্রাম কর।

অপর সন্ন্যাসীরা আমাকে আর একটী কুটীর দেখাইয়া দিলেন। পর্ণশয্যায় শয়ন করিলাম।

প্রভাত হইলে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া নির্ঝরের জলে স্নান করিলাম। স্নানান্তে সন্ন্যাসী প্রদত্ত ফলমূল ভোজন করিলাম। পূর্ব্বোক্ত প্রধান সন্ন্যাসী সেই কুটীরে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলাম। তিনি ইঙ্গিত পূর্ব্বক আমাকে উপবেশন করিতে আদেশ করিলেন। আমি উপবিষ্ট হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ব্রহ্মচারী?"

আমি ব্রহ্মচর্য্য বা অন্য কোন আশ্রমই গ্রহণ করি নাই। সন্ন্যাসীকে প্রকৃত কথাই বলিলাম। বলিলাম, "এই বেশে ভ্রমণ করিবার সুবিধা, সেই জন্য গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিয়াছি। আমি নিঃস্ব পথিক মাত্র, নানা দেশে, নানা তীর্থে পর্য্যটন করিতেছি। এ পর্য্যন্ত কিছুই শিক্ষা হয় নাই।"

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বয়ঃক্রম অল্প দেখিতেছি, তুমি সংসার ত্যাগ করিলে কেন?"

সকল কথা আমি খুলিয়া বলিতে পারিলাম না। বলিলাম, "আনুপূর্ব্বিক সকল কথা আমি বলিতে পারিব না, আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। সংসারে সুখ না পাইয়া, বিরক্ত হইয়া আমি সংসার ত্যাগ করিয়াছি।"

সন্ন্যাসী স্মিতমুখে কহিলেন, "গোপনীয় কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না। সুখের সন্ধানই ভ্রম। সংসারের ভিতরেও সুখ নাই, সংসারের বাহিরেও সুখ নাই।"

আমি কহিলাম, "বিষয়ীর অপেক্ষা ত্যাগী যে অধিক সুখী তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "তাহা নহে। সুখকে ত্যাগ করিলে তবেই সুখ পাওয়া যায়। সুখ ত বাহিরে নাই। আপনাতেই সুখ। আপনার ভিতরে অনুসন্ধান কর, সুখ পাইবে। সে অনুসন্ধানের ক্ষমতা না থাকে যথাসাধ্য ইহজীবনের কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাও। নিষ্ঠাতেও তৃপ্তি আছে।"

উপদেশের উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া আমি নিরুত্তর রহিলাম।

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তোমার কি ইচ্ছা? এই আশ্রমে কিছু দিন অবস্থান করিবে, কিম্বা অন্যত্র যাইবে?"

আমি কহিলাম, "যদি অনুমতি হয় তাহা হইলে কিছু দিন আপনাদের আশ্রয়ে থাকি। যে দেশে উপস্থিত হইয়াছি একা ভ্রমণ করিতে কিঞ্চিৎ আশঙ্কা হয়।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "কেন, আশঙ্কা কিসের?"

পূর্ব্ব দুই দিবসে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল আদ্যোপান্ত কহিলাম। সন্ন্যাসী শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন, কহিলেন, "ইহা উপকথার মত শুনাইতেছে।"

আমি কহিলাম, "যাঁহারা কল্য রাত্রে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন তাঁহারা কতক স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। আমার মুখে যাহা শুনিলেন তাহা আমি না দেখিলে বিশ্বাস করিতাম না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "অবগুণ্ঠনবতী রমণী কে?"

"আমি কিছুই জানি না। তাহার মুখ পর্য্যন্ত দেখি নাই।"

সন্ন্যাসী মৌন হইলেন। কিয়ৎকাল পরে কহিলেন, "আমার সন্দেহ হইতেছে এই রমণী দ্বারা বহু অনিষ্ট ঘটিয়া থাকিবে।"

"আমার তাহাই বিশ্বাস।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "ইহার কি কোন প্রতিকার নাই?"

আমি কহিলাম, "রাজা না করিলে কে করিবে?"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমরা বলশূন্য, কিন্তু একটা স্ত্রীলোকের অত্যাচার কি নিবারণ করিতে পারি না?"

"কি করিবেন?"

"তাহাই ভাবিতেছি," বলিয়া সন্ন্যাসী মৌন হইলেন।

রাত্রে আমি শয়ন করিয়া আছি এমন সময় সন্ন্যাসী গাত্র স্পর্শ করিয়া আমায় জাগরিত করিলেন। মৃদুস্বরে কহিলেন, "উঠিয়া আমার সঙ্গে আইস।"

আমি বিস্মিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। কুটীর হইতে বাহির হইয়া সন্ন্যাসী হ্রদের অভিমুখে চলিলেন। হ্রদের সম্মুখে উপনীত হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায় যাইতেছেন?"

"সেই রমণীর গৃহের অভিমুখে। আমাকে পথ দেখাইয়া দাও।"

ভীত হইয়া কহিলাম, "আমি সে দিকে যাইব না। এবার ধৃত হইলে আর পলায়ন করিতে পারিব না।"

সন্ন্যাসী মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "কোন আশঙ্কা নাই, নিশ্চিন্ত হইয়া আমার সঙ্গে আইস।"

আজ রাত্রে সঙ্গীতের ধ্বনি নাই, হ্রদে তরণীর চিহ্ন নাই। অট্টালিকা কোন্ দিকে আমার স্মরণ নাই। সন্ন্যাসীকে কেমন করিয়া পথ দেখাইয়া দিব?

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমি তোমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছি। তুমি কেবল গৃহ চিনিয়া লইবে।"

সন্ন্যাসী অগ্রে চলিলেন, আমি তাঁহার পদানুসরণ করিলাম। বহুদুর গমন করিয়া দেখিলাম হ্রদের তীরে বৃহৎ প্রাসাদ জ্যোৎস্নায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমি কহিলাম, "এই বাড়ী।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমি এই গৃহে প্রবেশ করিব।"

তাঁহার কথা শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া আমি পিছাইয়া পড়িলাম। সন্ন্যাসী গৃহে প্রবেশ করিলে তাঁহার যাহাই হউক আমার সমূহ বিপদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা এবং দ্বিতীয় বার ধৃত হইলে কি দুর্গতি হইবে তাহাও জানি না। সন্ন্যাসীর কথায় আমার ভয় হওয়া বিচিত্র নহে। তিনি স্মিতমুখে কহিলেন, "তোমার মনে যদি শঙ্কা হয় ত গৃহের নিকটে অবস্থান করিও না। দুরে কোন এমন স্থানে গমন কর যেখান হইতে এ গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ ভয়ের কারণ হইলে সহজে পলায়ন করিতে পারিবে। আমার জন্য কোন চিন্তা করিও না।"

সন্ন্যাসীর কথার শ্লেষ বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু ভয় ত্যাগ করিতে পারিলাম না। তাঁহার কথা মত নগরের অভিমুখে কিছু দূর গমন করিয়া এক ছায়াবহুল বৃহৎ বৃক্ষতলে অবস্থান করিলাম। সে স্থান হইতে সেই গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং পলায়নের পথও অবারিত। ছায়ান্ধকারে আমাকে অদৃশ্য হইতে দেখিয়া সন্ন্যাসী গৃহে প্রবেশ করিলেন।

বৃক্ষতলে অন্ধকারে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া সেই সম্মুখস্থিত অট্টালিকানিহিত রহস্য চিন্তা করিতে লাগি-

লাম। কোন্ সাহসে সন্ন্যাসী সেই গৃহে একা প্রবেশ করিলেন? কিরূপেই বা সেই স্থান হইতে মুক্ত হইয়া আসিবেন! কে সেই রমণী? কিসের জন্য এরূপ করিয়া এমন স্থানে বাস করে?

রাত্রি বাড়িতে লাগিল। পথে পথিক নাই। হ্রদে তরণী নাই। চারিদিকে কেবল ভীতিসাধক অস্ফুট নিশীথধ্বনি। আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

অনুমান রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল। সহসা অট্টালিকা প্রবেশদ্বার মুক্ত হইল। সেই পথে সন্ন্যাসী বাহিরে আসিলেন। পশ্চাতে অবগুণ্ঠনাবৃতা সেই রমণী! সঙ্গে আর কেহ নাই। তাহারা নিষ্ক্রান্ত হইলে গৃহদ্বার পুনরায় রুদ্ধ হইল। সন্ন্যাসী স্থির অবিচলিত পদক্ষেপে আমার সন্নিধানে আগমন করিলেন। সঙ্কেতপূর্ব্বক আদেশ করিলেন, "আইস।" আমি তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলাম। রমণী পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল।

বিস্ময় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই রমণী ঐশ্বর্য্যশালিনী, দাসদাসীপূর্ণ অট্টালিকা ত্যাগ করিয়া কেন এই সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ আগমন করিতেছে? কিরূপ কৌশলে অথবা কোন্ বলে সন্ন্যাসী এই নারীকে কিঙ্করীর মত সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন! সন্ন্যাসীর মুখে কথা নাই। রমণীও নীরব। অন্ধকারে পদধ্বনি শুনা যায়। মনুষ্যের কণ্ঠধ্বনি কোথাও শ্রুত হয় না। বর্দ্ধিতকৌতূহল হইয়া আমি তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলাম। যে স্থান হইতে সন্ন্যাসী পূর্ব্বে আগমন করেন, সেদিকে ফিরিলেন না। হ্রদের কূল ত্যাগ করিয়া, লোকালয়ের অভিমুখ পশ্চাতে রাখিয়া, আর একদিকে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দুর গমন করিয়া দেখি, সম্মুখে অন্ধকার অরণ্য। সন্ন্যাসী নিঃশঙ্কচিত্তে সেই অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। রমণী একবার দাঁড়াইল। কিন্তু সন্ন্যাসী পশ্চাৎ ফিরিয়া তাহার প্রতি তীব্র কটাক্ষ পাত করাতে পূর্ব্বের ন্যায় নীরবে তাঁহার অনুগামিনী হইল। আমি রমণীর পশ্চাৎ অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। রাত্রি অন্ধকার। অরণ্যের বাহিরে অন্ধকার। অরণ্যের ভিতরে অতি গাঢ় সূচীভেদ্য অন্ধকার। পথ আছে কিনা দেখিতে পাওয়া যায় না। পথ থাকিলেও লক্ষ্য হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। কিন্তু সন্ন্যাসী পূর্ব্বের ন্যায় অভ্রান্ত অবিচলিত পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রমণী এবং আমি যথাসম্ভব তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম।

কিছুদুর এইরূপ গেল। ক্বচিৎ পেচকরব, বৃক্ষশাখায় বাদুড়ের পক্ষশব্দ, দুরে কখনও কোন নিশাচর শ্বাপদের হৃৎকম্পকারী গর্জ্জন। অকস্মাৎ অনতিদূরে আলোক দেখিতে পাইলাম। নিকটে উপনীত হইয়া দেখি, অতি প্রাচীন ভগ্নাবশিষ্ট মন্দির। পার্শ্বে ভগ্নচূড়া স্তূপাকারে পতিত রহিয়াছে। চারিদিকে অতি বিশাল বটবৃক্ষশ্রেণী। চারিদিকে জটা ভূমিতে পতিত হইয়াছে। মন্দিরের প্রকোষ্ঠে আলোক জ্বলিতেছে। সন্ন্যাসীর সহিত আমরা মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিলাম। আলোক প্রদীপের নহে—ভূগর্ভস্থ কোনরূপ প্রজ্জ্বলিত বাষ্প হইতে আলোক নির্গত হইতেছে। ক্ষীণ নীল শিখা। কখনও ম্লান, কখনও উজ্জ্বল। কখনও নির্ব্বাণোন্মুখ, কখনও জ্বালাময়। মন্দিরের বাহিরের যেরূপ ভগ্নাবস্থা, ভিতরে সেরূপ নহে। আয়তন বৃহৎ। কক্ষ অনেকগুলি আছে, এরূপ মনে হয়। আলোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসী কিছুকাল চিন্তা করিলেন। পরে আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "তিষ্ঠ" রমণীকে কহিলেন, "আমার সঙ্গে আইস"। কক্ষে দুই জন প্রবেশ করিলে দ্বার রুদ্ধ হইল। আমি বাহিরে সেই আলোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

আলোকের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া ক্রমে চিত্তের বিকৃতি জন্মিতে লাগিল। কোথায় আসিয়াছি, কাহার সহিত আসিয়াছি, সে জ্ঞান ক্রমশঃ লুপ্ত হইল। আলোকে নানাবিধ মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলাম। কখনও বালিকার অবয়ব, কখনও তরুণী, কখনও ভয়ঙ্কর নৃশংস পুরুষ মূর্ত্তি, কখনও আলোক এবং ছায়ার নৃত্য। ক্রমশঃ দৃষ্টি স্থির হইল। দেখিলাম, সম্মুখে রত্নময় পালঙ্কের উপর সুন্দরী রমণী শয়ন করিয়া রহিয়াছে। পালঙ্কের চারিপার্শ্বে মুগ্ধলোচনে বহুসংখ্যক পুরুষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রমণী চক্ষু উন্মীলন করিয়া চতুঃপার্শ্বস্থ পুরুষদিগকে দেখিয়া অল্প হাসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। আপাদমস্তক বসনে আচ্ছাদিত করিল। বস্ত্রাবরণে তাহার দেহ আন্দোলিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সেই আবরণ পুনর্মুক্ত হইল। কোথায় সে সুন্দরী নয়নমোহিনী রমণী! শয্যা হইতে অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ, নিঃশ্বাসিতা ফণিনী ফণা তুলিয়া দাঁড়াইল! আমি চীৎকার করিয়া পশ্চাতে সরিয়া আসিলাম।

সেই সময় কক্ষ দ্বার মুক্ত হইল। রমণী বেগে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ভয়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে। সন্ন্যাসী পূর্ব্বের ন্যায় অবিচলিত, বিশাল দেহ স্থির। অতি গম্ভীর বজ্ররবে কহিলেন, "অবগুণ্ঠন মুক্ত কর।"

কম্পিতহস্তে, ধীরে ধীরে, রমণী অবগুণ্ঠন মুক্ত করিল। আমার মত কত ব্যক্তি হয়ত বহু যত্ন করিয়াও এই রমণীর মুখ কখন দেখিতে পায় নাই। এখন সন্ন্যাসীর কঠিন আদেশে তাহার মুখ অনাবৃত হইল। আমি রুদ্ধনিঃশ্বাসে নির্নিমেষ লোচনে রমণীর মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম।

তেমন রূপ আমি কখন দেখি নাই, কেবল রূপ নহে, চক্ষে সেরূপ তীব্র জ্বালা পূর্ব্বে দেখি নাই। বুঝিতে পারিলাম যে যাহার এত রূপ সে ইচ্ছা করিলে বহু অনর্থ

ঘটাইতে পারে। পূর্ব্ব রাত্রে রমণীর গৃহে যে সকল পরিচ্ছদ দেখিয়াছিলাম তাহা স্মরণ হইল।

সন্ন্যাসী একবার রমণীর মুখের দিকে দেখিলেন, আর বার আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার পর রমণীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "তুমি ঐ রূপ লইয়া অসংখ্য লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছ। এই যুবক সন্ন্যাসী বেশে আসিয়াছিল, তুমি ইহারও বিপদের প্রয়াস পাইয়াছিলে। তোমার মত নারী বেশে রাক্ষসী আর আছে কি না জানি না, কিন্তু তোমার এই দুষ্ক্রিয়া যদি রোধ না করিতে পারি তাহা হইলে বৃথাই আমার সাধনা।"

সন্ন্যাসী রমণীর হস্ত ধারণ করিলেন; সে চীৎকার করিবার উপক্রম করিল, কিন্তু পারিল না। আমি মূঢ়ের মত চাহিয়া রহিলাম। রমণীর হস্ত ধারণ করিয়া সন্ন্যাসী একেবারে বেগে সেই স্বতঃপ্রজ্জলিত অগ্নি মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অগ্নি হইতে যখন আবার বাহির হইলেন, তখন দেখিলাম উভয়ের অবয়বে ও মুখে অতি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! সন্ন্যাসীর দেহ তপ্ত কাঞ্চনের মত শোভা পাইতেছে, মুখের জ্যোতি আরও উজ্জ্বল হইয়াছে। রমণীর মুখ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে রূপ দেখিয়া আমি এত বিস্মিত হইয়াছিলাম সে রূপের কিছু মাত্র নাই। অঙ্গারদগ্ধ অতি মাত্র কুৎসিতা রমণী সম্মুখে দেখিতে পাইলাম। আমার মুখের ভাব দেখিয়া রমণী বস্ত্রে মুখ লুকাইয়া রোদন করিতে লাগিল। তাহার রূপের বিকৃতি হইয়াছে বটে কিন্তু অগ্নিতে অঙ্গের কোন স্থান দগ্ধ হয় নাই।

মন্দিরের বাহিরে আসিয়া সন্ন্যাসী পূর্ব্বের ন্যায় পথ দেখাইয়া চলিলেন। অরণ্য অতিক্রান্ত হইলে রমণীকে কহিলেন, "এখন গৃহে যাও। মুকুরে মুখ দেখিলে পূর্ব্বের ন্যায় পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইবে না। এখন প্রায়শ্চিত্তের সময় উপস্থিত হইয়াছে।"

রমণী রোদন করিতে করিতে চলিয়া গেল। তখন সন্ন্যাসী আমার প্রতি তীব্র কটাক্ষ পাত করিয়া কোমল স্বরে কহিলেন, "বৎস, তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও। কঠোর সন্ন্যাস আশ্রম তোমার তরে নহে। তুমি যে রমণীকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছ সে গুণবতী, তাহাকে লইয়া তুমি সুখে গৃহস্থ আশ্রম কর।"

তখন স্বপ্নশ্রুত সেই স্বর আমার শ্রবণে পুনঃ প্রবেশ করিল—"ঈপ্সিত, চিরদয়িত এস হে! কোথায় তুমি!"

সন্ন্যাসী দ্রুতপদে আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। আমি পর দিবস প্রাতে গৃহমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

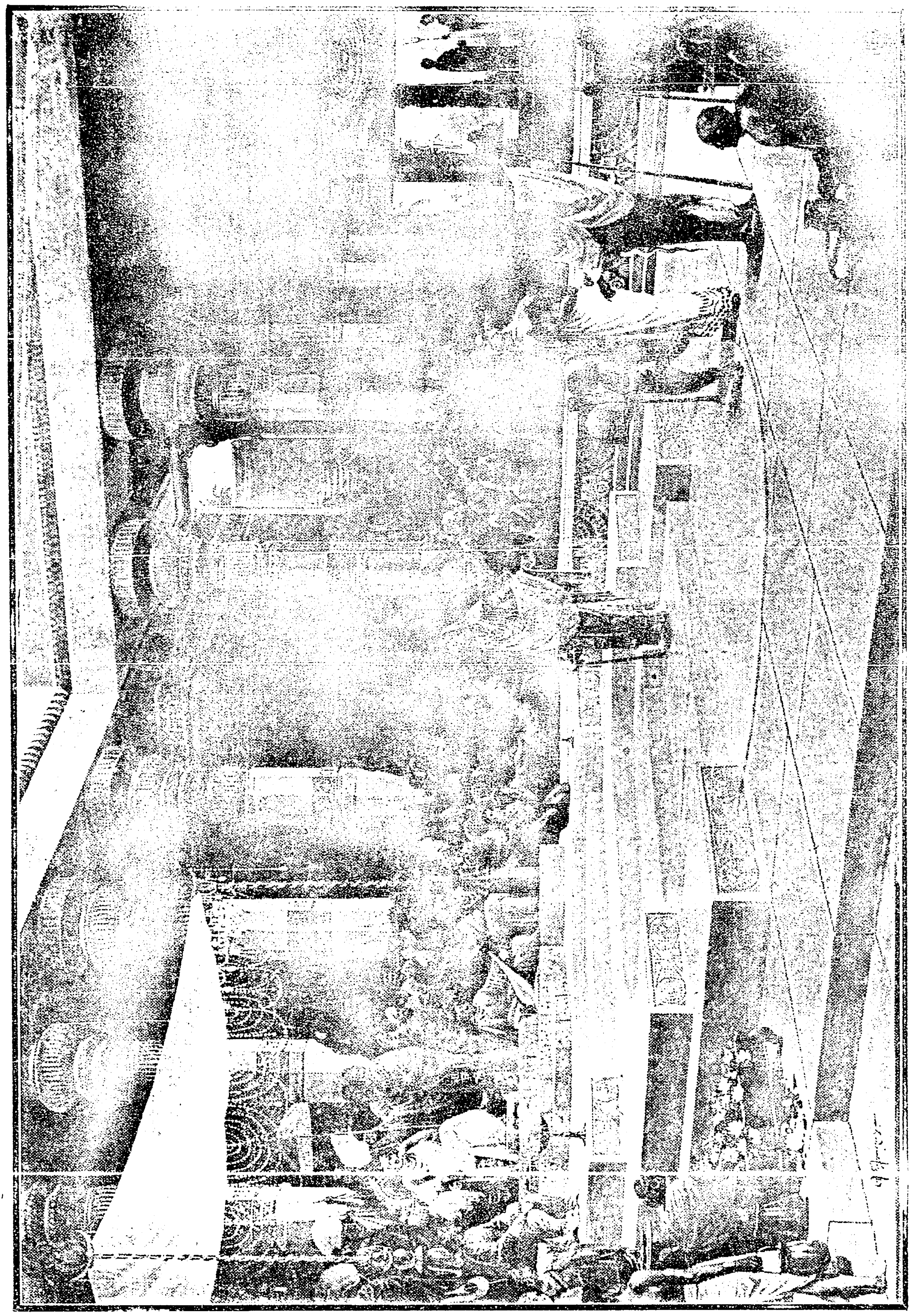

কাদম্বরী চিত্র—শূদ্রকের রাজসভা।

তৃতীয় ভাগ। } মাঘ, ১৩০৬। { ২য় সংখ্যা।

কাদম্বরী চিত্র।

প্রাচীন ভারতবর্ষের অনেক বিষয়ে অসামান্যতা ছিল সন্দেহ নাই। অন্য দেশে নগর হইতে সভ্যতার সৃষ্টি, আমাদের দেশে অরণ্য হইতে; বসনভূষণ ঐশ্বর্য্যের গৌরব সর্ব্বত্রই আছে, আর বিবসন নিভূর্ষণ ও ভিক্ষাচর্য্যার গৌরব ভারতবর্ষেই; অন্যান্য দেশ ধর্ম্মবিশ্বাসে শাস্ত্রের অধীন, আহার বিহার আচারে স্বাধীন; ভারতবর্ষ বিশ্বাসে বন্ধনহীন, আহার বিহার আচারে সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্রের অনুগত। এমন অনেক দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান যাইতে পারে সাধারণ মানবপ্রকৃতি হইতে প্রাচীন ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি অনেক বিষয়ে স্বতন্ত্র।

সেই অসামান্যতার আর একটি লক্ষণ এই দেখা যায় যে, পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিই গল্প শুনিতে ভালবাসে; কিন্তু কেবল প্রাচীন ভারতবর্ষেরই গল্প শুনিতে কোন ঔৎসুক্য ছিল না। সকল সভ্য দেশই আপন সাহিত্যে ইতিহাস, জীবনী ও উপন্যাস আগ্রহের সহিত সঞ্চয় করিয়া থাকে—ভারতবর্ষীয় সাহিত্যে তাহার চিহ্ন দেখা যায় না; যদি বা ভারত সাহিত্যে ইতিহাস উপন্যাস থাকে, তাহার মধ্যে আগ্রহ নাই। হোমরের ঈলিয়াডের মধ্যে বক্তার এবং শ্রোতার একটা পরিপূর্ণ ব্যগ্রতা একটা উত্তেজনা দেখা যায়; সেই জন্য তাহা স্বভাবতই সংক্ষিপ্ত, বেগবান্; তাহার ক্ষিপ্রগামী ঘটনাস্রোত শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত ও বাধাবিঘ্নে প্রতিহত নহে। রামায়ণ মহাভারতে গল্প-স্রোতের সে বেগ নাই। বর্ণনা, তত্ত্বালোচনা ও অবান্তর প্রসঙ্গে তাহার গল্পপ্রবাহ পদে পদে খণ্ডিত হইলেও প্রশান্ত ভারতবর্ষের ধৈর্য্যচ্যুতি দেখা যায় না। এ গুলি মূল কাব্যের অঙ্গ, না প্রক্ষিপ্ত, সে আলোচনা নিষ্ফল; কারণ প্রক্ষেপ সহ্য করিবার লোক না থাকিলে প্রক্ষিপ্ত টিকিতে পারে না। পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে নদী যদি বা শৈবাল বহন করিয়া না আনে, তথাপি তাহার স্রোত ক্ষীণবেগ না হইলে তাহার মধ্যে শৈবাল জন্মিবার অবসর পায় না। ভগবদ্গীতার মাহাত্ম্য কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না, কিন্তু যখন কুরুক্ষেত্রের তুমুল যুদ্ধ আসন্ন, তখন সমস্ত ভগবদ্গীতা অবহিত হইয়া শ্রবণ করিতে পারে, ভারতবর্ষ ছাড়া এমন দেশ আর জগতে নাই। কিষ্কিন্ধা এবং সুন্দর কাণ্ডে সৌন্দর্য্যের অভাব নাই এ কথা মানি, তবু রাক্ষস যখন সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল তখন গল্পের উপর অতবড় একটা জগদ্দল পাথর চাপাইয়া দিলে সহিষ্ণু ভারতবর্ষই কেবল তাহা মার্জ্জনা করিতে পারে। কেনই বা সে মার্জ্জনা করে? কারণ, গল্পের শেষ শুনিবার জন্য তাহার কিছু মাত্র সত্বরতা নাই। চিন্তা করিতে করিতে, প্রশ্ন করিতে করিতে, আশ পাশ পরিদর্শন করিতে করিতে, ভারতবর্ষ সাতটি প্রকাণ্ড কাণ্ড এবং আঠারটি বিপুলায়তন পর্ব্ব অকাতরচিত্তে, মৃদুমন্দগতিতে পরিভ্রমণ করিতে কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ করে না।

আবার, গল্প শুনিবার আগ্রহ অনুসারে গল্পের প্রকৃতিও ভিন্নরূপ হইয়া থাকে। ছয়টি কাণ্ডে যে গল্পটি বেদনা ও আনন্দে, চেষ্টা ও সফলতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, একটি মাত্র উত্তরাকাণ্ডে তাহাকে অসঙ্কোচে চূর্ণ করিয়া ফেলা কি সহজ ব্যাপার? আমরা লঙ্কাকাণ্ড পর্য্যন্ত এই দেখিয়া আসিলাম যে, অধর্ম্মচারী নিষ্ঠুর রাক্ষস রাবণই সীতার পরম শত্রু; অসাধারণ শৌর্য্যে ও বিপুল আয়োজনে সেই ভয়ঙ্কর রাবণের হাত হইতে সীতা যখন পরিত্রাণ পাইলেন, তখন আমাদের সমস্ত চিন্তা দূর হইল, আমরা আনন্দের জন্য প্রস্তুত হইলাম, এমন সময় মুহূর্ত্তের মধ্যে কবি দেখাইয়া দিলেন সীতার চরম শত্রু অধার্ম্মিক রাবণ নহে, সে শত্রু ধর্ম্মনিষ্ঠ রাম; নির্ব্বাসনে তাঁহার তেমন সঙ্কট ঘটে নাই—যেমন তাঁহার রাজাধিরাজ স্বামীগৃহে; যে সোণার তরণী দীর্ঘকাল যুঝিয়া ঝড়ের হাত হইতে উদ্ধার পাইল, ঘাটের পাষাণে ঠেকিবামাত্র এক মুহূর্ত্তে তাহা দুই খানা হইয়া গেল! গল্পের উপর যাহার কিছুমাত্র মমতা আছে সে কি এমন আকস্মিক উপদ্রব সহ্য করিতে পারে? যে বৈরাগ্য প্রভাবে আমরা গল্পের নানাবিধ প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক বাধা সহ্য করিয়াছি, সেই বৈরাগ্যই গল্পটির অকস্মাৎ অপঘাত মৃত্যুতে আমাদের ধৈর্য্য রক্ষা করিয়া থাকে।

মহাভারতেও তাই। এক স্বর্গারোহণ পর্ব্বেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটার স্বর্গ প্রাপ্তি হইল। গল্পপ্রিয় ব্যক্তির কাছে গল্পের অবসান যেখানে, মহাভারত সেখানে থামিলেন না—অতবড় গল্পটাকে বালুনির্ম্মিত খেলাঘরের মত এক মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন—সংসারের প্রতি এবং গল্পের প্রতি যাহাদের বৈরাগ্য তাহারা ইহার মধ্য হইতে সত্য লাভ করিল এবং ক্ষুব্ধ হইল না। মহাভারতকে যে লোক গল্পের মত করিয়া পড়িতে চেষ্টা করে সে মনে করে অর্জ্জুনের শৌর্য্য অমোঘ, সে মনে করে শ্লোকের উপর শ্লোক গাঁথিয়া মহাভারতকার অর্জ্জুনের জয়স্তম্ভ অভ্রভেদী করিয়া তুলিতেছেন,—কিন্তু সমস্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে হঠাৎ এক দিন এক স্থানে অতি অল্প কথার মধ্যে দেখা গেল একদল সামান্য দস্যু কৃষ্ণের রমণীদিগকে অর্জ্জুনের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া গেল; নারীগণ কৃষ্ণসখা পার্থকে ডাকিয়া আর্ত্তস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন, অর্জ্জুন গাণ্ডীব তুলিতে পারিলেন না! অর্জ্জুনের এমন অভাবনীয় অবমাননা যে, মহাভারতকারের কল্পনায় স্থান পাইতে পারে তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী অতগুলা পর্ব্বের মধ্যে কেহ সন্দেহ করিতে পারে নাই। কিন্তু কাহারও উপর কবির মমতা নাই। যেখানে শ্রোতা বৈরাগী, লৌকিক শৌর্য্যবীর্য্যমহত্ত্বের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্মরণ করিয়া নিরাসক্ত, সেখানে কবিও নির্ম্মম, এবং কাহিনীও কেবলমাত্র কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার ভার মোচন করিয়া দ্রুতবেগ অবলম্বন করে না।

তাহার পরে, পুরাণগুলিকে কেহ বিশুদ্ধ গল্পরূপে পড়িবার আশা করে না,—সে গুলি ধর্ম্মশাস্ত্র, গল্প উপলক্ষ্য মাত্র; মনোরঞ্জন বা কৌতূহল তৃপ্তি তাহার উদ্দেশ্য নহে, পরলোকের সম্পত্তি তাহার লক্ষ্য।

তাহার পর মাঝখানে সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ পার হইয়া কাব্যসাহিত্যে একেবারে কালিদাসে আসিয়া ঠেকিতে হয়। ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষ চিত্তরঞ্জনের জন্য কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। উৎসবে যে মাটির প্রদীপের সুন্দর দীপমালা রচনা হয়, পরদিন তাহা কেহ তুলিয়া রাখে না; ভারতবর্ষে আনন্দ-উৎসবে নিশ্চয়ই এমন অনেক মাটির প্রদীপ, অনেক ক্ষণিকসাহিত্য, নিশীথে আপন কর্ম্ম সমাপন করিয়া প্রত্যূষে বিস্মৃতিলোক লাভ করিয়াছে। কিন্তু প্রথম তৈজস প্রদীপ দেখিলাম কালিদাসের,—সেই পৈতৃক প্রদীপ এখনো আমাদের ঘরে রহিয়া গেছে—আমাদের উজ্জয়িনীবাসী পিতামহের প্রাসাদশিখরে তাহা প্রথম জ্বলিয়াছিল—এখনো তাহাতে কলঙ্ক পড়ে নাই।

কেবল আনন্দদানকে উদ্দেশ্য করিয়া কাব্যরচনা সংস্কৃত সাহিত্যে কেবল কালিদাসে প্রথম দেখা গেল। (এখানে আমি খণ্ডকাব্যের কথা বলিতেছি, নাটকের কথা নহে)। মেঘদূত তাহার এক দৃষ্টান্ত। এমন দৃষ্টান্ত সংস্কৃত সাহিত্যে বোধ করি আর নাই। যাহা আছে তাহা মেঘদূতেরই আধুনিক অনুকরণ, যথা পদাঙ্কদূত প্রভৃতি; এবং তাহাও পৌরাণিক। কুমারসম্ভব, রঘুবংশ পৌরাণিক বটে, কিন্তু তাহা পুরাণ নহে, কাব্য; তাহা চিত্তবিনোদনের জন্য লিখিত, তাহার পাঠফলে স্বর্গপ্রাপ্তির প্রলোভন নাই। ভারতবর্ষীয় আর্য্যসাহিত্যের ধর্ম্মপ্রাণতা সম্বন্ধে যিনি যেমন মতবাদ প্রচার করুন—আশা করি,

ঋতুসংহার পাঠে মোক্ষলাভের সহায়তা হইবে, এমন উপদেশ কেহ দিবেন না।

কিন্তু তথাপি কালিদাসের কুমারসম্ভবে গল্প নাই—যেটুকু আছে সে সূত্রটি অতিসূক্ষ্ম এবং প্রচ্ছন্ন; এবং তাহাও অসমাপ্ত। দেবতারা দৈত্যহস্ত হইতে কোন উপায়ে পরিত্রাণ পাইলেন কি না পাইলেন সে সম্বন্ধে কবির কিছুমাত্র ঔৎসুক্য দেখিতে পাই না—তাঁহাকে তাড়া দিবার লোকও কেহ নাই। অথচ বিক্রমাদিত্যের সময় শকহূণরূপী শত্রুদের সঙ্গে ভারতবর্ষের খুব একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছিল এবং স্বয়ং বিক্রমাদিত্য তাহার একজন নায়ক ছিলেন; অতএব দেবদৈত্যের যুদ্ধ এবং স্বর্গের পুনরুদ্ধারপ্রসঙ্গ তখনকার শ্রোতাদের নিকট বিশেষ ঔৎসুক্যজনক হইবে এমন আশা করা যায়। কিন্তু কই? রাজসভার শ্রোতাগণ দেবতাদের বিপৎপাতে উদাসীন। মদনভস্ম, রতিবিলাপ, উমার তপস্যা, কোনটাতেই ত্বরান্বিত হইবার জন্য কোন উপরোধ দেখিনা। সকলেই যেন বলিতেছেন, গল্প থাক্, এখন ঐ বর্ণনাটাই চলুক্। রঘুবংশও বিচিত্র বর্ণনার উপলক্ষ্যমাত্র।

রাজশ্রোতারা যদি গল্পলোলুপ হইতেন তবে কালিদাসের লেখনী হইতে তখনকার কালের কতকগুলি চিত্র পাওয়া যাইত। হায়, অবন্তীরাজ্যে নববর্ষার দিনে উদয়ন কথাকোবিদ্ গ্রামবৃদ্ধেরা যে গল্প করিতেন সে সমস্ত গেল কোথায়?

আসল কথা, গ্রামবৃদ্ধেরা তখন গল্প করিতেন, কিন্তু সে গ্রামের ভাষায়। সে ভাষায় যে কবিরা রচনা করিয়াছেন তাঁহারা যথেষ্ট আনন্দদান করিয়াছেন, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে অমরতা লাভ করেন নাই। তাঁহাদের কবিত্ব অল্প ছিল বলিয়া যে তাঁহারা বিনাশ পাইয়াছেন এমন কথা বলি না। নিঃসন্দেহ তাঁহাদের মধ্যে অনেক মহাকবি জন্মিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রাম্যভাষা প্রদেশ বিশেষেবদ্ধ, শিক্ষিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক উপেক্ষিত এবং কালে কালে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে—সে ভাষায় যাঁহারা রচনা করিয়াছেন তাঁহারা কোনস্থায়ী ভিত্তি পান নাই; নিঃসন্দেহ অনেক বড় বড় সাহিত্যপুরী চলনশীল পলিমৃত্তিকার মধ্যে নিহিত হইয়া একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেছে।

সংস্কৃতভাষা কথিতভাষা ছিল না বলিয়াই সে ভাষায় ভারতবর্ষের সমস্ত হৃদয়ের কথা সম্পূর্ণ করিয়া বলা হয় নাই। ইংরাজি অলঙ্কারে যে শ্রেণীর কবিতাকে Lyrics বলে তাহা মৃতভাষায় সম্ভবে না। কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশীতে যে সংস্কৃত গান আছে, তাহাতেও গানের লঘুতা, সরলতা ও অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যটুকু পাওয়া যায় না। বাঙ্গালী জয়দেব সংস্কৃত ভাষাতেও গান রচনা করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিদের বাঙ্গলা পদাবলীর সহিত তাঁহার তুলনা হয় না।

মৃতভাষায়, পরের ভাষায় গল্পও চলে না; কারণ গল্পে লঘুতা এবং গতিবেগ আবশ্যক,—ভাষা যখন ভাসাইয়া লইয়া যায় না, ভাষাকে যখন ভারের মত বহন করিয়া চলিতে হয় তখন তাহাতে গান এবং গল্প সম্ভব হয় না। কালিদাসের কাব্য ঠিক স্রোতের মত সর্ব্বাঙ্গ দিয়া চলে না—তাহার প্রত্যেক শ্লোক আপনাতে আপনি সমাপ্ত—একবার থামিয়া দাঁড়াইয়া সেই শ্লোকটিকে আয়ত্ত করিয়া লইয়া তবে পরের শ্লোকে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। প্রত্যেক শ্লোকটি স্বতন্ত্র হীরকখণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল, এবং সমস্ত কাব্যটি হীরক হারের ন্যায় সুন্দর কিন্তু নদীর ন্যায় তাহার অখণ্ড কলধ্বনি এবং অবিচ্ছিন্ন ধারা নাই।

তা ছাড়া সংস্কৃত ভাষার এমন স্বরবৈচিত্র্য ধ্বনিগাম্ভীর্য্য এমন স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে—তাহাকে নিপুণরূপে চালনা করিতে পারিলে তাহাতে নানাযন্ত্রের এমন কন্সর্ট বাজিয়া উঠে, তাহার অন্তর্নিহিত রাগিণীর এমন একটি অনির্ব্বচনীয়তা আছে যে কবি পণ্ডিতেরা বাঙ্নৈপুণ্যে পণ্ডিত শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিতেন না। সেই জন্য যেখানে বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করিয়া বিষয়কে দ্রুত অগ্রসর করিয়া দেওয়া অত্যাবশ্যক সেখানেও ভাষার প্রলোভন সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হয় এবং বাক্য, বিষয়কে প্রকাশিত না করিয়া পদে পদে আচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়ায়;—বিষয়ের অপেক্ষা বাক্যই অধিক বাহাদুরী লইতে চেষ্টা করে এবং তাহাতে সফলও হয়। ময়ূরপুচ্ছনির্ম্মিত এমন অনেক সুন্দর ব্যজন আছে যাহাতে ভাল বাতাস হয় না—কিন্তু বাতাস করিবার উপলক্ষ্যমাত্র লইয়া রাজসভায় কেবল তাহা শোভার জন্য সঞ্চালন করা হয়—রাজসভার সংস্কৃতকাব্যগুলিও ঘটনাবিন্যাসের জন্য তত অধিক ব্যগ্র হয় না; তাহার বাগ্‌বিস্তার,উপমাকৌশল,

বর্ণনানৈপুণ্য রাজসভাকে প্রত্যেক সঞ্চালনে চমৎকৃত করিতে থাকে।

সংস্কৃত সাহিত্যে গদ্যে যে দুই তিন খানি উপন্যাস আছে, তাহার মধ্যে কাদম্বরী সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। যেমন রমণীর তেমনি পদ্যেরও অলঙ্কারের প্রতি টান বেশী—গদ্যের সাজসজ্জা স্বভাবতই কর্ম্মক্ষেত্রের উপযোগী। তাহাকে তর্ক করিতে হয়, অনুসন্ধান করিতে হয়, ইতিহাস বলিতে হয়, তাহাকে বিচিত্র ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়—এই জন্য তাহার বেশভূষা লঘু, তাহার হস্তপদ অনাবৃত। দুর্ভাগ্যক্রমে সংস্কৃত গদ্য সর্ব্বদা ব্যবহারের জন্য নিযুক্ত ছিলনা, সেই জন্য বাহ্যশোভার বাহুল্য তাহার অল্প নহে। মেদস্ফীত বিলাসীর ন্যায় তাহার সমাসবহুল বিপুলায়তন দেখিয়া সহজেই বোধ হয় সর্ব্বদা চলাফেরার জন্য সে হয় নাই,—বড় বড় টীকাকার ভাষ্যকার পণ্ডিত বাহকগণ তাহাকে কাঁধে করিয়া না চলিলে তাহার চলা অসাধ্য। অচল হোক্ কিন্তু কিরীটে কুন্তলে কঙ্কণে কণ্ঠমালায় সে রাজার মত বিরাজ করিতে থাকে।

সেই জন্য বাণভট্ট যদিচ স্পষ্টতঃ গল্প করিতে বসিয়াছেন, তথাপি ভাষার বিপুলগৌরব লাঘব করিয়া কোথাও গল্পকে দৌড় করান নাই। সংস্কৃত ভাষাকে অনুচর পরিবৃত সম্রাটের মত অগ্রসর করিয়া দিয়া গল্পটি তাহার পশ্চাতে প্রচ্ছন্নপ্রায় ভাবে ছত্রবহন করিয়া চলিয়াছে মাত্র। ভাষার রাজমর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য গল্পটির কিঞ্চিৎ প্রয়োজন আছে বলিয়াই সে আছে, কিন্তু তাহার প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই।

শূদ্রক রাজা কাদম্বরী গল্পের নায়ক নহেন—তিনি গল্প শুনিতেছেন মাত্র, অতএব তাঁহার পরিচয় সংক্ষিপ্ত হইলে কোন ক্ষতি ছিল না। আখ্যায়িকার বহিরংশ যদি যথোপযুক্ত হ্রস্ব না হয়, তবে মূল আখ্যানের পরিমাণসামঞ্জস্য নষ্ট হয়। আমাদের দৃষ্টি শক্তির ন্যায় আমাদের কল্পনাশক্তিও সীমাবদ্ধ; আমরা কোন জিনিষের সমস্তটা এক সঙ্গে সমান করিয়া দেখিতে পাই না—সম্মুখটা বড় দেখি, পশ্চাৎটা ছোট দেখি, পৃষ্ঠদেশটা দেখি না, অনুমান করিয়া লই; এই জন্য শিল্পী তাঁহার সাহিত্য-শিল্পের যে অংশটা প্রধানতঃ দেখাইতে চান সেইটাকে বিশেষ রূপ গোচরবর্ত্তী করিয়া বাকি অংশগুলিকে পার্শ্বে পশ্চাতে এবং অনুমান ক্ষেত্রে রাখিয়া দেন। কিন্তু কাদম্বরীকার মুখ্য গৌণ ছোট বড় কোন কথাকেই কিছুমাত্র বঞ্চিত করিতে চান নাই। তাহাতে যদি গল্পের ক্ষতি হয়, মূল প্রসঙ্গটি দূরবর্ত্তী হইয়া পড়ে তাহাতে তিনি বা তাঁহার শ্রোতারা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন, তথাপি কথা কিছু বাদ দিলে চলিবে না; কারণ কথা বড় সুনিপুণ, বড় সুশ্রাব্য; কৌশলে, মাধুর্য্যে, গাম্ভীর্য্যে, ধ্বনি ও প্রতিধ্বনিতে পরিপূর্য্যমান।

অতএব মেঘমন্দ্র মৃদঙ্গধ্বনির মত কথা আরম্ভ হইল—আসীৎ অশেষ-নরপতিশিরঃ-সমভ্যর্চ্চিতশাসনঃ পাকশাসন ইবাপরঃ—কিন্তু হায় আমার দুরাশা! কাদম্বরী হইতে সমগ্র পদ উদ্ধার করিয়া কাব্যরস আলোচনা করিব আমার ক্ষুদ্রায়তন প্রবন্ধের এমন শক্তি নাই। আমরা যেকালে জন্মিয়াছি, এ বড় ব্যস্ততার কাল—এখন সকল কথার সমস্তটা বলিবার প্রলোভন পদে পদে সংযত করিতে হয়। কাদম্বরীর সময়ে কবি কথা বিস্তারের বিচিত্র কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন, এখন আমাদিগকে কথা সংক্ষেপের সমুদয় কৌশল শিক্ষা করিতে হয়। তখনকার কালের মনোরঞ্জনের জন্য যে বিদ্যার প্রয়োজন ছিল, এখনকার কালের মনোরঞ্জনের জন্য ঠিক্ তাহার উল্টা বিদ্যা আবশ্যক হইয়াছে।

কিন্তু এককালের মধুলোভী যদি অন্যকাল হইতে মধু সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে নিজকালের প্রাঙ্গনের মধ্যে বসিয়া বসিয়া তিনি তাহা পাইবেন না, অন্য কালের মধ্যে তাঁহাকে প্রবেশ করিতে হইবে। কাদম্বরী যিনি উপভোগ করিতে চান তাঁহাকে ভুলিতে হইবে, যে, আপিসের বেলা হইতেছে, মনে করিতে হইবে যে, তিনি বাক্যরসবিলাসী রাজ্যেশ্বর বিশেষ, রাজসভা মধ্যে সমাসীন এবং—সমানবয়োবিদ্যালঙ্কারৈঃ অখিলকলাকলাপালোচনকঠোরমতিভিঃ অতিপ্রগল্ভৈঃ অগ্রাম্যপরিহাসকুশলৈঃ কাব্যনাটকাখ্যানকাখ্যায়িকালেখ্যব্যাখ্যানাদিক্রিয়ানিপুণৈঃ বিনয়ব্যবহারিভিঃ আত্মনঃ প্রতিবিম্বৈরিব রাজপুত্রৈঃসহ রমমাণঃ। এইরূপ রসচর্চ্চায় রসিকপরিবৃত হইয়া থাকিলে লোকে প্রতিদিনের সুখদুঃখসমাকুল যুধ্যমান ঘর্ম্মসিক্ত কর্ম্মনিরত সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। মাতাল যেরূপ আহার ভুলিয়া মদ্যপান করিতে থাকে তাহারাও

সেইরূপ জীবনের কঠিন অংশ পরিত্যাগ করিয়া ভাবের তরল রসপানে বিহ্বল হইয়া থাকে; তখন সত্যের যাথাতথ্য ও পরিমাণের প্রতি দৃষ্টি থাকে না, কেবল আদেশ হইতে থাকে, ঢাল, ঢাল, আরও ঢাল! এখনকার দিনে মনুষ্যের প্রতি আমাদের আকর্ষণ বেশী হইয়াছে; লোকটা কে, এবং সে কি করিতেছে ইহার প্রতি আমাদের অত্যন্ত কৌতূহল, এই জন্য ঘরে বাহিরে চতুর্দ্দিকে মানুষের ক্রিয়াকলাপ জীবনবৃত্তান্ত আমরা তন্ন তন্ন পর্য্যালোচনা করিয়াও পরিতৃপ্ত হই না। কিন্তু সেকালে পণ্ডিতই বল রাজাই বল, মানুষকে বড় বেশি কিছু মনে করিতেন না। বোধ করি স্মৃতিবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া কর্ম্মে এবং একান্তে অবহিত ভাবে শাস্ত্রাদি আলোচনায় তাঁহারা জগৎ সংসারে অনেকটা বেশি নির্লিপ্ত ছিলেন। বোধ করি বিধিবিধান নিয়ম সংযমের শাসনে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের বড় একটা প্রশ্রয় ছিল না। এই জন্য রামায়ণ মহাভারতের পরবর্ত্তীকালীন সংস্কৃতসাহিত্যে লোকচরিত্র সৃষ্টি এবং সংসারবর্ণনার প্রাধান্য দেখা যায় না। ভাব এবং রস তাহার প্রধান অবলম্বন। রঘুর দিগ্বিজয় ব্যাপারে অনেক উপমা এবং সরস বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু রঘুর বীরত্বের বিশেষ একটা চরিত্রগত চিত্র পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা দেখা যায় না। অজ ইন্দুমতী ব্যাপারে অজ এবং ইন্দুমতী উপলক্ষ্য মাত্র—তাঁহাদের ব্যক্তিগত বিশেষ মূর্ত্তি সুস্পষ্ট নহে, কিন্তু পরিণয়, প্রণয় ও বিচ্ছেদ-শোকের একটি সাধারণ ভাব ও রস সেই সর্গে উচ্ছলিত হইতেছে। কুমারসম্ভবে হরপার্ব্বতীকে অবলম্বন করিয়া প্রেম, সৌন্দর্য্য, উপমা, বর্ণনা তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে। মনুষ্য ও সংসারের বিশেষত্বের প্রতি সেকালের সেই অপেক্ষাকৃত ঔদাসীন্য থাকাতে ভাষা বর্ণনা মনুষ্যকে ও ঘটনাকে সর্ব্বত্র আচ্ছন্ন করিয়া আপন রস বিস্তার করিয়াছে। সেই কথাটি স্মরণ রাখিয়া আধুনিক কালের বিশেষত্ব বিস্মৃত হইয়া কাদম্বরীর রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইলে আনন্দের সীমা থাকিবে না।

কল্পনা করিয়া দেখ—গায়ক গান গাহিতেছে "চ-ল-ত-রা-আ-আ-আ-আ-"ফিরিয়া পুনরায়"চ-ল-তরা-আআআআ" সুদীর্ঘ তান,—শ্রোতারা সেই তানের খেলায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে; এ দিকে গানের কথায় আছে, "চলত রাজকুমারী", কিন্তু তানের উপদ্রবে বেলা বহিয়া যায়, রাজকুমারীর আর চলাই হয় না; সমজদার শ্রোতাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে রাজকুমারী না চলে ত নাই চলুক্ কিন্তু তান্‌টা চলিতে থাক্। অবশ্য, রাজকুমারী কোন্ পথে চলিতেছেন সে সংবাদের জন্য যাহার বিশেষ উদ্বেগ আছে তাহার পক্ষে তানটা দুঃসহ; কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে যদি রস উপভোগ করিতে চাও, তবে রাজকুমারীর গম্যস্থান নির্ণয়ের জন্য নিরতিশয় অধীর না হইয়া তানটা শুনিয়া লও! কারণ যে জায়গায় আসিয়া পড়িয়াছ এখানে কৌতূহলে অধীর হইয়া ফল নাই, ইহা রসে মাতোয়ারা হইবার স্থান।

অতএব স্নিগ্ধজলদনির্ঘোষে আপাতত শূদ্রক রাজার বর্ণনা শোনা যাক্। সে বর্ণনায় আমরা শূদ্রক রাজার চরিত্র চিত্র প্রত্যাশা করিব না। কারণ চরিত্র চিত্রে একটা সীমারেখা অঙ্কিত করিতে হয়—ইহাতে সীমা নাই—ভাষা কলগর্জ্জিত সমুদ্রের বন্যার মত যতদূর উদ্বেলিত হইয়াছে তাহাকে বাধা দিবার কেহ নাই। যদিও সত্যের অনুরোধে বলিতে হইয়াছে শূদ্রক বিদিশা নগরীর রাজা, কিন্তু অপ্রতিহতগামী ভাষা ও ভাবের অনুরোধে বলিতে হইয়াছে, তিনি "চতুরুদধিমালামেখলায়াভুবোভর্ত্তা।" শূদ্রকের মহিমা কতটুকু ছিল সেই ব্যক্তিগত তুচ্ছতথ্যালোচনায় প্রয়োজন নাই, কিন্তু রাজকীয় মহিমা কতদূর যাইতে পারে, সেই কথা যথোচিত সমাস-সমারোহ সহকারে ঘোষিত হউক!

সকলেই জানেন ভাব সত্যের মত কৃপণ নহে। সত্যের নিকট যে ছেলে কানা, ভাবের নিকট তাহার পদ্মলোচন হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। ভাবের সেই রাজকীয় অজস্রতার উপযোগী ভাষা সংস্কৃত ভাষা। সেই স্বভাববিপুলা ভাষা কাদম্বরীতে পূর্ণ বর্ষার নদীর মত আবর্ত্তে তরঙ্গে গর্জ্জনে আলোকচ্ছটায় বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু কাদম্বরীর বিশেষ মাহাত্ম্য এই যে, ভাষা ও ভাবের বিশাল বিস্তার রক্ষা করিয়াও তাহার চিত্র গুলি জাগিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত প্লাবিত হইয়া একাকার হইয়া যায় নাই। কাদম্বরীর প্রথম আরম্ভ চিত্রটিই তাহার প্রমাণ।

তখনও ভগবান্ মরীচিমালী অধিক দূরে উঠেন নাই; নূতন পদ্মপত্রপুট ভেদ করিয়া যেমন কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত পাটল আভাটি দেখা যায় তখন সূর্য্যের বর্ণটি তেমনি।

এই বলিয়া বর্ণনা আরম্ভ হইল। এই বর্ণনার আর কোন উদ্দেশ্য নাই, কেবল শ্রোতার চক্ষে একটি কোমল রং মাখাইয়া দেওয়া, এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গে একটি স্নিগ্ধ সুগন্ধ ব্যজন দুলাইয়া দেওয়া। "একদা তু নাতিদূরোদিতে নবনলিনদলসম্পুটভিদি কিঞ্চিদুন্মুক্ত পাটলিম্নি ভগবতি মরীচিমালিনি"—কথার কি মোহ! অনুবাদ করিতে গেলে শুধু এইটুকু ব্যক্ত হয় যে, তরুণ সূর্য্যের বর্ণ ঈষৎ রক্তিম, কিন্তু ভাষার ইন্দ্রজাল, কেবলমাত্র ঐ বিশেষ্য বিশেষণের বিন্যাসে একটি সুরম্য সুগন্ধ সুবর্ণ সুশীতল প্রভাতকাল অনতিবিলম্বে হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ধরে। এ যেমন প্রভাত, তেমনি একটি কথায় তপোবনে সন্ধ্যা সমাগমের বর্ণনা উদ্ধৃত করিঃ—দিবাবসানে লোহিততারকা তপোবনধেনুরিব কপিলা পরিবর্ত্তমানা সন্ধ্যা" দিন শেষে রক্তচক্ষু তপোবনের ধেনুটি যেমন গোষ্ঠে ফিরিয়া আসে, কপিলবর্ণা সন্ধ্যা তেমনি তপোবনে অবতীর্ণা। কপিলা ধেনুর সহিত সন্ধ্যার রঙের তুলনা করিতে গিয়া সন্ধ্যার সমস্ত শান্তি এবং শ্রান্তি এবং ধূসরচ্ছায়া কবি এক মুহূর্ত্তেই মনের মধ্যে ঘনাইয়া তুলিয়াছেন। সকালের বর্ণনায় যেমন কেবলমাত্র তুলনাচ্ছলে উন্মুক্ত প্রায় নবপদ্মপুটের সুকোমল আভাটুকুর বিকাশ করিয়া মায়াবী চিত্রকর সমস্ত প্রভাতকে সৌকুমার্য্যে এবং সুস্নিগ্ধতায় পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন—তেমনি বর্ণের উপমাচ্ছলে তপোবনের গোষ্ঠে ফেরা অরুণ চক্ষু কপিলবর্ণ ধেনুটির কথা তুলিয়া সন্ধ্যার যত কিছু ভাব সমস্ত নিঃশেষে বলিয়া লইয়াছেন।

এমন বর্ণসৌন্দর্য্যবিকাশের ক্ষমতা সংস্কৃত কোন কবি দেখাইতে পারেন নাই। সংস্কৃত কবিগণ লাল রঙকে লাল রং বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, কিন্তু কাদম্বরীকারের লাল রং কত রকমের তাহার সীমা নাই। কোন লাল লাক্ষালোহিত, কোন লাল পারাবতের পদতলের মত, কোন লাল রক্তাক্ত সিংহ নখের সমান। "একদা তু প্রভাতসন্ধ্যারাগলোহিতে গগনতলে কমলিনীমধুরক্ত পক্ষসংপুটে বৃদ্ধ হংসে ইব মন্দাকিনীপুলিনাদপরজলনিধিতটমবতরতি চন্দ্রমসি, পরিণতরঙ্কুরোমপাণ্ডুনি ব্রজতি বিশালতামাশাচক্রবালে, গজরুধিররক্তহরিসটালোমলোহিনীভিঃ, আতপ্তলাক্ষিকতন্তুপাটলাভিঃ, আয়ামিনীভিরশিশিরকিরণদীধিতিভিঃ, পদ্মরাগশলাকাসম্মার্জ্জনীভিরিব সমুৎসার্য্যমানে গগনকুট্টিমকুসুমপ্রকরে তারাগণে"—এক দিন আকাশ যখন প্রভাতসন্ধ্যারাগে লোহিত, চন্দ্র তখন পদ্মমধুর মত রক্তবর্ণ পক্ষপুটশালী বৃদ্ধ হংসের ন্যায় মন্দাকিনী পুলিন হইতে পশ্চিম সমুদ্র তটে অবতরণ করিতেছেন, দিক্‌চক্রবালে বৃদ্ধরঙ্কুমৃগের রোমের মত একটি পাণ্ডুতা ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ হইতেছে, গজরুধিররক্ত সিংহজটার রোমের ন্যায় লোহিত, ঈষৎ তপ্ত লাক্ষাতন্তুর ন্যায় পাটলবর্ণ সুদীর্ঘ সূর্য্যরশ্মিগুলি যেন পদ্মরাগশলাকার সম্মার্জ্জনীর দ্বারা গগন কুট্টিম হইতে তারা পুষ্প সকলকে সমুৎসারিত করিয়া দিতেছে।

রংফলাইতে কবির কি আনন্দ! যেন শ্রান্তি নাই, তৃপ্তি নাই! সে রং শুধু চিত্রপটের রং নহে, তাহাতে কবিত্বের রং ভাবের রং আছে। অর্থাৎ কোন্ জিনিষের কি রং শুধু সেই বর্ণনামাত্র নহে, তাহার মধ্যে হৃদয়ের অংশ আছে। তাহার একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলে কথাটা পরিষ্কার হইবে। কথাটা এই যে, ব্যাধ গাছের উপর চড়িয়া নীড় হইতে পক্ষীশাবকগুলিকে পাড়িতেছে—সেই অনুপজাত উৎপতনশক্তি শাবকগুলির কেমন রং? কাংশ্চিদল্পদিবসজাতান্ গর্ভচ্ছবিপাটলান্ শাল্মলিকুসুমশঙ্কামুপজনয়তঃ, কাংশ্চিদুদ্ভিদ্যমানপক্ষতয়া নলিনসংবর্ত্তিকানুকারিণঃ, কাংশ্চিদর্কোপলসদৃশান্, কাংশ্চিল্লোহিতায়মান চঞ্চুকোটীন্ ঈষদ্বিঘটিতদলপুটপাটলমুখানাং কমলমুকুলানাং শ্রিয়মুদ্বহতঃ, কাংশ্চিদনবরতশিরঃ কম্পব্যাজেন নিবারয়ত ইব, প্রতিকারাসমর্থান্ একৈকশঃ ফলানীব তস্য বনস্পতেঃ শাখাসন্ধিভ্যঃ কোটরাভ্যন্তরেভ্যশ্চ শুকশাবকানগ্রহীৎ, অপগাতাসূংশ্চ কৃত্বা ক্ষিতাবপাতয়ৎ! কেহবা অল্প দিবসজাত, তাহাদের নবপ্রসূত কমনীয় পাটল কান্তি যেন শাল্মলিকুসুমের মত, কাহারও পদ্মের নূতন পাপড়ির মত অল্প অল্প ডানা উঠিতেছে, কাহারও বা পদ্মরাগের মত বর্ণ, কাহারও বা লোহিতায়মান চঞ্চুর অগ্রভাগ ঈষৎ উন্মুক্তমুখ কমলমুকুলের মত, কাহারও বা মস্তক অনবরত কম্পিত হইতেছে যেন ব্যাধকে নিবারণ করিতেছে—এই সমস্ত প্রতিকারে অসমর্থ শুকশিশুগুলিকে বনস্পতির শাখাসন্ধি ও কোটরাভ্যন্তর হইতে এক একটি ফলের মত গ্রহণ পূর্ব্বক গতপ্রাণ করিয়া ক্ষিতিতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

ইহার মধ্যে কেবল বর্ণবিন্যাস নহে—তাহার সঙ্গে করুণা মাখানো রহিয়াছে—অথচ কবি তাহা স্পষ্টতঃ হাহুতাশ করিয়া ব্যক্ত করেন নাই, বর্ণনার মধ্যে কেবল তুলনাগুলির সৌকুমার্য্যে তাহা আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু এমন করিলে প্রবন্ধ শেষ হইবে না। কারণ কাদম্বরীর মধ্যে প্রলোভন রাশি রাশি,—এই কুঞ্জবনের গলিতে গলিতে নব নব বর্ণের পুষ্পিত লতাবিতান—এখানে সমালোচক যদি মধুপানে প্রবৃত্ত হয় তবে তাহার গুঞ্জনধ্বনি বন্ধ হইয়া যাইবে। বাস্তবিক আমার সমালোচনা করিবার উদ্দেশ্য ছিল না; কেবলমাত্র প্রলোভনে পড়িয়া এই পথে আকৃষ্ট হইয়াছি। যে উপলক্ষ্যে এই প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছিলাম, মনে করিয়াছিলাম অমনি সেই প্রসঙ্গে কাদম্বরীর সৌন্দর্য্য আলোচনা করিয়া আনন্দ লাভ করিয়া লইব। কিন্তু কিছুদুর অগ্রসর হইয়াই বুঝিতেছি এ পথ সংক্ষিপ্ত নহে,—এই রসস্রোতে আত্মসমর্পণ করিলে লক্ষ্যপথে আর শীঘ্র ফিরিতে পারিব না।

বর্ত্তমান সংখ্যক "প্রদীপে" যে চিত্রটি মুদ্রিত হইয়াছে সেই চিত্র অবলম্বন করিয়া কিছু লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম। ইহার মূল পটটি বর্ণ তৈলে অঙ্কিত, বিষয়টি কাদম্বরী হইতে গৃহীত এবং চিত্রকর আমার স্নেহাস্পদ তরুণবয়স্ক আত্মীয় শ্রীমান্ যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়।

এ কথা নিশ্চয়, সংস্কৃত সাহিত্যে আঁকিবার বিষয়ের অভাব নাই। কিন্তু শিল্পবিদ্যালয়ে আমাদিগকে অগত্যা য়ুরোপীয় চিত্রাদির অনুকরণ করিয়া আঁকিতে শিখিতে হয়। তাহাতে হাত এবং মন বিলাতী ছবির ছাঁচে প্রস্তুত হইয়া যায়, তাহার আর কোন উপায় থাকে না; সেই অভ্যস্ত পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেশী চক্ষু দিয়া দেশী চিত্রবিষয়কে দেখা আমাদের পক্ষে বড় কঠিন। যামিনীপ্রকাশ অল্প বয়সেই সেই কঠিন ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রথম চেষ্টার যথেষ্ট সফলতা দেখিয়াই "প্রদীপের" শিল্পানুরাগী বন্ধু ও কর্ত্তৃপক্ষগণ আগ্রহের সহিত এই চিত্রের প্রতিকৃতি মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং আমাকে ইহার ভূমিকা লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

কাদম্বরীর যে প্রসঙ্গটি চিত্রে বিবৃত হইয়াছে সেইটি সংস্কৃত হইতে বাঙ্গলায় ব্যাখ্যা করিলেই ইহার উপযুক্ত ভূমিকা হয়। সেই প্রসঙ্গটি কাদম্বরীর ঠিক প্রবেশ দ্বারেই। আলোচনা করিতে করিতে সেই পর্য্যন্তই আসিয়াছিলাম, কিন্তু লোভে পড়িয়া নানা দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। পুনর্ব্বার সেইখানে ফেরা যাক্।

নব প্রভাতে রাজা শূদ্রক সভাতলে বসিয়া আছেন এমন সময় প্রতিহারী আসিয়া ক্ষিতিতল নিহিতজানুকরকমলা হইয়া নিবেদন করিল দক্ষিণাপথ হইতে চণ্ডাল কন্যা একটি পিঞ্জরস্থ শুক লইয়া কহিতেছে যে, মহারাজ সমুদ্রের ন্যায় সকল ভুবনতলের সর্ব্বরত্নের একমাত্র ভাজন, এই বিহঙ্গটিও একটি পরমাশ্চর্য্য রত্নবিশেষ বলিয়া দেবপাদমূলে প্রদান করিবার জন্য আমি আগত হইয়াছি, অতএব দেবদর্শনসুখ অনুভব করিতে ইচ্ছা করি।"

পাঠকগণ মনে করিবেন না প্রতিহারী এত সংক্ষেপে নিষ্কৃতি পাইয়াছে—অকৃপণা কবিপ্রতিভা তাহার প্রতিও অজস্র কল্পনাবর্ষণ করিয়াছেঃ—তাহার বাম পার্শ্বে অঙ্গনাজনবিরুদ্ধ কিরীচাস্ত্র লম্বিত থাকাতে তাহাকে বিষধরজড়িত চন্দনলতার মত ভীষণ রমণীয় দেখিতে হইয়াছে, সে শরৎলক্ষ্মীর ন্যায় কলহংসশুভ্রবসনা, এবং বিন্ধ্যবনভূমির ন্যায় বেত্রলতাবতী; সে যেন মূর্ত্তিমতী রাজাজ্ঞা, যেন বিগ্রহিনী রাজ্যাধিদেবতা।

সমীপবর্ত্তী রাজগণের মুখাবলোকন করিয়া উপজাতকুতূহল রাজা প্রতিহারীকে কহিলেন, দোষ কি, তাহাকে প্রবেশ করিতে দাও! প্রতিহারী তখন চণ্ডালকন্যাকে সভাতলে উপস্থিত করিল।

সেখানে অশনিভয়পুঞ্জিত শৈলশ্রেণীমধ্যগত কনকশিখরী মেরুর ন্যায় নরপতিসহস্রমধ্যবর্ত্তী রাজা। নানারত্নাভরণকিরণজালে তাঁহার অবয়ব প্রচ্ছন্নপ্রায় হওয়াতে মনে হইতেছে যেন সহস্র ইন্দ্রায়ুধে অষ্টদিগ্‌বিভাগ আচ্ছাদিত করিয়া বর্ষাকালের ঘনগম্ভীর দিন বিরাজমান; স্থূলমুক্তাকলাপলম্বিত স্বর্ণশৃঙ্খলে বদ্ধ মণিদণ্ডচতুষ্টয়ে অমলশুভ্র অনতিবৃহৎ দুকূলবিতান বিস্তৃত, তাহারই অধোভাগে ইন্দুকান্তমণিপর্য্যঙ্কে রাজা নিষণ্ণ; তাঁহার পার্শ্বে কনকদণ্ডচামরকলাপ উদ্ধূয়মান; পরাভবপ্রণত শশির ন্যায় বিশদোজ্জ্বল স্ফটিক পাদপীঠে তাঁহার বামপদ বিন্যস্ত; অমৃতফেনের ন্যায় তাঁহার লঘুশুভ্র দুকূলবসনের প্রান্তে গোরোচনাদ্বারা হংসমিথুনমালা অঙ্কিত; অতি সুগন্ধ চন্দনানুলেপনে তাঁহার উরঃস্থল ধবলিত, তাহারই মধ্যে

মধ্যে কুঙ্কুম চর্চ্চিত হওয়াতে স্থানে স্থানে নিপতিত প্রভাতরবিকিরণে অঙ্কিত কৈলাসশিখরীর ন্যায় তিনি শোভমান; ইন্দ্রনীল অঙ্গদযুগলে তিনি দুই বাহুতে চপলা রাজলক্ষ্মীকে যেন বাঁধিয়া রাখিয়াছেন; তাঁহার কর্ণোৎপল ঈষৎ আলম্বিত; মস্তকে আমোদিত মালতীমালা, যেন ঊষাকালে অস্তাচলশিখরে তারকাপুঞ্জ পর্য্যন্ত: সেবাসঙ্গতা অঙ্গনাগণ দিগ্বধূর ন্যায় তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। তখন প্রতিহারী নরপতিকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য রক্ত-কুবলয়দল কোমল হস্তে বেণুলতা গ্রহণ করিয়া একবার সভাকুট্টিমে আঘাত করিল। তৎক্ষণাৎ তালফলপতন শব্দে বনকরীযূথের ন্যায় রাজগণ মুখ আবলিত করিয়া তদভিমুখে দৃষ্টিপাত করিলেন।

তাঁহারা দেখিলেন আর্য্যবেশধারী ধবলবসন একটি বৃদ্ধ চণ্ডাল অগ্রে আসিতেছে, তাহার পশ্চাতে কাকপক্ষ-ধারী একটি বালক স্বর্ণশলাকানির্ম্মিত পঞ্জরে বিহঙ্গকে বহন করিয়া আনিতেছে, এবং তাহার পশ্চাতে নিদ্রার ন্যায় লোচনগ্রাহিণী এবং মূর্চ্ছার ন্যায় মনোহরা একটি তরুণ-যৌবনা কন্যা;—অসুরগৃহীত অমৃত অপহরণের জন্য কপটপটুবিলাসিনীবেশধারী ভগবান্ হরির ন্যায় সে শ্যাম-বর্ণা, যেন একটি সঞ্চারিণী ইন্দ্রনীলমণিপুত্তলিকা; আগুল্ফ-বিলম্বিত নীলকঞ্চুকের দ্বারা তাহার শরীর আচ্ছন্ন এবং তাহারই উপরে রক্তাংশুকের অবগুণ্ঠনে যেন নীলোৎপল-বনে সন্ধ্যালোক পড়িয়াছে; একটি কর্ণের উপরে উদীয়মান ইন্দুকিরণচ্ছটার ন্যায় একটি শুভ্র কেতকীপত্র আশক্ত; ললাটে রক্তচন্দনের তিলক, যেন কিরাতবেশা ত্রিলোচনা ভবানী।

আমাদের সমালোচ্য চিত্রের বিষয়টি কিঞ্চিৎ সংক্ষেপে অনুবাদ করিয়া দিলাম। সংস্কৃত কবিদের মধ্যে চিত্রাঙ্কণে বাণভট্টের সমতুল্য কেহ নাই এ কথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি। সমস্ত কাদম্বরীকাব্য একটি চিত্রশালা। সাধারণতঃ লোকে ঘটনা বর্ণনা করিয়া গল্প করে—বাণভট্ট পরে পরে চিত্র সাজ্জিত করিয়া গল্প বলিয়াছেন—এই জন্য তাঁহার গল্প গতিশীল নহে, তাহা বর্ণচ্ছটায় অঙ্কিত। চিত্রগুলিও যে ঘনসংলগ্ন ধারাবাহিক, তাহা নহে; এক একটি ছবির চারি দিকে প্রচুর কারুকার্য্য বিশিষ্ট বহুবিস্তৃত ভাষার সোণার ফ্রেম্ দেওয়া,—ফ্রেম সমেত সেই ছবিগুলির সৌন্দর্য্য আস্বাদনে যে বঞ্চিত—সে দুর্ভাগ্য।

কাদম্বরীর এই ভাষাচিত্রগুলি বর্ণচিত্রে অনুবাদিত হইবার জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়া আছে। পাঠকের চিত্তপটে যে ছাপ পড়িতেছে সে ছাপ পুনরায় দৃশ্যপটে না জাগিলে কি তৃপ্তি হয়?—সঙ্গীতের বেদনা যেমন স্বগত গানের দ্বারা পরিতৃপ্ত হয় না, তাহা কণ্ঠস্বরের জন্য ব্যাকুল হয়, তেমনি কাদম্বরী পাঠে আমাদের হৃদয়ে পদে পদে যে একটি পরমানন্দকর চিত্রবেদনার উদ্রেক করে, তাহা চিত্র-করকে আহ্বান করিতে থাকে। সেই আহ্বানে যে কিশোরশিল্পী অশিক্ষিতপটুপ্রতিভাসহায়ে সাড়া দিয়াছেন তাঁহাকে আমরা অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করি এবং তাঁহার প্রতি যাহাদের আত্মীয়জন সুলভ পক্ষপাত থাকি-বার সম্ভাবনা নাই, সেই চিত্রকলাভিজ্ঞ সুযোগ্য গুণী ব্যক্তিগণকে এই চিত্র সমালোচনার জন্য অনুরোধ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি।

রেশম শিল্প।

ইংলণ্ড ও ইংলণ্ডের কোন উপনিবেশে রেশম জন্মে না; তজ্জন্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট, ভারতবর্ষের রেশম শিল্পে উৎসাহ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট, এ দেশের রেশম শিল্পে কতদূর পর্য্যন্ত উন্নতি দেখিতে চান, আমরা তাহা অবগত নই। এ দেশের লোকের উৎকৃষ্ট তুঁতপত্র উৎপাদনে ও নির্দ্দোষ গুটিপোকা হইতে উৎকৃষ্ট রেশম প্রস্তুত ব্যাপারে বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট নিয়তই উৎসাহ দিতে প্রস্তুত আছেন। এদেশের তূলা যেমন ইংলণ্ড হইতে বস্ত্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এ দেশে আইসে, রেশম তেমনি বস্ত্রমূর্ত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক বিবিধ রঞ্জনে রঞ্জিত হইয়া যাহাতে এ দেশে আইসে, বোধ হয় ব্যবসায়ী ইংরেজ জাতির এই-রূপ অভিপ্রায় হইয়াছে। উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, গবর্ণ-মেণ্টের উৎসাহ দানে যে এ দেশের একটী অবনতি প্রাপ্ত শিল্পের প্রচুর উপকার সাধিত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

লোকের বিশ্বাস চীন দেশ, রেশমোৎপত্তির আদি স্থান। চীন দেশ হইতে পৃথিবীর নানা স্থানে রেশমের সঞ্চার হইয়াছে। ইহার সত্যতার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নাই। প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে কৌশেয় বসনের প্রচলন আছে। পৌরাণিক কালে ভারতবর্ষে চীন দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার্য্য বস্ত্রের আমদানী হইত উহা চীনাংশুক নামে সংস্কৃত সাহিত্যে বারংবার উল্লিখিত হই-য়াছে। পদ্মপুরাণকার শ্রীকৃষ্ণকেও চীনাংশুক পরাইয়া-ছেন: চীনাংশুকের কার্পাস বস্ত্র না হইয়া রেশমী বস্ত্র হওয়ার সম্ভব।

প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষের একটী দেশ, রেশ-মোৎপত্তির জন্য বিখ্যাত ছিল। সেই দেশকে কোষকার-দের দেশ বলিত: কখনও পুণ্ড্রদেশকে কখন বা পুণ্ড্র-সংবলিত পার্শ্ববর্ত্তী দেশকে কোষকার-দেশ বলা হইয়াছে। এখনকার মালদহ, বগুড়া, রাজসাহী ও মুর্শীদাবাদ জেলা এই প্রাচীন কোষকার-দেশ। বঙ্গদেশের মধ্যে এখনও এই কয়েক জেলায় রেশমের কারবার অধিক হয়। এই কয়েক জেলার মধ্যে মালদহ জেলা, আবার রেশমোৎ-পত্তির সর্ব্বপ্রধান স্থান। মোগল রাজত্ব কালে দিল্লী ও আগরার ওমরাহ মহলে ও বাদশাহের অন্তঃপুরে মালদহের বিবিধ রেশমী বস্ত্র আদর লাভ করিয়াছিল। শুনা যায় ভিকুসেথ নামক এক মহাজনের কৌশেয়বসনপূর্ণ বাণিজ্য পোত পারস্যোপসাগর পর্য্যন্ত গমন করিত। মালদহ জেলার মধ্যে জোত আরাপুর ও ভোলাহাট গ্রামের লোকে প্রচুর পরিমাণে রেশম উৎপাদন করে। অতএব সমুদায় বঙ্গদেশের মধ্যে জোত আরাপুর ও ভোলাহাটের ন্যায় রেশম উৎপাদনের স্থান আর নাই। এই কারণে বাঙ্গা-লার ভূগোলে এই দুই স্থানের নাম সন্নিবেশিত হওয়া উচিত। পুণ্ড্রজাতি এ জেলার আদিম অধিবাসী। অতি প্রাচীন কাল হইতে পুণ্ড্রজাতি এই ব্যবসায় করিয়া আসিতেছে।

যাহারা তুঁত পাতা জন্মায়, পলু পোষে এবং রেশম সম্বন্ধীয় অন্যান্য কার্য্য করে, লোকে তাহাদিগকে বসনী বলে। বোধ হয় এই শব্দটী বসনী (বসন+ইন্) শব্দ হইতে উৎপন্ন। পূর্ব্বাপেক্ষা বসনীদের বিস্তর অবনতি ঘটিয়াছে। রেশম ব্যবসায়ে তেমন লাভ হয় না বলিয়া অনেকে উহা পরিত্যাগ করিয়াছে। তজ্জন্য অনেক বানক (রেশমি কুঠি) বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বসনীরা বলেন যে, এখন যেমন ঘন ঘন পলু মারা যায়, পূর্ব্বে তেমন হইত না। তুঁতের ভুঁই পা'ট করিতে ও পলুর প্রতি যত্ন করিতে হইলে আলস্যের বশীভূত হইলে চলে না। পূর্ব্ব-কার বসনীদের অপেক্ষা এখনকার বসনীরা কিছু আলস্যের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা রেশম ব্যবসায়ে পূর্ব্বের ন্যায় লাভবান হইতে পারেন না।

নানাবিধ রোগে পলু মারা যায়। পলুর বিবিধ রোগের মধ্যে কটাবা পেব্রিণ, কালশিরা, চুলোকেটে, কুর্কুট্টে ও রসা রোগ প্রধান। কটা রোগের ন্যায় পলুর শত্রু আর নাই, কারণ এই রোগ হইলে অন্যান্য রোগও আসিয়া উপস্থিত হয়। দুই একটী পলুকে এই রোগের অধীন দেখিলেই তাহা ফেলিয়া দিতে হয়, নতুবা সমুদায় পলু এই রোগে মারা যাইতে পারে। নগ্ন চক্ষুতে, এই রোগ হই-য়াছে কিনা, জানা কঠিন; অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিলে রোগ হইয়াছে কিনা সহজেই জানিতে পারা যায়। রেশম কোম্পানীর নিয়োজিত শিক্ষিত কর্ম্মচারিগণের উপদেশে আজ কাল অণুবীক্ষণের ব্যবহার করিয়া অনেকে উপকার পাইতেছেন। বিজ্ঞান জগতে অণুবীক্ষণের উপকারিতা যে কতদূর, তাহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবিদিত নাই।

বাঙ্গালা দেশের স্থান বিশেষে ছোট পলু, বড় পলু ও নিস্তারি পলু বা মান্দ্রাজি পলু পোষা হইয়া থাকে। মাল-দহ জেলায় ছোট পলু পালন করা হয়: যত্নের কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলেই ছোট পলু মারা যায়। যত্নের অভাবে ইহার এতদূর অবনতি হইয়াছে যে, এখন অবধি সতর্ক না হইলে এ দেশ হইতে রেশমের ব্যবসায় এক কালে উঠিয়া যাইবে। উপযুক্ত সময়ে এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। প্রত্যেক দেশহিতৈষী ব্যক্তির এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সহা-য়তা করা কর্ত্তব্য।

পলুর ঘরের উত্তাপ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে রাখিতে না পারিলে পলুর রোগ হয়। তাপপরিমাণ নির্ণয়ের জন্য তাপ-মান যন্ত্রের ব্যবহার করিয়া অনেকে সুফল পাইতেছেন। কোন কোন বসনী বলিয়া থাকেন যে—"অণুবীক্ষণ ও তাপমান যন্ত্রের ব্যবহার না করিয়াও আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ রেশমের কারবারে লাভ করিতেন। আমাদের ইংরেজী মতে চলার প্রয়োজন কি?" তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত যে, তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের ন্যায়

পরিশ্রম করেন না। তাঁহারা পলুর এত যত্ন করিতেন যে, রীতিমত স্নানাহারের সময় পাইতেন না। তাঁহারা, পলু "রোজে বসিলে" তৈল মাখিতেন না এবং মৎস্য খাইতেন না। এখনকার অনেক বসনী তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় শুচি থাকিতে কষ্ট বোধ করেন। অণুবীক্ষণ ও তাপমানের ব্যবহারে ফল পাওয়া গেলে, তাহাতে অবহেলা করা অন্যায়।

ভাল ঘরে রাখিয়া পলু না পুষিলে পলুর রোগ হয়। অতএব ঘর নির্ম্মাণ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। ইহাতে কিছু ব্যয় হয় বটে, কিন্তু পরিণামে তাহা উঠিয়া থাকে। পলুর ঘর শুষ্ক ও খট্‌খটে হওয়া উচিত। ঘরের বায়ু বিশুদ্ধ রাখিতে হইলে তাহাতে মধ্যে মধ্যে গন্ধকের ধূম দিতে হয়। তুঁতিয়া ও চূণমাটী দিয়া ঘরের মেঝে নিকাইলে ঘরটী শুষ্ক ও খট্‌খটে হইয়া থাকে। তুঁতে রোগ সংক্রমণ নিবারণ করে, চূণে দুর্গন্ধ নষ্ট হয়, এবং গন্ধকের ধূমে রোগের "ওড়াবীজ" নষ্ট হয়। আমাদের দেশের বসনীগণ ঘরনির্ম্মাণ বিষয়ে নিতান্ত অসাবধান। তাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে কপালের দোষ দিয়া বসিয়া থাকেন। তুঁতিয়া, চূণ ও গন্ধক দেশীয় দ্রব্য। ব্যবহারের প্রণালী শিখিয়া ব্যবহার করিতে পারিলে উহাতে নিশ্চয়ই ফল পাওয়া যায়। কলের গাড়ীতে ও কলের জাহাজে চড়িতে হইতেছে, বিলাতি কাপড় পরা হইতেছে, উহাতে ত ধর্ম্ম বজায় আছে। চূণ, তুঁতে, গন্ধক, অণুবীক্ষণ ও তাপমান ব্যবহারে জাতি যাইবে কেন? ধর্ম্ম হানিই বা হইবে কেন?

পলুর ঘর স্যাঁৎসেঁতে হইলে, পলুর একপ্রকার রোগ হয়। এই রোগের নাম চুণোকেটে। চুণোকেটে অতি বর্দ্ধনশীলরোগ। আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় দুটী একটাকে এই রোগগ্রস্ত দেখিতে পাইলে তখনই তাহা ফেলিয়া দেওয়া উচিত। এই রোগকে অনেক সময়ে সামান্য জ্ঞান করিয়া বসনীগণ বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন।

অপকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন করিলে যেমন মনুষ্যের পেটের রোগ হয়, সেইরূপ মন্দ বা অপরিষ্কৃত পাতা খাইয়া পলুর একপ্রকার রোগ হয়, তাহার নাম কালশিরা। পলুর গায়ে বেশী গরম লাগিলেও পলুর কালশিরা হয়। অতএব ঘরের উষ্ণতা যাহাতে অতিরিক্ত না হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা নিতান্ত আবশ্যক। ধূলাভরা ও কাদাভরা ভাপাপাতা খাওয়াইলে পলুর কালশিরা রোগ হইয়া থাকে। উষ্ণতা ও শৈত্যের আকস্মিক পরিবর্ত্তনে যেমন মনুষ্যের সর্দ্দিগরমি হইয়া থাকে, সেইরূপ পলুরও সর্দ্দিগরমি হইয়া থাকে। পলুর এই রোগের নাম রসারোগ। ভিজা পাতা খাওয়াইলে অথবা কখনও নরম, কখনও কড়া পাতা খাওয়াইলে পলুর রসারোগ হইয়া থাকে।

পলুর ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত। চালে বা বেড়ায় আরসুলা, টিক্‌টিকি বা ঝুল্‌ থাকিলে তাহা ঝাড়িয়া ফেলিতে হয়। আরসুলা, টিক্‌টিকি ও মাছি, এই ক্ষুদ্র কীটের প্রবল শক্র। ঘরে দরজা ও কতকগুলি জানালা রাখিতে হয়। যাহাতে বাহির হইতে কোন কীট বা সরীসৃপ পলুর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার জন্য দস্তা বা লোহার জালদিয়া জানালাগুলি বুনিয়া দেওয়া উচিত। ইহাতে গৃহাভ্যন্তরে আলোক প্রবেশের ব্যাঘাত হয় না। শৈত্য ও উষ্ণতার ব্যতিক্রম রক্ষার্থ গৃহাভ্যন্তরে জানালার পশ্চাৎদিকে কাঠের জানালা রাখিতে হয়। প্রয়োজন হইলে তাহা বন্ধ করিলে গৃহাভ্যন্তরের শৈত্য ও উষ্ণতা রক্ষিত হইতে পারে। মাছি হইতে পলুকে রক্ষা করিতে হইলে, পলুর ঘরের দরজা সংলগ্ন আর একটী ঘর নির্ম্মাণ করিতে হয়। ইহা অবশ্য আকারে ক্ষুদ্র হওয়া চাই। ইহার এক কোণে একখানা আয়না রাখিয়া দিলে, মাছিগুলি উহার উপর গিয়া বসে, তখন ঝাঁটাদিয়া উহা মারিয়া ফেলিতে হয়। ফলতঃ অবিরত সতর্ক দৃষ্টিসম্পন্ন না হইলে পলুপালন হইয়া উঠে না।

পাতা দেওয়ার অনিয়মে পলু মারা যায়, কিংবা তাহা ভাল করিয়া পাকে না। পলুর পেটে রেশমের সঞ্চার হইলে পাতা দেওয়ার অনিয়মে রেশমের ক্ষতি হয়। এই কার্য্যে বিস্তর পরিশ্রমের প্রয়োজন। পূর্ব্বে সকল বসনী, স্বয়ং এ কার্য্য করিতেন। এখন শ্রম কাতরতা জন্য অনেকে নিজে না করিয়া বেতন দিয়া লোক রাখিয়া থাকেন। যে সকল লোক রাখেন, তাহারা শুচি বা অশুচি অবস্থায় পলুকে পাত দিতেছে কিনা, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখেন না। নিজের কাজ পরকে দিয়া করাইতে গেলেই ফল ভাল হয় না।

পলুর নাদি ও পলুপাত খাইয়া যাহা পরিত্যাগ করে,

তাহা প্রত্যহ পরিষ্কার করা উচিত। এইরূপ পরিষ্করণকে "কাসার করা" বলা হয়। কাসার না করার জন্য বা সাবধান হইয়া কাসার না করার-জন্য বিস্তর পলু মারা পড়ে। পলুর উপর জাল বিছাইয়া জালের উপর পাতা দিলে, পলু পাতা খাওয়ার লোভে জালের ছিদ্র দিয়া জালের উপরে উঠিয়া বসে; তখন নীচের ডালার নাদি ও পাতা ঝাড়িয়া ফেলিতে পারা যায়। ইহাতে হাতের দাবানি ও নখের আঁচড় লাগিয়া পলু মারা যায় না।

এ দেশের বসনীদের কতকগুলি ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা হয়ত মরাপলু, পলুর নাদি ও কাসার ঘরের এক কোণে বা ঘরের সম্মুখবর্ত্তী আঙ্গিনায় রাশি করিয়া রাখিলেন। এরূপ করিলে রোগের বীজাণু বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। ডালা চন্দ্রকী, ঘড়া, কাঠি-আদি উপকরণ তুঁতের জল দিয়া ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলান হয় না। ইহাতে রোগের বীজাণু নষ্ট হয় না। ঘর শুকাইল কিনা, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয় না। অনেকে মরা পলু ও কাসার একটী গর্ত্তে না পচাইয়া উহা জমিতে সারের ন্যায় ব্যবহার করেন, ইহাতে অত্যন্ত অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। পাতার রসে রোগের বীজ প্রবেশ করে। গুড়াপলু অর্থাৎ শিশু পলু ও অধিকবয়স্ক পলুকে সমানভাবে পাত দেওয়া হইয়া থাকে। আমরা যেমন বালকদিগকে বারে বেশী ও পরিমাণে কম আহার দিয়া থাকি, গুড়া পলুকেও সেইরূপ বারে বেশী ও পরিমাণে কম আহার দেওয়া কর্ত্তব্য। বালকদিগকে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেমন বারে কম ও পরিমাণে বেশী আহার দেওয়া হয়, পলুর পক্ষেও সেই ব্যবস্থা; ইহার অন্যথা হইলে পলুর আশানুরূপ পুষ্টি হয় না।

শুনিয়াছি, ব্রহ্মদেশের লোকে পলুর ঘর অতিসুন্দররূপে নির্ম্মাণ করে। ফ্রান্স ও ইটালিদেশে রেশম-শিল্পের প্রচুর উন্নতি সাধিত হইয়াছে; কার্য্যকরী শিক্ষায় অবহেলা করিলে দেশে ধনাগমের উপায় হয় না। ধনাগম ত দূরের কথা, ধন রক্ষণেও আমাদের ক্ষমতার অভাব দেখা যায়। গো-পালনে আমাদের দেশের লোকের কিরূপ ঔদাসীন্য, তাহা গোশালাগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। পলু বা রেশমকীট পালনে যে আমাদের ঔদাস্য, তাহা পলুর ঘর দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। রঞ্জতন শিল্প ত আমাদের দেশ হইতে তিরোহিত হইয়াছে। যাহাতে রেশম শিল্প অবনতির হস্ত হইতে উদ্ধার পায় তাহার জন্য সকলেরই যত্নবান্ হওয়া উচিত। স্বাধীন ব্যবসায় ও স্ববৃত্তি কদাচ একাসনে বসিতে পারে না। বসনীদের স্মরণ রাখা উচিত, তাঁহারা স্বাধীন ব্যবসায়ী; তাঁহাদের ব্যবসায় অতি পবিত্র। এ ব্যবসায়ে তাঁহাদের যেন অনাদর বুদ্ধি জন্মে না।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

কামাখ্যা।

কামরূপ কামাখ্যার নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন; এখনও এ দেশে অনেক লোকের মুখে কামরূপের ডাকিনী-মন্ত্রের গল্প শুনা যায়; কামাখ্যায় আসিলে মানুষ প্রায়ই স্বদেশে ফেরে না; যাদুমন্ত্রে স্ত্রীলোকগণ তাহাদিগকে বশ করিয়া রাখে; মন্ত্রের বলে সিংহ মানুষের মত কথা কয়; মানুষ ইচ্ছামত পশুপক্ষীর আকার ধারণ করিতে পারে, এ সকল গল্পও অনেকে শুনিয়াছেন। এদেশের বাজীকরেরা কামরূপ কামাখ্যার আজ্ঞার দোহাই দিয়া এখনও নানা কৌশলে দর্শকমণ্ডলীকে বিমোহিত করে। কামাখ্যা কামরূপের নামান্তর মাত্র। ইহা অতি প্রাচীন দেশ। মহাভারতেও কামরূপের কথা উল্লেখ আছে। ভগদত্ত, বাণ, ভীষ্মক, ঘটোৎকচ প্রভৃতি রাজাগণ এ প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। মহাভারতে এ দেশ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বলিয়া খ্যাত ছিল। কামাখ্যা হিন্দুর প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। এই তীর্থ একান্ন পিঠের এক পিঠ। দক্ষ যজ্ঞে, সতী শিব-নিন্দা শ্রবণে প্রাণত্যাগ করিলে শিব সতী দেহ লইয়া নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন; শেষে বিষ্ণু চক্রে দেহ খণ্ড খণ্ড হইয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে পতিত হয়। দেহের স্থান বিশেষ নীলাচলে পড়াতে এই স্থান কামাখ্যা নামে প্রসিদ্ধ।

কামাখ্যার নাম কামরূপ হইবার একটী পৌরাণিক প্রবাদ আছে। শিব সতী শোকে অধৈর্য্য হইয়া এরূপ যোগনিরত হইলেন যে, সে যোগভঙ্গ করে কাহার সাধ্য! দেবতা সকল বিশেষ ভীত হইয়া কামদেবকে যোগ ভঙ্গের জন্য পাঠান। কামদেব যোগ ভঙ্গ করাইয়া শিব-কোপা-

চামুণ্ডা মূর্ত্তি দর্শন করিতে হয়। মন্দির হইতে বাহিরে আসিবার পূর্ব্বে প্রবেশ দ্বারের সম্মুখেই জয় ঘণ্টা দোদুল্যমান। এই ঘণ্টা বাজাইয়া বাহিরে আসিতে হয়। বাহিরে আসিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে হয়। মন্দিরের ঈশান কোণে সৌভাগ্যকুণ্ডের তটে কমলেশ্বর বিষ্ণু আছেন। মন্দির হইতে বাহিরে আসিলেই কুমারীরা দলে দলে "একটী পয়সা, একটী পয়সা" বলিয়া যাত্রীদিগকে আঁটিয়া ধরে। তাহারা অল্পেই সন্তুষ্ট। কুমারীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে—প্রায় চারি পাঁচ শত হইবে। কাশীতে দণ্ডী ভোজনের যেরূপ ফল, কামাখ্যায় কুমারী ভোজনেরও সেইরূপ ফল বলিয়া কথিত আছে। কুমারী ভোজন করাইবার বন্দোবস্ত যাত্রীরা স্বয়ং করিয়া লইতে পারেন। এ ব্যাপার পাণ্ডা মহাশয়দিগের হাতে না দেওয়াই ভাল।

কলিকাতা হইতে দুইটী রাস্তা দিয়া এখানে আসা যায়। একটী শেয়ালদহ হইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত রেলে। আর একটী শেয়ালদহ হইতে দার্জ্জিলিং মেলে চড়িয়া যাত্রাপুর পর্য্যন্ত আসিতে হয়। প্রথমোক্ত পথে গোয়ালন্দ হইতে ষ্টীমার যোগে একবারে গোহাটী পৌঁছান যায়। ষ্টীমার কোম্পানি এখন সময়েরও বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। গোয়ালন্দ হইতে গোহাটী পৌঁছিতে প্রায় দুই দিন লাগে। ষ্টীমারে আর কোথাও নামা উঠা করিতে হয় না। শেষোক্ত পথে যাত্রাপুরে ষ্টীমারে উঠিয়া গোহাটী পৌঁছিতে হয়। এ রাস্তায় বড়ই উঠা নামার ক্লেশ ভোগ করিতে হয়; সে জন্য অনেকের পক্ষে প্রথমোক্ত পথই ভাল। ধুবড়ি-তিস্তা—গোহাটী রেলওয়ে শীঘ্রই খুলিবে, তখন যাত্রীদের এ কষ্টটুকুও আর থাকিবে না। কাশী গয়ার মত একবারে কলিকাতার রেলে চড়িলে গোহাটী আসা যাইবে। ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থান হইতেই এখানে যাত্রীর সমাগম হয়। রাজন্যবর্গের মধ্যে দ্বারভাঙ্গার বর্ত্তমান মহারাজাই অগ্রণী। তীর্থ স্থান বাল্যাবধিই মহারাজের প্রিয় দর্শনীয় স্থান। এ ভিন্ন প্রত্যেক বৎসরেই অনেক যাত্রীর সমাগম হয়।

কামাখ্যার আধ মাইল দূরে পর্ব্বতের উপর ভুবনেশ্বরীর মন্দির। স্থানটী যথার্থ ই নৈসর্গিক শোভার আধার। বিগত ভূমিকম্পে এখানকার পুরাতন মন্দিরটী ভূমিসাৎ হইয়াছে। সম্প্রতি পুনরায় নূতন মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে একজন ব্রহ্মচারী আছেন। প্রতিদিনই দেবীর নিয়মিতরূপে পূজা হয়।

গোহাটীতে আরও অনেক তীর্থ আছে। ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে উমানন্দর (স্বয়ম্ভুলিঙ্গ) মন্দির আছে। শিব-রাত্রির দিন এখানে খুব ঘটা হয়। গোহাটী সহরের মধ্যে শুক্লেশ্বর, উগ্রতারা, মঙ্গলচণ্ডী ও নবগ্রহের মূর্ত্তি আছে। গৌহাটির উত্তরে অশ্বক্লান্ত তীর্থ। এখানে পিণ্ডদানের ফল হয়। এস্থানে ত্রিরাত্র বাস করিতে হয়।

গোহাটীর ছয় মাইল দূরে বশিষ্ঠাশ্রম। স্থানটী পরম রমণীয়। এখানে ত্রিসন্ধ্যা করিলে কোটী জন্মে সন্ধ্যা না করার পাপ ক্ষয় হয়। সন্ধ্যা, ললিতা ও কান্তা নামে তিনটী স্রোত ক্রমাগতই এখানে বহিতেছে। এ স্রোত কোথা হইতে আসিতেছে এখনও কেহ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। বশিষ্ঠাশ্রমে যাইবার বিশেষ কোন অসুবিধা নাই। ঘোড়ার গাড়ী করিয়া যাওয়া যায়। এখানে বশিষ্ঠ মুনির আশ্রম ছিল বলিয়া কথিত আছে।

শ্রীমহিমচন্দ্র গুপ্ত।

——০——

শ্রীযুক্ত শশিকুমার হেশ।

শ্রীযুক্ত শশিকুমার হেশের নাম এখনও আমাদের দেশের এত অল্প লোকেই শুনিয়াছেন যে, হঠাৎ তাঁহার সচিত্র জীবনী প্রকাশ করিবার আগে দুই একটা কথা বলা আবশ্যক বোধ করিতেছি।

কিয়ৎকাল পূর্ব্বে 'সঞ্জীবনীতে' ইটালী প্রবাসীর পত্র শীর্ষক কতকগুলি সুখপাঠ্য প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, তাহা হয় ত অনেকে দেখিয়াছেন। শশী বাবুই সেই সকল পত্রের লেখক। কিন্তু 'সঞ্জীবনীর' লেখক বলিয়া তাঁহার পরিচয় দেওয়া আমাদের অভিপ্রেত নহে। ইনি একজন চিত্র-শিল্পী; ইউরোপের নানা স্থানে থাকিয়া চিত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা ও খ্যাতি লাভ করিয়া সম্প্রতি দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

গত নবেম্বর মাসে বিলাতের 'ইম্পীরিয়েল্ ইনষ্টিটুট' নামক একটী সভা-গৃহে শশী বাবুর লিখিত একটী প্রবন্ধ ডাক্তার মল্লিক কর্ত্তৃক পঠিত হয়। সার জর্জ্জ বার্ডউড্ সেই সভার সভাপতি ছিলেন; বক্তৃতার বিষয় ছিল

শ্রীশশিকুমার হেশ।

"ইংলণ্ড ও ইউরোপ-মহাদেশে লব্ধ শিল্প বিষয়ক অভিজ্ঞতা" ("Artistic experiences on the continent and in England")। সেই সভার বিবরণ দিতে গিয়া কলিকাতাস্থ ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রের বিলাতী সংবাদদাতা (স্যর জর্জ্জ বার্ডউড্) ক্রিকেটবীর রঞ্জিৎ সিংহজী ও র‍্যাংলার পরাঞ্জপ্যের নামের সঙ্গে শশী বাবুর নাম এক নিশ্বাসে উল্লেখ যোগ্য ও এক প্যারাগ্রাফে লিখিতব্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। তাঁহার শিল্পনৈপুণ্যেরও খুব প্রশংসা করিয়াছেন। হাণ্টার সাহেবও বিলাতের 'টাইমস্' পত্রে শশী বাবুর প্রশংসা করিয়াছেন। এ দেশে শশী বাবুর গুণের কিরূপ মর্য্যাদা হইবে, তাহা জানি না। কিন্তু বিলাতে তাঁহার গুণগ্রামের যথেষ্ট সম্মান হইয়াছে। পূর্ব্বোল্লিখিত দুই প্রসিদ্ধ পুরুষ ব্যতীত লর্ড নর্থব্রুক্, লর্ড রে, স্যর ষ্টুয়ার্ট বেলী, স্যর আলফ্রেড্, স্যর উইলিয়ম্ ওয়েডারবার্ণ, কেইন্, হিউম্ প্রভৃতি খ্যাতনামা ইংরেজের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া তিনি তাঁহাদিগের প্রশংসা ও বন্ধুত্ব লাভে সমর্থ হইয়াছেন। এক্ষণে এ দেশে তিনি কিরূপ প্রতিপত্তি লাভ করেন, তাহা দেখিতে অনেকেই উৎসুক আছেন।

যদিও তিনি কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট আর্ট-স্কুলে কিয়ৎকাল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার শিক্ষা প্রকৃত প্রস্তাবে ইউরোপেই হইয়াছে বলিতে হইবে। সেখানে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইনি প্রায় ছয় বৎসরকাল ছিলেন।

যতদূর অবগত আছি, শশী বাবুর পূর্ব্বে পরলোকগত রোহিণীকান্ত নাগ ব্যতীত আর কেহ আমাদের দেশ হইতে শিল্পবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য ইউরোপে যান নাই। কিন্তু হতভাগ্য রোহিণীর কথা মনে হইলে আজিও অশ্রু সংবরণ করা যায় না। শুনিয়াছি রোহিণীকে সেই সুদূর বিদেশে অর্থাভাবে অনাহারে অনেক সময়ে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। সেই বিদেশে বিজাতির মধ্যে Blackieর জন্য যতটুকু সহানুভূতি ছিল, এ দেশে তাহাও ছিল না। ক্রমে অনাহারে বা স্বল্পাহারে, অনিদ্রায় ও দুশ্চিন্তায় তাহার শরীর ও মন ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। রোহিণীর এই শোচনীয় অকালমৃত্যুর জন্য কে দায়ী, তাহার আত্মীয়বর্গ, না দেশের ধনিগণ, না সে নিজে; কাহার দোষে ভারত মাতার এই শোক, তাহা ঠিক বলা সহজ নহে; বোধ হয় সকলকে সমান ভাগ করিয়া দিলে কাহারো আপত্তি থাকিবে না।

যাক্ রোহিণীর কথা ; আমরা শশী বাবুর কথা বলিতে আসিয়াছি, সংক্ষেপে তাহাই বলিব।

দশ বৎসর পূর্ব্বে ইনি একজন পাঠশালার ইন্স্পেক্টিং পণ্ডিত ছিলেন। সেই সময়ে কোন চিঠির প্রান্তে ইঁহার অঙ্কিত একটী ক্ষুদ্র চিত্র দেখিয়া আমরা বলাবলি করিয়াছিলাম যে, যদি ইনি আর্টস্কুলে পড়িতেন, তবে খুব 'শাইন্' করিতে পারিতেন। কথাটা ইঁহার কাণে গেল, ভগবানেরও কাণে গেল। কিন্তু কিরূপে এই নিঃসম্বল সহায়-শূন্য যুবকের আর্টস্কুলে পড়া সম্ভাবিত হইতে পারে, সে বিষয়ে কোন চিন্তা করা বা ইঁহাকে উপদেশ দেওয়া বড় কেহই আবশ্যক মনে করি নাই ; অথবা কালে যে এই বচন-ক্লপণ এ-বি-সি-বর্জ্জিত বার টাকা বেতনের ইন্স্পেক্টিং পণ্ডিত সুদূর ইউরোপে যাইয়া চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া সমস্ত বঙ্গদেশের—হয় ত সমগ্র ভারতের আশার স্থল হইবেন, তাহা কেহ তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই।

কিছু দিন পরে হঠাৎ ইঁহাকে এক দিন কলিকাতার ঝামাপুকুর লেনে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে ময়মনসিংহ ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের একটী বৃত্তি যোগাড় করিয়া ইনি কলিকাতায় আসিয়া আর্ট-স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছেন। তখন ইঁহার উৎসাহ-ব্যঞ্জক, হাস্যোজ্জ্বল ও ব্রীড়াবরণযুক্ত মুখশ্রী দেখিয়া মনে বড়ই আনন্দ হইল। কিন্তু কয়েকদিন পরে পুনরায় দেখা হইলে শুনিলাম যে, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড কোন অসার কূটতর্ক উপস্থিত করিয়া ইঁহাকে সেই বৃত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। তখন ইঁহার মুখে বিষাদ-ছায়া প্রতিফলিত, চিন্তায় ভ্রূকুঞ্চিত ; এবং তাঁহার ন্যায় দরিদ্রের পক্ষে গবর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলে অধ্যয়ন রূপ উচ্চ-আশা হৃদয়ে পরিপোষণ করা, আর পর্ণকুটীর-নিবাসী জীর্ণ-কন্থাশায়ী ভিক্ষুকের পক্ষে রাজকন্যার পাণিগ্রহণের স্বপ্ন দেখা যে তুল্য রূপ অসঙ্গত, ইহা মনে করিয়া লজ্জায় ইঁহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ ও ম্রিয়মাণ ! এই সময়ে ইনি একটা খোলার ঘরে, ঝি বামুনের বিনা সাহায্যে, অতি কষ্টে কালযাপন করিতেন ; ইহার উহার নিকট হইতে টাকা ধার লইয়া যথা সম্ভব অল্পব্যয়ে আর্টস্কুলে পড়িতে ছিলেন। এমন কি ড্রইং শিখিবার জন্য অত্যাবশ্যক যন্ত্রগুলিও ইনি অন্য ছাত্রের নিকট হইতে ২।১ ঘণ্টার জন্য চাহিয়া লইয়া স্কুলের পড়া চালাইতেন। কয়েক দিন পরে স্কুলের এক পরীক্ষায় ইনি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া একটী বৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন, এবং অল্প কালের মধ্যেই এই 'বাঙ্গাল' স্কুলের যাবতীয় শিক্ষক ও ছাত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইল। এত দিন পরে ইনি আপন পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইলেন ও অব্যাহত ভাবে অটুট উৎসাহে চিরাকাঙ্ক্ষিত চিত্র-বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত সাজিউড়া গ্রামে দরিদ্র পিতামাতার ঘরে শশী বাবুর জন্ম হয়। পিতা ছেলেকে শৈশবেই একটী ছাত্রবৃত্তি স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া দেন। যথা সময়ে শেষ পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়াও কোন গোলমালে শশী বাবু বৃত্তি পাইলেন না। এই স্কুলে থাকিতেই, ইংরাজি ও ফার্শি শিখিতে তাঁহার একান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল ; কিন্তু সুযোগাভাবে ঐ দুই ভাষার বর্ণ মালার অধিক শিখিয়া উঠিতে পারেন নাই।

চিত্রবিদ্যার অনুরাগটা তাঁহার জন্মাগত। এই সময়েই তিনি বাঙ্গালা, ইংরাজী, ফার্শী ও দেবনাগরী অক্ষর অবিকল ছাপার অক্ষরের মত লিখিতে পারিতেন। এমন কি সাধারণ চিঠিপত্রও দ্রুত হস্তে বাঙ্গালা ছাপার হরফের মত লিখিতেন।

বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাশ করিয়া অর্থাভাবে আর পড়া হইল না। গ্রামস্থ কোন ভদ্রলোকের আশ্রয়ে স্থানান্তরে গিয়া শশিকুমার চাকরীর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সেখানে একটী ইন্স্পেক্টিং পণ্ডিতের পদ খালি হয়। যদিও শশী বাবুর অপেক্ষা অনেক যোগ্যতর ব্যক্তি ঐ কর্ম্মের জন্য প্রার্থী ছিলেন, তথাপি ইনি সাহস করিয়া সেই চাকরীর জন্য দরখাস্ত করেন। কর্ত্তৃপক্ষ শুদ্ধ তাঁহার হাতের লেখা, নিঃসহায় অবস্থা ও কোমল স্বভাব দেখিয়া তাঁহাকে ঐ পদে নিযুক্ত করেন। তখন তাঁহার বয়স অতি অল্প।

এই সময়ে যাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইত, তাঁহারাই ইঁহার চিত্র বিদ্যায় অনুরক্তি ও শক্তি দেখিয়া প্রশংসা করিতেন। একখানা ফটো পাইলেই তিনি অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে, তাহা বৃহদাকারে পরিবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিতেন। অবশ্য তাহা নিখুঁৎ হইত না ; কিন্তু সাধারণ লোকের নিকট হইতে তাহা প্রশংসা পাইতে অসমর্থ ছিল না।

শশী বাবুর একটী বিশেষ গুণ এই যে তিনি কখনই অলস নহেন। ইন্স্পেক্টিং পণ্ডিতের নীরস কার্য্যও তিনি অতি উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করিতেন। আর, সকল বিষয়েই তাঁহার অল্পাধিক পরিমাণে বুদ্ধি খেলিত। কোন কর্ম্মই তিনি অসাধ্য মনে করিতেন না। দারিদ্র্যের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে ও পল্লীগ্রামের অন্ধকার কক্ষে বিচরণ করিয়া ঘটিকা যন্ত্রের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় অতি সামান্যই ছিল, হার্ম্মোনিয়াম যন্ত্র বা বন্দুক লইয়া নাড়া-চাড়া করা তাঁহার অদৃষ্টে কখনো ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু কদাচিৎ কাহারো ঐ সকল যন্ত্রের কোন একটী বিকল হইলে যে কোন উপায়ে তাহাকে কার্য্যোপযোগী করিবার সাহস ও সামর্থ্য তাঁহার ছিল। এবং এই প্রকার কার্য্যে খুব আনন্দ অনুভব করিতেন। শুদ্ধ একটী উখার সাহায্যে ছাতার পরিত্যক্ত লৌহদণ্ড হইতে মাছ ধরিবার অতি সুন্দর বড়শী তৈয়ার করিতে পারিতেন। এবং এই সকল বড়্শী বন্ধুদিগকে উপহার দিতেন। যাঁহারা উহা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, উহা বিলাতী বড়্শী অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট হইত না।

আমাদের দেশের একটী প্রচলিত কথা ও সনাতন প্রথা এই যে, কেহ সুকুমার শিল্পের দিকে গেলেই তাহার চরিত্র নীতির পিচ্ছল বর্ত্ম হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে। যদিও শশী বাবু আজন্ম চিত্র-শিল্পের সেবক, তথাপি কখনো তাঁহার নৈতিক জীবনে মুহূর্ত্তের জন্যও পতন হয় নাই। চিরদিনই তিনি সৎসংসর্গ ভাল বাসেন। তাঁহার ধর্ম্ম-পিপাসা এত প্রবল যে ইন্স্পেক্টিং পণ্ডিতির কঠোর পরিশ্রমের পরেও প্রতি রবিবার প্রায় ১১।১২ মাইল দূরবর্ত্তী কোন এক ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া ঈশ্বরাধনায় যোগ দিতেন। এবং পুনরায় পর দিন প্রত্যুষে স্বীয় কার্য্যস্থলে উপস্থিত হইতেন।

এই রূপ কয়েক বৎসর ইন্স্পেক্টিং পণ্ডিতের কাজ করিয়া পরে কিরূপে শিল্প শিক্ষার অভিলাষী হইয়া, নানা দশা বিপর্য্যয় অতিক্রম করিয়া, তিনি কলিকাতার আর্টস্কুলের একজন প্রধান ছাত্র রূপে পরিগণিত হন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এই আর্টস্কুলে থাকিতেই তাঁহার ইটালী দেশে যাইবার একান্ত ইচ্ছা হইল। কারণ তিনি শুনিয়াছিলেন যে, ঐ দেশই চিত্র-বিদ্যার আদি জননী ও লীলাভূমি। কিন্তু তাঁহার মত দরিদ্রের এই সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া তাঁহার সহাধ্যায়ীবর্গ ও শুভানুধ্যায়ী বন্ধুগণও তাঁহাকে বাতুল মনে করিতেন। শেষে তাঁহার ইটালী যাওয়ার ব্যগ্রতা এমন অসহিষ্ণু আকার ধারণ করিল যে, তিনি তখন শুদ্ধ পথের ব্যয় (passage money) পাইলেই ইটালীতে যাইতে ইচ্ছুক হইলেন ! সেখানে যাইয়া পরে কি হইবে, কিরূপে তাঁহার ইটালী-প্রবাসের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে, তাহা ভাবিবার অবকাশ ও অভিলাষ মাত্র তাঁহার রহিল না। অন্ততঃ সেই র্যাফেল-টিশিয়ান্ গুইডো-অঞ্জেলোর জননী ইটালীতে যাইয়া দেহপাত করিবেন, ইহা তাঁহার অষ্টপ্রহর ব্যাপী জাগ্রত স্বপ্ন হইয়া দাঁড়াইল।

পূর্ব্বে যদিও অনেকে—বিশেষতঃ তাঁহার সমপাঠিবর্গ, তাঁহার সঙ্কল্পিত বিষয়ের আয়তন ও গুরুত্ব অনুভব করিয়া তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিত, তথাপি তাঁহার আর্টস্কুলে পড়া শেষ হইলে তাঁহার গুণগ্রাম দর্শনে লোকে আর তাঁহাকে বাতুল মনে করিত না। এই সময়ে পরলোকগত বারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের একখানা প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া তিনি তাহা লইয়া উক্ত মহাপুরুষের নিকট উপস্থিত হইলে, মিষ্টার ঘোষ তাঁহার অঙ্কিত ছবি দেখিয়া নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন। ঐ ছবিটী Black and whiteএ অঙ্কিত ছিল। এই রূপে মিষ্টার ঘোষের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইলে, তিনি তাঁহার নিকট হইতে ময়মনসিংহ জেলার অন্যতম ভূম্যধিকারী মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরীর একটী ফোটো হস্তগত করিয়া উক্ত মহাত্মার আদেশ ও উপদেশ অনুসারে তদবলম্বনে একটী বৃহদায়ন ছবি (পূর্ব্বোক্ত Black and white প্রণালীতে) অঙ্কিত করেন, ও মিষ্টার ঘোষেরই সাহায্যে মহারাজ বাহাদুরকে উপহার স্বরূপ প্রদান করেন। এইরূপে মহারাজার সঙ্গে তাঁহার প্রথম পরিচয় হইল।

অতঃপর ময়মনসিংহ জেলার প্রসিদ্ধ দানশীলা ভূম্যধিকারিণী শ্রীযুক্তা জাহ্নবী চৌধুরাণী মহাশয়ার নিজের একটী তৈলচিত্র প্রতিকৃতি ও তাঁহারই অনুজ্ঞায় ঐ পরিবারের আরো কয়েকটী প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া ছয় শত টাকা

পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হন। শশী বাবুর ইটালী যাইবার ইহাই প্রধান ও আদি সম্বল হইল।

মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর প্রথম সাক্ষাতেই তাঁহাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়াছিলেন, এবং তাঁহার আর্থিক সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত ছয় শত টাকা পাইবার পরে তাঁহার ইটালী যাইবার ব্যগ্রতা এত উগ্রতা অবলম্বন করিল যে,তিনি মহারাজার শেষ আদেশের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই বোম্বাইয়ে টেলিগ্রাম করিয়া রোমে যাইবার জন্য ষ্টিমারে তৃতীয় শ্রেণীর স্থান রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। কেবল যাইবার সময়ে মহা-রাজকে জানাইয়া গেলেন যে, রোমে গিয়া যেন অনাহারে তাঁহার প্রাণটা না যায়।

এই স্থলে বলা আবশ্যক যে, তাঁহার এই ইটালী যাত্রা সম্বন্ধে কলিকাতা আর্টস্কুলের ভূতপূর্ব্ব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জবিন্‌স্ সাহেব ও উক্ত স্কুলের বর্ত্তমান অন্যতর অধ্যাপক 'ও-ঘিলার্ডি' সাহেব তাঁহাকে যথেষ্ট উৎসাহ ও উপদেশ দিয়াছিলেন। এমন কি ঐ আর্টস্কুলের পড়া শেষ হইলে শশী বাবুকে যে মুদ্রিত সার্টিফিকেট দেওয়া হইয়াছিল, জবিন্‌শ সাহেব তাহার নীচে স্বহস্তে লিখিয়া দেন যে, এই যুবক ইটালী যাইয়া চিত্র-বিদ্যা শিক্ষা করিতে ইচ্ছুক ও সে এই বিষয়ে লোকের উৎসাহ ও সাহায্য পাইবার সম্পূর্ণ যোগ্য ব্যক্তি'। ও-ঘিলার্ডি শশী বাবুকে রোমের 'রয়েল একাডেমির নিয়মাবলী আনাইয়া দেন, এবং কলিকাতাস্থ ইটালীয়ান্ কন্‌সালের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। বলা বাহুল্য এই সময়ে তিনি ইটালীয় ভাষার কিছুই ধার ধারিতেন না, সুতরাং একটী উড়ে বেহারাকে দোভাষী করিয়া উক্ত কন্‌সালের সহিত তাঁহাকে কথাবার্ত্তা চালাইতে হইয়াছিল! কন্‌সাল মহোদয় তাঁহাকে রোমের কয়েকটী উচ্চ রাজ কর্ম্মচারীর নিকটে পরিচয়পত্র দিয়াছিলেন।

বোম্বে পৌঁছিলে সেখানকার ভাইস্-কন্‌সালও তাঁহাকে রোমের কয়েকজন বড় লোকের নিকটে আরো কয়েক খানা পরিচয়পত্র দিলেন, ও সেই সঙ্গে যে জাহাজে তাঁহাকে রোমে যাইতে হইবে, সেই জাহাজের অধ্যক্ষের নিকটও একখানা চিঠি দিলেন।

জাহাজে উঠিয়া জানিতে পারিলেন যে, তিনি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী বলিয়া তাঁহাকে 'ডেক্-এ (Deck-এ) থাকিতে হইবে। কিন্তু পূর্ব্বে কাহার নিকটে শুনিয়াছিলেন যে তৃতীয় শ্রেণীতেও কেবিন্ পাওয়া যায়। যাহা হউক্ অত দূরের পথে যাইতে হইলে ডেক্-এ যাওয়া কিরূপ কষ্টকর ও বিপ-জ্জনক তাহা অনুভব করিয়া জাহাজের অধ্যক্ষ মহোদয় দয়া করিয়া তাঁহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে থাকিতে অনুমতি দিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তিনি ইটালীয় ভাষা জানিতেন না; ইংরেজীও অতি সামান্য জানিতেন, অর্থাৎ যাহাকে Smattering of English বলে, তাহাই জানিতেন। অথচ ঐ দুটী ভাষার অন্ততঃ একটী না জানিলে জাহাজের কোন লোকের সঙ্গেই তাঁহার কথা কহিবার যো ছিল না। সুতরাং, জাহাজে অবস্থান কালেই তাঁহাকে ঠেকিয়া ইংরাজী শিখিতে প্রবৃত্ত হইতে হইল। কথায় বলে 'ক্ষেতে গেলে কৃষাণের বুদ্ধি," এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। পরিশ্রমের বলে তিনি চলন-সই রকমের ইংরাজী শিখিলেন।

এক মাস পরে জাহাজ রোমে পৌঁছিল। এই সময়ে তাঁহার হাতে মাত্র ৯০৲ নব্বই টাকা ছিল।

সেখানে পৌঁছিয়া দেখিলেন যে তথাকার 'রয়েল একাডেমির নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র ইতি পূর্ব্বেই ভর্ত্তি হইয়াছে। তাহার উপরে, একাডেমিতে প্রবেশ লাভের পক্ষে তাঁহার দ্বিতীয় বাধা এই যে, তিনি ইটালীয় ভাষা জানেন না। কেবল তিনি সুদূর বিদেশ হইতে আগত বলিয়া ও তিন মাসের মধ্যে ইটালীয় ভাষায় তথাকার শিক্ষা-সচিবের (Minister of Education) সঙ্গে কথা-বার্ত্তা বলিবেন, এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হওয়াতে, তাঁহাকে একাডেমিতে ভর্ত্তি হইতে দেওয়া হইল। এ বিষয়ে ইটালীয় তুরস্কের কন্‌সাল-এর অনুরোধও তাঁহার পক্ষে অনেক কার্য্য করিয়াছিল। বোধ হয় না বলিলেও চলিত যে শশী বাবু নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যেই তাঁহার অঙ্গীকারানুরূপ ইটালীয় ভাষায় পারদর্শীতা দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রোমের রয়েল একাডেমিতে প্রায় দুই বৎসর কাল অধ্যয়ন করেন। পরে ফ্রান্সে যাইয়া পারিসে কিয়ৎকাল শিক্ষা করিয়া জার্ম্মেনীর অন্তর্গত মিউনিক্ নগরে গমন করেন। সেখানকার 'রয়েল একাডেমি' চিত্রবিদ্যা শিক্ষার্থ অতি প্রসিদ্ধ। ইনি সেখানে Special class of Painting-এ প্রবেশ করিয়া প্রশংসার সহিত কয়েক মাস কাজ করেন। পরে ইউরোপের অন্য কয়েকটী নগরীর চিত্র-

শালিকা (Art Gallery) পরিদর্শন করিয়া গত মে মাসে লণ্ডনে উপস্থিত হন। যদিও লণ্ডন চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ, তথাপি সেখানকার চিত্র সংগ্রহ মন্দ নহে; বিশেষতঃ উহা আমাদের রাজধানী। সেখানে উপস্থিত হইয়া সার জর্জ বার্ডউড প্রমুখ কয়েক জন বড় বড় ইংরাজের নিকট কিরূপ সমাদর পাইয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। লণ্ডনে উপস্থিত হইলে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত ও ডাক্তার মল্লিক তাঁহাকে নানা বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এবং প্রধানতঃ এই দুই মহানুভবের চেষ্টায়ই তিনি উপরি-উক্ত ইংরেজ মহোদয়-দিগের সহিত এত সহজে ও অল্প সময়ে পরিচিত হইতে সমর্থ হইয়াছেন। ঐ দুই ইংলণ্ডপ্রবাসী ভারত-সন্তান ব্যতীত মিঃ দাদা ভাই নৌরোজী ওমিঃ ডব্লিউ, সি, বানা-র্জির নিকটও তিনি অনেক উৎসাহ পাইয়াছেন। আর বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে, আমাদের দেশের শ্রদ্ধেয় কবি সহৃদয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকটও শশী বাবু অশেষ পরিমাণে ঋণী। তিনি এ দেশে থাকিয়াই তাঁহাকে নানা সময়ে নানা বিষয়ে উৎসাহ ও পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন।

বাস্তবিক শশী বাবুর জীবন-বৃত্তান্ত লিখিবার এখনো সময় হয় নাই। তিনি সবে ইউরোপে থাকিয়া চিত্র-বিদ্যার বিবিধ প্রণালী শিখিয়া আসিয়াছেন; কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাইতে এখনো বিলম্ব আছে। তাঁহার বয়স অনূর্দ্ধ ত্রিংশৎ বর্ষ মাত্র। কিন্তু এই যুবকটীর এই অনতি পরিসর জীবনের মধ্যেই এত ক্লেশের সহিষ্ণুতা, উদ্যমশীলতা ও স্বাবলম্বনের পরিচয় পাওয়া যায় যে, আজকালের এই ইউরোপ আমেরিকা জাপান যাত্রার দিনে ও কঠোর জীবন সংগ্রামের সময়ে, তাঁহার জীবনী আলোচনায় ইষ্ট বই অনিষ্ট হইবে না।

শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুস্তক সমালোচনা।

পদ্মা।

(৩৩ পৃষ্ঠার পর)

প্রমথ বাবুর ছন্দসম্পদ কম নহে, তাঁহার মিত্রাক্ষর যোজনাও প্রায় স্থলেই শ্রুতির প্রীতিকর, তবে "বঁধুরে"র সঙ্গে "মাঝারে" (৭০ পৃঃ), "বিনিময়ে"র সঙ্গে "কাঁদিয়ে" (৩৬ পৃঃ), "আবেগে"র সঙ্গে "এঁকে" (৪০ পৃঃ) "নাচে"র সঙ্গে "সাজ" (৭৯ পৃঃ) প্রভৃতি খুব সুসঙ্গত মিল পড়িয়াছে কি না বলিতে পারি না। "শকতি", "উকতি", প্রভৃতি শব্দ যে ভাবে লিখিত হয়, ঠিক সেই ভাবে পঠিত হয় না, উচ্চারণকালে "শকতি" শব্দ "শকোতি", "উকতি" শব্দ "উকুতি" এই আকার ধারণ করে; সুতরাং তাহাদের সঙ্গে "জ্যোতি" ও "কাকুতি"র মিল স্বীকার করা যাইতে পারে।

রবীন্দ্র বাবু কোন কোন নূতন কবিতায় যুক্ত অক্ষরকে দুইটি অক্ষররূপে ব্যবহার করিয়াছেন; "আমার স্মরণ শুভ সিন্দূরে","একটি বিন্দু আঁকিয়ো" প্রভৃতি ছত্র "আমার লতার একটি মুকুল" "ভুলিয়া তুলিয়া রাখিয়ো" প্রভৃতি ছত্রের সহচররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে; সুতরাং তিনি পূর্ব্বের দুইটি ছত্রও দ্বাদশ ও নবম অক্ষররূপে গণনা করিয়াছেন, তাঁহার আধুনিক কবিতার অনেক স্থলেই এইরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। আমরা ছন্দের এই নব-প্রবর্ত্তিত নিয়মটি প্রমথ বাবুর নিকট উপস্থিত করিতেছি। প্রমথ বাবুর রচিত কোন কোন পদে যতিভঙ্গ দোষ ঘটি-য়াছে বলিয়া আমাদের বোধ হইল, সেরূপ পদের সংখ্যা অবশ্য খুব অল্প। "ঈষৎ বাঁকায়ে গ্রীবা কটিস্থ মেখলা' পরে স্থাপি কর দাঁড়ায়ো স্বগর্ব্বোজ্জ্বলা" (৩১ পৃঃ) শেষ ছত্রের "পর স্থাপি কর" পর্য্যন্ত পূর্ব্ব ছত্রের সঙ্গে এক নিশ্বাসে পড়িলেও শেষাংশ ("দাঁড়ায়ো স্বগর্ব্বোজ্বালা") পড়িতে কেমন বাধ বাধ লাগে। কবিতায় ভাবের গাম্ভীর্য্য ও শ্রী বজায় রাখিয়া ছন্দাদির উৎকর্ষের প্রতি কবির মনোযোগী হওয়া উচিত, এ সম্বন্ধে প্রমথ বাবুর স্বভাবদত্ত শক্তি আছে, আমরা এই জন্য এ কথাগুলি লিখিলাম॥

আমাদের আর একটি কথা বক্তব্য এই যে, মাইকেল মিল্টনের অনুকরণে উপমাগুলির পরিসর অনাবশ্যকভাবে অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি করিয়াছেন; আধুনিক কবিগণের কেহ কেহ শেলী প্রভৃতি কবির অনুকরণে একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব লইয়া এত দীর্ঘকাল নাড়া চাড়া করিয়া থাকেন যে, পাঠক চিত্তে সম্যক্ ভাব কিম্বা অনুভূতি গঠিত হইবার সুবিধা ঘটিয়া উঠে না, কল্পনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চেষ্টায় আদত ভাবটি নির্ব্বাপিত হইয়া ধোঁয়া মাত্র অবশিষ্ট থাকে। পদ্মার কবিতাগুলির কোন কোনটিতে এই দোষ দৃষ্ট হয়;

"শেষে শান্তি ঘনাইয়া নয়নে বসিবে ঘিরে। কৃষ্ণ পক্ষ পরস্পরে আঁকড়ি রহিবে ম'রে॥" শান্তিপ্রসঙ্গ প্রথম ছত্র পর্য্যন্ত আবদ্ধ রাখিলেই সুন্দর হইত, শান্তি কৃষ্ণপক্ষ আঁকড়িয়া মরিয়া রহিবে কথার অর্থ করিতে পারা গেলেও ইহা সুভাব বলিয়া স্বীকার করা যায় না; শান্তি নিজেই নীরব এবং নিঝুম, কবির আর তাহার উপর সমাধির ব্যবস্থা ভাল চলে না।

পদ্মার মৌলিক রস আস্বাদন করিতে করিতে সহসা "সুরেন্দ্রজনবন্দিতা" "ঝনন রণণ" প্রভৃতির ন্যায় দুই একটি ভাব, দুই একটি ছন্দলহরী পাঠকবর্গকে রবি বাবুর কবিতা স্মরণ করাইয়া দিবে। "পঞ্চবটী" নামক কবিতাটির শান্তি পূর্ণ ভাবরাশি প্রাচীন-কীর্ত্তিবর্ণন-প্রসঙ্গে অতি সুন্দর হইয়াছে, তাহাতে দ্বিজেন্দ্র বাবুর "নবদ্বীপের" অনুকরণে চাপল্যের ঝাঁজ না দিলে ভাল হইত। দ্বিজেন্দ্র বাবু চাপল্য পরিহার করিয়া সহসা গম্ভীর হইতে জানেন; যখন তিনি ব্যঙ্গোক্তি করিয়া দন্তরুচি-কৌমুদীচ্ছটায় হাস্যের উৎস সৃষ্টি করিতেছেন, তখনও তিনি ইচ্ছা করিলে হঠাৎ আশ্চর্য্য দ্রুততার সহিত আত্মসম্বরণ করিয়া গুরু গম্ভীর তন্ত্রীতে কর স্পর্শ করিতে পারেন; কিন্তু প্রমথ বাবুর সে পথে যাওয়া ভাল হয় নাই, প্রমথ বাবু বড় সুললিত, বড় স্থিরস্বভাবের কবি; শান্তিময় স্বপ্নবিহ্বল দর্শনজড়িত কাব্য সুধা-উৎসের মত তাহার লেখনী হইতে নিঃসৃত হইয়া এক স্থিরপ্রতিজ্ঞ, স্বভাব-সৌন্দর্য্যানুভূতিতে ভরপুর, ভাবগম্ভীর প্রকৃতির পরিচয় দিতেছে; রহস্য কথায় সেই গাম্ভীর্য্য একটু স্বস্থানচ্যুত হয়, অন্ততঃ রহস্যের সহিত গম্ভীর ভঙ্গী অবলম্বন করিতে চেষ্টা না করিলেই তাঁহার পক্ষে যেন ভাল হয়।

চৈতন্য প্রভুর তিরোধান সম্পর্কীয় কবিতাটী বেশ কবিত্বপূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু এখন ঐতিহাসিকগণ দ্বারা স্থিররূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, চৈতন্যদেব সমুদ্র-গর্ভে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন নাই। ১৫৩৩ খৃঃ অব্দের আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী তিথিতে (শুক্রবার দিবস) কীর্ত্তনানন্দে বিভোর চৈতন্যদেবের পদে ইষ্টক বিদ্ধ হয়, পর দিবস বেদনা অত্যন্ত বাড়িয়া যায় ও তৎপর দিবস (রবিবার দিন) সপ্তমী তিথিতে তিনি জ্বররোগে কলেবর ত্যাগ করেন। ঐতিহাসিক ঘটনা সময়ে সময়ে একবারে পরিহার করিবার অধিকারও কবিগণের আছে; কিন্তু চৈতন্য-লীলা এখন বঙ্গসমাজে যেরূপ জীবন্ত ভাবে কার্য্যকরী হইতেছে, তাহাতে তৎসম্বন্ধে কোন ইতিহাস-বিরুদ্ধ কথা সুকবির বীণাঝঙ্কারে রাষ্ট্র হইলেও তাহা বহু দিন পাঠকের অন্তঃকরণে আনন্দের সঞ্চার করিবে কিনা, তাহা একটু সন্দেহের বিষয়।

"পদ্মা"র গীতি-মাধুর্য্য আমাদিগের চিত্তে ও শ্রুতিতে লাগিয়া রহিয়াছে, এজন্য এতগুলি কথা লিখিলাম। এই কাব্যের মলাটে রজত কাঞ্চনের খেলা, পাঠ করিয়া বোধ হইল, যেন ভিতরের উপকরণও তদপেক্ষা কম মূল্যবান নহে। 'পদ্মা'র ছাপা, কাগজ, বাঁধাই—উৎকৃষ্ট। আমরা বাঙ্গালা পুস্তকের এরূপ মনোজ্ঞ আবরণ অল্পই দেখিয়াছি।

'পদ্মা' নাম শুনিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, কোন নায়িকা বিশেষের নাম লইয়া এই কাব্য নিজ পরিচয় দিতেছে, কিন্তু তাহা নহে; আমরা ইহাকে এক খানি গীতি-কাব্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। নানাবিষয়ক গীতি কবিতা, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী প্রভৃতি দ্বারা কাব্য খানি পূর্ণ। 'পদ্মা' নাম সম্বন্ধে কবি নিজে শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে জানাইয়াছেন, উহা পূর্ব্ববঙ্গের স্বনাম-প্রসিদ্ধ নদীর নামানুকরণে পরিগৃহীত হইয়াছে। মানব হৃদয়ের আদিকাব্য-চিন্তা ও পদ্মা নদীর তরঙ্গে সাদৃশ্য আছে, দুইই প্রখর অনির্দ্দিষ্ট গতি, দুইই ব্যাকুল উচ্ছ্বসিত লহরী লইয়া অজ্ঞাত পথের অনুসন্ধানে প্রবর্ত্তিত, পদ্মার ন্যায় মানব কবিতাও সৃষ্টি সৌন্দর্য্যের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া লুটাইয়া তীব্র, মধুর, শান্ত এবং ভৈরব রসের পরিপূর্ণ ছন্দ লহরীতে প্রবাহিত হইয়াছে; প্রকৃত গীতি কবিতা সেই নদীর মতই স্বভাবের অসম্ভব প্রবর্ত্তনায় কবি-চিত্তের নিগূঢ় রাজ্য হইতে স্বতঃ উদ্বেলিত হইয়া থাকে। এই হিসাবে 'পদ্মা' কাব্যের নাম সার্থক হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি।

প্রমথ বাবু সাহিত্যের আসরে উপস্থিত হইয়াই এক খানি উচ্চ আসনের দাবী করিয়াছেন, আমাদের বিশ্বাস সেরূপ আসন তাঁহার প্রাপ্য হইয়াছে, ভবিষ্যতে বঙ্গদেশ—বিশেষ, পূর্ব্ববঙ্গ এই নবীন লেখক হইতে অনেক প্রত্যাশা করিতেছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

—০—

কণিকা।*

কবিবর রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি ছোট খাট কবিতা "কণিকা" নাম ধারণ করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। 'কণিকা' কণককণিকার ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়ী;—কবিতাগুলি জলের মত সরল, জ্যোৎস্নার মত নির্ম্মল, প্রিয়জনের মত সুন্দর। তন্মধ্যে কতকগুলি শিশির কণার মত নিতান্তই "একরত্তি"; কিন্তু শিশির-কণার মতই সমুজ্জ্বল।

এখনও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সেবার মূল্য নিরূপণ করিবার সময় হয় নাই। যিনি কিশোরকাল হইতে পদ্যে গদ্যে প্রতিনিয়ত অক্লান্ত সাধকের ন্যায় মাতৃভাষার সেবা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার সাধনা এখনও অবসন্ন হয় নাই; এখনও নিত্য নূতন কাব্য-সৌন্দর্য্য দিন দিন বিকশিত করিয়া তুলিতেছেন। সুতরাং এ সময়ে তাঁহার 'কণিকার' সমালোচনা করিব না; কেবল, কবি যাহাকে বিনয়বশতঃ 'কণিকা' নামে পরিচিত করিতে চাহিয়াছেন, তদ্দ্বারা আমরা কি কি লাভ করিলাম, তাহারই একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব।

সাহিত্যের সঙ্গে সমালোচনার সম্বন্ধ অতি নিকট। উপযুক্ত সমালোচনার অভাবে এবং অনুপযুক্ত সমালোচনার অত্যাচারে সুকুমার সাহিত্য স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে না। বঙ্গ-সাহিত্য-সেবকগণ তাহার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। লেখকগণ বহু দিনের অধ্যবসায়ে বহু যত্নে যাহা সঙ্কলিত করেন, কর্ম্মক্লান্ত পত্র-সম্পাদকগণ তাহার আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করিবার অবসর না থাকিলেও মুক্তহস্তে সমালোচনা বিতরণ করিতে ক্রটি করেন না। 'কণিকার' কবি সংক্ষেপে, অপিচ ঈষন্মাত্র ইঙ্গিতে, আমাদের সমালোচনার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন ঃ—

"কাণা কড়ি পিঠ তুলি কহে টাকাটিকে,
তুমি ষোল আনামাত্র, নহ পাঁচশিকে!
টাকা কয়, আমি তাই, মূল্য মোর যথা,—
তোমার যা মূল্য তার ঢের বেশি কথা!"

সত্য বটে, আমাদের সাহিত্যে কিয়ৎপরিমাণে কৃতিত্বের "ভাগ" আসিয়া পড়িয়াছে; তাহার বলে আমরা চারি আনা পাঁচ আনার কম হইয়াও সাড়ে ষোল আনার ঝাঁক মারিতে চাহি, কিন্তু লেখক অপেক্ষা সমালোচকেরাই কৃতিত্বের ভাগের বেশির ভাগ দখল করিয়া বসিয়াছেন। ইহার নামান্তর—স্পর্দ্ধা! তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে সমালোচকের আসন এত উচ্চে অবস্থিত যে, লেখকগণ কিছুতেই ততদূরে উঠিতে পারিবেন না, তাঁহাদিগকে সভয়ে সুদূরে দাঁড়াইয়া অপরাধীর ন্যায় লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে! কিন্তু যথার্থ কৃতি লেখকের আসন বহু উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত, অযোগ্যের স্পর্দ্ধাপূর্ণ অক্ষম সমালোচনা ততদূর আদৌ পৌঁছিতে পারে না। 'কণিকায়' তাহার আভাস এইরূপে প্রদত্ত হইয়াছে ঃ—

"হাউই কহিল, মোর কি সাহস, ভাই,
তারকার মুখে আমি দিয়ে আসি ছাই!
কবি কহে—তার গায় লাগে না ক কিছু,
সে ছাই ফিরিয়া আসে তোরি পিছু পিছু!"

অনেকে ইহাকে অতিশয়োক্তি মনে করিতে পারেন; কিন্তু সাহিত্যের কল্যাণে অযোগ্য সমালোচকের লিপি-কণ্ডূয়ন নিরস্ত করিবার হিসাবে ইহা অতিশয়োক্তি নহে। আজ কাল সাহিত্য-সমালোচনার যেরূপ পদ্ধতি আবিষ্কৃত ও প্রচলিত হইতেছে, তাহাতে অন্তরঙ্গের গুণগান, বহিরঙ্গের দোষ প্রদর্শন করা সংক্রামক রোগের মধ্যে গণ্য হইতে চলিয়াছে। কোন কোন মাসিকপত্রে যে সকল সংক্ষিপ্ত সাহিত্য সমালোচনা প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। এমনও দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার প্রবন্ধের জন্য অপেক্ষা করিয়া প্রবন্ধ পাইলেন না, অন্য পত্রিকায় তাঁহার সুলিখিত প্রবন্ধ বাহির হইলেও তাঁহাকে সম্পাদক মহাশয় আক্রমণ করিয়া থাকেন! এ অবস্থায়, একটু 'মিঠে কড়া'—বুঝিয়া দেখিলে—উপকারী ঔষধের ন্যায় ফলোপধায়ক হইতে পারে।

স্বল্পাক্ষর কবিতায় সৌন্দর্য্য সমাবেশ করা, ভাবোদ্দীপন করিয়া চিত্তবিমোহন করা এবং লেখকের বক্তব্য না বলিয়াও পাঠকের হৃদয়ে দৃঢ় মুদ্রিত করিয়া দেওয়া, বিলক্ষণ ক্ষমতার কথা। সুদীর্ঘ প্রবন্ধে যাহা হয় না, সংক্ষিপ্ত কবিতায় তাহা সাধন করিতে কত ক্লেশ? অথচ 'কণিকার' কবি সহজে সরল ভাষায় স্বল্পাক্ষরে এমন কত তর্কের মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছেন।

* শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য ৷৹ আনা।

"রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহা ধূমধাম,
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি,
মূর্ত্তি ভাবে আমি দেব,—হাসে অন্তর্যামী।"

এখানে পংক্তি চতুষ্টয়মাত্র রচনা করিয়াই কবি নিরস্ত হইয়াছেন; কিন্তু ইহারই মধ্যে বক্তব্য বিষয়টি কেমন সুকৌশলে পরিব্যক্ত হইয়াছে! ভাষার সৌন্দর্য্য একরূপ, তাহাতে কবিতাকে শ্রুতিমধুর করে; ভাবের সৌন্দর্য্য আর একরূপ,তাহাতে কবিতাকে ভাবুকের নিকট মনোজ্ঞ বেশে উপনীত করিয়া দেয়; ভাব প্রকাশের কৌশলের সৌন্দর্য্য ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহাতে ভাবুককে ভাবিতে না দিয়া একেবারেই সিদ্ধান্তে উপনীত করিয়া দেয়। ক্ষুদ্র কবিতায় সে কৌশল বিস্তার করিবার স্থান অতি অল্প। সে অল্পের মধ্যে যিনি শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করিতে পারেন, তিনি ধন্য। 'কণিকার' কবি এ বিষয়ে সুনিপুণ।

"ধাইল প্রচণ্ড ঝড়, বাধাইল রণ,—
কে শেষে হইল জয়ী?—মৃদু সমীরণ!"

এইরূপে ছোট খাট কবিতায় কোথায়ও তীব্র শ্লেষ, কোথায়ও সুতীক্ষ্ণ ধিক্কার, কোথায়ও বা সুগভীর দুঃখ সুকৌশলে অভিব্যক্ত করিয়া কবি 'কণিকাকে' ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যে মনোজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছেন।

উপদেশ দিবার জন্য বহুলোকে লালায়িত, কাহারও কথা লোকে আদৌ শুনিতে চাহে না, কাহারও কথা শুনিয়া কদাচ পরিশ্রান্ত হয় না। এরূপ হইবার কারণ কি? বলিবার দোষে অনেক ভাল কথাও ভাসিয়া যায়, বলিবার গুণে অনেক তুচ্ছ কথা হইলেও বহুমূল্য উপদেশ লাভ করা যায়। কণিকার কবি—মাচার কুষ্মাণ্ড, কাঁসার ঘটি, গোহালের মহিষ, হালের লাঙ্গল, চাকের মৌমাছি, বনের টুনটুনি, গ্রন্থের কীট, মাথার ছাতা, চকোরীর কাঁদা, কুকুরের লেজনাড়া, কচুগাছের শিকড় গাড়া,—এলোচুল, বাঁধা খোঁপা, কাক, কোকিল, ময়ূর, ভ্রমর, প্রজাপতি—কঞ্চির বেড়া, বাবলার শাখা,—কত কি ছোট বড় প্রতিদিবসের চিরপরিচিত বস্তুর উপলক্ষ করিয়া কত বিভিন্ন বিষয়ের কৌতূহলপূর্ণ উপদেশের সঙ্গে কৌতুক বিতরণ করিয়াছেন, তাহা 'কণিকা' না পড়িলে সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিবার উপায় নাই।

কপালগুণে আমরা 'কালা আদমী' হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। সে কিছু ততটা দুঃখের কথা নহে, কিন্তু না বুঝিয়া অনেক 'কালা আদমীও' আমাদিগকে ও আমাদের দেশকে 'কালো' বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ব্যবহার শুধু অসঙ্গত নয়—নিতান্ত পরিহাসের ব্যাপার; কবি তাহা এইরূপে চিত্রিত করিয়াছেন;—

"কেঁচো কয়--নীচ মাটি, কালো তার রূপ!
কবি তারে রাগ করে' বলে—চুপ্ চুপ্!
তুমি যে মাটির কীট, খাও তারি রস,
মাটির নিন্দায় বাড়ে তোমারি কি যশ!"

কথাটা সত্য হইলেও, অনেক সময় তৎপ্রতি হৃদয় মন আকৃষ্ট হয় না। আমাদিগকে গালি দিয়া, আমাদিগকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া আমরা বড় হইতে চাই। সে চেষ্টা অনেক সময়ে নিতান্ত হাস্যাস্পদ হইয়া পড়ে। যথা:—

"কেরোসিন্ শিখা বলে মাটির প্রদীপে—
ভাই বলে ডাক যদি দেব গলা টিপে!
হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা,—
কেরোসিন্ বলি উঠে—এস মোর দাদা!"

তাই বলিয়া আকাশের চাঁদ কেরোসিনের সঙ্গে কুটুম্বিতা স্বীকার করিতে সম্মত হয় কি? বুঝিয়া দেখিলে, আমাদের দেশের অনেক কেরোসিনের চাকচিক্যের অবস্থা ইহার অপেক্ষা অল্পই বিভিন্ন!

আর অধিক উদ্ধৃত করিব না। দেশে কুষ্মাণ্ডের অভাব নাই; তবে কুষ্মাণ্ডের কাণ্ডজ্ঞান অল্প বলিয়া তাহারা মাটির সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া আকাশের চন্দ্র সূর্য্যের সঙ্গে ভাই ভাই সম্বন্ধ পাতাইতে চায়। তাহা লইয়াই কবি গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন; সুতরাং একটু দীর্ঘ হইলেও সে কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

"কুষ্মাণ্ডের মনে মনে বড় অভিমান
বাঁশের মাচাটি তাঁর পুষ্পক বিমান।
ভুলেও মাটির পানে তাকায় না তাই,
চন্দ্র সূর্য্য তারকারে করে ভাই ভাই!
নভশ্চর ব'লে তাঁর মনের বিশ্বাস,
শূণ্য পানে চেয়ে তাই ছাড়ে সে নিশ্বাস।
ভাবে শুধু মোটা এই বোঁটাখানা মোরে
রেখেছে ধরার সাথে কুটুম্বিতা ডোরে।

বোঁটা যদি কাটা পড়ে তখনি পলকে
উড়ে যাব আপনার জ্যোতির্ম্ময় লোকে।
বোঁটা যবে কাটা গেল, বুঝিল সে খাঁটি,
সূর্য্য তার কেহ নয়, সবি তার মাটি!"

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

——০——

ব্রিটিশসাম্রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা।

জগতের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য উন্নতি কিম্বা অবনতির পথে যাইতেছে সে কথার আলোচনা করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই, তাহার আলোচনায় কোন ফলও নাই। কিন্তু আমরা—ভারতবাসী—ইংরাজের সহিত যে সম্বন্ধে আবদ্ধ তাহাতে গবর্মেণ্টের উন্নতি অবনতির প্রতি কোন মতে উদাসীন হইতে পারি না। গবর্মেণ্ট যাহাই বলুন, সংবাদপত্রদিগকে রাজদ্রোহিতা অপরাধে দণ্ডিত করুন অথবা আইনের ধারা কঠিনতর করুন আমরা গবর্মেণ্টের অমঙ্গল কামনা করিতে পারিনা, কারণ ইংরাজ রাজ্য ব্যতীত আমাদের অন্য গতি নাই। ইয়োরোপীয় অন্য কোন জাতির সহিত ভারতবর্ষে যদি ইংরাজের যুদ্ধ হয় ত আমাদের ভয়ানক বিপদ, আর কোথাও ইংরাজের পরাজয় হইলেও আমাদের বিপদ, আর যদি ইংরাজেরা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে আমাদের সর্ব্বনাশ। আমাদের এমন ক্ষমতা নাই যে আমরা নিজের দেশ শাসন করিতে পারি অথবা কোন লুব্ধ বলবান জাতির পথ রোধ করিতে পারি। পরাধীনতা আমাদের নিশ্চয়, এবং ইংরাজের অধীনতা অন্য সকল জাতির অধীনতা অপেক্ষা শ্রেয়স্কর একথা আমরা জানি। এই কথা জানিয়া শিক্ষিত ভারতবাসী কখন ইংরাজের বিপক্ষ হইবে না। এই প্রকৃত কথা, তা গবর্মেণ্ট বিশ্বাস করুন আর নাই করুন।

বুয়রদিগের সহিত যে ইংরাজদিগের যুদ্ধ বাধিয়াছে তাহাতে যে আমাদের চিন্তার কারণ নাই এমত নহে। কথা উঠিতে পারে যে দক্ষিণ আফ্রিকার এক প্রান্তে এক ক্ষুদ্র জাতির সহিত ইংরাজের যুদ্ধ হইলে ইংরাজ রাজ্যে আর কোথাও আশঙ্কার কারণ কি? উপস্থিত কোন আশঙ্কা নাই বটে, কিন্তু ট্রান্সভালে যাহা ঘটিবে ভবিষ্যতে তাহার ফল—শুভ বা অশুভ—ফলিবেই। আমেরিকার স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের পর এরূপ কোনও যুদ্ধে ইংরাজ জাতি লিপ্ত হয় নাই। সে যুদ্ধের সহিতও এ যুদ্ধের ঠিক তুলনা হয় না। কেন না, তখন যুদ্ধ হইয়াছিল ইংরাজে ও ইংরাজে। মার্কিনবাসীগণ ইয়োরোপের নানা দেশের লোকের সংমিশ্রণ, কিন্তু যেমন করিয়াই দেখা যায় তাহাদিগকে ইংরাজ নামে অভিহিত করিতে হয়। আমেরিকার ইংরাজ স্বদেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য, ইংলণ্ডের ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। ইংরাজের নিকট ইংরাজ পরাজিত হইলে বিশেষ লজ্জার বা অপমানের কারণ হয় না। বভ্রুবাহন কর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইয়া অর্জ্জুনের কোন বিশেষ কলঙ্ক হয় নাই। কিন্তু বুয়র ইংরাজ নহে; প্রকৃতপক্ষে ঠিক ইয়োরোপীয় জাতিও নহে। ওলন্দাজদিগের ঔরসজাত জাতি মাত্র। যুদ্ধ তাহাদিগের ব্যবসা নহে। রীতিমত যুদ্ধশিক্ষা তাহাদের দেশে নাই। উলিচ্ অথবা স্যাণ্ডহর্ষ্টের মত স্থান ট্রান্সভালে নাই। সংখ্যায় বুয়রেরা মুষ্টিমেয় মাত্র। বিশেষ, এই যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বে বুয়রদের উপর ইংরাজদের রাগ ছিল। পূর্ব্বে আর একবার যুদ্ধ হইয়াছিল, তখনও ইংরাজেরা বুয়রদিগকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। সেইজন্য এবার যখন ইংরাজসৈন্য ট্রান্সভালে প্রথম প্রেরিত হয়,তখন সমবেত ইংরাজ দর্শকমণ্ডলী "মজুবা পাহাড় মনে রাখিও" শব্দে সমুদ্রকূল ধ্বনিত করিয়াছিল। এই উত্তেজনা বাক্যের অর্থ এই যে, মজুবা পাহাড়ে আমরা বুয়রদিগকে আঁটিয়া উঠিতে পারি নাই, তোমরা এবার গিয়া তাহাদিগকে ভাল করিয়া শিক্ষা দিও। একদিকে এই জাত ক্রোধ, পূর্ব্ব অপমানের স্মৃতি, বহুশত বৎসরের যুদ্ধ শিক্ষা, অদ্বিতীয় বিচিত্র রণতরীসমূহ, জগদ্বিখ্যাত সেনাপতি, উৎকৃষ্ট দুর্জ্জয় সৈন্য, অন্য দিকে মুষ্টিমেয় কৃষক ও বণিক জাতি, যুদ্ধ শিক্ষাহীন, যুদ্ধার্ণব শূন্য, ক্ষুদ্র দেশের ক্ষুদ্র কাজে সর্ব্বদা লিপ্ত। যদি ট্রান্সভালে উপনীত হইয়াই জেনেরল বুলর বুয়রদিগকে পরাজিত করিয়া প্রিটোরিয়ায় উপনীত হইয়া প্রেসিডেণ্ট ক্রুগর এবং জেনেরল জুবেয়রকে বন্দী করিতেন, তাহা হইলে বিস্ময়ের বা শ্লাঘার কোন কথা হইত না। এইরূপ হইবারই সম্ভাবনা সকলের মনে ছিল। প্রকৃত পক্ষে যাহা ঘটিয়াছে সংবাদপত্র পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। সে সকল

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বা আলোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। ইংরাজের পক্ষে যুদ্ধে নানারূপ ভ্রম হইয়াছে ইংরাজী সংবাদ পত্রেই তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। যুদ্ধশেষে যে ইংরাজের জয় হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। একবার কিম্বা দুইবার কিম্বা দশবার অকৃতকার্য্য হইলে যে জাতি ভগ্নোদ্যম অথবা সঙ্কল্প হইতে বিরত হয়, ইংরাজ সে জাতি নহে। অসীম অধ্যবসায়, অসিদ্ধিতে নূতন উদ্যম ইংরাজ চরিত্রের প্রধান গুণ। সেই গুণের এইবার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাইবে। যেখানে ইংরাজ অথবা ইংরাজের আত্মীয় সেইখানে এখন কেবল একমাত্র সঙ্কল্প জাগিতেছে, কিসে বুয়র পরাজিত হইবে। অর্থব্যয়ে, সৈন্যক্ষয়ে দৃক্‌পাত নাই। ইংলণ্ডে এখন আর কোন কথা নাই। রাজনৈতিক দলাদলি এখন স্থগিত রহিয়াছে—যুদ্ধাবসানে যাহা হয় হইবে। বিজয়লক্ষ্মী প্রতিকূল হইলে পৌরুষ কি করিতে পারে ইংরাজের নিকট জগৎ এইবার সেই শিক্ষা লাভ করিবে। রাজলক্ষ্মী যে ইংরাজকে ত্যাগ করিবেন এরূপ সংশয় মনে উপস্থিত হইবার কোন কারণ নাই।

তথাপি যে ক্ষতি হয় নাই এমন কথা মনে করা ভ্রম। মুষ্টিমেয় বুয়র জাতি যে ক্ষতি করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। রুসিয়া কিম্বা জর্ম্মানির সহিত ইংরাজের যুদ্ধ হইলে উভয় পক্ষে জয় পরাজয়ের সমান সম্ভাবনা; একপক্ষ দুই চারি বার জয় করিলে বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু ট্রান্সভালের পক্ষে সে কথা খাটে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তুলনায় ট্রান্সভালের অস্তিত্বই চক্ষে পড়ে না। ইংরাজের তুলনায় বুয়র নিতান্ত নগণ্য জাতি। সেই বুয়রের শৌর্য্যবীর্য্যে, তাহাদের রণকুশলে পৃথিবীসুদ্ধ লোক চমৎকৃত হইয়াছে। ইহাতেই ইংরাজজাতির প্রকৃত ক্ষতি হইয়াছে। ইয়োরোপের অপরাপর জাতি যে ইংরাজের উপর অসন্তুষ্ট একথা কাহারও অবিদিত নাই। প্রধান মন্ত্রী লর্ড সল্‌সব্রী এ কথার প্রকারান্তরে উল্লেখ করিয়া, the splendid isolation of England স্বীকার করিয়া একদিন গৌরব করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন ইংলণ্ড একা তখন তাহাকে সর্ব্বদা একা একশোর মত থাকিতে হইবে, নহিলে ইয়োরোপে তাহার প্রাধান্য থাকিবে কেমন করিয়া? যদি বুয়রের মত একটা সামান্য জাতি ইংরাজের সহিত এমন করিয়া লড়িতে পারে তাহা হইলে মন্ত্রীবরের কথার গৌরবের অত্যন্ত লাঘব হয়। হইয়াছেও তাহাই। ফ্রান্স, অষ্ট্রীয়া, রুসিয়া, স্পেন প্রভৃতি দেশের সংবাদপত্র যুদ্ধ সম্বন্ধে যে সকল সম্বাদ ও মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আসিতেছে তাহাতে তাহাদিগকে ইংরাজের বিশেষ মিত্র বোধ হয় না। এই সকল সংবাদ পত্রের লেখা পড়িয়া উদ্ধত প্রকৃতি চেম্বরলেন সাহেব তাহাদিগকে শাসাইয়াছিলেন, গুরুমহাশয়ের মত তাহাদিগকে শিক্ষা দিবেন এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার তাড়নায় যে তাহারা ডরাইবে এরূপ মনে করা অন্যায়। ট্রান্সভালকে শাসাইয়া যখন তিনি কিছু করিতে পারিলেন না, হাতাহাতি আরম্ভ হইল, তখন যে ইয়োরোপীয় সংবাদপত্রেরা তাঁহাকে ভয় করিবে তিনি ছাড়া আর কেহই এরূপ মনে করে না। কিন্তু কথাটা বড় গুরুতর। আমাদের দেশের সংবাদ পত্র গুলাকে যত শীঘ্র উড়াইয়া দেওয়া যায় ইয়োরোপের সংবাদপত্র গুলিকে তাহা পারা যায় না। সেখানে দেশশুদ্ধ লোকে সংবাদপত্র পাঠ করে, দেশশুদ্ধ লোকের মনের ভাব সংবাদ পত্রে ব্যক্ত হয়। সেখানে সংবাদ পত্র রাজার চক্ষুশূল নহে, সংবাদপত্রগুলাকে শাসন করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে নূতন আইন বা নূতন দণ্ড আবিষ্কার করিবার প্রয়োজন হয় না: ইয়োরোপের সকল দেশেরই মনোভাব ইংলণ্ডের বিপক্ষে। একথা ইংলণ্ডের প্রধান লোকেরা সকলেই অবগত আছেন।

এই অবস্থায় রুসিয়া কর্ত্তৃক কুস্ক অধিকার আশঙ্কাসূচক। রুসিয়ার সম্রাট কিম্বা কর্ম্মচারীগণ যাহাই বলুন, ঠিক এই সময়ে সুযোগ বুঝিয়াই রুষিয়া হেরাতের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে। চীনে কি হইতেছে, কিম্বা জাপানের সহিত রুসিয়ার গোলযোগ হইবার কি সম্ভাবনা আছে, তাহার সহিত এ সংবাদের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। বুয়র যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া ইংরাজদিগের আর কোন দিকে চাহিবার অধিক অবসর নাই ইহা প্রত্যক্ষ সকলেই দেখিতে পাইতেছে। ইংলণ্ডে কোন প্রধান সেনাপতি নাই বলিলেই হয়। লর্ড রবর্টস্, জেনেরল বুলর, লর্ড কিচ্‌নর সকলেই ট্রান্সভালে। লর্ড উল্‌সলী ইংলণ্ডে একা। আর কোথাও যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তিনি যাইতে পারেন কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ। অধিক সংখ্যক সৈন্যও ট্রান্সভালে। এমন সময় রুসিয়ার সহিত ইংরেজের যুদ্ধ হওয়া এক

প্রকার অসম্ভব। তথাপি রুসিয়া সহসা এমন কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবে না যাহাতে অনন্যোপায় হইয়া ইংলণ্ডকে যুদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু রুসিয়া কোন স্থানে উপস্থিত হইলে সে স্থান ত্যাগ করিবে না ইহা স্থির। যখন তাহারা পঞ্জদেহ্ অধিকার করে তখন ইংলণ্ড যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত। মহাত্মা গ্লাড্‌ষ্টন তখন প্রধান রাজমন্ত্রী। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া হাউস অব কমন্স একবাক্যে একাদশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা কর্জ্জ করিতে স্বীকৃত হন। যুদ্ধের সজ্জা আরম্ভ হয়, বিস্তর অর্থও ব্যয় হয়। কিন্তু রুসিয়া কোন মতে পঞ্জদেহ্ পরিত্যাগ করিল না। অবশেষে আফগানিস্থান-সীমা-নির্দ্দেশ কমিশন নিযুক্ত হইয়া সেবার গোল মিটিয়া যায়। এবার কুস্ক লইয়া বিশেষ গোল হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ ট্রান্সভালের হাঙ্গামা না মিটিলে ইংরাজেরা আর একটা নূতন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারেন না। এদিকে, কুস্ক হইতে আর এক পদ অগ্রসর হইলেই হেরাত। আমীর আবদুর রহমানের জীবিতাবস্থায় যে রুসিয়া হেরাত অধিকার করিবে এরূপ মনে হয় না। কিন্তু আবদুর রহমান আর কয় দিন? তিনি লোকান্তরিত হইলে আফগানিস্থানে একটা ভয়ানক গোল উপস্থিত হইবে। ইংরাজেরা যদি মনে করিয়া থাকেন যে সর্দ্দার হবিবুল্লা ইংরাজের সাহায্যে নির্ব্বিঘ্নে পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন তাহা হইলে তাঁহাদের গুরুতর ভ্রম। রাজার মৃত্যুর পর একটা যুদ্ধ বিগ্রহ হওয়া আফগানিস্থানে একরূপ সনাতন প্রথা। তাহাতে এ সময় আফগানিস্থানে সৈন্যসমূহ যেরূপ সুশিক্ষিত ও বহুসংখ্যক পূর্ব্বে কোনকালে এরূপ ছিল না। আবদুর রহমানের মৃত্যুর পর প্রকাশ্যে না হউক গোপনে রুসিয়া কোনও ব্যক্তির সহায়তা নিশ্চিত করিবে। ইংরাজেরা যদি সৈন্য বল লইয়া আফগানিস্থানে উপস্থিত হন তাহা হইলে আফগান সৈন্যদিগের সহিত তুমুল যুদ্ধ বাধিবে। বর্ত্তমান আমীরের মৃত্যুর পর আফগানিস্থানের সীমানির্দ্দেশ ভঙ্গ হইয়া যাইবে। তখন হেরাতে রুসিয়া উপস্থিত হইলে কে তাহাদিগের গতি রোধ করিবে? তাহা হইলেও যে কোন বিশেষ আশঙ্কার কারণ আছে আমাদের এরূপ মনে হয় না, কিন্তু এখন গবর্মেণ্টের যেরূপ ধারণা তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। ভারতবর্ষ হইতে শত যোজন দূরে থাকিলেও যে রুসিয়া হইতে বিপদ ঘটিতে পারে এ বিশ্বাস দূর হওয়া চাই। কালে যদি আফগানিস্থান অথবা তিব্বত রুসিয়ার অধীন হয় তাহা হইলেই বা ভয়ের কারণ কি? ফ্রান্স, জর্ম্মানি, রুসিয়া এবং অষ্ট্রীয়া সমসীমান্ত, কিন্তু সেই কারণেই কি নিত্য যুদ্ধ হইতেছে, না জর্ম্মান রাজ্য রুসিয়ার করকবলিত হইতেছে? আজ হউক অথবা দশ বৎসর পরে হউক রুসিয়া ভারতবর্ষের সীমান্তে উপনীত হইবেই, কিন্তু ভারতবর্ষে প্রবেশ করা তেমন সহজ হইবে না। দুর্ব্বল জাতি বলবানের অধীন হইবে এই নিয়ম। যে নিয়মে পেশোয়ার হইতে ভামো পর্য্যন্ত ইংরাজের অধীন হইয়াছে সেই নিয়মে হয় তিব্বত কিম্বা আফগানিস্থান কিম্বা দুই রুসিয়ার অধীন হইবে। কিন্তু বলবানে বলবানে সাক্ষাৎ হইলে দুই জনেরই গতি রোধ হয়। যেরূপ রুসাতঙ্ক সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে সাধারণ লোকের মনে হয় যে ইংলণ্ডের অপেক্ষা রুসিয়া বলবান। কিন্তু এরূপ বিশ্বাস ভ্রমাত্মক। সমগ্র ভারতবর্ষ ইংরাজের সহায়। যে সকল জাতির হস্তে গবর্মেণ্ট অস্ত্র দেন না রুসিয়ার সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাহারাও আত্মরক্ষা, রাজ্যরক্ষা করিতে প্রস্তুত হইবে। এ কথা রুসিয়ার অবিদিত নাই, এবং যতদূর বুঝিতে পারা যায় তাহাতে বোধ হয় ভারতবর্ষের প্রতি রুসিয়ার লক্ষ্য নাই।

তথাপি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা আশাপ্রদ নহে। বুয়র যুদ্ধ এবং রুসিয়া কর্ত্তৃক কুস্ক অধিকার তাহার প্রমাণ। বুয়রেরা পরাজিত হইলেও ইংরাজের ক্ষতি হইবে। চেম্বরলেন হইতে সকলে যে আশঙ্কা করিত তিনি তাহাই ঘটাইয়াছেন। তিনি, রোড্‌স্ এবং কয়েক জন ধনী এই যুদ্ধের মূল। বুয়রদিগকে হীনবল ও অল্পসংখ্যক বিবেচনা করা আর এক ভ্রম হইয়াছে। যদি যুদ্ধই হইল ত এরূপ আয়োজন করা উচিত ছিল যাহাতে বুয়র সৈন্যগণ একটা বড় যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ইংরাজের শরণাপন্ন হইত। অল্প সংখ্যায় ইংরাজ সৈন্য বার বার ট্রান্সভালে যাইতেছে, বার বার পরাজিত হইতেছে। যদি একেবারে এক লক্ষ সৈন্য সমবেত হইয়া ট্রান্সভালে প্রবেশ করিত তাহা হইলে এখনকার অবস্থা উপস্থিত হইত না। ইয়োরোপে সর্ব্বত্র সংবাদপত্রে এরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইত না, আফ-

গানিস্থানের অভিমুখে অগ্রসর হইতে রুসিয়ার সাহস হইত না। বুয়র যুদ্ধের পরিণাম যাহাই হউক, ইংরাজদিগকে ভবিষ্যতে অত্যন্ত সাবধান থাকিতে হইবে। তাঁহারা এখন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন যে ইয়োরোপে তাঁহাদিগের মিত্র অপেক্ষা শত্রু সংখ্যা অধিক। সুযোগ পাইলে ইয়োরোপেই অনেকে তাঁহাদের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইবে। বুয়রযুদ্ধের পর অনেকের সে সাহসও হইবে। ইংলণ্ডের রণপোত সংখ্যা এত অধিক এবং জলযুদ্ধে তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই কোন আশঙ্কা নাই। বাহিরের শত্রু অপেক্ষা ঘরের শত্রুকে অধিক ভয়। যাঁহারা অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, বুয়রদিগের বল সম্যকরূপে বিদিত না হইয়া, প্রচুর আয়োজন পূর্ব্বাহ্নে না করিয়া স্বজাতিকে এই যুদ্ধে নিয়োগ করিয়াছেন তাঁহারা মিত্রের কাজ করেন নাই। এরূপ পরামর্শদাতা সর্ব্বদাই জুটিয়া থাকে। তাহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ না করাই দুরদর্শী রাজনৈতিকের কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য এবার ইংরাজেরা পালন করিতে পারেন নাই। যে ভ্রম হইয়াছে কালে তাহা সংশোধিত হইবে। ইংরাজের গৌরবরবি অস্ত যাইবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। তাঁহাদিগের অক্ষয় কীর্ত্তি আরও বহুকাল ধরিয়া বাড়িতে থাকিবে এমন আশা করিবার অনেক কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

যে Imperialism এর ফল বুয়র যুদ্ধ সেই Imperialism এর ফল আমাদের দেশেও নানা বিষয়ে লক্ষিত হইতেছে। এ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য আছে। এদেশে দরিদ্র অশিক্ষিত লোকেরা গবর্মেণ্টের অহিত কামনা করে না, এ কথা গবর্মেণ্ট মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। বাকি রহিলাম আমরা—কয়েক শত বা সহস্র শিক্ষিত ব্যক্তি। গবর্মেণ্টের স্কুলে কলেজে আমরা শিক্ষিত, হয় আমরা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী না হয় অন্য কোন উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতেছি। শিক্ষিত লোকদিগের প্রতি অবিশ্বাস করাতে কি গবর্মেণ্টের কোন লাভ আছে? রাজভক্তির কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম, কৃতজ্ঞতার উল্লেখ না হয় নাই করিলাম। কিন্তু যে পরিমাণে আমরা শিক্ষিত সেই পরিমাণে যে আমরা কতকটা বুদ্ধিমান একথা ত স্বীকার করিতে হইবে। যদি তাহাই হইল, যদি আমরা বুদ্ধির কোন ধার ধারি তাহা হইলে কোন্ বুদ্ধিতে আমরা ইংরাজ রাজ্যের বা গবর্মেণ্টের অমঙ্গল কামনা করিব? এক রাজা গিয়া আর এক রাজা হওয়া কি সোজা কথা? ইংরাজ যাইলেই কি আমাদের পরাধীনতা ঘুচিবে? আর ইংরাজের হাজার দোষ থাকিলেও ইংরাজের অপেক্ষা আর কাহার অধীনতা বাঞ্ছনীয়? এ সকল কথা স্পষ্ট করিয়া বলা যায়, এবং এইরূপ স্পষ্ট করিয়া এ সকল কথা গবর্মেণ্টের ভাবিয়া দেখা উচিত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, ইংরাজের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রহিলে আমাদের সকল আশা সফল হইতে পারে। ইংরাজের মঙ্গলে আমাদের মঙ্গল, ইংরাজের বিপদে আমাদের বিপদ। কেবল স্বার্থপরতার হিসাবে স্বদেশের, স্বজাতির, স্বপরিবারের দিকে চাহিয়া এই কথা বলিতে হয়, শুধু মৌখিক রাজভক্তির অনুরোধে নহে; গবর্মেণ্ট আমাদিগকে ঠেলিলেও আমরা তাঁহাদিগকে ছাড়িতে পারি না, এই আসল কথা। এই কথা বুঝিতে পারিয়া অবশেষে গবর্মেণ্টকে এখনকার ভ্রমগুলি পরিত্যাগ করিতে হইবে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

—o—

সেকাল।

এখনও বাঙ্গালার ইতিহাস সঙ্কলন করিবার সময় হয় নাই। আধুনিক সময়ের ইতিহাসের কথা বলিতেছি না;—তাহার উপকরণ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পুঞ্জীকৃত হইতেছে। তদ্দ্বারা অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে একালের ইতিহাস গঠিত হইতে পারিবে। কিন্তু মুসলমান-শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে এদেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার কোন ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলিত হইবার উপায় নাই। মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা সবিশেষ অনুসন্ধানলব্ধ ঐতিহাসিক তথ্যরূপে গ্রহণ করিতে সাহস হয় না।

তাঁহারা যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাও বড় অধিক নহে। "বখ্‌তিয়ার খিলিজির বঙ্গাগমনের পর ১২৬০ খৃষ্টাব্দের সমকালে আবু-উমর-মিন্‌হাজ-উদ্দীন-ওস্‌মান্ ইবন্ সিরাজুদ্দীন-অল্‌-জুজ্জানী "তবকাৎ—ই—নাসেরী" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার বিংশ পরিচ্ছেদে বাঙ্গালার যাহা কিছু ইতিবৃত্ত প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাই বাঙ্গালার মুসলমান-লিখিত সর্ব্বপ্রথম ইতিহাস। * অতঃপর মুসলমান লেখকগণ যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছেন তাহাও নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ও অসংলগ্ন—অধিকাংশ স্থলে স্বপ্নকাহিনীর ন্যায় অকিঞ্চিৎকর!

বিজেতা বিজিতের ইতিহাস লিখিলে তাহাতে অনেক দোষ প্রবেশ করিয়া থাকে। মিন্‌হাজের গ্রন্থে তাহার অভাব নাই। তদ্ভিন্ন,—উহাতে মুসলমানাগমনের পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনসময়ের ঐতিহাসিক তথ্য অল্পই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বাঙ্গালা বহুকালের সভ্যদেশ। দক্ষিণবঙ্গের কথা যাহাই হউক,—পূর্ব্ব পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ যে বহুপ্রাচীন সভ্য জনপদ, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর্য্যপিতামহগণ কোন্ সময়ে তদ্দেশে প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহার জনশ্রুতি পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে!

ন্যূনাধিক দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রের সিংহাসনে বসিয়া চাণক্যনীতি-কৌশলে ভারতবর্ষের অধিকাংশ জনপদে অধিকারবিস্তার করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার সভায় গ্রীকরাজদূত মেগাস্থিনীস্ অবস্থিতি করিয়া যে ভারতবিবরণী লিপিবদ্ধ করেন, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তখন বঙ্গভূমি স্বতন্ত্র পরাক্রান্ত রাজ্যরূপে পরিগণিত ও নৌবলহস্ত্যশ্বপদাতি সুরক্ষিত দুর্জ্জেয় ও দুর্জ্জেয় জনপদ বলিয়া পরিচিত ছিল।

সে অনেক দিনের কথা। তখনও এসিয়াখণ্ডের জলে স্থলে পর্ব্বতে প্রান্তরে গ্রামে নগরে ও দ্বীপোপদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রতাপ বিকীর্ণ হইয়া পড়ে নাই। তখনও পাশ্চাত্য সভ্যসমাজে ভারতবর্ষের নাম মাত্রেই পরিজ্ঞাত; কিন্তু তাহা বহুবিস্ময়ের লীলাভূমি স্বপ্নরাজ্যের ন্যায় অনিশ্চিত ও অজ্ঞাতপূর্ব্ব!

তাহার পর "অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু"—সর্ব্বত্র বৌদ্ধমন্ত্র বিঘোষিত হইয়াছিল। তৎসূত্রে সে সকল বৌদ্ধকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, উত্তর বঙ্গের নানা স্থানে অদ্যাপি তাহার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। চৈনিক বৌদ্ধাচার্য্য ফা হিয়ান্ ও হিয়ঙ্গ থ্‌সাঙ্গ তদ্দর্শনোপলক্ষে বঙ্গভূমিতেও পদার্পণ করিয়াছিলেন।

তৎকালে বাঙ্গালার গৌরবের অবধি ছিল না। সে গৌরবের দিনে তাম্রলিপ্তির লবণাম্বুবেলা বাঙ্গালীর পোতারোহণ কোলাহলে নিয়ত কলকলায়মান রহিত; বাঙ্গালীর বাণিজ্যপোত বায়ুবেগে চালিত হইয়া কত দেশের রত্নভাণ্ডার স্বদেশে বহন করিয়া আনিত। তাম্রলিপ্তির শ্রেষ্ঠীসম্প্রদায় শত সৌধচূড়ায় সে বিভবচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া বাঙ্গালীর পুরুষকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আজ তাহা স্বপ্নকাহিনীর ন্যায় প্রতিভাত;—সেই বাঙ্গালী এখন সমুদ্রযাত্রায় অগ্রসর হইলে সমাজচ্যুত হইতেছে!

এক দিনে সহসা এত পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে না। কিন্তু কিরূপে কত দিনে এত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল, তাহার কোন ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায় না। যে যুগে এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল তাহা যথার্থই "তামসযুগ"। তাহার ঐতিহাসিক তথ্যনিচয় তমসাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে; সমালোচনার খদ্যোতিকামাত্র অবলম্বন করিয়া সে পথে অধিক দূর অগ্রসর হইবার উপায় নাই।

তামস যুগের বঙ্গভূমি ভাগপঞ্চকে বিভক্ত থাকার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তাহাকে লোকে (১) রাঢ় (২) বাগ্‌ড়ী (৩) মিথিলা (৪) বরেন্দ্র ও (৫) বঙ্গ নামে অভিহিত করিত। ইহার প্রত্যেক ভাগের বহুসংখ্যক উপবিভাগ ছিল; তাহার সর্ব্বত্র বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র রাজ্যের ক্ষুদ্র নরপতি আপনাদিগকে সসাগরা ধরিত্রীর অদ্বিতীয় অধিপতি বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের নাম, গোত্র ও বংশপরিচয় বুদ্বুদবৎ কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে!

তাঁহাদের অধিকৃত রাজ্য বহুবিপ্লবের লীলাভূমি বলিয়া পরিচিত। তাহাতে বাঙ্গালীর সহিত বাঙ্গালী, হিন্দুর সহিত বৌদ্ধ,—এক ভ্রাতার সহিত অন্য ভ্রাতা—নিয়ত বিবদমান হইয়া বঙ্গভূমি বিপর্য্যস্ত করিত; কখন বা হূনাদি প্রবল পার্ব্বত্যজাতি আপতিত হইয়া শস্যক্ষেত্র বিলুণ্ঠিত করিয়া বাঙ্গালীর শান্তিসুখ তিরোহিত করিয়া দিত। বহিঃশত্রুর অভিযানে, অন্তর্বিপ্লবের আলোড়নে, সে কালের বঙ্গভূমির অবস্থা ভাল থাকিবার কথা নহে।

সেকালের ইতিহাস সঙ্কলনের উপযোগী যে সকল উপকরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ—(১) পুরাতন গ্রন্থ (২) শিলা-লিপি ও (৩) তাম্রশাসন।

* ঐতিহাসিক চিত্র, প্রথমবর্ষ, প্রথমখণ্ড, ৩৮ পৃঃ।

পুরাতন গ্রন্থ বলিতে প্রকৃত পুরাতন গ্রন্থ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা পুরাতন তাহারও সকল অংশ সমান পুরাতন নহে; পণ্ডিতমণ্ডলী তন্মধ্যে কত প্রক্ষিপ্ত শ্লোক যোজনা করিয়া দিয়াছেন! এই সকল গ্রন্থে সে কালের একটি অস্পষ্ট ছায়ামাত্রই প্রাপ্ত হওয়া যায়; চৈনিক বৌদ্ধাচার্য্যগণের গ্রন্থে সে ছায়া কিয়ৎপরিমাণে স্পষ্টতর হইয়াছে।

শিলালিপির সংখ্যা অধিক নহে। তন্মধ্যে গৌড়েশ্বর বিজয়সেন দেবের প্রতিষ্ঠিত প্রদ্যুম্নেশ্বর নামক শিবমন্দিরের ফলকলিপি ও গুরব মিশ্রের সংস্থাপিত গরুড়স্তম্ভলিপি সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

তাম্রশাসনের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক। তন্মধ্যে পাল ও সেনবংশীয় নরপতিবর্গের তাম্রশাসনই উল্লেখযোগ্য। পালনরপালগণ বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী ও সেন নরপতিগণ হিন্দুধর্ম্মানুরাগী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের মধ্যে বহুবার যুদ্ধকলহের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎকালে বাঙ্গালীকে কখন বহিশত্রুর সহিত সংগ্রাম করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইত; কখন বা দিগ্বিজয়ী গৌড়াধিপতির বিজয় পতাকা বহন করিয়া দূরদেশেও গমন করিতে হইত। সেন নরপতিবর্গের শেষদশায় বাঙ্গালায় মুসলমান শাসন প্রবর্ত্তিত হয়।

এই সকল নরপালবর্গের মধ্যে কাহার পর কে রাজা হইয়া কত দিন পর্য্যন্ত কোন্ ভূভাগ শাসন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহার কোন লিখিত প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু তাহাতে বিশেষ দুঃখ নাই। কাহার পর কে রাজা হইয়াছিলেন তাহা জানিতে না পারিলেও বাঙ্গালার ইতিহাসের বিশেষ ক্ষতি হইবে না। পৃথিবীর কত ধরণীপতি ধরাপৃষ্ঠে পদাঙ্করেখা দৃঢ়মুদ্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কালক্রমে তাহার চিহ্নপর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে! আর সে সংবাদ জানিতে পারিলেই বা বাঙ্গালার ইতিহাসের বিশেষ কি উপকার হইত? ইতিহাস কি কেবল রাজবংশ কাহিনী?

মুসলমানাধিকার প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে হিন্দু ও বৌদ্ধের মধ্যে প্রবল সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল; সে সংঘর্ষে রাজার সঙ্গে প্রজাপুঞ্জকেও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কি সূত্রে সেই সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা কেবল বঙ্গদেশের কেন—সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসের মূল সূত্র। কারণ, বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ে ভারতবর্ষের যত না উন্নতি হইয়াছিল, উহার অধঃপতনে এ দেশের ততোধিক অধঃপতন সংঘটিত হয়। শুনিতে পাওয়া যায়, গৃহবিবাদই সে অধঃপতনের মূল। তাহা হইতে কালে যে বিষময় ফল সমুৎপন্ন হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহার জ্বালাময় তীব্ররস সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই!

যে দিক্ দিয়া দেখ, বাঙ্গালার ইতিহাস ভারতবর্ষের ইতিহাসের সহিত এক সূত্রে গ্রথিত। আর্য্যাবর্ত্তের পদতললগ্না বঙ্গভূমি স্বতন্ত্র রাজতন্ত্রের অভিভুক্ত হইলেও, তাহা আর্য্যাবর্ত্তের উপবিভাগ মাত্র। যে চিন্তা প্রবাহ আর্য্যাবর্ত্তের সভ্যসমাজকে পরিচালিত করিত, যে রাজবিধি ও সমাজনিয়ম আর্য্যাবর্ত্তের সভ্যসমাজকে নিয়মিত করিত, বঙ্গদেশেও তাহারই প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইত। সেই জন্য বাঙ্গালার ইতিহাস আর্য্যাবর্ত্তের ইতিহাসের অংশমাত্র—তাহা হইতে স্বতন্ত্র বা পৃথক নহে।

এখন সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের অধিবাসী অধঃপতিত বলিয়া পরিচিত। আমরা যে পৃথিবীর নিকট হীন হইয়া পড়িয়াছি, তাহা আমাদিগকেও মানিয়া লইতে হইতেছে। যাহা সত্য—নিত্য প্রত্যক্ষীকৃত—তাহাকে তর্ক করিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া ফল নাই। আমরা হীন—তাহা সত্য কথা। কিন্তু আমরা কি চিরদিনই হীন?

ইতিহাসের অভাবে এই প্রশ্নের মীমাংসা করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা আমাদের ক্রমোন্নতি সাধন করিবেন বলিয়া পবিত্র কল্যাণব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগকে কিয়ৎ পরিমাণে বর্ব্বর বলিয়াই মনে করেন। তাঁহাদের বিচারে আমরা অর্দ্ধসভ্য—কি সেকালে কি একালে, আমরা কদাচ সুসভ্য সমুন্নত ছিলাম না!

অবজ্ঞার প্রতিদান অবজ্ঞা। যাঁহারা আমাদিগকে অবজ্ঞাভরে বর্ব্বর বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, আমরাও অবজ্ঞাভরে তাঁহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া ঘৃণা করি। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সে দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন জনপদ, প্রাচ্য সভ্যতা ও প্রতীচ্যসভ্যতার মধ্যে যে দেশকাল পাত্রভেদে বহু পার্থক্য বিদ্যমান থাকাই স্বাভাবিক, আমরা কেহই তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করি না।

আমরা কি চিরদিনই হীন? হীনজাতির ক্ষীণকণ্ঠ হইতে বেদগাথা উত্থিত হইত না; হীনজাতির ক্ষীণ মস্তিষ্ক হইতে উপনিষৎ ও ষড়দর্শন সমুৎপন্ন হইত না; হীনজাতির দুর্ব্বল বাহুযুগল দেশ দেশান্তে বিজয় পতাকা বহন করিতে পারিত না; তাহার ভগ্নপদ বহুকাল ধরাপৃষ্ঠে দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান থাকিত না!

আমরা যে চিরদিন হীন ছিলাম না, তাহা কেবল আমাদের কথায় মানিয়া লইতে হইবে না; সেকালে যাঁহারা আমাদের সংসর্গে মিলিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও তাহার সাক্ষী। আলেক্‌জাণ্ডার অবলীলাক্রমে ভূমধ্যসাগরতীর হইতে সিন্ধুসীমা পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকেও ভারতবিজয়ের আশা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। মুসলমানধর্ম্মের অভ্যুদয়ে আরবের মরুবক্ষে যে উৎসাহতরু অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রতাপে ইস্‌লামের বিজয়পতাকা মধ্য এসিয়া হইতে উত্তর আফ্রিকা ও তথা হইতে দক্ষিণ ইউরোপে প্রোথিত হইতে বিলম্ব হয় নাই; কিন্তু তিনশত বৎসরের তুমুল সংগ্রামে বহু বীরমুণ্ড স্কন্ধচ্যুত হইবার পূর্ব্বে সে শক্তি ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই।

কিন্তু সে পুরাকাহিনীর পুনরুল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা চিরদিন হীন না হইলেও হীন হইয়া পড়িয়াছি। কি সূত্রে আমাদের মধ্যে হীনতা প্রবেশ করিয়াছিল তাহাই প্রকৃত সমালোচনার কথা। তাহা বিস্মৃত হইয়া অতীত ভারতের গৌরবের ইতিহাস ও আর্য্য সভ্যতার ক্রম বিকাশের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া ফল কি? রোমক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় অপেক্ষা অধঃপতনের ইতিহাসই লোক শিক্ষার উপাদানে পরিপূর্ণ!

এ পর্য্যন্ত যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে—আমাদের উন্নতির মধ্যেই অবনতির ধ্বংশবীজ নিহিত ছিল! যে ভাবে ভারতবর্ষের আর্য্যসভ্যতা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সনাতন নহে—চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে নাই!

স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি প্রীতি স্বাভাবিক হইলেও সকল দেশে স্বাভাবিক নিয়মে তাহা বিকশিত হইতে পারে নাই। আমাদের দেশে যে নিয়মে এই প্রীতি বিকশিত হইয়াছিল, আমাদের সাহিত্যে ও ইতিহাসে তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আমাদের দেশে "আমি" সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, "আমার" তদপেক্ষা বহু নিম্নে সংস্থিত। আমি কি উপায়ে বড় হইব, সেই চিন্তায় আমাদের সকল শাস্ত্র পরিপূর্ণ। তাহার মূলমন্ত্র—"আত্মানং সততং রক্ষেৎ"। এক হিসাবে আত্মোন্নতি হইতে ক্রমশঃ জাতীয় বা দেশীয় উন্নতি সাধিত হইতে পারে। কিন্তু ইহার মধ্যেই ধ্বংশবীজ নিহিত আছে। "আত্মানং সততং রক্ষেৎ" বলিতে অনেক দূর পর্য্যন্ত যায়। ইহা হইতেই লোকে যেন তেন প্রকারেণ আত্ম রক্ষা করিতে শিক্ষা করে, এবং আত্মরক্ষার্থ ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠে—"ন গণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ"। ইহা হইতে ব্যক্তিগত স্বার্থ পরিপুষ্ট হইতে গিয়া জনসাধারণের স্বার্থ ক্রমশঃ উপেক্ষিত হইতে থাকে।

স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণ হইলেই আমার কল্যাণ—ইহা এক প্রকারের হিসাব। তুমি আমি দশজনে মিলিয়াই দেশ, সুতরাং আমার উন্নতি হইলেই দেশের উন্নতি—ইহা আর এক প্রকারের হিসাব। আমরা শেষোক্ত হিসাবই ভাল বলিয়া বুঝিয়া ছিলাম; সুতরাং আত্মোন্নতির জন্যই ব্যাকুল হইয়াছিলাম।

আত্মোন্নতি যে কেবল আমার উপরেই নির্ভর করে না, তাহা আমরা বুঝি নাই। বুঝি নাই বলিয়াই, গণ্ডীর মধ্যে গণ্ডী আঁকিয়া আপনার চারিদিকে এক সুদৃঢ় দুর্গপ্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে একা "আমি" দীর্ঘ তপস্যায় আত্মোন্নতি সাধন করিতে বসিয়াছিলাম। আমার বলিতে যাহা কিছু, তাহা সেই ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সে গণ্ডীর বাহিরে যাহা কিছু পড়িয়া ছিল, তাহা "আমার" বলিয়া বোধ হইত না, তাহা আমার নিকট নিতান্ত "পর" বলিয়াই বোধ হইত। সুতরাং সমগ্র দেশের মধ্যে একপ্রাণতা পরিপুষ্ট হইবার পক্ষে বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। যে দেশে জনসাধারণ এইরূপে বহুধা বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, সে দেশে স্বদেশ প্রীতি বিকশিত হইতে পারে না। প্রত্যেকে আপনাপন ব্যক্তিগত লাভালাভের তুলাদণ্ড হস্তে পরিগ্রহণ করে, যে কোন উপায়ে হউক স্বার্থসাধন করাকেই পুরুষার্থ বলিয়া বিবেচনা করে। আমাদের ইতিহাস তাহার সাক্ষী।

প্রাচীন ভারতে মহাসাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইতে পারে নাই; এক° দেশের সহিত অন্য দেশ, এক রাজার সহিত অন্য রাজা বিবদমান হইয়া প্রত্যেকে আপনাপন ক্ষুদ্র গণ্ডী সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করিতে গিয়া জাতীয় মহাশক্তিকে ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রশক্তিতে পরিণত করিয়াছিলেন। বিদেশের পরাক্রান্ত প্রবল জাতি যখনই চেষ্টা করিয়াছে, তখনই অনায়াসে আমাদের এক দলকে দিয়া অপর দলের উচ্ছেদ সাধন করিয়া ভারতবর্ষে অধিকার বিস্তার করিয়াছে। আমাদের অপেক্ষা শিক্ষায় সভ্যতায় বাহুবলে ও সমর-কৌশলে যাহারা যথার্থই হীন ও নগণ্য, সেই সকল পার্ব্বত্য হূন ও শক যবনাদি কতবার আমাদিগের শীর্ষস্থানে পদাঘাত করিয়া গিয়াছে! তখন ভারতবর্ষের গৌরবের দিন ছিল; তথাপি ভারতবর্ষকে নীরবে সে তীব্র অপমান বহন করিতে হইয়াছে!

সুসভ্য গ্রীকজাতি মধ্যএসিয়ায় রাজ্যসংস্থাপন করিলে তাহাদের সহিত ভারতবাসীর সংঘর্ষ হইয়াছিল। সে সংঘর্ষে সিন্ধুপারস্থিত ভারতরাজ্য ভারতবাসীর হস্তচ্যুত হইয়াছিল; তথায় গ্রীকরাজ্য প্রতিষ্ঠালাভ করিতে বিলম্ব হয় নাই।

মুসলমান যখন ভারতসীমান্তে অসিহস্তে উপনীত হইয়াছিল, তখন তাহারা সভ্যতায় শিক্ষায় সমর-কৌশলে সমুন্নত ছিল না; আমাদের তুলনায় তাহারা সুসভ্য ও সমুন্নত জাতি বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতেও পারিত না। কিন্তু তাহাদের নিকট ভারতবর্ষকে, আজি হউক আর কালি হউক, একদিন পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

আত্মপ্রীতি হইতে পারিবারিক প্রীতি ও তাহা হইতে কালক্রমে বিশ্বজনীন প্রীতি যে আদৌ বিকশিত হইতে পারে না, তাহা বলিতে পারা যায় না। কিন্তু সে কথা কেবল তর্কশাস্ত্রের কূট সিদ্ধান্তেই স্বীকার করিয়া লইতে হয়। সংসারে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে স্বদেশ বলিয়া কোন প্রীতির প্রতিমা কখনও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কি না সন্দেহ। অন্য লোকে যাহাকে স্বদেশ বলিয়া পূজা করে, যাহার জন্য হাসিতে হাসিতে জীবন বিসর্জ্জন করে, আমরা তাহার স্থলে স্বজাতীকে স্থাপন করিয়াছিলাম। সে জাতি আর কিছুই নয়—লোকাচারমূলক বর্ণাশ্রম বিভাগ মাত্র। তাহাতে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে প্রীতিবন্ধন প্রতিষ্ঠিত না হইয়া একত্রাবস্থানজনিত পরিচয়মাত্রই সংস্থাপিত হইয়াছিল; একের জন্য অপরে আত্মবিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত ছিল না!

যত দিন অন্য জাতির সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত না হয়, তত দিন এরূপ ব্যবস্থায় বিশেষ কিছু ক্ষতি হইতে পারে না। কিন্তু যে দিন অন্য জাতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে সম্মুখসমরে দণ্ডায়মান হইতে হয়, সেই দিন পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে। সত্য বটে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" বলিয়া জনশ্রুতি প্রচলিত আছে; কিন্তু সে জন্মভূমি বলিতে গণ্ডীমধ্যস্থ গণ্ডগ্রামের বাস্তুভূমি ভিন্ন আর কিছু নয়!

ভারতবর্ষের ভাল মন্দ বাঙ্গালা দেশেও প্রচলিত হইয়াছিল; এখানে আসিয়া বরং ভাল অপেক্ষা মন্দের ভাগই পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ক্রমশঃ গঙ্গাস্রোতের নিম্নাভিমুখিনী ত্বরিতগতির অনুসরণ করিয়া যাঁহারা অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে আর্য্যোপনিবেশ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা একরূপ বিনাযুদ্ধেই স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমিকে পরপদতলে পাতিত করিয়াছিলেন! ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে লজ্জার কথা, কিন্তু ইহা সত্য। বাঙ্গালী যেভাবে বঙ্গদেশে রাজ্যবিস্তার করিয়াছিল তাহার মূলেই ধ্বংশবীজ নিহিত ছিল। মুসলমান উপলক্ষ মাত্র—যে কেহ বাঙ্গালার স্বাধীনতা হরণ করিতে পারিত। কারণ বাঙ্গালী সমগ্র দেশকে এক অখণ্ড রাজ্যরূপে পরিণত করিতে পারে নাই; বরং এক অখণ্ড রাজ্যকে বহুখণ্ডে বিভক্ত করিয়া ক্ষুদ্র শক্তিকে ক্ষুদ্রতর করিয়া আপনার পরাজয়ের পথ পরিষ্কৃত করিয়া রাখিয়াছিল!

বাঙ্গালী যে ভীরু বা কাপুরুষ, তাহা সত্য নহে। বাঙ্গালীর সাহিত্যে স্বদেশপ্রীতির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না; সমগ্রদেশের মধ্যে একপ্রাণতা বর্ত্তমান থাকার কোন প্রমাণ প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং মুসলমানসেনা বাঙ্গালা দেশে পদার্পণ করিবার সময়ে যথারীতি বাধা প্রাপ্ত হয় নাই। বাঙ্গালীর বাহুবলের অভাব ছিল না, ইচ্ছা করিলে বাধা দিতে পারিত, কিন্তু সকলেই আপনার লইয়া ব্যস্ত বলিয়া কেহই দেশের কথা ভাবিবার অবসর পায় নাই।

মুসলমান সহসা একদা সমগ্র বঙ্গভূমি পরাজিত করে নাই। সমগ্র বঙ্গভূমি এক অখণ্ড রাজ্যরূপে বর্ত্তমান

থাকিলে হয়ত মুসলমান সেনা আদৌ প্রবেশ করিতে পারিত না; অথবা পারিলেও সমগ্র দেশ একসঙ্গেই পরাজিত হইত। দেশ বহুধা বিভক্ত ছিল, মুসলমানকেও বহু স্থানে যুদ্ধ করিয়া পুনঃ পুনঃ জয়লাভ করিতে হইয়াছিল।

যে সভ্যতা গৌরবের উচ্চচূড়ায় আরোহণ করিয়া তিষ্ঠিতে পারে নাই, দেখিতে না দেখিতে ভূপতিত হইয়াছে, তাহার মূল্য বড় অধিক নহে। তাহার দম্ভ ও আস্ফালন যতই অধিক হউক, সারবত্তা অতি অল্প। বাঙ্গালার তামস যুগের ইতিহাসের যে অস্পষ্ট ছায়ামাত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেও ইহা পরিস্ফুট রহিয়াছে।

পালবংশীয় গোপালদেব একদা গৌড়াধিপতি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার রাজ্যলাভের কথা ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনে এইরূপ লিখিত আছে:—

"মাৎস্যন্যায়মপোহিতুং প্রকৃতিভির্লক্ষ্ম্যাঃকরঃ গ্রাহিতঃ।"

প্রজাপুঞ্জ "মাৎস্যন্যায়" বিদূরিত করিবার আশায় তাঁহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এক মৎস্য যেমন অন্যকে উদরসাৎ করে, বাঙ্গালীরা সেইরূপ একে অন্যের উৎসাদন করিতেন; তন্নিবারণার্থ আপনাদের মধ্যে কোন রাজতন্ত্র সংস্থাপিত করিতে না পারিয়া মগধের নরপতির কণ্ঠে বিজয়মাল্য অর্পণ করিয়াছিলেন!

রাজনৈতিক ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া দিয়া ধর্ম্মনৈতিক ইতিহাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেও বাঙ্গালীর কলঙ্ক কালিমা বিদূরিত হয় না। হিন্দু ধর্ম্মপ্রাণ বলিয়া বিখ্যাত। উঠিতে বসিতে, খাইতে শুইতে, জীবনের প্রতিদিবসের প্রত্যেক কার্য্যে হিন্দুগণ ধর্ম্মের কঠিন নিয়মে নিয়মিত। কিন্তু তাহার মধ্যেও ধ্বংশবীজ নিহিত ছিল।

হিন্দু বৌদ্ধ হইয়াছিল, মুসলমান হইয়াছিল, খৃষ্টিয়ান হইতেছে। ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য খৃষ্টিয়ানগণ জলন্ত চিতায় আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন, বৌদ্ধগণ চিরনির্ব্বাসন দণ্ডের সঙ্গে শততাড়না সহ্য করিয়াছেন, শিখবীরগণ হাসিতে হাসিতে মুণ্ডদান করিয়াছেন। হিন্দু সেরূপ দৃষ্টান্ত রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। সমগ্রইতিহাস আদ্যন্ত একই ভাবে গঠিত; তাহার মধ্যে স্বধর্ম্মপ্রীতি বিশেষ শক্তিলাভ করিয়াছিল সেরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

অল্পে সন্তুষ্ট বলিয়া আমরা স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয়। যাহা কিছু কলহের উৎসাহ সে কেবল ন্যায়শাস্ত্রের বিচারে প্রকাশিত। সুতরাং আমরা একালের ন্যায় সেকালেও ব্যক্তিগত উন্নতির লোভে দেশের বা জাতির মুখের দিকে চাহি নাই; যেন তেন প্রকারেণ আপনার গণ্ডীর মধ্যে বসিয়া আপন লাভের গণ্ডার জন্য লালায়িত রহিয়াছি; লাভের লোভে "স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমিকেও" বিক্রয় করিতে ইতস্ততঃ করি নাই!

আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষায় ও পাশ্চাত্য দৃষ্টান্তে অনেকে এদেশে স্বদেশপ্রীতির বীজবপন করিয়া প্রাণপণে জলসেচন করিতেছেন। উষর ক্ষেত্রে সতেজ বীজও অঙ্কুরিত হয় না; আমাদের দেশেও তাহাই হইতেছে। কিন্তু পাছে পুরাতন আদর্শ নষ্ট হইয়া নূতনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই আশঙ্কায় আর একদল সনাতনবাদী আমাদিগকে টানিয়া লইবার জন্য প্রাণপণে বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছেন।

"সেকাল"—কথার কিছু মাহাত্ম্য আছে;—তাহার নামে স্বভাবতই মনপ্রাণ উৎফুল্ল হইয়া উঠে। কিন্তু সে কোন্ "সেকাল"? আমরা আমাদের ইতিহাসের কোন্ যুগে ফিরিয়া দাঁড়াইব?

যে দিন তুল্যাপরাধে ব্রাহ্মণের পক্ষে ভর্ৎসনা ও শূদ্রের পক্ষে অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, আমরা কি সেই দিনের "সনাতন" পদ্ধতি অবলম্বন করিব? তখন এ দেশে ব্রাহ্মণের অখণ্ড শাসন বর্ত্তমান ছিল। সে শাসন সহ্য করিতে না পারিয়া সাম্যমন্ত্র বিঘোষিত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের হুঙ্কার সমুথিত হইয়া জলস্থল প্রকম্পিত করিয়াছিল। সে দিন ভারতের গৌরবের দিন হইলেও, তাহা অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। তাহার পর যে সকল দিন সমাগত হইয়াছিল, ইতিহাস না থাকিলেও, তাহার স্মৃতি একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। তাহার কোন্ দিনের প্রলোভনে বর্ত্তমানের বর্দ্ধমান আশাতরুর মূলোচ্ছেদ করিয়া সেকালের প্রতি ধাবিত হইব?

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

প্রতিশোধ।

অবিনাশের উপর অতুলের ভারি রাগ হইয়াছিল। রাগ হইবার কথা। ক্লাসে বসিয়া পণ্ডিত মহাশয় যখন নানাবিধ সুরে ও অনেক রসবৈচিত্র্যের অবতারণা করিয়া

ঋজুপাঠের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তখন অতুল কেতাবখানি খুলিয়া খুব মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিতেছিল এবং পেন্সিল দিয়া মানে লিখিতেছিল। পণ্ডিত মহাশয় লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিলেন যে অতুল যেমন ঘাড় গুঁজিয়া এক মনে লিখিতেছে এমন আর কেহই লিখিতেছে না। পণ্ডিত মহাশয় কেদারায় বসিয়া দেখিতেছিলেন এই রকম, কিন্তু অতুলের পাশে বসিয়া অবিনাশ দেখিতেছিল আর এক রকম। সে দেখিতেছিল অতুল খোলা কেতাবের উপর একখানি সাদা কাগজ রাখিয়া তাহার উপর পেন্সিল দিয়া অত্যন্ত যত্নের সহিত একখানি ছবি আঁকিতেছিল। ছবিখানি দেখিয়া অতুলের যে চিত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা আছে এমন মনে হয় না। আর্ট স্কুলের ছেলে হইলে তাহাকে স্কুলে রাখিত কি না সন্দেহ। আর সে ছবি স্কুলের অধ্যক্ষগণ দেখিতে পাইলে পুরস্কারটা বোধ হয় অতুলের পিঠে পড়িত। ছবিখানি কেদারায় উপবিষ্ট মানুষের মূর্ত্তি, কিন্তু মানুষের সঙ্গে সৌসাদৃশ্য বড় ছিল না। বরং বানরের সঙ্গে কতকটা ছিল, কেন না চিত্রকর একটা লেজ বানাইয়া কেদারার নীচে ঝুলাইয়া দিয়াছিল। ছবির মুখের সঙ্গে আর পণ্ডিত মহাশয়ের মুখের সঙ্গে যেন কতকটা সাদৃশ্য ছিল। পণ্ডিত মহাশয়ের নাকের উপর যেমন বাঁকা চশমা ছিল ছবির নাকের উপরও সেই রকম ছিল। মাথার উপর একটা অদ্ভুত পাগড়ি, সে রকম পাগড়ি ভূ-ভারতে কেহ কোথাও বাঁধে না। পাগড়িটা আর লেজটা পণ্ডিত মহাশয়ের আদৌ ছিল না। এ দুটা চিত্রকরের কল্পিত কল্পনা। চিত্র শেষ হইলে অতুল গোটা গোটা অক্ষরে নীচে লিখিল, "মাথায় পাগড়ী ও—ওরফে পণ্ডিত মহাশয়।" লেখাটা তেমন বিশুদ্ধ নয়, বর্ণাশুদ্ধি দুই একটা ছিল। লেখা সমাপ্ত হইলে অতুল এক দৃষ্টে ছবিখানি দেখিতে লাগিল।

আশঙ্কার কোন কারণ তাহার মনে উঠে নাই। সে ভাবিতেছিল পণ্ডিত মহাশয় উঠিয়া গেলে ছবিখানা অন্য ছেলেদের দেখাইবে। গৃহশত্রুকে যে কত ভয় সে কথা ভাবিবার তাহার অবসর হয় নাই। অবিনাশ কোন কথা না বলিয়া পাশে বসিয়া ছবিখানি দেখিতেছিল। হঠাৎ খপ্ করিয়া সেখানা অতুলের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া একেবারে পণ্ডিত মহাশয়ের সম্মুখে গিয়া ধরিল। পণ্ডিত মহাশয় ছবিখানা চক্ষের কাছে ধরিয়া ভাল করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া, গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "এ কার কাজ ?"

অতুল আড়ষ্ট। তাহার মুখ একবার লাল, একবার সাদা হইয়া উঠিতেছিল, বুকের ভিতর ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল। ছবিখানা আঁকিবার সময় যেমন মজা বোধ হইতেছিল এখন মনের ভাব ঠিক সে রকম নয়। অবিনাশ যখন বলিল, "মহাশয়, অতুল এই ছবিখানা আঁকছিল", তখন অতুলের মুখেই সে কথা স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হইল।

পণ্ডিত মহাশয় অতুলকে কাছে ডাকিলেন। অতুল কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। পণ্ডিত মহাশয় তাহাকে ধৃষ্ট, পাষণ্ড প্রভৃতি নানা সম্বোধনে অভিহিত করিলেন। আর যে কতকগুলা কথা বলিলেন সেগুলা ত সংস্কৃত নহেই, বাঙ্গালা অভিধানেও পাওয়া যায় না। ছবিখানা সম্মুখে না থাকিলে হয় ত গালি দিয়াই পণ্ডিত মহাশয়ের ক্রোধের উপশম হইত, কিন্তু তাহার রাগ পড়িল না। পার্শ্বে বেত্র ছিল সেইটা তুলিয়া লইয়া অতুলকে ঘা কতক উত্তম মধ্যম দিলেন। তাহাতেও শান্তি হইল না। অতুলকে ধরিয়া প্রধান শিক্ষকের নিকট লইয়া গেলেন। শিক্ষক মহাশয় ছুটীর পর এক ঘণ্টা কাল অতুলকে স্কুলে আটক থাকিতে আদেশ করিলেন, আর শাসাইলেন যে দ্বিতীয় বার এরূপ অপরাধ করিলে তাহাকে স্কুল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন।

যখন স্কুল ভাঙ্গিয়া যায় সে সময় প্রহার ও অপমানের স্মৃতি অতুলের মনে প্রবল। কিন্তু তাহার চেয়েও প্রবল অবিনাশের উপর রাগ। অবিনাশকে তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়া অতুল কহিল, "মনে থাকে যেন, তোমায় দেখে নেব।"

অবিনাশের মনে তখন বড় স্ফূর্ত্তি। হাত দোলাইয়া, মাথা নাড়িয়া কহিল, "দেখে থাকে ঢের ঢের লোকে! আজ ত দেখেছি, আবার না হয় এক দিন দেখ্‌ব।" সে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

সেই এক ঘণ্টা অতুলের পক্ষে যেন কাটে না। মনে মনে কত কি যে ভাবিতে লাগিল তাহা বলা যায় না। কখন ভাবিল যে সন্ধ্যার পর পুকুরের ধারে যদি কোন দিন অবিনাশকে একা পায় ত তাহাকে জলে চুবাইবে। আবার ভাবিল যে আজই রাত্রে গিয়া অবিনাশের ঘরে

আগুন লাগাইয়া দিবে। একবার ভাবিল তাহাকে দেখিতে পাইলেই মারিবে। তাহার বইগুলা লইয়া পুড়াইয়া দিবে, তাহার গায় কাঁটা ফুটাইয়া দিবে, সকলের সাক্ষাতে তাহাকে গালি দিবে। মনে মনে কতবার অবিনাশকে জলে চুবাইল, তাহাকে পুড়াইয়া মারিল, তাহাকে পথে অপমানিত করিল। শাস্তির সময় অতিবাহিত হইলে অতুল রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে বাড়ী গেল।

অতুলকে ভয় না করুক অবিনাশ অন্য ছেলেদিগকে কিছু ভয় করিত। যখন সে স্কুল হইতে বাহির হইয়া যায় তখন দেখে যে তাহাদের শ্রেণীর একদল বালক জড় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা তাহাকে দেখিয়া টিটকারী দিতে লাগিল ও নানা রূপে শাসাইতে লাগিল। তখন অবিনাশের মনে হইতে লাগিল যে অতুলকে ওরকম করিয়া ধরাইয়া দেওয়া কাজটা বড় ভাল হয় নাই।

পর দিবস অতুলের রাগ কতক পড়িলেও পড়িতে পারিত কিন্তু বেত্রাঘাতের বেদনা তখনও গায়ে ছিল। আর পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতি ত তিলমাত্রও রাগ হয় নাই, রাগটা সম্পূর্ণই ছিল অবিনাশের উপর। স্কুলে গিয়া অতুল দেখিল সকল ছেলেই তাহার দিকে, সকলেই অবিনাশের উপর রাগিয়া অস্থির, সকলেই তাহাকে জব্দ করিবার জন্য একান্ত উৎসুক। কিন্তু হঠাৎ একটা কিছু রাগের মাথায় করিয়া ফেলিলে মুস্কিল। তাহা হইলে বুলর-বুয়রের মত একটা কিছু গণ্ডগোল বাধিবার নিতান্ত সম্ভাবনা। কারণ অবিনাশ ছেলে মহলে এক ঘরে হইলেও সে শিক্ষক এবং পণ্ডিত মহাশয়ের শরণাপন্ন, তাহার উপর একটা কিছু অত্যাচার হইলে ধাক্কাটা তাঁহারা সামলাইবেন। শিক্ষকেরা সব এক দিকে আর কতকগুলি ছেলে এক দিকে এমন অবস্থায় সমান যুদ্ধ হইতেই পারে না। তাহাতে শিক্ষকদিগের কোন দোষ ছিল না, তাঁহাদের উপর কোন ছেলের রাগ ছিল না। অতএব সহসা প্রকাশ্য ভাবে অবিনাশের সঙ্গে মারামারি কিম্বা ঝগড়া করা যায় না। টিফিনের ছুটীর সময় অতুলও কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া একটা উপায় ঠাহরাইতে লাগিল। তাহাদের কথাবার্ত্তা যদি তখন শুনিতে তাহা হইলে বুঝিতে পারিতে যে এমন যুদ্ধশাস্ত্র-বিশারদ পোলিটিশান যেখানে সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় না। পরামর্শটা যখন স্থির হইল তখন চারিদিকে হেলিওগ্রাফিক কিম্বা মেসনিক সঙ্কেত হইয়া গেল। অবিনাশ তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিল না।

ছুটীর পর অবিনাশ বাড়ী যাইতেছে, পথে দেখে তাহাদের ক্লাসের কয়েকটী ছেলে। অতুল তাহাদের মধ্যে নাই। একজন বলিল, "অরে কালা দেও।"

ওয়াজিদ আলি শাহ প্রণীত ইন্দ্রসভার অভিনয় সম্প্রতি পার্সি থিয়েটারে হইয়া গিয়াছিল। অবিনাশও দেখিতে গিয়াছিল। 'কালা দেও' নিন্দুক ও চাটুবাদী চরিত্র। নামটা শুনিয়া অবিনাশের মুখ লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু শুনিতে পায় নাই এই রকম ভান করিয়া না দাঁড়াইয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ আর এক জন বলিয়া উঠিল, "Titus Oates !"

এ নামটা আরও তাজা! আজিকার পড়ার ভিতর। টাইটস্ ওট্‌স্ এক জনকে বলিলে সে কি চুপ করিয়া থাকিতে পারে? অবিনাশের পা আর তেমন জোরে চলে না। এমন রাগ হইতেছিল যে দাঁড়াইয়া দুটা কথা শুনাইয়া দিলেও দিতে পারিত, কিন্তু সাহসে কুলাইয়া উঠিতেছিল না। কিন্তু সে চলিয়া যাইবে কোথা? তাহার পশ্চাতে পদশব্দ আসিতে লাগিল, আর কণ্ঠশব্দ আরও দ্রুত আসিতে লাগিল।

"শকুনি মামা! বলি ও শকুনি মামা!"

"বিভাষণ যাও কোথা?"

"ওহে গডাচড় চণ্ড্র!"

পরীক্ষার সময় এত ইতিহাস ও রূপক ছেলেগুলির যোগাইত কি না বিশেষ সন্দেহ স্থল, কিন্তু এখন তাহারা হু হু করিয়া পুরাণ, ইতিহাস, নাটক, নভেল হইতে কতকগুলি প্রধান প্রধান চরিত্রের নাম আওড়াইয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে ধর্ম্মশাস্ত্র আসিল।

"Cain!"

"Satan!"

সয়তানের পর আর চলে না। তোমার আমার না চলিতে পারে, কিন্তু যাহারা চালাইতেছিল তাহাদের অক্ষয় তূণ! তাহারা বাইবেল, ইংরাজি, পুরাণ, রূপক, ইতিহাস,

থিয়েটারী নাটক সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া একেবারে সাফ বাঙ্গালা ধরিল।

"বিশ্বাসঘাতক!"

"বদমায়েশ!"

"চোর!"

অবিনাশ আর সহ্য করিতে পারিল না। ফিরিয়া কহিল, "আমাকে বল্‌চ?"

প্যারেডের সময় সৈন্যগণ যেমন সকলে একত্রে অধ্যক্ষের আজ্ঞা পালন করে, রাইট্‌ এবাউট্‌ বলিবা মাত্র সকলে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়ায়, সেইরূপ অবিনাশের কথা শুনিবা মাত্র অপর পক্ষীয় সকলে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। কেহ কোন কথা কয় না দেখিয়া অবিনাশের একটু ভরসা হইল। আর একটু নিকটে গিয়া, বিলক্ষণ রাগ প্রকাশ করিয়া কহিল, "ও কথা গুলা কি আমায় বলা হচ্চিল?"

তখন সেই শিক্ষিত সৈন্যদল আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। এক জন বলিল, "কে হে তুমি, তোমাকে চিনি না।"

অমনি সারিবন্দি রব উঠিল, "আমরা কেউ তোমায় চিনি না।"

গালাগালি বরং ছিল ভাল, কিন্তু এ যে একেবারে ছুরীর ঘা, অর্থাৎ কর্ত্তন, কি না কটিং। অবিনাশ এত টুকু হইয়া মাটীতে মিশাইয়া গেল। বাড়ীর দিকে যখন আবার ফিরিল তখন পূর্ব্বের সেই পৃষ্ঠভেদী, কর্ণবিদারী বাক্যবাণ। অবশেষে অবিনাশ রণে ভঙ্গ দিয়া বেগে পলায়ন করিল। শত্রুপক্ষের জয়ধ্বনি এবং কঠোর আনন্দনিনাদ অনেক দূর পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে সঙ্গে গেল।

অবিনাশের একমাত্র উপায় ছিল। সে তাহাই অবলম্বন করিল। পর দিবস গিয়া শিক্ষকের কাছে ফরিয়াদ করিল, বলিল, "মহাশয়, অতুল পণ্ডিত মহাশয়ের ছবি আঁকিতেছিল দেখিয়া আমি তাহাকে ধরাইয়া দিয়াছিলাম. সেই জন্য ছেলেরা সব মিলিয়া কাল বাড়ী যাইবার সময় আমায় গালি দিয়াছিল।"

"কে কে ছিল?"

"গোপাল, বিপিন, যোগেন, মোহন, শ্যাম, নবীন, অধর, বিনয়, মহেশ, কেদার, তারিণী, আরও অনেকে ছিল।"

"বটে? গোপাল!"

"আজ্ঞা।"

"তুমি কাল পথে অবিনাশকে গালাগালি দিয়াছিলে?"

"মিথ্যা কথা, মহাশয়! কাল আমি অবিনাশকে পথে দেখিও নাই।"

"বিপিন!"

"আজ্ঞা, সমস্ত মিথ্যা। অতুলের নামে একটা সত্য দোষ পাইয়া অবিনাশ আমাদের সকলের নামে মিথ্যা বলিতেছে।"

অবিনাশ বলিল, "না মহাশয়, আমি সত্য বলিতেছি। উহারা এখন মিথ্যা বলিতেছে, ভয়ে স্বীকার করিতেছে না।"

অপরাধীরা কেহই কোন কথা স্বীকার করে না। শিক্ষক মহাশয় তখন অবিনাশকে বলিলেন, "তোমার কেহ সাক্ষী আছে? ইহারা যে তোমায় গালি দিয়াছিল আর কেহ শুনিয়াছিল?"

অবিনাশের মকদ্দমা জিতিবার আশাটা তখন কমিতে লাগিল। বলিল, "না, মহাশয়, আর কেহ ছিল না, কেবল ইহারাই ছিল।"

"তাহা হইলে শুধু তোমার কথায় বিশ্বাস করিয়া ক্লাসের অর্দ্ধেক ছেলেকে শাস্তি দিতে পারি না। বিশেষ, ইহাদের নামে এতদিন আমি কোন অভিযোগ শুনি নাই।"

ক্লাসে টুঁ শব্দটী নাই। অবিনাশ চুপ। আর সব ছেলেদের মুখে কথা নাই, হাসির কোন চিহ্ন নাই। বিচার এই রকম ছাড়া আর অন্য রকম হইতে পারে না, তাহাদের মুখের ভাবে সেইরূপ বুঝায়। অবিনাশের নালিশ দাখিল দপ্তর হইয়া গেল।

দুইটার সময় যখন জলযোগের অবকাশ হইল তখন হাস্য টিট্‌কারীর তরঙ্গে নাকানি চোকানি খাইয়া অবিনাশ আবার শিক্ষক মহাশয়ের কাছে ছুটিল। তিনি একটী অন্ধকার কুঠুরীতে অতি জীর্ণ, ভগ্নপৃষ্ঠ, ভগ্নবাহু কেদারায় বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। অবিনাশকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কি?"

"মহাশয়, আমাকে দেখিয়া উহারা হাসিতেছে ও মুখ ভেঙ্গ্‌চাইতেছে। আপনি আমার কথা তখন বিশ্বাস করিলেন না কিন্তু আমি আপনাকে দেখাইয়া দিতে পারি।"

"তোমার কথায় আমি অবিশ্বাস করি নাই, কিন্তু শুধু তোমার কথায় অনেকগুলি ছেলেকে সাজা দিলে স্কুলের ক্ষতি হইবে। কিন্তু আমি যদি স্বচক্ষে দেখিতে পাই বা স্বকর্ণে শুনিতে পাই তাহা হইলে ত তোমার কথা প্রমাণ হইয়া গেল।"

"আচ্ছা, মহাশয়, আজই আপনাকে দেখাইয়া দিব।"

"কখন?"

"ছুটীর পর। বাড়ী যাইবার পথে।"

"আমি থাকিলে ত তোমায় কেহ কিছু বলিবে না।"

"তা কেন মহাশয়, আপনি একটু আগে গিয়া মিত্রদের বাড়ীতে একটু বসিবেন। জানালার একটা পাখি খুলিয়া রাখিলেই সব দেখিতে পাইবেন, শুনিতেও পাইবেন।"

"ভাল কথা, তাহাই হইবে।"

অবিনাশ একটু খুসী হইয়া ক্লাসে ফিরিল। মনে করিতেছিল, খুব একটা ষ্ট্রাটেজিক্‌ চাল চালিয়াছে। কিন্তু কত গোয়েন্দা যে তাহাকে চক্ষে চক্ষে রাখিতেছিল সে

সন্ধান সে রাখিত না। ছুটীর পর যখন সে এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে মৃদুপদবিক্ষেপে মিত্রদের বাড়ীর সম্মুখে উপনীত হইল, সেখানে গোপাল, বিপিন, যোগেন কোম্পানির কাহারও টীকিটি পর্য্যন্ত দেখিতে পাইল না। জানেলার সম্মুখে উপস্থিত হইবা মাত্র ভিতর হইতে প্রশ্ন আসিল, "কই, তারা সব কোথায়?"

বড়মুখ করিয়া অবিনাশ এই কৌশল করিয়াছিল, কিন্তু একটাও পাখীর একটা পালক পর্য্যন্ত ফাঁদে পড়িল না। লজ্জিত হইয়া কহিল, "আজ একজনও আসে নাই। বোধ হয় কোন রকম করিয়া টের পাইয়া থাকিবে।"

ভিতর হইতে শিক্ষক একটু রুষ্টস্বরে কহিলেন, "আমি না থাকিলে কাল হয় ত ক্লাসে আসিয়া আবার নালিশ করিতে।"

অবিনাশ কহিল, "মহাশয়, আমি কি মিথ্যা বলিয়াছি?"

"তাহা জানি না। তুমি এখন বাড়ী যাও।"

অবিনাশ বাড়ী গেল, কিন্তু তাহার মন পূর্ব্ব দিনের অপেক্ষা খারাপ হইয়া গেল।

তার পরদিন অবিনাশ যখন স্কুলে যাইতেছে তখন পথে কে একজন লোক তাহার হাতে একখানা কাগজ দিয়া চলিয়া গেল। লোকটা কে অবিনাশ ভাল করিয়া দেখিতে পাইল না। মনে করিল বুঝি থিয়েটরের হ্যাণ্ডবিল। খুলিয়া দেখে কাগজখানি বিচিত্র কবিতায় পূর্ণ, ও সে নিজে সেই কবিতাগুলির লক্ষ্য। পড়িতে পড়িতে সে রাগে, লজ্জায় অস্থির হইয়া উঠিল। কাগজখানা সহস্র খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া পদদলিত করিল। স্কুলের ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখে অতুলের দল বল সকলে দাঁড়াইয়া একখানা কাগজ লইয়া পড়িতেছে। সকলের মুখে হাসি আর ধরে না। কাগজখানা কি অবিনাশের বুঝিতে বাকি রহিল না। সে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় দুই চারি জন তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল, আর দুই একজন জোরে জোরে সেই অপূর্ব্ব কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিল। অবিনাশ রাগে কাঁদ কাঁদ হইয়া যখন বেগে পথরোধকারীদিগকে ঠেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল তখন ভারি হাসির ধূম পড়িয়া গেল।

ক্লাসে গিয়া অবিনাশ আবার শিক্ষকের কাছে লাগাইল। বলিল, "মহাশয়, ইহারা পদ্য লিখিয়া আমায় গালাগালি দিয়াছে।"

"কোথায় পদ্য দেখি।"

নিজের খানা অবিনাশ ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল। বলিল, "ইহাদের সকলের কাছে আছে, খুঁজিলে পাওয়া যাইবে।"

শিক্ষক মহাশয় আদেশ করিলেন, "আচ্ছা, খুঁজিয়া বাহির কর।"

অতুল হঠাৎ একবার ধরা পড়িয়াছিল বলিয়া যে সকলেই ধরা পড়িবে সে সম্ভাবনা অল্প। অনেক খোঁজ হইল কিন্তু কবিতা বা কবিকে পাওয়া গেল না। শিক্ষক তখন রাগিয়া গেলেন, বলিলেন, "তুমি যদি রোজ রোজ এই রকম অনর্থক নালিশ কর তাহা হইলে তোমার সাজা হইবে।"

সময় বুঝিয়া গোপাল বলিল, "মহাশয়, কাল মিথ্যা করিয়া আমাদের নামে বলিয়াছিল যে আমরা গালি দিয়াছি। আজ বলিতেছে কবিতা লিখিয়াছি। রোজ রোজ ত এই রকম একটা না একটা মিথ্যা অপবাদ দিতে পারে।"

তখন আরও অনেকের মুখ ফুটিল। শিক্ষক বলিলেন, "এবার মিথ্যা অভিযোগ করিলে অবিনাশের বিলক্ষণ শাস্তি হইবে।"

অবিনাশের বুক দমিয়া গেল।

পণ্ডিত মহাশয়ের ঘণ্টায় কেহ কিছু বলিল না। তাহার পর শিক্ষক মহাশয় আবার আসিলেন। তিনি বসিয়া পড়াইতেছেন এমন সময় অবিনাশ চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিল। "দেখুন দেখি মহাশয়!"

"কি?"

"এই আমায় চিম্‌টী কাটিতেছে।"

"কে?"

"গোপাল।"

গোপাল যেখানে বসিয়াছিল সে স্থান হইতে অবিনাশকে চিম্‌টী কাটা অসম্ভব। গোপাল দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, "মহাশয়, এখান হইতে কি আমি উহাকে চিম্‌টী কাটিতে পারি?"

শিক্ষক ভাল করিয়া দেখিলেন, তাহার পর কহিলেন, "অবিনাশ, আজ ছুটির পর তুমি এক ঘণ্টা স্কুলে আটক থাকিবে।"

অবিনাশ ঢোঁক গিলিয়া বসিয়া পড়িল। আর সকলে গম্ভীর, কাহারও মুখে হাসির নাম নিশানাও নাই।

বাড়ী যাইবার সময় অতুল কয়েদীর সম্মুখে গেল। বলিল, "কেমন, আমার মত ঢের ঢের দেখেছ না?"

অবিনাশ কহিল, "যাও যাও, সকলে মিলে মিথ্যা কথা বলে আবার চালাকি!"

"বলেছিলে না আর এক দিন দেখ্‌বে? এখন দেখ্‌চ ত?"

"তার আর হয়েচে কি! তুমিও এক দিন কয়েদ ছিলে আমিও না হয় এক দিন রইলাম। তার আর ভয় কিসের?"

"শুধু বুঝি এই! এই ত সবে আরম্ভ। এখনি হয়েচে কি! দেখো তোমার কি দশাটা হয়।" বলিয়া অতুল ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। অবিনাশের তখন রাগই বেশী, ভয় পাইবার কথা নয়। সে রাগের মুখে, অতুলের

অনুপস্থিতিতে তাহাকে বিস্তর মন্দ কথা বলিল। অতুলও এক দিন এইরূপ বলিয়াছিল, কিন্তু এখন তাহার সহায় অনেকে, অবিনাশ অসহায়।

সে দিনও গেল। তাহার পর দিন যে শিক্ষক অবিনাশকে আটক রাখিয়াছিলেন তিনি পড়াইতে ছিলেন। অবিনাশের পাশে যে বসিয়াছিল সে এ কয় দিনের ব্যাপারে এ পর্য্যন্ত নিলিপ্ত ছিল। অবিনাশের বই এক খানা লইয়া সে পাতা উল্টাইতেছিল। হঠাৎ বই খানা হাতে করিয়া উঠিয়া শিক্ষক মহাশয়ের নিকট গেল। অবিনাশ এ পর্য্যন্ত কিছু সন্দেহ করে নাই।

যাহার হাতে কেতাব ছিল সে খুলিয়া শিক্ষক মহাশয়কে দেখাইল। কেতাবের ভিতর একখানি সাদা কাগজে শিক্ষক মহাশয়ের মূর্ত্তি আঁকা। আর মূর্ত্তি বলিয়া মূর্ত্তি! অতুল পণ্ডিত মহাশয়ের যে ছবি আঁকিয়াছিল, সে ইহার তুলনায় ত সোণার চাঁদ। শিক্ষক মহাশয়ের মাথায় গাধার টুপি, কপালে শিং। ছবির নীচে নানাবিধ নাম—তাহার একটা পড়িলে মানুষের এক বৎসর রাগ যায় না। শিক্ষক মহাশয় সকলগুলি পড়িলেন। তিনি পণ্ডিত মহাশয়ের মত ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন না। অবিনাশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কিছু বলিবার আছে?"

অবিনাশের মুখে কথা সরে না। বলিল, "মহাশয়, যে দিব্য করিতে বলেন সেই দিব্য করিয়া বলিতে পারি আমি ও ছবি আঁকি নাই। আমি ছবি আঁকিতে একেবারে জানি না। শত্রুতা করিয়া ইহারাই কেহ আমার কেতাবের ভিতর রাখিয়া দিয়া থাকিবে।"

শিক্ষক মহাশয়ের তরফ হইতে অন্য ছেলেরা কথা পাড়িল। এক জন বলিল, "অতুলের বেলা যে অবিনাশ শত্রুতা করে নাই তাহাই বা কে জানে?"

আর এক জন, "মহাশয়, কাল আপনি অবিনাশকে স্কুলে আটক করিয়াছিলেন বলিয়া বাড়ীতে এই ছবি আঁকিয়াছে। আজ আনিয়া আমাদের দেখাইতেছিল। এখন আবার অস্বীকার করিতেছে।"

ক্লাসসুদ্ধ জুরী একবাক্যে অবিনাশকে অপরাধী সাব্যস্ত করিল। বিচারপতি যিনি তিনি স্বয়ং ফরিয়াদী, এজন্য শাস্তির ভার নিজে লইলেন না। প্রধান শিক্ষকের ঘরে কোর্ট মার্শাল বসিল, চট্ করিয়া ড্রামহেড বিচার হইয়া গেল। সমবেত স্কুলের সাক্ষাতে অবিনাশের বেত্রদণ্ড হইল। যত বা অপমান ততই বেত্রাঘাতের জালা। তাহার পর অবিনাশের মস্তকে রাজমুকুটের ন্যায় গর্দ্দভ-উষ্ণীষ রক্ষিত হইল। পার্শ্বে দুই চারিজন নকীব দাঁড়াইল। তাহারা অবিনাশের দুই হাত ধরিয়া ক্লাসে ক্লাসে ঘুরিতে লাগিল এবং অতি মুক্তকণ্ঠে তাহার অক্ষয় কীর্ত্তি ও তাহার পুরস্কার ঘোষণা করিতে লাগিল। পরিশেষে বারান্দায় একটা বেঞ্চের উপর অবিনাশ দাঁড়াইল। স্কুল ভাঙ্গিবার সময় পর্য্যন্ত সেইরূপ দাঁড়াইবার হুকুম।

স্কুল ভাঙ্গিল। বাহিরে আসিয়া অতুল, গোপাল, বিপিন, যোগেন প্রভৃতি অবিনাশকে ঘিরিল। অতুল বলিল, "কি চাঁদ, ঢের ঢের দেখেচ না? তোমায় যদি রোজ রোজ নতুনতর না দেখাই ত আমার নামই নয়!"

সমস্বরে একটা রব উঠিল, "রসো বাবা, এখনি হয়েচে কি! এখনো অনেক দেখতে বাকি আছে।"

অবিনাশ কিছু উত্তর করিল না। আজ তাহার পরাজয়ের কিছু আর বাকি ছিল না। লাঞ্ছিত, অপমানিত, তিরস্কৃত, প্রহারিত হইয়া সে ধূলির অধম হইয়া গিয়াছিল।

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা পড়িতে লাগিল,

"Judas Iscariot!"

"দুঃশাসন!"

"রাবণ!"

অবিনাশ কাঁদিয়া ফেলিল। শিক্ষকদিগের কাছে আর কোন আশা ছিল না। এখন সব শত্রুপক্ষ, মিত্রপক্ষ আর কেহ অবশিষ্ট রহিল না। রহিল কেবল রোদন। সেই তাহার একমাত্র সহায়। বালানাং রোদনং বলং। অবিনাশ কাঁদিতে লাগিল।

তখন অতুলের কৃপা হইল, বলিল, "আর কখন কারুর নামে লাগাবে?"

অবিনাশ ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া বলিল, "তোমরা আমায় মেরে ফেল, তা হলে তোমাদের সাধ মিট্‌বে।"

"আর কখন কারুর নামে লাগাবে?"

অবিনাশ শপথ করিয়া বলিল, "আর কখনও না।"

"বল ঘাট।"

"ঘাট।"

"নাকে খত দাও।"

অবিনাশ নাকে খত দিল।

"আচ্ছা, এবার তোমায় মাপ করা গেল," বলিয়া অতুল সসৈন্যে বিজয়ী সেনাপতির মত হর্ষধ্বনি করিতে করিতে গৃহে চলিয়া গেল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

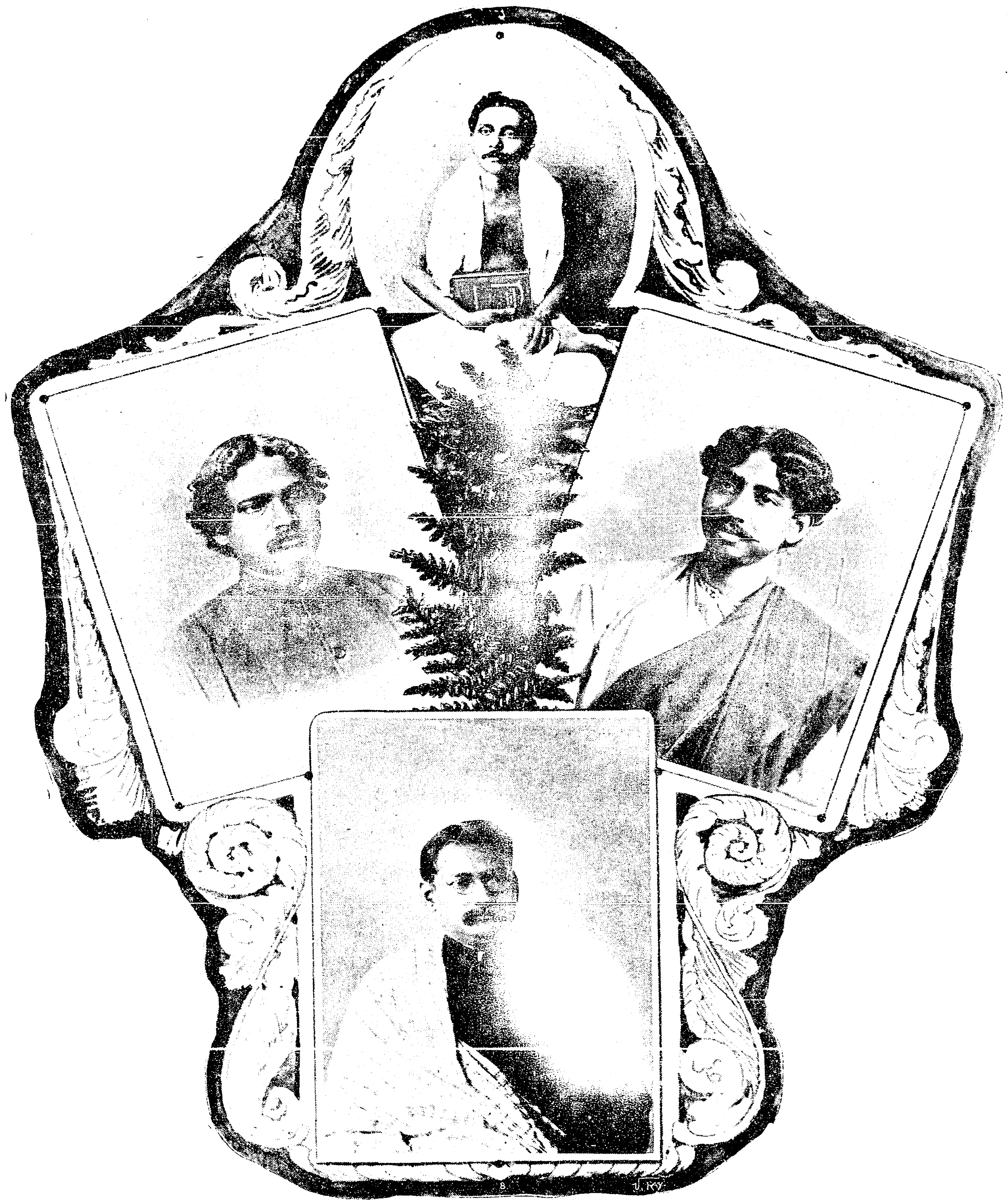

শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী,
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি, এল্।

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

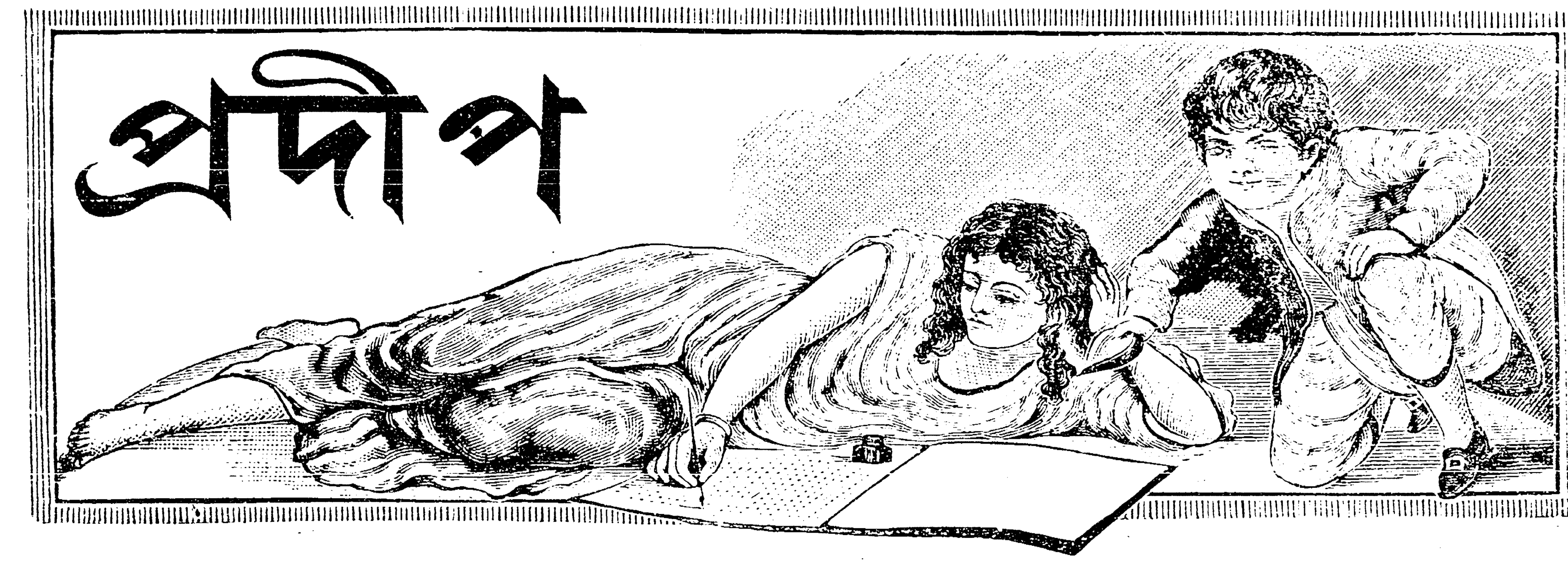

তৃতীয় ভাগ। ফাল্গুন, ১৩০৬। ৩য় সংখ্যা।

সম্পাদকের নিবেদন।

মাঘ মাসের প্রদীপ সম্পাদন করিয়া শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রদীপের সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। বিদেশে বাস বশতঃ সম্পাদকের যে অসুবিধা তাহা তিনি অনেক দিন হইতে অনুভব করিতেছিলেন। আনুষঙ্গিক আরও কতকগুলি অসুবিধা ঘটিয়াছিল।

এই সংবাদ শ্রবণে প্রদীপের পাঠক ও পাঠিকাগণ এবং সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই দুঃখিত হইবেন। রামানন্দ বাবু যেরূপ দক্ষতা, সম্ভ্রম ও সংযমের সহিত দুই বৎসর কাল প্রদীপের সম্পাদকতা করিয়া আসিয়াছেন তাহার অতিরিক্ত প্রশংসা করা যায় না। সে জন্য প্রদীপের কার্য্যাধ্যক্ষ এবং পাঠক পাঠিকা সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

এই সংখ্যা হইতে প্রদীপের সম্পাদকীয় ভার আমি গ্রহণ করিলাম। রামানন্দ বাবু প্রদীপের সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহ চক্ষে প্রদীপকে দেখিবেন আমরা সে আশা করি এবং সর্ব্বদা তাঁহার পরামর্শ পাইব সে ভরসাও আছে।

বাঙ্গালা মাসিক পত্রের ইতিহাসে বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আমাদের দেশে মাসিক পত্রের যখন প্রথম সৃষ্টি হয় তখন লেখকের সংখ্যা অল্প, সম্পাদককেই পত্রের অধিকাংশ লিখিতে হইত। এখন শিক্ষিত লোকে অনেকে বাঙ্গালা পড়েন ও লেখেন, বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে এখন অনেকে ব্রতী। অন্যান্য দেশে সম্পাদককে যাহা করিতে হয় কতক পরিমাণে এখন এদেশেও তাঁহাকে তাহাই করিতে হয়। প্রধানতঃ প্রবন্ধ নির্ব্বাচন করাই সম্পাদকের কর্ত্তব্য। তাহার অধিক বিশেষ কিছু করিতে হইবে না এই ভরসা পাইয়াই আমি এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছি। যাঁহারা এতদিন প্রদীপকে অনুগ্রহ করিয়াছেন, যাঁহাদের রচনায় এই পত্রের এতাদৃশ উন্নতি হইয়াছে তাঁহারা আমাকেও কৃপা করিবেন ইহাই আমার প্রধান ভরসা।

আর একটা কথা না বলিলে এই সংক্ষিপ্ত নিবেদন সম্পূর্ণ হয় না। প্রদীপের উন্নতির মূলে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দাসের উদ্যম, উৎসাহ, আয়োজন, পরিশ্রম ও একাগ্রতা। তাঁহার সেই উৎসাহ ও উদ্যম উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। তিনি আমার প্রধান সহায় এবং তাঁহার সহায়তা পাইব জানিয়াই আমি এই পত্রের সম্পাদকতা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছি। একথা বলিবার অবসর আর হইবে না জানিয়া এই সময় বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

৺ বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী।

সাধের আসন।*

কে তুমি জননী, পিতা,
নন্দিনী, রমণী, মিতা,
প্রেম ভক্তি স্নেহ রস উদার উচ্ছ্বাস ?
কে তুমি মা জল-স্থল,
মহান্ অনিলানল,
নক্ষত্র-খচিত নীল অনন্ত আকাশ ?
কে তুমি ? কে তুমি এই বিরাট বিকাশ ?

নিতি নিতি তরু লতা
নধর নূতন পাতা
কেমন প্রফুল্ল আহা কুসুম সুন্দর !
ঝ'রে যায় পরক্ষণ
ব্যথিয়া নয়ন মন,
আবার তেমনি ফুল ফোটে থরে থর !

এ বিশ্ব মন্দিরে তব
কিবে নিত্য নবোৎসব !
আনন্দে অবোধ ছেলে
বেড়াই হৃদয় ঢেলে।
কে তুমি মা বিশ্বেশ্বরী,
দাঁড়ায়েছ আলো করি ?
সদাই সম্মুখে দেখি, তবু তোরে চিনি না।
যখন যা আসে মনে
ডাকি সেই সম্বোধনে,
মা ছাড়া মায়ের কোন নাম আমি জানি না।

নিশান্তের লাল লাল
তরুণ কিরণ জাল
ফুটাও তিমির নাশি সে নীল গগনে।
আহা সেই রক্ত রবি
তোমারি পদাঙ্ক-ছবি !
জগতে কিরণ দেয় তোমারি কিরণে।

আকাশ পাতাল ভূমি
সকলি, কেবল—তুমি !
এক করে বরাভয়—
বিশ্বের নিয়তোদয়,
নিয়ত প্রলয় হয় অন্য করতলে।
দশ দিকে পায় স্ফূর্ত্তি,
তোমার মহান্ মূর্ত্তি,
অনাদি অনন্ত কাল লোটে পদতলে !

প্রত্যক্ষে বিরাজমান,
সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠান,
তুমি বিশ্বময়ী কান্তি, দীপ্তি অনুপমা ;
কবির যোগীর ধ্যান,
ভোলা প্রেমিকের প্রাণ,
মানব মনের তুমি উদয় সুষমা।

* ৺ বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী বিরচিত অপ্রকাশিত দীর্ঘ কবিতার ভগ্নাংশ। সম্পূর্ণ কবিতা তাঁহার গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত হইবে। কবির পুত্রগণ গ্রন্থাবলী প্রকাশিত করিতেছেন। বিহারি বাবুর ভাল ফটোগ্রাফ নাই। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পেন্সিলে বিহারি বাবুর একখানি ছবি আঁকিয়াছিলেন। সেই ছবি প্রদীপে প্রকাশিত হইল।—প্রদীপ সম্পাদক।

প্রাচীন জর্ম্মণ জাতি।

(১)

উপক্রমণিকা।

ইংরাজ, আমেরিকান এবং জর্ম্মণ, এই তিনটী অতি প্রবল, উন্নত ও বর্দ্ধিষ্ণু জাতি প্রাচীন জর্ম্মণদিগের বংশধর। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা সভ্যতা, ঐশ্বর্য্য ও পরাক্রমে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহাদিগের, বিশেষতঃ আমাদিগের প্রভু ইংরেজদিগের, পূর্ব্বপুরুষগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন যে আমাদিগের বিশেষ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করা উচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, রাজবংশের চরিত্রালোচনায়, পারত্রিক না হইলেও, ঐহিক মঙ্গলের সম্ভাবনা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইংরেজ ও তাঁহার জাতিদিগের অভূতপূর্ব্ব ধনবল এবং জ্ঞানসম্পদ আকস্মিক ঘটনামাত্র নহে। যে সকল গুণ ও সামাজিক ব্যবস্থার ফলে তাঁহারা সৌভাগ্যের উচ্চতম শিখরে আরূঢ় হইয়াছেন, প্রাচীন জর্ম্মণদিগের মধ্যে তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ইংরেজ চরিত্রের দুইটী গুণ বিশেষ ভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান, এবং স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা। এই দুইটী গুণই জর্ম্মণদিগের মধ্যে পরিস্ফুট রূপে বিদ্যমান ছিল। প্রাচীনকালের কোনও জাতির মধ্যেই স্ত্রীলোকের এত সম্মান ছিল না। ইহুদী, গ্রীক এবং রোমাণদিগের মধ্যে নারীগণের অবস্থা অতিশয় হীন ছিল। রমণীদিগেরও যে স্বাধীন অস্তিত্ব আছে, তাঁহাদিগের যে মন বলিয়া একটা জিনিস আছে, এবং তাহার উৎকর্ষ সাধনের প্রয়োজন আছে, অত্যুন্নত গ্রীকগণও তাহা বুঝিতে পারে নাই। গ্রীস এবং রোমে স্ত্রীলোকের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন ছিল না বলিলেই হয়। ভারতীয় আর্য্যগণ স্ত্রীজাতিকে কৃপা ও সহৃদয়তার চক্ষে দেখিতেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে কোনও কালে কোনও সামাজিক বা রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করেন নাই। তাঁহারা রক্ষণীয়া, পালনীয়া, মাননীয়া, কিন্তু স্বাধীনতার যোগ্যা নহেন। (ক) এক জর্ম্মণজাতির মধ্যে স্ত্রীলোককে পুরুষের অপেক্ষাও প্রভাবশালী দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপর, ইংরেজদিগের স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তার অর্থ স্বাধীনতা-প্রিয়তা। একান্নবর্ত্তীপরিবারে অভ্যস্ত আমরা ইংরেজ চরিত্রের এই গুণটীকে অনেক সময়ে উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া থাকি। কিন্তু আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে, এই স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তাই ইংরেজকে এত বড় করিয়াছে। এই গুণটী জর্ম্মণদিগের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই দুইটী বিষয়ের উল্লেখ করা গেল।

নিম্নে জর্ম্মণদিগের যে বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে, তাহাতে ইংরেজ-জীবনের অনেক আচার ব্যবহারের মূলসূত্র পাওয়া যাইবে। এক্ষণে একটু ঐতিহাসিক মুখবন্ধের অবতারণা করা যাইতেছে।

খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে জর্ম্মণজাতির প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইহাদিগের টিউটনী ও কিম্ব্রী নামক দুই শাখা জর্ম্মণী হইতে বাহির হইয়া রোমে ভয়ঙ্কর ত্রাসের সঞ্চার করে। ১০২ ও ১০১ পূঃ খৃঃ অব্দে মেরায়স্ নামক প্রসিদ্ধ রোমক সেনাপতি ইহাদিগের উচ্ছেদ সাধন করেন। ইহার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে, অরিওভিষ্টাস নামক জর্ম্মণরাজের সহিত, রোমের অদ্বিতীয় পুরুষ জুলীয়স সীজরের যুদ্ধ হয়। এই সময়ে জর্ম্মণদিগের নাম শুনিতেই রোমীয় ভদ্র যুবকদিগের মনে বিভীষিকার সঞ্চার হইত। সীজর স্বয়ং বলিতেছেন ;—"গুপ্তচর ও বণিকগণ আসিয়া প্রচার করিল, জর্ম্মণগণ দৈত্যের ন্যায় বিশাল দেহ ; তাহাদের সাহস অত্যদ্ভুত, সমরনিপুণতা অসাধারণ ; এমন কি তাহাদিগের মুখের দিকে চাহিতেও ভয় হয়। শুনিয়া, সেনানায়কগণ অতিশয় আতঙ্কিত হইল। অনেকে আসিয়া বিশেষ প্রয়োজনচ্ছলে, গৃহে যাইবার জন্য ছুটী চাহিল। যাহারা লজ্জায় যাইতে পারিল না, তাহারাও অন্তরের ভয় কিছুতেই গোপন করিতে পারিল না। এক এক সময়ে অশ্রু-

(ক) ইহা মনুসংহিতার কথা—
পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থাবরে পুত্রান স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি। ৯ম অধ্যায়।

মনুর সময়ে, স্ত্রীজাতি সম্বন্ধিনী ধারণা নীচ ছিল, এবং তাঁহাদের বিষয়ে সামাজিক বিধিও অতিশয় কঠোর ছিল।

ঐ অধ্যায় ১৫ ১৬, ১৭, ৮১ প্রভৃতি শ্লোক দ্রষ্টব্য।

এ স্থলে বলা উচিত, বৈদিক যুগে স্ত্রীলোকের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল।

Dutt's Ancient India, Vol. I., p. 101

সংবরণ করা তাহাদিগের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। নির্জ্জনে, বন্ধুদিগের সহিত মিলিত হইলেই তাহারা আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিত, এবং সম্মুখে বিপদ উপস্থিত দেখিয়া দুঃখ করিত। সকলেই চরম-লিপি প্রস্তুত করিতে লাগিল। এই নবীন সৈনিক পুরুষদিগের বিষম ভয় দেখিয়া অভিজ্ঞ বহুদর্শী সৈন্যগণও ভীত হইয়া পড়িল।" (১)

পাঠক দেখিতেছেন, বর্গীর নাম শুনিলেই আমাদের দেশের শিশুগণ যেরূপ ভয় পাইত, জর্ম্মণদিগের নাম শুনিবামাত্র রোমাণেরা প্রথমে সেইরূপ ত্রাসিত হইত। তাহা হইলেও, এই যুদ্ধে সীজর পূর্ণ জয় লাভ করেন।

এই স্থলে একটী আনুষঙ্গিক কথা বলা যাইতেছে। মোগল সাম্রাজ্যের সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের যে সম্বন্ধ, রোমক সাম্রাজ্যের সহিত জর্ম্মণদিগের সম্বন্ধ অনেকটা তাহার অনুরূপ। সকলেই জানেন মোগল সম্রাটগণ মরাঠা-দিগকে জয় করিবার জন্য অনেক অর্থ ও সেনা ধ্বংস করেন; এবং অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হন; কিন্তু অবশেষে এই মরাঠারাই মোগলসাম্রাজ্যকে বিধ্বস্ত করিয়া তদুপরি আপনাদিগের রাজ্য স্থাপন করে। রোমক সম্রাটগণও জর্ম্মণী জয় করিবার জন্য বহুবার চেষ্টা করেন। অবশেষে রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর ৯৬২ খৃঃ অব্দে জর্ম্মণসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮০৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই সাম্রাজ্য, পবিত্র রোমক সাম্রাজ্য (The Holy Roman Empire) (২) নামে বিদ্যমান ছিল। এই সালে নেপোলিয়নের দৌরাত্ম্যে উহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

জুলিয়স্ সীজরের পর তাঁহার উত্তরাধিকারী, প্রথম রোমক সম্রাট্, অগষ্টস্ সীজর, জর্ম্মণদিগকে বশীভূত করিবার জন্য অনেকবার সৈন্য প্রেরণ করেন। টাই-বেরিয়াস ড্রসাস, জারমানিকাস্, কিয়ৎপরিমাণে কৃত-কার্য্যও হইয়াছিলেন। ড্রসাসের সাময়িক কৃতকার্য্যতায় রোমাণেরা অত্যন্ত উল্লসিত হইয়াছিল। (৩) ইহার পর, ৬ খৃঃ অব্দে, ভেরাস্ জর্ম্মণী জয় করিতে প্রেরিত হন। তাঁহার সমস্ত সৈন্য জর্ম্মণদিগের হস্তে নিহত হয়, তিনি মনোবেদনায় আত্মহত্যা করেন।

রোমকগণ, সমগ্র জর্ম্মণী জয় করিতে অসমর্থ হইলেও নানারূপে জর্ম্মণীতে প্রভূত প্রভুত্ব লাভ করে; এবং ধীরে ধীরে রোমক সভ্যতা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জর্ম্মণদিগের জীবনকে বহু পরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলে। আর একটী কথা বলিয়া এই উপক্রমণিকার উপসংহার করিতেছি। ট্যাসিটস্ ভিন্ন অপর কোনও প্রাচীন লেখক জর্ম্মণজাতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। (৪) এই সুবিখ্যাত রোমক-ইতিহাস-লেখক খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। ঘটনার কারণ নির্ণয়ে, এবং মানব চরিত্র বিশ্লেষণে, ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত কেহই ইঁহাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। ইঁহার "জার্ম্মা-ণীয়া" নামক পুস্তক অবলম্বন করিয়া প্রাচীন জর্ম্মণ-জাতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ সঙ্কলিত হইল। এই বিবরণ হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে জর্ম্মণগণ অপেক্ষাকৃত বর্ব্বর জীবন যাপন করিত। ভারত-বর্ষে তখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রভাব। আমাদিগের পূর্ণ গৌরবের যুগে যাহারা অসভ্য অবস্থায় দিন কাটাইত, তাহাদিগের সন্তানগণ এক্ষণে আমাদের প্রভু ও শিক্ষক! সামাজিক রীতি, নীতির বিভিন্নতা এই অবস্থা পার্থক্যের কারণ কি না, ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

জর্ম্মণী। (Germania.)

১। পশ্চিমে রাইন নদী, দক্ষিণে ডানিয়ুব, পূর্ব্বে কার্পেথিয়ান্ পর্ব্বত শ্রেণী এবং উত্তরে জর্ম্মণ মহাসাগর ও বাল্টিকসাগর, এই চতুঃসীমান্তর্ব্বর্ত্তী ভূভাগের নাম জর্ম্মণী (৫)

২। বোধ হয়, জর্ম্মণগণ এই দেশের আদিম অধি-বাসী, এবং ইহারা অন্যান্য জাতির সহিত অতি অল্পই মিশ্রিত হইয়াছে। কারণ, অর্ণবপোত সহায়ে সীমাহীন

(১) Cæsar, De Bello Gallico I. 39

(২) The Holy Roman Empire অনেকটা German Silverএর মত। ভলটেয়ার বলেন, "It was neither holy, nor Roman"—(quoted by Dyer, History of Modern Europe.)

(৩) Vide Horace, Odes IV, 4.

(৪) জুলীয়স্ সীজর স্বীয় যুদ্ধ কাহিনীতে জর্ম্মণদিগের বিষয়ে স্থানে স্থানে মূল্যবান তত্ত্ব প্রদান করিয়াছেন, আবশ্যক মত তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে।

(৫) রোমানগণ, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন এবং বাল্টিকসাগরের দ্বীপ পুঞ্জকেও জর্ম্মণীর মধ্যে ধরিত।

মহাসমুদ্র (৬) অতিক্রম না করিলে এদেশে যাইবার উপায় নাই। আর উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল, অপরিজ্ঞাত সমুদ্রে যে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহার কথা ছাড়িয়া দিলেও, কেই বা এসিয়া, আফ্রিকা বা ইটালী পরিত্যাগ করিয়া জর্ম্মনীতে যাইতে চাহিবে? আদি নিবাস ভূমি (Patria) না হইলে, কেই বা বনাকীর্ণ, কুদর্শন, কুজ্ঝটিকাবৃত দেশে, নিরানন্দ আকাশতলে দুঃখের জীবনযাপন করিতে যাইবে!

জর্ম্মণগণের পুরাগত সঙ্গীতে বর্ণিত হইয়াছে, ইহারা সকলে, মেদিনী হইতে উদ্ভূত তুইস্তো (Tuisto) দেব ও তৎপুত্র মনুর (Mannus) (৭) সন্তান, এবং তাহারা ইঁহাদের ব্যবস্থা প্রণেতা। মনুর তিন পুত্র হইতে বিভিন্ন জর্ম্মণ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। "জর্ম্মণ" (৮) নামটী আধুনিক; ইহা প্রথমে একটী শাখার নাম ছিল, ক্রমে সমস্ত জাতি এই নাম গ্রহণ করিয়াছে।

৩। শুনা যায়, হারকিউলিস এদেশে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। জর্ম্মণগণ যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে এই বীরাগ্রগণ্য মহাপুরুষের বিষয়ক সঙ্গীত গান করে। ইহাদিগের মধ্যে আর একটী প্রথা আছে। সমরে যাইবার সময় সৈন্যগণ, সাহস উদ্দীপনের জন্য, সমস্বরে সঙ্গীত করে, এবং ধ্বনির ক্রমানুসারে যুদ্ধের ফলাফল নির্ণয় করে। ইহারা মনে করে, উদ্দীপনাপূর্ণ মহারব উত্থিত হইলে জয় নিশ্চিত। এজন্য, বিকট উচ্চধ্বনি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে, মুখে ঢাল লাগাইয়া মহা কলরব সহকারে রণক্ষেত্রে ধাবিত হয়। (৯) এ গুলিকে সঙ্গীত না বলিয়া বীরত্বোদ্দীপক কোলাহল বলিলেই ঠিক হয়।

কেহ কেহ বলেন, প্রসিদ্ধ গ্রীক বীর ইয়ুলিসিস্ তাঁহার দীর্ঘকাল ব্যাপী ভ্রমণ সময়ে একবার জর্ম্মণীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন; কিন্তু এবিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না।

৪। বস্তুতঃ জর্ম্মণগণ একটী বিশুদ্ধ, মৌলিক জাতি; অপর জাতির সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধে মিলিত হয় নাই। এজন্যই এই বহু বিস্তৃত জাতির মধ্যে সকলেরই অবয়ব ও গঠন প্রণালী একরূপ। ইহাদের চক্ষু নীলবর্ণ, দৃষ্টি কঠোর ও ভয়োৎপাদক, কেশ লোহিতাভ, দেহ বিশাল, সবল, যুদ্ধপটু; কিন্তু কষ্টসহিষ্ণু নহে। ইহারা উত্তাপ ও পিপাসা মোটেই সহ্য করিতে পারে না, কিন্তু শীত ও ক্ষুধা সহিতে বিশেষরূপে অভ্যস্ত।

৫। জর্ম্মণীর অধিকাংশই জঙ্গলাকীর্ণ, অথবা জলমগ্ন, সুতরাং অন্যান্য দেশ অপেক্ষা আর্দ্র। এদেশের ভূমি যথেষ্ট উর্ব্বরা, কিন্তু ফলবান তরুর সংখ্যা অল্প। গো, অশ্ব প্রচুর; তবে অশ্বগুলি অপেক্ষাকৃত খর্ব্বকায়; গাভীগুলিও সুদৃশ্য শৃঙ্গবিশিষ্ট নহে। কিন্তু এইগুলিই জর্ম্মণগণের ধন। কারণ বলিতে পারি না, দেবতাগণ সদয় অথবা নির্দ্দয় হইয়া এই দেশকে রৌপ্য ও সুবর্ণে বঞ্চিত করিয়াছেন। এমত বলিতেছি না যে, এই দুই ধাতু এদেশে মোটেই উৎপন্ন হয় না; হইলেও, জর্ম্মণগণ উহাদের সঞ্চয় অথবা ব্যবহারে বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করে না। তবে কখনও কখনও রৌপ্যপাত্র এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। (মনে রাখিতে হইবে, ইহা রোমানদিগের সহিত বাণিজ্যের ফল।)

৬। জর্ম্মণদিগের অস্ত্র শস্ত্র হইতে সহজেই অনুমিত হইতে পারে, জর্ম্মণীতে লৌহও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। অল্পলোকেই তরবারী ব্যবহার করে; অধিকাংশের অস্ত্র শেল (lancea)। অনেকে তীক্ষ্ণাগ্র, লৌহমুখ বর্ষা ব্যবহার করে, এবং ইহার সাহায্যে দূর হইতে অথবা নিকটে, যেরূপ ইচ্ছা, যুদ্ধ করিতে পারে। অশ্বারোহীগণ ঢাল ও শেলেই সন্তুষ্ট। পদাতিকগণ অনা-বৃত দেহে, অথবা সামান্য পরিচ্ছদে দেহ আবৃত করিয়া, যুদ্ধে গমন করে ও বহুদূর হইতে অস্ত্র নিক্ষেপ করে। যুদ্ধ সজ্জার জন্য কাহারও আগ্রহ নাই; কেবল ঢালগুলি অভিমত রঙ্গে রঞ্জিত হয়। অত্যল্প সংখ্যক যোদ্ধা বর্ম্ম পরিধান করে; ক্বচিৎ দুই এক জনের শিরস্ত্রাণ আছে। অশ্বগুলি সুগঠন, বেগবান কিংবা সুশিক্ষিত নহে। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে পদাতিকগণই জর্ম্মণদিগের প্রধান বল। ইহারা এত দ্রুত গমনপটু যে অশ্বারোহীগণের

(৬) উত্তর মহাসাগর (The North Sea)

(৭) পাঠক দেখিতেছেন, ইহার মধ্যে আমাদের মনুর স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে।

(৮) পণ্ডিতগণের মতে 'জর্ম্মণ' অর্থ নিনাদকারী (One who shouts) Church & Brodribb's Germania.

(৯) গ্রীকগণও সমরে প্রবৃত্ত হইবার সময় রণদেবতার উদ্দেশ্যে সঙ্গীত করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে ধাবমান হইত। গ্রীকভাষায় এই সঙ্গীতের নাম পীয়ান (pæan)—Xenophon, Anabasis, I.

সহিত মিলিত হইয়া অনায়াসে যুদ্ধ করে (১০)। সমস্ত যুবকদিগের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া এই শ্রেণীর সৈন্য সংগৃহীত হয়। পুনরায় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার উদ্দেশ্যে, কিয়ৎকালের জন্য পশ্চাৎপদ হওয়া, জর্ম্মণদিগের মতে ভীরুতার লক্ষণ নয়; বরং ইহাতে বুদ্ধিমত্তা ও কৌশল প্রকাশ পায়। ইহারা জয় অনিশ্চিত হইলে, স্বপক্ষীয় হতব্যক্তিগণের দেহ লইয়া প্রস্থান করে। ঢাল ফেলিয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়নের মত নিন্দনীয় কর্ম্ম আর নাই। এরূপ কলঙ্কিতজনের, পূজাস্থলে অথবা স্বজনসভায় উপস্থিত হইবার অধিকার নাই। অনেকে যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আত্মহত্যা করিয়া স্বীয় দুষ্কৃতির পরিসমাপ্তি করে।

৭। ইহারা বংশ-মর্য্যাদা অনুসারে রাজা মনোনয়ন করে, এবং যিনি বীরত্বে শ্রেষ্ঠ তাঁহাকে সেনাপতি পদে বরণ করে। রাজা যথেচ্ছাচারী নহেন, কারণ তাঁহার ক্ষমতা অসীম নয়। সেনাপতি পদগৌরবের দ্বারা শাসন করিতে পারেন না। সমরে নিপুণ, বিপদে অগ্রগণ্য, সম্মুখ যুদ্ধে সর্ব্বাগ্রগামী—এরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ না করিলে তাঁহার শাসন দণ্ড অকিঞ্চিৎকর বলিয়া গণ্য হয়। সেনাপতি কাহাকেও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন না; শৃঙ্খলাবদ্ধ বা প্রহার করিবার ক্ষমতাও তাঁহার নাই। কেবল পুরোহিতগণের এই সকল দণ্ড দিবার অধিকার আছে। তাহার কারণ এই যে, জর্ম্মণগণ মনে করে, দেবতাগণ যুদ্ধে উপস্থিত থাকেন, সুতরাং ধর্ম্মাচার্য্যগণ দণ্ড দিলে তাহাতে বাস্তবিক সেনাপতির না হইয়া, দেবতাদিগের আদেশ পালন করা হইল। ইহারা নানারূপ দেবমূর্ত্তি (অর্থাৎ ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতির প্রতিরূপ) লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করে; শান্তির সময়ে এই সকল মূর্ত্তি বনে ঝুলাইয়া রাখে। ইহাদিগের মধ্যে সাহস উদ্দীপনের এই এক সঙ্কেত দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহারা জ্ঞাতি, কুটুম্ব লইয়া এক এক দল গঠন করে, বিভিন্ন বংশের লোক এক দলে যুদ্ধ করে না; আর যুদ্ধের সময় স্ত্রী পুত্রদিগকে এত নিকটে স্থাপন করে যে, যুদ্ধ করিতে করিতে তাহাদিগের কলনাদ ও ক্রন্দন ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। রমণীগণের উৎসাহসূচক ধ্বনি ইহাদিগের বীরত্বের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন ও অতুলনীয় যশোগাথা। ইহারা আহত হইয়া মাতা ও ভার্য্যাসমীপে গমন করে। তাঁহারাও, আহত স্থানের গণনায় বা পরীক্ষায় ভীত না হইয়া, আহার্য্য দানে ও উদ্দীপনা পূর্ণ বাক্যে উৎসাহিত করিয়া রণোন্মত্ত প্রিয়জনকে সংগ্রামে প্রেরণ করেন।

৮। কথিত আছে, একবার কোনও যুদ্ধে জর্ম্মণ সেনানী ভগ্নোদ্যম হইয়া পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিবার উপক্রম করিল। তখন রমণীগণ তাহাদিগকে পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার জন্য অবিচলিত ধৈর্য্যের সহিত মিনতি করিতে লাগিলেন; পরাজয়ে দাসত্ব নিশ্চিত ও আসন্ন, এই বলিয়া তাহাদিগের ক্ষীণ প্রাণে অমিত তেজ সঞ্চারিত করিলেন; অবশেষে তাঁহারা যখন বক্ষ উন্মুক্ত করিয়া, বিপক্ষীয়দিগের সম্মুখীন হইলেন, তখন জর্ম্মণগণ জননী, পত্নী ও ভগিনীদিগকে মৃত্যুমুখে দৃক্পাতশূন্য দেখিয়া, অজেয় বিক্রমে শক্র সৈন্যের উপর পতিত হইল। (১১) এই গুণেই ইহারা রমণীদিগকে এত সম্মান করে, ও তাঁহাদিগের অতি সামান্য অমর্য্যাদাও অসহনীয় মনে করে। স্ত্রীজাতির প্রতি ইহাদিগের শ্রদ্ধা এত অধিক যে, কোনও রাজ্যের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইলে যদি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া বালিকাদিগকে প্রতিভূ স্বরূপ দিতে হয়, তবে প্রাণান্তেও সেই সন্ধি ভঙ্গ করে না। ইহারা বিশ্বাস করে, রমণীদিগের মধ্যে দেবত্ব বিশেষভাবে বিদ্যমান, তাঁহারা দৈব দৃষ্টি সম্পন্না। স্বর্গীয় ভেস্পেসিয়ানসের রাজত্ব সময়ে বেলেদা নামক রমণীকে অনেকে দেবীর ন্যায়

(১০) জুলীয়স সীজর বলেন ঃ—"জর্ম্মণদিগের যুদ্ধপ্রণালী এইরূপ। ইহাদিগের যে ৬ সহস্র অশ্বারোহী আছে, তাহাদিগের সঙ্গী ও সহায় স্বরূপ আবার অতি দ্রুতপদ ও সাহসী ৬ সহস্র পদাতিক রহিয়াছে। এই সেনাদলের প্রত্যেকে এক এক জন অশ্বারোহী কর্ত্তৃক সমস্ত সৈন্যদিগের মধ্য হইতে বিশেষ ভাবে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। ইহারা অশ্বারোহীদিগের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করে, কোনও দুরূহ কার্য্য উপস্থিত হইলে তৎসম্পাদনের জন্য ধাবিত হয়, কেহ গুরুতররূপে আহত হইয়া অশ্ব হইতে পতিত হইলে, তাহাকে আবেষ্টন করিয়া শক্র হস্ত হইতে রক্ষা করে। ইহারা পদদ্বয়ের ব্যবহারে এরূপ দক্ষ যে দূরতর স্থানে ত্বরায় উপস্থিত হইবার প্রয়োজন হইলে, ঘোটকেরস্কন্ধস্থ কেশ অবলম্বন করিয়া অশ্বারোহীদিগের সহিত সমবেগে ধাবমান হয়।

—De Bello Gallico I. 48.

(১১) সীজর এবং প্লুটার্ক বারংবার জর্ম্মণ রমণীগণের বীরত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। প্লুটার্ক স্বপ্রণীত মেরায়সের জীবন চরিতে লিখিয়াছেন, একোএসেক্স্টের প্রসিদ্ধ যুদ্ধে জর্ম্মণ নারীগণ তরবারি ও কুঠার লইয়া, অতুলশৌর্য্যে শক্রদিগকে দলিত করিয়া, তাহাদিগকে প্রাণ ভয়ে পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

Quoted by Church and Brodribb.

সম্মান করিত; আমরা ইহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তদ্ভিন্ন অলক্রুণা প্রভৃতি অনেক নারী দেবপূজা প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছেন।

রমণীগণের মন্ত্রণা বিশেষ সম্মানের সহিত গৃহীত হয়। ভবিতব্য বিষয়ক প্রশ্ন করিলে, তাঁহারা যে উত্তর দেন তাহা কখনও অবহেলিত হয় না।

৯। ইহারা নানা দেব দেবীর পূজা করে, ও তাঁহাদিগকে অনেক প্রকার পশুবলি দিয়া থাকে; কখনও কখনও নরবলির কথাও শুনা যায়। কিন্তু ইহারা দেবমন্দির নির্ম্মাণ করে না, কিংবা মানুষের প্রতিরূপ কোনও দেবমূর্ত্তি প্রস্তুত করে না; কারণ ইহারা মনে করে, প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া মন্দিরে রক্ষা করিলে দেবতাদিগের মহত্ব খর্ব্ব হয়। তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে নানা স্থানে বন ও উদ্যান উৎসর্গীকৃত হইয়াছে; এক একটী বন তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

১০। ভবিষ্যৎ ঘটনা নির্ণয়ের দুই প্রকার প্রণালী প্রচলিত আছে—পশু পক্ষীর রব ও লটারী। (১২) শেষোক্ত প্রণালী অতি সহজ। প্রথমতঃ কোনও ফলবান্ বৃক্ষের শাখা কাটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া চিহ্নিত করা হয়; তার পর সে গুলি একখানি সাদা কাপড়ের উপর যথেচ্ছ ছড়াইয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। রাজ্য সম্বন্ধীয় বিষয় হইলে রাজপুরোহিত, ব্যক্তিগত বিষয় হইলে গৃহস্বামী দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিয়া, আকাশের দিকে চাহিয়া, ঐ টুকরাগুলির এক একটী তিনবার তুলিয়া লন, এবং ঐ চিহ্নগুলি দেখিয়া ফলাফল নিরূপণ করেন। যদি এরূপ হয় যে, যে কার্য্যের উদ্দেশ্যে গণনা করা হইল, গণিত ফল তাহার অনুকূল নহে, তবে সে দিন আর গণনা করা হয় না; অনুকূল হইলে, এই ফল আবার পশুপক্ষ্যাদির রব দ্বারা পরীক্ষা করিতে হয়। রোমাণদিগের ন্যায় জর্ম্মাণগণের মধ্যেও পক্ষীর রব ও উড্ডয়ন হইতে ফলাফল নির্ণয়ের প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। ঘোটকের রব হইতে ভবিষ্যৎ গণনা বিশেষরূপে প্রচলিত। এই উদ্দেশ্যে দেবোপবনে, ধবলবর্ণ ঘোটকগুলি রাজকীয় ব্যয়ে রক্ষিত হয়, তাহাদিগকে কোনও হীন কার্য্যে কলঙ্কিত হইতে দেওয়া হয় না। এই অশ্বগুলিকে পবিত্র যানে যোজিত করিয়া, পুরোহিত বা রাজা অথবা রাজ্যের প্রধান ব্যক্তি চালনা করেন, এবং ইহাদিগের হ্রেষাধ্বনি শুনিয়া শুভাশুভ নির্ণয় করিয়া থাকেন। এই প্রথায় রাজা ও পুরোহিত হইতে আপামর সাধারণ সকলের যেরূপ অবস্থা আছে, সেরূপ আর কোনটীতেই নহে; ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র; কারণ পুরোহিতগণ দেবতাদিগের দাস মাত্র; কেবল ঘোটকেরাই তাঁহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারে। যুদ্ধে জয় পরাজয় নিরূপণের আর একটী প্রথা আছে। যে জাতির সহিত যুদ্ধ উপস্থিত, তাহাদিগের কাহাকেও যেরূপে হউক বন্দী করিয়া আনিয়া স্বপক্ষীয় এক ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে দেওয়া হয়। উভয়কেই স্বদেশীয় অস্ত্র ব্যবহার করিতে হয়। বন্দী হত হইলে জয়, অপর ব্যক্তি হত হইলে পরাজয়, এইরূপ ফল নির্ণীত হয়।

১১। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে রাজ্যের প্রধানগণ মন্ত্রণা করেন; গুরুতর বিষয়ে সমগ্র জনমণ্ডলী আলোচনা করিয়া থাকে। কিন্তু প্রজা সাধারণের আলোচিত বিষয়গুলিও অভিজাতবর্গ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করেন। বিশেষ প্রতিবন্ধক বা আকস্মিক বিপদ উপস্থিত না হইলে, প্রতি পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় সকলে মিলিত হইয়া থাকে। আলোচনার জন্য এতদপেক্ষা শুভ সময় আর নাই। জর্ম্মণগণ দিন গণনা না করিয়া রাত্রি গণনা করিয়া থাকে। মন্ত্রণার জন্য রাত্রি নির্দ্ধারিত হয়। কারণ ইহাদিগের মতে আগে রাত্রি তার পর দিন। এই জাতির মধ্যে স্বাধীনতার অপব্যবহার বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। সকলে এক সময়ে নিরূপিত দিনে উপস্থিত হয় না; কখনও কখনও দীর্ঘসূত্রী ব্যক্তিগণের দোষে, দুই তিন দিন বৃথা কাটিয়া যায়। ইচ্ছানুরূপ উপস্থিত হইয়া সকলে অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উপবেশন করে। পুরোহিতগণের আদেশে সভাস্থল নিস্তব্ধ হইলে, রাজা কিংবা অভিজাতবর্গ, বয়স, কুলমর্য্যাদা, রণপ্রতিষ্ঠা অথবা বাগ্মীতার ক্রমানুসারে বক্তৃতা করেন। বাগর্থ প্রতিপত্তি থাকিলে অবহিত হইয়া সকলে শ্রবণ করে; তদভাবে, শাসনদণ্ড সহায়ে মনোযোগ আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। অভিব্যক্ত বিষয় অপ্রীতিকর হইলে চতুর্দ্দিকে মহাকোলাহল উত্থিত হয়, অভিমত হইলে সকলে মহোৎসাহে বর্ষা

(১২) Vide Cæsar, De Bello Gallico I, 50, 53

সঞ্চালন করে। অস্ত্র সঞ্চালন করিয়া যে সম্মতি প্রদত্ত হয়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানজনক।

১২। এই সকল সভায় অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের, বিশেষতঃ প্রাণদণ্ডার্হ অপরাধীদিগের বিচার হয়। অপরাধানুসারে ভিন্ন ভিন্ন দণ্ডের বিধি আছে। বিশ্বাস-ঘাতক ও পলাতক লোকদিগকে গাছে ফাঁসি দেওয়া হয়। কাপুরুষ, রণে পরাঙ্মুখ ও পৈশাচিক দুষ্কর্ম্মান্বিত অপ-রাধীর দণ্ড, কর্দ্দমাক্ত জলে ডুবাইয়া হত্যা। দণ্ড প্রদানের সময় লক্ষ্য রাখা হয়, যাহাতে সামাজিক অপরাধ প্রকাশ্যে দণ্ডিত হয়, জঘন্য নারকীর দুষ্ক্রিয়া গুপ্ত থাকে। লঘু অপরাধের দণ্ডও লঘু। এই শ্রেণীর অপরাধের সাজা গরু ও ঘোড়া জরিমানা। জরিমানার এক অংশ রাজার প্রাপ্য, অপর অংশ অভিযোক্তা বা তাহার উত্তরাধিকারীর। এই সভায় বিচারক মনোনীত হয়। এক একজন বিচারক এক এক বিভাগে (Canton) বিচার করে; মন্ত্রণা দিয়া ও অন্যান্য রূপে সাহায্য করিবার জন্য প্রত্যেকের সহিত এক শত জন গ্রামবাসী নির্ব্বাচিত হয়। (১৩)

১৩। কি রাষ্ট্র সম্বন্ধীয়, কি ব্যক্তিগত, জর্ম্মণগণ অস্ত্রে সজ্জিত না হইয়া কোন বিষয়েই আলোচনা করে না। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই কেহ অস্ত্র গ্রহণ করিতে পারে না; অস্ত্রধারণের শক্তি বিশেষরূপে পরীক্ষিত হইলে তবে এই অধিকার প্রদত্ত হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে অস্ত্রগ্রহণার্থীকে, সমবেতজনমণ্ডলীর সমক্ষে তাহার পিতা, অথবা কুটুম্ব, অথবা কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ঢাল ও বর্ষায় ভূষিত করেন। ইহাই তাহার দীক্ষা। এখন তাহার দ্বিজত্ব প্রাপ্তি হইল; কারণ, দীক্ষার পূর্ব্বে রাষ্ট্র সম্বন্ধে সে অস্তিত্বশূন্য ছিল। দীক্ষিত যুবক কোনও খ্যাতিমান্ বীর পুরুষের অনুগামী হইয়া রণনৈপুণ্য শিক্ষা করে। যে বীরের অনুগামী সংখ্যা যত অধিক, তাঁহার তত সম্মান। অনুগামিগণ সংগ্রামে সহায়, শান্তিতে ভূষণস্বরূপ। এইরূপ বহুযুবজনবেষ্টিত ব্যক্তিগণ শুধু স্বদেশে নয়, বিদেশেও প্রতিষ্ঠা ও গৌরব লাভ করিয়া থাকেন। সন্ধির অভিলাষী হইয়া বৈদেশিক রাজদূত ইঁহাদিগকেই মহার্ঘ উপহার প্রদানে তুষ্ট করিতে চায়; যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ইঁহাদিগেরই অভিমত অনুসারে কর্ত্তব্য অবধারিত হয়।

১৪। সামন্তগণ জয় লাভের জন্য যুদ্ধ করে; অনু-গামিগণ যুদ্ধ করে সামন্তের জন্য। পরাজিত হইলে নেতার অগৌরব, বীরত্বে নেতা অপেক্ষা হীন হইলে অনুগামীর অগৌরব। স্বদেশে দীর্ঘকাল যুদ্ধ উপস্থিত না হইলে এই যুবকগণ বিদেশে যুদ্ধ করিতে যায়, কারণ ইহারা বিশ্রাম ভালবাসে না, বিপদেই ইহাদিগের আনন্দ। আর যুদ্ধ ও লুণ্ঠন ভিন্ন বহু সংখ্যক যুবকগণকে পোষণ করিবার আর উপায়ও নাই। বেতনের পরিবর্ত্তে সামন্তগণ ইহাদিগকে আহার প্রদান করেন। ইহারা যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত হইতে খুব প্রস্তুত, কিন্তু কৃষি-কার্য্যে নিতান্ত বিমুখ। ইহাদিগের মতে, রক্তপাত করিয়া যাহা লাভ করা যায়, তাহার জন্য ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে পরিশ্রম করা ভীরু ও অলসের কর্ম্ম।

১৫। যুদ্ধ উপস্থিত না থাকিলে অনেকে শিকার করিতে বাহির হয়; কিন্তু অধিকাংশই খাইয়া, ঘুমাইয়া নিতান্ত অলসভাবে সময় যাপন করে। এমন কি, অতি-শয় সাহসী ও রণপ্রিয় ব্যক্তিরাও নিষ্কর্ম্মা হইয়া দেবারাধনা অবধি গৃহের ও ক্ষেত্রের সমস্ত কার্য্য স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল লোকদিগের হস্তে ছাড়িয়া দেয়; আপনারা কেবল আরাম করিয়া বেড়ায়। ইহাদিগের প্রকৃতিতে আর এক আশ্চর্য্য বিসংবাদী ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, একাধারে অলসতা, ও শান্তির প্রতি ঘৃণা বিদ্যমান। প্রতিবেশী রাজ্য হইতে অশ্ব, বর্ম্ম, অস্ত্র উপহার পাইলে ইহারা অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়। রোমাণগণ ইহাদিগকে অর্থ লইতেও শিখাইয়াছে।

১৬। জর্ম্মণীতে ইটালী ও গ্রীসের ন্যায় জনাকীর্ণ নগর নাই, কারণ এ দেশের লোকেরা মিলিয়া মিশিয়া বাস করিতে পারে না। ইহারা, পরস্পর হইতে দূরে বিচ্ছিন্নভাবে, (১৪) মাঠ অথবা বৃক্ষরাজির মধ্যে, কিংবা নির্ঝরিণীর নিকটে স্বীয় অভিরুচি অনুসারে বাস করে।(১৫)

(১৩) পাঠক এই বিচার প্রণালীর সহিত প্রাচীন ভারতের বিচার প্রণালীর তুলনা করিতে পারেন।

(১৪) "A mark of their love of liberty and independence"—Church and Brodribb.

(১৫) আধুনিক জর্ম্মণ নগরগুলির শেষাংশ এই উৎপত্তির পরিচয় দেয়। যথা, Rosbach (bach=brook), Elberfeld (Feld =field), Paderborn (born=spring), Suckenwald (wald=wood).

ইহাদিগের গ্রামগুলি, পরস্পর নিকটবর্ত্তী ও সংশ্লিষ্ট হর্ম্ম্য-সমূহে সুশোভিত নয়। প্রত্যেকে, চতুষ্পার্শ্বে বিস্তৃত স্থান রাখিয়া আপনার আবাস স্থান নির্ম্মাণ করে। বোধ হয়, অগ্নিভয়, অথবা গৃহনির্ম্মাণে অনভিজ্ঞতা এরূপ করিবার কারণ। ইহারা ইট অথবা পাথরের গৃহ নির্ম্মাণ করিতে জানে না; সকলেই কদাকার, সৌষ্ঠব বিহীন কাষ্ঠের গৃহে বাস করে। ভিতরের দেয়াল এরূপ উজ্জ্বল বিশুদ্ধ মৃত্তিকাদ্বারা লেপন করে যে, দেখিলে বোধ হয় যেন রং করা হইয়াছে। কোন কোন প্রদেশের লোকেরা পর্ব্বত গুহায় বাসগৃহ প্রস্তুত করে। ইহাতে শীতের ক্লেশ অনেক লঘু হয়, এবং শত্রুভয় হইতেও সহজে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।)

নাতু ভ্রাতৃদ্বয়ের কারামুক্তি।

লক্ষ্ণৌ কন্‌গ্রেসে সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় যখন নাতু ভ্রাতৃদ্বয়ের মুক্তি সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সে কথা সভায় প্রকাশ করেন, তখন সমবেত সভ্য মণ্ডলী বার বার আনন্দ ধ্বনি করিয়া এই সুসংবাদে অত্যন্ত প্রীতি প্রকাশ করেন। সেই আনন্দ ধ্বনি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হয়। সংবাদপত্রাদিতেও এ বিষয়ে বহুতর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পার্লামেণ্টেও আন্দোলন হইবার কথা, কিন্তু বুয়র যুদ্ধ বাধিয়া সে সভায় অন্য কথায় এ সময় কেহ কর্ণপাত করে না। এ দেশেও কিছু দিন পরে হয় ত নাতুদিগের কথা আমরা বিস্মৃত হইব, কিন্তু বিস্মৃত হইবার পূর্ব্বে ভ্রাতৃদ্বয়ের কারামুক্তির প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা উচিত।

নাতুরা যে সময় অবরুদ্ধ হন, সে সময় বোম্বাই প্রদেশে, বিশেষ পুনায়, একটা ভারি হুলস্থূল পড়িয়াছে। গবর্মেণ্ট মনে করিতেছেন যে, সিপাহী-বিদ্রোহের দিন আবার বুঝি ফিরিয়া আসিল। পার্লামেণ্টে ভারতসচিব প্রকাশ্যে এ কথা বলিয়াছিলেন। আশঙ্কাটা হয়ত সিপাহী বিদ্রোহের অপেক্ষা অধিক, কেন না তখন কেবল সিপাহীগুলা ক্ষেপিয়াছিল, এ সময় বোম্বাই গবর্মেণ্ট বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছিলেন যে মহারাষ্ট্র প্রদেশে ব্রাহ্মণদিগের ভিতর একটা ভয়ানক চক্রান্ত চলিতেছে—উদ্দেশ্য ইংরাজের রাজা উচ্ছেদ করিয়া আবার বর্গীর রাজ্য স্থাপিত হইবে, পেশওয়েদিগের আবার অভ্যুদয় হইবে, মরাঠা বীর্য্য আর একবার ভারতবর্ষে কীর্ত্তিপতাকা তুলিবে। যখন জুবিলী রাত্রে দুই জন ইংরাজ নিহত হইলেন, তখন ত আর কোন সংশয়ই রহিল না। এই রকম করিয়াই ত রাজ-দ্রোহ আরম্ভ হয়। যাহারা এই সকল কর্ম্মে লিপ্ত ছিল, তাহাদের গুপ্ত মন্ত্রণা জানিবার জন্য গবর্মেণ্ট অনেক চর ও দূত—ভগ্ন ও অভগ্ন—লাগাইলেন। সন্ধানে জানা গেল যে রাজদ্রোহের প্রধান প্রচারক এক জন পরিচিত ও প্রখ্যাতনামা ব্রাহ্মণ—বাল গঙ্গাধর তিলক। তিলক গবর্ণরের সভার সদস্য, বিশ্ব বিদ্যালয়ের সভ্য, পণ্ডিত, কিন্তু এত দিন গবর্মেণ্ট তিলককে চিনিতে পারেন নাই। এই শান্ত প্রকৃতি ব্রাহ্মণ অত্যন্ত গোপনে, অর্থাৎ প্রকাশ্য বক্তৃ-তায় এবং বহু প্রচলিত সংবাদপত্রে, রাজদ্রোহ প্রচার করিতেছিলেন। বিদ্রোহের সূত্রপাত যে এরূপ করিয়া করা যায় এমন ধারণা কিছু নূতন বটে। বরাবরই সকল দেশে এবং সকল লোকের এই জ্ঞান ছিল যে বলবান রাজার বিপক্ষে কিম্বা সেই রাজ্যের বিনাশের জন্য মন্ত্রণা করিলে গোপনে করিতে হয়, কারণ তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িলে নিষ্ফল হইবার সম্ভাবনা এবং মন্ত্রণাকারীদিগের বিশেষ বিপদ। বহু লোকের সমক্ষে বক্তৃতা করিয়া কিম্বা বহুলোক পঠিত সংবাদপত্রে কিরূপ করিয়া গুপ্ত মন্ত্রণা করা যায় কিম্বা রাজদ্রোহ প্রচার করা যায় তাহা কল্পনা করাও কঠিন, কিন্তু গবর্মেণ্টের তাহাই স্থির বিশ্বাস জন্মিল। তিলক ধৃত হইলেন। বিচারে তাঁহার দেড় বৎসর সপরি-শ্রম কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইল। কিন্তু তাহাতে ফল হইল কি? দেশের লোকে ত তিলককে রাজদ্রোহী বলিয়া স্বীকার করিল না। ঘরে ঘরে তিলকের প্রতিমূর্ত্তি, প্রকাশ্য সভায় কোথাও উপস্থিত হইলে ঘন ঘন করতালি ধ্বনিতে লোকে তাঁহাকে অভিবাদন করে। কারাদণ্ডের পূর্ব্বে তিলক পুনায় এবং মহারাষ্ট্র প্রদেশে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন; আজ বাল গঙ্গাধর তিলক ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সম্মানিত। সেই সময় বোম্বাই গবর্মেণ্টের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে সংবাদপত্রে রাজদ্রোহিতা সংক্রামক রোগ হইয়া পড়িল। কত সংবাদপত্র ধরা পড়িল—কত লোকের শাস্তি হইল। দেশীয় সংবাদপত্র মাত্রেই সশঙ্কিত—কে কখন ধরা পড়ে। অপূর্ব্ব কৌশলের সহিত বোম্বাই গবর্মেণ্ট, হয়ত প্রচ্ছন্ন

পুলিসের এবং পূর্ব্বকথিত ভগ্ন ও অভগ্ন দূতের সহায়তায়, এই সংবাদপত্রে লুক্কায়িত বিদ্রোহিতা ধরিয়া ফেলিলেন। কিন্তু রাণ্ড ও আয়ার্ষ্ট সাহেবের হত্যাকারীরা ত ধরা পড়িল না। সংবাদপত্র লেখকেরা যে এ কর্ম্মও করিয়াছেন তাহা সহসা গবর্মেণ্ট সিদ্ধান্ত করিতে পারিলেন না।

সেই সময়, সেই অতি অশুভ ক্ষণে, সর্দ্দার রামচন্দ্র বলবন্ত রাও নাতু ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধৃত হন। ইঁহাদিগের পারিবারিক ইতিহাস কিঞ্চিৎ কৌতুককর। ইঁহাদিগের পিতামহ পেশ্ওয়ের এক জন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি গোপনে ইংরাজের পক্ষ হইয়া অনেক সন্ধান বলিয়া দেন। তাহার পুরস্কার স্বরূপ গবর্মেণ্ট তাঁহাকে বৃহৎ জায়গীর দান করেন। তাঁহার পৌত্রগণ ইংরাজের নিমক খাইয়া নিমক হালাল হইবার কথা। এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের বিপক্ষে কেহ কোন কথা বলেও নাই। বালা সাহেব অর্থাৎ বলবন্ত রাও সার্ব্বজনিক সভার সভ্য, রাজনৈতিক আন্দোলনে কিছু যোগ দেন—কিছু অর্থ ব্যয় করেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিছু গোঁয়ার, ঘোড়ার সখ্ আছে, এই পর্য্যন্ত। অকস্মাৎ এক দিবস প্রাতঃকালে পুলিস তাঁহাদের বাড়ী ঘেরাও করিয়া দুই ভাইকে গ্রেপ্তার করিল। পুনা সহরে ইঁহারা অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত, ধনী লোক, সহর সুদ্ধ একটা ভারি হই চই পড়িয়া গেল। কি অপরাধে পুলিস ইঁহাদিগকে ধরিল? কি অভিযোগ, কে অভিযোগী? কেহ কিছু বলিতে পারে না। যাঁহারা অভিযুক্ত তাঁহারাও কিছু জানেন না। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ মাজিষ্ট্রেটের ওয়ারেণ্টে তাঁহারা ধৃত হইতেছেন? কোন মাজিষ্ট্রেটের ওয়ারেণ্ট নাই। তবে কাহার আজ্ঞায় পুলিস তাঁহাদের বাড়ী ঘিরিয়া তাঁহাদিগকে ধরিতে আসিয়াছে? ওয়ারেণ্টে গবর্মেণ্টের প্রধান সেক্রেটারীর স্বাক্ষর আছে। তাঁহার কি ওয়ারেণ্ট সই করিবার ক্ষমতা আছে? আছে বই কি! কোন্ আইনের কোন্ ধারায়? কোন আইনের কোন ধারায় নয়, কিন্তু একটা অতি বৃদ্ধ রেগুলেশন আছে তাহাতে গবর্ণমেণ্টের এ ক্ষমতা আছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগের কি অপরাধ? তাহা ওয়ারেণ্টে প্রকাশিত নাই, পুলিসও কিছু জানে না। নাতুদিগের মত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ধরা পড়িলেই একটা গোল হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু এমন করিয়া ধরা পড়িলে সমস্ত দেশ টলমল হইবার ভয়। কি এ রেগুলেশন? বাস্তবিকই কি পুনায় রাজদ্রোহিতা বিদ্রোহিতার এত ভয় যে আইন পুলিসে কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, সৃষ্টিছাড়া একটা কাণ্ড করিতে হইবে? নাতু দুই ভাই দুই ভিন্ন জেলায় কারাগারে সাধারণ বন্দীর মত কয়েদ হইলেন।

লোকের পূর্ব্ব কথা মনে পড়িল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই পুনার মাজিষ্ট্রেটের ওয়ারেণ্টে বোম্বাই নগরে ছদ্মবেশী চার্লস্ ট্রাভর্স্ ক্রফর্ড ধৃত হইয়াছিল। ক্রফর্ড কমিশনর, তাহার এত বড় প্রতাপ যে লোকে তাহাকে গবর্ণরের সমকক্ষ মনে করিত। সেই ক্রফর্ড অপমান ভয়ে ভীত হইয়া, বেশ বদলাইয়া, নাম বদলাইয়া, কৃত্রিম দাড়ী পরিয়া পলায়নের চেষ্টা করে, পুলিস তাহাকে একটা ছোট হোটেল হইতে ধরিয়া লইয়া আইসে। কিন্তু সে ওয়ারেণ্ট কোন কাজের নয়। ক্রফর্ড পুনায় নীত হইলে মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে মকদ্দমা তুলিয়া লইয়া গবর্মেণ্ট কমিশন নিযুক্ত করিলেন। লোকে মনে করিল যে নাতুদিগের সম্বন্ধেও বুঝি গবর্মেণ্ট সেই রকম করিবেন। ওয়ারেণ্ট চীফ সেক্রেটরী সহি করুন, বিচার কোন মাজিষ্ট্রেট করিবেন এবং বিচারের ফলানুযায়ী নাতুরা অবরুদ্ধ কিম্বা মুক্ত হইবেন। বিচার যে একেবারেই না হইতে পারে এ কথা হঠাৎ কেহই বিশ্বাস করে নাই, মনেও করে নাই। কিন্তু বাস্তবিক ঘটিল তাই। দেশসুদ্ধ লোকের চীৎকারে গবর্মেণ্ট কর্ণপাত করেন না—সে দুর্ব্বলতা তাঁহাদের কোন কালে নাই। নাতুরা বারবার বিচারের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, সে কথারও গবর্মেণ্ট কোন উত্তর দেন না। পার্লামেণ্টে প্রশ্ন উঠিল, ভারত সচিব ইঙ্গিতে কটাক্ষে বুঝাইলেন যে নাতুদিগের বিরুদ্ধে অতি গুরুতর অভিযোগ, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিবার সময় উপস্থিত হয় নাই। সিপাহী বিদ্রোহের পর এমন ভয়ানক অবস্থা আর কখন হয় নাই। বোম্বাই গবর্মেণ্ট যাহা করিতেছেন তাহার উপর কাহারও কোন কথা কহা উচিত নহে। অনেক দিকে অনেক কথা উঠিতে লাগিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ও তৎপূর্ব্বে ফ্রান্সে যেমন Lettres de Cachet ছিল, আরও পূর্ব্বে ইংলণ্ডে যেমন কথায় কথায় Tower এ ধরিয়া লইয়া যাইত এ দেশেও সেই অবস্থা উপস্থিত হইল বলিয়া অনেক লেখালেখি হইল।

নাতুদিগের কি অপরাধ এ কথা লইয়া অনেক জল্পনা হইতে লাগিল। তাঁহারা খবরের কাগজ লেখেন না, বক্তৃতা করেন না, অতএব রাজদ্রোহ অপরাধে তাঁহারা অপরাধী হইতে পারেন না। হইলে তাঁহাদিগের প্রকাশ্য বিচার হইত। কাজেই লোকে অনুমান করিতে লাগিল যে গবর্মেণ্ট এরূপ সন্ধান পাইয়াছেন যে নাতুরা জুবিলী রাত্রের হত্যার ব্যাপারে কোন প্রকারে লিপ্ত আছেন। সে রহস্য প্রকাশ হইবার জন্য লোকে অপেক্ষা করিতে লাগিল। অনেক দিনের পর চাপেকার ধরা পড়িল। সে বাস্তব অবাস্তব নানা কথা স্বীকার করিল কিন্তু নাতুদিগের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিল না, তাঁহাদিগের সহিত তাহার কোনরূপ সম্বন্ধও প্রমাণিত হইল না। ক্রমে ক্রমে আরও কয়েক জন ধরা পড়িল। তাহাদেরও বিচার ও শাস্তি হইল। নাতুদিগের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তখনও প্রমাণিত হইল না। কিন্তু তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় কারারুদ্ধ রহিলেন। তথাপি সর্দ্দার বালা সাহেব নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। কারাগার হইতেও গবর্মেণ্টে সর্ব্বদা আরজি পাঠাইতেন। কখনও উত্তর পাইতেন কখন কোন উত্তর পাইতেন না। বোম্বাইয়ের Champion পত্রিকায় অনেক কাগজপত্র প্রকাশিত হইল। সে গুলি আবার বিলাতে প্রচারিত হয়। আবার একবার পার্লামেণ্টে খোঁচাখুঁচি হয়। তখনও গবর্মেণ্ট কোন কথা বলেন না, নাতুদিগকেও ছাড়িতে চাহেন না। যদি গবর্মেণ্ট নাতু ভ্রাতৃদ্বয়কে আজীবন কিম্বা দীর্ঘকাল কয়েদ রাখিতে পারিতেন তাহা হইলে তাঁহাদের কোট বজায় থাকিত। ভ্রাতৃদ্বয় অপরাধী কি নিরপরাধী সে বিচারের কোন আবশ্যক ছিল না, কারণ গবর্মেণ্টই সে বিষয়ের বিচারকর্ত্তা এবং তাঁহারাই শাস্তিদাতা। লোকের কথায় তাঁহারা কান দেন না। আমাদের চীৎকারে তাঁহারা কিছুমাত্র বিচলিত হন না। নাতুদিগকে যদি তাঁহারা কখন মুক্ত না করিতেন তাহা হইলে কে তাঁহাদের কি করিতে পারিত? কিন্তু গবর্মেণ্ট তাহা পারিলেন না। প্রথমে দুই ভ্রাতা বেলগ্রামে নীত হইয়া কারামুক্ত হইলেন কিন্তু নজরবন্দ রহিলেন। ডিষ্ট্রীক্ট্ মাজিষ্ট্রেট তাঁহাদিগকে গবর্মেণ্টের হুকুম শুনাইয়া বলিলেন, আপনারা বেলগ্রামে যেখানে ইচ্ছা থাকিতে পারেন কিন্তু আর কোথাও যাইতে পারিবেন না। পরামর্শস্বরূপ বলিলেন যে আপনারা সহরে না থাকিয়া যদি ইংরাজপল্লীতে বাস করেন ত ভাল হয়। বালা সাহেব হুকুমের নকল চাহিলেন। মাজিষ্ট্রেট বলিলেন নকল দিবার অনুমতি নাই। সেই সময় বুঝা গেল যে গবর্মেণ্টের কঠোর পণ কিছু বিচলিত হইয়াছে, তাঁহারা আপনার কোট ঠিক বজায় রাখিতে পারিলেন না। সেই সময় ইচ্ছা করিলে গবর্মেণ্ট নাতুদিগকে একেবারে মুক্তি দিতে পারিতেন, কিন্তু বোধ হয় তাহাতে তাঁহাদের একটু অপমান জ্ঞান হইত। এই জন্য কিছু হাতে রাখিলেন। ভিতরের সংবাদ এই যে বালা সাহেবকে দিয়া দুই চারিটা সর্ত্ত লিখাইবার চেষ্টা হয় কিন্তু তিনি কোন কথা স্বীকার করেন নাই। অবশেষে ডিসেম্বর মাসের শেষে দুই ভাই মুক্তি লাভ করেন। জমিদারী গবর্মেণ্ট ক্রোক করিয়াছিলেন, আবার ফেরত দিলেন। নাতুরা কেন বন্দী হইয়াছিলেন কেহ জানে না, তাঁহারা কেন মুক্ত হইয়াছেন তাহাও কেহ জানে না, তবে এই মাত্র অনুমান করা যায় যে, যে অপরাধের সন্দেহ করিয়া গবর্মেণ্ট তাঁহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তাহা হইলে নাতুরা অন্ততঃ আরও কিছুদিন আটক থাকিতেন। নাতুদিগের মুক্তির প্রকৃত অর্থ এই যে গবর্মেণ্টের এ বিষয়ে হার হইল, আর তাঁহারা নিজেদের ভ্রম স্বীকার করেন নাই বলিয়া আরও বেশী হার হইল।

আজকাল দেশের সর্ব্বত্র একটা বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, গবর্মেণ্ট দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন যে এজিটেশনে আর কখনও কর্ণপাত করিবেন না, আর আইন অনুশাসনগুলাও খুব কড়া রকমের করিবেন। শাসনের একটানা নদীতে এবার জোয়ার আনিবেন। এই যে বিপরীত গতি ইহার রোধ করা অসম্ভব। মিউনিসিপাল বিল ও আইন, সিডিশন আইন, সংবাদ পত্রদিগের বিচার ও শাস্তি, এইগুলিতে কি বুঝাইতেছে? না, গবর্মেণ্ট এইবার হইতে খুব শক্ত রকম শাসন করিবেন এবং কোন কথায় ভ্রূক্ষেপ করিবেন না। মিউনিসিপাল বিল লইয়া যে এত হুলস্থূল হইল, কলিকাতায় পাড়ায় পাড়ায় এজিটেশন হইল, বিলাতে একটা খুব গোল হইল, তাহাতে কি কোন ফল হইল? সেই ত বিল পাস হইয়া গেল, লাভের মধ্যে আমরা গবর্মেণ্টের আরও বিরক্তিভাজন হইলাম। নূতন সিডিশন আইন

বড় কঠোর বলিয়া একটা মস্ত কোলাহল হইল, গবর্মেণ্ট কি তাহা গ্রাহ্য করিলেন? বিজ্ঞলোকের মুখে এখনও শুনিতে পাওয়া যায় যে এজিটেশন করিয়াই আমরা গবর্মেণ্টকে রাগাইয়া দিয়াছি, তাই তাঁহারা আমাদিগকে জব্দ করিবেন স্থির করিয়াছেন: সব কথায় সভা আর বক্তৃতা, খবরের কাগজে মাথামুণ্ড লেখা, বড় বড় সাহেবদিগের কথার প্রতিবাদ, ইহাতে গবর্মেণ্ট রাগ করিবেন না কেন? যাঁহারা কংগ্রেস করিয়া মনে করিয়াছিলেন যে এখন আর গবর্মেণ্ট স্বেচ্ছামত সকল কর্ম্ম করিতে পারিবেন না তাঁহারা এখন কি বলেন? তাঁহারা বলেন এই যে, মিউনিসিপাল আইন হইয়াছে সত্য, সিডিশন আইন বড় কঠোর হইয়াছে এ কথাও মানি, কিন্তু নাতুদিগের মুক্তি হইয়াছে। আমরা যদি একশত বার হারি আর গবর্মেণ্ট একবার হারেন তাহা হইলেও আমাদের জিত।

আমরা যে গবর্মেণ্টকে হারাইয়াছি এরূপ শ্লাঘা আমাদের মনে হওয়া উচিত নয়। আমাদের কি সাধ্য যে গবর্মেণ্টের ভ্রম তাঁহাদিগকে স্বীকার করাই, কিম্বা তাঁহাদের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করাই! গবর্মেণ্ট নিজেই হারিয়াছেন। যদি তাঁহারা খুব ষ্ট্রং হইতে চাহেন, তাহা হইলে নাতুদিগকে ছাড়িলেন কেন? এই একবার গবর্মেণ্টের হার হইল। আর একবার তাঁহারা হারিয়াছিলেন বেঙ্গল জুরি নোটিফিকেশনের সময়। সেবারও আমরা তাঁহাদের হারাই নাই। বেঙ্গল গবর্মেণ্ট খুব পাকা বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু বিলাতে যে একটা গোল বাধিবে সে হিসাব তাঁহারা করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহাদের হার হইল। নাতুদিগের বেলাও তাঁহাদের ভুল। কাহার কথায় কি সন্দেহ করিয়া অনর্থক তাঁহারা দুই ভাইকে বন্দী করিলেন। কিন্তু Lettres de cachet এর কাল ত আর নাই। অতি জীর্ণ রেগুলেশনের দোহাই দিয়া অকারণে নির্দ্দোষী সম্ভ্রান্ত প্রজাকে গবর্মেণ্ট কয় দিন কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন? রাগের মাথায় গবর্মেণ্ট সে কথা ভাবেন নাই। তাঁহারা ভ্রম স্বীকার করুন আর নাই করুন প্রত্যক্ষ তাঁহাদের ভুল ধরা পড়িয়াছে। গবর্মেণ্টের অসীম ক্ষমতা, কিন্তু তাঁহারাও সর্ব্বদা যথেচ্ছ কাজ করিতে পারেন না। জুরি নোটিফিকেশন ছাড়িতে হইল, প্লেগ রেগুলেশন পরিবর্ত্তন করিতে হইল, নাতুদিগকে ছাড়িতে হইল। তবে আমরা এজিটেশন ছাড়িব কেন? এজিটেশন যে সকল সময় সফল হইবে এমনতর কাহারও মনে হয় না, কিন্তু এজিটেশন ছাড়িয়া দিলেই কি গবর্মেণ্ট একেবারে অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া সকল কার্য্য আমাদের মনোমত করিবেন? নাতুদিগের মুক্তিতে আর একটা প্রমাণ পাইলাম যে গবর্মেণ্ট গায়ের জোরে সব সময় সব কাজ করিতে পারেন না, নীতিসঙ্গত কর্ম্ম না হইলে কখন কখন তাঁহাদিগকেও মুখে না হউক কার্য্যতঃ ভ্রম স্বীকার করিতে হয়।

দ্রৌপদী।

কুরুসভামাঝে যবে কৃষ্ণার বসন
মুহুর্মুহু আকর্ষিল মূঢ় দুঃশাসন,
মুক্তকেশী একবস্ত্রা দ্রৌপদী সুন্দরী
ক্ষণতরে আর্ত্তত্রাসে উঠিলা শিহরি;
দৃপ্ত সাধ্বী-গর্ব্বে পুন হেরিলা তখন
হাসিছে নির্লজ্জ ক্ষুদ্র কাপুরুষগণ;
সাধু সভাসদ আর পুরবৃদ্ধ যত
নিশ্চল আছেন বসি অক্ষমের মত;
অপমানে নতশির, বসি পঞ্চজন
মৌন ম্লান—তেজোহীন বহ্নির মতন!—
লাজে ক্ষোভে নারীবক্ষ করিয়া বিদার
দিকে দিকে ধেয়ে গেল দারুণ ধিক্কার;
যেন সদ্য ঊর্দ্ধফণা দলিতা ফণিনী
দাঁড়াইলা সভাস্থলে রোষে তেজস্বিনী!

সীতা।

বিচার-মণ্ডপতলে নির্ব্বাসিতা সীতা
ঈষৎ সন্নত নেত্রে, কৃশা শুচিস্মিতা
দাঁড়াইলা রমণী-গৌরবে।—ধীর স্থির
স্নিগ্ধ ম্লান, প্রীতি-মূর্ত্তি গভীর গম্ভীর,
শত শত হৃদিপদ্মে উদিল তখন
অজ্ঞাতে নীরবে দিব্য স্বপ্নের মতন!
স্তম্ভিত প্রকৃতিপুঞ্জ রাজলক্ষ্মী ভ্রমে
চাহিল বৈদেহী পানে সভয়ে সম্ভ্রমে।
হেনকালে রঘুনাথ ধীরে গাঢ়স্বরে
আহ্বানিলা মহিষীরে পরীক্ষার তরে!
দিকে দিকে শুষ্ক নেত্র উঠিল ভরিয়া;
রহিল বিহ্বল সভা লজ্জায় মরিয়া।
মাতৃবক্ষ বিদরিয়া গেল অবশেষে,
মিলাইলা তার মাঝে জানকী নিমেষে!

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান।

বিজ্ঞান শব্দ এখন আমরা 'science' এই অর্থে ব্যবহার করি। কিন্তু প্রাচীন কালে ইহা ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হইত। প্রাচীনেরা বিজ্ঞান শব্দে তত্ত্বজ্ঞান বুঝিতেন। তাঁহাদের মতে জ্ঞান = বুদ্ধিজন্যজ্ঞান (knowledge); আর বিজ্ঞান = বোধিজন্যজ্ঞান (wisdom)। গীতাতে অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানম্ ইদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥

এখানে 'বিজ্ঞান' তত্ত্বজ্ঞান অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং ইহাকে জ্ঞানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলা হইয়াছে। যাহা জানিলে আর কিছু জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকেনা, তাহা তত্ত্বজ্ঞান বই আর কি? অন্যত্রও আমরা দেখি—"জ্ঞান বিজ্ঞান তৃপ্তাত্মা"। কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজে বিজ্ঞান শব্দের science অর্থে রূঢ়ি হইয়াছে। অতএব আমরা সেই অর্থেই বিজ্ঞান শব্দের প্রয়োগ করিব।

উপনিষদে ব্রহ্মকে প্রজ্ঞান-ঘন বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্মে প্রজ্ঞান ভিন্ন আর কিছু নাই। তাঁহার সর্ব্বত্র প্রজ্ঞান, তিনি প্রজ্ঞানময়। অন্যত্র দেখা যায়—"প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ"—প্রজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্তব্য। এখানে প্রজ্ঞান শব্দ তত্ত্বজ্ঞান অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, অথবা ইহা তত্ত্বজ্ঞানেরও উপরিতন অবস্থা। কারণ ঐতরেয় উপনিষদে "সংজ্ঞানম্, আজ্ঞানম্, বিজ্ঞানম্, প্রজ্ঞানম্" এইরূপ উক্ত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে প্রজ্ঞান যেন বিজ্ঞানেরও পরের অবস্থা। সম্প্রতি যদিও 'প্রজ্ঞা' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু 'প্রজ্ঞান' শব্দ একরূপ বাঙ্গালা হইতে উঠিয়া গিয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালা ভাষা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কারণ যখন আমরা 'বিজ্ঞান' শব্দের দ্বারা অন্য প্রয়োজন সাধন করিতেছি, তখন বিজ্ঞানের পূর্ব্বসহচর 'প্রজ্ঞান' শব্দকে ছাড়িলে চলিবে কেন? বিজ্ঞান শব্দে science বুঝায় ক্ষতি নাই; আমরা প্রজ্ঞান শব্দের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান বুঝিব।

বুদ্ধিজনিত জ্ঞান (বিজ্ঞান) যেমন scienceএর বিষয়ীভূত, বোধিজনিত জ্ঞান (প্রজ্ঞান) তেমনি ধর্ম্মের (religionএর) বিষয়ীভূত। বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান বস্তুতঃ জ্ঞানেরই পূর্ব্বাপর স্তর মাত্র। সুতরাং ইহাদের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ হওয়া উচিত নহে। কারণ বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা প্রজ্ঞান রাজ্যে উপনীত হই। প্রজ্ঞান বিজ্ঞানের পরিণতি মাত্র। বিজ্ঞানের পূর্ণতা বা পরিসমাপ্তিই প্রজ্ঞান। অতএব এ দোঁহার মধ্যে চিরসখ্য বিরাজিত থাকা উচিত। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে আমরা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতে পাই। আমরা দেখিতে পাই রোজার বেকন্, কোপার্‌নিকাস্, ব্রূণো, গ্যালিলিও প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক প্রবরগণ প্রজ্ঞানের রক্ষক ধর্ম্মযাজকদিগের হস্তে অশেষরূপে লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত এবং বিপর্য্যস্ত হইয়াছিলেন। আমরা দেখিতে পাই, যে ইয়ুরোপখণ্ডে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে বহু শতাব্দী ধরিয়া ভীষণ দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিয়াছিল। আমরা দেখিতে পাই যে বৈজ্ঞানিকের নিকট ধর্ম্ম পরিহাসের বস্তু এবং ঘৃণার সামগ্রী ছিল। আর ধর্ম্মযাজকের নিকট বৈজ্ঞানিক নির্ম্মম বিদ্বেষানলে আহুতি দিবার উপযুক্ত ইন্ধন বিবেচিত হইয়াছিল।

কিন্তু প্রাচ্য ভূখণ্ডে ইহার অনেকটা বিপরীত দেখা যায়। মিসর, অ্যাসিরিয়া, চীন, ভারতবর্ষ—সর্ব্বত্রই বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান অচ্ছেদ্য সখ্যবন্ধনে বিজড়িত ছিল। এখানে ধর্ম্মযাজকই বৈজ্ঞানিকের আসন অধিকার করিয়াছিলেন। বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞানের মধ্যে যে সংযোগ-তন্তু, তাহার কখন ব্যবচ্ছেদ ঘটে নাই। সেই জন্য দেখিতে পাই যে প্রাচ্যদেশসমূহে বিজ্ঞান কখনও জড়বাদ বা নাস্তিকতায় পর্য্যবসিত হয় নাই এবং ধর্ম্মও কখন বিজ্ঞানের ভিত্তি হারাইয়া অন্ধবিশ্বাস বা অর্থহীন অনুষ্ঠানমাত্রে পরিণত হয় নাই। সেই জন্য দেখিতে পাই যে প্রাচ্যধর্ম্মমূলক প্রায় সমস্ত আচার বিশ্বাসেরই অন্বেষণ করিলে একটা বৈজ্ঞানিক মূল পাওয়া যায়। আর দেখা যায় যে, দিন দিন বিজ্ঞানের যতই উন্নতি সাধিত হইতেছে, ততই সেই

সকল ধর্ম্মের প্রশস্ত ভিত্তি ক্রমশঃ দৃঢ়তর হইয়া উঠিতেছে এবং তাহাদের তমসাচ্ছন্ন অংশসমূহ নবালোকে উদ্ভাসিত হইতেছে। পক্ষান্তরে, ইয়ুরোপে বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞানের সংযোগ-তন্তু বিচ্ছিন্ন হওয়ায় প্রচলিত ধর্ম্মমতসমূহের পক্ষে বিজ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক অসহ্য হইয়া পড়িতেছে, এবং তাহার ফলে বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সহিত লোকের ধর্ম্ম-বিশ্বাস শ্লথ হইয়া যাইতেছে। অন্য দিকে বিজ্ঞান প্রজ্ঞা-নের হস্তাবলম্বন হারাইয়া অন্ধ জড়বাদে পরিণত হই-য়াছে এবং বৈজ্ঞানিক নিজের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিকে জ্ঞানের চরমসীমা ভাবিয়া positivism বা Agnosticism (অজ্ঞেয় বাদকে) আশ্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই বিভীষিকাময়ী বৈজ্ঞানিকতার করাল ছায়া ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সহিত এদেশেও পরিব্যাপ্ত হইতেছে। ইহার সংহারক কবলে নিষ্পেষিত হইবার পূর্ব্বে আমাদিগের এক-বার বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞানের স্বরূপ ও ভেদ বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত।

প্রথমতঃ বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞানের অবলম্বিত প্রণালীর বিভিন্নতা সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখা যাক্। বৈজ্ঞানিক ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির সাহায্যে জগৎতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। ইন্দ্রিয়ের শক্তি সীমাবদ্ধ ; সেই জন্য তিনি নানা-রূপ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করেন। মানুষের চক্ষু কয়েক ক্রোশ ব্যবধানে দেখিতে পায় না ; অথচ বৈজ্ঞানি-ককে কোটী যোজন দূরবর্ত্তী গ্রহনক্ষত্রাদি পরিদর্শন করিতে হইবে ; সেই জন্য দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার। মানুষ চর্ম্মচক্ষে ক্ষুদ্রতর পদার্থ উপলব্ধি করিতে পারে না ; অথচ বৈজ্ঞানিককে কীটাণু, বীজাণু, কোষাণু প্রভৃতি অতি সূক্ষ্ম পদার্থের স্বরূপ পর্য্যালোচনা করিতে হইবে ; সেই জন্য অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার। এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধেও দেখা যায়। সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়শক্তির বিস্তৃতিসাধন করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক যে কত প্রকার যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। যদি কোন প্রতিষ্ঠাশালী বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানশালা একবার পরিদর্শন করা যায়,তবে এ কথার প্রমাণের অপেক্ষা থাকে না। ফলতঃ বৈজ্ঞানিকের অবলম্বিত প্রণালীতে, প্রথ-মতঃ, ইন্দ্রিয় ও যন্ত্রের সাহায্যে জগৎব্যপারের পর্য্যবেক্ষণ (observation) ও পরীক্ষণ (experiment) এবং পশ্চাৎ বুদ্ধির সাহায্যে তাহাদের পর্য্যালোচন, অর্থাৎ নানা রূপে বিশ্লেষণ, বিভাজন, সমীকরণ ইত্যাদি। তদনন্তর ন্যায়ানুমোদিত যুক্তি প্রয়োগ দ্বারা তাহাদের উপগমন ও ব্যাপ্তিসাধন করিয়া নিয়মের সংস্থাপন ও তত্ত্বাবিষ্কার। সংক্ষেপতঃ ইহাই বৈজ্ঞানিক প্রণালী।

কিন্তু প্রজ্ঞানের প্রণালী ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রজ্ঞানের রাজ্যে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির (intellect) প্রয়োগে কোনই ফললাভ হয় না। তত্ত্বজ্ঞান আয়ত্ত করিয়া প্রজ্ঞানের অধিকারী হইতে হইলে জিজ্ঞাসুকে চিত্তশুদ্ধির দ্বারা ধ্যান যোগ অবলম্বন করিতে হয়। এই ধ্যানের ইংরাজী প্রতিশব্দ intuition। জার্‌মান্ দার্শনিক ক্যাণ্ট্ ইহাকে অতীন্দ্রিয় অববোধ (Transcendental apperception) বলিয়াছেন; সেলিং ইহার নাম দিয়াছেন —বোধিজ প্রজ্ঞান (intellectual intuition)। কিন্তু জার্‌মান্ পণ্ডিতেরা ইহার যতই লম্বা চৌড়া আখ্যা দিন না কেন, ইহা আমাদের সেই চিরপরিচিত ধ্যান ভিন্ন আর কিছুই নহে। বাহ্য বিষয় বাহিরে রাখিয়া, মনের গতি অন্তর্ম্মুখী করিয়া, চিত্তের বৃত্তি ধারণা করিয়া যে অনন্যবিষয়ক একাগ্রতা তাহাই ধ্যান। ধ্যানযোগ আয়ত্ত হইলে জগতের আবরণ উন্মুক্ত হইয়া যায় এবং তত্ত্বজ্ঞানী প্রতিভাসের পশ্চাতে (behind phenomena) পার-মার্থিক তত্ত্বের (Noumena) সাক্ষাৎকার লাভ করেন। বিজ্ঞানের দৃষ্টি বহির্ম্মুখী এবং লক্ষ্য বাহ্য আকৃতির প্রতি জাগতিক রূপের নানা ভেদ। সেই জন্য বিজ্ঞানের আরম্ভ বহু হইতে। প্রজ্ঞানের দৃষ্টি অন্তর্ম্মুখী এবং লক্ষ্য পরমার্থ-তত্ত্বের প্রতি। পরমার্থ অদ্বিতীয় পদার্থ। সেইজন্য প্রজ্ঞানের আরম্ভ এক হইতে। বিজ্ঞান জগতের বহুরূপিত্বে দিশাহারা হইয়া অকুল পাথার দেখেন ; প্রজ্ঞান 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' এই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া "যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি" যাহাকে জানিলে সকলই পরিজ্ঞাত হইয়া যায় সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্"কে ধ্যান-যোগে উপলব্ধি করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। এই নিমিত্ত দেখা যায় যে বৈজ্ঞানিকের প্রণালী অধিরোহমূলক (synthetic), কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীর প্রণালী অবরোহমূলক (Analytic)। বৈজ্ঞানিক বহু হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার সঙ্কোচন দ্বারা ক্রমে ক্রমে যথা সম্ভব একত্বে

উপনীত হন, আর তত্ত্বজ্ঞানী এক হইতে আরম্ভ করিয়া সম্প্রসারণ দ্বারা নানাত্বের বিকাশ প্রদর্শন করেন।

আরও দেখা যায় যে বৈজ্ঞানিক ধীরে ধীরে জ্ঞানের সোপান অতিক্রম করিয়া স্তরে স্তরে সুগম হইতে দুর্গমে, স্থূল হইতে সূক্ষ্মে, শিক্ষার্থীকে সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হন। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী শিষ্যকে ভিন্ন প্রণালীতে শিক্ষাদান করেন। তিনি প্রথমতঃ তাহার চিত্তকে তত্ত্ববীজ রোপণের উপ-যোগী করিয়া লন, পরে তাহার অধিকার বুঝিয়া তদনুরূপ উপদেশ প্রদান করেন। প্রশ্ন উপনিষদে দেখা যায় যে সুকেশা প্রভৃতি কয়েকটী তত্ত্বজিজ্ঞাসু ঋষিযুবক, মহর্ষি পিপ্পলাদের সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলে পিপ্পলাদ তাহাদের প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়া তাহাদিগকে বলিলেন যে তোমরা সম্বৎসর ধরিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া শুদ্ধচিত্ত হইয়া আইস, পরে ইচ্ছানু-রূপ প্রশ্ন করিও, যথোচিত উত্তর পাইবে। বিজ্ঞানের আলোচনায় এরূপ কোন অধিকার ভেদ নাই। সকলের পক্ষেই বিজ্ঞানের সিংহদ্বার উন্মুক্ত।

আরও দেখা যায় যে বৈজ্ঞানিক যেমন পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়া পরীক্ষা দ্বারা শিক্ষার্থীকে তাহার সত্যাসত্য বুঝাইয়া দেন, তত্ত্বজ্ঞানী শিষ্য সম্বন্ধে সেরূপ ব্যবস্থা করেন না। তিনি মৌখিক উপদেশ না দিয়া শিষ্য যাহাতে তত্ত্বজ্ঞান স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া তাহা আত্ম-সাৎ করিতে পারে তাহার উপায় করিয়া দেন। এইরূপে তত্ত্বজ্ঞান, পরপ্রত্যয়সিদ্ধ না হইয়া নিজের অববোধজনিত হয়। সেইজন্য আমরা দেখি যে তৈত্তিরীয় উপনিষদে ভৃগু তত্ত্বজ্ঞানী পিতা বরুণের সমীপস্থ হইয়া তাঁহাকে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিলে, "অধিহি মে ভগবন্ ব্রহ্মেতি", বরুণ তাঁহার প্রশ্নের সাক্ষাৎ কোন উত্তর না দিয়া তাঁহাকেই এই বিষয়ে একাগ্রভাবে চিন্তা (ধ্যান) করিতে বলেন। ভৃগুও তাঁহার উপদেশ মত তৎসম্বন্ধে ধ্যান করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে "অন্নই ব্রহ্ম"। বরুণ তাঁহার এই সিদ্ধান্ত শুনিয়া তাঁহাকে পুনরায় ধ্যান করিতে বলেন, ধ্যানান্তর ভৃগু বুঝিতে পারেন যে "প্রাণই ব্রহ্ম"। বরুণ তাঁহাকে পুনরপি ধ্যান করিতে বলেন। এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে ভৃগুর হৃদয়ে ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিভাত হয়। তিনি তখন উপলব্ধি করেন যে ব্রহ্ম "সচ্চিদানন্দ"।

বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞানের শেষ ফল সম্বন্ধেও বিস্তর প্রভেদ লক্ষিত হয়। বিজ্ঞানের করণ (বুদ্ধি) সীমাবদ্ধ ; সেইজন্য বিজ্ঞান সসীম। বিজ্ঞানরাজ্যে জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয়ের সীমা নির্দ্দেশ আছে। এত দূর পর্য্যন্ত জ্ঞানালোকে আলোকিত, তাহার পর সমস্তটা ঘনান্ধকার, জ্ঞানের অতীত। বিজ্ঞানের চরম অজ্ঞেয় বাদ। আর শেষ সিদ্ধান্ত এই :—

অজ্ঞেয় সৃষ্টির তত্ত্ব স্থিতি ও বিরাম
জ্ঞানের এ শোচনীয় শেষ পরিণাম।

কিন্তু প্রজ্ঞানের করণ (ধ্যান) সীমারহিত ; সেইজন্য প্রজ্ঞান অসীম। প্রজ্ঞানের দেশে অজ্ঞেয় শব্দের প্রচলন নাই, সমস্তই জ্ঞানের বিষয়ীভূত। কারণ জগতের যিনি পরম তত্ত্ব, চরম পরমার্থ, সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম পদার্থেরও তত্ত্বজ্ঞানী মনীষা দ্বারা সাক্ষাৎকার লাভ করেন। প্রজ্ঞা-নের চরম—বেদান্ত বাদ ; আর শেষ সিদ্ধান্ত এই :—

টুটে হৃদয়ের গ্রন্থি, দেখে তবে নর
সচ্চিদ্-আনন্দময় বিশ্বচরাচর ;

সেইজন্য জগতের কূট সমস্যা সম্বন্ধে বিজ্ঞান কোন সদুত্তর দিতে পারে না। সৃষ্টির প্রয়োজন উদ্দেশ্য ফল, ঈশ্বর মায়া, জীব জড়, কল্প মন্বন্তর, পরলোক জন্মান্তর, এই যে সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া মানুষ জগতের আদি হইতে বিকল হইতেছে, তদ্বিষয়ে বিজ্ঞান কোন সুমীমাংসা করিয়া দিতে পারে না, কারণ এ সকল তত্ত্ব বিজ্ঞানের বহির্ভূত ; প্রজ্ঞানের আশ্রয় লইয়া ইহাদিগকে আয়ত্ত করিতে হয়।

শেষ কথা। বিজ্ঞান বিশ্লেষণ সহকারে একত্ব সাধন করিয়া করিয়া শেষ এক মহা দ্বৈতে উপনীত হন—তাহার নাম প্রকৃতি ও পুরুষ, (matter ও force)। বিজ্ঞান তাহার উপর আর উঠিতে পারেন না। কিন্তু প্রজ্ঞান এই দুইয়ের সমন্বয় সাধন করিয়া বলেন—যিনি ক্ষরের অতীত ও অক্ষরের উত্তম, যাঁহা হইতে প্রকৃতি ও পুরুষের উদ্ভব, যিনি জড় ও চিতের অদ্ভুত সমন্বয় সেই পুরুষোত্তমকে নমস্কার করি।

যতঃ প্রধান পুরুষৌ যতশ্চৈতৎ চরাচরম্।
কারণং সকলস্যাস্য স নো বিষ্ণুঃ প্রসীদতু॥

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

ময়ূরভঞ্জে 'ছউ' নাট।

'ছউ' ময়ূরভঞ্জের একটী বিশেষ পর্ব্ব; একটি আমোদ অনুষ্ঠান। ইহাকে 'ছউ নাট' বা 'ছউ যাত্রা' বলা হইয়া থাকে। 'নাট' কথাটা হইতেই অবশ্য এটা বুঝা যাইতেছে যে ইহাতে নাট্য বা 'নৃত্য' আছে, 'যাত্রা' দেখিয়া অনেকে হয়ত 'বৌকুণ্ডুর যাত্রা', 'মতি রায়ের যাত্রা' ইত্যাদির ছবিটা মনোমধ্যে উদ্ভাসিত করিয়া তাহারই মত একটা কিছু 'গীত' বাদ্য নৃত্য ও বক্তৃতা সমন্বিত একটা আমোদ প্রমোদ বলিয়া স্থির করিতে পারেন, কিন্তু ঐতিহাসিক (!) সত্যের সম্মানের মর্য্যাদা যাহাতে 'রেখা মাত্রও ক্ষুণ্ণ' না হয় সেজন্য আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে, এই শেষোক্ত অনুমানকারিগণ একান্ত ভ্রান্ত হইয়াছেন। ছউ পর্ব্বে নৃত্য আছে, কিন্তু গীত নাই—তবে সানাইর বাদ্য এবং তত্তাল সঙ্গত ঢোলের সঙ্গত যদি গীত বলেন—সে স্বতন্ত্র কথা—কণ্ঠগীত নাই, বক্তৃতা তো একেবারেই নাই! এ পর্ব্বে সুধুই নৃত্য, সুধুই নাট, আর তদনুগামী বাদ্য! বাদ্যও ঢোলক নহে, তবলা নহে, হারমোনিয়ম নহে। ঢোল—কাঠি দেওয়া ঢোল, আর সানাই!

'যস্য দেবস্য যদ্রূপং তথা ভূষণবাহনং'—যেমন নৃত্য, তদুপযোগী বাদ্য! এ নৃত্য পুরুষের, রমণীর সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা দেখিবার জন্য লোক সাধারণের যেরূপ ঔৎসুক্য, ইহার জন্য যেরূপ আয়োজন ও অনুষ্ঠান হয়, অন্য স্থানে ভাল ভাল বাইজী-দের নৃত্য সভাতেও সেরূপ জনসমাগম বা আড়ম্বর হয় না।

এই নৃত্য মধুর মধুমাসে অনুষ্ঠিত হয়। চড়ক পূজার কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে ইহা আরম্ভ হয় এবং সংক্রান্তির দিবস শেষ হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্গা পূজার পর হইতেই ইহার আয়োজন, শিক্ষা, দীক্ষা প্রভৃতি আরম্ভ হয়। সুতরাং পাঠকবর্গ বুঝুন যে ব্যাপারটা কি গুরুতর যে প্রায় ছয় মাস পূর্ব্ব হইতে ইহার শিক্ষা ও মোহড়া (drill and reharsal) আরম্ভ হয়। ময়ূরভঞ্জের মহা-রাজের প্রাসাদেই ইহার আড্ডা। অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসের রাত্রিতে রাজ বাড়ী গেলে প্রায় প্রত্যহই ঢোলের উচ্চ শব্দ প্রাসাদ কুট্টিমে প্রতিধ্বনিত হইয়া শ্রবণদ্বারে নির্দ্দয়রূপে আঘাত করিয়া হৃদ্‌গেহস্থ আত্মাপুরুষের চৈতন্য সম্পাদন করিয়া দেয়। রাজ পরিবারের এই নৃত্যে যথেষ্ট সহানুভূতি আছে এবং ইহাতে তাঁহাদের ব্যয়ও যথেষ্ট হয়। রাজ ভ্রাতা স্বয়ং এই দলের পৃষ্ঠপোষক। মহারাজের অন্য ভ্রাতা দত্তকসূত্রে বর্ত্তমান নিলগিরি রাজেরও এক দল আছে। কোন কোন বারে এই উভয় দলের প্রতি-দ্বন্দিতা উপস্থিত হয় এবং সেই সময় প্রত্যেক দলেই স্বীয় স্বীয় নৃত্যনিপুণতা বিশেষ ভাবে প্রদর্শন করিয়া থাকে। নৃত্য শেষে জয় পরাজয় স্থির হয়।

এই যে কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাস হইতে শিক্ষা দেওয়া হয় এ কি শিক্ষা? আর কিছুই নহে, নৃত্যের ভঙ্গী, ভাব, অঙ্গ চালন-কৌশল ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার জন্য রীতিমত বেতন দ্বারা সিংহভূম প্রভৃতি স্থান হইতে শিক্ষক আনা হইয়া থাকে। সঙ্গতকারী ঢুলিও ঐসব স্থান হইতেই আনা হয়। অনুসন্ধানে আমরা যত দূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে সিংহভূম, মল্লভূম প্রভৃতি অঞ্চলেই সর্ব্বাদৌ এই 'ছউ' নাটের প্রথম জন্ম হয়। সরাইকেলা রাজবাটীতেও নাকি বহু পূর্ব্ব হইতে এ নাটের প্রচলন আছে এবং ময়ূরভঞ্জের অনেকে বলিয়াছেন ঐ রাজবাটীতেই ইহার প্রথম উৎপত্তি। তার পর ময়ূর-ভঞ্জেও বোধ হয় ৫০। ৬০ বৎসর (কি তার বেশী কম ঠিক স্মরণ নাই) হইল ছউ আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করি-আছে। বর্ত্তমান মহারাজের পিতৃ পিতামহাদি নাকি এই নাট্য বড় পছন্দ করিতেন এবং বিশেষ উৎসাহ সহকারে ইহার অনুষ্ঠান আয়োজন করিতেন। এখনও রাউৎ রায় (রাজ ভ্রাতা) সাহেব ইহাতে বিশেষ অনুরক্ত এবং এতদনু-ষ্ঠানে অর্থ ব্যয়ে কাতর নহেন। এই নৃত্যের নর্ত্তকগণকে রীতিমত যথেষ্ট বেতনাদি প্রদান করা হয়। ছোট ছোট বালক হইতে বয়স্কগণ পর্য্যন্ত এই নৃত্যের নটত্ব গ্রহণ করে। এই সব লোক প্রায়ই সাধারণ লোক। ভদ্র বংশীয় স্থানীয় রাজ কর্ম্মচারিগণও (অবশ্য উড়িয়া) কেহ কেহ স্বেচ্ছায় কেহ কেহ বা অনুরোধে পড়িয়া এই নৃত্যের নট-কার্য্যে ব্রতী হন। রাজবংশীয় যুবকগণও (লাল সাহেব-গণ) অনেকে এই নৃত্যে রীতিমত নটকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। সিংহভূম প্রভৃতি অঞ্চলের নৃত্য-শিক্ষক এবং বাদক আনীত হইয়া এই দলের নটদিগের নৃত্য-ভঙ্গিমা প্রভৃতি শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হয়; তাহারা নাকি ৩০৲ ৪০৲ কি তদপেক্ষাও অধিক বেতন পাইয়া থাকে।

'ছউ নাটের' নৃত্য-শিক্ষা এতই কি কঠিন যে পাঁচ ছয় মাস ধরিয়া তাহার শিক্ষা ও মোহড়া চলিতে থাকে? হাঁ, কঠিন বই কি! পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে 'ছউ' নাটের বিশেষ বিশেষত্ব এই যে ইহাতে বাক্‌যন্ত্র সম্পূর্ণ নীরব, নির্লিপ্ত। কথাবার্ত্তা, বক্তৃতা, গীত ইহাতে নাই, কিন্তু যাত্রার প্রয়োজনীয় আর সবই ইহাতে আছে। এইজন্য ইহাকে যাত্রাও বলিয়া থাকে। ইহারও এক একটা 'পালা' আছে। প্রধানতঃ রামায়ণের ঘটনাবলী অবলম্বনেই ইহার পালা সব প্রস্তুত হয়, এবং নাট্যোল্লিখিত চরিত্রাবলীর উপযোগী সাজ সজ্জাও ইহাতে ব্যবহৃত হয়। যেমন রাবণ রাজা, তাঁর জন্য রাজপোষাক, তরবারী, জাঠা, শেল, মুসল, মুদ্‌গর আদি, রাম লক্ষণের ধনুর্ব্বাণ, জটা, বল্‌কল আদি, নারদ ঋষির, পাকাদাড়ী, চুল, ত্রিতন্ত্রী, মালা, ইত্যাদি, ইত্যাদি। পালা অনুসারে এইসব চরিত্রাভিনেতাদিগকে মঞ্চে উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব নৃত্য বা নাট প্রদর্শন করিতে হয়। যুদ্ধ বিগ্রহ আদিও বাদ যায় না। সুতরাং যাত্রার সবই আছে, নাই কেবল বক্তৃতা, গীত! কিন্তু এই সব অভিনেতাদিগকে নৃত্য কৌশলে, কলা বিকাশে এবং অঙ্গ-চালন ভঙ্গীমায় স্বীয় চরিত্রানুসারী ভাব সমস্তই প্রকাশ করিতে হয়। অতএব ইহাতে "রে পাষণ্ড, এই দণ্ড দ্বারা এই দণ্ডে তোর মুণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব" ইহা উচ্চ রবে ধ্বনিত না করিয়া কেবল নৃত্য এবং অঙ্গ ভঙ্গী দ্বারা ঐ 'খণ্ড খণ্ডের' সম্ভাবনা ও তজ্জনিত ভীতি উৎপাদন করিতে হইবে, "হা বৎস," "হা রবি কুল রবি," অথবা "হা প্রেয়সি" "হা হৃদয় সর্ব্বস্ব" ইত্যাদি করুণস্বরে উচ্চারণ দ্বারা দর্শকের হৃদয়ে করুণা সঞ্চারের চেষ্টা না করিয়া কেবল অঙ্গের ভঙ্গী, কৌশল আদি দ্বারা সেই কষ্ট প্রকাশ, এবং করুণার উদ্রেক করিতে হইবে, বীণাবাদনকর নারদ ঋষিকে "একবার বল্ বীণে, হরি নাম বিনে, অন্য কিছু আর বল্ বিনে, তারে তারে ডাকবে তারে" ইত্যাদি গীতধ্বনিতে শান্তরসের উদ্দীপন না করিয়া কেবল নাট্যেন, তাহা সাধন করিতে হইবে; সুতরাং এই নাট্য, সকলের একভাবে, একরূপে শিক্ষনীয় নহে এবং সুধু যে কেবল পদচালনাই শিক্ষা করিতে হইবে তাহা নহে, অন্যান্য সমস্ত অঙ্গই, যথা হস্ত, মস্তক, স্কন্ধ, কটী, দেহ, সমস্তই বিশেষ বিশেষ ভাবে চালনা করিতে হইবে। আবার তাহাও বেতালিম হইবার যো নাই। পার্শ্বেই ঢোল অনবরত 'ক্রূরকর্ম্মা' ভাবে সে বিষয় নটকে সতর্ক করিতেছে, সানাইও তালোপযোগী সুরে উচ্চকণ্ঠে কর্ণ-জ্বর উৎপাদন করিতেছে। সুতরাং সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে এ নৃত্য সাধারণ যাত্রার নৃত্য হইতে কত কঠিন এবং ইহা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা কত আয়াস-সাধ্য। 'নৃত্য' বলিলে ঠিক হয় না, অলঙ্কার শাস্ত্র অনুসারে ইহাকে 'নাট' বা নাট্য' * বলাই সঙ্গত। ইহাতে সেই মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্য হইতে উর্ব্বশী মেনকার লীলা বিলাসসমন্বিত লাস্য পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার নৃত্যই আছে। এই সব নৃত্য অভ্যাস করা কুস্তীর 'কস্‌রৎ' শিক্ষা অপেক্ষা কোন অংশেই হীন বলিয়া বোধ হয় না বরং তদ-পেক্ষাও কঠিন বোধ হয়। কারণ দেহের আনমন, কুঞ্চন, প্রসারণ, হস্তপদের সহস্র ভঙ্গীতে সঞ্চালন, শত প্রকার অভিরাম গ্রীবা ভঙ্গী ইত্যাদি ও যেমন কুস্তী হইতে অনেক অধিক, তেমনই আবার ঐ সব অঙ্গ চালনরূপ নাট্য দ্বারা দর্শকের মনে সময়োপযোগী ভাবের উদ্দীপন, এবং তাল-লয় সঙ্গত ভাবে এই সব কার্য্য সম্পাদন এগুলিতো এই নাট্যে সম্পূর্ণ নূতন; কুস্তীতে এ সবের প্রয়োজন নাই। ইংরাজি Pantomime or Dumb-showর সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য বোধ হয়। Pantomimeতেও রঙ্গ-মঞ্চে বক্তৃতা নাই, কেবল কার্য্যদ্বারা ভাব প্রকাশ; 'ছউ' নাটে ঠিক তাই। এই Pantomime ও বড় কম পুরাতন নহে; প্রাচীন রোমকদিগের আমলে ইহা প্রচলিত ছিল এবং প্রসিদ্ধ অগষ্টস্ সিজারের (Augustus Octaviaus Cæsar) রাজত্বকালেই নাকি ইহার চরম উন্নতি হইয়াছিল! প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে (১৭১৭খৃঃ) নাকি ইংরাজিতে প্রথম 'নাট' পুস্তক, Pantomime অভিনীত হয়। যাহা হউক, ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে যে এইরূপ নীরব নাট্য বহুকাল হইতেই প্রচলিত আছে। সেক্‌স্‌পিয়ারের অষ্টম হেন্‌রিতেও একটা এইরূপ নাচের দৃষ্টান্ত আছে। তাহাতে রাজা এবং তাঁহার সঙ্গীগণের মুখোসপরা ছিল এবং তাঁহারা ভাষান্তরে চেম্বারলেনের

* যদিও 'নাট্য' নৃত্য, গীত, বাদ্য এই তিনের সম্মিলন অর্থে ব্যবহৃত হয়, তথাপি কেবল অঙ্গ ভঙ্গী অর্থেও নাটকে ইহার বহু প্রচলন আছে।

সঙ্গে কথা বলিয়াছিলেন। তবে নৃত্য কালে কেবল নৃত্যই ছিল। এই ছউ নাটে রঙ্গমঞ্চে থাকিবার সময় বাক্যালাপ নিষিদ্ধ। তবে মুখোস্ পরা বা নানা রঙ্গে মুখ রঞ্জিত করা, ইহাতেও আছে। হরিতাল, কালী, সিন্দূর বা অন্য কোন রঙ্গে প্রয়োজনোপযোগী করিয়া অবয়বাদি চিত্রিত করা হয়।

অবশ্য শিক্ষা সহবতের সময় আর ঐরূপ চিত্রিত করা হয় না; তখন কেবল ধাবন, কুর্দ্দন, নর্ত্তন, উল্লম্ফন, নুব্জীকরণ প্রভৃতি কলা বৈচিত্র্য এবং তদুপযুক্ত অঙ্গভঙ্গী কৌশলাদিই শিক্ষা দেওয়া হয় এবং বেশ 'সু তালিম' করিবার জন্য যথেষ্ট যত্ন লওয়া হয়। এইরূপ ৫।৬ মাস ব্যাপী শিক্ষা গুণে সব ঠিক হইলে মধুমাসের সময় ৩।৪ দিন কি ৫।৭ দিন থাকিতে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে নাট্যাভিনয়ের আয়োজন হয়। রাজবাটীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে মৃত্তিকা দ্বারা একটি উচ্চ স্থান প্রস্তুত করিয়া রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মিত হয়। তথায় অবশ্য রঙ্গমঞ্চের উপযুক্ত সাজ-শয্যা সবই ঠিক করা থাকে। তবে দৃশ্যপট (সীন্) ব্যবহার সাধারণতঃ হয় না। রঙ্গমঞ্চের পার্শ্বেই সাজঘর (Green Room) থাকে, তথায় নটগণের সাজসজ্জা, সুশীতল পানীয়, ভক্ষ্য, এবং অন্যান্য বিশ্রামোপযোগী উপাদান সমস্ত প্রস্তুত থাকে। উপযুক্ত সময়ে প্রথম দৃশ্যের অভিনেতাদল স্বীয় স্বীয় অস্ত্র শস্ত্রে (তীর, ধনুক, তরবারী, কমণ্ডলু, বীণা ইত্যাদি, যাহার যেমন আবশ্যক) ও উপযুক্ত সাজ সজ্জায় ভূষিত হইয়া রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয় এবং স্বীয় স্বীয় চরিত্রানুযায়ী নৃত্য কৌশল বিবিধ প্রকার নাট্যে প্রদর্শিত করিতে থাকে। এই সমস্ত নৃত্যে বাস্তবিকই যথেষ্ট শিক্ষা ও কৌশলের প্রয়োজন, যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই স্বীকার করিবেন। সে সব নৃত্যের ভাবভঙ্গী বর্ণনা করিয়া বুঝান অসাধ্য। তেমন কবি হইলে তিনি হয়ত তাহা বেশ বর্ণনা করিয়া সকলের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতে পারিতেন; কিন্তু আমার দ্বারা তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই।

এসব স্বচক্ষে দেখিয়া উপভোগ করিবার বস্তু, শুনিবার নহে। দেখিলে বাস্তবিকই মনে হয় এ নাট্য শিক্ষায় অসাধারণ বল, কৌশল এবং 'কস্‌রৎ' এর আবশ্যক। এইরূপে এক দলের শেষ হইলে অপর দল আসিয়া নাট্য আরম্ভ করে। পূর্ব্বের দল সাজঘরে যাইয়া বিশ্রাম সুখ-ভোগ করে, আবার প্রয়োজন হইলে রঙ্গমঞ্চে আসিয়া উপস্থিত হয়। সকল সময়েই যে প্রত্যেকে একইরূপ নৃত্য করে তাহা নহে; দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় নৃত্য এবং অঙ্গভঙ্গীর যথেষ্ট বিভিন্নতা ও বৈচিত্র লক্ষিত হয়। দুই দলে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই গুলি আরও ভাল করিয়া দেখিবার অবসর হয়। তখন এক দলের নৃত্য শেষ হইলে অপর দল মঞ্চ গ্রহণ করে, আবার তাহাদের পর অন্য দল আসিয়া পুনরায় নিজ নিজ সামর্থ্য ও শিক্ষানুযায়ী কৌশলাদি প্রদর্শন করে। জয় পরাজয় দর্শকগণের মতামতের উপরই অবশ্য নির্ভর করে। এই রূপে কয়েক দিন পর্য্যন্ত নাট্য হইয়া শেষ হয়।

এই নাট্যে বয়স্ক পুরুষগণ নানা সাজে সাজিয়া আসিয়া যখন নানারূপ অঙ্গ ভঙ্গি করিয়া নৃত্য করিতে থাকে, তখন তাহাদের ভাব ভঙ্গী দেখিয়া অনেক সময় হাসি পায়। তাহা হউক, কিন্তু ইহা যে একটা দ্রষ্টব্য বিষয় এবং দ্রষ্টা যে ইহা হইতে বিশেষ আমোদ উপভোগ করিতে পারেন সে বিষয় সন্দেহ নাই।

এস্থলে 'ছউ' এবং 'কুলজির' কথা একটু তুলিয়া আমরা নিবৃত্ত হইব। 'ছউ' নামটা কি ভাবে কোথা হইতে আসিল, তাহা আমরা স্থির করিতে পারি নাই। এক বা এক উৎকট ভাষা বিজ্ঞানতত্ত্ব আমার মনে আসিয়াছি যে, হয়ত ইংরাজি Pantomime or Dumb Show হইতে বা ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। যিনি ইহার প্রচারকর্ত্তা তিনি হয়ত ইহাকে Show নাম দিয়াছিলেন। উড়িয়াগণ 'Sh' উচ্চারণে বড় সুপটু নহে, 'S' কে 'Sh'এর উচ্চারণ দিতে তাহারা কাতর নহে, সুতরাং "Sh"কে Sএর উচ্চারণ দিয়া গড়ে সমান করিয়া লয় তদনুসারে তাহারা 'সো' বলিতে 'ছো' এবং তাহা হইতে ক্রমশ 'ছোউ' বা 'ছউ' বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। এব এরূপে ইংরাজি 'সো' উড়িয়া দেশে গিয়া মাথা কামা 'সঠিক' 'ছউ' হইয়া গিয়াছে। পাঠকবর্গ, (বিশেষত ভাষাবিজ্ঞানবিৎগণ) খুব হাসিতেছেন, তা হাসুন এ দীন লেখক 'ছউ'এর নামকরণ ও কোষ্ঠী বিচারের ভা তাঁহাদের হস্তে বিশ্বস্তভাবে সমর্পণ পূর্ব্বক অদ্য উপসংহা ছলে বিদায় গ্রহণ করিল।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী

অলকা মন্দির।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"রক্ষা কর! রক্ষা কর!" রমণীর আর্ত্ত কণ্ঠস্বর সহসা অজয়গড়ের উপত্যকায় ধ্বনিত হইল। পর্ব্বতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, কন্দরে কন্দরে সেই বিলাপ স্বর প্রতিধ্বনিত হইল।

উপত্যকা পথে, কিছু দূরে, জনৈক শ্রান্ত, তৃষ্ণার্ত্ত সৈনিক পুরুষ নির্ঝরের পার্শ্বে বসিয়া অঞ্জলি পুরিয়া জল পান করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন: বিপন্ন রমণীর কাতর কণ্ঠধ্বনি তাঁহার শ্রবণে প্রবেশ করিল। তাঁহার আর তৃষ্ণা নিবারণ করা হইল না।

নিকটেই তাঁহার অশ্ব শুষ্ক বৃক্ষশাখায় বল্গালগ্ন ছিল। অশ্বকে সম্বোধন করিয়া সৈনিক পুরুষ কহিলেন, "বিজয়! স্থির হইয়া থাক।"

কণ্ঠধ্বনি লক্ষ্য করিয়া যুবক বেগে ধাবমান হইলেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন এক পরমা সুন্দরী যুবতী বৃক্ষ শাখায় বদ্ধ রহিয়াছেন। তাঁহার সম্মুখে রক্তচক্ষু পিশাচাকৃতি এক পুরুষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহাকে দেখিলে নরকের দ্বারপাল মনে হয়। নিকটে চূর্ণ শিবিকা।

যোদ্ধৃপুরুষ কোষ হইতে অসি নিষ্কাশিত করিয়া তাহার উল্টা দিক দিয়া সেই নরাধমের স্কন্ধে আঘাত করিলেন। রোষগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "কে তুই?"

সেই দুরাচার সভয়ে উত্তর করিল—"মার্জ্জনা করুন। আমি আজ্ঞাবাহী ভৃত্য। আমার কোন অপরাধ নাই।"

"তোর প্রভু কোথায়?"

"তিনি বাহকের সন্ধানে গিয়াছেন।"

"এ চূর্ণ শিবিকা কার? বাহক কোথায়?"

"বাহকেরা প্রাণভয়ে পলাইয়াছে। শিবিকা এই যুবতীর। দেবদর্শন করিয়া ইহারা এই পথে ফিরিতেছিলেন। আমার প্রভু বাহকদের মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন।"

"তুই রাজপুত?"

"হাঁ! আমি চন্দাবৎ।"

"তোর সেই নৃশংস প্রভু?"

"তিনিও চন্দাবৎ।"

"চন্দাবৎগুলা রাজপুতের কলঙ্ক। তুই এই রমণীর পরিচয় জানিস্?"

"না—"

"সত্য বল—কুক্কুর! নচেৎ—"

"একলিঙ্গের নাম লইয়া বলিতেছি—কিছুই জানি না।"

"এই রমণীকে বন্ধন করিল কে?"

"তিনিই করিয়াছেন।"

যুবক রমণীর বন্ধন মোচন করিলেন। রমণী ভয়ে শরপত্রের ন্যায় কাঁপিতেছিলেন। যুবক অভয় দিয়া বলিলেন "আপনি নিরাপদ হইয়াছেন। পরিচয় দিন—রাখিয়া আসিতেছি। জ্যোতিঃসিংহ আক্‌বার বাদসাহের সেনানী। মোগলের নব বিজিত রাজপুত রাজ্যের প্রধান সৈনিক।"

রমণী চমকিয়া উঠিলেন। জ্যোতিঃ সিংহ! জ্যোতিঃ সিংহ! ইনিই কি সেই জ্যোতিঃ সিংহ! তাঁহার হৃদয়, ভয়ের পরিবর্ত্তে আনন্দের ক্রীড়াভূমি হইয়া উঠিল। পরিচয় দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়, ভাবিয়া বলিলেন—"বীর পুরুষ! আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ! আপনি ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন, জীবন রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু পরিচয়ে বাধা আছে। আমায় এই পর্ব্বত পথের বাহির করিয়া দিন্। নিকটেই গ্রাম আছে, শিবিকা পাইব।"

"তাহাই হউক!"

যুবক এতক্ষণ রমণীর অতুল সৌন্দর্য্যরাশিতে আত্মহারা হইয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিলেন। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন—সেই দুর্বৃত্ত নিঃশব্দে সরিয়া পড়িয়াছে। তিনি মহা বিপদে পড়িলেন। পথ ঘাট জানা নাই—কি করিয়া উপত্যকা হইতে বাহির হইবেন?

রমণী বীণাবিনিন্দিত স্বরে, সলজ্জ ভাবে, কহিলেন "চলুন! আমরা শীঘ্র বাহির হইয়া যাই। তাহারা দলে অধিক সংখ্যক। আবার অত্যাচার হইতে পারে।"

আ মরি! মরি! সে রূপের বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা করে। সেই প্রভাতকমলবৎ নিষ্কলঙ্ক মুখ, সেই সুন্দর চক্ষু—সেই মন্মথের তীব্রশরময় কটাক্ষের ক্রীড়াক্ষেত্র, আকর্ণ বিশ্রান্ত চঞ্চল চক্ষু! সেই অবেণীসম্বদ্ধ ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাশি! সেই সুগোল, সুন্দর বাহু, সেই নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব্ব দেহযষ্টি! আ মরি মরি! দেখিলে চক্ষের পলক পড়ে না। একবার দেখিলে আবার দেখিতে ইচ্ছা হয়।

বাসন্তীসমীর চুম্বিত, অর্ধফুটন্ত, অর্ধবিকশিত গোলাপের সৌন্দর্য্য দেখিয়াছ কি? হেমন্তের শিশির-স্নাত, সেফালিকার মনোরম সৌন্দর্য্য দেখিয়াছ কি? বর্ষাবিধৌত চম্পকের গৌরকান্তির ছটা মনোযোগের সহিত দেখিয়াছ কি? কৃষ্ণমেঘ পূর্ণ, বিস্তৃত আকাশে, সৌদামিনীর তীব্র রূপজ্যোতিঃ কখনও দেখিয়াছ কি? এ সব দেখিয়া তোমার মন মোহিত না হইতে পারে—কিন্তু এই রমণীকে দেখিলে, বিধাতার সৃষ্টি সৌন্দর্য্যের মাধুরীতে মুগ্ধ হইয়া তোমায় উদ্ভ্রান্ত চিত্ত হইতেই হইবে।

জানি না—সেই যুবক সৈনিক, এই অসূর্য্যম্পশ্যা মনোমোহিনীর স্থিরোজ্জ্বল কটাক্ষের অব্যর্থসন্ধানে পড়িয়াছিলেন কি না? কিন্তু নিশ্চয় বলিতে পারি, যোদ্ধৃপুরুষের প্রেমচ্ছায়াবিবর্জ্জিত হৃদয় কি জানি কেন, দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার মুখে, অত ক্লান্তির সময়েও একটা উত্তেজনা দেখা দিয়াছিল। একটু পূর্ব্বে তিনি নিঃসঙ্কোচ ভাবে এই রমণীর সহিত বাক্যালাপ করিয়াছিলেন, এখন যেন সকল কথাতেই একটা সংকোচ বোধ হইতে লাগিল।

সেই যোদ্ধৃপুরুষ দেখিলেন, অন্ধকারের কালচ্ছায়া ক্রমশঃ উপর হইতে গভীর হইয়া নামিয়া আসিতেছে। সেই উপত্যকার শ্যামলভাব অন্তর্হিত হইয়া, একটা তিমিরময় আবরণ তাহার উপর পতিত হইতেছে। তিনি সন্ত্রস্ত স্বরে বলিলেন,—"সুন্দরি! জানি না এই বন্ধুর পথ চলিতে আপনার কত কষ্ট হইবে। আপনি আমার হাত ধরুন। নিকটেই আমার অশ্ব বাঁধা আছে।"

অন্য সময় হইলে অপরিচিত যুবকের হস্ত স্পর্শ করিতে রমণী স্বীকৃত হইতেন না—কিন্তু এখন নিরুপায়।

পথ বন্ধুর, অন্ধকার হইয়া আসিতেছে, পদে পদে পদস্খলন হইবার আশঙ্কা। অগত্যা রমণী যুবকের হস্ত ধারণ করিলেন। উভয়ে সাবধানে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ক্ষুদ্রপথ—নানাবিধ ক্ষুদ্র বৃহৎ উপল খণ্ডে আকীর্ণ। দুই পার্শ্বে পর্ব্বত প্রাচীর। তাহার উপরে, নীচে, আশে পাশে ছোট, বড়, দীর্ঘ খর্ব্ব শত শত শ্যামল পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ। পথে অন্ধকার—চারিপাশে নির্জ্জনতা। আকাশে, অন্ধকারে একে একে নক্ষত্র ফুটিতেছে।

সহসা আট দশজন লোক এক রন্ধ্রপথ হইতে বাহির হইয়া তাঁহাদের পথরোধ করিল। সহসা আট দশটা মুক্তকোষ, শাণিত তরবারি তাঁহাদের চারিপার্শ্বে সেই ঘনায়িত অন্ধকারে ঝকমক করিয়া উঠিল। রাজপুত একা, তাহাতে আবার অসহায় স্ত্রীলোক সঙ্গে। অন্ধকারে এতগুলা লোক মিলিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে। যুবতীকে পশ্চাতে রাখিয়া, বিপদভঞ্জনকে স্মরণ করিয়া যুবক তরবারি হস্তে সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

আক্রমণকারীরা এবার হল্লা করিয়া উঠিল। যুবক দেখিলেন—তাহাদের মধ্যে সেই পাপিষ্টটাও রহিয়াছে। সে পলাইয়া গিয়া এই অনর্থ ঘটাইয়াছে। তিনি অসি প্রহারে সর্ব্বাগ্রেই তাহার মস্তক স্কন্ধচ্যুত করিলেন। অমনি আর সকলে একেবারে তাঁহার উপর পড়িল। দেবাসুর সমরে, কুমার কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় তিনি বীর বিক্রমে তরবারি চালনা করিতে লাগিলেন। হায়! কিন্তু তিনি একা।

যুবক যখন এরূপে বিপন্ন, তখন উপরের উপত্যকায় আর একটী ঘটনা ঘটিতেছিল। পঞ্চাশত সৈনিক সঙ্গে এক বীরপুরুষ সেই উপত্যকা অতিবাহিত করিয়া নীচে নামিতেছিলেন। নীচেকার সমস্ত ঘটনাই তিনি উপর হইতে কিছু কিছু দেখিয়াছিলেন। গম্ভীরকণ্ঠে আদেশ করিলেন—"তোমাদের মধ্যে কুড়ি জন নীচে নামিয়া গিয়া যুবককে রক্ষা কর।"

সহসা "আল্লাহো আক্‌বর" শব্দে, ভীমনাদে সেই রন্ধ্রপথ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। যুবক ভগবানকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে অসি ধরিয়া আরও দুই জনকে নিহত করিলেন।

একবারে অধিক সংখ্যক মোগলসৈন্য দেখিয়া আক্রমণকারীরা পলাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাদের পথরুদ্ধ। সেই উপত্যকা শোণিত রঞ্জিত করিয়া পাঁচ সাত জন সেই খানেই মরিল।

এক বীরোচিত সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষ আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ করিলেন—'সৈন্যগণ! ক্ষান্ত হও। আর রক্তপাতে প্রয়োজন নাই। মুষিকগুলাকে বন্দী কর।"

জ্যোতিসিংহ ইতিপূর্ব্বে স্কন্ধদেশে গুরুতর আঘাত পাইয়াছিলেন। প্রচুর শোণিতস্রাবে তাঁহার শরীর বলহীন হইয়াছিল। সেই আগন্তুক বীরপুরুষ, সেই ক্ষত স্থান উত্তরীয় দ্বারা বাঁধিয়া দিলেন। সস্নেহ স্বরে বলিলেন—"জ্যোতি! আঘাত কি গুরুতর লাগিয়াছে। তোমায় একা পাঠাইয়া আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম না। তোমার অশ্ব দেখিয়া পথের নিদর্শন পাইয়াছি। সময় মত না পৌঁছিলে আজ তোমায় হারাইতাম।"

জ্যোতিসিংহ কৃতজ্ঞতা পূর্ণস্বরে বলিলেন—"জাঁহাপনা। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আপনার করুণা ভুলিতে পারিব না।"

সেই আগন্তুক যোদ্ধৃপুরুষ, এতক্ষণ বৃক্ষান্তরালবর্ত্তী সেই ষোড়শীকে দেখেন নাই, এখন তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িল। তিনি সস্নেহে প্রশ্ন করিলেন "জ্যোতি! কে এই ষোড়শী?"

জ্যোতিসিংহ সমস্ত ঘটনা বলিলেন।

নবাগত পুরুষ এক হিন্দুসেনানীকে আদেশ করিলেন, "আহত সেনাপতিকে ও এই রমণীকে সন্ন্যাসীর কুটীরে লইয়া যাও। আমি পশ্চাতে আসিতেছি।"

সকলে সসম্ভ্রমে অবনত হইল। এই আদেশকারী আর কেহই নহেন—স্বয়ং আকবর সাহ!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পর্ণশয্যায় জ্যোতিসিংহ শায়িত। তাহার পার্শ্বে বসিয়া সেই অনিন্দ্যসুন্দরী। সুন্দরী একদৃষ্টে জ্যোতিসিংহের সংজ্ঞাহীন মলিন মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহার ক্ষত স্থানে কৃষ্ণবর্ণের প্রলেপ লাগাইয়া দিতেছেন।

সেই নির্জ্জন গুহা—অতি নির্জ্জন। মধ্যে মধ্যে কেবল পার্শ্বোপবিষ্ট সুন্দরীর সংযত শ্বাসপ্রশ্বাস শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শুনা যাইতেছিল না। সেই ষোড়শী তন্ময়চিত্তে রোগীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। অপরাহ্নে জটাজূট সমন্বিত এক সন্ন্যাসী আসিয়া গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। ধীর গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করিলেন—"মা! জ্যোতি সিংহ কেমন আছে?"

সুন্দরী রোগীর শয্যা পার্শ্ব হইতে একটু সরিয়া বসিলেন। ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন "পিতঃ! রোগীর অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল। একটু আগেই চেতনা হইয়াছিল। এখন ঘুমাইতেছেন।"

সন্ন্যাসীর সেই শ্বেত-শ্মশ্রু-আবৃত, কুঞ্চিত মুখমণ্ডলে আনন্দ প্রকাশিত হইল। তিনি উৎসাহ পূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"ভবানীর কৃপায় জ্যোতিসিংহ এ যাত্রা রক্ষা পাইল। ঔষধ ধরিয়াছে।" সন্ন্যাসী চলিয়া গেলে অলকা শয্যাশায়িত তাঁহার জীবনরক্ষক রাজপুত বীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। শত শত বার দেখিয়াও যেন দর্শনাশা মিটিল না। একবার দেখিয়া নিমেষের মধ্যে পলক না পড়িতে আবার দেখিতে ইচ্ছা হয়। অলকা ভাবিতে লাগিলেন—যেন কুমার জয়ন্ত দেবাসুরের যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া এই নির্জ্জন গুহায় বিশ্রাম করিতেছেন।

রাজপুত্রী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"ভগবান্! কেন পরীক্ষায় ফেলিলেন? কেন এ রূপবহ্নিতে ঝাঁপ দিলাম! কেন এই অননুভূত ঘটনাপুঞ্জ সৃষ্টি হইয়া ইনি আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন! যাহাকে পাইব না, পাইবার আশা নাই, তাহার জন্য এ উন্মত্ততা কেন? চৌহান ও চন্দায়ৎ চিরশত্রু। পিতা এই বীরশ্রেষ্ঠ জ্যোতি সিংহের প্রধান শত্রু। তিনিই ইহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছেন। তাঁহার অত্যাচারেই জ্যোতি সিংহ বাদসাহের সেনাপতিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। জ্যোতি আমার হইতে পারেন। কিন্তু পিতা হইতে দিবেন কেন?"

রাজকুমারী অলকার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। শয্যাশায়িত রাজপুত যুবক এবার নেত্রোন্মীলন করিলেন। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন—"কোথায় আমি? কে এ মোহময়রাজ্যে আনিয়াছে? কে তুমি দেববালা আমার শিয়রে বসিয়া?" অলকা বড় বিপদে পড়িলেন। লজ্জা আসিয়া তাঁহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। লজ্জিত হইবারই কথা। কিন্তু সন্ন্যাসীর আদেশ, যে তাহার জীবনরক্ষা করিয়াছে তাহার কাছে লজ্জা কি? অলকা কোমল অথচ কম্পিত কণ্ঠে উত্তর করিল, "আপনি চিন্তিত হইবেন না, নিরাপদ স্থানেই আছেন।"

"আপনি কে? কেন আমার শুশ্রূষা করিতেছেন?"

"আমি আপনার আশ্রয়দাতা সন্ন্যাসীর আজ্ঞাবর্ত্তিনী। আপনার সেবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছি।"

"নিযুক্ত হইয়াছেন—কে নিযুক্ত করিল?"

"সন্ন্যাসী"—

"সন্ন্যাসী—কে তিনি?"

"তিনি মহাপুরুষ!"

"তা জানি—কিন্তু আমি এখানে আসিলাম কিরূপে?"

অলকা সমস্ত ঘটনা ধীরে ধীরে বলিয়া ফেলিলেন। জ্যোতিঃ সিংহের সকল কথাই মনে পড়িল। তিনি সোৎসুকে প্রশ্ন করিলেন—"বাদসাহ কোথায়?"

'তিনি আপনার সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দিল্লী গিয়াছেন। আপনার জন্য যানবাহন নিযুক্ত হইয়াছে। আরোগ্য হইলে আপনিও যাইবেন।"

"আপনি—এ বিপদে আমার জীবনরক্ষা করিলেন। আপনার কাছে কি বলিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইব?"

অলকা এবার একটু লজ্জিতা হইলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন—"আপনিই অগ্রে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন। এ ছার জীবনের উপর আপনার পূর্ণ আধিপত্য"—আর বলা হইল না। রাজকন্যা ভাবিলেন ছি! ছি! কি প্রগল্‌ভতাই করিলাম? কি বলিয়া ফেলিলাম? জ্যোতি সিংহ করুণ কণ্ঠে—জিজ্ঞাসা করিলেন—"সুন্দরী! আপনার পরিচয় জানিতে কি কোন বাধা আছে?"

এ কথার উত্তর দিতে অলকার বুক্ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। যে জ্যোতি সিংহ তাহার পিতার জন্যই আজ ভিখারীর বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন; যাঁহার রাজ্য ছিল—ঐশ্বর্য্য ছিল—সম্ভ্রম ছিল—বীর্য্য ছিল, সেই দুর্গাধিপতি সংগ্রাম সিংহের পুত্র—জ্যোতিসিংহ আজ মোগল বাদসাহের অধীনে সামান্য সৈনিক কর্ম্মচারী। সন্ন্যাসী জ্যোতি সিংহের পূর্ব্ব পরিচয় জানেন। তিনিই অলকাকে সব বলিয়াছিলেন। পরিচয় পাওয়ার পর হইতে অলকার কৃতজ্ঞতা আরও দশগুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার সহানুভূতি বাড়িয়া প্রেমে পরিণত হইয়াছে। পিতা মাতা—পিতৃস্নেহ, সংসার, সব এক দিকে। আর এই নিভৃতগুহায় পর্ণশয্যায় শায়িত রাজপুত যুবক এক দিকে। অলকা মনে মনে ভাবিয়াছে—যদি তাহার ক্ষুদ্র প্রাণ তাঁহার গ্রহনীয় হয়—যদি তাহার তুচ্ছ শরীর তাঁহার কাজে লাগে—যদি তিনি তাহার ন্যায় দুর্ভাগিনী অবলার দান গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন, তবে হৃদয় দানেই তাহার পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

সঙ্গিনীকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া রাজপুত্র বুঝিলেন, পরিচয় দানে তাঁহার বিশেষ আপত্তি। তিনি আর কিছুই বলিলেন না। নেত্র দুটি পুনরায় নিমীলিত হইবার পূর্ব্বে তিনি বলিলেন "বড় তৃষ্ণা—"

সুবাসিত ঔষধ মিশ্রিত সরবত—সেই অনিন্দ্যসুন্দরী অলকা তাহার মুখে ঢালিয়া দিলেন। রাজপুত সৈনিক মনে মনে ভাবিলেন—দেবলোক হইতে অপ্সরা তাহার মুখে অমৃত ঢালিয়া দিতেছেন। যুবক নিদ্রিত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"মা! আমি ভবানীর আদেশ পাইয়াছি। তিনি যাহা জানাইয়াছেন তাহাই বলিতেছি। তোমাদের মিলন সুখের হইবে না। কাল সমস্ত রাত্রি গণনা করিয়া যাহা বুঝিয়াছি—তাহাতে প্রতি পদেই বিঘ্ন।"

গুহার বাহিরে এক তমালতলে দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসী অলকাকে উপরোক্ত কথাগুলি বলিতেছিলেন। আর অলকা—মলিনমুখে, অবনত বদনে, একটী শুষ্ক তমাল-পত্র ছিন্ন করিতে করিতে তাহাই শুনিতেছিল।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদের বিবৃত ঘটনার পর ৫।৭ দিন কাটিয়াছে। জ্যোতি সিংহ দিল্লীতে ফিরিয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাসী অলকার পিতা দুর্গাধিপতিকে পত্র লিখিয়া নিরুদ্বিগ্ন করিয়া তাহাকে আরও দুই এক দিন আশ্রমে রাখিয়াছেন। সেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রজ্ঞাবান সন্ন্যাসী বুঝিয়াছিলেন—অলকা ও জ্যোতিসিংহ উভয়েরই মনে ঘটনাবশে প্রেম সঞ্চার হইয়াছে। তাই জ্যোতি সিংহ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য না হইতে হইতেই তিনি তাহাকে দিল্লীতে পাঠাইয়াছেন।

অলকা ধীরে ধীরে বলিলেন—"পিতঃ, তবে কি কোন উপায়ই নাই।"

"না—মা, দৈববাযোগ দেখিতেছি। তোমাদের এখন হইতে এক বৎসর কাল দেখা শুনা নিষিদ্ধ। দেখা হইলেই বিপদ ঘটিবে। দেবের কথা কখনও মিথ্যা হয় না—জানিও মা!"

"পিতঃ, তবে আর সংসারে ফিরিব না। আপনার সেবায়, সন্ন্যাসিনী হইয়া জীবন কাটাইব।"

"আমি সন্ন্যাসী—সংসারের সহিত আমার সম্পর্ক অল্প। আমি কোথায় থাকি, কোথায় যাই, স্থির নাই। আর কেন মা আমায় মায়ায় জড়িত করিবি?"

অলকা এ কথার উত্তরে আর কিছু বলিতে পারিল না। মনে মনে ভাবিল এক বৎসর—কাটিতেই বা কত দেরী! কেন পিতা মাতার মনে কষ্ট দিই। প্রেমের স্মৃতির চিন্তায় কাল কাটাইব—জলন্তবহ্নি হৃদয়ে ধরিয়া কাল কাটাইব। তাঁহাকে পাই সুখী হইব—নতুবা পরলোকে ত আর কেহ বাধা দিবে না।

নিকটেই বাহকেরা ডুলি লইয়া বসিয়া ছিল। অলকা সন্ন্যাসীর পদ বন্দনা করিয়া ডুলিতে উঠিলেন। সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ করিলেন—"মা! ভবানীর কৃপায় তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হউক।"

যতক্ষণ দৃষ্টি চলে—ততক্ষণ সন্ন্যাসী অলকার গন্তব্য পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বোধ হইল মহর্ষি কণ্ব যেন শকুন্তলাকে বিদায় দিতেছেন। আর দেখা যায় না—দৃষ্টি পথ বনবীথিতে বদ্ধ হইয়াছে—সন্ন্যাসী নয়ন মার্জ্জনা করিয়া কুটীরে ফিরিলেন।

সন্ন্যাসী আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া গুহা মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন—"অনীতা!"

গৈরিক বসন পরিহিতা এক যুবতী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। গৈরিকে সে রূপ আরও উজ্জ্বল দেখাইতেছে। সে রূপবহ্নির তীব্রতা না থাকিলেও অনেক পুরুষপতঙ্গ তাহাতে ঝাঁপ দিতে পারে।

ভরা ভাদ্রে, দুই কূল ভরা, প্লাবিতা গঙ্গাবক্ষ অনুমান কর। তাহার অন্তরস্থ উদ্দাম খরস্রোতের প্রভাব লক্ষ্য কর। অনীতার মুখের দিকে চাহিলে সেই রূপ একটা চাঞ্চল্য ভাব দেখিতে পাইবে।

সন্ন্যাসী বলিলেন—"বৎসে! চিত্তসংযম করিতে পারিয়াছ কি?"

"না পিতঃ! লজ্জার মাথা খাইয়া আপনার কাছে বলিতেছি এখনও পারি নাই—কখনও পারিব তাহারও সম্ভাবনা নাই। আমায় অনুমতি দিন আশ্রম হইতে চলিয়া যাই। আর এ পবিত্র স্থান এ অভাগিনীর দ্বারা কলুষিত হইবে না।"

সন্ন্যাসী এরূপ উত্তরের আশা করেন নাই। তাঁহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। রুষ্ট ভাবে বলিলেন—"পাপীয়সী! নিজের অদৃষ্ট জানিতে পারিলে বোধ হয় চিত্ত দমন করিতে পারিবি। তোর অহঙ্কার চূর্ণ হইবে, ভ্রম দূর হইবে। যে অনিষ্ট প্রতিকারের জন্য আমি এত চেষ্টা করিতেছি, তাহাও হইবে।"

এক প্রান্ত ভগ্ন, কৃষ্ণকায় বন্ধুরগাত্র শিলার উপর বসিয়া সন্ন্যাসী অনীতাকে বলিতে লাগিলেন—"অনীতা—আগে জোতি সিংহের পরিচয় দিই। দুর্গাধিপতি—প্রদ্যোৎ সিংহ আমার শিষ্য। এখন সেই দুর্গ—চন্দায়ত গম্ভীরসিংহের দখলে। গম্ভীর সিংহ দাম্ভিক, অত্যাচারী, ষড়যন্ত্রী। চক্রান্তদ্বারা দিল্লীশ্বরের কাণ ভারি করিয়া প্রদ্যোৎ সিংহের হস্ত হইতে দুর্গ কাড়িয়া লয়। অভিমানে, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া প্রদ্যোৎ সিংহ নিশাযোগে ভিখারীর ন্যায় গৃহ ত্যাগ করে। আমি তখন তীর্থে গিয়াছিলাম।"

"চিত্রাবতীর শিলাময় বক্ষে—নৌকা লাগিয়া—প্রদ্যোৎ সিংহের নৌকা ডুবিয়া যায়। সেই নৌকায় একটী বালিকা ও একটী বালক ছিল। সেই বালক, প্রদ্যোতের এক মাত্র পুত্র জ্যোতিসিংহ। আর সেই বালিকা তুমি—অনীতা।"

"প্রদ্যোৎ সিংহের হস্ত হইতে যখন দুর্গ ও জায়গীর স্খলিত হয়, তখন তিনি মৃতদার। এই গোলযোগের সময় তিনি এক কুলকন্যাকে গৃহে আনেন। এই যুবতীর সম্বন্ধে রাজপুরীতে নানা কথা উঠিল। নূতন রাণীর চরিত্র সম্বন্ধে শীঘ্রই একটা কলঙ্ক রটনা হইল। বর্ত্তমান দুর্গাধিপতি গম্ভীর সিংহ, প্রদ্যোৎসিংহের প্রধান সেনাপতি। নূতন রাজ্ঞী এবং তাঁহার নামে কলঙ্ক উঠিল। এ অপবাদ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রদ্যোৎ সিংহ তাঁহার পত্নীকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিলেন।"

"ইহার পরই প্রদ্যোৎসিংহের কপাল ভাঙ্গিল। তিনি রাত্রিযোগে পলায়ন করেন। গম্ভীর সিংহের ঔরসজাত জানিয়াও, মায়াবশে তোমায় পরিত্যাগ করেন নাই। নৌকা মগ্ন হইবার পর—চিত্রাতীরবর্ত্তী শিবমন্দিরের এক সন্ন্যাসী তোমাদের উদ্ধার করেন। আমিই সেই সন্ন্যাসী।"

"আমি সন্ন্যাসী—তোমাদের লইয়া কি করিব, কিন্তু প্রদ্যোৎসিংহের মায়া ভুলিতে পারিলাম না। দিল্লীতে আকবার বাদশার কাছে প্রায়ই আমায় যাইতে হইত। সেখানে এক শ্রেষ্ঠী আমার প্রধান শিষ্য। তাহার উপর তোমাদের দুই জনেরই পালনভার দিলাম।"

"মনে আছে—এক বারুণী পূর্ণিমায় আমি দিল্লী যাই। জোতি তখন বাদশাহের অধীনে কর্ম্মে ব্রতী। নিশ্চিন্ত হইলাম। শ্রেষ্ঠী পত্নীর মুখে শুনিলাম, তোমাদের বাল্যপ্রণয়—যৌবনের ভালবাসায় পরিণত হইয়াছে।"

"মনে দুঃখ করিওনা—অনীতা! তোমার মাতার অপবাদের কথা তখনও ভুলি নাই। তোমার সহিত জ্যোতিসিংহের বিবাহ হইতে পারে না। কাজেই তোমায় পৃথক করিয়া নিজের আশ্রমে আনিয়া রাখিলাম।"

তারপর জোতিসিংহ আহত হইয়া আশ্রমে আসিলে পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও তুমি, অলকা নিদ্রিতা হইবার পর জ্যোতিসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছ। আমার আজ্ঞালঙ্ঘনে তোমার পাপ হইয়াছে। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত চিত্তদমন। তিন দিন তোমায় নিরাহারে রাখিয়াছি—মনঃস্থির করিতে বলিয়াছি—কিন্তু তাহাও পারিলে না। এখন নিজ অদৃষ্ট ভাবিয়া সাবধান হও। জোতিসিংহের সহিত তোমার মিলন যে কেন অসম্ভব তাহা এখন বুঝিলে! জ্যোতিসিংহ পিতৃমাতৃহীন—আমিই তাহার অভিভাবক। আমি না দেখিলে কে আর তাহাকে দেখিবে? দ্বাদশ ঘণ্টা চিন্তার অবসর দিলাম। কাল প্রভাতে আবার দেখা করিও।"

সেই উদাসীন—চলিয়া গেলে, অনীতা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনোভাব প্রকাশ করিল। যুক্তকরে উর্দ্ধনেত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, "প্রেমাকাঙ্ক্ষা দমন করিব কি বলিয়া? যেন এই আকাঙ্ক্ষা লইয়াই মরিতে পারি। জগতে আমার কিছুই নাই—আছে কেবল প্রেমচিন্তা। আর তুমি, হৃদয়হীন সংসার বিরাগী—উদাসীন, তুমি প্রেমের মর্ম্ম কি বুঝিবে?"

অনীতার চক্ষু দিয়া দর দর বেগে অশ্রু বহিতে লাগিল। দুই চারি ফোটা—সেই কৃষ্ণকায় পাষাণের উপর পড়িল। কিন্তু পাষণ ভিজিবে কেন?

অনীতা উঠিয়া দাঁড়াইল। অস্থির গতিতে আবার গুহার দিকে অগ্রসর হইল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল—"যদি ছাড়িতেই হয়, আর একবার সেই কমনীয় রূপজ্যোতি দেখিয়া পতঙ্গবৎ তাহাতে ঝাঁপ দিয়া জ্বলসিয়া মরিব।"

এই ঘটনার পরদিন, সন্ন্যাসী অনীতাকে খুঁজিয়া পান নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সান্ধ্যগগনে একটা ক্ষীণ লোহিত ছায়া পড়িয়াছে। মেঘের উপর মেঘ—সাদা, কাল, পাটল, হরিদ্রা, ধূসর—কত রং, কত বৈচিত্র। আর সেই এতবড় নীল আকাশের একাংশ চিত্রাবতীর নীল সলিলে ডুবিয়া পড়িতেছে।

সেই সান্ধ্যপ্রকৃতি দেখিয়া, প্রেমিকের মনে নানা কল্পনা জাগিয়া উঠিতে পারে। চিত্রাবতীর বক্ষভেদ করিয়া যে ক্ষুদ্র দুর্গ আকাশে মাথা তুলিয়াছিল—তাহার সর্ব্বোচ্চ মিনারে বসিয়া, এক ষোড়শী—প্রকৃতির ক্ষণ পরিবর্ত্তনীয় দৃশ্য দেখিতেছিলেন। তাঁহার মনে কি চিন্তা উঠিতেছিল তাহা কে বলিতে পারে?

যিনি সান্ধ্যশোভা দেখিবার জন্য মিনারের উপর উঠিয়াছিলেন—ওড়না বিছাইয়া—সেই মর্ম্মরমণ্ডিত মিনারতলে, গাত্রজ্বালার শান্তি করিতেছিলেন, তিনি দুর্গাধিপতি গম্ভীর সিংহের একমাত্র কন্যা অলকা।

দেবদর্শনে গিয়া পথিমধ্যে দস্যুহস্তে পড়িয়া অলকা কিরূপে নিগৃহীতা হন—ও কুমার জোতি সিংহ কিরূপে তাঁহাকে রক্ষা করেন, সন্ন্যাসীর যত্নে জোতিঃ সিংহের জীবন কিরূপে রক্ষা হয়, তাহার পরিচয় পাঠক পূর্ব্বেই পাইয়াছেন।

অলকা সেই নির্জ্জন মিনারে বসিয়া জোতি সিংহের কথা ভাবিতেছিলেন। চিত্রাবতীর শীতলসমীরচুম্বিত বাতাসেও তাঁহার হৃদয়ের উষ্মা বিদূরিত হইতেছিল না। পিতা—কখনই শত্রুপুত্রের হাতে কন্যা সম্প্রদান করিবেন না। জোতিসিংহও সাহস করিয়া দুর্গে আসিতে পারেন না। তবুও সন্ন্যাসীর আশ্রম হইতে আসিবার পর তিনি একবার লুকাইয়া দেখা দিয়া গিয়াছিলেন।

চিন্তাও ভাল লাগিল না। যেন অত উচ্চ মিনারে চিত্রার শীতল বাতাস পৌছাইতে পারিতেছিল না। সুন্দরী আবার অলিন্দে নামিয়া আসিলেন—এই স্বল্পশ্রমে—তাঁহার সেই রক্তকমল সদৃশ, মুখমণ্ডলে ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দুবৎ ঘর্ম্মবিন্দু জাগিয়া উঠিল। ওড়নার প্রান্ত দিয়া মুখ মুছিয়া অলকা একবার আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন—তার পর ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—"ঠিক্—এইখানে—ঠিক্ এই সময়ে তাঁর সহিত দেখা হইয়াছিল। এই প্রস্তরময় দুর্গগাত্রে রজ্জু সোপান বিলম্বিত করিয়া, এই স্থানেই তিনি আমায় দেখা দিয়াছিলেন। চন্দায়ৎ বংশের সহিত, চৌহানকুলের বংশগত শত্রুতা। পিতা আমাদের বিবাহে কখন সম্মত হইবেন না। তাহা হইলে চিত্রার এই গভীর কৃষ্ণ জলে আমার মরণই ভাল। কিন্তু আর একবার তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা হয়, আর একবার যদি তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম!"

সহসা প্রাচীরের নিম্ন স্থান হইতে কে আবেগ পূর্ণস্বরে বলিয়া উঠিল, "অলকা—আমি আসিয়াছি।"

রাজকুমারী অলকা সে স্বর শুনিবা মাত্রই বুঝিয়াছিলেন—জ্যোতি সিংহ আসিয়াছেন। সহসা রাজকুমারকে সম্মুখে দেখিয়া অধোমুখী হইলেন।

জ্যোতিসিংহ রাজকুমারীর সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—"অলকা! কতদিন আর এরূপে চোরের ন্যায় এই দুর্গে গমনাগমন করিব? সময়ে সময়ে মনে হয়, তোমার পিতার নিকট মনোভাব প্রকাশ করিয়া বলি। কিন্তু তাঁহার ঔদ্ধত্যের কথা মনে হইলে সে ভরসা হয় না। তোমার জন্মদাতা তিনি—তাই তাঁহার শত্রুতা ভুলিয়াছি, তাঁহাকে আপনার বলিয়া ভাবিতেছি। সন্ন্যাসীর নিষেধ সত্ত্বেও বিপদ গ্রাহ্য না করিয়া দুর্গে আসিতেছি। চল, অলকা! আর এ স্থানে থাকিয়া কাজ নাই। আমি তোমার জন্য মোগলের সেনাপতিত্ব ছাড়িতে প্রস্তুত। তোমায় লইয়া কুটীরে থাকিয়াও সুখী হইব। তোমায় লইয়া বিজনে নন্দন প্রতিষ্ঠা করিব।"

রাজকন্যা অলকা প্রথমে কথা কহিলেন না—পরে ধীরে ধীরে বলিলেন—"কুমার! ইহ জীবনে আমাদের সুখী হওয়া অসম্ভব! এত বাধা বিঘ্ন—জানি না কোথায় ইহার পরিণাম! তুমি আমায় যেখানে লইয়া যাইবে—সেই খানেই আমি সুখী হইব। কিন্তু আবার নূতন সর্ব্বনাশ উপস্থিত!! পিতা আমার বিবাহের দিন স্থির করিবার জন্য—সুরতান সিংহের সহিত পরামর্শ করিতে গিয়াছেন। শুনিতেছি একবারে সুরতান পুত্র দুর্জ্জয়সিংহকে সঙ্গে করিয়া আনিবেন। তুমি উদ্ধার না করিলে আমার আর অন্য কোন উপায়ই নাই। কিন্তু গোপনে পলায়নে বড় কলঙ্ক। সব সহিতে পারি, বংশের কলঙ্ক সহিতে পারি না। পলায়ন ভিন্ন কি আর কোন উপায় নাই?"

জোতি সিংহ স্থির হইয়া কি ভাবিলেন—পরে অলকার সমীরণ বিক্ষিপ্ত অলকারাজি যথা স্থানে বিন্যস্ত করিতে করিতে বলিলেন—"অন্য উপায় ত চিন্তা করিয়া দেখি নাই—আজ হইতে সপ্তাহান্তে তোমার সহিত দেখা করিব।"

"কোথায়?"

"এই দুর্গ মধ্যে।"

"এ পথে আর আসিও না। তোমার প্রথম আগমনের দিনেই সন্দেহের কারণ ঘটিয়াছিল। প্রহরীরা কয়েক দিন নদীতীরে সতর্কতার সহিত পাহারা দিয়াছিল। পিতা চলিয়া যাওয়ার পর তাহারা পাহারা শিথিল করিয়া দিয়াছে। তাই তুমি এত সহজে আসিতে পারিয়াছ।"

"তবে কি উপায়ে দুর্গে প্রবেশ করিব?"

রাজকন্যা চিন্তা করিয়া বলিলেন—"দুই এক দিনের মধ্যে উপায় বলিয়া পাঠাইব।"

জোতি সিংহ নিশ্বাস ফেলিয়া, অলকার মুখ চুম্বন করিয়া রজ্জু

বাহিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। চিত্রার তীরদেশে তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাকে বলিলেন—"সুন্দর! নৌকা লইয়া আইস!"

নৌকায় উঠিয়া জ্যোতি সিংহ চলিয়া গেলেন।

অলকা চিন্তাকুল চিত্তে, আলস্য ত্যাগ করিয়া ছাদের উপর দাঁড়াইলেন। সহসা দেখিতে পাইলেন সেই অন্ধকারে কে যেন ধীরে ধীরে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। রাজকন্যা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি?"

সম্মুখস্থ মূর্ত্তি কোন উত্তর করিল না—ধীরে ধীরে নিকটে অগ্রসর হইতে লাগিল। সহসা অন্ধকারে হাস্যধ্বনি শ্রুত হইল—রাজকন্যা ভীতা হইলেন।

মূর্ত্তি ক্রমে ক্রমে নিকটস্থ হইল। রাজকন্যার হাতখানি ধীরে ধীরে ধরিল। বলিল—"ভয় পাইও না, আমি স্ত্রীলোক।"

"কে তুমি? দুর্গ মধ্যে কি করিয়া আসিলে? তুমি স্ত্রীলোক—কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য কি?"

রমণী আবার হাসিয়া উঠিল। বলিল—"ভয় নাই, আমি তোমার শত্রু নই।"

অলকা চিন্তিতা হইলেন। নবাগতা রমণী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি সুন্দরী দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু ভালবাসার মর্ম্ম বুঝিয়াছ কি?"

"এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?"

"বলিলেই বা ক্ষতি কি?"

"তুমি কে? এ পর্যান্ত তোমার পরিচয় পাই নাই?"

"যদি না দিই—"

"প্রহরী ডাকিব।"

"আমি স্ত্রীলোক—প্রহরী আমার কি করিবে?"

অলকা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে কেন আসিয়াছ? তোমার কি চাই?"

"আমি—কি চাই—যাহা পাইবনা, যাহা পাইবার আশা নাই—যাহাকে পাইয়া হারাইয়াছি—আবার যাহা পাইব না, তাহাই চাই।"

"তোমার কথা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

রমণী বলিল, "তুমি চৌহান রাজকুমার জ্যোতিসিংহকে ভালবাস?"

অলকা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কে বলিল আমি তাঁহাকে ভালবাসি?"

রমণী হৃদয়ের আবেগে বলিয়া উঠিলেন, "আমার নিকট গোপন করিও না। তিনি এই মাত্র এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন। আমি তোমাদের সকল কথাই শুনিয়াছি। তুমি প্রতিজ্ঞা কর, তাঁহাকে ভুলিয়া যাইবে, আর তাঁহাকে দেখিবার চেষ্টা করিবে না। জ্যোতি সিংহ আমার্—বাল্যকাল হইতে আমরা একত্রে—তুমি তাঁহাকে কাড়িয়া লইতেছ, তাঁহারই জন্য পাগলিনীর মত আমি দেশে দেশে বেড়াইতেছি।"

রাজকুমারী অলকা এখন কতক বুঝিতে পারিলেন। কিয়ৎকাল তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। অবনত মস্তকে চিন্তা করিলেন। পুনর্ব্বার যখন মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিলেন, তখন কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না! রমণী যেমন সহসা আসিয়াছিল সেইরূপ সহসা অদৃশ্য হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অলকা বিষণ্নচিত্তে নিজের মহলে প্রবেশ করিলেন। একজন দাসীকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহল হইতে কোন স্ত্রীলোককে বাহির হইতে দেখিয়াছিস্?" দাসী বলিল কাহাকেও দেখিতে পায় নাই। প্রহরীদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তাহারাও কিছু বলিতে পারিল না। অপরিচিতা রমণীর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

অলকা অত্যন্ত চিন্তান্বিতা ও কিছু ভীতা হইলেন। এ রমণী কে? কি তাহার অভিপ্রায়? দুই এক দিনের মধ্যে সুরতান সিংহ আসিয়া উপস্থিত হইবেন। ইতিমধ্যে যদি জ্যোতিসিংহ সংবাদ না পান, তাহা হইলে কি হইবে?

গভীর রাত্রে বাতায়ন মুক্ত করিয়া, রাজকন্যা এক বার আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। নক্ষত্রমালিনী নীল আকাশে অন্ধকার—চিত্রার জলের উপর অন্ধকার। চারি দিক নিস্তব্ধ।

সেই গভীর রাত্রে নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া দুর্গ তোরণ হইতে ঘণ্টা নিনাদ হইল। রাজকন্যা বুঝিলেন রজনী তৃতীয় প্রহর। বাতায়ন রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিলেন। শয়ন করিয়া সেই রমণীর বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। নিদ্রিতাবস্থায় কেবল দুঃস্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

দুর্গের উত্তরাংশে যমুনাতীরে প্রস্তর মণ্ডিত কল্যাণীমন্দির। এই কল্যাণী দেবী চৌহান ও চন্দায়ৎদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। দুর্গাপতি পুরুষানুক্রমে এই প্রতিমার পূজা করিয়া আসিতেছেন।

প্রভাতকালে কৌষেয় বসন পরিধৃতা হইয়া রাজকন্যা পূজায় বসিয়াছেন। স্থির স্তিমিত, নিষ্পন্দ নিশ্চল—স্বর্ণ প্রতিমা, সেই পাষাণ প্রতিমার পদমূলে বসিয়া এক মনে দেবীর ধ্যান করিতেছেন। পূজা সাঙ্গ হইলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন।

তাহার পর আসন ত্যাগ করিয়া রাজকন্যা মন্দিরের উত্তরাংশের এক ক্ষুদ্র গৃহের দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মৃদু মৃদু করাঘাত করিলেন। দ্বার খুলিয়া গেল।

গৃহমধ্যে অজিনাসনে এক জন ভৈরবী বসিয়া রহিয়াছেন। যেন শান্তি ও বিবেক সেই ভৈরবীর মুখ মণ্ডলে চির বাসস্থান স্থাপন করিয়াছে। ভৈরবী অজিনাসনে উপবিষ্ট—পার্শ্বে সিন্দূর মণ্ডিত ত্রিশূল। নিকটে নরকপাল, শব ও ভস্ম রাশি। গলদেশে রুদ্রাক্ষ মালা, ললাটে সিন্দূর ও চন্দনের মিশ্ররেখা আর সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি।

অলকা ভক্তিভরে ভৈরবীর সম্মুখে প্রণত হইলেন। ভৈরবীর গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর হইল।

রাজকন্যা সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি দেখিলেন মা?"

ভৈরবী কোন কথা কহিলেন না কিন্তু তাঁহার ললাটে চিন্তা রেখা দেখা দিল। রাজকন্যা ইহা দেখিতে পাইলেন না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"গণনায় কি দেখিলেন!"

ভৈরবী ধীরে ধীরে কহিলেন, "বৎসে! ভবিষ্যৎ জানিয়া কি হইবে?"

অলকা কাতরস্বরে অনুনয় করিয়া আত্মভবিষ্যৎ জানিতে চাহিলেন।

ভৈরবী বলিলেন—"অলকা! তোমার ও জ্যোতিসিংহের মিলন অবশ্যম্ভাবী, গণনায় এইরূপ পাইতেছি। কিন্তু মিলনের ফল শুভ নয়। কিসে অশুভ ঘটিবে তাহা জানিতে পারি নাই। তবে—বিশেষ করিয়া দেখিয়াছি—তোমার বৈধব্যযোগ নাই।"

রাজকন্যা অলকাসুন্দরী ভৈরবীর চরণবন্দনা করিয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, সন্ন্যাসীর কথার সহিত ভৈরবীর কথার মিল নাই। জ্যোতিষের উপর তাঁহার অবিশ্বাস জন্মিল। দৈবের উপর বিশ্বাস দৃঢ় হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

চারিদিকে গভীর অন্ধকার। বনপথে সেই অন্ধকার আরও গভীর হইয়াছে। গাছের কোলের অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া—শাখার নিম্নে—পল্লবের ক্রোড়ে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সমগ্র বনভূমি নিস্তব্ধ। চারিদিকে শাল, তমাল প্রভৃতি গগণস্পর্শী বৃক্ষ সমূহ।

গাছের মাথায় মাথায়, ক্ষুদ্র বৃহৎ হীরকখণ্ডবৎ অসংখ্য জোনাকী জ্বলিতেছে। সেই অন্ধকারবেষ্টিত সমুন্নতশীর্ষ তরুরাজির গভীর পল্লবের মধ্যে দুই একটা নিশাচর পক্ষী অস্ফুট শব্দ করিতেছিল।

এই গভীর রাত্রে, এই নিস্তব্ধ বনপথে—একজন অশ্বারোহী অতি কষ্টে পথ অতিবাহন করিতেছেন। বনমধ্যে গমনাগমনে কাঠুরিয়ারা একটা সঙ্কীর্ণ পথের সৃজন করিয়াছিল এবং পরিচিত বলিয়াই সেই সাহসী যুবক অতিকষ্টে অশ্ব চালনা করিতেছিলেন।

অশ্ব এতক্ষণ কোনরূপে গমন করিতেছিল, কিন্তু কি দেখিয়া যেন সহসা ভয় পাইয়া দাঁড়াইল। অশ্বারোহী অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া দেখিলেন—সেই অন্ধকারবেষ্টিত বনপথে—অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তি।

সাহসী সৈনিক হস্তস্থিত বর্শা দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে দাঁড়াইয়া?" কে যেন তাঁহার কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিয়া বলিল, "কুমারের জয় হউক!"

অশ্বারোহী চিনিতে পারিলেন তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর কর্দ্দম সিংহ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন "এত বিলম্ব করিলে যে? আমি সঙ্কেতস্থানে, তোমার অপেক্ষায় থাকিয়া ফিরিয়া যাইতেছিলাম। মনে ভাবিয়াছিলাম তোমার চেষ্টা বিফল হইয়াছে।"

"আপনার আশীর্ব্বাদে কার্য্য সফল করিয়াছি কিন্তু অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছে।"

কুমার বলিলেন—"তবে চল। যখন বিপদকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইয়াছি—আর ফিরিব না।"

"আজই।"

"হাঁ—আজই—এই রাত্রে।"

"একটা কাজ করুন। অশ্ব এইখানে রাখিয়া যান। আমরা দুর্গের অতি নিকটে আসিয়াছি।"

"অশ্ব কোথায় রাখিব?"

"একটা বৃক্ষমূলে বন্ধন করুন। আমি ফিরিবার সময় লইয়া যাইব।"

"তাহাই হউক; কিন্তু বর্শা—তরবারি, যোদ্ধৃবেশ?"

যদি সেই অন্ধকারে কাহারও দৃষ্টিক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে সে হয়ত দেখিতে পাইত কর্দ্দমের মুখে একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কর্দ্দম মনে মনে বলিল, "প্রণয়িনী সন্দর্শনে যাইতেছেন, তরবারি ও বর্শায় কি হইবে?" প্রকাশ্যে বলিল—"বর্শাটাও রাখিয়া যান। যেরূপ বেশে আছেন তাহাতেই চলিয়া যান। তরবারি সঙ্গে থাক। শত্রুপুরী।"

যুবক ক্ষিপ্রহস্তে বৃহৎ বৃক্ষশাখায় অশ্ববল্গা বন্ধন করিলেন। ধীরপদে অগ্রসর হইয়া কর্দ্দম সিংহের প্রদর্শিত পথে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন।

বনের পার্শ্বেই ক্ষুদ্র পাহাড়। পাহাড়ের উপর দিয়া ক্ষুদ্র গিরিনদী বহিয়া যাইতেছে। এই গিরিনদীই চিত্রার সহিত মিলিয়া দুর্গের পরিখা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কর্দ্দম অতি কষ্টে পথ ঘুরিয়া এই ক্ষুদ্র নদী পার হইল।

যুবক বলিলেন "কর্দ্দম! আমরা ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে পৌছিতে পারি নাই। হয়ত তোমার কৌশল ব্যর্থ হইবে। তোমার বন্ধুর পাহারার সময় হয়ত উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।"

কর্দ্দম এ কথায় উত্তর করিল না। সেই প্রস্তর প্রাচীরবেষ্টিত ভীমকায় দুর্গের এক গুপ্ত দ্বারে গিয়া দুই চারিবার আঘাত করিল। ভিতর হইতে ঠিক সেইরূপ আঘাতশব্দ শ্রুত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই দুর্গদ্বারের একাংশ উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। কর্দ্দম সিংহ বলিল, "নিঃশব্দে প্রবেশ করুন। দুর্গমধ্যে সেই প্রহরীই আপনার পথপ্রর্শদক হইবে।"

যুবক কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন। পরে তাঁহার অনুচরের কানে কানে বলিলেন, "তুমি আমার অশ্ব লইয়া ছাউনীতে যাও। সেনাপতিকে বলিও আমার একশত বাছা সওয়ার চাই। তুমি প্রভাতের পূর্ব্বে এইখানে পৌছিতে চাও। বনের মধ্যে সেনা রাখিও।"

কর্দ্দম সিংহ প্রণত হইয়া বলিল—"যে আজ্ঞা। কিন্তু আর বিলম্ব করিবেন না।"

যুবক দুর্গে প্রবেশ করিলেন। সহসা মহাশব্দে দুর্গদ্বার বন্ধ হইয়া গেল।

সেই রাত্রে দুর্গাধিপতি, গম্ভীর সিংহও ঘটনাবশে, সুরতান সিংহ ও দুর্জ্জয় সিংহকে সঙ্গে লইয়া, অলকার বিবাহের কথা স্থির করিয়া দুর্গে ফিরিতেছিলেন।

পথে সেই বন্যবৃক্ষ শাখায় আবদ্ধ অশ্বের হ্রেষা রব তাঁহার কর্ণগোচর

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"এখনও ক্ষান্ত হও।"

"কেন অলকা, ভয় কিসের? এই দেখ অর্দ্ধেক পথ অতিবাহিত করিলাম।"

"ভীষণ শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। অর্দ্ধেক পথ এখনও রহিয়াছে। এ পথ আরও দুর্গম। শ্রান্তিতে তোমার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। আমায় এই স্থানে নামাইয়া দাও।"

জ্যোতিসিংহ কথা কহিলেন না। কহিবার অবসরও নাই—তত সামর্থ্যও নাই।

নীচে দাঁড়াইয়া দুর্গাধিপতি গম্ভীর সিংহ, সুরতান সিংহ, তাঁহার পুত্র দুর্জ্জয় সিংহ আর দুর্গাধিপতির অনুচরবর্গ। জ্যোতিঃসিংহ তাঁহাদের দিকে দৃষ্টি করিবামাত্র আবার নূতন উৎসাহ পাইলেন। অলকাকে লইয়া তিনি ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিলেন। প্রায় সমস্ত পথ অতিবাহিত করিলেন। প্রমোদবাসরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার বাহুবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িল। অলকা বন্ধনমুক্ত হইয়া দাঁড়াইলেন। জ্যোতিসিংহ মূর্চ্ছিত হইয়া সেই স্থানে পতিত হইলেন।

অলকা অত্যন্ত ভীত হইয়া জ্যোতিসিংহের পার্শ্বে বসিয়া চৈতন্যোৎপাদনের জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, জ্যোতিসিংহের মুখ দিয়া শোণিত নির্গত হইতেছে। তাঁহার আর চেতনা হইল না। বক্ষের ভিতর শোণিতস্থালী বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

অলকা যখন বুঝিতে পারিল, যে জ্যোতিসিংহ জীবিত নাই—তখন সে উন্মাদিনীর মত হইয়া উঠিল। ধূলিলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তাহার রোদন শ্রবণ করিয়া গম্ভীর সিংহ, সুরতান সিংহ, দুর্জ্জয় সিংহ প্রভৃতি উপরে উঠিয়া আসিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া অলকার আশঙ্কা হইল যে দুর্জ্জয় সিংহের সহিত বলপূর্ব্বক এইবার তাহার বিবাহ হইবে। ইহারা সকলে ষড়যন্ত্র করিয়া জ্যোতিসিংহকে প্রকারান্তরে হত্যা করিয়াছে, এখন তাহাকে তাহার পিতা দুর্জ্জয় সিংহের হস্তে সমর্পণ করিবেন। এই বিশ্বাস জন্মিবামাত্র অলকা বস্ত্র হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া আমূল আপনার হৃদয়ে বসাইয়া দিল।

গম্ভীর সিংহ চীৎকার করিয়া অলকার হস্ত ধারণ করিলেন, তাহার বক্ষ হইতে ছুরিকা টানিয়া বাহির করিলেন। ক্ষতস্থান দিয়া বেগে শোণিত প্রবাহ বাহির হইল; দেখিতে দেখিতে, হাসি মুখে, অলকা জ্যোতিসিংহের অনুবর্ত্তিনী হইল।

গম্ভীরসিংহ বিলাপ করিতেছেন এমন সময়ে—এক দীর্ঘাকার সন্ন্যাসী, একজন সৌম্যমূর্ত্তি বীরপুরুষ ও গৈরিকভূষিতা নবীনা ভৈরবী সেই প্রমোদ গৃহের দ্বারদেশে দেখা দিলেন।

সন্ন্যাসী ডাকিলেন,—

"গম্ভীর সিংহ!"

সেই সৌম্যমূর্ত্তিপুরুষ গম্ভীরকণ্ঠে ডাকিলেন—"গম্ভীরসিংহ!"

দুর্গাধিপতি শোকবিহ্বল চক্ষে তাঁহাদিগের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"এখনও ক্ষান্ত হও।"

"কেন অলকা, ভয় কিসের? এই দেখ অর্দ্ধেক পথ অতিবাহিত করিলাম।"

"ভীষণ শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। অর্দ্ধেক পথ এখনও রহিয়াছে। এ পথ আরও দুর্গম। শ্রান্তিতে তোমার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। আমায় এই স্থানে নামাইয়া দাও।"

জ্যোতিসিংহ কথা কহিলেন না। কহিবার অবসরও নাই—তত সামর্থ্যও নাই।

নীচে দাঁড়াইয়া দুর্গাধিপতি গম্ভীর সিংহ, সুরতান সিংহ, তাঁহার পুত্র দুর্জ্জয় সিংহ আর দুর্গাধিপতির অনুচরবর্গ। জ্যোতিঃসিংহ তাঁহাদের দিকে দৃষ্টি করিবামাত্র আবার নূতন উৎসাহ পাইলেন। অলকাকে লইয়া তিনি ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিলেন। প্রায় সমস্ত পথ অতিবাহিত করিলেন। প্রমোদবাসরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার বাহুবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িল। অলকা বন্ধনমুক্ত হইয়া দাঁড়াইলেন। জ্যোতিসিংহ মূর্চ্ছিত হইয়া সেই স্থানে পতিত হইলেন।

অলকা অত্যন্ত ভীত হইয়া জ্যোতিসিংহের পার্শ্বে বসিয়া চৈতন্যোৎপাদনের জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, জ্যোতিসিংহের মুখ দিয়া শোণিত নির্গত হইতেছে। তাঁহার আর চেতনা হইল না। বক্ষের ভিতর শোণিতস্থালী বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

অলকা যখন বুঝিতে পারিল, যে জ্যোতিসিংহ জীবিত নাই—তখন সে উন্মাদিনীর মত হইয়া উঠিল। ধূলিলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তাহার রোদন শ্রবণ করিয়া গম্ভীর সিংহ, সুরতান সিংহ, দুর্জ্জয় সিংহ প্রভৃতি উপরে উঠিয়া আসিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া অলকার আশঙ্কা হইল যে দুর্জ্জয় সিংহের সহিত বলপূর্ব্বক এইবার তাহার বিবাহ হইবে। ইহারা সকলে ষড়যন্ত্র করিয়া জ্যোতিসিংহকে প্রকারান্তরে হত্যা করিয়াছে, এখন তাহাকে তাহার পিতা দুর্জ্জয় সিংহের হস্তে সমর্পণ করিবেন। এই বিশ্বাস জন্মিবামাত্র অলকা বস্ত্র হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া আমূল আপনার হৃদয়ে বসাইয়া দিল।

গম্ভীর সিংহ চীৎকার করিয়া অলকার হস্ত ধারণ করিলেন, তাহার বক্ষ হইতে ছুরিকা টানিয়া বাহির করিলেন। ক্ষতস্থান দিয়া বেগে শোণিত প্রবাহ বাহির হইল; দেখিতে দেখিতে, হাসি মুখে, অলকা জ্যোতিসিংহের অনুবর্ত্তিনী হইল।

গম্ভীরসিংহ বিলাপ করিতেছেন এমন সময়ে—এক দীর্ঘাকার সন্ন্যাসী, একজন সৌম্যমূর্ত্তি বীরপুরুষ ও গৈরিকভূষিতা নবীনা ভৈরবী সেই প্রমোদ গৃহের দ্বারদেশে দেখা দিলেন।

সন্ন্যাসী ডাকিলেন,—

"গম্ভীর সিংহ!"

সেই সৌম্যমূর্ত্তিপুরুষ গম্ভীরকণ্ঠে ডাকিলেন—"গম্ভীরসিংহ!"

দুর্গাধিপতি শোকবিহ্বল চক্ষে তাঁহাদিগের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন।

সেই সৌম্যমূর্ত্তি বীরপুরুষ বলিলেন—"দুর্গাধিপতি! জ্যোতিসিংহ কোথায়!

দুর্গাধিপতি নতজানু হইয়া কহিলেন, "জাঁহাপনা। এই জ্যোতি সিংহ, এই আমার কন্যা অলকা, আমার একমাত্র সন্তান।"

আকবার সাহ সেই স্থির যুগলমূর্ত্তি দেখিয়া অশ্রুরোধ করিতে পারিলেন না। কম্পিতকণ্ঠে সন্ন্যাসীকে বলিলেন—"অনীতা যখন আমাদের সংবাদ দিয়াছিল তখন আসিলে বোধ হয় সেনাপতিকে রক্ষা করিতে পারিতাম।"

বাদশাহ ফিরিয়া ডাকিলেন, "আসফ খাঁ!"

"জাঁহাপনা!"

"ইহাদিগকে বন্দী কর। আগ্রার অন্ধকার কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখ। আমি ফিরিয়া ইহাদের বিচার করিব। এই দুর্গ ভাঙ্গিয়া তাহার ইষ্টক প্রস্তর লইয়া এখানে মন্দির নির্ম্মাণ করাইতে আজ্ঞা দাও। দুর্গাধিপতির ও এই সুরতান সিংহের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া জ্যোতিসিংহের ও এই অলকাসুন্দরীর সুবর্ণমূর্ত্তি গঠিত হইবে। মন্দিরে সেই দুই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

গম্ভীর সিংহ, সুরতান সিংহ, ও দুর্জ্জয় সিংহ মোগল সেনাপতির হস্তে বন্দী হইলেন।

ভৈরবী বেশে, নিস্পন্দ প্রস্তর মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া অনীতা সমস্ত দেখিল। দেখিল জ্যোতিসিংহ অলকারই বটে, তাহার নহে। দেখিল, এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া দুই জনে স্বর্গে একত্র ভ্রমণ করিতেছে। লোকলোকান্তরে, জ্যোতির্ম্ময় রূপে—হাস্যমুখে জ্যোতিসিংহ ও অলকা বিচরণ করিতেছে। আর দেখিল নীচে চিত্রার কালো জল—বড় শীতল, বড় বেগবতী, জুড়াইবার আর এমন স্থান নাই। আবার অলকার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল—মনে হইল যেন সে তাহার দিকে ফিরিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে, যেন বলিতেছে, "দেখ আমারই জিত—জ্যোতিসিংহ আমার, আমার—আমার, জন্ম জন্মান্তরে, অনন্তকালের তরে আমার!" নীচে চঞ্চল চিত্রা, ফেনময় অঙ্গুলি দিয়া ডাকিতে লাগিল, "আর কত দিন এমন করিয়া জ্বলিবি? আয়! আমার কাছে আয়, সকল জ্বালা জুড়াইবি।" দেখিতে দেখিতে অনীতা চিত্রা গর্ভে পতিত হইল। একবার ভাসিয়া উঠিল, তাহার পর ডুবিয়া গেল।

অলকা মন্দিরের ভগ্নাবশিষ্ট এখন অরণ্য সমাকীর্ণ, ভয়াবহ স্থান।

সম্পাদকের বিদায় গ্রহণ।

আমি কলিকাতা হইতে দূরে থাকি। আমার ক্ষমতা এবং অবসরও অল্প। এইজন্য আমি ভাল করিয়া "প্রদীপ" সম্পাদন করিতে পারিতেছিলাম না। অন্যান্য কয়েকটি কারণেও এ কার্য্যে আমার আর উৎসাহ নাই। তজ্জন্য "প্রদীপে"র সম্পাদকতা ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলাম।

যে প্রথিতনামা লেখক ও বিচক্ষণ সম্পাদক এক্ষণে ইহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিলেন, আমি আপনাকে কিয়ৎ পরিমাণেও তাঁহার সহিত তুলনার যোগ্য মনে করিতে পারিলে আত্মশ্লাঘা অনুভব করিতে পারিতাম। কিন্তু তাঁহার যোগ্যতা আমার ঈপ্সিত হইলেও দুর্লভ। আমি বিশ্বাস করি, তাঁহার তত্ত্বাবধানে "প্রদীপে"র উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে।

যাঁহারা এতদিন "প্রদীপ"কে স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগকে অভিবাদনপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিতেছি। ইতি

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

এলাহাবাদ। ফাল্গুন, ১৩০৬।

এই সংখ্যা প্রদীপের সর্ব্বাগ্রে এই কয়েকটী কথা সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত ছিল। রামানন্দ বাবুর পত্র আসিতে বিলম্ব হওয়ায় এই স্থলে প্রকাশিত হইল। প্রদীপ সম্পাদক।

নল সংক্রান্তি।

গত আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যার প্রদীপে যাঁহারা "গার্সিব্রত" পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে তদতিরিক্ত আরও কিছু জানাইবার জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিত হইল। যেমন ফরিদপুর ও নদীয়া জেলায় গার্সিব্রত, তেমনি মেদিনীপুর জেলায় 'নলসংক্রান্তি'। ইহাও আশ্বিন সংক্রান্তির সময় অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু গার্সি হইতে একটু ভিন্ন রকমের।

সংক্রান্তির দিন এখানে মাসের প্রথম দিন বলিয়া গণনা করা হয়, অর্থাৎ পঞ্জিকায় যে দিনকে মাসের প্রথম দিন ধরা হইয়াছে, এতদঞ্চলে তাহা দুই দিন, সুতরাং এবৎসর ত্রিশে আশ্বিন সোমবারই এখানে পহেলা কার্ত্তিক। বৎসর গণনাতেও সমুদায় বঙ্গদেশ হইতে একটু পার্থক্য আছে,—সমুদায় বঙ্গে বৈশাখের প্রথম হইতে বৎসর গণনা করা হয়, এ অঞ্চলে ভাদ্রের শুক্লা দ্বাদশীর (বামন বা শ্রাবণ দ্বাদশীর) দিন হইতে বৎসর আরম্ভ। এজন্য কোন বৎসর ভাদ্র মাস কোন বৎসর আশ্বিন মাস হইতে বৎসর গণনা করা হয়। এ বৎসর একত্রিশে ভাদ্র হইতে বৎসর আরম্ভ হইয়াছে।

আশ্বিন সংক্রান্তির দুই তিন দিন পূর্ব্ব হইতে এ অঞ্চলের সমুদয় হিন্দুজাতি 'নল'গাছ সংগ্রহ করিয়া রাখে, ঠিক পূর্ব্ব দিবস সন্ধ্যায় উহার স্কন্ধদেশে, বটপত্রের মধ্যে এক টুকরা পাকাটী, হলুদ, নিমের পাতা, কেঁউ (বৃক্ষ বিশেষের) পাতা, সুক্তা, সরিষা ও তণ্ডুলকণা প্রভৃতি কয়েকটী জিনিস একত্রে পুঁটলি করিয়া বাঁধিয়া দেয়। এইরূপ পঁচিশ ত্রিশ গাছি নল একত্রে বাঁধিয়া রাখে, এদিকে গৃহিণীগণ বড়ই ব্যস্ত, দিনের বেলা আহারের পরই ঢেঁকিশালায় গমন করেন, সেখান হইতে চাউল চূর্ণ করিয়া আনিতে অতি অল্প বেলা থাকে। (চাউল চূর্ণকে চলিত কথায় গুঁড়ি বলে।) ইহার পর তাঁহারা ৪।৫টা নারিকেল লইয়া বসিয়া যান। নারিকেলগুলি ভাঙ্গিয়া কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া রাখেন, এবং স্বতন্ত্র ভাবে আদার কুচিও রাখা হয়, ইহার পর একটা বড় রকম ঝুড়িতে গোটা দুই বুড়ো শশা, ওল, খণ্ড খণ্ড বাঁশ কঞ্চি, পুঁই ডগা, পত্রহীন খণ্ড খণ্ড শশা লতা (গুল্ম) নিমকাঠী, কাঁচা হলুদ, কাঁচা তেঁতুল প্রভৃতি সাজাইয়া রাখেন।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতে লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর নিকট শঙ্খধ্বনি করিয়া শীঘ্র শীঘ্র রন্ধন শালায় গমন করেন, জলপূর্ণ বড় রকম একটা কড়া উনানের উপর চড়াইয়া দিয়া চাউল গুঁড়ি দিতে দিতে আলোড়ন করেন, সমুদয় গুঁড়িগুলি দেওয়া হইলে আদার কুচি, নারিকেল কুচি, গুড় ও গরম মসলা দিয়া পূর্ব্ববৎ আলোড়ন করিতে থাকেন, যখন উহা বেশ ঘন হইয়া আইসে তখন নামান হয়। একটু পূর্ব্ব হইতে অন্য একটী কড়ায় কলাপাতা বিছান হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত চাউল গুঁড়ি ও গুড় প্রভৃতি মিশ্রিত পদার্থ উহাতে তুলিয়া দিয়া উহার উপর ২।৩ খানা পাতা উত্তমরূপে ঢাকিয়া দিতে হয়। সর্ব্বোপরি সুতপ্ত অঙ্গার চাপাইয়া এমন ভাবে ঘুঁটে দেওয়া হয় যাহাতে সমস্ত রাত্রি আগুন থাকে। রাত্রির মত উহাকে সুরক্ষিত ভাবে রাখা হয়। ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানের ন্যায় এ অঞ্চলেও সর্পাদির মন্ত্রবিদ্‌গণের মন্ত্র আবৃত্তির প্রথা আছে।

সংক্রান্তির দিন রাত্রি ঘণ্টাখানেক থাকিতে সমুদয় পল্লী জাগিয়া উঠে। পুরুষগণ গুচ্ছবদ্ধ নলগাছি ও সজ্জীভূত ঝুড়িগুলি লইয়া পুকুরের জলে ডুবাইয়া একটু পরে তুলিয়া আনেন; পুকুরের জল তখন 'ডাকজল' বলিয়া কথিত হয়। ঐ জলে মৃত বৃক্ষ মুঞ্জরে, রুগ্ন ও দুর্ব্বল শরীরকে সুস্থ ও সবল করে! এইরূপই বিশ্বাস। সুতরাং গৃহিণী হইতে অল্পবয়স্ক বালক বালিকা পর্য্যন্ত তৈল মর্দ্দনান্তে উক্ত 'ডাকের জলে' স্নান করিবার জন্য দলে দলে গমন করেন। বালক বালিকার আনন্দময় কোলাহলে, কামিনীগণের কঙ্কণ ও মলের শব্দে সমুদয় পথ ঘাট মুখরিত হইয়া উঠে। 'নোলক নাকে, কল্‌সী কাঁখে', কামিনীগণ চিরাভ্যস্ত সাময়িক পরনিন্দা সমালোচনা ভুলিয়া মুখরোচক রহস্যালাপ করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া যান। কারণ আজ সংক্রান্তি কাহারও সঙ্গে বিবাদ বা কাহাকেও মনোবেদনা দিতে নাই, তাহা হইলে গোটা মাসটা কলহ বিবাদে যাইবে।

অরুণোদয়ের একটু পূর্ব্বে সেই নল এক এক গাছি প্রত্যেক দেবালয়ে, অশ্বত্থ বৃক্ষে, বাগানে বাগিচায়, বিশেষতঃ ধান্য ক্ষেত্রে, স্নানের ঘাটে, সর্ব্বশেষে ঘরের চালে দিয়া পুরুষগণ স্নান করিতে প্রস্তুত হন। বেলা দেড় ঘণ্টা পর্য্যন্ত স্নান করিবার প্রথা, কারণ তদতিরিক্ত বেলায় আর 'ডাকের জল' থাকে না। ধান্যক্ষেত্রে নল গাছি দেওয়ার সময় নলের স্কন্ধদেশে পুঁট্‌লি বদ্ধ দ্রব্যের এক একটীর নাম উল্লেখ করিয়া সেই সেই নামের শেষ অক্ষরের সহিত মিল রাখিয়া প্রচলিত কয়েকটী ছড়া মন্ত্র রূপে ব্যবহৃত হয়। যথা—'এতে আছে কেঁউ, ধান ফলে বেঁউ বেঁউ'; (অর্থাৎ এক এক বাহু, এস্থলে ধান্য শীর্ষগুলিই বোধ হয় লক্ষ্য)। 'এতে আছে সুক্তা, ধান ফলো মুক্তা,' 'এতে আছে পেকাটী, যত শনির মাথা কাটী,' 'এতে আছে নিম, নল দিতে এল ভীম,' 'নল পড়্‌ল ভুঁয়ে, যা শনি তুই উত্তর মুয়ে' (মুখে), ইত্যাদি। এতগুলি উপরোধ অনুরোধে ধানগুলি ক্ষমতার অতিরিক্ত বর্দ্ধিত ও মুক্তার মত হয় কি না এবং ভয় পাইয়া শনি উত্তর মুখে পলাইয়া যায় কি না তাহা জানি না। নল দেওয়ার উদ্দেশ্য কি তাহাও এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই! তবে কিনা এখন বৈজ্ঞানিক যুগ, সুতরাং কোন কোন অতিবৈজ্ঞানিক একটা যুক্তি খাড়া করিয়াছেন যে নলের স্কন্ধদেশস্থ তিক্ত দ্রব্যের পুঁট্‌লি দ্বারা ক্ষেত্রস্থ শস্যনষ্টকারী কীট নষ্ট হয়। ইহা কত দুর সত্য তাহা বিজ্ঞানবিদ্ পাঠকগণই বিচার করুন, আমরা এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ, সুতরাং মতামত প্রকাশ করিতে অক্ষম।

মুসলমানগণ এ উৎসবে প্রায়ই যোগ দেয় না, তবে কোন কোন স্থলের কোন কোন মুসলমান একগাছি মোটা লাঠি লইয়া "হিন্দুর যা বোল আমাদের তা' বোল্, ধান ফোল্ ফোল্" বলিতে বলিতে ক্ষেত্রের আইলে দুই তিন বার আঘাত করে মাত্র।

সূর্য্যোদয়ের পরেই কর্ত্রী ঠাকুরাণী ভিজে চুল এলাইয়া দিয়া যত্নরক্ষিত কটাহটী বাহির করিয়া আনেন; উহার মধ্যস্থ তণ্ডুল চূর্ণাদির মিশ্রিত পদার্থকে 'দগ্ধ পিষ্টক' বলে। ইহার পর উক্ত পিষ্টকের উপরিস্থ ছাই ভস্মাদি অতি সন্তর্পণে (কারণ পিষ্টকে পড়িয়া যাইবার খুব সম্ভাবনা থাকে,) দূরে নিক্ষেপ করিয়া শাণিত বঁটির দ্বারা বরফির আকারে কর্ত্তন করিতে বসিয়া যান; অল্পবয়স্ক বালক বালিকাগণ চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া বসিয়া লোলুপ ও ঔৎসুক্য পূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার হস্ত সঞ্চালনের ক্ষিপ্রকারিতা দর্শন করিতে থাকে। বধূ ঠাকুরাণী শিল নোড়া লইয়া সেই অতি শৈশবের ঔষধ 'বুরা ঘষা' (প্রচলিত ভাষায় আলাই) 'ডাকের জল' দিয়া পেষণ করিয়া এক টুক্‌রা কলাপাতে রাখেন; গৃহিণীর আদেশে বালক বালিকাগণ তাহার একটু একটু খাইয়া এক এক বাটী পিষ্টক লইয়া মহানন্দে বসিয়া যায়। গৃহিণী বরফের আকারে পরিণত পিষ্টকের অধিকাংশ ভাগ বয়স্ক মেয়ে, পুরুষ, আগন্তুক ও নিমন্ত্রিত পড়সী এবং প্রার্থীদের জন্য রাখিয়া দেন। সমুদয় আঙ্গিনাটা যখন রোদে ভরিয়া যায় তখন পুরুষগণ স্নান করিয়া আসেন। তাঁহাদিগকেও পূর্ব্বোক্ত আলাই ভক্ষণের পর পিষ্টক আহার করিতে হয়। খানিক দুগ্ধ ও অতাল্প গুড় ইহাই মাত্র পিষ্টকের উপকরণ। কিন্তু তাহাই অতি আগ্রহে এবং আনন্দে নিমন্ত্রিতদের সহিত একত্রে তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া থাকেন। ইহার কিছু পরে গ্রামস্থ হাড়ি, ধোপা, তাঁতি, ধীবর প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোক আসিয়া উপস্থিত হয়, গৃহিণী তাহাদিগকে প্রফুল্লমুখে যত্নের সহিত প্রচুর পরিমাণে পিষ্টক দিয়া সন্তুষ্ট করেন। যাহারা সম্বৎসরকাল পল্লীগ্রামে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যোগাইয়া আসিয়াছে, তাহারাও ইহার কিছু প্রত্যাশা রাখে। গৃহিণী তাহাদিগকেও ডাকাইয়া আনিয়া তৃপ্তির সহিত আহার করান। ফলতঃ গৃহিণীর আদরযত্নস্নেহপূর্ণ শিষ্টাচারে পিষ্টককে মুখরোচক করিয়া তুলে।

অদ্যকার আহারে নূতন কলায়ের দাল ও মিশ্রিত সপ্তবিধ শাক ভাজা অতীব আবশ্যকীয় উপকরণ, এইগুলি সংগ্রহের জন্য দলে দলে বালক বালিকাগণ বহির্গত হয়। প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে কলায়ের শুঁটি, সরবৎ (সুগন্ধ যুক্ত এক প্রকার পত্র, ইহা দেখিতে ঠিক শরকঞ্চের পাতার ন্যায়; পত্রগুলি মসলারূপে কলায়ের দা'লে ব্যবহৃত হয়) ও সপ্তবিধ শাক সংগ্রহ করিয়া আনে।

ইহার পর আর বেশী কিছু উল্লেখযোগ্য নাই, পূর্ব্বোক্ত 'ডাকের জলে' রন্ধন, কলায়ের দাল, সপ্তশাক ভাজা, ওলের অম্বল আহার করা প্রচলিত প্রথা।

বলা বাহুল্য ফরিদপুর প্রভৃতি জেলার ন্যায় 'পোকা মাকড় দূরে যায়' প্রভৃতি ছড়া, গাছ প্রভৃতি জাগান ও ব্রতাদি করিবার প্রথা প্রচলিত নাই, কুলা ও কাঠি লইয়া শব্দ করিবার প্রথা এ অঞ্চলে এ সময় নাই। তাহা "শ্যামা পূজার" সময় (দীপান্বিতা অমাবস্যায়) অনুষ্ঠিত হয়। এ অঞ্চলেও উহা তখন মশকাদি তাড়নে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আশ্বিন সংক্রান্তি, ক্ষেত্রাদিতে নল দেওয়ার জন্য নল সংক্রান্তি বলিয়া এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ।

শ্রীতারকনাথ দাস।

দ্বন্দ্ব।

কৈশোরে বার্দ্ধক্যে, হাসিতে অশ্রুতে,
জীবনে মরণে, বন্ধনে মুক্তিতে হে!
আলোকে আঁধারে, নগরে বিজনে,
আকাশে পাতালে, গিরিতে গভীরে হে;
ভোগেতে যোগেতে, নীরোগে ব্যাধিতে,
নশ্বরে নিত্যেতে, নিকটে সুদূরে হে;
দরিদ্রে সম্রাটে, সরলে শঠেতে,
মালাতে কৃপাণে, কোমলে কঠোরে হে;
মূর্ত্তিতে অমূর্ত্তে, সাধনে সিদ্ধিতে,
জাগ্রতে নিদ্রিতে, সত্যেতে অলীকে হে;
কুসুমে কীটেতে, লালসে বিরাগে,
প্রাসাদে কুটীরে, স্বরগে নরকে হে;
মায়াতে মোক্ষেতে, নীরবে প্রণবে,
সৃজনে প্রলয়ে, তুমিই নির্দ্বন্দ্ব হে!

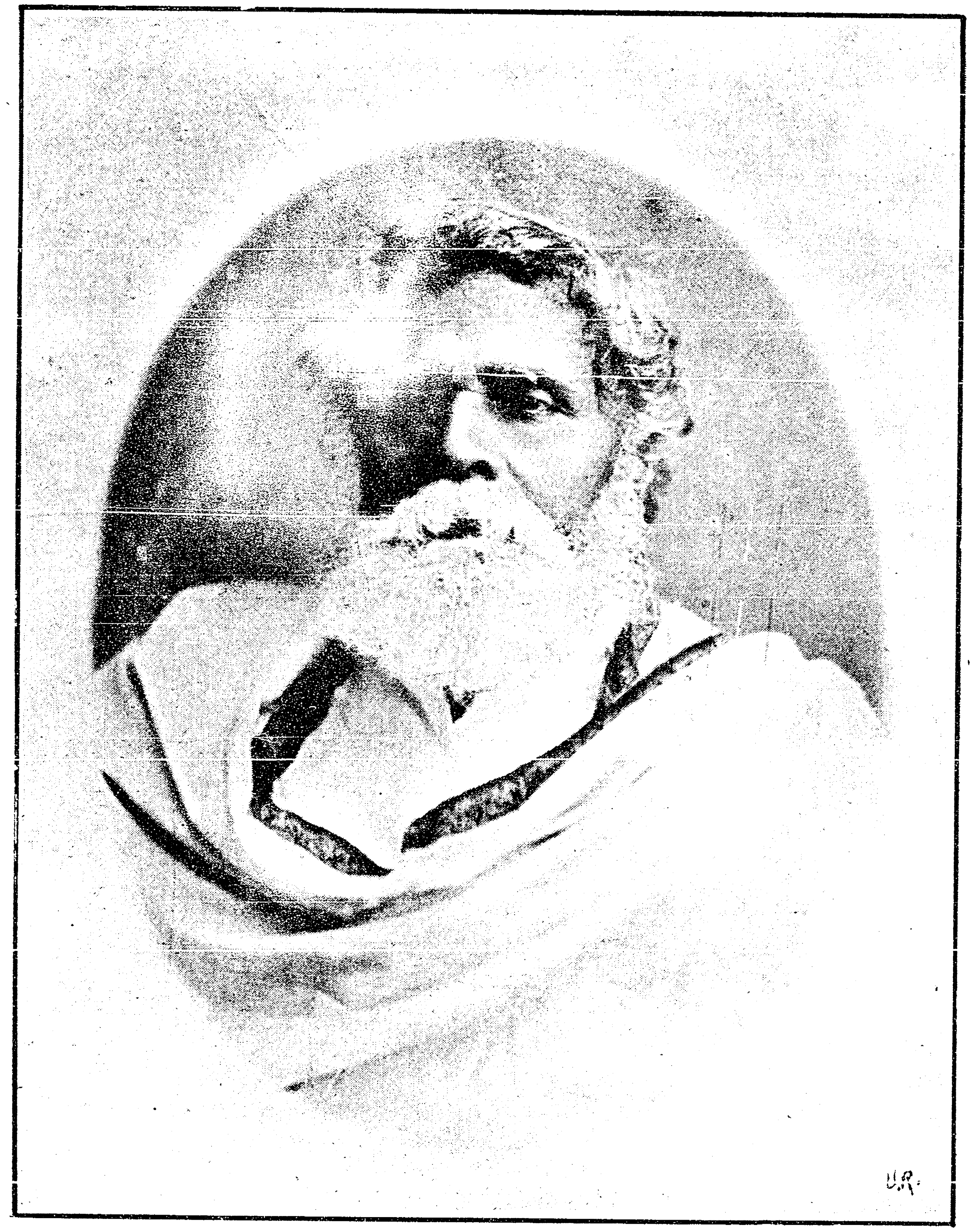

স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু।

KUNTALINE PRESS. CALCUTTA.

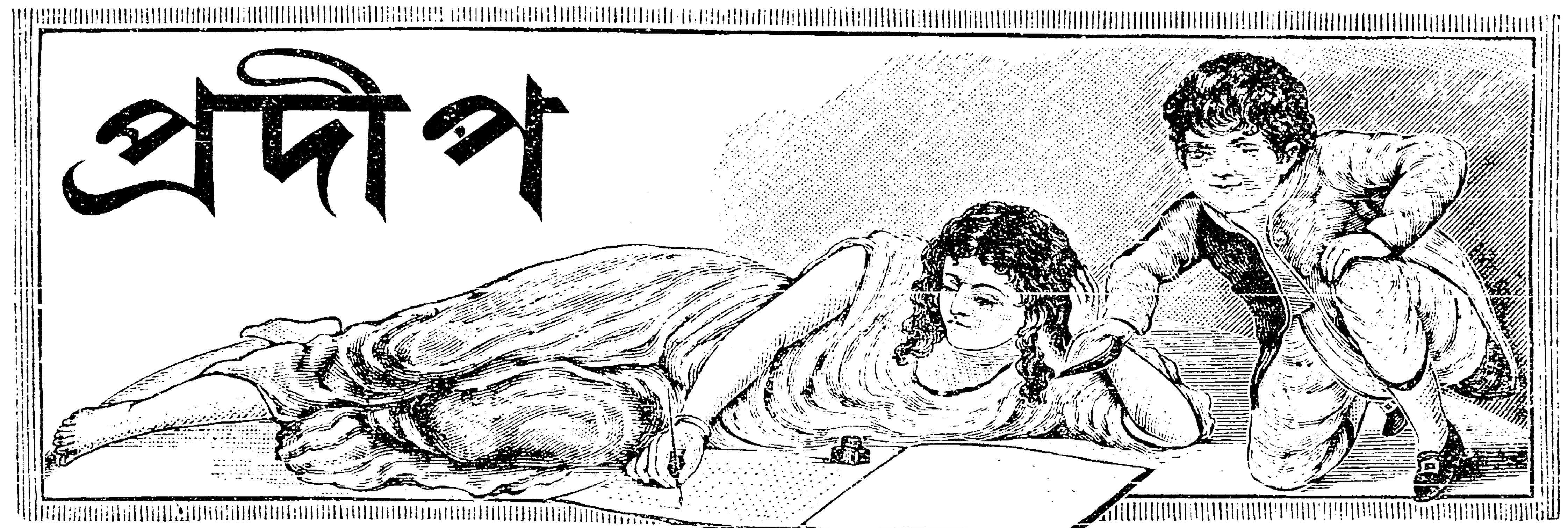

তৃতীয় ভাগ। | চৈত্র, ১৩০৬। | ৪র্থ সংখ্যা।

স্বর্গীয় মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু।

স্বর্গগত সুপ্রসিদ্ধ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বিষয়ে প্রদীপের পাঠকবর্গকে কয়েকটি কথা বলিব। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বঙ্গ ভূমিতে যে কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে রাজনারায়ণ বাবু একজন। রাজনারায়ণ বাবু অতি মহৎ প্রকৃতির লোক ছিলেন।

১৭৮৪ শকের ২৩শে ভাদ্র, ইংরেজী ১৮২৬ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর, কলিকাতার দক্ষিণ বোড়াল গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম নন্দকিশোর বসু। তিনি একজন ধর্ম্মানুরক্ত সাধুলোক ছিলেন। তিনি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের একজন শিষ্য ছিলেন। নন্দকিশোর বসু মহাশয় দয়ালু লোক ছিলেন। পরোপকারে সর্ব্বদা রত থাকিতেন। দুঃখী লোকের সেবায় আনন্দলাভ করিতেন। তিনি যে চাকুরি করিতেন তাহাতে উৎকোচ গ্রহণ করিলে তিনি প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিতে পারিতেন, কিন্তু কখনও এক পয়সা উৎকোচ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর সময় দেখা গেল, যে একমাসের বেতন ভিন্ন তাঁহার আর কিছুই নাই। লোকে তাঁহাকে বলিল, আপনার এই বৃহৎ পরিবারের কি করিয়া চলিবে? তিনি পুত্রকে দেখাইয়া বলিলেন, "রাজনারায়ণ রহিল!" প্রকৃত সাধুর ন্যায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। মৃত্যুকালে তিনি একজনকে শাঙ্করভাষ্য পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতে বলিলেন এবং ওঁকার জপ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিলেন।

রাজনারায়ণ বাবু বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাসে অতিশয় অনুরাগী ছিলেন। বাটীর সম্মুখের পথ দিয়া কোন তামাসা যাইতেছে দেখিলে, তাঁহার জননী তাঁহাকে বলিতেন "রাজনারায়ণ! একবার দেখ্ না।" তিনি উত্তর করিতেন, "ওসব দেখিয়া কি হইবে, মা!" তিনি ষোড়শ বৎসর বয়সে হিন্দুকলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহা ব্যতীত তাঁহার পিতা, বাটীতে মুন্‌সি নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে রীতিমত পারস্য ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দিয়াছিলেন।

কোন সময়ে তিনি 'Travels of Cyrus' নামক একখানি গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন। উক্ত গ্রন্থের কোন স্থানে এইরূপ ছিল যে, মিসরদেশীয় পুরোহিতগণ সাইরস রাজাকে বুঝাইতেছেন যে, মিসরদেশীয় দেবদেবীর উপাখ্যান সকল রূপক মাত্র। তখন তাঁহার মনে হইল যে, হিন্দু পুরাণ সকলও রূপক মাত্র।

রাজনারায়ণ বসু মহাশয় প্রথমে সংশয়বাদী ছিলেন। পরে ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী হন ও ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়া তিনি ঈশা, কেন, কঠ, প্রভৃতি পাঁচখানি উপনিষদ্ ইংরেজীতে অনুবাদ

করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বাবু ইংরেজীতে সুপণ্ডিত ছিলেন। প্রথমে তিনি বাঙ্গালা লিখিতেন না। মনে করিতেন, তিনি বাঙ্গালা লিখিতে জানেন না। যাহা হউক, একদিন তিনি একটি বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট লইয়া গেলেন। কিন্তু লজ্জাবশতঃ সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহাকে উহা দেখাইতে পারিলেন না। তাঁহার তাকিয়ার নীচে প্রবন্ধটি রাখিয়া বাসায় চলিয়া গেলেন। পরদিবস, দেবেন্দ্র বাবুর নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহার প্রবন্ধের অতিশয় প্রশংসা করিলেন। দেবেন্দ্র বাবুর নিকট উৎসাহ পাইয়া তিনি বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

সাংসারিক বিষয়ে স্বভাবতঃ রাজনারায়ণ বাবুর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না। ধনবান্ হইব, উচ্চপদ লাভ করিব, এরূপ ভাব তাঁহার কখনই ছিল না। তৎকালীন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হ্যালিডে সাহেব তাঁহাকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম দিতে চাহিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বাবু উহা অস্বীকার করিয়া বলিলেন, "আমি স্কুল মাষ্টার হইতে চাই।"

১৮৫১ সালে, তিনি মেদিনীপুর গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া তথায় গমন করেন। তিনি দীর্ঘকাল মেদিনীপুরে ছিলেন এবং অশেষ প্রকারে উক্ত স্থানের উপকার করিয়াছিলেন। মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার পূর্ব্বে ছিল বটে, কিন্তু তাহা একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছিল। তিনি উহা পুনঃ সংস্থাপন করিলেন। অনেক টাকা সংগ্রহ করিয়া মেদিনীপুরে একটি ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ব্রাহ্মসমাজে সপ্তাহে সপ্তাহে তিনি যে সকল উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন, তাহাতে বিশেষ উপকার হইতে লাগিল। অনেক লোক ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। কত লোকে মাতাল হইয়া অসচ্চরিত্র হইয়া অধঃপাতে যাইত, কিন্তু রাজনারায়ণ বাবুর প্রভাবে তাহারা ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে কেহ বা ধর্ম্মোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া ধর্ম্মপ্রচার ব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন।

রাজনারায়ণ বাবু দ্বারা মেদিনীপুরে একটি ধর্ম্মান্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। স্বর্গীয় রাধাকান্ত দেব মহাশয়ের পৌত্র কুমার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব মহাশয় সে সময়ে মেদিনীপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এক দিবস সন্ধ্যার সময় তাঁহার বাসায় উপাসনা ও সঙ্গীত হইতেছিল। সকলে উহাতে এতই নিমগ্ন হইয়া গেলেন যে, সমস্ত রাত্রি সঙ্গীত ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গ চলিল। প্রভাত হইলে তাঁহাদের সে ভাবের বিরাম হইল না। তাঁহারা তখন নিকটবর্ত্তী গোপগিরিতে গিয়া ব্রহ্মোপাসনায় নিযুক্ত হইলেন। সমস্ত দিন উপাসনা, ধ্যান ও সঙ্গীত চলিল। সন্ধ্যার সময় মেদিনীপুরের তৎকালীন সদর আলা শ্রীযুক্ত বাবু অভয়কুমার দত্ত মহাশয়ের নিমন্ত্রণে তাঁহার বাসায় গিয়া আবার তথায় উপাসনা আরম্ভ হইল। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত উহা চলিল। এইরূপে ত্রিশ ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়া সকলে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন!

রাজনারায়ণ বাবুর ধর্ম্মোপদেশে অনেক লোক বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার কোন শিষ্য মৃত্যুকালে বলিয়াছিলেন, "আমাকে রাজনারায়ণ বাবুর বক্তৃতা পড়িয়া শুনাও।" রাজনারায়ণ বাবুর বক্তৃতা শুনিয়া তিনি মৃত্যুকালে শান্তিলাভ করিলেন।

কখন কখন রাজনারায়ণ বাবু পল্লীগ্রামে গিয়া ধর্ম্ম-প্রচার করিতেন। একবার জলেশ্বরের দারোগার বাসায় রাজনারায়ণ বাবু উপাসনা করিয়াছিলেন। দারোগা মহাশয় তাঁহার উপাসনা শুনিয়া অত্যন্ত অনুতপ্তহৃদয়ে রাজনারায়ণ বাবুর চরণে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন, "আমি মহাপাপী, আপনি আমাকে পরিত্রাণ করুন।"

রাজনারায়ণ বাবু বলিলেন, "মানুষের পরিত্রাণ করিবার শক্তি নাই। পরমেশ্বরই জীবকে পরিত্রাণ করিতে পারেন। আসুন, আমরা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি। তিনি আপনাকে রক্ষা করিবেন।" এই বলিয়া তিনি প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

রাজনারায়ণ বাবু যে কেবল ধর্ম্মসম্বন্ধেই মেদিনীপুরের উপকার করিয়াছেন, এমন নহে। যাহাতে সকল বিষয়েই মেদিনীপুরের কল্যাণ হয়, সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি প্রধান শিক্ষক থাকাতে মেদিনীপুর গবর্মেণ্ট স্কুলের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। স্ত্রী শিক্ষার জন্য তিনি তথায় বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। এতদ্ভিন্ন গৃহে গৃহে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা

করিয়া দেন। শ্রমজীবীদিগের শিক্ষার জন্য নৈশবিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। ইহা ভিন্ন, সাধারণের জ্ঞানোন্নতি জন্য পাঠশালার প্রতিষ্ঠা করেন। উহার সমস্ত কার্য্য তিনি নিজে নির্ব্বাহ করিতেন।

স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার মহাশয় কলিকাতায় সুরাপান নিবারণী সভা সংস্থাপন করিবার পূর্ব্বে তিনি মেদিনীপুরে সুরাপান নিবারণের জন্য সভা সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন শারীরিক উন্নতির জন্য ব্যায়ামশালা। বিচার শক্তির উন্নতির জন্য বিতর্কসভা। ধর্ম্মচর্চ্চার জন্য ধর্ম্মালোচনা সভা। সাহিত্য চর্চ্চার জন্য সাহিত্য উৎসাহিনী সভা। জাতীয় ভাব ও স্বদেশানুরাগের উন্নতি জন্য জাতীয় গৌরব সম্পাদন সভা। এইরূপে নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ের উন্নতি জন্য রাজনারায়ণ বাবু নানা সভা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সেই জন্য মেদিনীপুরের একটি লোক আমোদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, সভার এত বাড়াবাড়ি হইতেছে যে, এখন একটা 'সভানিবারণী সভা' সংস্থাপন করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

১৮৫১ সাল হইতে ১৮৬৬ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত রাজনারায়ণ বাবু মেদিনীপুরে বাস করিয়া সে স্থানের অশেষ প্রকার কল্যাণ সাধন করেন। মেদিনীপুরে তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। সেখানে কত লোক তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির সহিত স্মরণ করিতেছে।

১৮৬৮ সালে, শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ তিনি কার্য্য ত্যাগ করেন। কিছুদিন পশ্চিমাঞ্চলে নানাস্থান ভ্রমণ করেন। শেষে কলিকাতায় আসিয়া এখানে অনেক দিন বাস করেন। বাল্যকাল হইতে রাজনারায়ণ বাবুর সহিত আমার (প্রবন্ধ লেখকের) সম্বন্ধ। তিনি আমাকে চিরদিন স্নেহ করিয়াছেন। তিনি যখন কলিকাতায় ছিলেন, তখন প্রায়ই তাঁহার নিকট গমন করিতাম। সেই সময়ে কোন বিশেষ কারণে আমার মনে অতিশয় ক্লেশ ছিল। সেই ক্লেশের অবস্থায় তাঁহার নিকট গিয়া যেমন সান্ত্বনা পাইতাম, এমন আর কোথাও পাইতাম না। পারস্য কবি হাফেজের মধুর কবিতা সকল আবৃত্তি করিয়া তিনি তাহার যে হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা করিতেন, তাহাতে আমি প্রাণে গভীর শান্তিলাভ করিতাম। হাফেজ, শাদি, জেলালউদ্দীন, রুমি প্রভৃতি পারস্য ভাষার মহাকবিগণের কবিতা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। কেমন গভীর ভাবের সঙ্গে তিনি সেই সকলের আবৃত্তি করিতেন। সেই সকল কবিতার এমন মধুর ব্যাখ্যা করিতেন যে, তাহাতে শোক তাপ দূর হইত, পাষাণ বিগলিত হইত! পরিশেষে তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ১৮৭৯ সালে দেওঘর গমন করেন। জীবনের অবশিষ্ট কাল তথায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

রাজনারায়ণ বাবু বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য অনেক যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি অনেকগুলি বাঙ্গালা গ্রন্থ লিখিয়াছেন। (১) রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা অতি প্রসিদ্ধ পুস্তক। স্বর্গীয় মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেন এই পুস্তক পাঠ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন ও ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলেন। কেশব বাবু একবার একথা কোন প্রকাশ্য সভায় স্বীকার করিয়াছিলেন। (২) ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা। বাঙ্গালা ভাষায় রীতিমত কোন ধর্ম্মবিজ্ঞান (Theology) সম্বন্ধীয় পুস্তক ছিল না। রাজনারায়ণ বাবুই ধর্ম্মবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ সর্ব্ব প্রথমে প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। (৩) 'হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা'। কলিকাতা নগরে উক্ত বিষয়ে তিনি একটি প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। উহা পুস্তকাকারে প্রকাশ হয়। উক্ত বক্তৃতায় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। উহাতে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের সমর্থন করা হয় নাই; হিন্দু ব্রহ্মজ্ঞানই প্রচার করা হইয়াছিল। তথাচ স্বর্গীয় কেশব চন্দ্র সেন মহাশয় সশিষ্যে সভা আহ্বান করিয়া উক্ত বক্তৃতার ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সোমপ্রকাশ সম্পাদক স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় উক্ত বক্তৃতা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "হিন্দুধর্ম্ম ডুবিতেছিল, রাজনারায়ণ বাবু উহা রক্ষা করিলেন।" ভূদেব বাবু এই বক্তৃতা পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি রাজনারায়ণ বসুর গোঁড়া।" হিন্দু সমাজের বিজ্ঞ লোকে এই বক্তৃতার জন্য, কেহ তাঁহাকে "হিন্দুকুল চূড়ামণি", কেহবা 'কলির বেদব্যাস' বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন। কলিকাতানিবসী বাবু শিবচন্দ্র গুহ বলিয়াছিলেন, "রাজনারায়ণ বাবুর একটি প্রস্তরময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করা উচিত।" সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার সভাপতি উক্ত বক্তৃতার অতিশয়

প্রশংসা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ উক্ত বক্তৃতা ইংরাজী ও উর্দ্দু ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান সংবাদ পত্র, টাইম্‌স্ পত্রিকায় উক্ত বক্তৃতার সার মর্ম্ম প্রকাশ হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ রটলেজ সাহেব তাঁহার কোন পুস্তকে উক্ত বক্তৃতার অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। (৪) 'সেকাল ও একাল।' এই পুস্তকে, এদেশে ইংরেজ শাসনকালের প্রথমাংশের অতি সুন্দর হাস্যজনক বর্ণনা আছে। ইংরেজ শাসনে এদেশে কিরূপ সামাজিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে, তাহার কোন কোন বিষয়ের বিশদ বর্ণনা আছে। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালীজাতির শারীরিক অবনতির কারণ ইহাতে পরিস্কাররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। লর্ড নর্থব্রুক দুই শত টাকা ব্যয় করিয়া, আপনার পাঠের জন্য, এই পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ করাইয়া লইয়াছিলেন। (৫) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা। ইহাতে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিবরণ আছে। (৬) Old Hindu's Hope এই পুস্তক প্রথমে ইংরাজীতে ও তৎপরে বাঙ্গালায় লিখিত হয়। মান্দ্রাজের রাজা গজপতি রাওয়ের ব্যয়ে ইংরাজী পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল; রাজা বিনয়কৃষ্ণ ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। (৭) সারধর্ম্ম। এই পুস্তকে তাঁহার ধর্ম্মমতের উদারতা দৃষ্ট হয়। (৮) ব্রহ্মসাধন। ইহা একখানি আধ্যাত্মিক সাধনবিষয়ক গভীর পুস্তক। (৯) তাম্বুলোপহার। ইহা ভিন্ন তিনি কয়েকখানি ইংরেজী পুস্তক লিখিয়াছিলেন। 'Hindu Theist's Brotherly Gift to English Theists. রেভারেণ্ড ভয়সি সাহেব এই পুস্তক ইংলণ্ডে প্রকাশ করিয়াছিলেন। Science of Reigion নামক মোক্ষমুলরের গ্রন্থে ইহার অনেক প্রশংসা আছে। 'Religion of Love' এই পুস্তক এদেশে ও ইংলণ্ডে বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছে। 'Old Hindu's Hope' নামক যে পুস্তক ইংরেজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে এদেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের উৎকৃষ্ট প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, তিনি ঈশ, কেন, কঠ প্রভৃতি পাঁচ খানি উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে যে উপনিষদ্ প্রকাশ হইয়াছে, তাহার ভূমিকায়, ডাক্তার রো, রাজনারায়ণ বাবুর অনুবাদিত উপনিষদের অনেক প্রশংসা করিয়াছেন।

রাজনারায়ণ বাবু সমাজসংস্কারক ছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার মহাশয় কলিকাতায় সুরাপাননিবারণী সভা সংস্থাপন করিবার পূর্ব্বে তিনি মেদিনীপুরে সুরাপান নিবারণের জন্য সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এদেশে তিনি সুরাপান নিবারণী সভার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। সুরাপান নিবারণের চেষ্টা করাতে মেদিনীপুরের মাতালগণ তাঁহার উপর অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিল। একটি বিশেষ ঘটনায় মাতালগণ রাজনারায়ণ বাবুর বিশেষ শত্রু হইয়া উঠিল। মেদিনীপুরপ্রবাসী কোন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক সুরাপান করিতেন। তাঁহার বাসায় মাতালগণের আড্ডা ছিল। সেই ভদ্রলোকটি এক দিন রাজনারায়ণ বাবুর বাসায় আসিয়া সুরাপাননিবারণী সভার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, তিনি আর কখন সুরাপান করিবেন না। মাতালগণের বড়ই বিপদ উপস্থিত হইল। বিনা পয়সায় মদ খাওয়ার পথ বন্ধ হইয়া গেল। সুতরাং তাঁহারা ভাবিলেন যে, রাজনারায়ণ বাবুকে মেদিনীপুর হইতে তাড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। এই জন্য তাঁহারা স্কুল ইন্‌স্পেক্টর হ্যারিসন সাহেবের নিকট এক মিথ্যা দরখাস্ত করিলেন যে, রাজনারায়ণ বাবু স্কুলের সময়, স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। হ্যারিসন সাহেব উক্ত দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন।

রাজনারায়ণ বাবু বিধবাবিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহকারী ছিলেন। তিনি তাঁহার দুই ভ্রাতার বিধবা বিবাহ দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একজন তাঁহার সহোদর আর একজন পিতৃব্যপুত্র। এ জন্য তাঁহাকে অনেক অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল; লোকে বলিয়াছিল যে, তাঁহার বাড়ীঘর পুড়াইয়া দিবে, অন্তরাল হইতে ইষ্টকাঘাত করিয়া তাঁহার মস্তক ভাঙ্গিয়া দিবে। তিনি এ সকল কথায় কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে, লোকে ঐরূপ করুক না। তাহা হইলে আমি এই বুঝিব যে, এখন তাহারা যেমন বিধবা বিবাহের বিরোধী, সেইরূপ যখন তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, উহা ভাল, তখন তাহারা, সেইরূপ, উহার পক্ষপাতী হইবে।

বাল্যবিবাহ প্রথাকে তিনি ঘৃণা করিতেন। উপযুক্ত বয়সে তাঁহার সকল কন্যার বিবাহ দিয়া ছিলেন।

তাঁহার ন্যায় স্বদেশানুরাগী লোক অল্পই দেখিয়াছি। তিনি প্রাণের সহিত মাতৃভূমিকে ভাল বাসিতেন। মাতৃভূমির সেবায় তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এদেশের রাজনৈতিক উন্নতি বিষয়ে তিনি অনেক চিন্তা ও আলোচনা করিতেন। স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়ভাব তাঁহার অস্থিমজ্জাগত হইয়াছিল। হেমচন্দ্রের 'ভারত সঙ্গীত,' সত্যেন্দ্র বাবুর 'মিলে সব ভারত সন্তান' এবং গোবিন্দচন্দ্র রায়ের 'নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা' ইত্যাদি কবিতা ও সঙ্গীত তিনি হৃদয়ের গভীর আবেগের সহিত আবৃত্তি করিতেন।

বৃদ্ধাবস্থাতেও তিনি জাতীয়ভাব ও স্বদেশানুরাগে পূর্ণ থাকিতেন। যে সময় লাহোরে কংগ্রেস হইতেছিল, তখন একদিন তাঁহার দৌহিত্রী গান করিতেছিলেন ;—

"পর দীপমালা নগরে নগরে,
তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে॥"

রাজনারায়ণ বাবু উহা শুনিয়া বলিলেন, "ও গান গাস্‌নে—সব কথা মনে হয়, শরীর দিয়ে আগুণ বাহির হয়—মন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যায়। গাস্‌নে, গাস্‌নে।"

রাজনারায়ণ বাবুর ন্যায় সরলান্তঃকরণ লোক অধিক দেখি নাই। তাঁহার মধুর উচ্চ হাস্যে, তাঁহার হৃদয়ের মধুরতা, নির্ম্মলতা, ও সরলতা প্রকাশ পাইত।

রাজনারায়ণ বাবুর উদারতা ও অসাম্প্রদায়িক ভাবের জন্য সকল শ্রেণীর লোক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেন। তাঁহার সংসর্গে সকল শ্রেণীর লোকই সন্তোষ ও তৃপ্তিলাভ করিতেন। আমার কোন বন্ধু রেলের গাড়ীতে পশ্চিম হইতে কলিকাতার দিকে আসিতেছিলেন। গাড়ীতে কয়েক জন বাঙ্গালী যুবার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন?" তাঁহারা উত্তর করিলেন যে, দেওঘরের নিকট এক পর্ব্বতে একজন সন্ন্যাসী আছেন। তিনি আমাদের গুরু। আমরা গুরুদেবের নিকট গিয়াছিলাম। গুরুদেব বলিলেন "তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও। আমি এখন এখানে থাকিব না। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় পীড়িত। আমি দেওঘর নগরে গিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইব।"

রাজনারায়ণ বাবুর প্রেম সকল শ্রেণীর লোককে তাঁহার প্রতি আকর্ষণ করিত। একবার কয়েকটি বালক তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একজন কুষ্ঠরোগী ছিলেন। তিনি অন্য সকলকে যেমন আলিঙ্গন করিলেন ঐ কুষ্ঠরোগীটিকেও সেইরূপ প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন।

ভূদেব বাবু একজন সহাধ্যায়ী ছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভূদেব বাবু বলিয়াছিলেন, "আমি রাজনারায়ণ বসুর গোঁড়া।" রাজনারায়ণ বাবুকে ভূদেব বাবু এতদূর শ্রদ্ধা করিতেন যে, তিনি একদিন রাজনারায়ণ বাবুকে বলিলেন, "রাজনারায়ণ! তুমিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ; আমার পৈতা তোমার গলায় দি। এই বলিয়া তিনি আপনার যজ্ঞোপবীত রাজনারায়ণ বাবুর গলদেশে লম্বমান করিয়া দিলেন। উক্ত যজ্ঞোপবীত রাজনারায়ণ বাবুর নিকট ছিল। একবার কানপুর হইতে ভূদেব বাবু ও রাজনারায়ণ বাবু একত্রে কান্যকুব্জ নগর দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া ভূদেব বাবু রাজনারায়ণ বাবুকে বলিয়াছিলেন, "রাজনারায়ণ! তোমার ও আমার পূর্ব্বপুরুষ এ স্থান হইতে বঙ্গদেশে গিয়াছিলেন, আমরা উভয়ে সেই পূর্ব্বপুরুষের স্থান দেখিতে আসিয়াছি।" রাজনারায়ণ বাবুর বিশেষ বন্ধুগণের মধ্যে সকল শ্রেণীর লোক ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়, খ্যাতনামা ভূদেব বাবু, কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত, প্রভৃতি অনেক সুপ্রসিদ্ধ ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি তাঁহার বন্ধুশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। মাইকেল যখন প্রথমে অমিত্রাক্ষর কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন সমালোচনার জন্য তিনি তাহার পাণ্ডুলিপি রাজনারায়ণ বাবুর নিকট প্রেরণ করেন। রাজনারায়ণ বাবু উহার সমালোচনা লিখিয়া মাইকেলের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কবিবর মাইকেল সময়ে সময়ে রাজনারায়ণ বাবুকে অনেক পত্র লিখিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বাবু পত্রগুলি যত্ন করিয়া তাঁহার নিকট রাখিয়া দিয়াছিলেন।

সকল শ্রেণীর লোকের প্রতি রাজনারায়ণ বাবুর যেমন শিষ্টাচার ছিল, এমন অল্পই দৃষ্ট হয়। যখন তিনি পক্ষাঘাত রোগে শয্যাগত, যখন তাঁহাকে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করাইয়া দিতে হইত, নিজে পারিতেন না, আহার করাইয়া দিতে হইত, নিজে পারিতেন না, তখনও যাঁহারা তাঁহাকে

দেখিতে যাইতেন, তাঁহাদিগকে বলিতেন, "আমি উঠিয়া আপনাদিগকে অভ্যর্থনা করি, এমন আমার সাধ্য নাই। আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন।" হাইকোর্টের একজন মাতাল এটর্ণি, একদিন বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট বসিয়া প্রলাপ বকিয়াছিলেন, তথাচ তিনি তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই বা থামাইয়া দেন নাই, ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার কথা শুনিয়াছিলেন।

তিনি অত্যন্ত যত্নপূর্ব্বক গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন। সচরাচর দেখা যায় যে, যাঁহারা জ্ঞান ও ধর্ম্মচর্চ্চার অত্যন্ত অনুরক্ত, তাঁহারা অনেক সময় গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য প্রতিপালনে মন দিতে পারেন না। কখন কখন তিনি, স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলকে লইয়া সাহিত্য আলোচনা করিতেন। কখন কখন তাঁহাদের সঙ্গে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতেন। অনেক সময় সাধু মহাত্মাদের জীবন-বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে উপদেশ দিতেন।

পরিবারের মধ্যে নিয়মিতরূপে সাপ্তাহিক উপাসনা করিতেন। পরিবারের মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে, তিনি তাহার নিকট বসিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন। পরিবারস্থ সকলকেই অতিশয় ভালবাসিতেন। চাকর, চাকরাণীদের পর্য্যন্ত মঙ্গলকামনা করিতেন। যখন তিনি পক্ষাঘাত রোগে শয্যাশায়ী, তখন তাঁহার কোন কন্যা শ্বশুরালয় হইতে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে সন্ধ্যার সময়, আপনার নিকট বসাইয়া তাঁহার সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতেন। সেই কন্যা যে দিন শ্বশুরালয়ে ফিরিয়া যাইবার জন্য তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে আসিলেন, তিনি তখন তাঁহার কল্যাণের জন্য পরমেশ্বরের নিকট উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করিলেন।

কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত পশুদিগকে তিনি অতিশয় যত্ন করিতেন। কাকদিগকে প্রতিদিন আহার দিতেন। বলিতেন, গৃহস্থের পঞ্চ যজ্ঞের মধ্যে এই এক যজ্ঞ। রাজনারায়ণ বাবুর একটি কুকুর পাগল হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বাবুর কোমল হৃদয় তাহাতে সায় দিতে পারিল না। তিনি কুকুরটিকে একটি ঘরে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন। বলিলেন, স্বাভাবিকরূপে উহার মৃত্যু হউক।

মসলা বাঁধা দড়ি ও দেশালাইয়ের জ্বালান কাঠিগুলি পর্য্যন্ত তিনি কুড়াইয়া রাখিয়া দিতেন। একজন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "সামান্য বস্তুতে এত মায়া কেন ?" তিনি বলিলেন, "গভীর রাত্রে যদি কাহাকেও সাপে কাম্‌ড়ায়, তখন কোথায় দড়ি খুঁজিয়া পাইব ? এই দড়িতে তাহার প্রাণ রক্ষা হইতে পারে। আর জ্বালান কাঠিদ্বারা প্রদীপ উস্‌থাইবার সুবিধা হইবে।" ঘরের বাহিরে কোন সামগ্রী পড়িয়া থাকিলে তাহা ঘরের ভিতরে আনিয়া রাখিতেন। বাটীর লোককে বলিতেন, "সকল সামগ্রী গুছাইয়া রাখিবে।"

তিনি যত্নপূর্ব্বক গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন বটে, কিন্তু কখনই সাংসারিক বিষয়ে আসক্ত ছিলেন না। পিতার উপদেশানুরূপ পদ্মপত্রের জলের ন্যায় তিনি সংসার করিতেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, দেওঘরে চালাঘর ক্রয় করিয়া তাহাতে সপরিবারে বাস করিবেন। কিন্তু পরমেশ্বরের কৃপায় ইষ্টকালয় হইল! তখন তিনি বলিলেন, "এ কি হইল! আমি চাই চালা ঘর, হ'ল বড় বাড়ী।" গৃহ প্রবেশের সময় সপরিবারে বাহিরে দণ্ডায়মান হইয়া যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম্ম এই, "হে পরমেশ্বর! যদি এই গৃহে আমাদের সম্পদ হয়, তাহা হইলে মোহমদে মত্ত হইয়া তোমাকে না ভুলি! আর যদি এই গৃহে দুঃখ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে যেন তোমার মঙ্গল বিধানে অবিশ্বাসী না হই। এ গৃহে যেন বিরোধ ও কলহ প্রবেশ না করে।"

তাঁহার কোন কন্যা বিবাহের পর স্বামীগৃহে যাইবার সময় যখন ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "মা! এ পৃথিবী ছাড়াছাড়ির পৃথিবী! প্রধান ছাড়াছাড়ি মৃত্যুর সময়। ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন কর।"

স্বভাবতঃ তাঁহার হৃদয় সংসারিক বিষয়ে অনাসক্ত ছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব তাঁহাকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি তাহাতে সম্মত না হইয়া স্কুলের শিক্ষকতা কার্য্য অবলম্বন করিলেন। প্যারী বাবু যখন হেয়ার স্কুল হইতে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হন, তখন রাজনারায়ণ বাবুকে হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক করিবার প্রস্তাব

হইয়াছিল। তাহা হইলে, তাঁহার পদোন্নতি হইত এবং তদপেক্ষাও ভাবী উন্নতির আশা ছিল। কিন্তু মেদিনীপুরে তিনি যে সকল সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, পাছে সে সকল নষ্ট হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় তিনি মেদিনীপুর ত্যাগ করিলেন না। কি নিঃস্বার্থ ভাব! শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর আটকিন্‌সন সাহেবের নিকট একবার রাজনারায়ণ বাবুর কথা উপস্থিত হইলে তিনি বলিয়াছিলেন,—

"Oh! Rajnarain Basu of Midnapore? He is a madcap. He wants neither pay nor promotion!"

তাঁহার তৃতীয় জামাতার মৃত্যু হইলে, তাঁহার কন্যা শোকার্ত্ত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন;—"যাঁহার ধন, তিনি লইয়াছেন। যতক্ষণ আমাদের কাছে রাখিবার ইচ্ছা ছিল, ততক্ষণ রাখিয়াছিলেন। এ যে ছাড়াছাড়ির পৃথিবী।" পক্ষাঘাত রোগে যখন শয্যাশায়ী হইলেন, তখন পারস্য কবি হাফেজের একটি কবিতা আবৃত্তি করিলেন। কবিতাটির অর্থ এই 'অনিত্য পৃথিবী। হে প্রিয়তম! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

কোন সময়ে, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের সাংঘাতিক পীড়ার কথা শুনিয়া বাটীর সকলে কাঁদিতেছিলেন। তিনি আসিয়া বলিলেন;—"প্রস্তুত হও, প্রস্তুত হও। পৃথিবীতে শোক, তাপ, দুঃখ, বিপদ দরিদ্রতা সব আমাদের আশে পাশে ঘুরিতেছে। এসকল সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাক। প্রস্তুত থাকাই আমাদের ধর্ম্ম। অধীর হওয়া ত আমাদের ধর্ম্ম নয়।"

অন্তরে অনাসক্ত বৈরাগী হইয়াও তিনি কেমন যত্নপূর্ব্বক গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন। কেমন তিনি কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন! এক দিন বাটীর চাকরদিগকে কোন ব্যক্তি বলিলেন, "কেবল বসিয়া বসিয়া পয়সা খাবি।" রাজনারায়ণ বাবু তখন পক্ষাঘাত রোগে শয্যাগত। তিনি ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন;—"ঠিক্! ঈশ্বর আমাদিগকে বলিতেছেন—বসে বসে পয়সা খাবে ?" যিনি ঐ কথাটি বলিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "তবে কি করিব ?" রাজনারায়ণ বাবু উত্তর করিলেন, "কর্ত্তব্য কাজ কর।" তিনি বলিলেন, "কর্ত্তব্য কেমন করিয়া বুঝিব ?" এই প্রশ্নে রাজনারায়ণ বাবু নিজের হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন;—"এর ভিতর এক জন আছেন, তিনি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বলিয়া দিতেছেন। তিনি কেবলই বলিতেছেন, অন্যায় করোনা, অন্যায় করোনা।"

কাচপাত্রের মধ্যে পুষ্প থাকিলে তাহার শোভা যেমন বাহিরে প্রকাশ পায়, মানুষের অন্তরের ধর্ম্ম ভাব সেইরূপ তাহার মুখে প্রকাশ পায়। রাজনারায়ণ বাবুর আন্তরিক ধর্ম্মভাব তাঁহার মূর্ত্তিকে পবিত্র সৌন্দর্য্যে অনুরঞ্জিত করিয়াছিল। এক দিন তিনি পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময় একজন বৈদ্যনাথের তীর্থযাত্রী আসিয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিল। তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া তাহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে কিছুতেই শুনে না। সে ব্যক্তি বলিল, "আমি মহাদেব দর্শন করিতে আসিয়াছি। এই তো সাক্ষাৎ মহাদেবের দর্শন পাইলাম। আপনি সাক্ষাৎ মহাদেবের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাকে দেখা দিয়াছেন।" রাজনারায়ণ বাবু সে ব্যক্তিকে অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু সে কিছুতেই বুঝে না। তিনি তাহাকে যত বুঝান, ততই তাঁহার দেব ভাব দেখিয়া তাঁহাকে দেবতা বলিয়া তাহার ভ্রান্তি হইতে লাগিল। পরে অনেক কষ্টে তাহার হাত হইতে এড়াইয়া তিনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কোন মহিলা একবার রাজনারায়ণ বাবুকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন;—"খুকী তিন বৎসরের শিশু। আজ প্রায় এক বৎসর খুকী আমার কাছ ছাড়া। কিন্তু আমি যখন বিদেশ থেকে আসিলাম, খুকী আমাকে দেখিয়াই "মা এসেছ, আমায় কোলে নেও" বলিয়া আমার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। আশ্চর্য্য! এতদিন পরে সে আমাকে কেমন করিয়া চিনিল! একটুও ভুলে নাই!" রাজনারায়ণ বাবু ইহার উত্তরে লিখিলেন;—"আহা! হা! আমরা পরলোকে গিয়া জগজ্জননীর কোলে ঠিক অমনি করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িব। সে কি সুন্দর অবস্থা!"

একবার কোন মহিলা তাঁহার শিশু কন্যাটিকে সঙ্গে লইয়া রজনারায়ণ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। যখন তাঁহাদের কথোপকথন চলিতেছিল, তখন ঐ শিশু কন্যাটি "মা কোলে উঠিব" বলিয়া পুনঃপুনঃ আব্‌দার করিতে লাগিল। রাজনারায়ণ বাবু অন্যান্য কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ পবিত্র হাসি হাসিয়া বলিলেন;—

"আহা! আহা! সে বিশ্বজননীর কাছে কবে আমরা আব্দার করিব, মা, কোলে উঠিব!"

গভীর ভগবদ্ভক্তি রাজনারায়ণ বাবুর হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিল। নিদ্রাকালে স্বপ্নাবস্থাতেও তাঁহার হৃদয়ে ভগবৎ প্রেমের লীলা হইত। এক দিন তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, যেন তিনি নীলাচলে গিয়াছেন; সম্মুখে এক বৃহৎ পর্ব্বত। তাহার নীচেই সমুদ্র। তিনি সমুদ্রের তীরে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন;—"আমার যে জগৎ মাতা, তিনি কি এখানে?" সেই সুন্দর স্থানে দাঁড়াইয়া, "আমার জগৎ মাতা কোথায়," বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত আত্মীয়দিগের নিকট বলিবার সময় রাজনারায়ণ বাবু হৃদয়ের আবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল হইল!

ভগবদ্ভক্ত রাজনারায়ণ বাবুর নিকটে কোন ব্যক্তি যদি পরমেশ্বরের দয়া বা জ্ঞানের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিত, তাহা হইলে তাঁহার হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগিত। তাঁহার মুখ দেখিলে তাহা বুঝা যাইত। তখন তিনি ঈশ্বর নিন্দাকারীকে ধীর ভাবে বলিতেন,—"ছিঃ! অমন কথা বলিতে নাই।" এরূপ দেখা গিয়াছে যে, এইরূপ মৃদু ভর্ৎসনাতেও ঈশ্বর নিন্দাকারীর বিশেষ উপকার হইয়াছে।

প্রথম বয়সে তিনি দার্শনিক যুক্তি তর্কদ্বারা ধর্ম্মবিষয়ক সত্যের সমর্থন করিতেন। সেই জন্য তিনি ধর্ম্মতত্ত্ব-দীপিকা নামক পুস্তক লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। শেষাবস্থায় যতই তাঁহার ভক্তি ও প্রেম গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল, ততই তিনি তর্কের প্রতি বীতরাগ হইতে লাগিলেন। যাহা হউক, প্রচারোৎসাহ চিরদিনই তাঁহার প্রবল ছিল। শেষাবস্থাতেও তিনি কথোপকথন দ্বারা ও পুস্তক উপহার দিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেন।

পারস্য কবি হাফেজের গ্রন্থ তাঁহার একান্ত প্রিয় ছিল। বোধ হয়, হাফেজের সমগ্র গ্রন্থ খানি তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি এমন স্বর্গীয়ভাবে হাফেজের কবিতা আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিতেন যে, তাহাতে পাষাণ দ্রবীভূত হইয়া যাইত। কত সময়, হৃদয়ে গভীর দুঃখ লইয়া তাঁহার নিকট গিয়াছি, তাঁহার হাফেজ আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা শুনিয়া গভীর শান্তি ও আনন্দ লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি।

রাজনারায়ণ বাবু বড়ই সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। দেওঘরে কোন গায়ক আসিয়াছেন শুনিলে, তিনি তাঁহাকে বাটীতে আহ্বান করিয়া আনিয়া তাঁহার সঙ্গীত শুনিতেন। ভক্তিরসের সঙ্গীত এমন তন্ময়চিত্তে শুনিতেন যে, আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইতেন। সন্ধ্যার পর সঙ্গীত শুনিতে বসিয়া কখন কখন পরিবারস্থ সকলকে বলিতেন,—"আমার ইচ্ছা করে, সমস্ত রাত্রি এইভাবে কেটে যায়। তাহাতে আমার কোন কষ্ট হইবে না। পরমানন্দে কেটে যাবে। কিন্তু তোমাদের পাছে কষ্ট হয়, এই আমার ভাবনা, সেই জন্যই বন্ধ করিতে বলিতেছি।"

পক্ষাঘাত রোগে শয্যাশায়ী থাকিয়াও তিনি তাঁহার উন্নত মনের ও মহৎ চরিত্রের যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাহা জীবনে কখনই ভুলিতে পারিবেন না। ঐরূপ বিষম কষ্টের অবস্থাতেও তাঁহার শান্তভাব দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইতেন। ঐ প্রকার অবস্থাতেও তিনি দেশের কোথায় কি হইতেছে,—রাজনৈতিক বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয়ে কোথায় কি হইতেছে তাহার সংবাদ লইতেন। ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতেন ও সকলকে উপদেশ দিতেন। এই অবস্থায় ভগবদ্ভক্তিতে সর্ব্বদা তাঁহার চিত্ত মগ্ন থাকিত। সিটিকলেজের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই সময়ে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বাবু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—"উমেশ বাবু! উপাসনা যে কত মধুর তাহা আমি এই অবস্থাতেই প্রকৃত ভাবে বুঝিতে পারিতেছি।"

রাজনারায়ণ বাবুর কোন বিধবা কন্যার একটি একমাত্র পুত্র ছিল। বালকটি সর্ব্বগুণান্বিত ছিল। তাহার নাম অবিনাশ। রাজনারায়ণ বাবু তাহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। একদিন তিনি বৈঠকখানায় বসিয়া কয়েকজন ভদ্রলোকের সহিত কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় কোন বিশেষ প্রয়োজনে তাহাকে "অবিনাশ দাদা" বলিয়া ডাকিলেন। উপস্থিত ভদ্রলোকেরা মনে করিলেন যে, রাজনারায়ণ বাবু এত বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার আবার দাদা কে? কিন্তু যখন অবিনাশ তথায় সহাস্যবদনে উপস্থিত হইলেন, তখন ভদ্রলোকেরা, তাহাকে দেখিয়া হাস্য করিয়া বলিলেন, "ইনিই আপনার দাদা?" রাজনারায়ণ বাবু বলিলেন, "ইনি আমার বিজ্ঞ দাদা, ইঁহাকে আমি বড়ই ভালবাসি।"

পক্ষাঘাত রোগে রাজনারায়ণ বাবু শয্যাশায়ী হওয়ার এক বৎসর পরে, ঐ বালকটি তিন মাস পীড়িত থাকিয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইল। পাছে এই ভীষণ সংবাদ রাজনারায়ণ বাবুর কর্ণে প্রবেশ করিলে তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি হয়, সেই আশঙ্কায় বাটীর লোকেরা তাঁহাকে এ কথা কেহ শুনাইল না। অতি সাবধানে ইহা গোপন করা হইল। কিন্তু রাজনারায়ণ বাবু অবিনাশকে না দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। শেষে বলিলেন "আমাকে খাট শুদ্ধ লইয়া গিয়া তাহার খাটের পার্শ্বে রাখিয়া দেও।" এরূপ অবস্থায় মৃত্যু সংবাদ গোপন করা অসম্ভব হওয়াতে, একজন বিশেষ আত্মীয়ের দ্বারা তাঁহাকে এই দুর্ঘটনার বিষয় জানান হইল।

সেই আত্মীয়টি এই বিষয় নিজে যাহা লিখিয়াছেন, এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। রাজনারায়ণ বাবু কিরূপ উচ্চশ্রেণীর লোক ছিলেন, পাঠকবর্গ ইহা পাঠ করিয়া বিশেষ অনুভব করিতে পারিবেন।

"আজ বেলা ৯ টার সময় পরমপূজনীয় রাজনারায়ণ বাবুকে অবিনাশের পরলোক গমনের কথা বলা হইল। এ সংবাদ শুনিয়া তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। উহা শুনিবার পূর্ব্বে তিনি যেমন ধীর ও গম্ভীর ভাবে ভগবানের করুণা ও মানবের সুখ দুঃখ, ইহকাল ও পরকাল সম্বন্ধে গভীর তত্ত্ব সকল বলিতেছিলেন এবং বলিতে বলিতে ঈশ্বরপ্রেমে বিহ্বল হইয়া এক একবার হাস্য করিয়া উঠিতেছিলেন; পরেও ঠিক্ সেই ভাব রহিয়া গেল। ভাব ও ভাষায় কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই—জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে এঘটনা হইল?" উত্তর হইল, "আজ ১৬ দিন হইল।" বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! এই আনন্দের সংবাদ কেন শুনাও নাই? সে যে মহা শান্তিধামে গিয়াছে।" বলা হইল, "মহাশয়ের শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ, সেই জন্য বিশেষ বিবেচনা করিয়া আজ শুনান হইল।" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আজিও আমাকে ইহারা চিনিতে পারিল না। সে যতদিন ছিল, ততদিন তাহার জন্য খুব ভাবনা, চিন্তা ছিল—কিন্তু এখন তাহার জন্য কোন চিন্তা নাই, ভাবনা নাই—সে মহাশান্তিতে, মহা আরামে রহিয়াছে। তবে কেন আমাকে বলে নাই?" আবার হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ইহা আনন্দের বিষয় যে, আমি ইহাদের প্রতি কিরূপ স্নেহশীল তাহা ইহারা জানে। যোগীন্ এবং আমার পরিবারস্থ সকলেই খুব ধৈর্য্যশীল—এ ঘটনা তাহারা সকলেই সহ্য করিয়াছে, আমাকে কিছু বুঝিতে দেয় নাই, ইহা বড় আশ্চর্য্য। সংসারের এই তো নিয়ম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, যাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তিনি তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেন।"

উক্ত আত্মীয় আরও লিখিতেছেন,—"এই শোক সংবাদ তিনি যে ভাবে গ্রহণ করিলেন, তাহা প্রত্যক্ষ না দেখিলে লিখিয়া বুঝাইবার সাধ্য নাই। তাঁহার এই প্রফুল্ল ভাব দেখিয়া সেখানে উপস্থিত সকলেই একেবারে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শুভক্ষণে দেওঘরে আসিয়াছিলাম, শুভক্ষণে আজ রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল। আজ জীবনে যে শিক্ষা লাভ হইল, শতগ্রন্থ অধ্যয়নে, শত উপদেশে তাহা হয় নাই।"

ভগবদ্গীতায় সিদ্ধ পুরুষের যে সকল লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই একটি লক্ষণ যে, সিদ্ধ পুরুষ পার্থিব সুখ দুঃখের অতীত হন। রাজনারায়ণ বাবুর মহচ্চরিত্রে এই লক্ষণ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি সাংসারিক সুখ দুঃখ, শোক তাপের অতীত অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন।

বিগত ১৬ই সেপ্টেম্বর, রাত্রি ১০টা ১০ মিনিটের সময় তিনি দিব্যধামে যাত্রা করেন। তজ্জন্য পূর্ব্ব হইতেই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন। দেহে থাকিতে থাকিতেই তিনি মৃত্যুর অতীত হইয়াছিলেন। সেই অমৃত পুরুষের সঙ্গে যুক্ত হইয়া তিনি মৃত্যুকে পরাভব করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুমতি ছিল যে, তাঁহার মৃত্যুকালে কয়েকটি সঙ্গীত হইবে। সেই কয়েকটি সঙ্গীত তিনি নিজে পূর্ব্ব হইতেই বাছিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই কয়েকটি সঙ্গীত এই,—(১) ঐ যে দেখা যায় আনন্দ ধাম। (২) তোমারি মধুর রূপ ভরেছে ভুবন। (৩) আজ আনন্দে প্রেমচন্দ্রে নেহারো। (৪) তুমি জ্ঞান তুমি প্রাণ। মৃত্যুকালের জন্য যে কয়েকটি সঙ্গীত নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন, তাহা দেখিলেই সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাঁহার আধ্যাত্মিক অবস্থা কত উচ্চ ছিল। রাজনারায়ণ বাবুর চরিত্র সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির

একটি আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, এই তিনটিই তাঁহার জীবনে সমুজ্জ্বলরূপে প্রকাশ হইয়াছিল। তিনি যেমন প্রকৃত সাধুর ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ, প্রকৃত সাধুর ন্যায় নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া আনন্দে বিশ্বমাতার ক্রোড়ে ঝম্প প্রদান করিলেন।

প্রাচীন জর্ম্মাণ জাতি।

(অবশিষ্টাংশ)

১৭। জর্ম্মণগণ অঙ্গরক্ষার জন্য একখানি বহির্ব্বাস (Sogum) ব্যবহার করে, তাহা আল্‌পীন্‌ বা কাঁটা দিয়া আটকাইয়া রাখে। অনেকে অনাবৃত দেহে চুল্লী অথবা অগ্নিকুণ্ডের নিকট সমস্ত দিন যাপন করে। ধনিগণ বহির্ব্বাসের (Sogum) নীচে একখানি বস্ত্র ব্যবহার করেন, তাহা (বাঙ্গালীদিগের ধুতি চাদরের ন্যায়) লম্বমান বা বায়ুপ্রবাহে উড্ডয়নশীল নহে। উহা গাত্রের সহিত, প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রকাশ করিয়া, যুক্ত থাকে। ইহারা পশুচর্ম্মও পরিধান করিয়া থাকে। (১৬) দূরতম গোষ্ঠীর লোকেরা বিলক্ষণ কষ্ট স্বীকার করিয়া চর্ম্মগুলিকে সুন্দর ও আরামদায়ক করে, কারণ তাহারা, এখনও বাণিজ্যাভাবে, সভ্যতার উপজাত হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। ইহারা মনোনীত পশুর চর্ম্ম প্রস্তুত করিয়া, সমুদ্রজাত জন্তুর রোমে নানা রঙ্গে সুশোভিত করে। জর্ম্মণদিগের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের পরিধেয়ে কোনও পার্থক্য নাই, কেবল স্ত্রীলোকগণ অনেক সময় পট্টবস্ত্রে দেহ আবৃত করেন, এবং উহা লাল রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া থাকেন; ইহাদিগের বাহু এবং বক্ষের উপরিভাগ অনাবৃত থাকে।

১৮। জর্ম্মণগণের বিবাহবিধি কঠিন হইলেও সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়। বর্ব্বরজাতিসমূহের মধ্যে কেবল ইহারাই এক পত্নীতে সন্তুষ্ট রহে। কদাচিৎ কেহ একাধিক পত্নী গ্রহণ করে, তাহাও ইন্দ্রিয়সেবার জন্য নহে। যে বংশমর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ, তাহাকে অনেকেই কন্যা দান করিতে চায়, এ জন্য কোন কোন সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তিকে বহু বিবাহ করিতে দেখা যায়। পত্নী পতিকে যৌতুক প্রদান করেন না, পতিই পত্নীকে যৌতুক দিয়া থাকেন। পিতা মাতা ও আত্মীয়স্বগণ বিবাহ স্থলে উপস্থিত থাকিয়া যৌতুকগুলি মনোনীত করেন। এই সকল যৌতুক নবপরিণীতা পত্নীর সুখ প্রসাধন অথবা দেহসজ্জার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হয় না। সুসজ্জিত অশ্ব, গাভী, ঢাল, বর্শা ও তরবারী বিবাহের শ্রেষ্ঠ উপহার। বিবাহার্থিনী কন্যাও ভাবী স্বামীকে অর্ঘ্যস্বরূপ কোনও অস্ত্র প্রদান করেন। উপহার বিনিময় সম্পন্ন হইলে তিনি পত্নীরূপে গৃহীত হইলেন। ইহাই অচ্ছেদ্য বিবাহ বন্ধন, পবিত্র উদ্বাহমন্ত্র, প্রজাপতির শুভাশীর্ব্বাদ। স্ত্রী কখনও মনে করেন না, যুদ্ধে সকল প্রকার বিপদের সম্মুখীন হইয়া বীর-বিক্রমে খ্যাতি লাভের আকাঙ্ক্ষা কেবল পুরুষদিগের পক্ষেই শোভা পায়, উহা তাঁহার কর্ত্তব্যসীমার বাহিরে বরং বিবাহের প্রাথমিক মঙ্গলাচরণে তাঁহার প্রতি এই উপদেশই প্রদত্ত হয়, তিনি সকল শ্রমে ও বিপদে স্বামীর সঙ্গিনী হইবেন, রণে ও শান্তিতে স্বামীর সহিত সকলই বহন করিবেন, সকলই করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। যুজিত বৃষভ, সজ্জিত যুদ্ধাশ্ব, বহুমূল্য প্রহরণচয়—এ সকলেরই এই একই লক্ষ্য ও উপদেশ—পত্নীকে এইরূপ স্বামীর সহচারিণী ও অনুগামিনী হইয়া চলিতে হইবে। (১৭) তিনি যৌতুকস্বরূপ যে সকল অস্ত্র গ্রহণ করিলেন, তাহা কলঙ্কিত না করিয়া পূর্ণ গৌরবের সহিত পুত্রগণের হস্তে সমর্পণ করিবেন, পুত্র বধূগণ আবার তাহা পৌত্রদিগকে প্রদান করিবেন।

১৯। অতএব, এই সকল অমোঘ কবচে সুরক্ষিতা হইয়া ইহারা বিশুদ্ধ জীবন যাপন করেন, এবং উৎসব-নৃত্য-ভোজের প্রলোভন হইতে সতত দুরে অবস্থান করেন।

---

(১৬) সীজর বলের, জর্ম্মনগণ বল্গাহরিণের চর্ম্ম পরিধানার্থ ব্যবহার করে।

De Bello Gallico VI. 22.

(১৭) আমাদিগের শাস্ত্রের উপদেশ :—

ছায়ানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।
সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া॥

কিন্তু হিন্দু রমণী কি কখনও যুদ্ধে স্বামীর সঙ্গিনী হইতেন? কুরু-পাণ্ডবদিগের সময় ইহার কথঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়; কিন্তু স্বীকার করিতে হইবে, কুন্তী, দ্রৌপদী যুদ্ধে দর্শক মাত্র, রণ-রঙ্গিণী, প্রহরণধারিণী নহেন। কর্ম্মদেবী, দুর্গাবতী, লক্ষ্মী বাই প্রভৃতি বীরনারীর কথা স্বতন্ত্র। বোধ হয়, হিন্দু সামাজিক জীবনের এই গুরুতর অভাব অনুভব করিয়াই কবি 'শান্তি'র সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং বোধ হয় এই জন্যই পূর্ব্বপশ্চিমের মিলন-জনিত শিক্ষার অপূর্ব্ব ফল, 'আনন্দ-মঠ' বঙ্গীয় পাঠক সমাজে, 'কৃষ্ণকান্তের' বহু নিম্নে স্থান পাইয়াছে।

স্ত্রীপুরুষ উভয়েই গুপ্ত-প্রণয় লিপির ব্যবহারে একান্ত অজ্ঞ। এই অগণিতজন সমন্বিত জাতির মধ্যে ব্যভিচারের সংখ্যা অতি সামান্য (১৮)। এরূপ পাপে কলঙ্কিত হইলে স্বামী পত্নীকে তৎক্ষণাৎ ইচ্ছানুরূপ যে কোনও দণ্ড দিতে পারেন। ব্যভিচারিণীকে, মস্তক মুণ্ডন করিয়া, উলঙ্গ-দেহে, স্বগণসমক্ষে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিয়া গ্রামের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রহার করিতে করিতে লইয়া যাওয়া হয়। অবিবাহিত স্ত্রীলোক ব্যভিচার করিলে তাহার আর মার্জ্জনা নাই; রূপ, যৌবন, ধন, সমস্ত থাকিলেও তাহাকে কেহই বিবাহ করিবে না। জর্ম্মণীতে তো আর কেহ পাপাচরণ দেখিয়া হাস্য করে না, অথবা অপরকে নষ্ট করিয়া ও নিজে নষ্ট হইয়া, কালের দোহাই দিয়া সন্তুষ্ট থাকে না। (১৯) ধন্য সেই রাজ্য, যাহাতে কেবল কুমারীগণই বিবাহ করে; যথায় উদ্বাহ-মন্ত্র কেবল একবার উচ্চারিত হয়, ও নারীজীবনের সমস্ত আশা বিবাহস্থলে পরিপূরিত হয়! (২০) জর্ম্মণনারী এক স্বামী গ্রহণ করেন, ও তাঁহার সহিত একাঙ্গ, একাত্মা হইয়া বাস করেন। স্বামীকে অতিক্রম করিয়া কোন চিন্তাই মনে স্থান দেন না; তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কোনও সুখের বাসনা অন্তরে পোষণ করেন না। বিবাহিত জীবনের পবিত্রতাকেই মহোচ্চ লক্ষ্য মনে করেন। ইঁহারা ভ্রূণ ও সন্তানহত্যা মহাপাপ মনে করেন। (২১) অপর দেশে উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া যাহা হয় না, ইঁহাদিগের মধ্যে চরিত্রের সদ্গুণে তাহা অতি সহজে সম্পন্ন হয়।

২০। প্রতি গৃহে বালকবালিকাগণ সামান্য, অপরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ পরিয়া বর্দ্ধিত হয়। জর্ম্মণদিগের যে উন্নত দেহ ও সবল, সুগঠিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হই, এইরূপে বর্দ্ধিত হইয়াই তাহারা তাহা লাভ করে। জননী স্বয়ং সন্তানকে স্তন্যদান করেন, ধাত্রীর হস্তে শিশুকে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন না। (২২) প্রভু ও ভৃত্য কাহারও সন্তান সুখের কোলে পালিত হয় না; উভয়ের শিক্ষার এমন কোনও পার্থক্য নাই, যাহাতে বুঝিতে পারা যায়, এক জন প্রভুর পুত্র, অপর জন দাস-তনয়। সকলে এক গৃহে, এক মাঠে, একই পশুদলের মধ্যে বর্দ্ধিত হয়; বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বিক্রম ও সাহস দেখিয়া জানা যায়, কে স্বাধীন পিতার সন্তান। যুবকগণ বিলম্বে প্রেমের মোহনগীতি শ্রবণ করে, এজন্য তাহাদের যৌবনও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। পিতামাতা কন্যার বিবাহের জন্য কিছুমাত্র ব্যস্ততা প্রকাশ করেন না। তাহারা পুরুষদিগের ন্যায় উন্নতকায়; তাহাদিগের যৌবন আরম্ভ হইয়াই বিলয় প্রাপ্ত হয় না। তাহারা আপনাদিগের ন্যায় বলিষ্ঠ পুরুষদিগের সহিত পরিণীতা হয়, সুতরাং সন্তান সন্ততিও পিতামাতার সবল, সুদৃঢ় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রাপ্ত হয়। ভাগিনেয়েরা মাতুলালয়ে মাতুলপুত্রদিগের সহিত সমযত্নে পালিত হইয়া থাকে। (২৩) কোন কোন শাখা মাতুল ভাগিনেয় সম্পর্ককে অতি পবিত্র ও অচ্ছেদ্য মনে করে; এজন্য প্রতিভূ লইবার সময় ভাগিনেয়দিগকে পাইলে আর কাহাকেও চাহে না। কিন্তু সন্তানেরাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। জর্ম্মণদিগের মধ্যে দানপত্র বা চরমলিপীর (Will)

---

(১৮) শত্রুর মুখে এরূপ সুখ্যাতি গৌরবের বিষয়, সন্দেহ নাই।

(১৯) টাসিটাস্‌ স্বদেশবাসিনীদিগের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া এই সকল কথা বলিতেছেন। এই সময়ে রোমক নারীগণের নৈতিক অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল।—So profligate were the Roman ladies of the Empire that we are told, Tacitus's Annals II. 85, that the senate had to provide by law that no woman whose father, or grandfather, or husband was a knight should give in her name as a prostitute to the ædiles—Church and Brodribb.

(২০) রোমের অবস্থা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল বলিয়াই বড় দুঃখে লেখক এই উত্তপ্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন।

"Men and women married," says one author, "with a view to divorce, and divorced in order to marry. Many of these changes happened within the year, especially if the lady had a large fortune, which always went back with her, and procured her choice of transient husbands. And can one imagine, that the fair one who changed her husband every quarter, strictly kept her matrimonial faith all the three months?"—De Quincy, The Cæsars· বাড়াবাড়ি দেখিয়া অগষ্টস্‌ সীজার আইন করেন, স্বামীর মৃত্যু হইলে দশ মাসের মধ্যে কোনও স্ত্রীলোক বিবাহ করিতে পারিবে না। এই সময়ে একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া রোমক মহিলার দশম বিবাহ সম্পন্ন হয়।

Martial vi. 7.

(২১) রোমে এই উভয় দুর্নীতিই প্রচলিত ছিল।

(২২) ইংরেজ ও অন্যান্য ইয়ুরোপীয়েরা, শিশুকে স্তন্য দিবার জন্য ধাত্রী (Wet nurse) রাখেন। রোমেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল।

(২৩) যথা দাক্ষিণাত্যে নায়রদিগের মধ্যে।

প্রচলন নাই। সন্তান না থাকিলে প্রথমে ভ্রাতা, তৎপর পিতৃব্য, তৎপর মাতুল উত্তরাধিকারী। জ্ঞাতি কুটুম্বের সংখ্যা যত অধিক বৃদ্ধ বয়সে তত সম্মান। নিঃসন্তান ব্যক্তির, ঐশ্বর্য্য থাকিলেও, কোনও প্রভুত্ব নাই। (২৪)

২১। প্রত্যেক জর্ম্মণকে শত্রুতায় ও মিত্রতায় স্বদেশ ও স্বগণের সহিত একীভূত হইতে হয়। ইহাদিগের শত্রুতা আমরণ স্থায়ী নহে। নরহত্যা করিলেও দণ্ডস্বরূপ কতকগুলি পশু দিয়া নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। হত ব্যক্তির প্রতিনিধি, অপরাধীকে প্রকাশ্যে মার্জ্জনা করে, কারণ স্বাধীন জাতির মধ্যে একের সহিত অন্যের শত্রুতা রাজ্যের পক্ষে বড় বিপজ্জনক। সামাজিক উৎসবে ও আতিথেয়তাতে ইহারা যেরূপ মুক্তহস্ত ও সহৃদয়, এরূপ আর কোনও জাতিই নহে। আশ্রয়প্রার্থী হইলে কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করা ইহাদিগের চক্ষে অতি অধর্ম্মের কাজ। সকলেই আদরে বন্ধুবান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া অবস্থানুযায়ী ভোজন করাইয়া থাকে। আহার্য্য বস্তু কম হইলে গৃহস্বামী অতিথিদিগকে লইয়া নিকটবর্ত্তী গৃহে অনাহূত হইয়াও গমন করেন। সে গৃহে আহূত অনাহূতের তারতম্য নাই। আতিথেয়তা বিষয়ে পরিচিত, অপরিচিতের মধ্যে কোনও প্রভেদ লক্ষিত হয় না; সকলের প্রতি সমান যত্ন। ইহাদিগের নিয়ম এই, যাইবার সময় অতিথি কিছু চাহিলে তাহা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে; গৃহস্বামীও, অতিথির নিকট যাহা প্রার্থনা করেন, লাভ করেন। ইহারা উপহার পাইলে বড় আনন্দিত হয়, কিন্তু সেজন্য কোনও বাধ্যবাধক সম্বন্ধ স্বীকার করে না। অতিথির প্রতি ইহাদিগের ব্যবহার অতি ভদ্র।

২২। ইহারা সূর্য্যোদয়ের পর শয্যাত্যাগ করিয়াই স্নান করে। বৎসরের অধিকাংশ সময় শীত বলিয়া স্নানের জন্য প্রায়ই গরম জল ব্যবহার করে। স্নানান্তে আহার। প্রত্যেকে স্বতন্ত্র আসনে, স্বতন্ত্র টেবিলে ভোজন করে। তৎপর অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া কর্ম্ম ক্ষেত্রে অথবা সামাজিক সম্মিলনে উপস্থিত হয়। দিবা রাত্রি মদ্যপান করা কিছুমাত্র দোষের বিষয় মনে করে না। (২৫) মদ্যপদিগের যেমন সচরাচর হইয়া থাকে, পান করিতে করিতে বিষম বিবাদ উপস্থিত হয়; বিবাদ উপস্থিত হইলে, অতি অল্পদিনই কথায় শেষ হয়; অধিকাংশ সময়ই রক্তপাত ও নরহত্যা না হইলে উহার নিবৃত্তি নাই। কিন্তু ইহারা অনেক সময়ে এইরূপ পান ভোজনের কালে, শত্রুর সহিত পুনর্ম্মিলন, বন্ধুতা স্থাপন, রাজপুরুষ নির্ব্বাচন, প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করে, এবং যুদ্ধ ও সন্ধির সকল গুরুতর সমস্যার মীমাংসা করে; কারণ এই সময়ে ইহাদিগের চিত্ত সহজ চিন্তার অনুকূল ও সর্ব্বপ্রকার বীরত্বজনক কার্য্যে উৎসাহী থাকে। ইহাদের প্রকৃতি স্বভাবতঃ সরল ও কুটিলতাবর্জ্জিত, সুতরাং মত্ততার অবস্থায় ইহারা হৃদয়দ্বার একেবারে উন্মুক্ত করিয়া দেয়, কিছুই গোপন করিতে পারে না, কারণ এ সময়ে সকলের মন প্রমুক্ত, আবরণশূন্য থাকে। আলোচ্যবিষয় পরদিন পুনরায় আলোচিত হয়। এরূপ প্রণালী বিলক্ষণ হিতকারী। যখন মনের ভাব গোপন করা অসম্ভব, তখন ইহারা আলোচনা করে, এবং যখন ভ্রম করিবার আশঙ্কা নাই, তখন কর্ত্তব্য অবধারণ করে। (২৬)

২৩। জর্ম্মণেরা নানারূপ মদ ব্যবহার করে, তন্মধ্যে গোধূমের মদ অধিক প্রচলিত। ইহারা সামান্য আহারে সন্তুষ্ট। বনজফল, সদ্যমৃগয়ালব্ধ পশুমাংস, ঘনীভূত (congealed) দুগ্ধ, ইহাদিগের প্রধান খাদ্য। আহারে কোনও পারিপাট্য নাই, রসনাতৃপ্তিকর বস্তুর ব্যবহারও বিরল। কিন্তু ইহারা তৃষ্ণায় এরূপ সংযত নয়। মদ্যপান করিয়া ইহাদিগের তৃপ্তি নাই, যত দিবে, ততই পান করিবে। এজন্য সম্মুখ যুদ্ধ না করিয়া মত্ততার অবস্থায় আক্রমণ করিলে ইহাদিগকে সহজে জয় করা যায়।

২৪। ইহাদিগের মধ্যে উৎসবাদিতে কেবল একপ্রকারের ক্রীড়া দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই। ক্রীড়াপ্রদর্শনার্থী যুবকেরা নগ্নদেহে লম্ফ দিয়া কতকগুলি উলঙ্গ কৃপাণ ও বর্ষার মধ্যে পড়িয়া নৃত্য করে। ইহারা

(২৪) রোমে ছিল বলিয়াই একথা বলা হইল।
—Horace Satires II 5, 30; Juvenal VI. 140.

(২৫) আধুনিক জর্ম্মণগণ এ বিষয়ে বংশের নাম রাখিয়াছে। ইংরাজদিগের পানাসক্তিও নিতান্ত কম নহে।

(২৬) এই পরিচ্ছেদে রোমক জীবনের সহিত জর্ম্মণজীবনের পার্থক্য দেখান হইয়াছে। রোমের ভদ্রলোকেরা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিতেন, তৎপর কিছুকাল ক্রীড়া করিয়া স্নান করিতেন; আহারের সময় বন্ধুদিগের সহিত এক আসনে উপবেশন করিতেন। রোমে কেহ অস্ত্র লইয়া পথে বাহির হইতে পারিত না, দিনের বেলায় মদ্যপান নিন্দনীয় ছিল। রোমাণেরা জর্ম্মণদিগের ন্যায় অতিরিক্ত পানাসক্ত ছিল না।

অনেক শ্রম স্বীকার করিয়া এই ক্রীড়াতে দক্ষতা লাভ করিলেও অর্থলোভে ইহাতে নিযুক্ত হয় না। দর্শকদিগের আনন্দই এই অসমসাহসিক কার্য্যের পুরস্কার।

জর্ম্মণেরা বড় দ্যূতক্রীড়াসক্ত। লাভের আশায় সর্ব্বস্ব পণ করে; অবশেষে দেহ ও স্বাধীনতা পর্য্যন্ত হারায়। (২৭) পরাজিত ব্যক্তিকে দাসত্ব স্বীকার করিতে হয়। অধিকতর বলিষ্ঠ হইলেও তাহাকে জেতা শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লইয়া যাইয়া বিক্রয় করে, সে দ্বিরুক্তি মাত্র করে না—এই জাতির আত্মমর্য্যাদার জ্ঞান এতই অধিক। জয়লাভের লজ্জা হইতে মুক্তি পাইবার মানসে, জেতা হতভাগ্য পরাজিত ব্যক্তিকে দাসব্যবসায়ীর হস্তে সমর্পণ করে।

২৫। রোমে ক্রীতদাসগণ প্রভুর গৃহে বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত হয়, জর্ম্মণীতে সেরূপ নহে। তথায় তাহারা নিজ গৃহে পুত্রকলত্র লইয়া বাস করে এবং প্রভুকে নিরূপিত শস্য, পশু অথবা বস্ত্র প্রদান করে; এই পর্য্যন্ত তাহার দাসত্ব, অন্যান্য বিষয়ে সে স্বাধীন গৃহস্থের ন্যায় সুখশান্তি ভোগ করে। (২৮) দাসদিগকে সচরাচর প্রহার, বন্ধন, বা কঠোর শ্রমসাধ্য কার্য্যদ্বারা নিগৃহীত করা হয় না। কিন্তু তাহাদিগকে হঠাৎ ক্রোধের বশীভূত হইয়া হত্যা করিতে প্রায়ই দেখা যায়, আর এরূপ হত্যা করিলে প্রভুর কোনও দণ্ড হয় না। বলা উচিত, জর্ম্মণগণ স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর বা প্রভুত্বপ্রিয় নয়। দাসগণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াও গৃহে বা জনসমাজে বিশেষ গণনীয় হয় না।

২৬। জর্ম্মণীতে সুদ লইবার প্রথা অপরিজ্ঞাত; এ বিষয়ে আইনে নিষেধ বিধি নাই, অথচ সকলেই বিনা সুদে টাকা ধার দেয়। জাতি সাধারণের জমিগুলি কৃষকেরা পর্য্যায়ক্রমে চাষ করে, এবং ক্রমে সেগুলি রাজপুরুষেরা পদমর্য্যাদা অনুসারে আপনাদিগের মধ্যে বিভক্ত করিয়া লন। পতিত ভূমির অভাব নাই, সুতরাং এ সম্বন্ধে কোনও কলহ উপস্থিত হয় না। প্রতি বৎসর কৃষিক্ষেত্র পরিবর্ত্তিত হয়, তথাপি ভূমি প্রচুর পাওয়া যায়। জর্ম্মণী যেরূপ উর্ব্বরা অধিবাসিগণ তদনুরূপ কিছুই পরিশ্রম করে না। ইহারা বসুন্ধরার নিকট কেবল শস্য পাইয়াই সন্তুষ্ট হয়; নানারূপ ফল ফুলের জন্য বিন্দুমাত্র শ্রমস্বীকার করিতে চাহে না। ইহারা বৎসরে কেবল তিন ঋতুর কথা জানে; শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্ম ভিন্ন অন্য কোনও ঋতুর নাম ইহারা অবগত নহে।

২৭। ইহাদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যয়বাহুল্য নাই। (২৯) তবে যশস্বী বীরপুরুষদিগের দাহকার্য্যে বিশেষ বিশেষ কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়, এই মাত্র। শ্মশান-শয্যায় বস্ত্র, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি প্রদত্ত হয় না। মৃতব্যক্তির সহিত তাহার অস্ত্রশস্ত্র অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়; সৈনিক ও রাজপুরুষদিগের সহিত কখনও কখনও তাঁহাদিগের যুদ্ধাশ্বও দগ্ধ হয়। ইহারা মনে করে, বহুব্যয়সাধ্য সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করিলে পরলোকগত আত্মা অসুখী হন। জর্ম্মণেরা মৃত প্রিয়জনের জন্য দীর্ঘকাল ক্রন্দন ও অশ্রুপাত করে না, কিন্তু শোক যন্ত্রণা সহজে ভুলিতে পারে না। ইহাদিগের মত এই, রমণী শোকাকুলা হইয়া বিলাপ করিবেন, পুরুষ মৃতজনের চরিত্র ধ্যান করিয়া মহত্ত্বের পথে অগ্রসর হইবেন।

উপসংহার।

হিন্দু ও জর্ম্মণ।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে আরব নিবিড় তমসাচ্ছন্ন, জুডিয়া পরাধীন, গ্রীস পতিত, রোম ঐহিক সম্পদের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াও পৈশাচিক পাপে কলঙ্কিত, মিসর শ্রীহীন, জর্ম্মণী বর্ব্বর; তখন একা ভারতবর্ষ স্বগৌরবে অক্ষুণ্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জগতে জ্ঞান ও ধর্ম্মের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ বিতরণ করিতেছিল। অত্যুন্নত ভারতবাসীর সহিত অর্দ্ধসভ্য জর্ম্মণের সকল বিষয়ে তুলনা হয় না; কিন্তু ইঁহারা পরস্পরে জ্ঞাতি। অতএব, উভয়ের পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে সাদৃশ্য ও কোন্ কোন্ বিষয়ে তাহার অভাব আছে, নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করা যাইতেছে।

জর্ম্মাণ ও ভারত রমণীর মধ্যে চরিত্রপ্রভাবে আশ্চর্য্য

(২৭) এস্থলে যুধিষ্ঠিরের অক্ষক্রীড়া স্মরণযোগ্য।

(২৮) আমাদের দেশে অতি অল্প দিন পূর্ব্বেও এইরূপ দাসপরিবার দেখা যাইত। বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখকের ঊর্দ্ধতন নবম পুরুষ এক ক্রীতদাস পরিবার লইয়া চন্দ্রদ্বীপ হইতে আসিয়া জামুরিয়া গ্রামে বসতি করিতে আরম্ভ করেন। এই দাসাদগের উপাধি ছিল, 'সেন', প্রাচীন দলীলে ইহাদিগকে 'জড়খরিদা নফর' বলা হইয়াছে।

(২৯) রোমে খুব ছিল। ইসিডোরস নামক এক ব্যক্তি আপনার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় নব্বই হাজার পাউণ্ড, (বর্ত্তমান সময়ের চৌদ্দলক্ষ টাকা) ব্যয় করিবার আদেশ করিয়া যায়।

সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। পাতিব্রত্য-ধর্ম্মে জর্ম্মণ রমণী আর্য্যা ভারতবাসিনীর যোগ্যা ভগিনী। উভয়েই ছায়ার ন্যায় পতির অনুগামিনী, অর্থে ও ভোগে তাঁহার নিত্য সহচরী। উভয়েই সমাজে মাননীয়া। প্রভেদ এই, হিন্দুগণ নারীজাতিকে যে সম্মান প্রদর্শন করিতেন, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে স্বার্থবুদ্ধি—(Policy) প্রণোদিত; (৩০) জর্ম্মাণগণের শ্রদ্ধা কুসংস্কারবর্জ্জিত না হইলেও স্বভাব-সিদ্ধ। আর, জর্ম্মণ রমণী অনেক গুরুতর রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পরামর্শদান করিতেন, মন্ত্রদর্শী ঋষির ন্যায় রাজ্যের শুভাশুভ গণনা করিতেন; ভারত রমণী এরূপ কোনও অধিকার প্রাপ্ত হন নাই। উভয়েই বয়োপ্রাপ্ত হইয়া পরিণীতা হইতেন, কিন্তু ভারতে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল, জর্ম্মণীতে কদাচিৎ কোনও রাজা একাধিক পত্নী গ্রহণ করিতেন। দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে এই কুপ্রথা জর্ম্মণীতে বিলুপ্ত হয়, ভারতবর্ষে ইহা এখনও রহিয়াছে। ভারতরমণী সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানে বঞ্চিত ছিলেন, জর্ম্মণিতে গৃহদেবতার পূজা ও সেবা প্রায় স্ত্রালোকদিগকেই করিতে হইত। শারীরিক বীর্য্য ও সাহসে জর্ম্মণরমণী শ্রেষ্ঠা ছিলেন, কারণ এদেশে স্ত্রীজাতিকে কখনও অস্ত্র লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে হইত না। ব্যভিচারের দণ্ড জর্ম্মণী অপেক্ষা ভারতবর্ষে অনেক অধিক কঠোর ছিল। (৩১) জর্ম্মণগণ ব্যভিচারী পুরুষকে কি দণ্ড দিত, জানি না; হিন্দুগণ যে দণ্ড দিতেন তাহা অতি ভয়ঙ্কর। (৩২) জর্ম্মণ ও হিন্দু মহিলা, রোমীয় রমণীর ন্যায়, সামাজিক উৎসবাদিতে পুরুষদিগের সহিত যোগ দিতেন না। উভয়ের সন্তান পালন রীতি একরূপ ছিল।

ভারতবর্ষে প্রজাসাধারণের স্বাধীনতা ছিল না। তাহারা রাজাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত ও নির্ব্বিচারে তাঁহার আদেশ পালন করিত। এমত বলিতেছি না, প্রজাগণ তখন অসুখী ছিল। রাজকীয় কর্ত্তব্য পালন বিষয়ে মনু ও অন্যান্য শাস্ত্রকারদিগের উপদেশ অতি উচ্চ। কিন্তু রাজার ক্ষমতা অসীম ছিল, তাঁহার কার্য্য সম্বন্ধে প্রজাদিগের কিছু বলিবার অধিকার ছিল না। নেপোলিয়নের অধীনে ফরাসিজাতি ইয়ুরোপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছিল, তাই বলিয়া তাহারা আপনাদিগকে স্বাধীন মনে করিত না। ভারতের প্রকৃতিপুঞ্জও প্রাচীনকালে স্বাধীন ছিল না। এই জন্য আমাদিগের ভাষায় ইংরেজী State, লাটীন Civitas, শব্দের উপযুক্ত প্রতিশব্দ নাই। The English people, Populus Romanus, বলিলে যাহা বুঝায়, 'প্রজা' বলিলে তাহার কিছুই বুঝা যায় না। বৈদেশিকেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলে নৃপতিগণ আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়াছেন, প্রজাসাধারণ কখনও স্পানিয়ার্ডদিগের মত স্বদেশ-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া প্রাণ দিতে অগ্রসর হয় নাই; তাহার কারণ এই স্বাধীনতার অভাব। জর্ম্মণগণ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ছিল। তাহারা, রাজা, রাজপুরুষ ও সেনাপতিদিগকে আপনারা মনোনীত করিত, যোগ্যতা থাকিলে তাঁহাদিগের অনুগত হইত, নচেৎ নহে। তাহারা রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিত; তাহাদিগের অভিমত ভিন্ন রাজা যুদ্ধ বা শান্তি সম্বন্ধে কিছুই করিতে পারিতেন না। ইহা হইতেই Reichstag, Witenagemot, Parliament ও Congress এর উৎপত্তি। আধুনিক জর্ম্মণগণ বরং কিয়ৎপরিমাণে পরাধীন; তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় স্বাধীন ছিল। তারপর, ভারতবর্ষে ন্যায়াধিকরণ একান্ত একদেশদর্শী ছিল, একই অপরাধে বর্ণভেদে ভিন্ন ভিন্ন দণ্ডের বিধান ছিল। জর্ম্মণীতে জাতিভেদ ছিল না, সুতরাং সেখানে একশ্রেণীর প্রজা সর্ব্বদাই পদদলিত হইত না।

জর্ম্মণগণ পৌত্তলিক ছিল, কিন্তু তাহারা মানবের অবয়ব দিয়া দেবমূর্ত্তি প্রস্তুত না করিয়া পশুমূর্ত্তির পূজা

(৩০) প্রমাণ মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র :—

প্রজনার্থং মহাভাগঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষুণ বিশেষোঽস্তিকশ্চন॥ ৯। ২৬

টীকাকার কুল্লূক ভট্ট বলিতেছেন :—

যদাপ্যাসাং রক্ষণার্থং দোষা উক্তাস্তথা
পি যদা প্রতীকারা স্তেষাং এতা স্ত্রিয়ো
মহোপকারা গর্ভোৎপাদনার্থং বহু কল্যাণ
ভাজনভূতাঃ বস্ত্রালঙ্কারাদি দানেন সম্মানার্হাঃ ইত্যাদি।

(৩১) 'যদাপ্যাসাং দোষা উক্তাঃ' ইত্যাদি। বুঝিতে হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী ১৪। ১৫। ১৬। ১৭ শ্লোক পড়িতে হইবে।

(৩২) ভর্ত্তারং লঙ্ঘয়েদ্যাতু স্ত্রীজ্ঞাতিগুণদর্পিতা।
তাং শ্বভিঃ খাদয়েদ্রাজা সংস্থানে বহুসংস্থিতে।
পুনাংসন্দাহয়েৎ পাপং শয়নে তপ্ত আয়সে।
অভ্যাদধ্যুশ্চ কাষ্ঠানি তত্র দহ্যেত পাপকৃৎ॥ মনু, ৮।২৩১, ২৩২।

মনু, বর্ণ ও অবস্থাভেদে ব্যভিচারের বিভিন্ন প্রকার দণ্ড বিধান করিয়াছেন, এস্থলে সে সকলের উল্লেখ করা গেল না।

করিত। তাহারা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদে উপনীত হইতে পারে নাই। জর্ম্মণীতে পুরোহিতগণের প্রভাব এদেশ অপেক্ষাও প্রবল ছিল। জর্ম্মণগণ হিন্দুগণের ন্যায় পশু বলি দিত।

আতিথেয়তাতে উভয় জাতির প্রকৃতি একরূপ। অতিথিকে প্রত্যাখ্যান করা উভয়ের মতেই মহাপাপ। জর্ম্মণেরা হিন্দুদিগেরই মত সরল, সত্যপরায়ণ, কুটিলতাশূন্য ও সহৃদয় ছিল।

দাসত্ব প্রথা প্রাচীনকালের কলঙ্ক। হিন্দু, গ্রীক, রোমান, জর্ম্মণ কেহই এই পাপ হইতে মুক্ত ছিলেন না। (৩২) তবে, শূদ্রদিগের মত জর্ম্মণদাসগণ বিশেষ কোনও বর্ণের সৃষ্টি করে নাই। শূদ্রকে হত্যা করিলে কোন অপরাধেই ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড হইত না; (৩৩) জর্ম্মণেরাও অবাধে দাসদিগকে হত্যা করিতে পারিত।

দায়াধিকারে উভয় জাতির মধ্যে একটু প্রভেদ আছে। এদেশে নিঃসন্তান ব্যক্তির উত্তরাধিকারী ভাগিনেয়; সে দেশে এরূপ স্থলে প্রথমে ভ্রাতা, পরে পিতৃব্য, তদভাবে মাতুল, উত্তরাধিকারী বলিয়া গণ্য হইত।

জর্ম্মণগণ আমাদেরই মত শব দাহ করিত, এবং খ্যাতনামা পুরুষদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় বিশেষ বিশেষ কাষ্ঠ ব্যবহার করিত। এখনও এ দেশে অবস্থা বিশেষে চন্দনকাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

দেবদূত ও বিক্রমাদিত্য।

(একটি ইংরাজি কবিতার ভাবানুবাদ)

দ্বিপ্রহরা বিভাবরী;—উজ্জয়িনী-পতি
সহসা উঠিলা জাগি শয়ন-মন্দিরে;
দেখিলা দেবতা এক উজ্জ্বলমূরতি
দাঁড়ায়ে অনতিদূরে অবনত শিরে।

স্বর্ণময় গ্রন্থ এক বামহস্তে তাঁর,
দক্ষিণে লেখনী শোভে হীরক নির্ম্মিত।
দেবতা লিখন রত মনে আপনার,
দেখিয়া বিক্রমাদিত্য পরম বিস্মিত।

দেবতা চরণে রাজা করিয়া প্রণাম,
করপুটে শুধাইলা প্রশ্ন সবিনয়;—
"ওহে দিব্যধামবাসি, কি তোমার নাম?
কি লিখিছ কহ তুমি হইয়া সদয়।"

দেবতা কহিলা—"আমি দূত ঈশ্বরের,
সকল সংসারময় করিয়া ভ্রমণ
লিখি লিখি লইতেছি নাম প্রত্যেকের,
ঈশ্বরে প্রণয় করে যত যত জন।"

শুনিয়া বিক্রমাদিত্য জিজ্ঞাসেন তাঁয়,—
"দেখ দেখি, মম নাম আছে কিম্বা নাই।"
দেবতা করিয়া দৃষ্টি কহিলা রাজায়—
"তব নাম তালিকায় দেখিতে না পাই।"

শুনিয়া দুঃখিত রাজা চক্ষু করি নত
কহিলেন—"ভালবাসা ঈশ্বরের প্রতি
নাহি যদি থাকে মম, লিখিও অন্ততঃ
মানবগণেরে আমি ভালবাসি অতি।"

*　　　*　　　*
*　　　*　　　*

পরদিন নিশাযোগে আসি পুনরায়
দেবতা বিক্রমাদিত্যে দিলা সমাচার;—
"ঈশ্বর-প্রেমিক-জন-নাম-তালিকায়
ঈশ্বর লিখিলা নাম প্রথম তোমার।"

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

উপমা।

তুমি　সুন্দর যেন বিশ্বপ্লাবিনী
　　শারদ ইন্দু হাসি;
তুমি　পবিত্র যেন অর্ঘ্যডালায়
　　শুভ্র কুসুম রাশি।

(৩২) এদেশে সাত রকম দাস ছিল। মনু ৮।৪১৫।
(৩৩) মনুস্মৃতি।৮।৩৮০।

তুমি উজ্জ্বল যেন উষার প্রতিমা
কিরীটে কনকভাতি ;
তুমি স্নিগ্ধ যেমন বর্ষণ শেষে
স্তব্ধ বর্ষা রাতি।

তুমি নির্ম্মল যেন নীরদমুক্ত
সুনীল আকাশতল,
তুমি শান্ত যেমন আতপপূর্ণ
স্বচ্ছ সরসীজল।

তুমি কোমল যেমন শিশির সিক্ত
শেফালিকা সুকুমার ;
তুমি করুণ যেমন নীরব সন্ধ্যা
আকুল চিকুরভার।

তুমি সুরভিত যেন রজনীগন্ধা
নিশীথ আঁধারে ঢাকা ;
তুমি মধুর যেমন মাধবী প্রভাতে
মলয় অমিয়মাখা।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

বিবাহ বাসরে বিধবা বালিকা।

এক ধারে একাকিনী
কে তুই দাঁড়ায়ে বল,
এ আনন্দ কোলাহলে
কেন আঁখি ছল ছল ?

যতেক মঙ্গল কাজে
কেন নাহি ডাকে তোরে,
না বলিতে কেহ কিছু
এক ধারে যাস সরে !

নিভৃত গাছের ছায়ে
বিহগ বালিকা মত,
লুকায়ে লুকায়ে রাখ
আকুল বাসনা শত ;

কি যেন বলিতে চাস্,
সরে না বচন, হায়,
বরষার ধারা মত
আঁখি শুধু ভেসে যায়।

যেখানে আনন্দ গাথা,
যেখানে হুলুর ধ্বনি
যেখানে মঙ্গল ঘট
যেথা, কোলাহল শুনি ;

তুইরে থাকিস দূরে,
সে সব মঙ্গল হতে,
তোর ক্ষুদ্র হিয়া খানি
দিসনা সে ধারে যেতে।

নিরাশ জীবন আর
নিষ্প্রভ নয়ন লয়ে,
থাকিস সঙ্কোচে সদা
এক ধারে দাঁড়াইয়ে !

সতত রয়েছে লেখা
ওই কচি মুখে তোর
নিরাশার ভাষা দিয়ে,
মরণ যাতনা ঘোর।

সকলি মুছেচে তোর,
সিন্দুর বিন্দুর সাথে—
গিয়াছে আলোক ডুবে
গভীর আঁধার রাতে।

কেবলি আছিস্ তুই
সহিতে ঝটিকা ভার ;
আর আছে প্রাণ ভরা
দুঃখ শোক হাহাকার !

মৃত্যু বিনা নাহি তোর
আপনার কেহ আর ;
মুছাবে না কেহ হেথা
নয়ন সলিল ধার !

শ্রীসরলা দত্ত।

মৃত্যু।

মধ্যাহ্ন আকাশ তলে, অশোকবনচ্ছায়ায়, অলস-বাহিনী নির্ম্মল তটিনীতীরে প্রণয়ী যুগল উপবেশন করিয়াছিল।

উপবনে কুরবক, কিংশুক, কদম্ব বৃক্ষ। প্রভাতচ্যুত মল্লিকার ক্ষীণ গন্ধ, শাখাপত্রে লুক্কায়িত কপোতীর মধ্যাহ্ন-মর্ম্মস্পর্শী করুণ রব। মধ্যাহ্ন প্রখর নহে—পৌষ মাস, কিন্তু মধ্যাহ্নের আলস্য সর্ব্বত্র—বায়ুর বেগে, জলের প্রবাহে, পশুপক্ষীর গতিতে, আকাশের নিথরতায়, সর্ব্বত্র মধ্যাহ্নজনিত আলস্য। প্রভাত হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত স্থাবরজঙ্গমাকীর্ণা প্রাচীনা ধরণী দীর্ঘ পথ অতিবাহিত করিয়া শ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম করিতেছে।

যুবক অশোকমূলে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া উপবিষ্ট ছিল। যুবতী তাহার স্কন্ধে মস্তক রক্ষা করিয়া ঈষচ্চঞ্চল, ক্ষণভঙ্গুর তরঙ্গমালা নিরীক্ষণ করিতেছিল। আলস্যে কিছু অসংযত, স্খলিত মূর্ত্তি। কেশ অবেণীবদ্ধ, মুক্ত, কুঞ্চিত হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কিছু যুবকের অঙ্গে কিছু আপনার পৃষ্ঠে, কিছু বক্ষদেশে পড়িয়াছে। যুবক সেই কেশের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতেছে, কখন স্থির হইয়া আকাশের দিকে চাহিতেছে। দুই জনের কেহ কোন কথা কহিতেছে না।

ক্ষণেক পরে, আকাশের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া যুবক যুবতীকে কহিল, “দেখ !”

যুবতী আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, উপরে বাজপক্ষী উড়িতেছে, তাহার উর্দ্ধে একটী পারাবত উড়িতেছে। দুইজনে কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া দেখিতে লাগিল। চক্রাকারে, বৃহৎ মণ্ডলে পারাবত ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রমে উর্দ্ধে উঠিতেছে, মণ্ডলাকারে বাজপক্ষী নিম্নদেশ হইতে সেই পারাবতকে লক্ষ্য করিয়া উপরে উঠিতেছে। যতক্ষণ পারাবত বাজের উপরে থাকিবে ততক্ষণ তাহার কোন আশঙ্কা নাই, কারণ আকাশের নিম্নস্তর হইতে বাজপক্ষী উর্দ্ধস্তরস্থিত পারাবতকে ধরিতে পারে না। বাজপক্ষী পারাবতের উপরে উঠিতে পারিলেই পারাবতের আশঙ্কা। দেখিতে দেখিতে পারাবত এত ক্ষুদ্র হইয়া গেল যে তাহাকে আর ভাল করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না, কখন শ্বেতবর্ণ পক্ষ সূর্য্যালোকে প্রভাসিত হয় কখন পক্ষী দৃষ্টির অগোচর হয়। বাজপক্ষী পারাবত অপেক্ষা অনেক বৃহত্তর বলিয়া তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কোন পক্ষীটি উপরে, কোনটী নীচে তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় না।

মৃদুমন্দকলবাহিনী তটিনী তীরে বসিয়া উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে যুবক যুবতী সেই দৃশ্য দেখিতে লাগিল। সহসা দেখিল, অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পারাবত নীচে নামিয়া আসিতেছে। বাজপক্ষী উপরে। পারাবতের সে মণ্ডলাকার নির্দ্দিষ্ট গতি আর নাই। বাঁকিয়া চুরিয়া, প্রাণের ভয়ে যথা-সাধ্য সত্বর নামিতেছে। বাজপক্ষীও দ্রুত অবতরণ করিতেছে, কিন্তু তাহার কোনরূপ অস্থিরতা নাই, পারাবতকে লক্ষ্য করিয়া বেগে নামিতেছে। নামিতে নামিতে বাজ একবার স্থির হইল, অর্দ্ধ নিমেষকাল স্থির রহিল, তৎপরে পক্ষ সঙ্কোচ করিয়া ধনুকের জ্যা মুক্ত তীরের ন্যায় পারাবতের উপর পতিত হইল। পারাবত পক্ষ সঞ্চালন একেবারে রহিত করিয়া, লোষ্ট্রের ন্যায় ধরণীর অভিমুখে পতিত হইল। কিন্তু পতনের পূর্ব্বেই বাজপক্ষী বজ্র তুল্য নখের দ্বারা তাহাকে গ্রহণ করিল। গ্রহণ করিয়া রাখিতে পারিল না, পারাবত পক্ষপ্রহারে বাজের নখচঞ্চু মুক্ত হইয়া প্রণয়ীযুগলের সম্মুখে পতিত হইল।

ব্যথিতহৃদয়ে যুবতী কাতর শব্দ করিয়া পারাবতকে তুলিয়া লইল। দেখিল, বাজপক্ষীর তীক্ষ্ণ নখে পারাবতের তুণ্ড দীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মৃতপক্ষীর দেহ দেখিয়া রমণীর চক্ষে জল আসিল। মৃতপারাবতধৃতহস্তা শোকনমিতাঙ্গী সুন্দরীকে সান্ত্বনা করিয়া যুবক কহিল, “একটা পারাবতের জন্য শোক কেন ? বাজপক্ষী ত পারাবতকে মারিয়াই থাকে। ইহাই নিয়ম।”

রমণী কহিল, “পারাবত সুখে আকাশে উড়িতেছিল বাজপক্ষীরূপী মৃত্যু ইহাকে মুহূর্ত্ত মধ্যে গ্রহণ করিল। পারাবতমিথুনের অপরটী সন্ধ্যার সময় ইহাকে দেখিতে না পাইয়া শোক করিবে। মৃত্যুর কালাকাল নাই জানি। কিন্তু মরিয়া প্রাণী কোথায় যায় ? মৃত্যুই যদি নিশ্চয় তাহা হইলে ত আর সকলই মিথ্যা ! তোমার আমার এই ক্ষণিক সুখস্বপ্ন কোন দিন মৃত্যু আসিয়া ভঙ্গ করিয়া

দিবে! ওই নিষ্ঠুর বাজপক্ষীর মত আমাদের একজনকে গ্রহণ করিবে।"

চিন্তিত হইয়া যুবকও বিষণ্ণ হইল। নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "মৃত্যু কি? মানুষ মরিয়া কোথায় যায়? কেহ কখন বলিতে পারে না, কেন না, মৃত্যুর আলয় হইতে কেহই প্রত্যাগত হয় না। যদি মরিয়া ফিরিয়া আসিতে পারিতাম ত মৃত্যু কি তোমাকে বুঝাইতাম।"

যুবক এই কথা বলিবা মাত্র আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া, প্রদীপ্ত জ্বালাশালী দিব্য পুরুষ আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়া যুবকের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। সেরূপ রূপ মনুষ্যলোকে দেখিতে পাওয়া যায় না। সর্ব্বাঙ্গ হইতে স্নিগ্ধ জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতেছে। সে আলোক দিবালোকের ন্যায় নহে, চন্দ্রালোকের তুল্যও নহে, কোন বিচিত্র অদৃষ্টপূর্ব্ব দিব্য আলোক। মুখে অতি প্রশান্ত, উজ্জ্বল আলোক, চক্ষে গাঢ় করুণ জ্যোতি। যুবককে সম্বোধন করিয়া অমৃতায়মান বচনে কহিলেন, "আমার সঙ্গে আইস, মৃত্যুর আলয় দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিবে।"

ভয়াতুরা রমণী বিহ্বলের ন্যায় যুবকের হস্ত দৃঢ়রূপে ধারণ করিল, কহিল, "ইঁহাকে আমি কখন যাইতে দিব না। মৃত্যুর আলয় হইতে কেহ কখন ফিরিয়া আইসে না। তুমিও বাজপক্ষী, পারাবতের ন্যায় আমার প্রিয়তমকে গ্রহণ করিতে আসিয়াছ।"

দিব্য পুরুষ মৃদুমধুর দিব্য হাসি হাসিয়া কহিলেন, "আমি কৃতান্তের অনুচর নহি, মৃত্যুনিবাসে বাস করি না। সুন্দরি! আশ্বস্তা হও, কোন আশঙ্কা নাই, তুমি এখনই ইঁহাকে ফিরিয়া পাইবে।"

যুবক সেই দিব্য পুরুষকে দেখিয়া বিশ্বস্তচিত্তে যুবতীকে কহিল, "ইঁহার সহিত গমন করিতে আমার কোন আশঙ্কা বোধ হইতেছে না। তুমি নিশ্চিন্ত হও, আমি এখনি ফিরিয়া আসিব। আর যদি ইনি মৃত্যুরূপীই হন তাহা হইলেই বা কে ইঁহাকে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিবে?"

দিব্য পুরুষ কহিলেন, "কোন আশঙ্কা নাই, আমার সঙ্গে আইস।"

তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া যুবতীর হৃদয়েও স্বতঃ বিশ্বাস সমুৎপন্ন হইল। যুবকের হস্ত পরিত্যাগ করিয়া কহিল, "এই পুরুষের প্রতি আমারও অবিশ্বাস হইতেছে না। তুমি ইঁহার সঙ্গে গমন করিয়া শীঘ্র ফিরিয়া আইস।"

দিব্য পুরুষ যুবকের হস্ত ধারণ করিলেন। হস্তধারণ করিবা মাত্র যুবকের বাহ্য চেতনা লুপ্ত হইয়া দিব্য চেতনা সমুদিত হইল। পুরুষ যুবতীকেও লঘু স্পর্শ করিলেন; সেই স্পর্শে রমণী তরুমূলে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইল। দিব্য পুরুষ যুবকের হস্ত ধারণ করিয়া গগনমার্গে উত্থিত হইলেন। যুবকের দেহে অপূর্ব্ব লঘুতা ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হইল, অবলীলা ক্রমে আকাশবিহারী পক্ষীর ন্যায় আকাশে উঠিতে লাগিল। কিন্তু গতির বেগ পক্ষীর অপেক্ষা বহুগুণে দ্রুততর। যুবক তাহা অনুভব করিতে পারিল না। বুঝিল বায়ুস্তর ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে নিশ্বাসপ্রশ্বাসের কোন ক্লেশ হয় না। পদতলে মেঘ দেখিতে পাওয়া যায় না, পৃথিবী দেখিতে দেখিতে দূরস্থ ক্ষুদ্র গোলকের ন্যায় অদৃশ্য হইল। মস্তকের উপরে গাঢ় নীলিমা, দূরে দূরে জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী। স্তব্ধতা সর্ব্বব্যাপী। কল্পনাতীত, অতি গম্ভীর, অতি গভীর রহস্যময়, অবিচ্ছিন্ন স্তব্ধতা। জগতের কোন স্থানে সে স্তব্ধতার তুলনা নাই। শব্দের স্বল্পতা ও বহুলতা অনুসারেই নিস্তব্ধতা এবং কোলাহলের ধারণা। অরণ্যে, পর্ব্বত শিখরে, শান্ত সমুদ্রের নিস্তরঙ্গ বক্ষে স্তব্ধতা লক্ষিত হয়, পরন্তু সে কেবল শব্দের অল্পতা মাত্র। শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্থূলতাবশতঃ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ শব্দ শ্রুতিগোচর হয় না। কিন্তু শব্দশূন্য স্থান কোথায়? ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রাণীর হৃৎকোষের ধ্বনি বায়ুর তরঙ্গে, আলোকের স্পন্দনে সর্ব্বত্র শব্দিত হইতেছে। সর্ব্ব শব্দাতীত, চিরস্তব্ধ শূন্যমার্গ দিব্য পুরুষের প্রসাদে অদ্য যুবকের নয়নগোচর হইল। নিশ্বাসপ্রশ্বাসে পর্য্যন্ত শব্দ নাই, বিশাল, বিরাট, বিপুল স্তব্ধতা বৃহদাকাশ ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজিত রহিয়াছে।

ক্রমে সেই নীলিমা এবং সেই জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী দৃষ্টিপথের অতীত হইল। ক্রমে যুবক দিব্য পুরুষের হস্তাবলম্বন পূর্ব্বক অন্ধকারে প্রবেশ করিল। অন্ধকার ও স্তব্ধতা—এতদ্ব্যতীত আর কিছুই অনুভূত হয় না। এই অন্ধকারের অতুলনীয়। শাশ্বত অন্ধকার এই স্থানে—ইহারই ক্ষুদ্র খণ্ডাংশ জগৎকে তিমিরাবৃত করে। পুঞ্জীভূত সনাতন তিমিরের সংহতি, সে স্থানে কোন কালে আলোক প্রবেশ করে না, অপ্রতিদ্বন্দ্বী অন্ধকারের রাজ্য। বধিরের ন্যায়, অন্ধের ন্যায় যুবক সেই অন্ধকারে প্রবেশ করিল। দিগ্‌দিগন্তে সেই অন্ধকার বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে, যাহা কিছু সম্মুখে পাইতেছে তাহা গ্রাস করিতেছে। অন্ধকার অনন্ত সমুদ্রের ন্যায়; অন্ধকারের পর অন্ধকার, তাহার পর অন্ধকার, আরও অন্ধকার, অন্ধকার, অন্ধকার! চারিদিকে অন্ধকার আলিঙ্গন করিতেছে, বক্ষে চাপিয়া ধরিতেছে, চক্ষে কর্ণে নাসিকায় অন্ধকার প্রবেশ করিতেছে, বাহুর নীচে, পাদদ্বয়ের মধ্যে অন্ধকার গমনাগমন করিতেছে! স্তরের পর স্তর, তরঙ্গের পর তরঙ্গ, কক্ষের পর কক্ষ, যোজনের পর যোজন! সেই অনুমেয় অন্ধকারে পথপ্রদর্শক কে? চক্ষু কিছু দেখিতে পায় না—আলোকের স্বপ্নসম্ভাবনা পর্য্যন্ত নাই, চতুর্দ্দিকে অন্ধকার লক্ষ বাহু প্রসারিত করিতেছে। যে দিব্য পুরুষ গ্রহনক্ষত্রখচিত আকাশ পথে যুবককে আনয়ন করিয়াছিলেন, তিনিই তাহাকে সেই অন্ধকারের মধ্য দিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় অলক্ষিতবেগ গতিতে লইয়া চলিলেন।

গাঢ় অন্ধকার তরল হইয়া আসিতে লাগিল। প্রথমে ঊষার পূর্ব্বগামী আলোকের ন্যায় অস্পষ্ট আলোক দেখা দিল। সহসা সেই আলোকের সহিত সেই সর্ব্বব্যাপী স্তব্ধতা ভঙ্গ হইয়া গেল। প্রথমে অস্ফুট কলরব, কোটী কোটী ভ্রমর গুঞ্জনের ন্যায় শব্দ, ক্রমে সেই ধ্বনি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বহু ভাষা, বহু স্বর চতুর্দ্দিকে উত্থিত হইতে লাগিল। প্রবলতর শব্দে সে শব্দও ডুবিয়া গেল। ঘোর গম্ভীর গর্জ্জন, নিরবচ্ছিন্ন মেঘ গর্জ্জনের ন্যায়, ক্ষুব্ধ সমুদ্র গর্জ্জনের ন্যায়, দিগ্বিদিক হইতে আসিয়া বেষ্টন করিল। লক্ষে লক্ষে, নিনাদে নিনাদে সেই গর্জ্জন উঠিতে লাগিল। আলোক সেইরূপ অস্পষ্ট, দিকে দিকে অনন্ত শূন্য। সেই গর্জ্জন ধ্বনিতে যুবকের শ্রবণ পীড়িত হইতে লাগিল, চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হইল। দিব্য পুরুষ তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক মনোবেগে গমন করিতে লাগিলেন। গর্জ্জন ক্রমে মন্দীভূত হইয়া গেল। আলোক স্পষ্টতর হইল। বিচিত্র দ্যুলোকের ঊষা এবং প্রদোষালোক সম্মিলিত—অতি কোমল, স্নিগ্ধ, শান্ত। মস্তকের উপর জগতের সে নীলাকাশ আর নাই—কোন বিচিত্র রশ্মিখচিত, কিরণ-সূত্রে নির্ম্মিত চন্দ্রাতপের ন্যায় মণ্ডপ, তাহাতে শত নক্ষত্র তুল্য দীপ্তিশালী গোলক বিলম্বিত রহিয়াছে। মধ্যস্থলে সরল, স্থির বিদ্যুতের রেখাপথ, মুহুর্মুহু তাহা হইতে জ্যোতিস্ফুলিঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। সেই রেখার উপর চরণ স্থাপন করিয়া দিব্য পুরুষ দণ্ডায়মান হইলেন। যুবকও তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইল। যুবকের হস্ত পূর্ব্ববৎ দিব্য পুরুষের হস্তে রহিল। দিব্য পুরুষ যুবককে কহিলেন, "মৃত্যুলোক দর্শন কর!"

তাঁহার আদেশ মত যুবক চাহিয়া দেখিল! স্তরে স্তরে আলোকের তরঙ্গ চলিয়া গিয়াছে। সেই আলোকে বিভাসিত অতি অপূর্ব্ব নূতন জগৎ! কোথাও সৌধশ্রেণী, কোথাও পুষ্পিত বনবীথিকা, ছায়াগর্ভ, নির্ম্মল, স্থির সরসী। কত প্রাণী আনন্দে বিচরণ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে সমুদয় অন্তর্হিত হইল। পুনরায় দৃশ্যপটের পরিবর্ত্তনের ন্যায় নব নব জগতের অভ্যুদয় হইতে লাগিল। যুবক কহিল, "হস্ত ত্যাগ করুন, আমি এই সকল নগর নগরী, নবীন জগৎ দেখিব।"

হস্ত ত্যাগ করিতেই যুবক পতিত হইল। নিম্নশির, ঊর্দ্ধপদ হইয়া অশনির ন্যায় বেগে পতিত হইতে লাগিল। কতকাল তাহার এরূপ পতন হইত কে বলিতে পারে? অকস্মাৎ দিব্য পুরুষ যুবকের হস্ত গ্রহণ করিলেন। বাজপক্ষী যেরূপ পারাবতকে গ্রহণ করিয়াছিল সেরূপ নহে। দ্বিতীয় বার সেই বিদ্যুৎ রেখাপথের উপর দিব্য পুরুষের পার্শ্বে যুবক দণ্ডায়মান হইল। দিব্য পুরুষ কহিলেন, "তুমি একা কিছু দেখিতে পাইবে না। আমার সঙ্গে আইস।" তাঁহার সহিত যুবক সেই সকল বিচিত্র মনোহর স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিল। কোথাও অট্টালিকার ছায়া, অট্টালিকা নাই, কোথাও প্রাণিগণ আসিতেছে যাইতেছে, কিন্তু পৃথিবীবাসীদিগের মত তাহাদের দেহ নাই। তাহারাও অকস্মাৎ অপসৃত হইতেছে।

যুবক জিজ্ঞাসা করিল, "এই কি মৃত্যুলোক? দেহান্তে কি জীবগণ এই স্থানে আগমন করে?"

দিব্য পুরুষ কহিলেন, "এই স্থানের অধিবাসী কাহাকেও জিজ্ঞাসা কর।"

সম্মুখে সুন্দরী রমণীকে দেখিয়া যুবক জিজ্ঞাসা করিল, "মৃত্যুলোক কি এই?"

রমণী কহিল, "শুনিয়াছি পৃথিবীতে মৃত্যুলোক আছে। এখানে আমরা কিছু কাল বাস করিয়া চলিয়া যাইব।"

যুবক কিছুদূর গমন করিয়া একটি বৃদ্ধ ব্যক্তিকে দেখিতে পাইল। জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, ইহাকেই কি মৃত্যুলোক বলে? প্রাণী মরণান্তে কি এই স্থানে আগমন করে?"

বৃদ্ধ সস্মিতমুখে, স্নেহস্বরে কহিলেন, "আমাদিগকে কি মৃতের মত দেখাইতেছে? মৃত্যুর সবিশেষ তথ্য তোমার পার্শ্ববর্ত্তী এই পুরুষ অবগত আছেন, ইঁহাকে জিজ্ঞাসা কর।"

যুবক দিব্য পুরুষকে বলিল, "আপনি কৃপা করিয়া আমার সংশয় ভঞ্জন করুন।"

"বলিতেছি, আমার সঙ্গে আইস," বলিয়া দিব্য পুরুষ যুবককে লইয়া পুনরায় প্রাহিত হইলেন। পূর্ব্বোক্ত বিদ্যুৎ রেখার উপর দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। বহুদূর এই রূপ গমন করিয়া যুবক সবিস্ময়ে দেখিল সম্মুখে অনির্ব্বচনীয় প্রভাময় আলোক অলাতচক্রের ন্যায় ঘূর্ণিত হইতেছে। সে আলোকের উপমা নাই, স্বপ্নকল্পনাতীত সমুজ্জ্বল আলোকচক্র। কখন আলোকচক্রের কেন্দ্রস্থল সঙ্কুচিত হইতেছে কখন সম্প্রসারিত হইতেছে। সেই আলোক হইতে নানাবিধ মূর্ত্তি সমুৎপন্ন হইতেছে, পুনরায় তাহাতেই বিলীন লইতেছে, আবার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তির অভ্যুদয় হইতেছে।

দিব্য পুরুষ যুবককে সম্বোধন করিয়া মৃদুগম্ভীরস্বরে কহিলেন, "ইহাই জীবন ও মৃত্যুর রহস্য। বিকাশ ও বিলয়, তৎপরে পুনর্বিকাশই নিয়ম তদ্ভিন্ন মৃত্যু নাই।"

যুবকের হস্ত ধারণ করিয়া দিব্য পুরুষ প্রত্যাগমন করিলেন। কিয়ৎ কাল পরে হস্ত ত্যাগ করিবা মাত্র যুবক দেখিল অশোকবৃক্ষমূলে তটিনীতীরে সে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দিব্য পুরুষ অন্তর্হিত হইয়াছেন।

সায়াহ্ন আগত প্রায়। সায়ংকালীন দিবালোকে নদী, উপবন, প্রকৃতির চিত্রপট সমুদ্ভাসিত হইতেছে। অশোকমূলে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া, আলুলায়িত কুন্তলে, শিথিল আলস্যে রমণী নিদ্রিত রহিয়াছে। সুখস্বপ্নে ঈষৎ হসিতাধরা, ন্যস্ত অঞ্চলে করতল লগ্ন। মুখ চুম্বন করিয়া যুবক তন্বীর নিদ্রা ভঙ্গ করিল। চক্ষু উন্মীলন করিয়া যুবককে দেখিয়া, যুবতী সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখিলে?"

"দেখিলাম, মৃত্যু নাই। সর্ব্বত্র জীবন, সর্ব্বত্র পরিবর্ত্তন। মৃত্যু সমাপ্তি, সমাপ্তি কুত্রাপি নাই।"

সর্ উইলিয়ম্ উইল্সন্ হণ্টর।

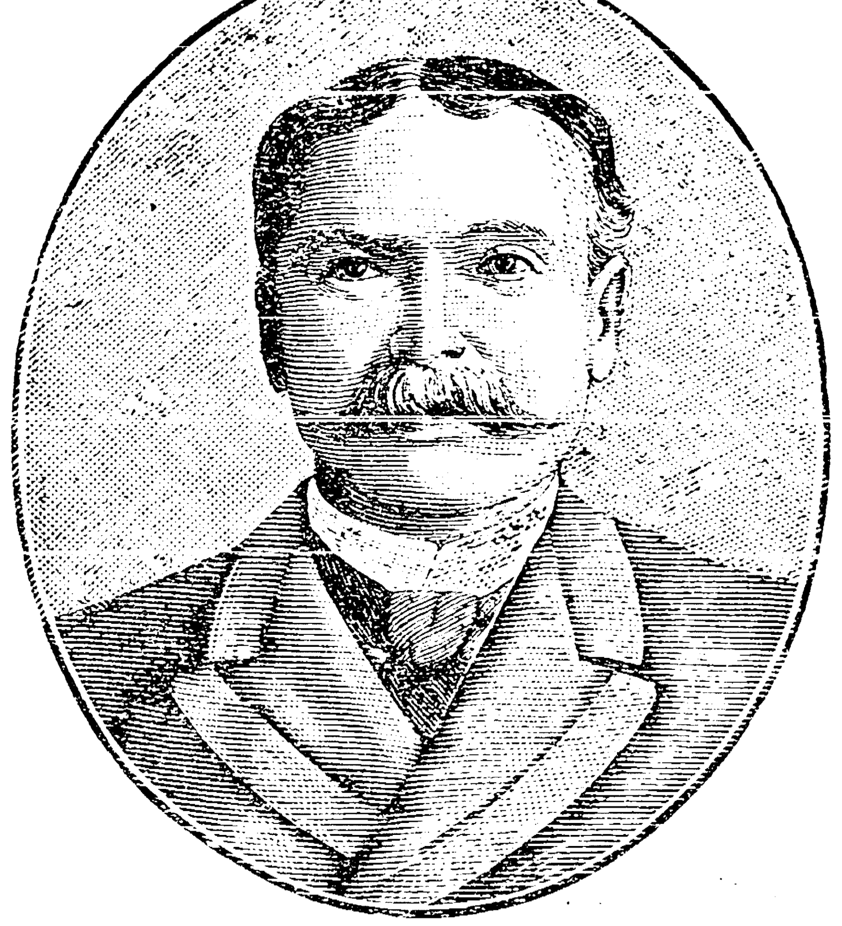

ভারতবর্ষের শাসনকার্য্যে বহুবৎসর ব্যাপৃত থাকিয়া যে সকল ইংরাজ রাজপুরুষ ইংলণ্ডে বিশ্রাম ভোগ করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্ উইলিয়ম্ উইলসন্ হণ্টর অপেক্ষা কেহই সুপরিচিত ছিলেন না। এই সম্প্রদায়ের ইংরাজদিগের মধ্যে সাহিত্যজগতেও কেহ তদপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিলেন না। ভারতবাসীদিগের আশা ও আশঙ্কার সহিত তাঁহার সহানুভূতি ছিল। এই সকল কারণে প্রদীপে তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে। কিন্তু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় থাকিলে যেমন অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণেও জীবন্ত মানুষটিকে পাঠকবর্গের সম্মুখে খাড়া করা যাইতে পারিত, এই সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিতে তাহা করিতে পারা যাইবে না। তাঁহার বিস্তৃত কোন জীবন চরিত থাকিলে তাহা হইতেও সাক্ষাৎ পরিচয়ের কতক ফল পাওয়া যাইত। কিন্তু তদ্রূপ জীবন-চরিত নাই।

সর্ উইলিয়ম্ উইল্সন্ হণ্টর ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ১৫ই জুলাই তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন। সিপাহি বিদ্রোহের পর যে জেম্স্ উইল্সন্ সাহেব ভারতবর্ষের অর্থসচিব নিযুক্ত হন, হণ্টর সাহেব তাঁহার ভাগিনেয় ছিলেন। সুতরাং তাঁহার মাতৃকুলের সহিত ভারতবর্ষের সম্পর্ক দেখা যাইতেছে! তিনি গ্লাসগো, প্যারিস ও বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ত্রয়ে বিদ্যালাভ করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে যে প্রতিযোগিতাত্মক সিবিল সার্ব্বিস্ পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাহাতে হণ্টর সাহেব অতি উচ্চ স্থান লাভ করেন। এই পরীক্ষার ফলে যাঁহারা সিবিলিয়ান নির্ব্বাচিত হন, এক বৎসর পরে তাঁহাদিগকে আবার একটি পরীক্ষা দিতে হয়। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে গৃহীত এই দ্বিতীয় পরীক্ষায় হণ্টর সাহেব প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত ও ভারতবর্ষের কোন কোন প্রচলিত ভাষায় বিশেষ পারদর্শিকতা প্রদর্শন করেন। তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন জেলার শাসন কার্য্যে বেশী দিন যাপন করিতে হয় নাই। অন্যবিধ রাজকার্য্যেই তাঁহার চাকরীর অধিকাংশ সময় যাপিত হয়।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যায় ঘোরতর দুর্ভিক্ষ হয়। সেই সময়ে তিনি উড়িষ্যা প্রদেশের ও বাঙ্গালা দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাংশের স্কুল্ ইন্স্পেক্টর নিযুক্ত হন। তিনি ১৮৬৯ সাল পর্য্যন্ত এই কার্য্য করেন। দুর্ভিক্ষের শেষে তিনি গবর্ণমেণ্টের ধন্যবাদ প্রাপ্ত হন, কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রম বশতঃ ভগ্নদেহে ছুটি লইয়া বিলাত যাইতে বাধ্য হন। বিদ্যালয়ের পরিদর্শকরূপে তাঁহাকে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে হইত। সেই সুযোগে তিনি উড়িষ্যার ও দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গের অনেক ঐতিহাসিক ও সামাজিক তত্ব সংগ্রহ করেন। এই সকল উপকরণ লইয়া তিনি ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে The Annals of Rural Bengal রচনা করেন। দশ বৎসরের মধ্যে এই পুস্তকের পাঁচটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়।

এই পুস্তকের ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন ঃ—

"It is not history itself, but it endeavours to bring together from remote and unexplored sources the material of which a real history of India may be composed. It goes forth into the field, it penetrates the jungle, it lingers in the thatchroofed villages, it encamps under many a spreading tropical tree; everywhere it mingles with the PEOPLE, trying to understand them as an equal and a friend, and to interpret those under currents of joy and suffering which make their inner life."

ভূমিকার এই অংশটিতে গ্রন্থকারের হৃদয়ের সুন্দর প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ১৪০ পৃষ্ঠায় লেখক বলিয়াছেন —

"They ["the Bengalis of the present day"] have about them the capabilities of a noble people. আমাদের জাতীয় আত্মশ্লাঘা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য এই বাক্যটি উদ্ধৃত করি নাই। আমাদের উদ্দেশ্য হণ্টর সাহেবের গুণগ্রাহিতা প্রদর্শন, এবং এরূপ গুণগ্রাহী ব্যক্তি বক্ষ্যমাণ পুস্তকে আমাদের যে সকল দোষ দেখাইয়াছেন, তৎপ্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষ ও উচ্চ এশিয়ার ১৩৯টি অনার্য্য ভাষার এক খানি অভিধান প্রস্তুত করেন। ছুটির পর ভারতবর্ষে প্রত্যাগত হইয়া তিনি ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং সেক্রেটরী অব্ ষ্টেটের ধন্যবাদ প্রাপ্ত হন। তদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের নিকট বিশ হাজার টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন। পুরস্কার এবং ধন্যবাদের কথা সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী নিযুক্ত হন, এবং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ভারতগবর্ণমেণ্টের অধস্তন সেক্রেটরী নিযুক্ত হন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতগবর্ণমেণ্টের ডিরেক্টর জেনারেল অব্ ষ্টাটিষ্টিক্স্ নিযুক্ত হন। এই বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীরূপে তিনি সমুদয় ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকসংখ্যা, উদ্ভিজ্জ, খনিজ, ও শিল্পজাত দ্রব্য, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ের বিবরণ সংগ্রহরূপ দুরূহ কার্য্যের পরিচালনা করেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এই কার্য্য সমাপ্ত হয়, এবং ১২৮ খণ্ড পুস্তকে সমুদয় সংগৃহীত বিবরণ প্রকাশিত হয়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে The Imperial Gazatter of India নাম দিয়া তিনি ঐ ১২৮ খণ্ড পুস্তকের একটি সারসংগ্রহ প্রকাশিত করেন। উহা ৯ খণ্ডে পরিসমাপ্ত হয়। এই সময়ে তিনি ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত হন। ১৮৮১ হইতে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যে সকল ভূমি সম্বন্ধীয় আইন ও প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হয়, তৎ-সম্পর্কে হণ্টর সাহেব বিশেষ পরিশ্রম করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের প্রথম সেন্সস্ অর্থাৎ আদম সুমারী গৃহীত হয়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ২০ খণ্ড পুস্তকে বাঙ্গালা দেশের Statistical Accounts প্রকাশিত করেন।

দুর্ভিক্ষের কারণ নির্ণয় এবং তাহা নিবারণের উপায় উদ্ভাবনার্থে হণ্টর সাহেব বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে C. I. E. উপাধি প্রাপ্ত হন।

তিনি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় শিক্ষা কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হন। বাঙ্গালীদের মধ্যে ৺ভূদেব

মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু এবং মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই কমিশনের সভ্য ছিলেন। এই কমিশন উচ্চ ও নিম্ন শিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহার অধিকাংশই যুক্তিসঙ্গত ও জাতীয় জীবনের সহিত উদার সহানুভূতি প্রসূত। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষের কোন প্রদেশেই সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে কার্য্য হইতেছে না। শিক্ষা কমিশনের সভাপতি এবং ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরূপে তিনি যে পরিশ্রম করেন, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের ধন্যবাদ প্রাপ্ত হন।

ভারতবর্ষে রেলওয়ের বিস্তার হওয়াতে দেশের শিল্প, বাণিজ্যাদির কি প্রকার মঙ্গলামঙ্গল হইতেছে, তাহা নিরূপণ করিবার জন্য ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বিলাতের পার্লেমেণ্টের একটী কমিটী নিযুক্ত হয়। ভারত গবর্ণমেণ্ট উক্ত কমিটীর সমক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্য হণ্টর সাহেবকে প্রেরণ করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যত্ব ব্যতীত আরও একটী পদে হণ্টর সাহেব বড় লাট লর্ড ডফরিন্ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন। উহা আয়ব্যয় কমিশনের সভ্যত্ব। ভারতবর্ষীয় রাজকোষ হইতে যে ব্যয় হয়, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিবার জন্য এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ ভারত গবর্ণমেণ্টকে বার্ষিক যে টাকা দেন, তাহার পরিমাণ পুনঃনির্দ্ধারণ করিবার জন্য উক্ত কমিশন নিযুক্ত হয়। হণ্টর সাহেব একবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে কে, সি, এস্ আই উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ২৫ বৎসর রাজকার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। গত ফেব্রুয়ারি মাসে ৬০ বৎসর বয়সে অকস্মাৎ ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জারোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার শরীর বেশ বলিষ্ঠ ছিল। তাহা সত্ত্বেও এই বয়সে মৃত্যুর কারণ তাঁহার একজন বন্ধু নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ১৮৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দের শীতকালে তিনি সস্ত্রীক কাস্পিয়ান হ্রদের তীরবর্ত্তী বাকু সহরে একটী পীড়িত পুত্রের সেবা শুশ্রূষার জন্য যান। সেই সময়ে শীতে ও ক্লান্তিতে বড় কষ্ট পান। তাহার উপর তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপাদানগুলি হারাইয়া যাওয়াতেও তাঁহার বড় ক্লেশ হয়। এই সকল কারণে তাঁহার শরীর রোগপ্রবণ হইয়া পড়ে। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় মারা পড়িবার ইহাই কারণ। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি ৯ খণ্ডে পরিমিত Imperial Gazetteer of India নামক গ্রন্থের একটি পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ বাহির করেন। এই সংস্করণ ১৪ খণ্ডে সমাপ্ত হয়।

পূর্ব্বে উল্লিখিত পুস্তকগুলি ব্যতীত তিনি আরও অনেক পুস্তক রচনা করেন, কয়েকটীর নাম নিম্নে লিখিত হইতেছে। ১। উড়িষ্যা। দেশীয় রাজত্বকালে ও ইংরাজ শাসনে উড়িষ্যার ইতিহাস ও অবস্থার কথা ইহাতে বিবৃত আছে। যাঁহারা হিন্দু স্থপতি ও ভাস্করগণের শিল্প নৈপুণ্যের বিষয় অবগত হইতে চান, বৌদ্ধদিগের মানবপ্রেমের ও হিতৈষণার পরিচয় লাভ করিতে চান, তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থখানি পড়িতে বলি। উড়িষ্যার অধিবাসী এবং উড়িষ্যার নিকটস্থ প্রদেশবাসী বাঙ্গালিগণ পুরাকালে কিরূপ সাহসী নাবিক, জলযোদ্ধা ও উপনিবেশ সংস্থাপক ছিলেন, তাহার অনেক পরিচয় আমরা এই গ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত হই। এতদ্বিষয়ক কয়েকটী বাক্য নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে :—

"The ruin of Tamluk as a seat of maritime commerce affords an explanation of how the Bengalis ceased to be a sea going people. In the Buddhist era they sent warlike fleets to the east and the west and colonised the islands of the archæpelago. Even Manu, in his inland centre of Brahmanism at the far north west, while forbidding such enterprises betrays the fact of their existence. He makes a difference in the hire of river boats and of seagoing ships, and admits that the advice of merchants experienced in making voyages on the sea, and in observing different countries, may be of use to priests and kings. But such voyages were associated chiefly with the Buddhist era, and became alike hateful to the Brahmans and impracticable to a deltaic people whose harbours were left high and dry by the land-making rivers and the receding sea. Religious prejudices combined with the changes of nature to make the Bengalis unenterprising upon the ocean. But what they have been, they may under a higher civilisation again become. The unwarlike Armenians whom Lucullus and Pompey blushed to conquer, supplied seven centuries later, the heroic troops who annihilated the Persian monarchy in the height of its power. To any one acquainted with the revolutions of races, it must seem mere impatience ever to despair of a people; and in maritime courage, as in other national virtues, I firmly believe that the inhabitants of Bengal have a new career before them under British rule."

(ORISSA, PP. 314-315.)

ইহাতে অনেকগুলি সুন্দর ছবি আছে। ২। "ভারতীয় মুসলমানগণ।" পরলোক গত সর্ সৈয়দ আহম্মদ খাঁ এই পুস্তকের প্রতিবাদ করেন, এবং অনেক বিষয়ে হণ্টর সাহেবের ভ্রম প্রদর্শন করেন। ৩। A system of famine warnings. নাম হইতেই এই গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। ৪। লর্ডমেয়োর জীবনচরিত। ৫। লর্ড ডালহৌসীর জীবন চরিত। ৬। The Indian Empire, its History, People, and Products। অর্থাৎ ভারত সাম্রাজ্যের ইতিহাস, এবং ইহার অধিবাসী এবং শস্য ও পণ্য দ্রব্যাদির বৃত্তান্ত। এতদ্ভিন্ন তিনি Rulers of India (ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তৃগণ) নামক গ্রন্থাবলীর সম্পাদকতা করেন; এবং নিজে তদন্তর্গত লর্ড ডালহৌসীর জীবনচরিত প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার বিদ্যালয়ে পাঠ্য ভারতেতিহাস শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই সুপরিচিত। আমরা যতদুর জানি এই পুস্তকখানির পূর্ব্বে কোনও বিদ্যালয় পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাসে হিন্দু ও বৌদ্ধ শাসনকালের এরূপ বিস্তৃত ও সহৃদয়তাপূর্ণ বিবরণ বাহির হয় নাই। তাঁহার শেষ গ্রন্থ ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস। ইহার প্রথম খণ্ড এক বৎসর পূর্ব্বে বাহির হয়। এই গ্রন্থ তিনি সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি ইহার জন্য যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করেন, সমস্তই "নেপাল" নামক জাহাজের সহিত সমুদ্রে লয় পায়, তাহার পর দশ বৎসর ধরিয়া তিনি আবার উপকরণ সংগ্রহে নিযুক্ত হন। কিন্তু জাহাজ ডুবিতে যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহার সম্পূর্ণ পূরণ করিতে পারেন নাই। যাহা পারিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশের জন্য তিনি নিজ পুস্তকের ভূমিকায় গোওালের ঠাকুর সাহেব এবং দারভাঙ্গার ভূতপূর্ব্ব মহারাজকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। এই পুস্তকের জন্য তিনি ইংলণ্ড, পোর্টুগাল ও হল্যাণ্ড দেশ হইতেও অনেক উপকরণ সংগ্রহ করেন। কিন্তু নূতন করিয়া উপাদান সংগ্রহ করিতে হওয়ায় তিনি পুস্তক খানিকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রসীমায় আবদ্ধ করিতে বাধ্য হন। প্রথমে ইচ্ছা ছিল, আর্য্যগণের ভারতবর্ষ প্রবেশ কাল হইতে এদেশের ইতিহাস লিখিবেন; কিন্তু শেষে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া কেবল ইংরাজ শাসনকালের ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাহাও শেষ হইল না, তাঁহার সংগৃহীত মালমসলা কোন উপযুক্ত লোকের হাতে পড়িলে হয়ত আমরা কালে সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি পাইব। কিন্তু সম্প্রতি তাঁহার সমকক্ষ ইঙ্গ ভারতীয় আর কাহাকেও দেখা যাইতেছে না।

রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়া হণ্টর সাহেব কিছুকাল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যভাষার পরীক্ষকের কার্য্য করিয়াছিলেন, এতদ্ভিন্ন তিনি নিয়মিতরূপে টাইম্‌স্ পত্রে ভারতবর্ষীয় নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতেন। ভারতবাসীদিগের রাজনৈতিক অধিকার লাভেচ্ছার তিনি বিরোধী ছিলেন না। তিনি মনে করিতেন যে কোন কোন বিষয়ে আমরা অতিরিক্ত সংস্কার ও অধিকার প্রার্থী। তিনি পরিমিত সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি হইতে কংগ্রেস্ সম্বন্ধে তাঁহার মত জানিতে পারা যায়।

"The more advanced classes in this new India have organised themselves into an association which no Indian member of Parliament can overlook— I mean the Indian National Congress. Whatever we may think of the details of the programme of that Congress, it represents a political power in India which no Indian statesman and no Indian member of Parliament can afford to disregard. The Indian Congress is essentially the child of British rule, the product of our schools and universities. We have created and fostered the aspirations which animate the Congress, and it would be both churlish and unwise to refuse now to those aspirations both our sympathy and our respectful consideration"

অনেকের মনে থাকিতে পারে যে, ইল্‌বার্ট বিলের সময় হণ্টর সাহেব বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভায় নির্ভীকতার সহিত উক্ত বিলের সপক্ষে বক্তৃতা করেন।

সার উইলিয়াম হণ্টরের নিজের গভীর পাণ্ডিত্য ছিল না। কিন্তু তিনি অপরের পাণ্ডিত্যের ফল পাঠক সাধারণের নিকট হৃদয়গ্রাহী বেশে উপস্থিত করিতে পারিতেন। তিনি উচ্চশ্রেণীর ঐতিহাসিকও ছিলেন না। তাঁহার শেষ গ্রন্থে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক ও অন্যত্র

দুর্লভ তথ্য আছে। কিন্তু উহাতে design ও proportion এর অভাব দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ ক্ষুদ্র ঘটনা অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং সমগ্র গ্রন্থখানি ও একটী সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালীর অনুগত নহে। তাঁহার রচনা বেশ সরস ও সরল ছিল। এই সকল গুণ তাঁহার রচিত "The Old Missionary এবং The Thackerays in India প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। তাঁহার গ্রন্থসমূহে এরূপ শ্রমশীলতা, বুদ্ধিমত্তা ও রচনা নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, এবং তিনি এত গ্রন্থ লিখিয়াছেন যে, তাহাতে দশ জন গ্রন্থকার প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিতেন। তাঁহার একজন বন্ধু একখানি ইংরাজী দৈনিক পত্রে লিখিয়াছেন—"তিনি 'প্রায়ই বলিতেন, আমি কি যেন অনুভব করি যাহা সর্ব্বদাই আমাকে ক্রিয়াশীল হইতে উত্তেজিত করে।" তিনি এত বড় এত কাজ করিয়াছিলেন কিন্তু কখনও আপনাকে একটা বড় লোক বলিয়া তাঁহার মনে অহমিকা জন্মে নাই। তিনি ছোট বড় সকলেরই সহিত তাহাদেরই একজন হইয়া মিশিতে পারিতেন। তাঁহার গ্রামের সকলের সুখে সুখী, ব্যথায় ব্যথী ছিলেন। তিনি সুবক্তা এবং সদালাপী ছিলেন। অবসর সময় অশ্বারোহণ এবং হুইষ্ট্ ক্রীড়া (এক প্রকার তাসখেলা)তে যাপন করিতেন।

নিষ্ফল অপরাধ।

রাত্রিকালে, ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহে দোতালার ঘরে দুইটী লোক বসিয়াছিল। একজন প্রৌঢ় বয়স্ক, মস্তকে কৃষ্ণ-পক্ক কেশ, শরীর বলিষ্ঠ, চক্ষু উজ্জ্বল। আর একজন যুবা পুরুষ, কিছু ক্ষীণ কিন্তু নিতান্ত দুর্ব্বল নয়। প্রৌঢ় বয়স্ক পুরুষ বসিয়া যুবককে দেখিতেছিল। যুবা চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিল, কিন্তু নিদ্রাগম হইলে যেরূপ অঙ্গ শৈথিল্য হয় যুবকের সেরূপ অবস্থা নহে। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্থির হইয়া বসিয়াছিল।

প্রৌঢ় বয়স্ক পুরুষ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি নিদ্রিত ?"

নিমীলিতচক্ষু যুবক উত্তর করিল, "না, তুমি ত আমাকে নিদ্রা যাইতে বল নাই।"

"নিদ্রা যাইও না, তোমাকে এখন জাগিয়া থাকিতে হইবে।"

"জাগিয়াই আছি।"

"কি দেখিতেছ ?"

"তুমি আমার সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছ। গৃহে আলোক জ্বলিতেছে।"

"রাত্রি কত ?"

"জানি না।"

"আমার পকেটে ঘড়ী আছে, দেখ।"

"দেখিয়াছি।" যুবক বসিয়া রহিল।

"কি দেখিলে ?"

"দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে।"

প্রৌঢ় বয়স্ক পুরুষ পকেট হইতে ঘড়ী বাহির করিয়া দেখিল, দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। যুবককে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি ভাবিতেছ ?"

"কিছু না, তুমি কি বলিবে তাহারই অপেক্ষা করিতেছি।"

"বাহিরে যাও।"

"যাইতেছি।" যুবক পূর্ব্ববৎ বসিয়া রহিল।

"কি দেখিতেছ ?"

"বড় অন্ধকার, কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না।"

"নীচে নামিয়া যাও।"

"এই যাই।"

"পথে কি দেখিতেছ ?"

"এখন আর তত অন্ধকার নাই। পথে বড় লোক জন নাই।"

"পূর্ব্ব মুখে বরাবর চলিয়া যাও।"

"বরাবর যাইতেছি।"

"কত দূর গিয়াছ ?"

"অনেক দূর। পথ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে।"

"যাইতে বাম দিকে থামওয়ালা বাড়ী দেখিতে পাইতেছ ?"

"সম্মুখে দেখিতেছি। এইবার বাড়ীর নিকটে আসিয়াছি।"

"দাঁড়াও।"

"দাঁড়াইয়াছি।"

"বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ কর।"

"দ্বার রুদ্ধ, ভিতরে প্রবেশ করা যায় না।"

"অপরের পক্ষে রুদ্ধ, তুমি প্রবেশ করিতে পারিবে।"

"করিয়াছি"

"উপরে যাও।"

"বড় অন্ধকার! কোন্ দিক দিয়া যাইব ?"

"ডাহিন দিকে ফিরিয়া সিঁড়ী পাইবে। উপরে যাও।"

"উপরে আসিয়াছি।"

"কোথাও আলোক দেখিতে পাইতেছ ?"

"বারান্দার এক কোণে একটী ঘরে আলোক জ্বলিতেছে। দ্বার রুদ্ধ, দ্বারের উপরের কাচ দিয়া আলোক প্রবেশ করিতেছে।"

"ঐ ঘরে প্রবেশ কর।"

"করিয়াছি।"

"কি দেখিতেছ ?"

"ঘরে টেবিলের উপর অনেক কাগজ পত্র ছড়ান রহিয়াছে। ঘরের দেয়ালে গা আলমারি। তাহার ভিতর লোহার দেরাজ সিন্দুক। একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি সেই সিন্দুক খুলিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।"

"কি করিতেছে ?"

"প্রস্তরখণ্ডের মত কতকগুলা কি সাজাইতেছে। আবার সে গুলা ছাড়িয়া লোহার সিন্দুকের ভিতর হইতে একখানা কি কাগজ বাহির করিয়া দেখিতেছে।"

"দেখ দেখ, কি কাগজ!" প্রৌঢ় পুরুষ আগ্রহে উঠিয়া দাঁড়াইল।

"উহু, মাথা ভাঙ্গিয়া গেল," বলিয়া চীৎকার করিয়া যুবক মাথায় হাত দিল।

প্রৌঢ় পুরুষের মাথায়ও যেন অত্যন্ত আঘাত লাগিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে ?"

"মস্তকে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে।"

"কিসে ?"

"জানি না।"

"কেহ আঘাত করিয়াছে ?"

"তাহা বলিতে পারি না।"

"আবার দেখ।"

"কিছু দেখিতে পাইতেছি না।"

"কেন, সেই কাগজ ?"

"কই, দেখিতে পাইনা।"

"সেই বৃদ্ধ ?"

"তাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না।"

"লোহার সিন্দুক, ঘর ?"

"কিছু না।"

"তোমার কি হইয়াছে ?"

"বলিতে পারি না। বোধ হয় মস্তকে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে।"

"আচ্ছা, তুমি উঠিয়া গিয়া শয়ন কর। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে উঠিবে।"

যুবক সেইরূপ নিমীলিত নয়নে উঠিয়া শয়ন করিতে গেল।

প্রৌঢ় বয়স্ক পুরুষ কর মর্দ্দিত করিয়া, দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া আপনা আপনি বলিল, "এখনও তাহাকে পারিতেছি না, তাহার বল আমার অপেক্ষা অধিক। দেখা যাক্, পারি কি না।"

তাহার নাম যুগলকিশোর, নৈনীতাল পাহাড়ের নিকট বাস। এখন লক্ষ্ণৌ সহরে রহিয়াছে। যুবকের নাম মদনমোহন। যুগলকিশোরের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে যুগলকিশোরের সহিত সাক্ষাৎ হয়, সেই পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে আছে। মদনমোহনকে যুগলকিশোর হিপনটিক্ বলে বশীভূত করিয়াছিল। যুবকের এখন আর এমন বল নাই যে যুগলকিশোরকে ছাড়িয়া আর কোথাও যায়!

প্রাতঃকালে মদনমোহন উঠিয়া যুগলকিশোরকে অভিবাদন করিল। যুগলকিশোর জিজ্ঞাসা করিল, "রাত্রে কেমন নিদ্রা হইয়াছিল ?"

"নিদ্রার কোন ব্যাঘাত হয় নাই। আমি এমন করিয়া আর কতদিন বসিয়া থাকিব ? একটা কর্ম্মকাজের চেষ্টা করি।"

"সে জন্য এত ব্যস্ত কেন ? আমি ত তোমায় এখনি বিদায় করিয়া দিতেছি না। দেখিয়া শুনিয়া একটা ভাল কর্ম্ম করিয়া দিব।"

"তাহা হইলে ভাল হয়। এমন করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ভাল লাগে না।"

"আর অধিক দিন এরূপ থাকিতে হইবে না। যাহাতে শীঘ্র তোমার একটা কিছু হয় আমি সে চেষ্টায় আছি।"

আহারাদির পর যুগলকিশোর বাহিরে গেল। মদন মোহন বসিয়া তুলসীদাসের রামায়ণ পড়িতে লাগিল।

সহর ছাড়িয়া যুগলকিশোর গোমতীর ধার দিয়া অনেক দূর গেল। লোকালয় ছাড়িয়া অনেক দূরে ভগ্ন সমাধি পড়িয়া রহিয়াছে। সেই সমাধির পার্শ্বে জীর্ণ ইষ্টক দ্বারা আচ্ছাদিত গুহা। ইষ্টক সরাইয়া যুগলকিশোর গুহায় প্রবেশ করিল। অন্ধকারে কিছু দূর গিয়া প্রাচীন সমাধির ভগ্নাবশিষ্ট দেখিতে পাইল। অনেক খুঁজিয়া সমাধির ভিতর কয়েক খানি অতি প্রাচীন তুলটের কাগজ পাইল। বাহিরে আসিয়া কাগজগুলি ভাল করিয়া দেখিল। বলিল, "না, এখানে নাই।" ফিরিয়া আসিয়া সহরে একটা থামওয়ালা বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। দরজায় দুই জন জোয়ান দ্বারবান বসিয়া আছে। একজন জিজ্ঞাসা করিল "কেঁও লালা জী?"

"মালিক মকান সে মিল্‌নে মাংতা হুঁ।" যুগল কিশোর পাশ কাটাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিল। অমনি দরওয়ান তাহার পথ রোধ করিল।

"সিওয়ায় হুকুম অন্দর না জাইয়ে।"

"অচ্ছি বাত হয়, যা কে ইত্তলা দেও।"

"কেয়া নাম?"

"বাঁকে লাল।"

"কাঁহা সে আয়ে?"

"দিল্লী সে।"

"কেয়া কাম?"

"মিল্‌নে মাংতা হুঁ। কাম উন্‌কো বতাউঙ্গা, তুমকো নহিঁ।"

"ঠহরিয়ে আপ, ময় ইত্তলা দেতা হুঁ।"

এক জন দরওয়ান চলিয়া গেল, আর এক জন যুগলকিশোরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরেই সে ব্যক্তি ফিরিয়া আসিয়া, এক টুকরা কাগজ যুগলকিশোরের হাতে দিয়া বলিল' "মুলাকাত নহি হোগা।"

কাগজে লেখা ছিল "নাম ভাঁড়াইবার আবশ্যক কি? যখন নিজের নাম বলিয়া আসিবে তখন সাক্ষাৎ করিব।"

যুগলকিশোরের কর্ণরন্ধ্র দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিতে লাগিল। একটী কথাও না কহিয়া চলিয়া গেল। দরওয়ান দুই জন পরস্পরের মুখ চাহিয়া একটু হাসিল।

বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া যুগলকিশোর একটা ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট বেলা কাটাইল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় মদনমোহনকে ডাকিল। সম্মুখে বসাইয়া তাহার চক্ষের প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া দুই চারি বার তাহার মুখের সম্মুখে অঙ্গুলি চালনা করিল। মদনমোহন একবার বলিল, "তুমি কি কর আমি বুঝিতে পারি না। আমার কষ্ট হয়।"

যুগলকিশোর কেবল দৃষ্টির বলে যুবককে পরাভূত করিল। মদনমোহনের চক্ষু মুদ্রিত হইল, দেহ স্থির হইল। যুগলকিশোর ডাকিল, "মদন মোহন!"

"কি?"

"তোমার চিত্তবৃত্তি এখন কাহার অধীন? তোমার না আমার?"

"তোমার।"

"কালিকার কথা মনে পড়ে?"

"পড়ে।"

"আজ আবার সেই গৃহে যাইতে পারিবে?"

"পারিব।"

"তবে যাও।"

"যাই।"

কিয়ৎকাল যুগলকিশোর নীরবে রহিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "এখন তুমি কোথায়?"

"সেই গৃহের সম্মুখে আসিয়াছি।"

"এ কেবল কল্পনা। তোমাকে যদি উঠিয়া সহজ লোকের মত যাইতে বলি ত পারিবে?"

"পারিব।"

"মনে কর তুমি সেইরূপ সশরীরে গিয়াছ। তাহা হইলে কি গৃহে প্রবেশ করিতে পারিবে?"

"না।"

"কেন?"

"দ্বার রুদ্ধ। প্রবেশ পথ নাই। দ্বারের নিকট ভিতর দিকে দুই জন দরওয়ান শয়ন করিয়া আছে। কোন শব্দ হইলে তাহারা জাগিয়া উঠিবে।"

"তাহা হইলে সে পথে প্রবেশ করিবার আবশ্যক নাই। বাড়ীর পশ্চাতে যাও।"

"এই যে আসিয়াছি।"

"কি দেখিতেছ?"

"প্রাচীর। প্রাচীরের ভিতরে উদ্যান।"

"প্রাচীর কত উচ্চ?"

"অধিক উচ্চ নয়।"

"নিঃশব্দে প্রাচীর লঙ্ঘন করা যায়?"

"যায়।"

"তবে লঙ্ঘন কর।"

"করিয়া উদ্যানে আসিয়াছি।"

"গৃহের অভিমুখে যাও।"

"সেই দিকে যাইতেছি।"

"কিছু দেখিতে পাওয়া যায়?"

"ছোট একটী দরজা। গ্রীষ্মের জন্য দরজা খুলিয়া একটী বৃদ্ধা খাটিয়ায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে।"

"তাহার নিদ্রা ভঙ্গ না করিয়া ভিতরে প্রবেশ করা যায়?"

"স্বচ্ছন্দে। প্রবেশ করিব?"

"কর। কোথায় আসিলে?"

"প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের এক দিকে উপরে উঠিবার সিঁড়ী আছে।"

"সিঁড়ীতে উঠ। উপরে কি আছে।"

"সিঁড়ীর উপর দরজা। বন্ধ।"

"ভিতর দিক হইতে না বাহির দিক হইতে?"

"বাহির দিক হইতে।"

"দরজা খোল, যেন কোন শব্দ না হয়।"

"খুলিয়াছি।"

"এবার কি?"

"বারান্দা।"

"বারান্দা দিয়া যাও। কোথায় যাওয়া যায়?"

"বহির্ব্বাটীতে।"

"এ পর্য্যন্ত কোন লোক জন দেখিতে পাইলে?"

"কই, না। বোধ হয় সকলেই নিদ্রিত।"

"বহির্ব্বাটীতে কোন ঘরে আলোক আছে?"

"সেই ঘরে আছে।"

"কোনরূপ শব্দ না করিয়া প্রবেশ করিতে পারা যায়?"

"এদিক দিয়া পারা যায় না। দ্বার খুলিতে গেলে শব্দ হয়।"

"আর কোন দিক দিয়া প্রবেশ করা যায়?"

"রাস্তার দিকে বারান্দার দরজা খোলা আছে। সে দিক দিয়া ঘুরিয়া যাওয়া যায়।"

"সেই দিক দিয়াই যাও।"

"তাহাই যাইতেছি।"

"ঘরের ভিতর কি দেখিতেছ?"

"সেই বৃদ্ধ।"

"প্রবেশের সময় সে কি তোমায় দেখিতে পাইল?"

"না, সে এই দিকে পৃষ্ঠ দিয়া আলমারি খুলিয়া কি দেখিতেছে। বসিলেও এই দিকে পৃষ্ঠ থাকে।"

"কি করিতেছে?"

"কাল যে কাগজখানা দেখিতেছিল সেই খানা হাতে দোলাইয়া শুকাইতেছে। কাগজখানা ভিজা।"

যুগলকিশোর মৃদু মৃদু, আপনার মনে বলিল, "মূর্খ! ভিজাইল কেন?" প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করিতেছে?"

"কাগজখানা শুকাইয়া আলমারির ভিতর রাখিয়া দিল। এখন আপনার মনে অল্প অল্প হাসিতেছে।"

"কে হাসে, দেখা যাইবে," বলিয়া যুগলকিশোর রাগিয়া উঠিল। মদনমোহন কোন কথা কহিল না।

যুগলকিশোর আবার কথোপকথন আরম্ভ করিল। "তাহার পর দেখ কি করে?"

আলমারি ও লোহার দেরাজ সিন্দুক বন্ধ করিয়া চাবি আর একটা বাক্সে রাখিল।"

"বাক্সের চাবি কোথায় রাখে?"

"নিজের কাছে।"

"তাহার পর?"

"শয়নের উদ্যোগ করিতেছে। এই গৃহেই শয়ন করে।"

"আর কেহ এ গৃহে শয়ন করে?"

"না।"

"ঘরের বাহিরে কোন ভৃত্য শয়ন করে?"

"কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না।"

"হইয়াছে। যে পথে গিয়াছিলে সেই পথ দিয়া ফিরিয়া আইস।"

অতঃপর পূর্ব্বরাত্রির ন্যায় মোহনলালকে শয়ন করিতে আদেশ করিয়া যুগলকিশোর নিজের শয়নাগারে গমন করিল।

পর দিবস যুগলকিশোর বাড়ীর বাহির হইল না। দিবাভাগে মোহনলালকে ডাকিল না, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল না। রাত্রি এগারটা বাজিলে স্থির হইয়া বসিয়া, একাগ্রচিত্তে মোহনলালের মনের প্রতি আপনার মানসিক বল প্রয়োগ করিল। সেই মানসিক বলে মোহনলালকে আপনার সমক্ষে আহ্বান করিল। মোহনলাল উঠিয়া আপনার কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া, যুগলকিশোরের সম্মুখে উপস্থিত হইল। চক্ষু নিমীলিত।

যুগলকিশোর কহিল, "চক্ষু উন্মীলন কর।"

মোহনলাল চক্ষু উন্মীলন করিল। কিন্তু সে চক্ষের দৃষ্টি স্থির, পল্লবে নিমেষ নাই। জাগ্রত ব্যক্তির ন্যায় চক্ষের চঞ্চলতা নাই।

গলকিশোর কহিল, "চক্ষু এইরূপ থাকিবে।"

মোহনলালের চক্ষু সেইরূপ রহিল।

যুগলকিশোর কহিল, "আজ তোমায় একটী কঠিন কর্ম্মে নিয়োগ করিব।"

"যাহা বলিবে তাহাই করিব।"

"তুমি কাল ও পরশু রাত্রে যে বৃদ্ধকে দেখিয়াছিলে তাহাকে স্মরণ আছে?"

"আছে।"

"অনেক কাল পূর্ব্বে আমি তাহার শিষ্য ছিলাম। সাধারণ লোকের অবিদিত নানাবিধ বিদ্যায় সে সবিশেষ পারদর্শী। কিন্তু অত্যন্ত গর্ব্বিতস্বভাব। আমার সামান্য ত্রুটী হওয়াতে আমাকে তাড়াইয়া দেয়। বুঝিতে পারিতেছ?"

"বুঝিতেছি।"

"সেই পর্য্যন্ত আমি নানা স্থানে নানা চেষ্টা করিয়া অনেক বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি। জানিতে পারিয়াছি সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ এক বিদ্যা আছে। অনেক সন্ধানের পর ইহাও জানিতে পারি যে কোন ক্ষমতাবান পুরুষ সেই বিদ্যা শিক্ষার প্রণালী এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া রাখেন। একজনকে শিখাইবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার আদেশ মত সেই কাগজ খানি তাঁহার সমাধিতে রক্ষিত হয়। সমাধি এই নগরের নিকটে। জানিতে পারিয়াই এখানে চলিয়া আসি। সমাধি স্থানে গিয়া দেখি, কোন ব্যক্তি ইষ্টক ভাঙ্গিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিয়া সেই কাগজ খানা লইয়া গিয়াছে। সে ব্যক্তি আর কেহ নহে, আমার পূর্ব্ব গুরু। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার সাক্ষাৎ পাইলাম না। পত্র লিখিয়া পুনরায় শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে সম্মত হইলাম, কোন উত্তর পাইলাম না। তখন গিয়া তোমাকে লইয়া আসি। সেই গুপ্ত বিদ্যা শিখিবার জন্য আমি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিব। সেই কাগজ খানি পাইবার জন্য এমন কর্ম্ম নাই যাহা করিতে না পারি। কিন্তু সেই বৃদ্ধ অত্যন্ত ক্ষমতাবান। প্রথম রাত্রে তুমি সেই কাগজ খানি দেখিতে পাইলে না তাহার ক্ষমতা বলে। তোমার মস্তকে, আমার মস্তকে আঘাত লাগিল সেও তাহার ক্ষমতায়। সে শক্তি, সে বিদ্যা আমার নাই। সেই গুপ্ত বিদ্যা শিখিতে পারিলে সকল শিক্ষাই হইবে। কিন্তু যাহার কাছে সেই কাগজ রহিয়াছে তাহার সহিত কৌশলে আমি পারিব না। বলই আমার একমাত্র উপায়। অতএব বল প্রয়োগ করিব। শুনিতেছ?"

"সকল কথা শুনিতেছি।"

"কিরূপে বল প্রয়োগ করিব? বলপূর্ব্বক তাহার গৃহে প্রবেশ করিতে পারি না। পারিলেও বল প্রদর্শন মিথ্যা, কারণ তাহার লোকবল আছে, এবং নানা বিদ্যার বলে সে স্বয়ং বলবান। বল প্রয়োগ করিতে হইবে, অথচ কৌশল চাই। যদি কোন উপায়ে সেই কাগজ খানি তাহার নিকট হইতে লইতে পারি তাহা হইলে সে যত দিন জীবিত থাকিবে ততদিন আমার সর্ব্বপ্রকার আশঙ্কা। এই জন্য তাহাকে হত্যা করিয়া সেই কাগজ খানি লইতে হইবে। আমি স্থির করিয়াছি, এই কর্ম্মে তোমাকে নিযুক্ত করিব।"

মোহনলাল প্রস্তর মূর্ত্তির তুল্য স্থির।

যুগলকিশোর বলিল, "সকল কথা বুঝিলে?"

"সকল কথা বুঝিয়াছি।"

"পারিবে?"

"পারিব।"

তখন যুগলকিশোর একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিয়া মোহনলালের হস্তে দিল। কহিল, "দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ কর।"

মোহনলাল সেইরূপ করিয়া ধরিল।

যুগলকিশোর দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়া মোহনলালের ভ্রূযুগের মধ্যস্থলে ঈষৎ স্পর্শ করিল। সেইরূপে অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিয়া কহিল, "যাহা কহিতেছি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।"

"পূর্ব্বের অপেক্ষা ও মনোযোগপূর্ব্বক শুনিতেছি।"

"তুমি এই ছুরী বস্ত্রের মধ্যে লুক্কায়িত করিয়া অত্যন্ত সাবধানে সেই গৃহে যাইবে।"

"সাবধানে যাইব।"

"সদর দরজার দিকে যাইবে না। বাড়ীর পশ্চাতে প্রাচীরের কাছে যাইবে।"

"তাহাই হইবে।"

"প্রাচীর লঙ্ঘনের সময় বিশেষ সাবধান হইবে যেন কোন শব্দ না হয়, কিম্বা কেহ দেখিতে না পায়। পিছনের দরজার কাছে বৃদ্ধা যদি ঘুমাইয়া না থাকে তাহা হইলে যতক্ষণ সে নিদ্রিতা না হয় ততক্ষণ উদ্যানে লুকাইয়া থাকিবে।"

"থাকিব।"

"তাহার পর সাবধানে গৃহে প্রবেশ করিবে। এখন তুমি কিছু দেখিতে পাইতেছ না, যাহাকে আমি নির্দ্দেশ করিতেছি কেবল তাহাকেই দেখিতেছ, কিন্তু সে সময় আমার আদেশে সমস্ত দেখিতে পাইবে। চারিদিকে দেখিয়া সেই আলোকিত কক্ষে প্রবেশ করিবে। প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে বৃদ্ধের পৃষ্ঠ দ্বারের দিকে আছে কি না লক্ষ্য করিয়া দেখিবে। নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধের পশ্চাতে গিয়া বাম কণ্ঠের উপর দিয়া নীচের দিকে ছুরী মারিবে, যাহাতে আমূল বিদ্ধ হয়। তৎক্ষণাৎ ছুরী ছাড়িয়া বৃদ্ধের মুখ চাপিয়া ধরিবে, যেন মৃত্যুকালে সে যন্ত্রণায় চীৎকার না করে। তাহার পর আলমারির ভিতর হইতে সেই কাগজ খানা বাহির করিয়া লইবে। আর কিছু লইবে না। ছুরীও বাহির করিয়া লইবে। লইয়া সত্বর সাবধানে ফিরিয়া আসিবে।"

"আসিব।"

"এখন যাও," বলিয়া যুগলকিশোর মদনমোহনের ললাট হইতে আপনার অঙ্গুষ্ঠ সরাইয়া লইল।

মদনমোহন উঠিয়া অভ্রান্ত স্থির গতিতে নীচে নামিয়া গেল।

যুগলকিশোর উঠিয়া দাঁড়াইয়া, দুই হস্ত সঞ্চালন করিয়া মানসিক সমস্ত বল মদনমোহনের অভিমুখে প্রেরণ করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ এইরূপে গেল। অনেকক্ষণ পরে যুগলকিশোর হস্ত সঞ্চালন রহিত করিল। একটু পরে নীচের সিঁড়ীতে পদশব্দ হইল। মদনমোহন উপরে উঠিয়া আসিল। সেইরূপ অভ্রান্ত, দৃঢ় পদক্ষেপে গৃহে প্রবেশ করিলে যুগলকিশোর দেখিল তাহার এক হস্তে রক্ত মাখা ছুরিকা, স্থানে স্থানে রক্ত জমিয়া কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে; আর এক হস্তে জীর্ণ, গলিত এক খণ্ড কাগজ। অত্যন্ত ব্যগ্রতার সহিত সেই কাগজ খানা মদনমোহনের হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া আলোকের সম্মুখে লইয়া গেল। আলোক উজ্জ্বলতর করিয়া কাগজে কি লেখা আছে দেখিতে লাগিল। কাগজের দুই পৃষ্ঠাই লেখায় পরিপূর্ণ। কিন্তু আলোকের নিকটে ধরিয়া যেমন যুগলকিশোর পড়িতে যাইবে অমনি সে লেখা মিলাইতে আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত লেখাই মিলাইয়া গেল, কাগজে মসিচিহ্ন পর্য্যন্ত রহিল না। যুগলকিশোর উল্টাইয়া পাল্টাইয়া অনেক বার দেখিল, কাগজ পরিষ্কার, এক বর্ণও কোথাও লেখা নাই।

যুগলকিশোরের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। অনেকক্ষণ ভাবিয়া মদনমোহনকে জিজ্ঞাসা করিল, "সে ঘরে কি রকমের আলোক জ্বলিতেছিল?"

"এ রকম নয়, সে আলোক আর এক প্রকার।"

"আমাকে বল নাই কেন?"

"তুমি ত আমায় জিজ্ঞাসা কর নাই।"

যুগলকিশোর অনেক চেষ্টা করিল, অনেকরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা লুপ্তলেখা পুনর্ব্বিকাশ করিবার প্রয়াস করিল, কিন্তু কোন মতেই লুপ্ত অক্ষরগুলি আর উদ্ধার করিতে পারিল না। গুপ্ত বিদ্যা যেমন তাহার অজ্ঞাত ছিল সেইরূপ অজ্ঞাত রহিল।

পর দিবস রাত্রের হত্যাকাণ্ড সহরে রাষ্ট্র হইয়া অত্যন্ত গোলযোগ হইল। যুগলকিশোর মদনমোহনকে সঙ্গে করিয়া লক্ষ্ণৌ ছাড়িয়া গেল।

মুক্তি।

অতীতের তীর হতে ছিঁড়িয়া বাঁধন
ভেসেছে অকূলে মোর জীবন-তরণী,
ঘিরিয়া এসেছে নিশি তিমির-বরণী
ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন নিয়তি গগন।
হারায়েছি ধ্রুবতারা দিগ্ দরশন,
চলেছি এ নিরুদ্দেশ কোথা অসহায়!
ভেঙ্গেছে বিশ্বাস কর্ণ শোক ঝটিকায়,
ছিঁড়েছে আশার পাল,—বিপন্ন এখন!
ডুবেও ডুবে না তরি সময়-সাগরে;
কেন আছি, কোথা যাই, বুঝিতে না পারি;
এ নিশার বোধ হয় নাহি অবসান—
ঝরে বৃথা নিরাশায় নয়নের বারি!
কে বলিবে, কতকালে শুভ অবসরে
মগ্ন হবে ভগ্ন তরি, মুক্ত হবে প্রাণ!

শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার।

প্রত্যাখিতা।

(শকুন্তলা)

চিকণ চিকুর পড়েছে এলায়ে
আবরি আনন শশী,
যেন শরতের চারু শশধরে
আবরিছে মেঘ মসী।
নীলিম নয়নে জল ছল ছল,
বহিছে কপোল তলে,
যেন হেমন্তের হেম শত দল
ভাসিছে শিশির জলে।
কাঁপে থর থর চারু দেহ লতা,
বিবর্ণ কমল মুখ,
অবশ শরীর চলে না চরণ
দুরু দুরু কাঁপে বুক।
অনলের তাপে বিকচ গোলাপ,
শুকায়ে গিয়েছে মরি!
আশার আলোক গিয়েছে নিবিয়া
হৃদয় আঁধার করি।
না ফুটিতে আহা শুকাইয়া গেছে
অধরে মধুর হাসি,
হৃদয় ভাঙ্গিয়া বহিছে কেবল
অনন্ত বিষাদ রাশি!

শ্রীমতী সরোজিনী দেবী।

নীরবে।

কাছে আসিও না মোর
রও গো দূরে,—
ওগো! এ মলিন করে,
ওই চিত্র ছুঁলে পরে,
কি জানি যদি বা যায়
ভেঙ্গে বা চূরে!
পরশ চাহিনা তাই,
শুধুই দেখিতে চাই,
শুধু চাই পূজিবারে
মানস পূরে।
মানস মন্দিরে রাখি,
আমি যবে চেয়ে থাকি,
হৃদয় ভরিয়া যায়
অমৃত সুরে।
তাই আমি ভাল বাসি
নীরব পূজা,—
অনিত্য সুখের তরে,
যে মরে সে যাক ম'রে,
আমার এ সত্য সুখ
নীরবে খুঁজা।
নীরবে যমুনা তটে
বসিয়া তুমি,—
বাজাবে মোহন বাঁশী
পরিয়া প্রেমের ফাঁসী,

আমি গো পড়িব লুটে
চরণ চুমি।
উজলিবে সেই চিত্র
যমুনা বুকে,
হেরিয়া বিভল প্রাণ,
ওই রূপ করি ধ্যান
তোমাতে যাইবে ডুবে
অনন্ত সুখে।
সে সুখের দিন মোর
আসিবে কবে,
নীরবে বসিয়া একা,
স্মরি সেই স্মৃতি রেখা,
কবে সে নীরবে প্রাণ
সমাধি হবে!

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী।

গ্রন্থ সমালোচন।

বীণা। শ্রীহরিদাস ঘোষ প্রণীত।

এখানি যে কাব্যগ্রন্থ তাহা নামেই সূচিত হইতেছে। কিন্তু এ বীণা ত সরস্বতীর নহেই, সরস্বতীর সহিত যাহার কোনও সম্বন্ধ আছে তাহারও নহে। উৎসর্গপত্রে লেখা আছে—"আমাদের স্বর্গীয় পিতাঠাকুর, যিনি আমার বাল্যকালের কবিতা পাঠ করিয়া কতই আনন্দ প্রকাশ করিতেন, অনেক দিন হইল মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।" স্নেহবাৎসল্যজনিত পক্ষপাতিতা অন্যে প্রকাশ করিবে না, লেখকের সে আশঙ্কা আছে। "পাঠকের আদর অনাদর কবিতাগুলির গুণাগুণের উপর নির্ভর করে।" যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এই অপূর্ব্ব কবিতাগুলি পাঠকের নিকট আদৃত হইবে না। উৎসর্গ ছাড়া অন্য উপসর্গও আছে। বিজ্ঞাপনে আছে—"নূতন সামগ্রী পাব কোথা? আমি প্রচলিত ছন্দোবন্ধে বদ্ধ হইতে সম্মত নহি।" নূতন ছন্দ হইলেই ত নূতন সামগ্রী হইল! দুই একটা নূতন ছন্দের দৃষ্টান্ত দেখিবেন?—

কবিতাতে ভালবাসা, ভালবাসা নভেলে,
ভালবাসা মিছে কথা তবে কে বলে?

এই ত নূতন ছন্দোবন্ধ! কবির বিচিত্র কৌশল লক্ষ্য করিবেন। প্রথম ছত্রটী ১৫ অক্ষরে; দ্বিতীয়টী ১৩, কিন্তু দুটী মিলাইয়া ঠিক ২৮টী অক্ষর, অর্থাৎ হরে দরে হাঁটু জল। এক এক স্থানে কিন্তু ছন্দোবন্ধ নিতান্তই নূতন। যেমন—

শুনিয়ে বিদরে বুক, জেনেরল টোরল
স্বীকারিল অধীনতা, আঁখি ছল ছল।

গ্লাড্‌ষ্টনের মৃত্যুতে পার্লামেণ্টে "বালফুর" শোক প্রকাশ করিতেছেন। তাহাতে—

বালফুরের বাক্যে তবে সবে দিল সায়
উঠিল সভাতে মহাধ্বনি "হায়, হায়!"

ইংরাজেরা শোকসভায়, বিশেষ পার্লামেণ্টে কোন সভ্যের মৃত্যু উপলক্ষে হায় হায় করিয়া মহাধ্বনি করে এ কথাও নূতন। "বালফুরের" পর "রোজবেরী"—

শোকাকুল রোজবেরী উঠিল সাহসে।
কাঁদিল, কাঁদালে সবে প্রকাশিয়া শোক
হেঁটমুখে ফেলে অশ্রু যত লর্ড লোক।

এই ত গেল কবিতার নমুনা। রুচির পরিচয়ও আছে। "রবি" শীর্ষক কবিতা বা ছড়া হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতে পারা যায় না। দেখিতেছি, লেখক আইন ব্যবসায়ী, কেন না উপসংহারে তিনি আপনার নামের সহিত "উকীল" শব্দ যোগ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার জানা উচিত যে এরূপ লেখা পিনাল কোডের ধারানুসারে রাজদণ্ডে দণ্ডার্হ। রবীন্দ্রনাথ সুকবি কি কুকবি, তাঁহার রচনা বিশেষ ভাল কি মন্দ, এ কথা বলিবার অধিকার সকলেরই আছে। তাঁহার সম্বন্ধে অন্য চর্চ্চা যে করে তাহার পৃষ্ঠে কষাঘাতই ব্যবস্থা। সমালোচ্য পুস্তকে রুচির চরম পরিচয় শেষ কবিতায়—"শিখনখ।" কবিতার গোড়ায় একটু নোট আছে। লেখক গদ্যে পদ্যে সমান মজবুত। "হিন্দী ভাষায় অনেক কবিরা 'নখশিখ' অর্থাৎ সুন্দরীর নখ হইতে শীর্ষ অর্থাৎ মস্তক পর্য্যন্ত (আপাদ মস্তক) কবিতা লিখিয়াছেন। বঙ্গভাষায় এরূপ একখানি কবিতা নাই। আপাদমস্তক বর্ণন থাকিতে পারে, কিন্তু এরূপ একটী বিশেষ কবিতা নাই।" এই কবিতায় যে বর্ণনা আছে অশ্লীলতায় তাহার তুলনা ভারতচন্দ্রের রচনাতেও পাওয়া যায় না। উপসংহারে উকীল মহাশয় আদেশ করিতেছেন, "যিনি যে ভাষায় কবিতা লিখুন না কেন, তাঁহাকে দেশীয় ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয় অবশ্য লিখিতে হইবে।... দেশীয় ধর্ম্মে, জাতীয় ধর্ম্মে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস না থাকিলেও,

প্রকৃত কবিকে সে বিষয়ে কবিতা লিখিতে হইবে।” অর্থাৎ, ওকালতী ও কবিতা লেখা ঠিক এক রকমের ব্যবসা হইবে। শ্রীহরিদাস ঘোষ উকীল মহাশয় ওকালতী করুন, কবিতা লেখা ছাড়ুন। কোন কালে তাঁহার কবি নামে পরিচিত হইবার কোন সম্ভাবনা দেখি না।

দলিত কুসুম। উপন্যাস। শ্রীনারায়ণ দাস মৌলিক প্রণীত।

শুধু উপন্যাস নহে, “স্ত্রী-শিক্ষাপ্রদ সত্য ঘটনামূলক সামাজিক উপন্যাস।” কাঁচা পাকা সার্টিফিকেট সম্বলিত। পাকা সার্টিফিকেট গুলি মুদ্রিত হইয়া পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে, কাঁচাগুলি হাতে লেখা। সংক্ষেপে আখ্যায়িকা এই :—হরিনাথ কুণ্ডুর এক পুত্র রামচন্দ্র ও এক কন্যা রামমণি (ছেলে মেয়ের এক নাম রাখা কি প্রথা?)। রামচন্দ্র দুশ্চরিত্র, রামমণি বিধবা এবং দুশ্চরিত্রা, গয়ারাম নামক উপপতিকে রাত্রিকালে পিতৃগৃহে লইয়া আসে। গল্পের গোড়ায় হরিনাথ মরিয়া গেল। রামচন্দ্র ভার্য্যা কুসুমকুমারীকে পিত্রালয় হইতে আনিতে যায়। কুসুমকুমারীর ভ্রাতাগণ ডাকাত, তাহারা রামচন্দ্রকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। রামচন্দ্র পলাইয়া আসে। তাহার মনে হয় কুসুমকুমারীও এ ব্যাপারে লিপ্ত আছে। বাড়ী ফিরিয়া সে ঘোরতর দুর্ব্বৃত্ত হইয়া উঠিল। গয়ারাম ও রামমণি নিশ্চিন্ত থাকে। অনেক দিন কোন সংবাদ না পাইয়া কুসুমকুমারী ও তাহার মাতা রামচন্দ্রের বাটীতে আগমন করে। রামমণি তাহাদিগকে তাড়াইবার অভিলাষে কুসুমকুমারীর নামে মিথ্যা অপবাদ ভ্রাতার নিকট উল্লেখ করে। রামচন্দ্র ভগিনীর চরিত্র বিশেষ রূপে অবগত হইয়াও স্ত্রীকে মারিয়া মৃতকল্প করে। তাহার পর রামচন্দ্রের প্রস্থান। রামমণি গেল মরিয়া। তাহার শোকে অধীর হইয়া গয়ারাম কুসুমকুমারীর প্রতি কৃপাকটাক্ষ করে। কুসুমকুমারী শোনে না। বল প্রয়োগের চেষ্টা। তদুত্তরে কুসুমকুমারীর দা প্রয়োগ। গয়ারামের গয়াপ্রাপ্তির পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্তি। কুসুমকুমারীর হত্যাপরাধে বিচার, নিস্কৃতি, রামচন্দ্রের সহিত মিলন। ইতি গল্প ফুরাইল। লেখকের বিবেচনায় ইহা স্ত্রী শিক্ষাপ্রদ গল্প। সে বিষয়ে মতভেদ থকিতে পারে। গল্প লিখিবার ভঙ্গী, ভাষার কৌশলও অদ্ভুত। দ্বিতীয় পৃষ্ঠাতেই রহিয়াছে—“ভোগ করিতে পারিয়াছিল না।” পদ্মার এ পারে এরূপ ভাষা শুনিতে পাওয়া যায় না। “তথাতেই” শব্দ কোন দেশে ব্যবহৃত হয়? এই পুস্তকে এ শব্দের ছড়াছড়ি। ঘটনার সমাবেশ আরও বিচিত্র। রামচন্দ্রকে তাহার শ্যালক ডাকাতেরা হত্যা করিতে লইয়া আসিয়াছে, তাহার ধ্রুব বিশ্বাস যে ভগিনীপতিকে বিদ্রূপ করিবার তাহাদের কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই, সেই ঘোর বিপদের সময় রামচন্দ্রের কি সাধ হইল? পাঠক বলিতে পারেন? একটু উদ্ধৃত করিয়া দিই :—

> “রামচন্দ্র মনে মনে ভাবিল আর তাহার জীবনের আশা নাই, চরম সময় উপস্থিত। আর মুহূর্ত্ত পরেই দুরাত্মাগণ তাহার ভবের খেলা সাঙ্গ করাইয়া দিবে।
>
> তাহার বড়ই ইচ্ছা হইল যে, এই সময় সে জন্মের শোধ একটী গান গাহিয়া লয়। তখন সে তাহার মনোগত অভিপ্রায় পাষণ্ডদিগকে জানাইল।”

এমন সত্য ঘটনা মূলক স্বাভাবিক ব্যাপার আর কি হইতে পারে? যখন কয়েক জন দস্যু তরবারি হস্তে কাহাকেও হত্যা করিবার জন্য উদ্যত হয় সেই পরমানন্দের সময় সে ব্যক্তির গান করিতে যদি ইচ্ছা না হয় তবে আর কখন হইবে? তা সে গান অধ্যাত্ম বিষয়কই হউক আর প্রেয়সী সম্বন্ধীয়ই হউক। এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা সংযোজনাও স্ত্রী শিক্ষাপ্রদ না কি?

সার্টিফিকেটদাতাদিগকে একটা কথা বলিবার আছে। যাঁহারা সাহিত্যের কেহ নন তাঁহাদের সার্টিফিকেটে কিছু আসে যায় না। কিন্তু সাহিত্যরসগ্রাহী অথবা খ্যাতনামা ব্যক্তিদিগকে প্রশংসা পত্র একটু সাবধান হইয়া দিতে হয়। সাবান, চিরুণী, আরসীর প্রশংসা সহজে লিখিয়া দেওয়া যায়। সাহিত্য এই শ্রেণীভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

হামিদা। উপন্যাস। শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত।

লেখক বঙ্গসাহিত্যে পরিচিত এবং যেরূপ অধ্যবসায়ের সহিত সাহিত্যসেবায় নিযুক্ত রহিয়াছেন তাহাতে কালে কৃতী হইতে পারিবেন এমত আশা করা যাইতে পারে। উপন্যাসখানি সুলিখিত ও সুপাঠ্য। আখ্যায়িকার ঘটনাংশে কয়েকটী ভ্রম আছে কিন্তু তাহাতে গল্পের কোন ক্ষতি হয় নাই।

কলিকাতা,—২৬ নং স্কটস্ লেন, ভারত মিহির যন্ত্রে, সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

ভূতপূর্ব্ব প্রদীপ সম্পাদক
শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

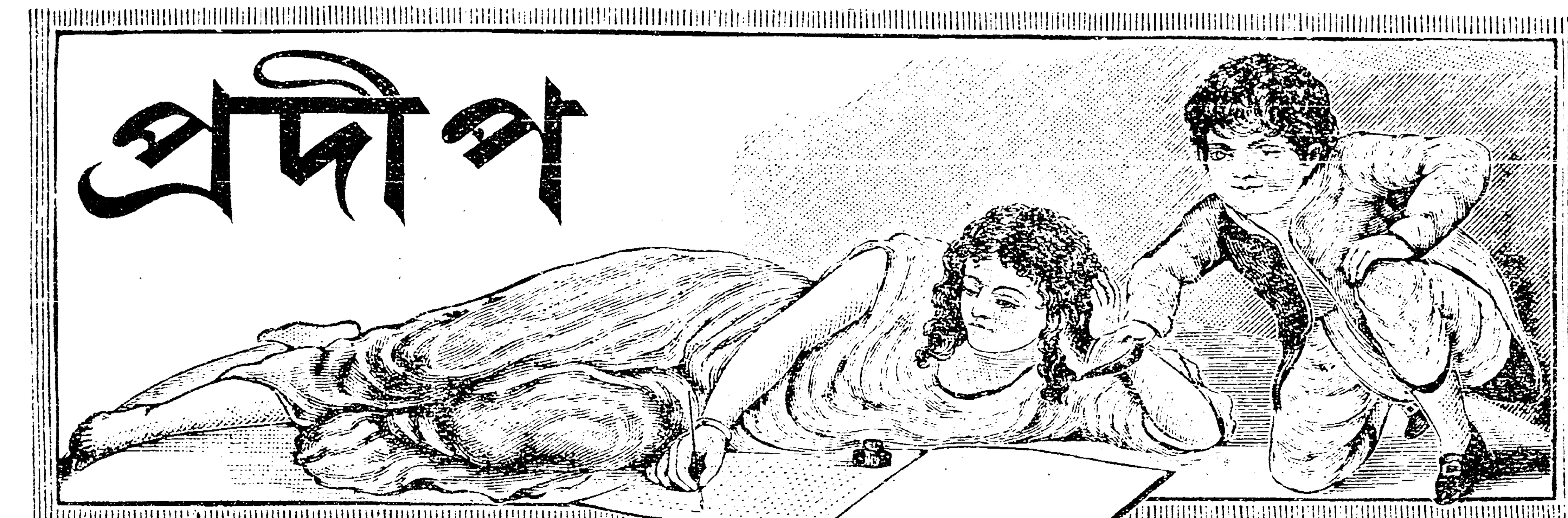

তৃতীয় ভাগ। } বৈশাখ, ১৩০৭। { ৫ম সংখ্যা।

সন্ধ্যার প্রদীপ। *

১

হের দেখ জলিয়াছে প্রদীপ সন্ধ্যার—
দেবরূপ দৃশ্য ধরাপরে!
চারিদিকে ছায়া পড়ে কাঞ্চন কায়ার—
আলো দ্বীপ আন্ধার সাগরে;
ললিত লীলায় কায়,
হেলে দুলে বিনা বায়,
শিখার শরীর মাঝে নড়ে যেন প্রাণ,
দীপ নয়—যেন কোন দেব বিদ্যমান!

২

দূর হতে রূপ কিবা হয় দরশন,
চৌদিকে কিরণ পড়ে চিরে,
আন্ধারের মাঝে তায় দেখায় কেমন—
জবা যেন যমুনার নীরে!
আন্ধারের কাল কায়,
তায় অস্ত্রাঘাত প্রায়,
দীপ দেখি রক্তমাখা ক্ষত স্থান হেন,
কাল কেশে কামিনীর পদ্মরাগ যেন।

৩

জালিয়া প্রদীপ, ঝাঁপি বসন অঞ্চলে
রূপসী প্রবেশে নিজ পুর,
রক্ত আভা মাখা রক্ত বদন মণ্ডলে,
রক্ত শিখা সীমন্তে সিন্দূর,
চঞ্চল নয়নে চায়,
প্রদীপ চঞ্চল বায়,
পায় পায় কাঁপে স্তন, শিখা মনোলোভা—
কারে ছেড়ে কারে দেখি কে অধিক শোভা!

৪

কি ফুল ফুটেছে আহা অন্ধকার বনে,
নদী পারে প্রদীপ সন্ধ্যার,
প্রিয় মুখ ধ্যান যেন প্রবাসীর মনে,
যেন শিশু-সুত বিধবার;
হয়ে গেছে সর্ব্বনাশ,
আছে একমাত্র আশ,
হেন নর হৃদয়ের দেখায় আভাষ,
মেঘের মণ্ডলে যেন মঙ্গল † প্রকাশ।

৫

ক্রমে ঘোর হ'য়ে এল সন্ধ্যার অম্বর,
পান্থ অতি ক্লান্ত পর্য্যটনে,

* "মহিলা" কাব্য প্রণেতা ৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বিরচিত। ১২৮৭ সালে 'নলিনী' নাম্নী মাসিক পত্রিকায় এই কবিতাটী প্রথম প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রিকা দুই বৎসর মাত্র প্রচারিত ছিল।

অজানিত দেশ, শুধু চৌদিকে প্রান্তর,
দামিনী চমকে ক্ষণে ক্ষণে ;
হেন কালে হেন স্থলে
দূরে সন্ধ্যা দীপ জ্বলে,
পথিকের প্রাণে পুন আশার সঞ্চার,—
সে জানে কি বস্তু তুমি প্রদীপ সন্ধ্যার !

৬

বদনের কাছে বাতি জননী ঢুলায়,
খল খল হাসে শিশু তায়,
আভায় আভায় মিশে, শোভায় শোভায়,
হেরে মাতা স্নেহের নেশায় !
আগারে বালক মেলা,
ছায়া ধরাধরি খেলা,
হেরে প্রবীণেরা হাসে, গণেনা আপন
ছায়া ধরা খেলাতেই কাটালে জীবন !

—o—

সাবিত্রী আখ্যান।

পৌষ মাসের "সাহিত্যে" শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "সাবিত্রীর পাতিব্রত্য" সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্য অথবা পুরাণ ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় সাবিত্রীর অনুরূপ মহচ্চরিত্র বোধ হয় আর নাই। এরূপ চরিত্রের যত আলোচনা হয় ততই মঙ্গল। কিন্তু সাবিত্রী যেরূপ মহিয়সী কল্পনার আদর্শচরিত্র তাহাতে তুলনায় সমালোচনা করিলে লাভের আশা নাই, ক্ষতির আশঙ্কা আছে। সাবিত্রী নিজেই তাঁহার তুলনা ; তাঁহার তুল্য সাধ্বী সতী পতিব্রতা আর নাই, ইহাই সাবিত্রী চরিত্রের বিশেষ গৌরব। যাঁহার চিত্রপটে এই চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তিনিও অদ্বিতীয় কবি। অপর দেশের বিবাহ-পদ্ধতির উল্লেখ করিয়া, কিম্বা আর কোন কথা তুলিয়া এই আদর্শের গৌরব বৃদ্ধি করা যায় না। সকল দেশে, সকল কালে সাবিত্রী রমণীকুলের মহত্তম আদর্শ, আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা, ধ্যানধারণার সামগ্রী। এ দেশেও তাহাই। যে কয়জন সতীর নাম প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে সাবিত্রীর নাম নাই। সাবিত্রী তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক ঊর্দ্ধে। মহাভারতের বনপর্ব্বে সাবিত্রী উপাখ্যান কিরূপে সন্নিবেশিত হয়, স্মরণ করা কর্ত্তব্য। পর্ব্বাধ্যায়ের নামই "পতিব্রতা মাহাত্ম্য পর্ব্বাধ্যায়।" রাজা যুধিষ্ঠির মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের সহিত কথোপকথন কালে তাঁহাকে বলিতেছিলেন যে, তিনি দ্রৌপদীর নিমিত্ত যেরূপ শোকাকুল হইয়াছেন ভ্রাতৃগণের অথবা রাজ্যনাশের জন্য সেরূপ পরিতপ্ত হন নাই। ইতিপূর্ব্বে জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে হরণ করিবার চেষ্টা করে। যুধিষ্ঠির বলিলেন, সেই বিপদের সময়েও দ্রৌপদী স্বামীদিগকেই চিন্তা করিতেছিলেন। এই কথা বলিয়াই যুধিষ্ঠির মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

অস্তি সীমন্তিনী কাচিদ্দৃষ্টপূর্ব্বাপি বা শ্রুতা।
পতিব্রতা মহাভাগা যথেয়ং দ্রুপদাত্মজা ॥

আপনি কি এই দ্রুপদনন্দিনীর তুল্য পতিব্রতা রমণী কুত্রাপি দৃষ্টি বা শ্রবণগোচর করিয়াছেন ?

(কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।)

তখন মহর্ষি সাবিত্রীর উপাখ্যান বিবৃত করিতে আরম্ভ করিলেন। অনুমান এইরূপ হয় যে, যুধিষ্ঠির সাবিত্রী বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন না এবং দ্রৌপদী যে পতিব্রতা-শ্রেষ্ঠা তাঁহার এই ধারণা অপনয়ন করিবার জন্য মার্কণ্ডেয় সাবিত্রীর অলৌকিক ইতিহাস কীর্ত্তন করেন। প্রবন্ধলেখক মহাশয়ও এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, সাবিত্রীর কথা পাতিব্রত্যের উদাহরণ। উদাহরণ নহে, পাতিব্রত্যের পরাকাষ্ঠা স্বরূপ।

প্রবন্ধলেখক মহাশয় বলিতেছেন, "যে সকল সমাজে অধিক বয়সে স্ত্রীলোকের বিবাহ হয়, তথায় বিবাহের পূর্ব্বে অনেক রমণী যে এক বা একাধিক পুরুষের অভিলাষিণী হইয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে, বোধ হয়, সন্দেহ হইতে পারে না।" কোন্ সমাজগুলি এই কথার লক্ষ্য তাহা অনুমান করিতে কাহারও বিলম্ব হইবে না। কিন্তু বর্ত্তমান প্রতীচ্য সমাজের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, যদি লেখক মহাশয় মহাভারতের বা তৎপূর্ব্বকালীন সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন, তাহা হইলে এমন কথা তিনি সহসা লিখিতে পারিতেন না। সাবিত্রীর কি বাল্যবিবাহ হইয়াছিল ? যে কালে, যে সমাজে বাল্যবিবাহ আদৌ প্রচলিত ছিল না, সেই সমাজে সাবিত্রী শুভসম্ভবা। তাঁহার প্রসঙ্গে বিবাহ

† মঙ্গল গ্রহ।

সম্বন্ধে বয়ঃক্রমের বিতণ্ডা অথবা অন্য কোনরূপ সাময়িক বিষয়ের বিচার উপস্থিত করা অসঙ্গত মনে হয়। সাবিত্রীর অধিক বয়সে বিবাহ হইয়াছিল—এত অধিক বয়সে যে সে কালে বয়স্থা কন্যার বিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত থাকিলেও সাবিত্রীর পিতা, রাজা অশ্বপতি, কন্যার দীর্ঘ কৌমার্য্য অবলোকন করিয়া চিন্তিত হইয়াছিলেন। রাজকন্যা এত অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা ছিলেন কেন ? কবি তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

তান্তু পদ্মপলাশাক্ষীং জ্বলন্তীমিব তেজসা।
ন কশ্চিদ্বরয়ামাস তেজসা প্রতিবারিত ॥

এই পদ্মপলাশলোচনা এইরূপ তেজস্বিনী ছিলেন যে, সকল পুরুষই তাঁহার তেজঃপ্রভাবে প্রতিহত হইয়াছিল, কেহই তাঁহার পাণিগ্রহণে সাহস করিতে পারে নাই।

সাবিত্রীর পিতা যে কেবল কন্যার বর্দ্ধিত যৌবন অবলোকন করিয়া চিন্তিত হইয়াছিলেন এমত নহে। দেবর্ষি নারদ সভামধ্যে উপস্থিত হইলে, রাজদুহিতা সাবিত্রী মস্তক দ্বারা মুনির পাদবন্দনা করিলেন। মুনি কন্যার বয়োধিক্য লক্ষ্য করিয়া অশ্বপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

কিমর্থং যুবতীং ভর্ত্রে ন চৈনাং সংপ্রয়চ্ছসি।

কন্যাটী যৌবনস্থা হইয়াছে, তথাপি কেন সৎপাত্রে সম্প্রদান করিতেছ না ?

নারদের সম্মুখে আগমন করিবার পূর্ব্বেই সাবিত্রী পিতৃনিয়োগে আত্মানুরূপ ভর্ত্তা অন্বেষণ করিতে গিয়াছিলেন। অন্বেষণ করিয়া, স্বরাজ্যনির্ব্বাসিত, বনমধ্যে পর্ণকুটীরবাসী, দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানকে পতিরূপে মনোনীত করিয়াছিলেন। যে তেজের উল্লেখ করা গিয়াছে, সাবিত্রী চরিত্রের তাহাই বিশেষত্ব। তিনি কাঞ্চন প্রতিমার ন্যায় সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু সে কাঞ্চন তেজোত্তপ্ত, কেহই তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে সাহস করে নাই। তিনিই সত্যবানের পাণিগ্রহণ করেন, নতুবা কাষ্ঠ পাটনে নিযুক্ত বনবাসী যুবক কিরূপে তাঁহার করপ্রার্থী হইবে ? এই তেজ অবশেষে যমদমী হয়। যে তেজ প্রভাবে সকল পুরুষই প্রতিহত হইয়াছিল, ত্রিরাত্র অনশনাহুতিতে সেই তেজ বর্দ্ধিত হইয়া ঘৃতাহুত অগ্নি শিখার ন্যায় স্বয়ং যমরাজকে পরাভূত করে। সাবিত্রী বিশুদ্ধ, শুভ্র অনলশিখার ন্যায় তেজস্বিনী, পাতিব্রত্যে সেই শিখা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল।

কেবল পাতিব্রত্যে কিরূপ তেজ সমুৎপন্ন হয় তাহার দৃষ্টান্ত এই বনপর্ব্বেই অন্যত্র আছে। কৌশিক নামক ব্রাহ্মণ কোপদৃষ্টিতে এক বলাকাকে নিধন করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি এক পতিব্রতার গৃহে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। স্বামীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকায় পতিব্রতার ভিক্ষা দিতে বিলম্ব হয়। কৌশিক কোপকষায়িত লোচনে পতিব্রতার দিকে চাহিয়া অনেক কটু কথা বলিলেন, আর শাসাইলেন যে ব্রাহ্মণেরা অগ্নিসদৃশ, মনে করিলে অনায়াসেই বসুন্ধরা দগ্ধ করিতে পারেন। পতিব্রতা প্রথমে ব্রাহ্মণকে শান্ত করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ কোন মতে শান্ত হন না ও দগ্ধ করিবার ভয় দেখাইতেছেন দেখিয়া বলিলেন—

নাহং বলাকা বিপ্রেন্দ্র ত্যজ ক্রোধং তপোধন।
অনয়া ক্রুদ্ধয়া দৃষ্ট্যা ক্রুদ্ধ কিং মাং করিষ্যসি ॥

হে তপোধন! ক্রোধ পরিত্যাগ করুন, আমি বলাকা নহি, আপনি ক্রোধ দৃষ্টি দ্বারা আমার কি করিবেন ?

কিন্তু ব্রাহ্মণের কোপকটাক্ষ হইতে আত্মরক্ষা করাতে এবং কালপূর্ণ হইলে মৃত্যুর হস্ত হইতে স্বামীকে রক্ষা করাতে অনেক প্রভেদ। প্রভেদ আছে বলিয়াই সাবিত্রী জগতে অতুলনীয়া।

এই পাতিব্রত্য তেজ পরীক্ষিত না হইলে বুঝিতে পারা যায় না। সাবিত্রী সকল গুণে ভূষিতা, পাতিব্রত্য পালনে অন্য কোন কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই। শ্বশুরালয়ে গমন করিয়া 'সর্ব্বাঙ্গ হইতে অলঙ্কার সমস্ত উন্মোচনপূর্ব্বক অরণ্যসুলভ বল্কল ও কাষায় বসন পরিধান করিলেন।' দরিদ্র অরণ্যবাসীর গৃহে ইহাই ভূষণ। তাহার পর সকলের মনস্তুষ্টি সাধনে যত্নবতী হইলেন—

পরিচারৈর্গুণৈশ্চৈব প্রশ্রয়েণ দমেন চ।
সর্ব্বকামক্রিয়াভিশ্চ সর্ব্বেষাং তুষ্টিমাবহে ॥
শ্বশ্রূং শরীরসৎকারৈঃ সর্ব্বৈরাচ্ছাদনাদিভিঃ।
শ্বশুরং দেবসৎকারৈর্বাচঃ সংযমনেন চ ॥
তথৈব প্রিয়বাদেন নৈপুণ্যেন শমেন চ।
রহশ্চৈবোপচারেণ ভর্ত্তারং পর্য্যতোষয়ৎ ॥

বিনয়, লজ্জা প্রভৃতি বহুবিধ সদ্‌গুণ, সকলের অভিলাষানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান ও পরিচর্য্যা দ্বারা আশ্রমবাসীদিগের তুষ্টি সম্পাদন করিতে

লাগিলেন। শরীরসংস্কার ও আচ্ছাদনাদি প্রদান দ্বারা শ্বশ্রূকে, দেবপূজা ও বাক্‌সংযম দ্বারা শ্বশুরকে এবং প্রিয়োক্তি, নৈপুণ্য, শান্তি ও নির্জ্জনে উপহার প্রদান দ্বারা ভর্ত্তারে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন।

এই সকল কর্ত্তব্যপালন করিবার কালে সাবিত্রী পতি-বিয়োগের আশু সম্ভাবনা বিস্মৃত হন নাই। 'দেবর্ষি নারদের বাক্য স্মরণ করিয়া দিন দিন নিতান্ত সন্তপ্ত হইতে লাগিলেন।' তৎপরে সাবিত্রীর ত্রিরাত্র অনশন ব্রত, অলঙ্ঘ্য ভবিতব্যতায় সত্যবানের মৃত্যু, এবং সাবিত্রীর পাতিব্রত্য বলে পুনর্জীবন লাভ।

সাবিত্রীর অলৌকিক পবিত্র চরিত্র পর্য্যালোচন কালে সত্যবানের চরিত্রের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হয়। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক হউক অথবা অন্য কোন কারণে হউক মহাভারতের মহাকবি সত্যবানের চরিত্রে সাবিত্রী চরিত্রের অলৌকিকতা প্রদর্শন করেন নাই। করিবার কথাও নয়, কারণ 'সকল পুরুষই সাবিত্রীর তেজঃপ্রভাবে প্রতিহত হইয়াছিল।' অশ্বপতি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া নারদ বলিয়াছিলেন—

বিবস্বানিব তেজস্বী বৃহস্পতি সম মতৌ।
মহেন্দ্র ইব বীরশ্চ বসুধেব ক্ষমান্বিতঃ॥

সত্যবান সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান, ইন্দ্রের ন্যায় বল বীর্য্য সম্পন্ন ও বসুধার ন্যায় ক্ষমাবান।

ইহা কতকটা ঘটকালির ভাষা। উপমাগুলিতেই অত্যুক্তি সূচিত হইতেছে। সত্যবান যে বিশেষ তেজস্বী ছিলেন না তাহার প্রমাণ এই উপাখ্যানেই পাওয়া যায়।

যমরাজের পাশমুক্ত হইয়া সত্যবান ও সাবিত্রীতে যে কথোপকথন হয়, তাহার আলোচনা কালে, প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় সাবিত্রীর চরিত্র পূর্ণরূপে পরিস্ফুট করেন নাই। প্রবন্ধের সেই স্থল পাঠ করিলে ধারণা হয় যে সত্যবান পুনর্জীবিত হইবা মাত্রই সাবিত্রীর নারীস্বভাব-সুলভ ভীতি উৎপন্ন হইল, অরণ্যে রাত্রিকালে ভয়াবহ শব্দ শ্রবণ করিয়া ভয়াকুল হইয়া তিনি পতিকে সেই কথা বলিলেন। অথচ পতিকে ব্যথিত দেখিয়া গৃহে ফিরিবার জন্য উত্তেজিত করিলেন না। কিন্তু সত্যবান পিতামাতার অদর্শনে আকুল, কোন মতে সে স্থানে রাত্রি যাপন করিতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে সাবিত্রীকে কতকগুলি কঠোর কথা বলিলেন—"যদি তোমার বুদ্ধি ধর্ম্মের অনুগামিনী হয়, যদি তুমি আমারে জীবিত রাখিতে ইচ্ছা কর, যদি আমার প্রিয়াচরণ করা তোমার কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে চল, ত্বরায় আশ্রমে গমন করি।" এই কথা শুনিয়া সাবিত্রী পতিকে উঠাইয়া তাঁহাকে আশ্রমে লইয়া গেলেন।

কেবল এই কথা বলিলে সাবিত্রীর আদর্শ চরিত্রে কিছু অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়। কিন্তু মহা প্রতিভাশালী অপূর্ব্ব চরিত্রাভিজ্ঞ মহাকবি সাবিত্রীর মহান্, পূর্ণ চরিত্রে কোথাও ছিদ্রান্বেষণের বা অসম্পূর্ণতার অবকাশ রাখেন নাই। সাবিত্রী রাজকন্যা, নিশাকালে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে ভীত হওয়া বিচিত্র নহে। এইজন্য তাঁহার ভয়ের উল্লেখ মাত্র রহিয়াছে। কিন্তু পিতৃমাতৃসন্নিধানে গমন করা যে সত্য-বানের কর্ত্তব্য এ কথা সত্যবান বলিবার পূর্ব্বে সাবিত্রী স্বয়ং বলিয়াছিলেন। আত্মত্রাসের উল্লেখ করিবার অব্যব-হিত পূর্ব্বেই সাবিত্রী সত্যবানকে কি বলিতেছেন?—

তমুবাচাথ সাবিত্রী রজনী ব্যবগাহতে।
শ্বস্তে সর্ব্বং যথাবৃত্তমাখ্যাস্যামি নৃপাত্মজ॥
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রন্তে পিতরৌ পশ্য সুব্রত।
বিগাঢ়া রজনী চেয়ং নিবৃত্তশ্চ দিবাকরঃ॥

সাবিত্রী কহিলেন, নাথ! এক্ষণে রজনী উপস্থিত হইয়াছে, অবিলম্বে পিতামাতার নিকটে গমন করা তোমার নিতান্ত আবশ্যক; অতএব শীঘ্র গাত্রোত্থান কর; কল্য সমুদায় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিব। ঐ দেখ তামসী নিশা উপস্থিত, দিবাকর অস্তমিত হইয়াছেন।

এই কথা বলিয়া, সাবিত্রী আপনার ভয়ের কথা বলিলেন। তিনি পতিকে যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্মার্থ এই—"রাত্রি হইয়াছে, এখন আশ্রমে তোমার পিতামাতার নিকট তোমার ফিরিয়া যাওয়া উচিত। শৃগাল ও অপ-রাপর নিশাচর জন্তুর শব্দে আমারও ভয় হইতেছে। কিন্তু তোমাকে পীড়িত ও শ্রান্ত দেখিতেছি। তোমার এই অন্ধকারে যাইতে যদি কষ্ট হয় তাহা হইলে আজি রাত্রি এই স্থানেই যাপন কর। আমি অগ্নি জ্বালিতেছি তাহাতে তোমার গ্লানি দুর হইবে। তুমি পিতামাতার জন্য চিন্তিত হইও না, তাঁহাদের কোন অমঙ্গল হইবে না।" ধর্ম্মরাজ যমের নিকট শ্বশুরের জন্য যে বর প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন সে কথা তখন বলিলেন না। স্বয়ং ত্রিরাত্র

অনশনে যাপন করিয়াছেন, এই অরণ্যে রাত্রি যাপন করিলে চতুর্থ রাত্রিও অনশনে যাইবে, সে কথারও উল্লেখ করিলেন না।

এই স্থানে সত্যবানের চিত্তদুর্ব্বলতার পরিচয় পাওয়া যায়। পিতামাতা তাঁহাকে না দেখিতে পাইলে অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করিবেন।—

এবমুক্ত্বা স ধর্ম্মাত্মা গুরুভক্তো গুরুপ্রিয়ঃ।
উচ্ছ্রিত্য বাহূ দুঃখার্ত্ত সুস্বরং প্ররুরোদ হ॥
ততোঽব্রবোত্তথা দৃষ্টা ভর্ত্তারং শোক কর্ষিতম্।
প্রমৃজ্যাশ্রূণি নেত্রাভ্যাং সাবিত্রী ধর্ম্মচারিণী॥

গুরুভক্ত, গুরুপ্রিয় ধর্ম্মাত্মা সত্যবান এইমাত্র বলিয়া বাহু যুগল উন্ন-মিত করত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। তখন ধর্ম্মচারিণী সাবিত্রী শোকবিহ্বল ভর্ত্তার নয়ন যুগল হইতে অশ্রুধারা মার্জ্জনা করিয়া কহিলেন।

(শ্বশ্রূ, শ্বশুর ও ভর্ত্তার কল্যাণ হইবে এই কথা কহিলেন।)

পথহারা বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে দেখিয়া সত্য-বানকে নারদকথিত সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ও ইন্দ্রের ন্যায় বলবীর্য্যসম্পন্ন মনে হয় না। ত্রিরাত্র অনাহারে অবসন্ন সতী সাবিত্রী পতির অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া দিলেন। পরি-শেষে সত্যবান সাবিত্রীর প্রতি যে কিছু কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিলেন তাহাও দুর্ব্বলচিত্তের পরিচায়ক।

মূল কথা এই স্থানে সমাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধে আরও কতকগুলি প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিক কথার উল্লেখ আছে। সেই কথাগুলিতে বিষয়গাম্ভীর্য্য বিনষ্ট হইয়াছে এবং প্রবন্ধও কিছু লঘু হইয়াছে। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন,"মহাভারতে সাবিত্রীকে প্রেমিকারূপে দেখিতে পাওয়া যায় না। সাবিত্রী সত্যবানকে আপন প্রেমের গভীরতার কথা বলিতেছেন, প্রেমোচ্ছ্বাসে পাগল করিয়া দিতেছেন, দীর্ঘ নিশ্বাসে দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছেন, আলিঙ্গনের আতিশয্যে নিপীড়িত করিতেছেন, সাবিত্রীর উপাখ্যানে মহাভারতের মহাকবি এরূপ কিছুই লেখেন নাই।" প্রথমতঃ এ কথা আনুপূর্ব্বিক যথার্থ নহে, কারণ অন্ততঃ একবার সাবিত্রী যে সত্যবানকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ উপাখ্যানে আছে। পুন-র্জীবিত হইয়া, নিদ্রোত্থিতের ন্যায় সত্যবান সাবিত্রীকে বলিতেছেন—

শিরোভি তাপ সন্তপ্তঃ স্বাপ্তুং চিরমরুবন্।
ততোৎসঙ্গে প্রসুপ্তোঽস্মি ইতি সর্ব্বং স্মরে শুভে॥
ত্বয়োপগূঢ়স্য চ মে নিদ্রয়োপহৃতং মনঃ।

হে শুভে! শিরঃপীড়ায় একান্ত পরিতাপিত ও নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া তোমার উৎসঙ্গে শয়ন করিলাম এবং তৎপরে তোমার আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইয়া নিদ্রায় অত্যন্ত অভিভূত হইলাম, এ সকল কথা আমার স্মরণ হইতেছে।

কিন্তু যদি এ কথারও উল্লেখ না থাকিত তাহা হইলেও সাবিত্রী উপাখ্যানের সহিত অপর নরনারীর প্রেম বর্ণনা উপমিত হইতে পারে না। যাহা নাই তাহার অভাবে সাবিত্রী চরিত্র শ্রেষ্ঠ নহে, যাহা আছে সেই হেতু এই চরিত্র অনুপম। সাবিত্রীকথা প্রেমাত্মক নহে, পাতিব্রত্যাত্মক। দম্পতি প্রেমে ও পাতিব্রত্যে প্রভেদ আছে এ কথা প্রবন্ধ লেখক মহাশয় নিজেই বলিয়াছেন।

প্রবন্ধের আর এক স্থানে মহাকবিগণের প্রেমচিত্রের উল্লেখ করিয়া লেখক বলিতেছেন, "এখনকার কবিনাম-প্রাপ্ত অনেক বাঙ্গালী লেখকের প্রেমচিত্র অন্যরূপ দেখা যায়। সে চিত্রে প্রেমিক প্রেমিকার প্রেমের আস্ফালন, আড়ম্বর, বক্তৃতা, গবেষণা, হা হুতাশ, দীর্ঘনিশ্বাস, চুম্বন ও আলিঙ্গন ভিন্ন আর বড় একটা কিছু থাকে না।" ইত্যাদি। এরূপ কথায় এখনকার কবিনাম প্রাপ্ত অনেক বাঙ্গালী লেখকের নিন্দা হয় না, মহাকবিদিগেরই অব-মাননা হয়। কবি অথবা কবিনামপ্রাপ্ত কোন বাঙ্গা-লীরই এত বড় স্পর্দ্ধা নাই যে আপনাকে বাল্মীকি, ব্যাস, বা কালিদাসের সমকক্ষ মনে করেন। এই প্রবীণ সমা-লোচকই এরূপ তুলনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যাঁহারা কবিনামপ্রাপ্ত অথচ প্রকৃত কবি নহেন, তাঁহাদিগের নাম লোকে দুই দিন পরে বিস্মৃত হইবে; কিন্তু মহাকবিদিগের অক্ষয় কীর্ত্তি কে ভুলিবে? এখনকার কবিনামপ্রাপ্ত হতভাগ্য বাঙ্গালী লেখকের পূর্ব্বেও বঙ্গদেশে কবিগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের প্রেমচিত্র কি মহাকবিগণের চিত্রানুযায়ী? জয়দেব, মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, ভারতচন্দ্র রায়ের প্রেমচিত্র কি প্রবন্ধ লেখক মহাশয়ের মনোমত? তাঁহারা ত এখনকার কবিনামপ্রাপ্ত বাঙ্গালী লেখক নহেন! আর যদি তুলনা করিতেই হয় তাহা হইলে দৃষ্টিক্ষেত্র প্রশস্ত করিতে হইবে, লোকবিশেষ বা শ্রেণী

অস্পর্শ পামর দীন, দুরাচার মন্দাহিন (?)
নীচ সঙ্গ নীচ ব্যবহার।
মুঞি হেন পতিত জনে, স্পর্শ প্রভু কি কারণে,
যোগ্য নহে তোমা স্পর্শিবার ॥ ৪
প্রভু কহে সনাতন, কর দৈন্য সম্বরণ,
তোমা দৈন্যে কাটে মোর হিঞা।
কৃষ্ণের করুণা ঐছে, ভাল মন্দ নাহি বাছে,
তোমা স্পর্শি পবিত্র লাগিঞা ॥ ৫
লাল ভোট দেখি গায়, প্রভু পুন পুন চায়,
লজ্জিত হইলা সনাতন।
গৌড়িয়ারে ভোট দিয়া, ছিড়া এক কান্থা লঞা,
প্রভুস্থানে পুন আগমন ॥ ৬
গৌরাঙ্গ করুণা করি, রাধাকৃষ্ণ মাধুরী,
শিক্ষা করাইলা সনাতনে।
আজ্ঞাদিলা রূপ সনে, দেখা হবে বৃন্দাবনে,
প্রভূ আজ্ঞায় করিলা গমনে ॥ ৭
ছিড়া কান্থা মুড়া মাথা, মুখে কৃষ্ণগুণ গাথা,
পরিধান ছিড়া বহির্ব্বাস।
কবু কান্দে কবু হাসে, সদা প্রেমানন্দে ভাসে,
কবু ভিক্ষা কবু উপবাস ॥ ৮
গিঞা গোসাঞি সনাতন, প্রবেশিলা বৃন্দাবন,
রূপ সঙ্গে হইল মিলন। *
প্রেমে অশ্রু নেত্র ভরে, সনাতনের পদধরে,
কান্দে রূপ গদ গদ স্বরে। *
গৌরাঙ্গের যত গুণ, কহে রূপ সনাতন,
হা নাথ হা নাথ বলি কান্দে। *
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে, মাধুকরী ভিক্ষা করে
এহিরূপে কথ দিন থাকে। *
কথ দিন তাহা ছাড়ি, কুঞ্জে কুঞ্জে রহে পড়ি,
ফল মূল করয়ে ভক্ষণ।
উচ্চ স্বরে আর্ত্তনাদে, রাধাকৃষ্ণ বলি কান্দে,
এহি রূপে গোঞায় সনাতন ॥
কথ দিন অন্তর্ম্মনা, ছাপান্নদণ্ড ভাবনা,
চারি দণ্ড শয়ন বৃক্ষতলে। *
চারি দণ্ড স্তুতি থাকে, স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে,
একতিল বৃথা নাহি যায়। *
কবু নাম গানে থাকে, রাধাকৃষ্ণ বলি ডাকে,
অবসর নহে এক তিল। *
ছাড়ি ভোগবিলাস, তরুতলে করে বাস,
দুই চারি দিন উপবাস।
আনিঞা বনের শাক, অলবণে করে পাক,
মুখে দেন দুই এক গ্রাস ॥
শুভ্র ব্রজ রজ গায়, ধূলায় ধূসর তায়,
কণ্টকী লাগয়ে দুই পাশে।
শ্রীরাধা বল্লভ দাসে, মনে করি অভিলাষে,
উচ্চস্বরে গায় অনুরাগে।

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু।

——০——

জাতীয় চরিত্র ও জাতীয় মহত্ত্ব।

জাতীয় চরিত্র বলিলে দেশের সমস্ত অধিবাসীর প্রকৃতিই বুঝায়—ব্যক্তিবিশেষের সমষ্টি লইয়াই উহা গঠিত হয়। যে দেশের ব্যক্তিবিশেষের সমষ্টিতে অধিক উন্নত ও মহৎ চরিত্র দেখা যায়, সেই দেশই জগতে অধিক মহত্ত্ব ও গৌরব লাভ করে। এই চরিত্রবান জাতি শুধু বড় ও প্রসিদ্ধ লোকদের জীবন হইতে গঠিত হয় না—ছোট বড় প্রত্যেক গৃহে, সামান্য কুটীরে—পিতার কাজের সঙ্গে, মাতার কর্ত্তব্যের মধ্যে, স্ত্রীর আচরণের ভিতর—এই জাতীয় প্রাণ অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত ও বিকশিত হয়।

বর্ত্তমান বোর যুদ্ধ হইতে তাহাদের মধ্যে এই জাতীয় চরিত্রের আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতেছি। ইংরেজদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক বোরদিগকে আমরা অতি সামান্য, নগণ্য জাতি বলিয়াই ভাবিতাম; মনে করিতাম উহারা আমাদের দেশের ইউরেসিয়ানদের মত অতি দুর্ব্বল ও অলস; ইংরেজদের সঙ্গে যুঝিবার ক্ষমতা তাদের কোথায়? কিন্তু গত চার মাসের যুদ্ধ বিবরণে আমাদের—আমাদের কেন সমস্ত জগৎসুদ্ধ লোকের—সে তাচ্ছিল্য ভাব গিয়া এখন তাদের প্রতি সম্মান বাড়িয়াছে। তাদের শত্রুপক্ষেরা পর্য্যন্ত তাদের সাহস, বীরত্ব, রণকৌশল ও একপ্রাণতার প্রশংসা করিতেছে! তাদের এই জাতীয় চরিত্র সামান্য কুটীরে, লাগার (Laager) বা ডিপোর মধ্যে ও গোলাবাড়ীর ভিতরেই গঠিত হইয়াছিল। সংবাদপত্রে যখন পড়ি—শ্রমজীবী, কৃষিজীবী সকলেই—যাহাদের অস্ত্র ধরিবার শক্তি আছে—ট্রান্সভালের এরূপ সমস্ত অধিবাসী মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিতেছে তখন বিস্মিত

* তারকা চিহ্নিত কবিতাগুলি অসম্পূর্ণ। বহুচেষ্টায় আমরা পূর্ণ করিতে পারি নাই। মূল পুস্তকে বানান যেরূপ আছে, ঠিক সেইরূপ রাখা গেল।

লেখক।

হই। তারা নিজেই নগর রক্ষার ভার লইয়াছে, প্রহরী ও গোয়েন্দার কাজ করিতেছে ও কয়লার খনি চালাইতেছে। বোর স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত একপ্রাণ হইয়া সংসারের ও মাঠের কাজ করিতেছে, সৈন্যদের আহার ও পোষাক যোগাইতেছে, আহত ও পীড়িতদের সেবা করিতেছে—আবার 'লেডিস্মিথের' বেষ্টনকারী বোর সৈন্যদের কাছে গিয়া নিজ নিজ স্বামী, পুত্র বা ভ্রাতাকে অভয়, উৎসাহ ও আনন্দ দিতেছে। সকলে আপন আপন গার্হস্থ্য ও পারিবারিক শোক দুঃখ ও বিরহ ভুলিয়া জাতীয় মান ও জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সমভাবে দেহপাতে প্রস্তুত, আত্মবিসর্জ্জনে উদ্যত, খাটিতে সক্ষম। বিশাল চরিত্রের এরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পড়িয়া মনে হয়, ধন্য বোর জাতি! অন্য জাতি এত জ্ঞানধর্ম্মের অভিমানে পুষ্ট হইয়া যাহা শিখিল না, এই দুই তিন শ বৎসরের কঠোর জীবন সংগ্রামে বোরজাতি তাহা শিখিয়াছে।

ইংরেজদের মধ্যেও এই জাতীয় একতা ও জাতীয় চরিত্র যে কতদূর উন্নত তাহা সকলেই জানেন। গার্হস্থ্য বিপদের ভিতরে ও পারিবারিক শোকের মধ্য দিয়া এই জাতীয় প্রাণ যে রকম উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায় সেরূপ আর কিছুতে নয়। সুতরাং বর্ত্তমান যুদ্ধ ইংরেজ জাতির মহাপ্রাণতারও অতি সুস্পষ্ট পরিচয় দিতেছে। এই জাতীয় ভাব সামান্য শ্রমজীবী ইংরেজ ভলাণ্টিয়ার হইতে বড় বড় লর্ড লেডিদের মধ্যে সমভাবে দেখিতে পাই। অল্প দিন হইল লর্ড রবার্টসের পুত্র বোর যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছে। এই নিদারুণ পুত্র ও ভ্রাতৃশোকে একান্ত কাতর হলেও লেডি রবার্টস ও তাঁর কন্যারা লর্ড রবার্টসকে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে দিতে বিমুখ হন নাই; বরং অধিকতর নিকটে থাকিয়া স্বামী ও পিতাকে উৎসাহ দিবার অভিপ্রায়ে নিজেরাও কেপ্‌কলনিতে গিয়াছেন। এরূপ আত্মবিস্মরণের দৃষ্টান্ত এখন ব্রিটনের ঘরে ঘরে ঘটিতেছে। কত পিতামাতা একটি পুত্রকে হারাইয়া অপরটিকে যুদ্ধে পাঠাইতেছে; কত ভগিনী অশ্রু চাপিয়া ভ্রাতাকে বিদায় দিতেছে, কত স্ত্রী বুক বাঁধিয়া স্বামীকে চির আলিঙ্গন করিতেছে। প্রতি দিনের যুদ্ধ সংবাদ প্রত্যহ কত ঘরে শোকের খবর ও নিরাশার ছায়া আনিতেছে। অথচ কাহারও আপ্‌শোষ নাই!—হায়! কেন তাকে যেতে দিয়াছিলাম—বলিয়া মর্ম্মভেদী বিলাপ নাই! কারণ, জাতীয় মহত্ত্বের কাছে এই ব্যক্তিগত বিপদ ও শোককে ইংরেজেরা অতি তুচ্ছ মনে করে। প্রতি জনের এইরূপ অক্লেশে দেহপাত দ্বারা, প্রতি ব্যক্তির গার্হস্থ্যশান্তি বিসর্জ্জনের দ্বারাই জাতীয় মান, জাতীয় গৌরব ও জাতীয় ক্ষমতা অটুট্ থাকিতে পারে—ইংরেজেরা মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে এই মহাবীজ শোণিতে ধারণ করে। সেই বীজ ক্রমে অঙ্কুরিত ও বিকশিত হইয়া বর্ত্তমান ইংরেজ চরিত্র গঠিত হইয়াছে।

এই বিশাল জাতীয় চরিত্র গঠিত হইতে বহুকাল ও বহু শিক্ষার আবশ্যক। অনেক পুস্তক পড়িলে বা বড় বড় উপাধি ধরিলে চরিত্র লাভ করা যায় না। উচ্চ বক্তৃতা বা তর্কের আড়ম্বরেও উহার পুষ্টি হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সমভাবে পালিত হইলে সামান্য কুটীরে বা বড় প্রাসাদে উহা সমভাবে জন্মিতে পারে। ইংলণ্ডের আজকাল বড় বড় লর্ড ডিউকেরা যে জাতীয় ভাবে প্রণোদিত হইয়া যুদ্ধস্থলে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইতেছে, সামান্য শ্রমজীবী ভলাণ্টিয়ার সেই মহৎভাবে উৎসাহিত হইয়া দেশের জন্য আপন আপন জীবন উৎসর্গ করিতেছে—দুই শ্রেণীর প্রাণেই জাতীয় দায়িত্ব একভাবে সমস্ত জীবনকে ভরিয়া ফেলিয়াছে, দুই চরিত্রই সমানে মহৎ নাম পাইবার যোগ্য।

আমাদের দেশে ঐরূপ জাতীয় জীবন ও বিশাল চরিত্র গঠিত হইবার পক্ষে অনেকগুলি অন্তরায় আছে। তার মধ্যে আমাদের দেশের একান্নবর্ত্তীপরিবার-ব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতার অধিক প্রভাব দেখা যায়। এখনকার অপেক্ষা পূর্ব্বে একান্নবর্ত্তী গৃহের বন্ধন অধিকতর দৃঢ় ছিল বটে, কিন্তু উহার ভিতর বহু পরিজনের একত্রবাসের দরুণ পরস্পরের সম্পদ বিপদে মানুষের হৃদ্বৃত্তিগুলি চালনার অধিক পরিসর পাওয়া যাইত। আজকাল যদিও সেরূপ বহুজনাবদ্ধ পরিবার প্রায় দেখা যায় না, কিন্তু তাহাতে আমাদের নিজ নিজ জীবনের গণ্ডী আরো প্রশস্ত পথে না গিয়া বেশী গুটাইয়া সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। প্রতি ব্যক্তির নিজ নিজ গৃহে বা সংসারে কোনরূপ দুঃখ কষ্ট না থাকিলেই আমরা অতি সুখে দিন কাটাই। আমরা আত্মীয় স্বজনের প্রতি যেমন কর্ত্তব্যের জন্য দায়ী, স্বদেশ ও স্বজাতির নিকটেও সেইরূপ দায়ী—এ উন্নত জাতীয়

অস্পর্শ পামর দীন, দুরাচার মন্দাহিন (?)
নীচ সঙ্গ নীচ ব্যবহার ।
মুঞি হেন পতিত জনে, স্পর্শ প্রভু কি কারণে,
যোগ্য নহে তোমা স্পর্শিবার ॥ ৪
প্রভু কহে সনাতন, কর দৈন্য সম্বরণ,
তোমা দৈন্যে কাটে মোর হিঞা ।
কৃষ্ণের করুণা ঐছে, ভাল মন্দ নাহি বাছে,
তোমা স্পর্শি পবিত্র লাগিঞা ॥ ৫
লাল ভোট দেখি গায়, প্রভু পুন পুন চায়,
লজ্জিত হইলা সনাতন ।
গৌড়িয়ারে ভোট দিয়া, ছিড়া এক কান্থা লঞা,
প্রভুস্থানে পুন আগমন ॥ ৬
গৌরাঙ্গ করুণা করি, রাধাকৃষ্ণ মাধুরী,
শিক্ষা করাইলা সনাতনে ।
আজ্ঞাদিলা রূপ সনে, দেখা হবে বৃন্দাবনে,
প্রভু আজ্ঞায় করিলা গমনে ॥ ৭
ছিড়া কান্থা মুড়া মাথা, মুখে কৃষ্ণগুণ গাথা,
পরিধান ছিড়া বহির্ব্বাস ।
কবু কান্দে কবু হাসে, সদা প্রেমানন্দে ভাসে,
কবু ভিক্ষা কবু উপবাস ॥ ৮
গিঞা গোসাঞি সনাতন, প্রবেশিলা বৃন্দাবন,
রূপ সঙ্গে হইল মিলন । *
প্রেমে অশ্রু নেত্র ভরে, সনাতনের পদধরে,
কান্দে রূপ গদ গদ স্বরে । *
গৌরাঙ্গের যত গুণ, কহে রূপ সনাতন,
হা নাথ হা নাথ বলি কান্দে । *
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে, মাধুকরী ভিক্ষা করে
এহিরূপে কথ দিন থাকে । *
কথ দিন তাহা ছাড়ি, কুঞ্জে কুঞ্জে রহে পড়ি,
ফল মূল করয়ে ভক্ষণ ।
উচ্চ স্বরে আর্ত্তনাদে, রাধাকৃষ্ণ বলি কান্দে,
এহি রূপে গোঞায় সনাতন ॥
কথ দিন অন্তর্ম্মনা, ছাপান্নদণ্ড ভাবনা,
চারি দণ্ড শয়ন বৃক্ষতলে । *
চারি দণ্ড স্তুতি থাকে, স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে,
একতিল বৃথা নাহি যায় । *
কবু নাম গানে থাকে, রাধাকৃষ্ণ বলি ডাকে,
অবসর নহে এক তিল । *
ছাড়ি ভোগবিলাস, তরুতলে করে বাস,
দুই চারি দিন উপবাস ।
আনিঞা বনের শাক, অলবণে করে পাক,
মুখে দেন দুই এক গ্রাস ॥
শুভ্র ব্রজ রজ গায়, ধূলায় ধূসর তায়,
কণ্টকী লাগয়ে দুই পাশে ।
শ্রীরাধা বল্লভ দাসে, মনে করি অভিলাষে,
উচ্চস্বরে গায় অনুরাগে ।

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু ।

* তারকা চিহ্নিত কবিতাগুলি অসম্পূর্ণ । বহুচেষ্টায় আমরা পূর্ণ করিতে পারি নাই । মূল পুস্তকে বানান যেরূপ আছে, ঠিক সেইরূপ রাখা গেল ।

লেখক ।

———o———

জাতীয় চরিত্র ও জাতীয় মহত্ত্ব ।

জাতীয় চরিত্র বলিলে দেশের সমস্ত অধিবাসীর প্রকৃতিই বুঝায়—ব্যক্তিবিশেষের সমষ্টি লইয়াই উহা গঠিত হয় । যে দেশের ব্যক্তিবিশেষের সমষ্টিতে অধিক উন্নত ও মহৎ চরিত্র দেখা যায়, সেই দেশই জগতে অধিক মহত্ত্ব ও গৌরব লাভ করে । এই চরিত্রবান জাতি শুধু বড় ও প্রসিদ্ধ লোকদের জীবন হইতে গঠিত হয় না—ছোট বড় প্রত্যেক গৃহে, সামান্য কুটীরে—পিতার কাজের সঙ্গে, মাতার কর্ত্তব্যের মধ্যে, স্ত্রীর আচরণের ভিতর—এই জাতীয় প্রাণ অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত ও বিকশিত হয় ।

বর্ত্তমান বোর যুদ্ধ হইতে তাহাদের মধ্যে এই জাতীয় চরিত্রের আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতেছি । ইংরেজদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক বোরদিগকে আমরা অতি সামান্য, নগণ্য জাতি বলিয়াই ভাবিতাম ; মনে করিতাম উহারা আমাদের দেশের ইউরেসিয়ানদের মত অতি দুর্ব্বল ও অলস ; ইংরেজদের সঙ্গে যুঝিবার ক্ষমতা তাদের কোথায় ? কিন্তু গত চার মাসের যুদ্ধ বিবরণে আমাদের—আমাদের কেন সমস্ত জগৎসুদ্ধ লোকের—সে তাচ্ছিল্য ভাব গিয়া এখন তাদের প্রতি সম্মান বাড়িয়াছে । তাদের শত্রুপক্ষেরা পর্য্যন্ত তাদের সাহস, বীরত্ব, রণকৌশল ও একপ্রাণতার প্রশংসা করিতেছে ! তাদের এই জাতীয় চরিত্র সামান্য কুটীরে, লাগার (Laager) বা ডিপোর মধ্যে ও গোলাবাড়ীর ভিতরেই গঠিত হইয়াছিল । সংবাদপত্রে যখন পড়ি—শ্রমজীবী, কৃষিজীবী সকলেই—যাহাদের অস্ত্র ধরিবার শক্তি আছে—ট্রান্সভালের এরূপ সমস্ত অধিবাসী মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিতেছে তখন বিস্মিত হই । তারা নিজেই নগর রক্ষার ভার লইয়াছে, প্রহরী ও গোয়েন্দার কাজ করিতেছে ও কয়লার খনি চালাইতেছে । বোর স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত একপ্রাণ হইয়া সংসারের ও মাঠের কাজ করিতেছে, সৈন্যদের আহার ও পোষাক যোগাইতেছে, আহত ও পীড়িতদের সেবা করিতেছে—আবার 'লেডিস্মিথের' বেষ্টনকারী বোর সৈন্যদের কাছে গিয়া নিজ নিজ স্বামী, পুত্র বা ভ্রাতাকে অভয়, উৎসাহ ও আনন্দ দিতেছে । সকলে আপন আপন গার্হস্থ্য ও পারিবারিক শোক দুঃখ ও বিরহ ভুলিয়া জাতীয় মান ও জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সমভাবে দেহপাতে প্রস্তুত, আত্মবিসর্জ্জনে উদ্যত, খাটিতে সক্ষম । বিশাল চরিত্রের এরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পড়িয়া মনে হয়, ধন্য বোর জাতি ! অন্য জাতি এত জ্ঞানধর্ম্মের অভিমানে পুষ্ট হইয়া যাহা শিখিল না, এই দুই তিন শ বৎসরের কঠোর জীবন সংগ্রামে বোরজাতি তাহা শিখিয়াছে ।

ইংরেজদের মধ্যেও এই জাতীয় একতা ও জাতীয় চরিত্র যে কতদূর উন্নত তাহা সকলেই জানেন । গার্হস্থ্য বিপদের ভিতরে ও পারিবারিক শোকের মধ্য দিয়া এই জাতীয় প্রাণ যে রকম উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায় সেরূপ আর কিছুতে নয় ! সুতরাং বর্ত্তমান যুদ্ধ ইংরেজ জাতির মহাপ্রাণতারও অতি সুস্পষ্ট পরিচয় দিতেছে । এই জাতীয় ভাব সামান্য শ্রমজীবী ইংরেজ ভলাণ্টিয়ার হইতে বড় বড় লর্ড লেডিদের মধ্যে সমভাবে দেখিতে পাই । অল্প দিন হইল লর্ড রবার্টসের পুত্র বোর যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছে । এই নিদারুণ পুত্র ও ভ্রাতৃশোকে একান্ত কাতর হলেও লেডি রবার্টস ও তাঁর কন্যারা লর্ড রবার্টসকে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে দিতে বিমুখ হন নাই ; বরং অধিকতর নিকটে থাকিয়া স্বামী ও পিতাকে উৎসাহ দিবার অভিপ্রায়ে নিজেরাও কেপ্‌কলনিতে গিয়াছেন । এরূপ আত্মবিস্মরণের দৃষ্টান্ত এখন ব্রিটনের ঘরে ঘরে ঘটিতেছে । কত পিতামাতা একটি পুত্রকে হারাইয়া অপরটিকে যুদ্ধে পাঠাইতেছে ; কত ভগিনী অশ্রু চাপিয়া ভ্রাতাকে বিদায় দিতেছে, কত স্ত্রী বুক বাঁধিয়া স্বামীকে চির আলিঙ্গন করিতেছে । প্রতি দিনের যুদ্ধ সংবাদ প্রত্যহ কত ঘরে শোকের খবর ও নিরাশার ছায়া আনিতেছে । অথচ কাহারও আপশোষ নাই !—হায় ! কেন তাকে যেতে দিয়াছিলাম—বলিয়া মর্ম্মভেদী বিলাপ নাই ! কারণ, জাতীয় মহত্ত্বের কাছে এই ব্যক্তিগত বিপদ ও শোককে ইংরেজেরা অতি তুচ্ছ মনে করে । প্রতি জনের এইরূপ অক্লেশে দেহপাত দ্বারা, প্রতি ব্যক্তির গার্হস্থ্যশান্তি বিসর্জ্জনের দ্বারাই জাতীয় মান, জাতীয় গৌরব ও জাতীয় ক্ষমতা অটুট্ থাকিতে পারে—ইংরেজেরা মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে এই মহাবীজ শোণিতে ধারণ করে । সেই বীজ ক্রমে অঙ্কুরিত ও বিকশিত হইয়া বর্ত্তমান ইংরেজ চরিত্র গঠিত হইয়াছে ।

এই বিশাল জাতীয় চরিত্র গঠিত হইতে বহুকাল ও বহু শিক্ষার আবশ্যক । অনেক পুস্তক পড়িলে বা বড় বড় উপাধি ধরিলে চরিত্র লাভ করা যায় না । উচ্চ বক্তৃতা বা তর্কের আড়ম্বরেও উহার পুষ্টি হয় না । পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সমভাবে পালিত হইলে সামান্য কুটীরে বা বড় প্রাসাদে উহা সমভাবে জন্মিতে পারে । ইংলণ্ডের আজকাল বড় বড় লর্ড ডিউকেরা যে জাতীয় ভাবে প্রণোদিত হইয়া যুদ্ধস্থলে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইতেছে, সামান্য শ্রমজীবী ভলাণ্টিয়ার সেই মহৎভাবে উৎসাহিত হইয়া দেশের জন্য আপন আপন জীবন উৎসর্গ করিতেছে—দুই শ্রেণীর প্রাণেই জাতীয় দায়িত্ব একভাবে সমস্ত জীবনকে ভরিয়া ফেলিয়াছে, দুই চরিত্রই সমানে মহৎ নাম পাইবার যোগ্য ।

আমাদের দেশে ঐরূপ জাতীয় জীবন ও বিশাল চরিত্র গঠিত হইবার পক্ষে অনেকগুলি অন্তরায় আছে । তার মধ্যে আমাদের দেশের একান্নবর্ত্তীপরিবার-ব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতার অধিক প্রভাব দেখা যায় । এখনকার অপেক্ষা পূর্ব্বে একান্নবর্ত্তী গৃহের বন্ধন অধিকতর দৃঢ় ছিল বটে, কিন্তু উহার ভিতর বহু পরিজনের একত্রবাসের দরুণ পরস্পরের সম্পদ বিপদে মানুষের হৃদ্‌বৃত্তিগুলি চালনার অধিক পরিসর পাওয়া যাইত । আজকাল যদিও সেরূপ বহুজনাবদ্ধ পরিবার প্রায় দেখা যায় না, কিন্তু তাহাতে আমাদের নিজ নিজ জীবনের গণ্ডী আরো প্রশস্ত পথে না গিয়া বেশী গুটাইয়া সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে । প্রতি ব্যক্তির নিজ নিজ গৃহে বা সংসারে কোনরূপ দুঃখ কষ্ট না থাকিলেই আমরা অতি সুখে দিন কাটাই । আমরা আত্মীয় স্বজনের প্রতি যেমন কর্ত্তব্যের জন্য দায়ী, স্বদেশ ও স্বজাতির নিকটেও সেইরূপ দায়ী—এ উন্নত জাতীয়

ভাব এখনও আমরা হৃদয়ে ধরিতে শিখি নাই। নিজ গৃহটি আমাদের কাছে নিজ দেশের সমান, আপন পরিবারটি সমস্ত স্বজাতির অনুরূপ—আর আমি নিজে সে সবের সর্ব্বময় কর্ত্তা—এই নিকৃষ্ট ভাব আমাদের জীবনে এতদূর মিশিয়া গিয়াছে, আমাদের কাজকর্ম্মে ও কথাবার্ত্তায় এতদূর প্রকাশ পায় যে, উহা হইতে মনকে বিচ্ছিন্ন করা এক প্রকার অসম্ভব।

সকল দেশ ও সকল জাতির অবস্থা খুঁজিয়া দেখিলে, আমরা ইহাই সর্ব্বত্র দেখিতে পাই যে, যে দেশের লোকেরা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য যত অধিক কঠোরতা সহ্য করে, তাহাদের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি তত অধিক জোরাল ও ধারাল হয়, আর তাহাদের চরিত্রও অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হয়। এস্কুইমো, ল্যাপ্ প্রভৃতি অতি শীতপ্রধান-দেশের জাতিরা উহার প্রধান উদাহরণ। ঐ লোকদের বাসভূমির প্রাকৃতিক অবস্থা একান্ত প্রতিকূল হওয়ায় তাহারা নানা উপায়ে আপনাদিগকে স্বাভাবিক শত্রু হইতে রক্ষা করিতে শিখে। সকলেই শীতের জ্বালায় অস্থির, শাদা ভালুকের ভয়ে ত্রস্ত, ও একমাত্র শিকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এরূপ অবস্থায়, যে পরিশ্রম করিয়া বা বুদ্ধি খাটাইয়া আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবন না করে, তাহাকেই—হয় শীতের প্রকোপে, নয় ভালুকের কবলে, নতুবা অনাহারে প্রাণ হারাইতে হয়। সে কারণে শিশুকাল থেকেই তারা নানা উপায়ে শিকার ও আপনাদিগকে রক্ষা করিতে শিখে। সিল ও তিমি মৎস্য ধরিবার জন্য তারা গৃহ ছাড়িয়া অনেক দূর ঘুরিতে বাধ্য হয়, কখন বা ছোট ছোট ডিঙ্গির ভিতরেই বরফের মধ্যে দুই তিন মাস কাটিয়া যায়। আজীবন এই প্রকার কঠোরতার কোলে পালিত হওয়ায় তাহাদের শরীর সবল ও চরিত্র দৃঢ় হয়। বিপদকালে সকলে প্রাণপণে পরস্পরের সাহায্য করে। পরনিন্দা, কলহ, চুরী প্রবঞ্চনা প্রভৃতি দুর্ব্বল চরিত্রের দোষ তাদের মধ্যে প্রায় দেখা যায় না।

অন্য দিকে যে দেশে যত অনায়াসে ও বিনা পরিশ্রমে জীবিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেখানকার অধিবাসীরা তত বেশী অলস ও দুর্ব্বলচরিত্র হইয়া থাকে। আমাদের দেশেই ইহার অনেক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশ—আবার বঙ্গদেশের মধ্যেও পূর্ব্ববাঙ্গালা অধিক উর্ব্বরা ও ফলপ্রদ। সেখানকার জমি এত জল ও সরস যে কেবল কাদায় লাঙ্গল দিয়া বীজ বুনিলেই চার মাস পরে কৃষকেরা এত ধান তোলে যে, সমস্ত বৎসর আর আহারের ভাবনা ভাবিতে হয় না। সেজন্য সেখানে দাস দাসী বা শ্রমজীবী লোক পাওয়া ভার। সকলেই একরূপ নিরুদ্যম ও নিশ্চেষ্ট ভাবে জীবন কাটায়, আর পরস্পরের সঙ্গে দাঙ্গা, মোকদ্দমা করিয়া সময় নষ্ট করে। ইহা অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন যে, ভারতবর্ষের মধ্যে বাখরগঞ্জ জেলায় চুরী, ডাকাতি, জাল ও মিথ্যা মোকদ্দমা প্রভৃতি নীচ প্রকৃতির অপরাধ অধিক ঘটিয়া থাকে।

ভিন্ন ভিন্ন জাতি ছাড়িয়া স্বতন্ত্র পরিবারব্যবস্থা আলোচনা করিলেও ভাল মন্দ ব্যবস্থার মধ্যে আমরা চরিত্র-গঠনের উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট উপাদান দেখিতে পাই। ইংরেজদের মধ্যে কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্র পৈতৃক সম্পত্তি পাওয়ার আইন বশতঃ অন্যান্য পুত্রেরা জীবিকার জন্য নিজ নিজ চরিত্র ও পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হয়। এরূপ স্থলে শরীর সবল ও চরিত্র দৃঢ় না হইলে কেহই জীবনে সফল হইতে পারে না; সেজন্য বাল্যবয়সেই জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে ইংরেজ যুবকেরা যত সদ্বৃত্তিগুলির চালনা দ্বারা নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবনের সফলতা ও সৌভাগ্যের উপায় করিয়া থাকে।

আমাদের দেশে নিজ নিজ পরিবার মধ্যে অন্নসংস্থান থাকাতে লোকেরা বেশী নড়িতে চায় না। কাজ করুক বা না করুক দুটি খেতে ত পাবে—এই প্রবাদ বচন অনেক স্থলে আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে শাপের মত হইয়াছে। একান্নবর্ত্তী পরিবারব্যবস্থা দ্বারা কত উদ্যমশীল ও শ্রমপটু জীবন চিরদিনের মত অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ ধনী লোকের পুত্র পৌত্রগণ যে অলস ও বিলাসী হয়, তাহাও এই সামাজিক বা পারিবারিক রীতির ফল। জীবিকা নির্ব্বাহ বা অর্থোপার্জ্জন পরিশ্রমের উদ্দেশ্য হইলেও উহা মানবজীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য নয়—ইহা অতি অল্প লোকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, সুতরাং যে সমাজে প্রতি ব্যক্তিকে জীবিকার জন্য খাটিতে হয় না, সেখানে অলসতা ও উহার সহচর যত মন্দ গুণ আসিয়া মানব চরিত্রকে আক্রমণ করে। আমাদের সমাজেও তাহাই ঘটিয়াছে।

তাছাড়া, বহুকাল পরিবারবদ্ধ থাকায় আমাদের মনের ভাব এত অপ্রশস্ত হইয়া গিয়াছে যে, উহা সকল ঘটনা ও কাজকর্ম্মে প্রকাশ পায়। পুত্রকন্যাগুলি চিরকাল আশপাশে থাকে, ইহাই হিন্দু পিতামাতার একান্ত ইচ্ছা। চাকরীর জন্য পুত্র কি জামাতা কিছু দূরস্থানে গেলে জননী ভাবিয়াই আকুল। এমন কি, নিজ নিজ গ্রাম, সহর, কি অঞ্চল ছাড়িয়া অন্যত্র সন্তানদের বিবাহ দিতেও পিতামাতার অমত দেখা যায়। অনেক সময় কলিকাতার বাহিরের যোগ্য পাত্র ত্যজিয়া পিতামাতা নিকটবর্ত্তী অপেক্ষাকৃত হীন ব্যক্তির সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়াছেন—এরূপ দৃষ্টান্ত আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

আমাদের সাধারণ জীবনেও এই সংকীর্ণতা সর্ব্বত্র দেখা যায়। ইউরোপ বা ইংলণ্ডের রাস্তায় কি উদ্যানে যখন পাঁচজন ভদ্রলোকে একত্র হয়, তখন তাহাদের পরস্পরের কথাবার্ত্তায় মনোযোগ করিলে তাহাতে গার্হস্থ্য বা আফিস জীবনের স্বার্থ আন্দোলন অতি অল্পই থাকে। সাধারণস্থানে সকলেই সাধারণ বিষয়ের আলাপ করে। উঁচু, নীচু, ছোট বড় সকলেই এক ভাবে সমাজ, ধর্ম্ম, শিক্ষা বা রাজনীতির আলোচনা করে। নিজের দেশে কি অন্য স্থানে কোথায় কি হইতেছে—সকল বিষয়ের উত্তম খবর রাখে। কিন্তু আমাদের দেশের কলিকাতার ইডেন গার্ডেনে কি মফস্বলের ময়দানে—দেশীয় লোকদের মধ্যে আত্ম ও আফিস ছাড়া কোন বিষয়ের আলাপ শুনিতে পাই না। শিক্ষক বা ছাত্রশ্রেণীর মধ্যে স্কুল কলেজের প্রসঙ্গই প্রধান! কোন্ কলেজের নিয়ম কড়া, কোন্ স্কুল ছাত্রদিগকে বেশী প্রশ্রয় দেয়, কোন্ প্রফেসর কেমন লেক্চার দেয়—ইত্যাদি কথা ছাড়িয়া তারা প্রায় অন্য সাধারণ কি জাতীয় বিষয়ের আন্দোলন করে না। আর ডেপুটি, মুন্সেফ ও উকীল বাবুদের সমস্ত হৃদয় যেন আইনের কূট প্রস্তাবে পূর্ণ থাকে। কাহার কাছারীতে কি মোকর্দ্দমা হইল, কোন্ তরফের সাক্ষী ঘুষ খাইয়াছে, কাহার সাহেব কাহার উপর চটা বা সন্তুষ্ট, কাহার বেতন বৃদ্ধির কত বিলম্ব—প্রভৃতি ক্ষুদ্র বিষয় ভিন্ন কোন উচ্চ ভাব কি জাতীয় চর্চ্চা তাঁহাদের মুখে শুনা যায় না। এক কথায়, ইংরাজীতে যাহাকে talking shop বলে, আমাদের শিক্ষিত ভ্রাতারা অবসর কালে সেই আলাপেই রত থাকেন। কোনরূপ মহৎ ভাব কি উন্নত বিষয় আমাদের সংকীর্ণ জীবনের ক্ষুদ্রতম কোণেও স্থান পায় না। স্বদেশের উচ্চশিক্ষিত লোকদের মধ্যে যখন আমরা জাতীয় প্রাণ ও জাতীয় মহত্ত্বের প্রতি এরূপ ঔদাস্য বা তাচ্ছিল্য দেখিতে পাই, তখন অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিতদের ত কথাই নাই। দুই বেলা দুইটি ভাত পাইলেই তারা সন্তুষ্ট। উচ্চ জীবনের মহত্ত্ব তারা কিরূপে বুঝিবে?

আমাদের মহচ্চরিত্র গঠনের আর একটি প্রতিবন্ধকতা এই যে, আমাদের দেশের লোকেরা সর্ব্বত্র জ্ঞানের অপেক্ষা ধনের সন্মান অধিক করে। বিশাল চরিত্রের অপেক্ষা বড় সিন্ধুকের দ্বারা বেশী আকৃষ্ট হয়। কেবল গরীব বা নীচ শ্রেণীর মধ্যে নয়—শিক্ষিত ধনবানদের মধ্যেও এই অর্থপূজা সমান দেখিতে পাই। সে কারণে সকলেই স্বতন্ত্রতায় বিসর্জ্জন দিয়া বড় বড় চাকরী পাইবার জন্য লালায়িত! যাঁরা গবর্মেণ্টের অধীনে কর্ম্ম পান তাঁরা আপনাদিগকে মহা ভাগ্যবান ভাবিয়া অপরকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। আমরা মাসিক আয় অনুসারে ব্যক্তিবিশেষের মূল্য স্থির করি। যথার্থ ধার্ম্মিক, উদার ও চরিত্রবান্ ব্যক্তি অর্থের আড়ম্বর দেখাইতে না পারিলে, সকলের চক্ষে অতি সামান্য লোক বলিয়া অনাদৃত হন। আর অনেক চরিত্রহীন লোক অর্থের বলে সমাজের সর্ব্বত্র সন্মানিত হইয়া থাকেন। Money covers a multitude of sins. অর্থাৎ টাকায় অনেক পাপ ঢাকিয়া ফেলে—এ ইংরাজী প্রবাদটি এ দেশে যত দুর সত্য ফলিতে দেখিয়াছি, বিলাতেও তত দেখি নাই।

আমাদের আর একটি দোষ, দেশের মধ্যে কোন মহৎ সবল চরিত্র দেখিলেই অতিরিক্ত চাটুবাদে আমরা তাঁহার ঔজ্জ্বল্য নষ্ট করিয়া ফেলি। নিজের প্রশংসায় কর্ণপাত করে না জগতে এরূপ দৃঢ়প্রকৃতির লোক অতি অল্প—বিশেষ আমাদের এই দুর্ব্বল চরিত্রের মধ্যে উহা নিতান্ত বিরল। আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত ও সকল লোকদের মধ্যে এই ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতা স্পষ্ট দেখা যায়। কোন শিক্ষিত লোকের মধ্যে মহত্ত্বের আভাস পাইলেই তাঁহার চারিদিকে চাটুকারদের দল জুটিয়া থাকে, আর ক্রমাগত তাঁর কাণে প্রশংসার ঢাক পিটাইয়া তাঁকে আত্মগর্ব্বিত ও স্বার্থপর করিয়া তুলে। এইরূপে যে বিশাল

চরিত্র বিকশিত হইবার অবসর পাইলে সময়ে জাতীয় জীবনের ভিত্তি স্বরূপ হ'তে পারিত, তাহা কাঁটার ভিতর পড়িয়া সংকীর্ণ ও ছিন্ন হইয়া শীঘ্র বিনাশ পায়!

জাতীয় চরিত্র গঠনের প্রারম্ভেই আমরা যদি দুর্ব্বলতার পরিচয় দিই, তাহলে আমাদের মধ্যে কোন কালে যে ডারউইন বা হাক্সলি, গ্ল্যাডষ্টোন বা মোক্ষমূলার প্রভৃতির ন্যায় বিশাল চরিত্রের অধিষ্ঠান হইবে এরূপ আশা করা যায় না। তবে মানুষের 'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।' আমাদের সমাজের মধ্যে নানা প্রকার ধ্বংসশক্তি থাকিলেও এক দিন না এক দিন ঐ বিষেই বিষক্ষয় হইবে। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন, দেশের লোকসংখ্যার সঙ্গে দারিদ্র্য জ্বালা কিরূপ বাড়িতেছে, সাধারণ লোকের সমৃদ্ধিক্ষেত্র ক্রমশই অপ্রশস্ত হইয়া যাইতেছে। এই সঙ্কুচিত ক্ষেত্রের প্রবল ঘর্ষণে আলোড়িত হইয়া, আজ কাল অনেকে সামাজিক ও পারিবারিক গণ্ডী ভেদিয়া বাহিরে গিয়া হাঁফ ছাড়িতেছেন। এই সব শ্রমপটু জীবনের সঙ্কলনে, দুই চারিটি করিয়া মহৎ চরিত্রের বৃদ্ধিতে স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের সমষ্টিতে আমাদের জাতীয় জীবন ও জাতীয় চরিত্র গঠিত হইবে। আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আত্ম ও স্বার্থ ভুলিয়া বিশাল দেশব্যাপারে লিপ্ত হইব ও সর্ব্বদা স্বদেশের আনন্দ ও সুখ দুঃখের আলোচনা করিব। শুধু আলোচনা নয়—আমরা প্রতি ব্যক্তি দেশের জন্য দেশের লোকের জন্য খাটিতে শিখিব। তাহলে নিশ্চয় এক দিন আমাদের চরিত্র মহৎ হইবে, আর আমাদের স্বজাতি সর্ব্বত্র সম্মানিত হইবে। *

শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস।

—০—

বিবাহ।

শুন শুন বলি এক দুঃখের কাহিনী;—
গিরি শৃঙ্গে ছিল এক নারী;
রূপসী সরলা বালা নামেতে নন্দিনী
নেপালীয়া জাতির কুমারী।

প্রতিদিন সে রূপসী সখীগণ সনে
জল তরে নির্ঝরেতে যায়;
মধুর মুরলীরব লাগয়ে শ্রবণে,
প্রতিদিন কে বাঁশী বাজায়?

যায় যায় আর চায়; সানু পৃষ্ঠে বসি
কে যুবক বাঁশরী বাজায়,
কেন সে সুস্বর তার মন প্রাণে পশি
গতি স্থিতি উভয় ভুলায়?

শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঘোরে যেন সেই গীতধ্বনি;
নির্ঝরিণী সনে নেমে যায়;
সে গিরি কন্দরে তার জাগে প্রতিধ্বনি;
বিহগের কূজনে মিশায়।

সবল, সুদৃঢ়, সুস্থ, গৌরাঙ্গ, সুন্দর,
আয়তাক্ষ, বিশাল-উরস,
শ্রীদয়াল নাম তার পুরুষ প্রবর
পঞ্চাধিক বিংশতি বয়স।

নির্ম্মল সরল চিত্ত, জানে না খলতা,
প্রকৃতির পালিত সন্তান,
তাই তার প্রকৃতির শোভাতে মমতা,
তাই তার প্রাণভরা গান।

পাহাড়ী যুবতী কত যায় আর আসে,
সেই গীত শোনে দাঁড়াইয়া,
আপনা পাশরি যেন ডোবে সেই রসে
যায় যবে জলের লাগিয়া।

ঘরে ফিরে সেই গীত গাইতে গাইতে,
স্বরে স্বরে উঠায়ে লহরী;
সুস্বর ছড়ায়ে যায় সে গিরি ছাইতে,
দিক্ দশ সুধা-সিক্ত করি।

সে যুবতী-কুল মাঝে নন্দিনী সুন্দরী,
অনুমান দ্বাবিংশ বয়সে,
মরাল গমনে যায় দিক আলো করি,
সেও ডুবে সে সংগীত-রসে।

অন্যেত দেখিয়া গেল; ভাল মন্দ কত
বলে গেল; ফেলে গেল তারে;
সে কেন রহিয়া গেল মন্ত্রমুগ্ধ মত?
যাই যাই যাইতে না পারে।

কে বাঁধিল? বাঁধিল কি সে বাঁশরী তারে?
অথবা সে পুরুষ প্রধান?
কে বা জানে? বেলা যায় বুঝিতে না পারে,
যাই-যাই-দিবা অবসান।

অবশেষে তাড়াতাড়ি জল নিয়া চলে
আধখানা হৃদয় ফেলিয়া;
না পোহাতে নিশি পুনঃ আসে সেই স্থলে
জল আনা ছলনা করিয়া।

সেও কেন আসে সেথা এহেন সকালে?
সেও কেন তার পথ চায়?
প্রভু হে জড়াও তুমি দোঁহে প্রেম জালে,
দোঁহে তাহা বুঝিতে না পায়।

এক দিন শ্রীদয়াল দেখিল নন্দিনী
ফুল পাড়ে পাষাণে চড়িয়া,
পাষাণে পাষাণ রাখি নারে সে কামিনী
ধরিবারে, যায় সে পড়িয়া।

শ্রীদয়াল গাছে চড়ি নোঁয়াইয়া লতা
ফুল দুটী পঁহুছিয়া দিল,
মুখ পানে চাহিল সে কহিল না কথা,
ফুল দুটী কাণেতে পরিল।

আর দিন জল নিয়া যাইছে নন্দিনী
কাঁটাবনে বাঁধিল বসন;
ফিরে চায়, হাত বাঁধা, ভাবে একাকিনী
কে উদ্ধার করিবে এখন?

হেন কালে শ্রীদয়াল ধাইয়া ত্বরিত
আসি তথা কণ্টক ছাড়ায়;
মুখ পানে চাহি বালা হইলা লজ্জিত,
ধন্যবাদ নয়নে জানায়।

এমনে কেমনে কথা ফুটে দুই মুখে!
দুই জনে হলো পরিচয়;
দুজনে নির্ঝর পারে বসি মনোসুখে
প্রেমালাপে বেলা গত হয়।

একের জলের ভার অন্যে দেয় বহে,
নিত্য ফুল দেয় উপহার;
গোমেষ চরায় দোঁহে আর কথা কহে
অন্ত নাই সে সব কথার।

কি কহিল, কি বুঝিল, জানি না সে সব,
শুনিলাম হইল নিশ্চয়,
গুরুজনে কহি হবে বিবাহ উৎসব,
মিলাইবে যুগল হৃদয়।

বহুলোক সমাগম বিবাহ বাসরে,
গুরুজনে আনন্দ অপার,
খেয়ে, পিয়ে, গেয়ে সবে রাত্রি শেষ করে,
সে বিবাহে সন্তোষ সবার!

যুবক যুবতী এবে হইল দম্পতী
ঘর করে গিরি শৃঙ্গোপরে,
অপূর্ব্ব প্রেমেতে বাঁধা যুগল মূরতি,
কায়া ছায়া সম সদা ফিরে।

দোঁহার শ্রমের অন্ন দোঁহে সুখে খায়;
দোঁহে বহে জীবনের ভার;
দোঁহে বসি গিরিপৃষ্ঠে বাঁশরী বাজায়,
দোঁহে গাঁথে গিরি পুষ্প-হার।

একবার গিরি পৃষ্ঠে এল আড়কাটি
আসামের বাগিচা হইতে;
শুনাল বিচিত্র কথা অতি পরিপাটী
জিদ করে সে দোঁহে যাইতে!

তাদের সরল প্রাণে সে কথা পশিল,
কল্পনাতে সকলি সুন্দর;
দেখিতে নূতন দেশ মানস খসিল;
দোঁহে তাই বাঁধিল কোমর।

* এই প্রবন্ধ মাঘ মাসে লিখিত হইয়াছিল।

বিপদ না গণে তারা, শ্রমে না ডরায়,
দোঁহা-প্রেমে দুজনে মগন।
নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে চলিল তথায়,
সেই স্থলে ভাবিয়া আপন।

সে যা বলে তাই করে সরল হৃদয়ে
কি লিখিল তাহাও না জানে,
ছিল মুক্ত হ'ল দাস, দাসখত লয়ে,
ইংরাজের বিধির বিধানে।

উপনীত চা বাগানে; নিষ্ঠুর হৃদয়
তথা এক মিলিল ইংরাজ,
সেই সে বাগিচাপতি ক্রূর নীচাশয়,
দাস দলে সেই যমরাজ।

জরিমানা, কারাবাস, প্রহার প্রচণ্ড
নৃশংসতা শাস্ত্রে যত লিখে;
বধিতে সে দাস দলে সকলি পাষণ্ড
ভাল মতে রাখিয়াছে শিখে।

দাসখতে বাঁধা সবে পলাইতে নারে,
অস্থি মাংস পিষে গুরু শ্রমে,
উচ্চ নীচ জ্ঞান নাই তাহার বিচারে,
ভদ্রাচার নাহি করে ভ্রমে।

ইজ্জত হারায়ে সবে পশুর অধম,
নিরাশায় ডোবে পাপাচারে,
ধর্ম্মাধর্ম্ম লুপ্ত প্রায়, পাপ পুণ্য সম
সবে নষ্ট কে রাখিবে কারে।

যারে ইচ্ছা ধরিয়া সে লয়,
নারীর সতীত্ব নাই সে ইংরাজ কাছে,
দাসখতে সবে বাঁধা কার সাধ্য আছে
তার হয়ে কোনো কথা কয়?

এ হেন বাঘের গর্ত্তে এল মেষ দ্বয়,
দেখি বাঘ রসনা শাণায়;
প্রথমে সৌজন্য কত মধুরতাময়,
সে দোঁহারে কতই বাড়ায়।

ক্রমে হৃদয়ের কথা জানায় দুজনে
নন্দিনীরে চাহিল ইংরাজ;
শ্রীদয়াল ক্রোধে কাঁপে সে কথা শ্রবণে
নন্দিনীর মাথে পড়ে বাজ।

দোঁহাতে পলাতে চায়, দাস-খতে বাঁধা,
এতদিনে হইল চেতনা;
এত দিনে কেটে যায় নয়নের ধাঁধা,
ঘরে বসি কাঁদে দুই জনা।

মিষ্ট কথা, উপহার, ঘুষ, সদাচার,
কিছুতেই হলো না যখন;
ধরিল ইংরাজ তবে প্রচণ্ড আকার,
বাধা-প্রাপ্ত ব্যাঘ্রের মতন।

এক দিন নিশাযোগে দিল শ্রীদয়ালে
ছলে অন্য গ্রামে পাঠাইয়া,
না ফিরিতে পৃষ্ঠ, আসি কুঠী-লাঠীয়ালে
নন্দিনীরে লইল ধরিয়া।

সে নারী সামান্য নয় বলে বা সাহসে,
হাতে পায়ে শক্তি যতক্ষণ,
যুঝিল একেলা ঘোর, আনিতে স্ববশে
হিম শিম লাঠিয়ালগণ।

কতবা যুঝিবে একা ফুরাল শকতি,
ধরি লয়, কাঁদে হাহাকারে,
বৃক মুখে মেষ যথা যুঝে সে যুবতি,
কেহ নাহি রক্ষয়ে তাহারে!

কুলি এক শ্রীদয়াল-উদ্দেশে ছুটিয়া,
এ বারতা কহে কাণে কাণে,
গর্জ্জি ক্ষিপ্ত সিংহ প্রায় আসে সে ফিরিয়া,
বাধা বিঘ্ন কিছু নাহি মানে।

আছিল নেপালী ছোরা গৃহে লম্বমান,
টানি লয় উন্মত্ত মতন,
নিমিষে সে ইংরাজের গৃহে ধাবমান,
সিংহ সম করিয়া গর্জ্জন।

এদিকে সে পশু সম পাষণ্ড ইংরাজ
নন্দিনীকে একেলা পাইয়া,
সোহাগে ধরিতে যায় খোয়াইয়া লাজ,
জোরে বাহু দেয় সে ঠেলিয়া।

শেষেতে ধরিল হাত; না কুলায় বলে
দংশিল সে সে হাতে গর্জ্জিয়া;
ইংরাজ পাইয়া ব্যথা ক্রোধে উঠে জ্বলে,
পদাঘাত করিল গর্জ্জিয়া।

পদাঘাতে অভাগিনী পড়ে আছাড়িয়া,
ব্যথা বড় পাইল চরণে;
উঠিয়া বসিয়া কাঁদে, ইংরাজ আসিয়া,
পুন বাঁধে প্রেম আলিঙ্গনে।

পুন সে রমণী রোষে, পুন ক্রোধোদয়,
পুন তারে করয়ে প্রহার,
ছুটিয়া নক্ষত্র বেগে ও কে এ সময়
এল যম দূতের আকার।

না ফিরিতে সে ইংরাজ সে নেপালী ছোরা
পেটে তার সজোরে বসিল!
মরি, মরি ছুটে আয়, কে আছিস তোরা,
না বলিতে সে বাণী খসিল।

নিমিষে সে ছোরা উঠি হৃদয় বিদারে,
পড়িল সে হারায়ে চেতনা;
ধরা হতে বাহু যুগে তুলিয়া প্রিয়ারে,
নিমিষেতে পলাল সে জনা।

না জমিতে ভৃত্যগণ, নিশার আঁধারে
সে বাগিচা ছাড়িয়া পলায়,
নন্দিনী চলিতে নারে, পৃষ্ঠেতে তাহারে
শ্রীদয়াল বহে লয়ে যায়।

ছাড়িয়া সহজ পথ বনে বনে চলে,
নাহি করে হিংস্র জন্তু ভয়,
নামায় পৃষ্ঠের বোঝা পরিশ্রান্ত হলে,
প্রেম দানে জুড়ায় হৃদয়।

এরূপে পলায়ে গেল নদ নদী পারে
উতরিয়া গ্রাম জনপদ;
দিন গতে পুন সুস্থ দেখিল প্রিয়ারে,
ভাবিল সে কাটিল বিপদ।

উতরিল বহুদিনে ত্রিপুরার দেশে,
সেথা ক্ষেতে খাটে দুইজনে;
সুখেতে জীবন যায় ডুবি প্রেমাবেশে
পূর্ব্ব কথা রহিল না মনে।

ভুলে গেল পাহাড়ের সুখের সে দিন,
ভুলে গেল গো মেষ চরাণি,
ভুলে গেল বাগিচার দুর্দ্দশা কঠিন,
ভুলে গেল সে ঘোর রজনী।

ক্রমে সুসন্তান এক ক্রোড়েতে আসিল,
ঘর পূর্ণ সুবাসে তাহার;
দেখিয়া দোঁহার প্রাণ আনন্দে ভাসিল,
দ্বিগুণিত প্রণয় দোঁহার।

এক দিন ক্ষেত হতে আসে শ্রীদয়াল,
পথমাঝে পুলিশে ঘেরিল;
পুলিস প্রহরী সেই কালান্তের কাল
চারিজনে সবলে ধরিল।

একি? একি? আর একি, পৃষ্ঠে বাহু নিয়ে
বাঁধি তারে লৌহের শৃঙ্খলে;
গৃহে সে যাইতে চায়, অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে
ঠেলে লয়ে অন্য দিকে চলে।

বাঁধিয়া লইল তারে পুন সে আসামে,
আদালতে হইবে বিচার;
ওদিকে নন্দিনী পড়ি একা সেই গ্রামে
দিন রাত করে হাহাকার!

শেষে সে কোমর বাঁধে যাব সেই দেশ
যাব সেই নদ নদী পারে,
হায়রে! বাহির হল ভিখারিণী বেশে,
সবে দেখে সুধায় তাহারে।

একা নারী পথে ব্যাঘ্র ভল্লুকের ভয় ;
মহারণ্য সে ত নাহি গণে,
পতির উদ্দেশে চলে বাঁধিয়া হৃদয়,
পৃষ্ঠে শিশু আগুলি যতনে।

বহুদিনে উতরিল আসামের দেশ,
শ্রমে জীর্ণ, শীর্ণ অনাহারে,
শুনিল সে কি বারতা ! সেই দিবাশেষে
ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলাবে তাহারে।

দিবাশেষে ফাঁসীকাষ্ঠে আনিল তাহারে,
উঠাইল মৃত্যু মঞ্চোপরি,
হেন কালে ও কে আসে জনতা মাঝারে
কেহ নারে রাখিবারে ধরি।

শিশু পৃষ্ঠে নারী এক উন্মাদিনী প্রায়
রুক্ষকেশী বিশীর্ণ বদন,
বিপুল জনতা ঠেলি সেই দিকে ধায়,
থাম, থাম, না শোনে বারণ।

ওরি নারী, ছেড়ে দেও শেষ দেখা তরে,
এ আদেশে তাহারে ছাড়িল ;
রমণী ধাবিত হয়ে হাহাকার করে
প্রণয়ীর বুকেতে পড়িল।

বাহুপাশে বাঁধি কণ্ঠ কতই চুম্বন
করিল যে না হয় গণনা ;
হায়রে সে প্রেম দৃশ্য করি দরশন
অশ্রুজল ফেলে সর্ব্ব জনা।

ছেড়ে দেও, ছেড়ে দেও, বলি আলিঙ্গন
খসাইয়া ফাঁসিতে চড়ায় ;
তখনই সে অভাগিনী হারায়ে চেতন,
ছিন্ন লতা পড়িল ধরায়।

যখন চেতনা হল নাহি বুদ্ধি জ্ঞান,
উন্মাদিনী নন্দিনী এবার,
জঙ্গলে জঙ্গলে ফেরে করিয়া সন্ধান
প্রাণপতি বিদেশে আমার।

শিশুটী মরিয়া গেল, ছাড়ে না তাহারে,
মৃত শিশু বুকে জড়াইয়া
পতির উদ্দেশে ফিরে বনের মাঝারে
নাম ধরে ডাকিয়া ডাকিয়া।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

—০—

ছোট বৌ।

পাঁচটীর ঘরে একটী নতুন মানুষ এলে একটু তার নতুন নতুন ঠেকে। তার পর আবার পাঁচ রকম দেখে, পাঁচ জনের সঙ্গে মিশে সয়ে যায়। এই কথা ছোট বৌকে ঠান্‌দিদি বোঝান। ছোট বৌর মনে হয় যে এই শ্বশুর বাড়ীতে ঠান্‌দিদিই যেন তার একটু আপনার লোক, আর যেন কেউ আপনার নেই। শ্বাশুড়ীর ছোট বৌটীর উপর বেশী টান হবার কথা, কিন্তু তিনি বড়, মেজ, সেজ, ন বৌদের যেমন করেন ছোটটীকে তেমন করেন না। ছোট বৌর তাই মনে হয়, কিন্তু আর আর বৌরা বলে যে শ্বাশুড়ী ভিতরে ভিতরে বৌকাঁট্‌কী, কোন বৌকে বড় আপনার মত করেন না। মেয়েদের উপর যতখানি টান বৌদের উপর ততটা নয়। এ দিকে ঝিকে মেরে যে বৌকে শিক্ষা দেওয়া গৃহিণীর তাও নেই। মার্‌বার সময় বৌদের উপরই পড়ে। সত্য কি আর হাত তোলেন, তবে মুখনাড়াটা আসৃটা বৌদের অদৃষ্টেই ঘটে। ছোট বৌ মনে করে তার ভাগেই বেশী। ঠান্‌দিদির মুখে মন্দ কথা নেই, যখন পারেন ছোট বৌকে আপনার কাজে ডেকে নিয়ে দুটা মিষ্ট কথা বলেন, তাই ছোট বৌ তাঁকে আপনার মনে করে।

ছোট বৌ যে সত্য খুব ছোট তা নয়। খুব ছোট বয়সে তার বিয়ে হয় নি, আর বিয়ে হতেই সে শ্বশুর ঘর কর্‌তে আসে নি। বিয়ের পর বছর দুই বাপের বাড়ী ছিল। তার বরের সেইখানে নিমন্ত্রণ হত, সেইখানে দুজনের ভাব হয়। শ্বশুর বাড়ীও ছোট বৌয়ের প্রায় এক বছর হল। বয়স এখন সতের বৎসর, নাম কুসুমকুমারী। স্বামীর নাম চন্দ্রনাথ। চন্দ্রনাথ বাড়ীর ছোট ছেলে, স্বভাব বড় লাজুক, পড়াশুনা বেশ করে। বাপের শাসন, মার শাসন, ভাইদের শাসন, মাথা চাড়া দিবার তার বড় ক্ষমতা ছিল না। দিনের বেলা বাড়ীর ভিতর গেলে স্ত্রী তাহার সম্মুখে বাহির হইত না, দৈবাৎ দেখা হইলে সেও লজ্জায় কথা কহিত না। রাত্রে যা কিছু কথাবার্ত্তা হইত সেও চুপি চুপি, ভয় পাছে কেহ আড়ি পাতিয়া শোনে। এইরূপে ভয় লজ্জায় দুইজনের ভালবাসা তেমন ফুটিয়া বাহির হইতে পারিত না, কিছু সঙ্কীর্ণ ছিল। কিন্তু সেই কারণে বড় গভীর, অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত তলায় তলায় বহিত। ছোট বৌ সকল কথা স্বামীর কাছেও খুলিয়া বলিত না। সে জানিত যে তাহার স্বামীর কোন ক্ষমতা নাই, কোনরূপ স্বাধীনতা নাই। এইজন্য সে আপনার ছোট ছোট দুঃখগুলি নিজে বহন করিত, তাহার অংশ স্বামীকে দিয়া স্বামীর হৃদয় ভারাক্রান্ত করিত না। স্বামীর কাছে কেবল শান্তি ও সান্ত্বনা, রাত্রে প্রদীপের আলোকে দুইজনে পরস্পরের মুখ দেখিয়া অগাধ তৃপ্তিলাভ করিত।

চন্দ্রনাথ আইনের পড়া পড়িত। ভাইয়েরা কেহ কেরাণীগিরি করিত, কেহ বাড়ী বসিয়া মুরুব্বিগিরি করিত। তাহারা সকলে মিলিয়া সময়ে সময়ে চন্দ্রনাথকে বলিত, "তুই আইন পড়ে কি কোর্‌বি ? তুই যে মুখচোরা, কখন উকীল হতে পার্‌বি নে। জজ সাহেবের মুখ দেখেই মুখ শুকিয়ে যাবে।"

চন্দ্রনাথ নিরুৎসাহিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিত, "তবে কি কোর্‌ব, মেজ দাদা ?"

মেজ দাদা মুরুব্বি, ওকালতী কি কেরাণীগিরি, কোন ঝঞ্ঝাট নাই। বলিতেন, "তুই ত বি. এ., পাশ কোরেছিস্ মন্দ নয়, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের এক্‌জামিন দে না। তা না পারিস্ ত ইণ্ডিয়া গবর্মেণ্টের কেরাণীগিরির এক্‌জামিন দে। ওকালতী টোকালতী তোর কিছু হবে না।"

ক্ষীণ প্রতিবাদের স্বরে চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিত, "চাকরীর চেয়ে ওকালতী ভাল নয় কি ?"

"তুই যে একেবারে স্বাধীন হবি দেখ্‌চি। তা তোর সে সব কিছু হবে না, তোর তেমন স্বভাব নয়।"

এরূপ সিদ্ধান্তের পর চন্দ্রনাথ কাজেই নিরুত্তর হইত।

ওদিকে ছোট বৌ নানা লোকের কাছে নানা কথা শুনিত। যাহার যে কাজ সে তাহাকেই ফরমায়েশ করিত, এদিকে তাহার কাজ কাহারও পসন্দ হইত না। যদি পান হইতে চূণ খসিল, অসাবধানতায় কাহারও দুধের বাটী পড়িয়া গেল অমনি যাহার ইচ্ছা সে বলিয়া উঠিত, "এ আর কারুর কাজ নয়, ছোট বৌর কাজ।" তা সে কাজ ছোট বৌর হউক আর না হউক। ননদেরা অন্য বউদের উপর বড় একটা হুকুম খাটাইতে পারিত না, আর গৃহিণী স্বয়ং সব সময় তাহাদের সঙ্গে বড় একটা আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। কিন্তু ছোট বৌ এখনও কতক নরম, কিম্বা হয় ত বিধাতা তাহাকে নরম করিয়াই গড়িয়াছিলেন। সেইজন্য তাহার উপর আর সকলেই গরম।

একদিন ছোট বৌ এক বাটী দুধ উপরে লইয়া যাইতেছিল। সিঁড়ী দিয়া একজন ননদ ঝড়ের মত নামিয়া আসিতেছে। ছোট বৌ সাবধান হইতে, পাশ কাটাইতে, ননদ তাহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল। গায়ে গা ঠেকিয়া ছোট বৌর হাতের বাটী হইতে দুধ ছল্‌কিয়া পড়িয়া গেল। তৎক্ষণাৎ গৃহিণীর কাছে সংবাদ গেল। গৃহিণী রাগিয়া বলিলেন, "ছোট বৌ মা, তোমার কি কোন যোগ্যতা নেই ? এক বাটী দুধ আন্‌তে পার না ? আর এই কল্‌কেতা সহরে দুধ বড় সস্তা না কি, যে ইচ্ছে হলেই ফেলে দেবে ?"

ছোট বৌ অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "আমি ত ইচ্ছে কোরে দুধ ফেলি নি মা। ছোট ঠাকুরঝি সিঁড়ী থেকে নাব্‌ছিল, না দেখতে পেয়ে হাতে হাত ঠেকে পড়ে গিয়েছে।"

এই কথা যেই বলা অমনি আর রক্ষা নাই। "যত দোষ আমার মেয়েদের, আর তুমি লক্ষ্মীঠাকরুণ আমার বাড়ীতে এয়েচ ! লক্ষ্মীছাড়ার মেয়ে না হলে এমন দশা হয় ? যেমন বাপ মা তেমনি মেয়ে হবে না ত কি ! আবার নিজে দোষ কোরে আমার মেয়েদের নামে লাগান ! আস্পর্দ্ধাও ত কম নয়।"

ছোট বৌ চক্ষের জলে কিছু দেখিতে পায় না। কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া আপনার ঘরে খিল দিল।

এ রকম সর্ব্বদাই হইত। অনেক রাত্রে সকলে ঘুমাইলে পর চন্দ্রনাথ স্ত্রীর মুখ দেখিয়া দেখিয়া বলিত, "বোধ

হয় তোমার মনে সুখ নেই। তুমি আমায় কোন কথা বল না কেন।”

ছোট বৌ হাসিয়া স্বামীর মুখে হাত দিত। বলিত, “কিসের আবার অসুখ? পাঁচজনের সঙ্গে ঘর কোর্‌তে গেলে পাঁচটা কথা হয়। তাতে আবার অসুখ কি? আর তুমি ত আমায় কিছু বল না, তা হলে বরং দুঃখ হত।”

চন্দ্রনাথ কুসুমকুমারীকে বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিত, “তুমি যে মুখে কথাটী না কয়ে সব সহ্য কোরে থাক তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পারি। চিরদিন এমন কোরে যাবে না। আমার যদি কোন যোগ্যতা থাকে তা হলে একদিন তুমি নিজের ঘরের গিন্নী হবে, পাঁচজনের কেন একজনেরও কথা শুন্‌তে হবে না।”

ছোট বৌ অগাধ ভালবাসার অটল বিশ্বাসের সহিত বলিত, “ও সব কথা তুমি ভেব না। তোমার কাছে থাক্‌লেই আমার সুখ। আর মেয়ে মানুষ একটু আধটু সহ্য না কোর্‌লে চল্‌বে কেন?”

তা, তাহাকে সহ্য করিতে হইত অনেক। বড় জাদের ছেলেদের দুধ খাওয়ান, স্নান করাইয়া দেওয়া, গা মুছাইয়া দেওয়া, চুল বাঁধিয়া দেওয়া সব করিত, তাহাতেও সকলের মন উঠিত না। কেহ একটু কিছু ত্রুটী পাইলে হয়! তাহা হইলে সে দিন ছোট বৌর কাঁদিয়াই অর্দ্ধেক দিন কাটিত। কেবল ঠান্‌দিদি তাহার হইয়া সময়ে সময়ে দুটা কথা বলিতেন, তাহার দিকে একটু টান করিতেন।

ছোট বৌ রাত্রে সকলে শয়ন করিতে গেলে নিজের ঘরে শয়ন করিতে যায়। আগে গেলে পাছে কেহ কিছু তাহাকে বলে এইজন্য তাহার বড় লজ্জা করে। সমস্ত দিনের অসুখ অশান্তি বহন করিয়া সে রাত্রে স্বামীর প্রীতি-পূর্ণ মুখ দেখিয়া সব ভুলিত। অভিযোগ অনুযোগ করা তাহার স্বভাব নয়, এইজন্য সে স্বামীর কাছে কাহারও বিরুদ্ধে কোন কথা বলিত না। এক রাত্রে ঠান্‌দিদির ঘর হইতে বাহির হইয়া সে আপনার শয়ন গৃহে যাইতেছে, দুয়ারের সম্মুখে গিয়াছে, এমন সময় সেজ বৌ আপনার ঘরের দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বলিলেন, “ছোট বৌ, একটা কথা শুনে যাও।”

ছোট বৌ অমনি ফিরিয়া তাঁহার কাছে গেল। বলিল, “কি বল্‌চ, সেজ দিদি?”

“আমার কাপড়খানা ছাদে শুকাচ্চে, পেড়ে নিয়ে এস ত। নতুন ঝী পোড়ারমুখী তুল্‌তে ভুলে গিয়েছে। সে বাড়ী চলে গিয়েছে, ঝীয়েরা কেউ রাত্রে থাকে না।”

ছোট বৌ বলিল, “কাল সকালে হলে হবে না?”

“আমি রাত থাকৃতে উঠে কাপড় ছাড়ি। আর সমস্ত রাত ছাদে পড়ে থাক্‌লে কাপড়খানা হিমে ভিজে যাবে।”

ছোট বৌ একটু ভাবিয়া বলিল, “তবে তুমি আমার সঙ্গে এস দিদি।”

“সর্ব্বরক্ষে! এত রাত্রে আমি ছাদে উঠ্‌তে পারব না। সে দিন মেজ ঠাকুরঝি ছাদে সাদা কাপড়পরা একটা মেয়ে মানুষ দেখেছিল। রাত্রি হলে আমার অমনি গা ছম্ ছম্ করে, কেউ না দাঁড়ালে আমি ঘর থেকে বেরুতে পারি নে। আমি ভাই তোমার সঙ্গে যেতে পার্‌ব না। তুমি না হয় তোমার ঘরের আলোটা নিয়ে যাও। আমার ঘরের আলো আমি দিতে পার্‌ব না।”

ভূতের ভয় যে সেজ বৌ ঠাকুরাণীর এক চেটিয়া তা নয়। ছোট বৌরও সে ভয় যথেষ্ট আছে। অন্য কোন কাজ হইলে সে কোন আপত্তি না করিয়া তখনই যাইত, কিন্তু এত রাত্রে ছাদে একা যাইতে কোনমতে তাহার সাহস হইতেছিল না। বিশেষ সাদা কাপড়পরা মেয়ে মানুষের কথা সেও শুনিয়াছিল। অগত্যা বলিল, “আমারও বড় ভয় করে ভাই। এত রাত্রে ছাদে একলা কেমন কোরে যাব?”

“কেন, তোমার আবার এত ভয় কিসের? সেখানে ত আর বাঘ ভাল্লুক বসে নেই!”

এমন সময় চন্দ্রনাথ ঘরের বাহিরে আসিয়া বলিল, “সেজ বৌ, তোমাদের দুজনের সমান ভরসা। আমি ছাদ থেকে তোমার কাপড় এনে দেব?”

তাহাকে দেখিয়া এক গলা ঘোমটা দিয়া ছোট বৌ এক পাশে দাঁড়াইল। সেজ বৌ মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া বলিল, “ছোট্ ঠাকুরপোর যে এখনো ঘুম নেই! তা বৌ কাছে না এলে ঘুম হবেই বা কেমন কোরে? তা তুমি তাড়াতাড়ি ছুটে এসেচ কেন, তোমার বৌকে ত আর আমি বাঘের মুখে দি নি।”

চন্দ্রনাথ বলিল, “সে কথা ত নয়। আমি না গেলে তোমার কাপড় আস্‌বে না।”

“কেন, তোমার বৌকে তুমি যেতে দেবে না?”

“তোমার যেমন ভয় করে ওরও সেই রকম ভয়। আমি এখনি এনে দিচ্চি।”

“না, না, তোমার আর অত উপকার কোর্‌তে হবে না। তোমাদের ঘেন্না পিত্তি নেই, এড়া কাপড়, আমার কাচা কাপড় ছুঁতে হবে না।”

“আচ্ছা, তবে ছোট বৌ এনে দিক্, আমি দাঁড়াচ্চি।”

সেজ বৌ আবার মুখে কাপড় দিয়া হাসি চাপিল, বলিল, “সেই বেশ কথা, কিন্তু দেখো যেন কাপড় আন্‌বার সময় ছোট বৌকে ছুঁয়ে ফেল না।”

ছোট বৌ প্রথমে স্বামীর সঙ্গে যাইতে চায় না, অনেক পীড়াপীড়ির পর গেল। ছাদে উঠিয়া হাসিয়া স্বামীকে বলিল, “তোমার আবার সাত তাড়াতাড়ি উঠে আসা কেন? আমি না হয় একা আস্‌তেম। কাল সব আমায় ঠাট্টা কর্‌বে।”

চন্দ্রনাথ বুঝিল ঠাট্টার চেয়ে কিছু গুরুতর হইবে।

থাকিতে থাকিতে ছোট বৌ কতকটা ভাঙ্গা কুলার মত হইল। যাহার যা ছাই ফেলিবার থাকিত সেটা তার উপর দিয়াই যাইত। কিন্তু সে ছাই তাহার নির্ম্মল অঙ্গে লাগিত না।

চন্দ্রনাথ আইনের পরীক্ষা বিশেষ প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইল। মুরুব্বি এবং কেরাণী অগ্রজেরা বলিলেন, “ও যে ভাল পাস হবে, সে ত জানা কথা। কিন্তু ওকালতী করা ওর কর্ম্ম নয়।”

পাস হইয়া চন্দ্রনাথ স্থির করিল দূরে একটা জেলায় গিয়া ওকালতী করিবে। কলেজে যে জলপানী পাইয়াছিল তাহার তিন শো টাকা জমা করিয়াছিল। আরও কিছু টাকার আবশ্যক। চন্দ্রনাথ মনে করিয়াছিল পিতার নিকট কিছু না চাহিয়া যদি চলে ত ভাল হয়। রাত্রে সে ছোট বৌর সহিত পরামর্শ করিল।

ছোট বৌ বলিল, “সেই কথা ত ঠিক। তুমি বাবার কাছে কেন টাকা চাইবে? তোমার যে টাকা আছে আর আমার যে গহনা আছে তা বেচে তোমার এক বছর বেশ চল্‌বে। আর যেই যা বলুক আমি জানি যে তোমার শীঘ্র রোজগার হবে।”

চন্দ্রনাথ বলিল, “তোমার গহনা বেচ্‌তে হবে না, কিছু দিন বাঁধা রাখ্‌লেই বোধ হয় হবে।”

“তা তোমার যেমন ভাল বোধ হয় তাই কোরো,” বলিয়া ছোট বৌ গহনা বাহির করিতে উঠিল।

চন্দ্রনাথ তাহাকে হাত ধরিয়া নিবারণ করিল। বলিল, “এই রাত্রেই ত আর চাইনে। যখন দরকার হবে তখন চেয়ে নেব।”

ছোট বৌর গহনা লইয়া চন্দ্রনাথ হাজার টাকায় বাঁধা রাখিল। তের শো টাকা হাতে করিয়া সে কর্ম্মক্ষেত্রে যাইবার উদ্যোগ করিল।

যাইবার পূর্ব্ব রাত্রে ছোট বৌর কাছে বিদায় লইতে হইল, কারণ যাইবার দিন তাহার সঙ্গে বেশী কথা কহিবার ত অবকাশ হইবে না! ছোট বৌর ছল ছল চক্ষু, কিন্তু সে স্বামীকে এক মুহূর্ত্তের জন্য নিরুৎসাহিত করে নাই। চন্দ্রনাথ দুই হাতের ভিতর তাহার মুখখানি ধরিয়া বলিল, “তোমায় ফেলে যাচ্চি এই আমার দুঃখ। এ বাড়ীতে তোমায় ত কেউ আপনার মত করে না। যত দিন না তোমাকে আমি নিয়ে যাব তত দিন তোমার কষ্ট হবে।”

ছোট বৌ পতিকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, তাহার বুকে মুখ রাখিয়া কহিল, “তোমাকে না দেখে যে কষ্ট তা ছাড়া আর আমার কষ্ট কি? বাড়ীতে আমার চেয়ে সকলে বড়, আর সকলের সমান আমি হব কেমন কোরে? তুমি সেখানে গিয়ে আমার জন্য ভেব না; তা হলে ভাল কোরে কাজকর্ম্ম কোর্‌তে পারবে না। আমার এখানে কোন কষ্ট হবে না।”

চন্দ্রনাথ বক্ষঃস্থিত মুখ তুলিয়া সেই মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “তোমার জন্য ভাব্‌ব না? ভাব্‌ব বলেই আরও বেশী কোরে কাজ কোর্‌ব—যদি কাজ পাই।”

যখন চন্দ্রনাথ দূর বিদেশে চলিয়া গেল ছোট বৌর সঙ্গে একবার অমনি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখা করিয়া গেল। সংক্ষেপে বিদায়ের দুই টা কথা—ছোট বৌ তাও পারিল না—চক্ষের জল সম্বরণ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বুক ফাটিয়া, চোক ফাটিয়া অশ্রু বাহির হইল। সেই অশ্রুসিক্ত নয়ন চুম্বন করিয়া চন্দ্রনাথ চলিয়া গেল।

চন্দ্রনাথ যাইবার পনর দিন পরে এক দিন গৃহিণী

কোন আত্মীয়ের বাড়ী যাইবেন। সঙ্গে অবিবাহিতা ছোট কন্যা যাইবে। তাহাকে সাজাইবার জন্য গহনার প্রয়োজন। ছোট বৌর ডাক পড়িল। গৃহিণী বলিলেন, "ছোট বৌ মা, তোমার গহনাগুলি দাও ত, ফুলিকে পরিয়ে নিয়ে যাব।" কন্যার নাম ফুলকুমারী।

ছোট বৌর মুখ ম্লান হইয়া গেল। বলিল, "গহনা ত আমার কাছে নেই।"

"সে কি কথা? তুমি বাপের বাড়ী থেকে আস্‌বার সময় ত গহনা নিয়ে এসেছিলে।"

"গহনা উনি নিয়েচেন।"

"তুমি রইলে এখানে আর চন্দ্র তোমার গহনা বিদেশে নিয়ে গেল। এ কি রকম আক্কেল!"

"তিনি নিয়ে যান নি। কিছু টাকার দরকার ছিল তাই বাঁধা দিয়ে নিয়েচেন।"

"বৌয়ের গহনা বাঁধা রেখে টাকা! এমন বুদ্ধি তার হল কবে? আর দুজনে পরামর্শ কোরে এই কাজ করা হয়েচে, আমরা এর বাষ্পবিন্দু ও জানি নে।"

এই কথা লইয়া তুমুল কাণ্ড বাধিল। ছোট বৌর কাঁচা মাথা কাটা যাইতে যাইতে রহিল। চন্দ্রনাথের কাছে চিঠি গেল, সে এ কথার কোন উত্তর দিল না।

মাস খানেক পরে চন্দ্রনাথ পিতাকে চিঠি লিখিল। মর্ম্ম এই—"প্রথম মাসে ২০০৲ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছি। গহনা বন্ধক রাখিয়া যে টাকা আনিয়াছিলাম তাহার ৫০০৲ টাকা সেই টাকা হইতেই শোধ করিলাম। ১৫০৲ টাকা রেজেষ্টারি করিয়া আপনাকে পাঠাইতেছি। ৫০৲ টাকা নিজের ব্যয়ের জন্য রাখিলাম।"

কর্ত্তা আসিয়া গৃহিণীকে চিঠি পড়িয়া শুনাইলেন। ১৫০৲ টাকার নোট গৃহিণীর হাতে দিলেন। বলিলেন, "চন্দ্রই আমার ছেলের মত ছেলে হয়েচে। সে আমার মুখোজ্জ্বল কোর্‌বে।"

ছেলের উপার্জ্জিত টাকা হাতে করিয়া গৃহিণীর মন টলিল। ছোট বৌর প্রতি দৃষ্টি প্রসন্ন হইল।

চন্দ্রনাথের সহোদর কেরাণী ও মুরুব্বি মহলেও একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল। তাহারা বলিল, "নতুন জায়গা, তাই প্রথম মাসে কিছু পেয়েচে। এর পর আর কিছু হবে না।"

কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হইল। দ্বিতীয় মাসে ছোট বৌর গহনা বন্ধকমুক্ত হইয়া আবার ছোট বৌর হাতে আসিল। কর্ত্তার হাতে আরও দেড় শত টাকা আসিল। তাহা ছাড়া ছোট বৌর নামে কুড়ি টাকার মনি অর্ডার আসিল। চন্দ্রনাথের লজ্জা কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে সম্বন্ধে প্রকাশ্যে কেহ কোন কথা কহিল না। টাকা পাইয়া, অত্যন্ত লজ্জিতা হইয়া ছোট বৌ শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে দিতে গেল। তিনি বলিলেন, "না মা, ও টাকা তোমায় পাঠিয়েচে, তোমার কাছেই থাক্। তোমারও ত হাতখরচ আছে।

তিন চার মাস পরেই চন্দ্রনাথ মাতাকে পত্র লিখিল, ছোট বৌকে আনিতে শীঘ্র বাড়ী যাইব। যে চন্দ্রনাথ দিনের বেলা লজ্জায় স্ত্রীর সহিত দেখা করিত না সে এ রকম চিঠি লেখে! কিন্তু এ কথাও ছোট বৌর সাক্ষাতে কেহ তুলিল না।

চন্দ্রনাথ বাড়ী আসিয়া ছোট বৌকে লইয়া গেল। যাইবার সময় শ্বাশুড়ী ননদ জায়েরা সকলে ছোট বৌকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তখন সেই কোমল, সজলনয়ন, আনত আনন, বিমল রূপের ছবি দেখিয়া সকলেই গৃহলক্ষ্মীকে চিনিতে পারিল। শ্বাশুড়ী বলিলেন, "মা, তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী। আবার শীঘ্র ঘরে এস।"

জায়েরা বলিলেন, "ভাই, মনে কোরে আমাদের চিঠি দিও।"

কম্পিত অধরপল্লবে, অশ্রুপূর্ণলোচনে ছোট বৌ সকলের পদধূলি লইল। পদধূলি মস্তকে করিয়া চলিয়া গেল।

চন্দ্রনাথের ভ্রাতারা বলিলেন, "আমরা ত বরাবরই বলেছিলাম যে চন্দ্র একটা মানুষের মত মানুষ হবে! অমন ছেলে আজ কাল কয়টা হয়?"

বিদেশে কিছু দিন পরে ছোট বৌ সেজ বৌর পত্র পাইল। সেজ বৌ লিখিতেছেন, "ভাই, তুমি গিয়ে অবধি তোমার জন্য আমার বড় মন কেমন করে। এ বাড়ীতে আমি যেমন তোমায় ভালবাসি এমন আর কেউ বাসে না। শুনেচি তোমাদের দেশে না কি বড় চমৎকার লেপের ওয়াড় পাওয়া যায়। আমায় দু খানা শীঘ্র পাঠিয়ে দিও, আমার বড় দরকার।"

পত্র হস্তে ছোট বৌ স্বামীর কাছে গেল। বলিল, "সেজ দিদি দু খানা লেপের ওয়াড় চেয়েচেন, তাঁকে পাঠিয়ে দিতে হবে।"

"কই, চিঠি দেখি!"

হাসিয়া ছোট বৌ চিঠি হাতে দিল। চন্দ্রনাথ পড়িয়া বলিল, "ভালবাসাতে ত কোন সন্দেহই নেই। অত ভাল না বাস্‌লে রাত্রের বেলা ভূতের ভয় বলে নিজে ছাদে না উঠে তোমাকে পাঠাতে চাবেন কেন?"

ছোট বৌ একেবারে মুখ ফুটিয়া হাসিয়া উঠিল। "সেই কথা কি চিরকাল মনে কোরে রাখ্‌তে হবে না কি?

চন্দ্রনাথও সরল, উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিল, "মনে কোরে রাখ্‌ব না? মনে আছে বলেই সেজ বৌকে দুট লেপের ওয়াড় না পাঠিয়ে তিনটে পাঠাব!"

রস্কিন *

ললিতকলা এবং রচনা-শিল্প।

অনন্যসাধারণ প্রকৃতি বা দুর্লভ প্রতিভার প্রেরণায় যে সকল মহাজন জগতে কোন বিষয়ে নূতন পন্থা

রস্কিন্—যৌবনে।

প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন বা পুরাতনের জীর্ণ স্রোতে নূতন তরঙ্গ তুলিয়াছেন, তাঁহাদের ভিতর জন্ রস্কিন্ (John Ruskin) বিশেষ উল্লেখের যোগ্য। সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকেরা বলেন, বর্ত্তমান ইংরাজি সাহিত্যে দুই জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের প্রভাব পরিস্ফুট। জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল সাধারণ লেখকবর্গকে চিন্তা করিতে, যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করিতে শিখাইয়ছেন।—মেকলে তাহাদিগকে প্রাঞ্জল রচনা প্রণালীর সঙ্গে সঙ্গে সংযমহীন বাহ্য ছটাপূর্ণ ভাষার আচার্য্যগিরি করিতে শিখাইয়াছেন। সেইরূপ জন্ রস্কিন্ যে ইংরাজ সাধারণকে সৌন্দর্য্যের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন এবং ললিতকলার চর্চ্চায় নবজীবন আনিয়াছেন, তাহাতে মতভেদ নাই। জীবনের শত তর্ক ও পাকের ভিতর, সহস্র জটিলতা ও জঞ্জালের মধ্যে সৌন্দর্য্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—জীবনের অন্তরে বাহিরে সৌন্দর্য্য প্রয়োজনীয়—এ শিক্ষা আমরা রস্কিনের নিকট পাই। রস্কিন্ যে শুধু সৌন্দর্য্যের পুরোহিত তাহা নয়—তিনি ধর্ম্ম ও নীতির শিক্ষক, অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী গদ্যলেখক, এবং চরিত্রগৌরবে আদর্শ পুরুষ। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী যেমন শিক্ষাপ্রদ, তাঁহার জীবনও সেইরূপ শিক্ষাপ্রদ। তিনি একাধারে জ্ঞানবীর এবং কর্ম্মবীর। এবং ইহা

* জন্ম ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮১৯—মৃত্যু ২০শে জানুয়ারি ১৯০০।

আমাদের বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালা জাতির কম গৌরবের কথা নয় যে তাঁহার উদারতা এবং আন্তরিকতা—তাঁহার চরিত্র-মাহাত্ম্য পর্য্যালোচনা করিলে আমাদের অনেক সময়ই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে মনে পড়ে।

প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় চরিত্রবান্ ব্যক্তি-দিগের পিতামাতাও চরিত্রবান্। রস্কিন্ নিজে যেমন অসাধারণ প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁহার পিতা মাতারও প্রকৃতি, বিশেষতঃ তাঁহার মাতার প্রকৃতিও অসাধারণ ছিল। তাঁহাদের প্রভাব তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনকে অনেকটা গড়িয়াছিল। তাঁহার মাতা অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রাণ, সত্যনিষ্ঠ, এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতিও খুব সরল ছিল। তিনিই শৈশব ও কৈশোরে রস্কিনের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। তাঁহার শিক্ষা দিবার পদ্ধতি সহজ ও যুক্তিযুক্ত। ফাঁকি না দিয়া সহজ অথচ প্রকৃত চেষ্টায় যাহা শিশু-ক্ষমতার আয়ত্তাধীন তাহার অতিরিক্ত পাঠ তিনি কখনও দিতেন না। কিন্তু কড়ায় গণ্ডায়, অক্ষরে অক্ষরে, তাহার হিসাব লইতেন। যতক্ষণ তাহার ভিতর সামান্য ত্রুটি থাকিত কিছুতেই ছাড়িতেন না। একবার রস্কিন্ একটী ক্ষুদ্র কথা তাঁহার মাতার অনুরূপ হ্রস্বমাত্রায় উচ্চারণ করিতে অসমর্থ হইলে, তিনি তিন সপ্তাহ ধরিয়া চেষ্টা করাইয়া অভিলষিত ফল লাভ করিয়াছিলেন। এদিকে কিন্তু পাঠ ও পাঠনার সময় যাহাতে কোন রূপ বিঘ্ন না ঘটে সে বিষয়ে সতর্ক ও দৃঢ়সঙ্কল্প থাকিতেন। নিতান্ত প্রয়োজন পড়িলেও বাড়ীর ভৃত্যবর্গ পর্য্যন্ত কাছে আসিতে পারিত না, এবং পরিচিত অপরিচিত যে কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, হয় তাঁহাদের পাঠে যোগ দিতে হইত, না হয় পাঠ সমাপন পর্য্যন্ত অন্যত্র অপেক্ষা করিতে হইত। বৎসরে অন্ততঃ একবার রস্কিন্‌কে বাইবেল গ্রন্থখানি আমূল পড়িয়া শেষ করিতে হইত এবং তাহার দীর্ঘ দীর্ঘ অধ্যায়গুলি কণ্ঠস্থ করিতে হইত। যদি তাহার মধ্যে দীর্ঘ বা দুরুচ্চার্য্য কোন নাম থাকিত, থাকিলই বা, তাহাতেত উচ্চারণ শিখিবার এবং শিখাইবারই সুবিধা হইত। যদি অধ্যায় বিশেষ নিতান্ত রসহীন বোধ হইত, হইলই বা, তাহাতে ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায় অভ্যাস করিবারই সুযোগ ঘটিত। যদি কোন ঘৃণ্য বা রুচিবিরুদ্ধ কথা থাকিত, থাকিলই বা, সে কথা যে স্পষ্টাক্ষরে ও অসঙ্কোচে বলিবার আবশ্যক হইয়াছিল এ বিশ্বাস অর্জ্জন করিবার অবসর ঘুটিত। চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মাতার নিকট রস্কিন নিয়মিত রূপে প্রতি দিন বাইবেল পাঠ করিয়াছিলেন।

মাতৃঅঙ্কে এইরূপ বাইবেল অধ্যয়নে তিনি যে বিস্তর শুভফল পাইয়াছিলেন তাঁহার অভ্যস্ত বাক্‌পটুতার সহিত রস্কিন্ নিজেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। শুধু যে ইহার দ্বারা তাঁহার ধর্ম্মজীবন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছিল তাহা নয়, তাঁহার চিন্তাশক্তি উদ্বোধিত নিয়ন্ত্রিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল, এবং তাঁহার অপূর্ব্ব রচনা শক্তিও বিশেষ আনুকূল্য পাইয়াছিল। মাতা শিশু-পুত্রের জন্য কি সুন্দর পাঠ্যই নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন—হোমারের কাব্য (ইংরাজি অনুবাদ), স্কটের উপন্যাস, রবিন্‌সন্ ক্রুসো, পিলগ্রিম্‌স্ প্রগ্রেস্। সরস্বতীর মন্দিরে যাইবার কি উজ্জ্বল, কি মধুর, কি হৃদয়গ্রাহী পথ! প্রলুব্ধ শিশু-হৃদয় কি অব্যর্থ ও স্বাভাবিক আকর্ষণে এই কল্পনা-কুসুমিত পথে অগ্রসর হয়! হায় বঙ্গ শিশু!

ইহা অপেক্ষাও মনোহর এবং চরিত্র গঠনে পটু ছিল তাঁহার অপরাপর শিক্ষা। অনেকেই শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, রস্কিনের মাতা নিজে কখন তাঁহাকে কোন খেলনা দেন নাই এবং অপর কাহাকেও এমন অবৈধ ও অস্বাভাবিক কার্য্য করিতে প্রশ্রয় দিতেন না। একবার তাঁহার মাসী রস্কিনের জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁহাকে এক জোড়া খুব জমকাল পুতুল যৌতুক দিয়াছিলেন। মাতা এই প্রীতিদানে বাধা দিতে পারেন নাই, কিন্তু পরদিনই পুত্রের নিকট হইতে উহা কাড়িয়া লইয়াছিলেন। তাহার পর রস্কিন্ সে পুতুল দ্বিতীয় বার দেখেন নাই। রস্কিনের মা বলিতেন শিশু নিজের খেলা নিজেই ঠিক করিয়া লইবে।

এদিকে তাঁহার কোন সমবয়স্ক মানব-সঙ্গী ছিল না, পালিত পশু পক্ষীও ছিল না। সুতরাং গৃহমধ্যে যাহা পাইতেন এবং বাহ্য প্রকৃতির যাহা কিছুতে তাঁহার মন আকৃষ্ট হইত তাহা লইয়াই তিনি খেলা করিতেন। গৃহের ভিতর গালিচার বিবিধ বর্ণ ও শিল্প শোভা, বিছানার চাদরের বিভিন্ন চিত্র ও কারুকার্য্য নিরীক্ষণ, সম্মুখবর্ত্তী বাটীর বহিঃপ্রাচীরের ইষ্টক শ্রেণী গণনা, ইহা লইয়াই তিনি

অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। বাড়ীর চারিদিকে প্রশস্ত সুন্দর উদ্যান ছিল, সেখানে রস্কিন্ বড় আনন্দ পাইতেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন ইডন্ কাননের সহিত এই উদ্যানের সকল বিষয়েই সাদৃশ্য ছিল। কেবল ইহার একটি বৃক্ষের নয় সমস্ত বৃক্ষেরই ফল নিষিদ্ধ ছিল, এবং ইহার ভিতর কোন মানবসঙ্গপ্রিয় পশু বা পক্ষী ছিল না। কল্পনা-চিত্রে আমরা বেশ দেখিতে পাই, শিশু একেলা সেই উদ্যান মধ্যে বসিয়া তদ্গত-চিত্তে, কখন নীল আকাশ—কখন বিবিধবর্ণ-বিচিত্র মেঘ শ্রেণী—কখন বায়ু-মুখর-পত্র-রাজির মধ্যে আলোকের চঞ্চল ক্রীড়া—কখন অদূরবর্ত্তী নদী-বক্ষের লহরী লীলা দেখিতেছে—কখন বা শূন্য-দৃষ্টে স্বপ্নরাজ্যের ব্রজবনে কামধেনু লইয়া বিচরণ করিতেছে। এই রূপে শিশু-জীবনেই তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি ও কল্পনা-শক্তি অনুকূল অবস্থায় পরিপুষ্ট হইয়াছিল।

উপরের লিখিত বর্ণনা পাঠে পাঠক সহসা মনে করিতে পারেন যে রস্কিনের মাতার হৃদয় বড় একটা স্নেহশীল ছিল না, পাঠক যদি আরও অবগত হন যে, তিনি শিশু পুত্রকে কেবল খেলেনা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না—তাঁহাকে বাল্যপ্রিয় মিষ্টান্ন হইতেও একেবারে বঞ্চিত রাখিয়াছিলেন (কেবল একবার মাত্র তিনটি শুষ্ক দ্রাক্ষাফল দিয়াছিলেন)—এদিকে আবার বেত্র-ব্যবস্থার ত্রুটি ছিল না—আবদারে বেত্র—ক্রন্দনে বেত্র—অনবধানতাবশতঃ পতনে বেত্র—এই সকল জানিলে পাঠক না জানি বাঙ্গালী মাতার তুলনায় রস্কিনের জননীকে কি ভাবিবেন। এক বিষয়ে কিন্তু কোমল-হৃদয়া বাঙ্গালী মাতার স্নেহ-দৌর্ব্বল্য তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিল—তিনি তাঁহার পুত্রকে কোন বিপদের সান্নিধ্যে যাইতে দিতেন না। জলাশয় মাত্রের ধারে যাইবার কঠোর নিষেধ ছিল, এবং পাঠক শুনিয়া বিস্মিত হইবেন ইংরাজী মাতার শাসনে তাঁহাকে সত্য সত্যই শত হস্তেন বাজিনঃ এই নিরাপদ বিধান মানিয়া চলিতে হইয়াছিল। বস্তুতঃ রস্কিনের মাতার সন্তান-স্নেহের অভাব ছিল না—একটী ঘটনাতেই তাহা বেশ প্রতীয়মান। রস্কিন যখন অক্সফোর্ডে (Oxford) পড়িতে যান, পাছে তাঁহার সুখস্বচ্ছন্দতার ত্রুটি হয় এই ভয়ে তাঁহার মাতা গৃহ ছাড়িয়া নিকটবর্ত্তী পল্লীতে বাসা ল'ন।

যে স্নেহ আপনাকে সহজে সদ্য চরিতার্থ করিবার প্রণোদনে স্নেহ পাত্রকে অহোরাত্র লেহন করিতে থাকে—সুদূর পরিণাম দর্শন যে স্নেহের অতীত—দুর্ব্বল-হৃদয়ের সে স্নেহ তাঁহার ছিল না। তাঁহার স্নেহ জ্ঞান-মিশ্র, সংযত, পরিণামদর্শী। সত্য বটে এই নিয়ন্ত্রিত স্নেহ স্নেহপাত্রের হৃদয়ে সহসা প্রতিধ্বনি তুলিতে পারে না—তাহাকে স্নেহ করিতে শিখাইতে পারে না। রস্কিনেরও তাহাই ঘটিয়াছিল। তিনি নিজেই বলিয়াছেন "শৈশবে ভালবাসিতে শিখি নাই—ভালবাসার পাত্রও পাই নাই।" পিতা মাতাকে তিনি নৈসর্গিক শক্তিপুঞ্জের ন্যায় দেখিতেন—যেমন চন্দ্র সূর্য্য। তাঁহাদের বিরহে অবশ্য কাতর হইতেন। কিন্তু শৈশবে তাঁহাদের প্রতি স্নেহাকর্ষণ অনুভব করেন নাই। কোমল শৈশবে স্নেহ-দীক্ষার এই অভাবে তিনি অপর হৃদয়ের স্নেহ-পিপাসা বুঝিতে পারিতেন না। এমন কি যখন কার্লাইল (Carlyle)—যে কার্লাইলকে অনেকেই মানব-দ্বেষী বলিয়াই জানে—এবং যাঁহাকে রস্কিন নিজ গুরু-পদে বরণ করিয়াছিলেন—যখন কার্লাইল বলিয়াছিলেন, যতক্ষণ আমি এমন ভাবিতে না পারি যে আমার বিষয়ে অপর কেহ ভাবিতেছে—আমাকে অপর কেহ ভালবাসিতেছে—ততক্ষণ পৃথিবীকে মরু বলিয়াই বোধ হয়, লোক-নিবাস উদ্যান বলিয়া মনে হয় না। রস্কিন্ এই স্নেহগর্ভ উক্তির মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া উহার সমালোচনাকল্পে বলেন—"আমার যেরূপ শিক্ষা—তাহাতে আমার হৃদয়ে ঠিক বিপরীত-ভাবই উদয় হয়। আমার প্রকৃত সুখ সেই মুহূর্ত্তে যখন আমার জন্য কেহ ভাবিতেছে না। পিপীলিকা বা প্রজাপতি—আমার বিষয় ভাবিতেছে না জানিয়া আমার সেই বাস্ত-লগ্ন উদ্যান মরু বলিয়া ত বোধ হয় নাই; বরং আমার সান্ধ্যবিহারের সুখ আমি পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিতে পারিতাম না, এই ভাবনায় যে পিতা মাতা আমার জন্য ভাবিতেছেন এবং গৃহে ফিরিতে বিলম্ব হইলে চিন্তিত হইবেন। আমাকে স্নেহ প্রীতি করে এমন লোকের অভাবে পৃথিবীকে শূন্য মনে করা সুস্থ-হৃদয়ের পরিচয় নয়।"

আমরা এ প্রবন্ধে বিস্তারিত বা ধারাবাহিকরূপে রস্কিনের জীবন বৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হই নাই। তাঁহার মৃত্যুউপলক্ষে তাঁহার জীবন ও জীবনের কার্য্য সংক্ষেপে

আলোচনা করিবার ইচ্ছা করিতেছি। তাঁহার শৈশব জীবন একটু বিস্তৃতভাবে লিখিবার কারণ এই সে যে, জীবন সাধারণ শিশুজীবন হইতে অনেক পরিমাণে পৃথক্ ছিল। শিশুর উপর সাধারণতঃ পিতামাতার এবং গৃহের প্রভাবই বলবত্তর। রস্কিনের সম্বন্ধেও তাহাই হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার পিতামাতার প্রকৃতি সাধারণ প্রকৃতি হইতে খুবই স্বতন্ত্র ছিল—তাঁহাদের রচিত গৃহস্থালিও স্বতন্ত্র হইয়াছিল। সেই জন্য তাঁহাদের প্রভাবও স্বতন্ত্র। গৃহ সম্বন্ধে রস্কিন্ কি বলেন শুনুন :—

"আমি গৃহে কখন অশান্তি বা কলহ দেখি নাই—পিতামাতাকে কখন পরস্পরের প্রতি বিরক্তি-রুক্ষ ভাষা বা রোষদীপ্ত কটাক্ষ প্রয়োগ করিতে দেখি নাই। কোন ভৃত্যকে কখন কঠোর ভাবে ভৎর্সিত হইতে শুনি নাই। সংসারে কখন ভয় ভাবনার অন্ধকার বা তাড়াতাড়ির বিশৃঙ্খলা দেখি নাই। সর্ব্বত্রই শান্তি এবং সংযম। আমারা পিতামাতার উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল—কারণ এমন কোন কিছুই আমাকে অঙ্গীকৃত হইত না যাহা আমি পাইতাম না; এমন কোন শাসনের ভয় আমাকে প্রদর্শিত হইত না যাহা প্রযুক্ত হইত না, এমন কোন কথা বলা হইত না—যাহা বাস্তব নয়। সুতরাং আমি তাঁহাদের আদেশ ও বিধান, আমার জীবনের পক্ষে প্রকৃতির নিয়মের ন্যায় হিতকর ও অবশ্য প্রয়োজনীয় বোধে পালন করিতাম"। আমাদের মধ্যে কয় জন এই-রূপ—বা ইহার শতাংশের এক অংশ বলিতে পারেন?

শৈশবে রস্কিন আর একটী অতি সুন্দর এবং অপরের পক্ষে দুর্লভ শিক্ষা পাইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার বিস্তৃত সুরা ব্যবসায় ছিল। ব্যবসা উপলক্ষ্যে তাঁহাকে বৎসরে একবার ইংলণ্ড এবং স্কটলণ্ডের নানা স্থান পর্য্যটন করিতে হইত। এই পর্য্যটনে তিনি স্ত্রী ও পুত্রকে সঙ্গে লইতেন। ভ্রমণ-উপভোগের কালত ছিল সেই। তখন রেলপথ ছিল না। শিশু রস্কিন্ ঘোটক যানের উপরিভাগে একটী ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসনে বসিয়া কৌতূহল বিস্ফারিত নেত্রে চারিদিক দেখিতে দেখিতে যাইতেন। এইরূপে তিনি ইংলণ্ড এবং স্কটলণ্ডের অনেক পথ ঘাট দেখিয়াছিলেন এবং গ্রাম্য কুটীর হইতে বিশাল উন্নত রাজ-প্রাসাদ সকলের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বিখ্যাত কোন প্রাচীন অট্টালিকা দেখিলে তাঁহারা ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহার আভ্যন্তরীণ শোভা ও পূর্ব্বতন ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিতেন। এবং কোন গৃহে সুন্দর চিত্রাবলী থাকিলে তাহাও দেখিতে যাইতেন। যে শিশু ভবিষ্যতে অমৃতময়ী ভাষায় চিত্রবিদ্যা ও স্থাপত্য সৌন্দর্য্যের গুণকীর্ত্তনে জীবন অতিবাহিত করিবেন তাহার পক্ষে এ শিক্ষা অমূল্য।

কলাচর্চ্চায় রস্কিনের পিতা তাঁহার বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি সুশিক্ষিত, কাব্যরসজ্ঞ, এবং কলা-কুশলী ছিলেন। অনেক প্রথিতনামা সাহিত্যসেবক ও চিত্রকরের সঙ্গে তাঁহার আলাপ ছিল। তিনি কাব্য-গ্রন্থাদি অতি সুন্দর পড়িতে পারিতেন, এবং পুত্রকে পড়িয়া শুনাইতেন। চিত্রবিদ্যায় তিনি একজন অভিজ্ঞ সমজদার ছিলেন, এবং নিজেও কিছু কিছু আঁকিতে পারিতেন। টেল্‌ফোর্ড (Telford) নামে তাঁহার একজন অংশীদার, রস্কিনের জন্মোৎসবে প্রসিদ্ধ চিত্রকর টার্ণারের (Turner) দ্বারা চিত্রিত কবি রজর্স (Rogers) রচিত "ইটালী" নামক কাব্য-গ্রন্থ রস্কিনকে উপহার দেন। পুস্তকের মধ্যে সেই সকল চিত্র দেখিয়া রস্কিনের সম্মুখে যেন এক নূতনজগৎ খুলিয়া গেল। তিনি টার্ণারের অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাইলেন, এবং তাঁহার একজন উপাসক হইয়া পড়িলেন।

আর একখানি পুস্তক পাইয়া তাঁহার জীবনের যুগান্তর উপস্থিত হয়। সে পুস্তকের নাম Prout's Sketches in Flanders and Italy. ঐ গ্রন্থের ছবি দর্শনে পিতা পুত্রের উৎকট আনন্দ দেখিয়া মুগ্ধ মাতা প্রস্তাব করিলেন, স্থানগুলি দেখিলে হয় না? পিতা কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া আনন্দ-প্রদীপ্ত নয়নে বলিলেন, কেনই না দেখিব? অমনি দিন কয়েকের মধ্যে সব প্রস্তুত হইল। দাস দাসী সমভিব্যাহারে পিতা মাতা ও পুত্র ইউরোপ ভ্রমণে বাহির হইলেন। সে মুগ্ধ ভ্রমণের সুখ এবং তীব্র উপভোগ বর্ণনার অতীত হইয়া পড়ে—তাহার মাধুর্য্য অনুভবের বিষয়। স্বদেশ-ভ্রমণ-কালের ন্যায় রস্কিন এখন আর শিশু নয়। এখন তাঁহার রসাস্বাদন শক্তি বাড়িয়াছে। কলা-সৌন্দর্য্যে চক্ষু ফুটিয়াছে এবং প্রতিভার নিত্য নবোন্মেষে হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব উৎসাহ, নববল, এবং অমর আশা সঞ্চারিত হইয়াছে।

এদিকে ভ্রমণের সুখ স্বচ্ছন্দতার পক্ষে পিতামাতার অবিশ্রান্ত চেষ্টা ও প্রভূত আয়োজন। রেলের তাড়া নাই—লগ্নভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই। পূর্ব্ব হইতেই পথে পথে বাসা নির্দ্ধারিত। উপস্থিত হইবামাত্র সব প্রস্তুত। বাহির হইবার কালে দ্বারে যান। এইরূপে তাঁহারা মধ্য এবং দক্ষিণ ইউরোপের গিরি-নদী-হ্রদ-শোভিত কতিপয় রমণীয় স্থান দেখিয়া বেড়াইলেন। পথে রস্কিন ও রস্কিনের পিতা কখন বা প্রকৃতির কোন রম্য বা বিরাট দৃশ্য-পটের—কখন বা মানবহস্ত-রচিত বিবিধ-কলা কারু-কার্য্যের ছবি আঁকিতেন। আল্‌প্‌স্-গিরিশ্রেণী দর্শনে রস্কিনের কি অসীম আনন্দোচ্ছ্বাস! তাহার বর্ণনা তাঁহারই লেখনীর আয়ত্ত ও যোগ্য।

তীর্থযাত্রা করিবার নিমিত্ত যেমন কাহারও কাহারও উগ্র ব্যগ্রতা, উন্মত্ত অধীরতা জন্মিয়া থাকে, আল্‌প্‌স্ দেখিবার নিমিত্ত রস্কিনের সেইরূপ আবেগ হইয়াছিল। প্রায় সমস্ত দিন বন জঙ্গল এবং উচ্ছল-পার্ব্বত্য ভূমিখণ্ড অতিক্রম করিয়া রজনীর মধ্য-যামে পর্ব্বত-ক্রোড়-লগ্ন অর্গল-বদ্ধ নগর বিশেষে উপনীত হইয়া দিবসের প্রতীক্ষায় রহিলেন। পরদিন অপরাহ্নে রাইন নদীর নিকটবর্ত্তী বিস্তৃত কান্তার পরিভ্রমণ করিতে করিতে—দূরে—পর পারে—"মেঘ বলিয়া কাহারও ভ্রম হইল না"—"স্ফটিকের ন্যায় পরিষ্কার"—"সুনীল আকাশপটে স্পষ্ট অঙ্কিত"—"অস্ত গমনোন্মুখ সূর্য্যের আলোকে আরক্তিম"—আল্‌প্‌স্ গিরি। ধ্যান ধারণা ও কল্পনার বহুদূরে—আয়ত্তচ্যূত ইডেন কাননের প্রাচীর ইহা অপেক্ষা সমুজ্জ্বল নয়—মৃত্যুর পর পারে স্বর্গের প্রাচীর ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর নহে।

সেই দিন রস্কিনের দ্বিতীয় জন্ম—এত কাল ধরিয়া, এত যত্নে শিক্ষিত হইয়া—দীক্ষা-উন্মুখ পবিত্র-হৃদয় বালক, প্রকৃতির বিশাল অচল মন্দিরে, জীবন-ব্রতের সন্ধান পাইয়া মন্ত্র-জীবনে সেই দিন দীক্ষিত হইলেন—আজ তাঁহার উপনয়ন ক্রিয়া সমাধা হইল। সত্য-সৌন্দর্য্য ও শান্তির সাম-গান-মুখরিত আনন্দগ্রন্থি—আজ তাঁহার জীবনে তাঁহার চিন্তা কথা এবং কার্য্যে আবদ্ধ হইল। সেই সন্ধ্যায় বাগ্দেবী তাঁহার কুসুমাঙ্গুলির আলোকময়ী ইঙ্গিতে, সেই সুস্থ-দেহ প্রতিভার উষালোকে অরুণিত-হৃদয়, বালককে তাঁহার জীবনে যাহা কিছু উন্নত, পবিত্র, যাহা কিছু কার্য্যকরী তাহা দেখাইয়াছিলেন। আল্‌প্‌স্ দর্শনে শুধু যে তাঁহার নয়নপথে সৌন্দর্য্যের দ্বার উন্মুক্ত হইল তাহা নয়—তিনি বুঝিলেন সেই অসীম অনন্ত স্বর্গ রাজ্যের প্রথম সোপানে মাত্র আরোহণ করিয়াছেন। বহুবর্ষ পরে, এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি নিজেই বলিয়াছেন—"যখনই কোন আনন্দ উচ্ছ্বাসের কল-তরঙ্গে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হয়,—বা কোন শান্তিপ্রদ—বলপ্রদ শুভ চিন্তা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠে, তখনই সেই দিন, সেই দৃশ্য, তাঁহার স্মৃতি-পথে উদয় হয়।"

পর্ব্বতদর্শনে রস্কিন চিরজীবনই এইরূপ উৎকট আনন্দ পাইতেন। সে আনন্দের আবেগ ও গভীরতা তিনি প্রেম-জনিত আনন্দের সহিত তুলনা করিয়া বলেন, প্রেম উপভোগেরই ন্যায় ইহা বর্ণনা বা ব্যাখানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। পাঠকের কি বায়রণের (Byron) কথা স্মরণ হয়?

to me
High mountains are a feeling.

পুত্রের চিত্রাঙ্কনী শক্তির বিকাশের জন্য পিতার যে কিরূপ যত্ন ও আগ্রহ ছিল বেশ বুঝা যাইতেছে। চিত্র-বিদ্যা শিখাইবার নিমিত্ত আগে হইতেই শিক্ষক নিযুক্ত ছিল এবং প্রসিদ্ধ চিত্রকরদিগের রচিত আলেখ্য-সংগ্রহের ব্যবস্থাও হইয়াছিল। তাহা ছাড়া রস্কিন যখন বয়ঃ-প্রাপ্ত হইলেন পিতা তাঁহার জন্য ৩০০০ টাকা (£ 200) বাৎসরিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন।

কলা বিদ্যায় পিতা পুত্রের একপ্রাণতা সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে—এক দিন কোন নিলামে রস্কিন ছবি কিনিতে গিয়া দেখিলেন, সেখানে যে একখানি মাত্র ক্রয়োপযোগী চিত্র ছিল, তাহা বিকাইয়া গিয়াছে, সুতরাং ম্রিয়মাণ হৃদয়ে তিনি গৃহে ফিরিলেন কিন্তু পরক্ষণেই দেখিলেন সে চিত্র তাঁহারই ঘরে রহিয়াছে। পুত্রের ভাল লাগিবে বলিয়া পিতা ইতিপূর্ব্বেই তাহা কিনিয়া আনিয়াছিলেন।

শৈশব হইতে রস্কিনের জীবন কিরূপে গঠিত হইতেছিল—তাঁহার হৃদয়-ধাতু যখন কোমল ছিল তখন তাঁহার উপর কি কি প্রভাবের গভীর অঙ্কপাত হইয়াছিল তাহার আভাস উপরিলিখিত বিবরণে পাইয়াছি। এক্ষণে আমরা তাঁহার কর্ম্মজীবনের আলোচনা করিব।

১৮ বৎসর বয়সে রস্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং তিন বৎসর অক্সফোর্ডে বাস করেন, পরে আরও দুই বৎসর অতীত হইলে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অক্সফোর্ড জীবনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই। সে জীবন তাঁহার বড় ভালও লাগে নাই। প্রতিযোগিতা প্রণালীর তিনি বরাবরই বিপক্ষ ছিলেন। তিনি বলিতেন, আমরা শিখিব এবং শিখিতে চেষ্টা করিব—জ্ঞান এবং সৌন্দর্য্যকে আয়ত্ত করিব এবং তজ্জন্য সাধনা করিব, ইহাই প্রয়োজনীয়—ইহাই যথেষ্ট, ইহাই শ্রেয়ঃ—প্রতিযোগিতায় হীন ঈর্ষা-বৃত্তির উদ্রেক করিয়া কি ফল?

তবে যে তিনি আগ্রহের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাভ্যাসে বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাহার কারণ পিতা মাতার প্রতি ভক্তি ও স্নেহ। পিতামাতা অনেক আকাঙ্ক্ষা করিয়াই তাঁহাকে অক্সফোর্ডে পাঠাইয়াছিলেন—তাঁহারা না দুঃখিত হন, তাঁহাদের হৃদয়ে না ব্যথা লাগে, এই কারণেই তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত তৎপর এবং যত্নবান হইয়াছিলেন—ইহাতে তাঁহার নিজের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি বড় একটা ছিল না।

অক্সফোর্ড জীবনের আর একটী বিষয়ের উল্লেখ আবশ্যক। রস্কিন যখন তথায় যান তখন সেখানে ছাত্রজীবনে অনেক দোষ ছিল। মদ্যপায়িতার সীমা ছিল না। কিন্তু রস্কিন সকলের সঙ্গে এবং সকল আমোদপ্রমোদে যোগ দিয়াও চতুরভাবে মদ্যপান হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই কঠোর গৃহ শিক্ষার স্থায়ী ফল কোথায় যাইবে? তিনি সকলের সঙ্গে বসিয়া, পাত্রের পর পাত্র নিঃশেষ করিতেন—গলায় ঢালিয়া নয় ভিতরকার জামার মধ্যে। সুরাপানে রস্কিনের এইরূপ বিতৃষ্ণা দেখিয়া আর এক জন মহত্তর লোকের আরও শিক্ষাপ্রদ উন্নত ব্যবহার মনে পড়ে।

বিখ্যাত ফরাসী উপন্যাসলেখক (Balzac) ব্যালজার কথা মনে পড়ে। ব্যালজা এক জন অসাধারণ প্রতিভা এবং প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার অধ্যবসায় এবং উদ্যম বিস্ময়কর—অমানুষিক! তিনিও মাদকসেবী ছিলেন না। যখন তাঁহার নিতান্ত প্রিয় বন্ধু বান্ধবেরা (Haschich) মাদক-জনিত নেশার তীব্র সুখ উপভোগের মত এবং তাঁহাকে তাহার রসাস্বাদন করাইবার জন্য ব্যস্ত, তিনি তাঁহাদের নিকট জানিতে চাহিলেন, উক্ত নেশার প্রভাবে মনের কিরূপ অবস্থা হয়।

বর্ণনায় যাহারা সিদ্ধহস্ত—কথার উপর যাহাদের অলৌকিক ক্ষমতা—যাহারা কবি—ব্যাল্‌জাকে তাঁহারা সেই মাদকতার মোহিনী চিত্রময়ী ভাষায় বুঝাইতে লাগিলেন। কৌতূহলী শিশুর ন্যায় তিনি মুগ্ধ হইয়া শুনিলেন, যে এই মাদকের প্রভাবে ইন্দ্রিয় সকলের ক্ষমতা কল্পনাতীত মাত্রায় বর্দ্ধিত হয়—তুমি শুনিতে পাইবে সকল হইতে স্বর লহরী উত্থিত হইতেছে, বিচিত্র বর্ণে বিচিত্র কলরোল। তোমার অন্তরে বাহিরে চারিদিকে অনন্ত প্রসারিত—তুমি এক অপূর্ব্ব স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছ—তোমার কর্তৃত্ব নাই—অহংজ্ঞান তিরোহিত, নিজের ইচ্ছা নিজের অধীন নয়। তুমি যেন সাগর-মধ্যে স্পঞ্জ—আনন্দস্রোত সহস্র রন্ধ্রে একবার তোমার ভিতর প্রবেশ করিতেছে আবার চলিয়া যাইতেছে। এই অপূর্ব্ব অবস্থা উপভোগ করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াও ব্যালজা হস্তস্থিত মাদক দ্রব্য রাখিয়া দিয়া বলিলেন—"যে অবস্থায় আমার নিজের উপর প্রভুত্ব চলিয়া যায়, আমার ইচ্ছাবৃত্তি আমার আয়ত্ত নহে, তাহা অপেক্ষা জগতে ভয়াবহ কিছু আছে বলিয়া বোধ হয় না।"

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে রস্কিন উপাধি লাভ করিয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন এবং ১৮৪৩ সালে আধুনিক চিত্র সম্প্রদায় (Modern Painters) নামক তাঁহার প্রথম পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। সেই অবধি ১৮৬০ সাল পর্য্যন্ত, অবিশ্রান্ত ধারে, অনুপম সুন্দর ভাষায় কলা বিদ্যা সম্বন্ধে তিনি গ্রন্থের উপর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। প্রথম পুস্তকে তিনি সাধারণ রুচি ও মতের বিপক্ষে তাঁহার নিজের অভিপ্রায় স্বাধীন ভাবে ব্যক্ত করেন। যৌবনের একটি নিঃসঙ্কোচ বিশ্বাস আছে, যে বিশ্বাস সে সকলের সম্মুখে সহজে ব্যক্ত করে। রসোপভোগের একটি অকপট তীব্র আনন্দ আছে সে আনন্দ বিশ্বসংসারকে মগ্ন করিতে চায়। প্রতিভার একটি স্বাভাবিক বিকাশ এবং অপ্রতিহত প্রভাব আছে, সূর্য্যালোকের ন্যায় তাহা আপনা আপনি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। রস্কিনের প্রথম পুস্তকে আমরা এই তিনটী

দেখিতে পাই। কি সুন্দর ভাষা—কি দেবোপম নির্ভীকতা—কি বিশ্ববিজয়ী বিশ্বাস! আবার এই সকলের উপর গৈরিক প্রস্রবণের ন্যায় কি আনন্দ স্রোত! আর এই পুস্তক রচনার মূলই বা কি? (Turner) টর্ণার এর চিত্রাঙ্কণী প্রতিভার রসগ্রাহিতা—তাঁহার উপর শ্রদ্ধা-এবং ভক্তি। তরুণকর্ণধারার চাপলায় প্রণোদিতঃ। বাস্তবিক সমালোচনার প্রকৃত এবং মূল কারণ সমালোচ্য বস্তুর রসাস্বাদন—তাহার সৌন্দর্য্য উপভোগ এবং তজ্জনিত আনন্দ। কাব্য হউক, চিত্র হউক, ভাস্কর্য্য হউক তাহার সৌন্দর্য্যে যখন আমি মুগ্ধ, তখন আমাকে 'বাহবা' দিতেই হইবে, এবং অপরকে ডাকিয়া সেই আনন্দ সংবাদ দিতে হইবে। আমি যে সুখ উপভোগ করিতেছি, তোমাকে তাহার অংশ না দিয়া আমি থাকিতে পারি না। দানে আমার সুখ বাড়িবে বই কমিবে না।

Modern Painters পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ—প্রকাণ্ড পুস্তক। সাহিত্য ও কলাজগতে ইহা বিষম বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল। ইহার ভিতর কলা-সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে রস্কিন অনেক মূল-তত্ত্ব এবং মৌলিক নিয়মের আলোচনা এবং অবতারণা করিয়াছেন। প্রথমে পুরাতন মতবাদীরা তাঁহার বিপক্ষে তাঁহাদের চিরপরিচিত হুঙ্কার ছাড়িতে এবং তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে বিরত হন নাই। তাহারা তাহাদের পুরাতন নামাবলী ঝাড়িয়া তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিতে এবং অভিশাপ দিতেও ছাড়েন নাই। জগতের নিয়মই এই, যাহা আছে তাহা সহজে যাইতে চাহে না। জীর্ণ অট্টালিকাও পড়িবার কালে তাহার বিচ্ছিন্ন শিথিলতার মধ্য হইতে বজ্রধ্বনিতে যেন সেই পতনেরই প্রতিবাদ করে। কিন্তু সময় হইলে সকলকেই সরিয়া পড়িতে হয়। দ্বিতীয় খণ্ডে রস্কিন যখন তাঁহার সমালোচকদিগের মত সকল তাঁহার প্রতিভার প্রদীপ্ত আলোকে শরৎকালের মেঘরাশির ন্যায় বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিলেন, তখন সকলে এই নূতন দেবতার পূজা আরম্ভ করিলেন। ১৮৬০ সালে Modern Painters সম্পূর্ণ হয়। তাহার পূর্ব্বে কলা বিদ্যা সম্বন্ধে তিনি একাধিক বৃহদায়তন গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাদের সমালোচনা প্রবন্ধের সীমার মধ্যে অসম্ভব—তাহার জন্য এক খানি পুস্তকের বিস্তৃতি আবশ্যক। আমরা ললিতকলা সম্বন্ধে তাঁহার গুটিকতক মুখ্য মত স্থূলতঃ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা পাইব।

প্রস্তাবিত বিষয় লিখিবার পূর্ব্বে একটী কথা বলা আবশ্যক এবং বলিবারও সময় আসিয়াছে—কলাবিদ্যায় রস্কিনের নিজের কিরূপ পারদর্শিতা ছিল। স্থাপত্যে যে তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তি বা সৃষ্টি-নিপুণ কল্পনা ছিল না, তাহা তিনি আপনিই স্বীকার করিয়াছেন। চিত্রাঙ্কণে তাঁহার নিতান্ত সামান্য ক্ষমতা ছিল না এবং তাঁহার রচিত চিত্র সংখ্যাও সামান্য নয়। সকল চিত্রেই আমরা তাঁহার অসাধারণ ধৈর্য্য—অশ্রান্ত অধ্যবসায় এবং একপ্রাণ কার্য্যনিষ্ঠা দেখিতে পাই। প্রদর্শনীতে তাঁহার কোন কোন চিত্র বিশেষ সুখ্যাতিও লাভ করিয়াছে, এবং কোন কোন সমালোচকদিগের মতে তাঁহার নৈসর্গিক দৃশ্যপট সকল এত ভাল যে তাহাদের অপেক্ষা আরও ভাল আমরা কল্পনা করিতে পারি না। তাঁহার গ্রন্থ-সমূহে তাঁহার স্বহস্ত প্রণীত কতকগুলি ছবি বড়ই সুন্দর—আধুনিক চিত্রকর সম্প্রদায় নামক পুস্তকে তিনি আল্‌প্‌স্ পর্ব্বতের স্থান বিশেষের যে চিত্র দিয়াছেন তাহা কাহারও কাহারও মতে পার্ব্বত্য চিত্রাঙ্কণের আদর্শ। এ দিকে হুইস্‌লর (Whistler) প্রমুখ চিত্রকরেরা বলেন, রস্কিনের চিত্রবিদ্যায় অসাধারণ অভিজ্ঞতা এবং কলারসে বিলক্ষণ প্রবীণতা থাকিলেও কার্য্যে তিনি কিছুই করেন নাই। এ দ্বন্দ্ব মীমাংসা করা প্রবন্ধলেখকের আয়ত্তের ভিতর নয়। তবে মোটের উপর ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে, যে সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি যেরূপ অসাধারণ প্রতিভা দেখাইয়াছেন কলাজগতে সেরূপ দেখাইতে পারেন নাই।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন।

ল্যাপ্‌লাণ্ডের কথা।

অনেকেই ল্যাপ্‌লাণ্ডকে উত্তর কেন্দ্রীয় ঊষা (Aurora Borealis) বিভাসিত, চিরতুষারসমাচ্ছন্ন, নিশীথসৌরকর-পরিশোভিত, মেরুসন্নিহিত দেশ বলিয়া অবগত আছেন। ইহা যে বল্‌গা হরিণচালিত অচক্র শকট ও খর্ব্বকায় ল্যাপ্‌জাতির দেশ তাহাও অনেকের অবিদিত নাই।

কিন্তু এদেশ সম্বন্ধে এতদ্ব্যতীত আর অধিক কিছু জ্ঞাতব্য আছে বলিয়া কেহ মনে করেন না। এরূপ ধারণা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। ল্যাপ্‌লাণ্ড ও তাহার অধিবাসীদিগের সম্বন্ধে জানিবার বিষয় অনেক আছে। সত্যবটে অনেকে এই দেশকে শীতলবায়ুতাড়িত, অনুর্ব্বর, ক্লেশসঙ্কুল ও জনসমাগমশূন্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং এই বর্ণনা অণুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। কিন্তু তথাপি সচরাচর এখানে যে সকল প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়নগোচর হয় তাহার সৌন্দর্য্য অনির্ব্বচনীয়। ল্যাপ্‌লাণ্ড বলিয়া কোনও নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ দেশ নাই। ল্যাপ্‌জাতি কর্ত্তৃক অধ্যুষিত সমগ্র ভূখণ্ডের নাম ল্যাপ্‌লাণ্ড। ইহা ইউরোপীয় রুষিয়ার উত্তর পশ্চিম হইতে আরম্ভ করিয়া সুইডেন ও নরওয়ের উত্তরাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সুতরাং এই তিন দেশেরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কোনও না কোনও ভাব এখানে দৃষ্টিগোচর হয়। উন্নত পর্ব্বতময় অন্তরীপ অথবা ভাতি উৎপাদক উচ্চ শৈলরাজি; চিত্রার্পিতবৎ প্রাকৃতিকসৌন্দর্য্যশোভিত গভীর উপত্যকা; পাদপ পরিবৃত হ্রদ বা উপসাগর; সুপ্রশস্তা প্রবাহিণী অগভ খরস্রোতা গিরিনদী; রজতকান্তি নির্ঝর ও জলপ্রপাত পদে পদে দর্শকের চিত্ত আকর্ষণ করে। অপেক্ষাকৃত অরণ্যময় ভূভাগে পত্রপুষ্পফলের বিচিত্র বর্ণসমাবেশ ও মধ্যে মধ্যে সুদূরপ্রসারিত প্রান্তরসমূহের অতুলনীয় প্রশান্ত শোভা দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। সত্যব বৎসরের অধিকাংশ সময় সমস্তদেশ তুষারাচ্ছন্ন থাকে; কিন্তু সে দৃশ্যেরও কেমন একপ্রকার সৌন্দর্য্য আছে যাহা জগতের অন্য কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না; এবং সেই তুষাররাশির উপর দিয়া অচক্র শকটের সাহায্যে যাতায়াতে এত সুবিধা হয় যে ল্যাপ্‌গণ তাহার পরিবর্ত্তে তদ্দেশী স্বল্পকালস্থায়ী গ্রীষ্মকালের উত্তাপ ও সৌন্দর্য্য সম্ভোগ অতি অকিঞ্চিৎকর ও অসুবিধাজনক বলিয়া মনে করে।

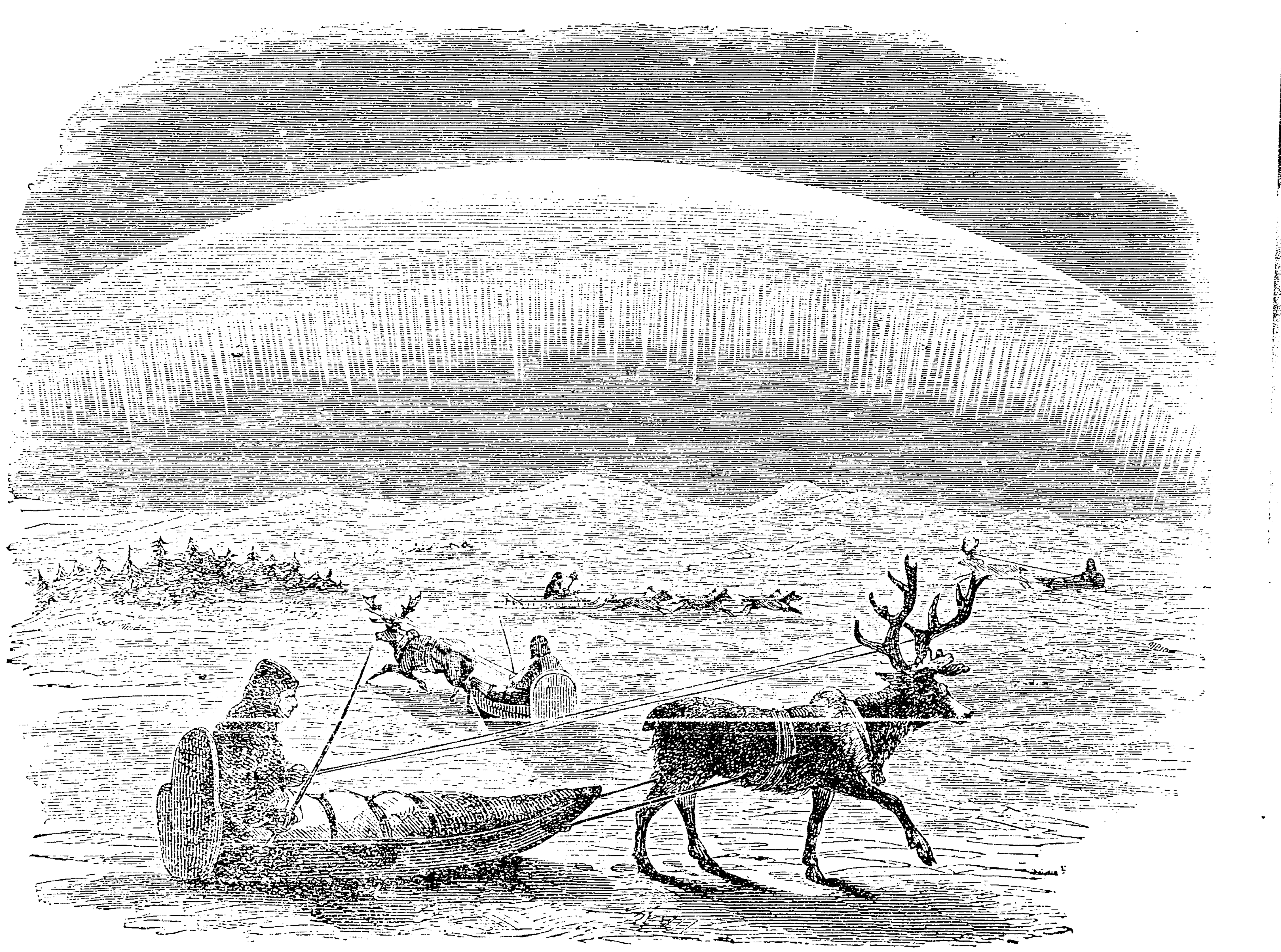

তাহার পর রজনীর সৌন্দর্য্য! তাহার কি আর তুল আছে? কবি ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ একস্থলে সৌন্দর্য্যের

উপমা দিতে গিয়া লিখিয়াছেন, "ল্যাপ্‌লাণ্ড রজনীর ন্যায় মনোহর।" বাস্তবিক, ইহা অপেক্ষা সুন্দর উপমা আর হইতে পারে না। পৃথিবীর এই অংশে অত্যদ্ভুত কেন্দ্রীয় উষার যে আলোক সৌন্দর্য্য দৃষ্টিগোচর হয় তাহা যাহারা একবার দেখিয়াছেন তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন, যে একমাত্র ঐ উষালোক দর্শনেই সুদূর ল্যাপলাণ্ড গমনের যাবতীয় ক্লেশের যথেষ্ট পুরস্কার হয় ইহা এক প্রকার অর্দ্ধ গগনব্যাপী আলোক। অনেকে মনে করেন ইহা বৈদ্যুতিক শক্তিসম্ভূত; এবং দেখা গিয়াছে যে ইহার প্রকাশের সময় দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের শলাকা অত্যন্ত বিচলিত ও স্থান ভ্রষ্ট হয় এবং বৈজ্ঞানিক মাত্রেই জানেন যে বৈদ্যুতিক শক্তির সহিত চৌম্বক আকর্ষণের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে—এমন কি ইহার একটীকে অপরটীর রূপান্তর মাত্র বলিলেও দোষ হয় না। অনেকেই অবগত আছেন যে পৃথিবীর কক্ষ যে সমতলে অবস্থিত, পৃথিবীর মেরুদণ্ড তাহার সহিত লম্বভাবে না থাকিয়া বক্র (oblique) ভাবে আছে বলিয়া উত্তর ও দক্ষিণ মেরুদ্বয় ক্রমান্বয়ে বৎসরের এক অর্দ্ধাংশ কাল সূর্য্য হইতে অপর দিকে ফিরিয়া থাকে। এইজন্য ১০ই চৈত্র হইতে ১০ই আশ্বিন পর্য্যন্ত ছয় মাস কাল উত্তর মেরুতে দিন ও দক্ষিণ মেরুতে রাত্রি ও অবশিষ্ট ছয় মাস উত্তর মেরুতে রাত্রি ও দক্ষিণ মেরুতে দিন হয়। মেরু হইতে নিরক্ষ বৃত্তের দিকে যত অগ্রসর হওয়া যায় ততই দিবামান ও রাত্রিমানের হ্রাস হইতে থাকে এবং নিরক্ষবৃত্তের সন্নিহিত স্থানে দিবামান ও রাত্রিমান সম্বৎসর প্রায় সমান অর্থাৎ দ্বাদশ ঘণ্টা হয়।* মেরুসন্নিহিত দেশের ষণ্মাসব্যাপী রজনী যদি এতাবৎকাল অন্ধকারাবৃত থাকিত তাহা হইলে তথাকার অধিবাসীদিগের কি পর্য্যন্ত ক্লেশ ও অসুবিধা হইত তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কারণ, কুম্ভকর্ণের মত একেবারে ছয়মাসের উপযুক্ত আহার সামগ্রী উদরস্থ করিয়া কেন্দ্রীয় রজনীর ছয়মাস কাল নিদ্রা যাওয়া মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব নহে। সুতরাং তথাকার অধিবাসীদিগের বৎসরের অর্দ্ধাংশকাল রজনীতেই আহারাদি সংগ্রহের জন্য ভ্রমণ ও পরিশ্রম করিতে হয়। কেন্দ্রীয় উষার আলোকে তাহাদিগের অন্ধকারে ভ্রমণ ও শ্রমসাধ্য কার্য্যসাধনের ক্লেশ ও অসুবিধা বিদূরিত হয়। এই ব্যাপারকে যিনি উদ্দেশ্যবিহীন প্রাকৃতিক ঘটনা মাত্র বলিতে চান বলুন; আমরা তাঁহার মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের প্রশংসা করিতে পারি না। আমাদের বিবেচনায় ইহা পরম কারুণিক জ্ঞানময় ঈশ্বরের আশ্চর্য্য করুণা ও কৌশলের উজ্জ্বল নিদর্শন। ইহা তাঁহারই মঙ্গলময় বিধান।

উত্তর ও দক্ষিণ উভয় মেরুর সন্নিহিত প্রদেশেই এই কেন্দ্রীয় উষা দৃষ্টিগোচর হয়। উত্তর কেন্দ্রীয় উষাকে ইংরাজীতে Aurora Borealis বা Nothern Lights বলে এবং দক্ষিণ কেন্দ্রীয় উষাকে Aurora Australis বা Southern Lights বলে। অস্মদ্দেশীয় প্রাচীন ঋষিগণও উত্তর মেরুসন্নিহিত প্রদেশের সুদীর্ঘ রজনী ও কেন্দ্রীয় উষার বিষয় অবগত ছিলেন। তাঁহারা এই কেন্দ্রীয় উষাকে সোমগিরি নামে অভিহিত করিয়াছেন। রামায়ণে আছে,—

"তমতিক্রম্য শৈলেন্দ্রমুত্তরঃ পয়সান্নিধিঃ।
তত্র সোমগিরির্নাম মধ্যে হেমময়ো মহান্॥
সতু দেশো বিসূর্য্যোঽপি তস্য ভাসা প্রকাশতে।
সূর্য্যলক্ষ্যাভিবিজ্ঞেয় স্তপতেব বিবস্বতা॥"

"সেই পর্ব্বত অতিক্রম করিলেই উত্তর মহাসমুদ্র। সেখানে সুবৃহৎ সোমগিরি আছে; তাহার মধ্যস্থল সুবর্ণময়। সেই দেশ সূর্য্যহীন হইলেও ঐ সোমগিরির আলোকে আলোকিত; উহা সূর্য্যালোক না হইলেও ঐ সূর্য্যালোকে আলোকিত দেশের ন্যায় প্রকাশ পায়।"

ট্রম্‌হোল্ট্ নামক নরওয়েবাসী বৈজ্ঞানিক এই কেন্দ্রীয় উষার নিম্নলিখিতরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন:—"প্রথমে অন্ধকারময় আকাশের উপর দিয়া অজ্ঞাত শক্তি পরম্পরার প্রভাবে অল্প অল্প আলোক রেখা প্রসারিত হয়; ইহাই কেন্দ্রীয় উষার বিচিত্র আলোক, বর্ণ, আকৃতি ও গতির মহাচাক্‌চিক্যময় ক্রীড়ার আরম্ভ। দেখিতে দেখিতে উক্ত নীরব শক্তি গগনতলে অসংখ্য কম্পমান আলোকপতাকাসংরচিত এক মহাপ্রভাময় অনলচন্দ্রাতপ উত্থাপিত করে। উক্ত চন্দ্রাতপ দিগ্বলয়

* প্রকৃতপক্ষে দিবামান রাত্রিমান অপেক্ষা একটু অধিক হয়। কারণ বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব নিবন্ধন প্রত্যুষে দিগ্বলয় রেখার উপরে উঠিবার কিয়ৎ কাল পূর্ব্ব হইতে এবং অপরাহ্নে দিগ্বলয় রেখার নিম্নে যাইবার পরেও কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত সূর্য্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

রেখা হইতে আরম্ভ করিয়া উর্দ্ধে গগনের মধ্য বিন্দু (Zenith) পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। ক্রমে উহার মধ্য হইতে রামধনুর ন্যায় বিচিত্রবর্ণের মালা ও ঝালরসমূহ প্রকাশিত হইয়া উত্তর হইতে দক্ষিণ ও পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত তরঙ্গবৎ গতিতে ধাবিত হইতে থাকে; মুহূর্ত্তকাল পরেই সমস্ত নভোমণ্ডল ভীষণ আলোড়িত অগ্নিসমুদ্রের আকার ধারণ করে। এইরূপে নানা নূতন আকার ধারণ করিতে করিতে এই অত্যদ্ভুত জ্বালাময় আলোক রাশি সুদীর্ঘ শীতরজনী ব্যাপিয়া নিজ প্রভা বিস্তার করিয়া সমস্ত দেশকে আলোকিত করিয়া তুলে। অবশেষে অরুণালোক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইহার নির্ব্বাণোন্মুখ অন্তিম আলোক রেখাসমূহ তিরোহিত হয়।" ট্রমহোল্ট্ উপসংহারে বলিয়াছেন, "জগতে এতদপেক্ষা সুন্দর দৃশ্য আর নাই। যিনি ইহা দর্শন করেন নাই তিনি কল্পনা-তেও ইহার মহোজ্জ্বল প্রভা ভাবিয়া উঠিতে পারিবেন না। এক কথায় এ দৃশ্য বর্ণনাতীত।"

আমরা প্রারম্ভেই বলিয়াছি ল্যাপ্লাণ্ড নিশীথসৌর-করশোভিত। ইহার অর্থ বুঝাইবার জন্য দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে পৃথি-বীর মেরুদণ্ডের বক্রাবস্থাননিবন্ধন প্রত্যেক মেরুতে ক্রমান্বয়ে বৎসরের অর্দ্ধাংশকাল দিন ও অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ-কাল রাত্রি হয় এবং নিরক্ষবৃত্তেরদিকে যত অগ্রসর হওয়া যায়, দিবামান ও রাত্রিমান ততই কম হইতে থাকে। পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তন বশতঃ সূর্য্যকে প্রতি দিন বৃত্তাকার পথে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে যাইতে দেখা যায়। এই বৃত্তাকারপথ নিরক্ষবৃত্তের সমতলের সহিত সমান্তরভাবে থাকে। সুতরাং কর্কটক্রান্তি (১০ই চৈত্র) হইতে মকরক্রান্তি (১০ই আশ্বিন) পর্য্যন্ত ছয়মাস কাল সূর্য্য নিরক্ষবৃত্তের উত্তর দিকে অবস্থিতি করে। নিরক্ষ-বৃত্তের সমতলকে বর্দ্ধিত করিয়া দিলে আকাশে যে বৃত্ত সমুৎপন্ন হয় তাহাই সুমেরু ও কুমেরুর দিগ্বলয়। সুতরাং উপরি-উক্ত ছয় মাসকাল সূর্য্য ক্রমাগত সুমেরুর দিগ্বলয়ের উপরে অবস্থিতি করাতে ঐ ছয় মাস নিজ সুমেরুতে দিন এবং কুমেরুতে রাত্রি হয়। কর্কটক্রান্তির সময় প্রথমে সূর্য্যকে উত্তর মেরুর দিগ্বলয়ের একপ্রান্তে উঠিতে দেখা যায়; তাহার পর তিন মাস (উত্তরায়ণের দিনপর্য্যন্ত) উহা দিগ্বলয়ের চতুর্দ্দিকে স্ক্রূপের প্যাচের ন্যায় পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ঘূরিতে ঘূরিতে উপরে উঠিতে থাকে ও উত্তরায়ণের দিন (১০ই আষাঢ়) হইতে আবার ঐ ভাবে ঘূরিতে ঘূরিতে নিম্নদিকে নামিতে থাকে এবং মকরক্রান্তির সময় আবার দিগ্বলয়ের প্রান্তে উপস্থিত হইয়া ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যায়। সুমেরু হইতে যত নিরক্ষবৃত্তের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় ততই সূর্য্যের ভ্রমণপথের অবস্থান দিগ্বলয়ের সমতলের সহিত বক্রভাব ধারণ করিতে থাকে এবং কিছুদিন ঐ ভ্রমণ পথের কিয়দংশ প্রতিদিন দিগ্বলয়ের নিম্নে থাকিয়া যায়। এই জন্য দিবামান ও রাত্রিমানের হ্রাস হইতে থাকে। তখন আর সূর্য্যের ভ্রমণপথ দ্বিগ্বলয়ের সম-তলের সহিত সমান্তরভাবে থাকে না। সুতরাং যে কয় মাস দিন থাকে তাহার প্রত্যেক চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সূর্য্য একবার দিগ্বলয়ের খুব নিকটে আসে ও পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার বার ঘণ্টা পরে দিগ্বলয় হইতে অপেক্ষাকৃত উপরে উত্থিত হয়। এই চব্বিশঘণ্টার মধ্যে দিগ্বলয় হইতে সূর্য্যের উন্নতি যখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয় তাহাই এক হিসাবে ঐ সকল দেশের মধ্যাহ্নকাল; আর যখন ঐ উন্নতি সর্ব্বাপেক্ষা অল্প হয় সেই সময়ই ঐ সকল দেশের নিশীথকাল। এই জন্য ল্যাপ্লাণ্ড প্রভৃতি স্থানকে নিশীথ সূর্য্যের দেশ (Land of the Midnight Sun) বলে। এই নিশীথ সূর্য্য দিগ্বলয়ের খুব নিকটে দৃষ্ট হয়। এইরূপ নিশীথই সূর্য্যের তৎকালীন নিম্নগতির শেষ সীমা ও উর্দ্ধগতির আরম্ভ। সুতরাং ইহা এক হিসাবে প্রদোষ ও প্রত্যু-ষের সন্ধিস্থল।

এই নিশীথ সূর্য্যের শোভাও কেন্দ্রীয় উষার ন্যায় অত্যাশ্চর্য্য ও অনির্ব্বচনীয়। এমন কি ইহার ইন্দ্রজাল-রচিতবৎ অলৌকিক চাকৃচিক্য কোনও কোনও অংশে কেন্দ্রীয় উষা অপেক্ষাও মহোজ্জ্বল প্রভাসম্পন্ন। বেয়ার্ড টেলর ইহার যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। তিনি বলিয়াছেনঃ—"দেখিলাম, শরৎকালীন বায়ু তাড়িত শুষ্কপত্রের ন্যায় রাশি রাশি বিদেশ প্রত্যাগত পক্ষী* এই নিশীথ সূর্য্যের কিরণে সুবর্ণবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উড়িতে উড়িতে আসিতেছে। সুদূর উত্তরে উত্তর মহাসাগরের পরিষ্কার দিগন্তবৃত্তের উপরে সূর্য্যমণ্ডল যেন ঘোর হরিদ্রাবর্ণ আলোক শয্যার উপর অবস্থিত। সম্মুখে আমার মস্তকের উপর দুই চারিখানি অত্যুজ্জ্বল রক্তপীতবর্ণ (of orange colour) মেঘের রেখা; আরও উপরে পূর্ব্বোক্ত হরিদ্রাবর্ণ ক্রমে ক্রমে মিলাইয়া গিয়া সুন্দরগোলাপি ও নীল আভা ধারণ করিয়াছে; সেখানকার মেঘগুলি মুক্তাফলাভ গোলাপী, ও সুবর্ণাভ ধূসরবর্ণের বাষ্পমালার ন্যায় দেখাই-তেছে। সমুদ্রের বর্ণ পীত ও রক্তপীত সূত্রখচিত শ্লেট্ প্রস্তরের মত; সমস্ত আকাশ এক প্রকার কোমল, অদ্ভুতরহস্যময় আলোক প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে; এবং দুইটী অন্তরীপের মধ্যস্থলে নিশীথ সূর্য্য পরাহত তেজে বিবিধ অত্যুজ্জ্বল বর্ণছটা বিকীর্ণ করিতেছে। এই সময়ের ঠিক্ উপযুক্ত কোনও নাম নাই; কারণ, ইহা না সূর্য্যাস্তকাল, না সূর্য্যোদয় কাল, অথচ ইহাতে এই উভয়কালেরই সৌন্দর্য্য সম্মিলিতভাবে বর্ত্তমান।"

এই সকল সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ সত্ত্বেও ল্যাপ্লাণ্ড এমন মনোজ্ঞ দেশ নহে যেখানে চিরদিনের জন্য বাস করিতে অথবা নিতান্ত প্রয়োজনাতীতকাল অপেক্ষা করিতে ইচ্ছা করে। দেখিবার যোগ্য অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দৃশ্য এখানে আছে বটে, কিন্তু সে সকল দেখা হইয়া গেলেই দর্শকের মন স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে। যে দেশে কৃষিকর্ম্ম অসম্ভব, যে দেশের বৃক্ষসকল ফলদান করে না, যে দেশের অল্পদিনস্থায়ী গ্রীষ্মকালে বৃক্ষলতাদি এত শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি ও পরিণতি প্রাপ্ত হয় যে তাহারা অকালপক্কতানিবন্ধন কোনও উপকারেই আসে না,—এমন কি যে দেশে শূকরশাবক পুষিলেও তাহাদিগকে খাওয়াইবার খরচ পোষায় না—সে দেশকে কোনও মতেই সমৃদ্ধিশালী বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। এখানে কেবল প্রচুর পরিমাণে মৎস্য, জামের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল, গঠন কার্য্যোপযোগী কয়েক প্রকার মূল্যবান্ কাষ্ঠ ও লক্ষ লক্ষ বল্গা হরিণ পাওয়া যায়। কিন্তু সভ্য দেশের অধিবাসিগণ যে সকল সুখসুবিধা উপভোগ করেন তাহার তুলনায় পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সকলের প্রচুরতা অতি অকিঞ্চিৎকর।

তাহার পর মনুষ্যের সঙ্গ পাইবার উপায় কি তাহাও এক বিবেচ্য বিষয়। এখানকার অধিবাসীদিগের সঙ্গ সুখকর হইবে কি না সে চিন্তা ত দূরের বিষয়—লোক খুঁজিয়া মিলাই ভার। অধিবাসীর সংখ্যা বোধ হয় ১৭,০০০ সতর হাজারের অধিক হইবে না। এই ১৭,০০০ লোক প্রায় ১,৫০,০০০ দেড়লক্ষ বর্গমাইল পরিমিত ভূখণ্ডে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে বাস করে। সুতরাং গড়ে নয় বর্গমাইল ভূমিতে একজন লোকের বাস; এবং তাহাদের মধ্যে অনেকেই যাযাবর প্রকৃতিবিশিষ্ট; তাহা-দের কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থায়ী বাসস্থান নাই; তাহারা যেখানে সেখানে ঘূরিয়া বেড়ায়। এদেশে কোনও নগর নাই; গ্রামগুলি অধিবাসীদিগের যাযাবর প্রকৃতির অনু-যায়ী—ছয় সাতখানি তাঁবু বা কুটীরের সমষ্টিমাত্র; খাদ্য অথবা জ্বালানি কাষ্ঠের অভাব অনুসারে অধিবাসিগণ যখন যেখানে যায় এই বাসস্তানগুলি সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। সত্য বটে নরওয়ের উপকূলে হ্যামারফেষ্টনামে একটী নগর আছে—ইহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তর-বর্ত্তী নগর—ইহার অধিবাসীর সংখ্যা ২৫০০। কিন্তু যদিও ইহা ল্যাপ্লাণ্ডে অবস্থিত, ইহা প্রকৃতপক্ষে নর-ওয়েবাসীদিগের উপনিবেশ বা বন্দর। নিকটবর্ত্তী দ্বীপবাসী সামুদ্রিক ল্যাপ্গণ মধ্যে মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সময়ে এখানে আসিয়া নরওয়ে ও রুষিয়াবাসী ব্যবসায়ীদিগের নিকট মৎস্য ও বল্গা হরিণের মাংস বিক্রয় করে এবং তাহা-দিগের নিকট হইতে কাফি, চিনি, তামাকু ও সর্ষপচূর্ণ প্রভৃতি নিজেদের ব্যবহার্য্য বিদেশীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়া যায়।

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ল্যাপ্লাণ্ডে মনুষ্য-সঙ্গ সুলভ নহে এবং যদিবা সুলভ হইত তাহা হইলেও উহা তেমন প্রীতিপ্রদ হইত না। সভ্যদেশবাসী অনেকেই বোধ হয় এখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে নামমাত্র পরিচয় অপেক্ষা অধিকতর ঘনিষ্ঠতা বাঞ্ছনীয় মনে করিবেন না। সে যাহা হউক ইহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রকৃতি, রীতি-নীতি ও ব্যবসায়ের অনেক প্রকারভেদ দৃষ্ট হয় এবং মধ্যে মধ্যে এমন নীচ ও বর্ব্বর প্রকৃতির লোক দেখা যায়, যাহাদের সঙ্গে বিদেশীয়গণের বিদায়গ্রহণকালীন সম্ভা-ষণাদি করিতেও প্রবৃত্তি হয় না। সুইডেনের ল্যাপগণ

* শীতপ্রধান দেশের পক্ষিগণ শীতকালে অপেক্ষাকৃত উষ্ণতর দেশে চলিয়া যায়; আবার গ্রীষ্মকালে ফিরিয়া আসে।

মৎস্যজীবী, পর্ব্বতবাসী ও অরণ্যচারী এই তিন শ্রেণীতে, এবং নরওয়ের ল্যাপ্গণ সমুদ্রবাসী, নদীবাসী ও পর্ব্বতবাসী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ; এবং রুষিয়ার ল্যাপ্গণের অধিকাংশই মৎস্যজীবী। কিন্তু মোটের উপর সমস্ত ল্যাপ্-

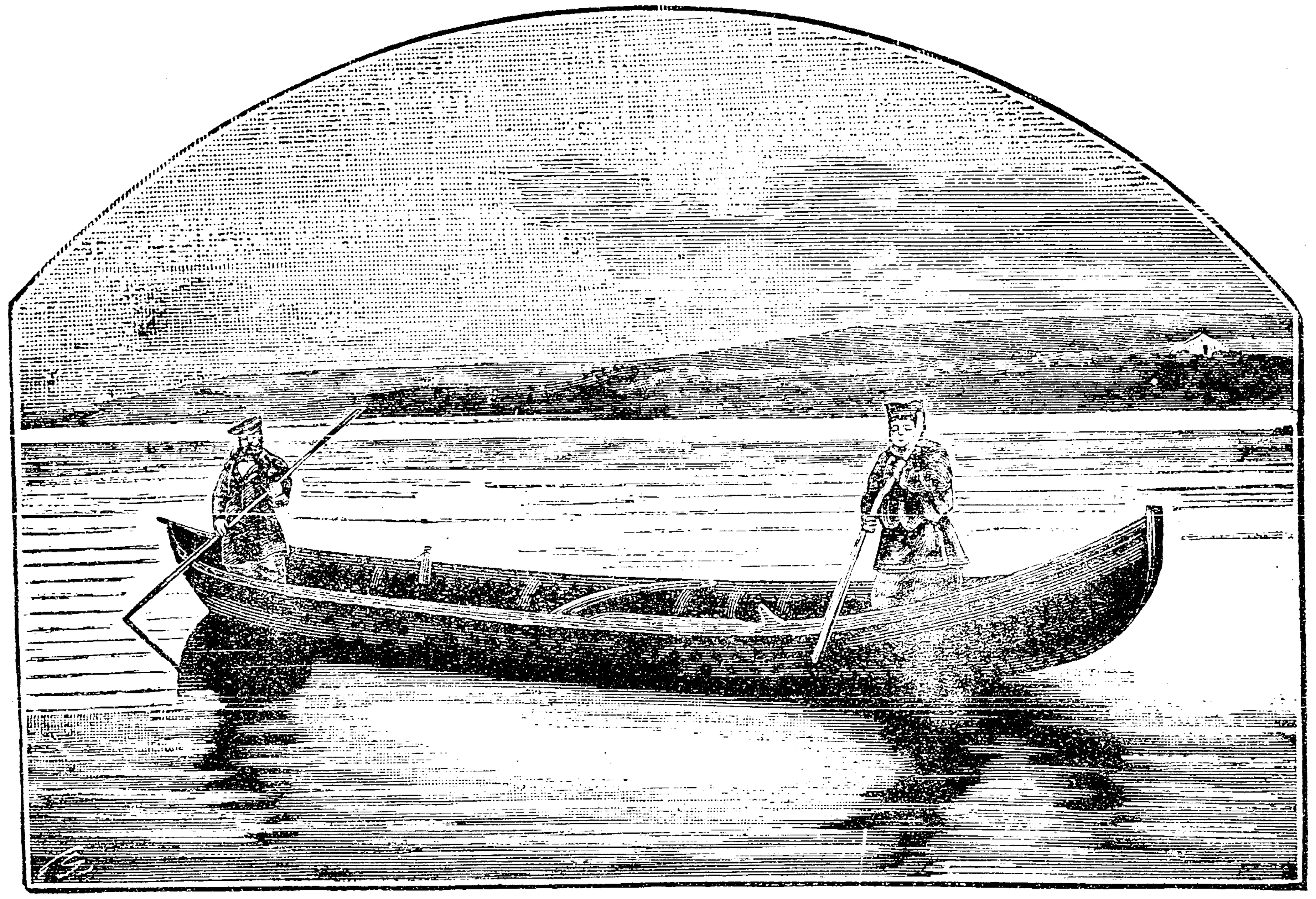

জাতিকে পার্ব্বত্য ও সামুদ্রিক এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করিলেই যথেষ্ট হইবে। সামুদ্রিক ল্যাপ্গণ সমুদ্রের উপকূলে মৃত্তিকা বা কাষ্ঠনির্ম্মিত কুটীরে স্থায়িভাবে বাস করে এবং তাহাদের সংখ্যা যাযাবর ল্যাপ্দিগের অপেক্ষা অধিক এবং তাহারা অপেক্ষাকৃত সভ্য ও সঙ্গতিপন্ন।

ল্যাপ্গণ আপনাদের দেশকে স্যাব্মি বা স্যামি এবং আপনাদিগকে স্যামিলট্ বা কৃষ্ণবর্ণ জাতি বলে। 'শ্যামল' কথার সহিত ইহার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখা যায়। মূলে উভয়শব্দ এক কি না বলা যায় না। কেহ কেহ মনে করেন ল্যাপ্ শব্দের অর্থ 'দেশপ্রান্তবাসী' এবং উহা বৈদেশিকগণ কর্ত্তৃক ঘৃণার ভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ক্রিশ্চিয়ানার অধ্যাপক ফ্রিস্ বলেন উহা ফিন্ল্যাণ্ড দেশীয় 'ল্যাপপা' (যাযাবর) শব্দ হইতে উৎপন্ন এবং ইহাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু দক্ষিণপ্রদেশবাসী অপেক্ষাকৃত সুসভ্য ল্যাপ্গণ এই শব্দ 'বর্ব্বর' অর্থে উত্তরপ্রদেশবাসী অসভ্য ল্যাপ্গণের প্রতি প্রয়োগ করিয়া থাকে।

ল্যাপ্গণ মনুষ্য জাতির মধ্যে কোন্ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত তাহা নির্ণয় করা কিছু সুকঠিন। কিন্তু ইহাদের আকৃতি অনেক পরিমাণে ককেশীয় ও মঙ্গোলীয় জাতির মাঝামাঝি এবং ইহারা সম্ভবতঃ এই উভয় জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। ইহাদের আকৃতি একটুও সুন্দর নহে—কিন্তু অদ্ভুত। পৃথিবীর পূর্ব্ব গোলার্দ্ধে যে সকল জাতি বাস করে তাহাদের মধ্যে ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা খর্ব্বকায়। স্ত্রীলোকদের দৈর্ঘ্য সাড়ে চারি ফীট্ অর্থাৎ তিন হাতের এবং পুরুষদের দৈর্ঘ্য সওয়া তিন হাতের অধিক হয় না। ইহাদের কপাল ছোট ও চর্ম্ম পাত্লা। কিন্তু কপাল ছোট বলিয়া ইহাদের বুদ্ধি অল্প নহে। ইহারা ক্রয়-বিক্রয় ও বিদেশীয়দের সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে বেশ বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহাদের শরীরের বর্ণ কৃষ্ণ, শ্যান, গৌর, তাম্রবর্ণ, রক্তিম প্রভৃতি বিবিধ নামে অভিহিত হইতে দেখা যায়। এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে ইহাদের মধ্যে বিবিধ বর্ণের লোক দৃষ্ট হয়। কিন্তু অধিকাংশই যে কৃষ্ণবর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই। কেশও কটা, তাম্রবর্ণ এবং নীল বা ধূসর মিশ্রিত কৃষ্ণ প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের। তন্মধ্যে শেষোক্ত প্রকারই সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেশের বর্ণ যাহাই হউক, উহা দীর্ঘ, শক্ত ও সোজা—বিন্দুমাত্রও কোঁকড়ান নহে। ইহাদের মস্তক

বৃহৎ কিন্তু ললাট ক্ষুদ্র, মুখের হাঁ বড়, হনুদ্বয় উচ্চ, নাসিকা চ্যাপ্টা ও প্রশস্ত, চক্ষু মঙ্গোলীয়দের মত বক্রভাবে অবস্থিত, দৃষ্টি টেরা। ইহাদের পায়ের নিম্নার্দ্ধ ধনুকের মত বক্র এবং সেই জন্য ইহাদের গতি অতি কদর্য্য। কিন্তু ইহারা অত্যন্ত ক্ষিপ্রকর্ম্মা ও বলবান্ এবং ইহাদের কষ্টসহিষ্ণুতা নিতান্ত বিস্ময়কর। এমন অনেক ষষ্টিবর্ষবয়স্ক দৃঢ়কায় ল্যাপ্ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের জীবনে এক দিনের জন্য কোনও রোগ হয় নাই এবং যাহারা এই বয়সেও আধমণ বোঝা পৃষ্ঠে লইয়া প্রতিদিন পদব্রজে ত্রিশ মাইল পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিতে পারে। চলিতে চলিতে তুষার ঝটিকা উপস্থিত হইলে ইহারা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে ; ইহাদের সমস্ত শরীর বরফে চাপা পড়িয়া যায় ; পরে ঝটিকা নিবৃত্ত হইলে ইহারা তুষাররাশি ভেদ করিয়া উত্থিত হয়। দারুণ শীতের সময় যখন ল্যাপগণ বল্গা হরিণের আহারের জন্য শৈবাল অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, তখন তাহাদের দলস্থ স্ত্রীলোকদের মধ্যে কাহারও প্রসবকাল উপস্থিত হইলে সে প্রসবান্তে অত্যল্পকাল মাত্র বিশ্রাম করিয়া আবার চলিতে থাকে ; এবং তাহাতে তাহাদের কোনও অনিষ্ট হয় না। এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, শারীরিক সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য ল্যাপ্লাণ্ডে যাওয়া নিষ্ফল। ল্যাপ্ ও ফিন্দিগের বৃত্তান্তলেখক ফ্রাঙ্ক্ ভিন্সেণ্ট বলেন যে ল্যাপ্ স্ত্রীলোকদের মধ্যে সুন্দরী স্ত্রীলোক কদাচিৎ দুই একজন দেখিতে পাওয়া যায়। তবে যুবক যুবতীদের মধ্যে কেহ কেহ খর্ব্বাকৃতি, টেরাচক্ষু, চ্যাপ্টা নাসিকা ও প্রশস্ত মুখরন্ধ্র প্রভৃতি দোষ সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত সুশ্রী বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য। কিন্তু 'অপেক্ষাকৃত' সুশ্রী ব্যতীত তাহাদিগকে আর অধিক কিছু বলা যায় না। অনিন্দ্যসুন্দর কান্তি ইহাদিগের মধ্যে নিতান্ত দুর্ল্লভ। সাধারণতঃ ল্যাপ্ যুবতীদের সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে তাহারা হাস্যমুখী চলনসই রকমের সুন্দরী। কিন্তু তাহাদের যাহা কিছু সৌন্দর্য্য তাহা শীঘ্রই বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং বৃদ্ধবয়সে তাহারা নিতান্ত বিশ্রী ও কিম্ভূত কিমাকার হইয়া পড়ে।

ল্যাপ্গণ শান্তস্বভাব, প্রফুল্লচিত্ত ও আতিথেয় ; তীব্র সুরাপানপ্রবৃত্তি ভিন্ন ইহাদের অন্য কোনও প্রকার প্রবল আসক্তি নাই ; মারপিট, খুন, অত্যাচার প্রভৃতি অপরাধ ইহাদের মধ্যে নাই বলিলেই হয় ; এমন কি প্রণয়ের গাঢ়তাও ইহাদের মধ্যে দৃষ্ট হয়না। ইহারা অর্থলোলুপ বটে, কিন্তু অর্থলাভ করিয়া তাহা কোনও রূপ কাজে লাগায়না। কাফি, চিনি প্রভৃতি যে কিছু বিদেশীয় বিলাসের দ্রব্য ইহারা ব্যবহার করে তাহার জন্য অর্থব্যয় না করিয়া বল্গাহরিণের চর্ম্ম ও শুষ্ক মৎস্যের বিনিময়ে তাহা ক্রয় করিয়া থাকে। ইহারা যাহা কিছু অর্থব্যয় করে তাহা 'ফিঙ্কেল' নামক একপ্রকার স্বদেশজাত মদ্য ক্রয় করিবার জন্য। এই মদ্য আমাদের দেশের ধেনো মদের ন্যায় শস্য চুয়াইয়া প্রস্তুত হয়। ইহা অত্যন্ত বিস্বাদ—টার্পিন তৈল, তিমি মৎস্যের তৈল ও কদর্য্য গুড় একত্র মিশাইলে যেরূপ হয় সেইরূপ। ইহা এত তীব্র যে পান করিলে বোধ হয় যেন পাকস্থলী পুড়িয়া গেল। অবশিষ্ট অর্থ ইহারা পাহাড়ের ফাটলে লুকাইয়া রাখে এবং কোথায় রাখিয়াছে প্রায়ই তাহা ভুলিয়া যায়। অনেক ল্যাপের ধারণা এই যে, এই লুক্কায়িত অর্থ দ্বারা পরকালে তাহাদের খরচ চলিবে।

বল্গাহরিণ চুরির অপরাধই ইহাদের মধ্যে সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে। নরওয়ের অন্তর্ভুক্ত ল্যাপ্লাণ্ডেই এই অপরাধের বিশেষ ভাবে শাস্তি হইয়া থাকে ; সেই জন্য এই প্রদেশে এমন প্রাপ্তবয়স্ক ল্যাপ্ প্রায় দেখা যায় না যে, এই অপরাধে একবার কারাগারে প্রেরিত হয় নাই।

ইহাদের পরিচ্ছদের বিবরণ দেওয়া হঠাৎ যত সহজ বলিয়া মনে হইতে পারে, বাস্তবিক তত সহজ নহে। সাধারণতঃ লোকের ধারণা এই যে, বল্গা হরিণের চর্ম্ম বলিলেই তাহাদের পরিচ্ছদের বর্ণনার পরিসমাপ্তি হইল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সভ্যদেশীয়দিগের ন্যায় ইহাদের পরি-

চ্ছদেরও ভিন্ন ভিন্ন অংশের নানা প্রকারভেদ দৃষ্ট হয়। স্থানভেদ, ঋতুভেদ, উপলক্ষ ও পরিধানকারীর আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি নানা কারণে এই প্রকারভেদ ঘটিয়া থাকে।

ল্যাপ্ পুরুষগণ সর্ব্বোপরি উচ্চ কলার বিশিষ্ট পিরা-ণের ন্যায় একটী মোটা কাপড়ের কুর্ত্তা পরিধান করে। সামুদ্রিক ল্যাপ্গণের কুর্ত্তা প্রায়ই শাদা কাপড়ের; কিন্তু অন্য শ্রেণীর ল্যাপ্গণ সচরাচর, বিশেষতঃ ভোজ প্রভৃতির সময়, নাল, হরিৎ, পাটল এমনকি উজ্জ্বল লোহিত বর্ণের কুর্ত্তাও ব্যবহার করে। কখন কখন ইহারা কাল মখমলের কুর্ত্তা পরিয়া থাকে, কিন্তু এ গুলিরও কফ্ ও পৃষ্ঠদেশে লোহিত বা পীতবর্ণের কাপড় বসান হয়। ইহার নিম্নে শরীরের অব্যবহিত উপরে ইহারা ঐরূপ আর একটী কুর্ত্তা পরিধান করে; কিন্তু তাহার কাট ও সেলাই প্রভৃতি তত উৎকৃষ্ট নহে। ল্যাপ্গণ লংক্লথ প্রভৃতি কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্রের জামা ব্যবহার করে না। ইহারা গ্রীষ্ম-

কালে একটীমাত্র কুর্ত্তা পরিধান করে, কিন্তু শীতকালে দেহের অব্যবহিত উপরে একটী মেষচর্ম্মের অঙ্গরক্ষা পরিয়া থাকে। ইহারা কুর্ত্তার উপরে একটী কটিবন্ধ পরিয়া তাহাতে ভুটিয়াদের মত একখানি বড় ছোরা ঝুলাইয়া রাখে। ইহাদের পাজামা কুর্ত্তার ন্যায় মোটা কাপড়ে নির্ম্মিত, কিন্তু দৈর্ঘ্যে একটু ছোট—পায়ের পাতার গ্রন্থি পর্য্যন্ত ও পাদুকার সহিত বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ এবং জানু হইতে পাদ গ্রন্থি পর্য্যন্ত সুপরিষ্কৃত চামড়ার ফিতাদ্বারা জড়ান। ইহারা মোজার ব্যবহার জানে না, কিন্তু পাদুকার অভ্যন্তরে এক প্রকার নরম ঘাস সাজাইয়া দেয়, তাহাতে শীতকালে তাহাদের পা বেশ গরম থাকে। ইহাদের পাদুকাও খুব নরম—বল্গাহরিণের খুরের নিকটস্থ চর্ম্ম দ্বারা প্রস্তুত। হস্তদ্বয়ের উত্তাপরক্ষার জন্য ইহারা সুক্ষ্ম কোমল পশম নির্ম্মিত দস্তানা পরিধান করে এবং শকটচালনের সময় বিবিধবর্ণ রঞ্জিত অঙ্গুলাবরণবিহীন দস্তানা ব্যবহার করিয়া থাকে।

ইহারা শীতকালে কুর্ত্তার নিম্নে মোটা কাপড়ের পরিবর্ত্তে সুক্ষ্ম কোমল পশম নির্ম্মিত পরিচ্ছদ পরিধান করে। প্রদেশভেদে টুপির গঠন বিভিন্ন রূপ দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ টুপির উপরিভাগ সমচতুষ্কোণ এবং নীল বা লোহিত বর্ণ; ভিতরে এক প্রকার হাঁসের কোমলপক্ষ বসান; টুপির চতুর্দ্দিকে উদ্বিড়ালের চর্ম্মনির্ম্মিত একটী প্রশস্ত পাড় সংযুক্ত থাকে—বৃষ্টির সময় উহা অনেক উপকারে লাগে। তীব্র শীতের সময় ইহারা সুক্ষ্ম কোমল পশমনির্ম্মিত এক প্রকার মুখাবরণ ব্যবহার করে। স্ত্রীলোকদের পোষাক পুরুষদের মত, কেবল তাহাদের কুর্ত্তার গলাবরণ (collar) নাই; তাহার পরিবর্ত্তে ইহারা স্কন্ধের উপর একখানি ক্ষুদ্র সাল বিস্তারিত করিয়া দেয়। ভোজ প্রভৃতি উপলক্ষে উপর্য্যুপরি দুই তিনখানি পর্য্যন্ত সাল একত্র ব্যবহৃত হয়; তাহার মধ্যে সকলের উপরের খানি রেসম নির্ম্মিত। এতদ্ভিন্ন স্ত্রীলোকেরা নিজ অবস্থানুসারে রৌপ্য অথবা তাম্রের কারুকার্য্য শোভিত কোমরবন্ধ ব্যবহার করিয়া থাকে ও তাহাতে পুরুষদের মত ছোরা ও তদ্ব্যতীত ছুঁচ, সুতা, কাঁচি ও চাবি রাখিবার উপযুক্ত বন্দোবস্ত আছে। টুপি মাথায় বেশ করিয়া চাপিয়া বসান, এবং তাহাতে নানা রূপ সুন্দর কাজ করা থাকে। ইহা নীল বা লোহিত বস্ত্রে প্রস্তুত এবং ইহার সম্মুখে জরির কাজ করা এবং চতুর্দ্দিক ফুলকাটা রেসমী বা সুতার ফিতাদ্বারা আচ্ছাদিত।

ইহাদের শিশুদিগের কোনওরূপ পরিচ্ছদ নাই। তাহাদিগকে একপ্রকার দোলায় মেষচর্ম্ম ও শৈবালদ্বারা ঢাকিয়া রাখা হয়। কতকগুলি সরুকাষ্ঠ বাঁকারির মত নোয়াইয়া ও তাহার উপরিভাগ, চর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া এই দোলা নির্ম্মিত হয়। শিশুদিগকে ইহার মধ্যে শৈবালের উপর শয়ন করাইয়া উপরে মেষচর্ম্মের একখানি

আচ্ছাদন ফিতাদ্বারা আট্কাইয়া দেওয়া হয়। এই দোলার সঙ্গে একটী চামড়ার পেটি আবদ্ধ থাকে; কোথাও যাইবার সময় শিশুর মাতা ঐ পেটির সাহায্যে দোলাটি কাঁধে ঝুলাইয়া লইয়া যায়; অন্য সময় ঐ পেটি দ্বারা শিশুসমেত দোলাটি তাঁবুর মধ্যে কোন নিরাপদ স্থানে, অথবা মাতা বাহিরে কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলে নিকটস্থ বৃক্ষশাখায় ঝুলাইয়া রাখা হয়।

ল্যাপ্দিগের পরিচ্ছদের এই সাধারণ বিবরণই যথেষ্ট। উহার নানাবিধ প্রকারভেদের বিস্তারিত বিবরণ দিবার উপযুক্ত স্থান আমাদের নাই এবং তাহা পাঠকদিগের চিত্তাকর্ষক হইবে বলিয়াও বোধ হয় না।

ইহাদের গার্হস্থ্য ও সামাজিক আচার ব্যবহার ও জীবনযাপন প্রণালী এরূপ কুৎসিত যে ইহাদের সহিত অধিক দিন একত্র অবস্থান করিতে কোনও মতেই প্রবৃত্তি হয় না। ইহাদের বাসস্থান অতি কদর্য্য—তাহার মধ্যে সামুদ্রিক ল্যাপ্দিগের কাষ্ঠনির্ম্মিত কুটীরগুলিই অপেক্ষাকৃত একটু ভাল। বৃক্ষশাখার উপর বার্চগাছের বল্কল ও ঘাসের চাপ্ড়া দিয়া প্রস্তুত ছাদবিশিষ্ট এই সকল গৃহ বাহিরদিক্ হইতে মৃত্তিকাস্তূপের ন্যায় দেখায়। গৃহের প্রবেশদ্বার অত্যন্ত নীচু—খুলিলে আপনা আপনি বন্ধ হইয়া যায়। গৃহে জানালা নাই—আলোক আসিবার জন্য ছাদে খানিকটা ছিদ্র থাকে; তাহা দ্বারাই গৃহের ধূম নির্গত হইয়া যায়। খানকতক আল্গা প্রস্তরের চারিদিকে চারিটী খোঁটা পুতিয়া রন্ধনাদির জন্য চুল্লী নির্ম্মিত হয়। এই খোঁটার সঙ্গে আড়াআড়ি ভাবে কয়েক খণ্ড কাষ্ঠ বাঁধিয়া তাহার উপর হাঁড়ি, কেট্লি প্রভৃতি বসান হয় ও নিম্নে প্রস্তরের উপর অগ্নি জলিতে থাকে। গৃহ সরঞ্জাম কিছুই নাই। গৃহবাসিগণ বার্চ প্রভৃতি বৃক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখার উপর উবু হইয়া বসিয়া থাকে এবং রাত্রিকালে তাহারই উপর শয়ন করে। যাহাদের দুইখানি গৃহ আছে তাহারা সম্মুখের গৃহে বল্গাহরিণ প্রভৃতি পালিত পশু রাখিয়া আপনারা পশ্চাতের গৃহে বাস করে। শীতকালে ধূম, পশুদিগের মলমূত্র ও আবর্জ্জনাদিতে পূর্ণ হইয়া এই গৃহ সকল যে অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। অথচ ইহাই ল্যাপ্দিগের গৃহের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট-তর শ্রেণীর। সাধারণতঃ ইহাদের একটী মাত্র গৃহ—তাহাই একাধারে বৈঠকখানা, শয়ন গৃহ, পাকশালা, ভাণ্ডার পথাবাস। শয্যার মধ্যে কয়েক খণ্ড বল্গা হরিণের চর্ম্ম; তাহাই বিছাইয়া তদুপরি স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ প্রভৃতি পরিবারস্থ সকলে শয়ন করে। এবং কোনও অতিথি বাধ্য হইয়া এই সকল বাটীতে আশ্রয় লইলেও পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থার কোনও রূপ ব্যতিক্রম করা হয় না।

পার্ব্বত্য ল্যাপ্দিগের তাঁবু বার্চ বৃক্ষের শাখার উপর বল্গাহরিণের চর্ম্ম বিস্তারিত করিয়া নির্ম্মিত হয়। মিঃ ডিন্সেণ্ট্ বলেন তিনি ছয়ফুট্ ব্যাস বিশিষ্ট ও চারিফুট্ উচ্চ এইরূপ একটী তাঁবুতে নয় জন ল্যাপ্কে কতকগুলি কুক্কুর, একগাদা চামড়া, ও কতকগুলি বাক্স, কেট্লি ও খাদ্যদ্রব্যাদি লইয়া বাস করিতে দেখিয়াছেন। বেল নামক আর এক পর্য্যটক বলেন তিনি আট ফুট ব্যাস বিশিষ্ট একটী তাঁবুতে দুইজন পুরুষ, তিনজন স্ত্রীলোক, চারিটী বালকবালিকা ও চারিটী কুক্কুরকে বাস করিতে দেখিয়াছেন। ইহা যে অসাধারণ ব্যাপার তাহা নহে—ইহাদের প্রথাই এইরূপ। ইহা পরিচ্ছন্নতা ও সুনীতির পক্ষে কতদূর অনুকূল তাহা সহজেই অনুমেয়।

ল্যাপ্গণ অত্যন্ত অতিথি বৎসল। কোনও বিদেশীয় লোক ইহাদের কুটীরে বা তাঁবুতে উপস্থিত হইলে ইহারা খুব আদর যত্ন করে; কিন্তু তাহারা যেরূপ অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন তাহাতে তাহাদের আতিথ্য গ্রহণ করা অপেক্ষা অনেক সময় অনাহারে থাকা শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হয়। সমস্ত বাড়ীতে হয় ত একটা মাত্র কাফি খাইবার পেয়ালা; অতিথিকে তাহাই দেওয়া হয় এবং গৃহস্বামী খালি টিনের কৌটায় করিয়া কাফি পান করেন। অভ্যাগত ব্যক্তি অনেক সময় দেখিতে পাইবেন যে কাফিতে দুগ্ধ দিবার সময় গৃহকর্ত্রী বা তাঁহার কন্যা জিহ্বা দ্বারা চাটিয়া চামচের ময়লা পরিষ্কার করিতেছেন। স্নান বা গাত্র মার্জ্জন কাহাকে বলে তাহা ইহারা জানে না বলিলেই হয়। প্রত্যহ পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনেরও প্রথা নাই। অপরিষ্কার চর্ম্ম-নির্ম্মিত গাত্রবস্ত্র কখনও পরিষ্কার করা হয় না—যতদিন না পোষাক ছিঁড়িয়া অব্যবহার্য্য হইয়া যায় ততদিন ইহারা পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করে না। সে যাহা হউক ইহারা মোটের উপর প্রফুল্ল ও সন্তুষ্টচিত্ত, গল্পপ্রিয়, সরল এবং সুরসিক। এবং তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে নিশ্চয়ই স্বীকার করিবে যে মনুষ্যজীবনে সুখের অভাব নাই।

যাযাবর ল্যাপ্দিগের প্রধান খাদ্য বল্গা হরিণের মাংস ও দুগ্ধ; এক কথায় বলিতে গেলে বল্গা হরিণই তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব; তুষার মণ্ডিত দেশের এই একমাত্র সঙ্গী ল্যাপ্দিগের সকল অভাব পূর্ণ করে। ইহাদের মাংস ও দুগ্ধ দ্বারা ল্যাপ্গণ জীবন ধারণ করে এবং চর্ম্ম দ্বারা শীতাতপ হইতে আপনাদিগের দেহ রক্ষা করে; কারণ, বল্গা হরিণের চর্ম্ম দ্বারা ল্যাপ্দিগের পরিচ্ছদ, তাঁবু প্রভৃতি বিবিধ প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত হয়। ইহা তাহাদের শকট চালন, দ্রব্যাদিবহন, আহার ও পরিচ্ছদ সরবরাহ প্রভৃতি জীবন যাত্রার উপযোগী যাবতীয় প্রয়োজন সাধন করে। এককথায় বল্গা হরিণ লইয়াই যাযাবর ল্যাপ্দিগের সামাজিক জীবনের আরম্ভ ও শেষ।

সামুদ্রিক ল্যাপ্দিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের প্রধান উপায় মাছধরা। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ দুই একটা গরু ও দুই চারিটা মেষ পালন করিয়া থাকে। ইহা-

দের পশুপালন প্রথা অসভ্য আদিম অবস্থায় লোকদের মত নিতান্ত সামান্য রকমের পশু রাখিবার স্থান গুলিও দেখিতে অতি অদ্ভুত। ইহার মধ্যে আবার শুষ্ক ঘাসের মাচা গুলির দৃশ্য আরও অদ্ভুত। আমাদের দেশে লাউ শসা প্রভৃতি গাছের জন্য যেরূপ মাচা বাঁধা হয় এগুলি কতকটা সেইরূপ। ইহা কাষ্ঠ নির্ম্মিত, উর্দ্ধে চারি হইতে ছয় ফীট এবং একটু লম্বা ধরণের। ইহার উপরে শুষ্ক ঘাস রক্ষিত হয় এবং নিম্নদেশে সরু সরু কাঠ ঝুলাইয়া তাহার উপর বস্ত্রাদি রাখা হয়। চালাঘরের চাল বজায় রাখিয়া চারিদিকের বেড়া বা প্রাচীর সরাইয়া ফেলিলে যেরূপ দেখায়, দূর হইতে এগুলি দেখিতে সেইরূপ।

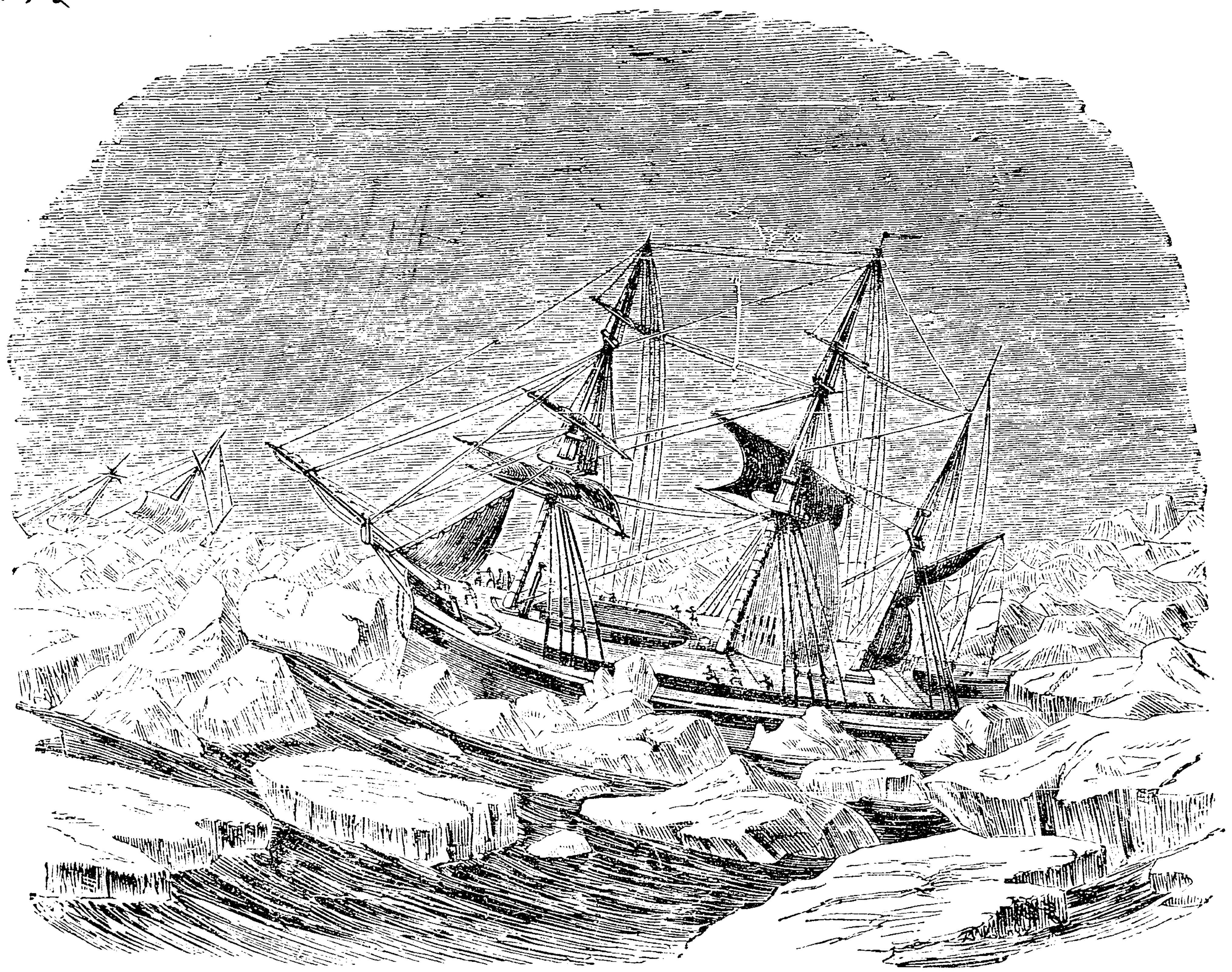

শীতকালে ল্যাপ্‌লাণ্ডের নিকটস্থ সমুদ্র বরফে আচ্ছাদিত হইয়া যায়। তখন ব্যবসায়ী ও অন্যান্য সমুদ্র যাত্রিদিগকে অনেক কষ্টে বরফ রাশি ভেদ করিয়া জাহাজ চালাইতে হয়। অনেক সময় পর্ব্বতশৃঙ্গবৎ হিমশিলাদ্বয়ের মধ্যে পড়িয়া তাহার চাপে অথবা ভগ্ন হিমশিলার পতনে জাহাজ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। কখনও বরফে আট্‌কাইয়া গিয়া জাহাজের গতিরোধ হইয়া যায়।

কিন্তু এই সময়ে স্থলপথে ভ্রমণের বড় সুবিধা। অচক্র শকটে চড়িয়া বরফের উপর ইহারা খুব দ্রুতবেগে ভ্রমণ করিতে পারে। এই শকট দুই প্রকারের; এক অনাবৃত ডিঙ্গি নৌকার মত, আর এক ক্ষুদ্র ডোঙ্গার মত। শেষোক্ত গুলিই অধিক দ্রুতগামী। এতদ্ভিন্ন বরফের উপর চলিবার জন্য এক প্রকার পাদুকা আছে, তাহা পায়ে দিয়া ইহারা সুগমপথে একদিনে (আঠার ঘণ্টায়) ১৫০ মাইল অর্থাৎ ঘণ্টায় প্রায় চারিক্রোশ চলিতে পারে। কখনও কখনও ইহারা ঘণ্টায় পনর মাইল পথ অতিক্রম করিতে পারে। গ্রীষ্ম কালে অনেক সময় নৌকার সাহায্যে যাতায়াত করিতে হয়। ল্যাপ্ দিগের নৌকা অপ্রশস্ত দীর্ঘ ডোঙ্গার মত; প্রান্তদ্বয় উচ্চ ও সূচ্যাগ্র; সুতরাং মধ্যস্থল জলে ডুবুডুবু হইয়া থাকে; দুই প্রান্তে দুইজন মাঝি দণ্ডায়মান হইয়া কখনও দাঁড় বাহিয়া, কখনও লগি ঠেলিয়া নৌকা চালাইতে থাকে; আরোহিগণ মধ্যস্থলে উবু হইয়া বসিয়া থাকে; পা ঝুলাইয়া বসিবার বন্দোবস্ত নাই বলিয়া কোনও প্রকার অসুবিধা অনুভব করে না।

ল্যাপ্‌দিগের বিবরণ একপ্রকার শেষ হইল। তাহাদিগের সামাজিক রীতি নীতি, বিবাহ পদ্ধতি, ধর্ম্ম প্রভৃতির বিষয় কিছুই বলা হইল না, বলিবার স্থানও নাই। ইহাদের সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। এবং বোধ হয় পঞ্চাশ ষাটি বৎসরের মধ্যে এই জাতি ধরাতল হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।*

* একটী ইংরাজী প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA

তৃতীয় ভাগ। } জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

যুগান্তর।

শত বর্ষ ধরিয়া যে কালাংশ যোজনব্যাপী অজগরের ন্যায় বৰ্দ্ধিত হইতেছিল, এবং যাহা এক্ষণে অতীতে লীন হইয়াছে, সেই উনবিংশ খৃষ্টীয় শতাব্দীর বিস্তারিত অথবা সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই স্থানে হওয়া অসম্ভব। বহু দেশের, বহু জাতির, বহু ঘটনার ইতিহাস এই চিরস্মরণীয় শতাব্দীর অন্তর্গত, এজন্য ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার অবতারণা হইতে পারে না। কেবল মাত্র বঙ্গ দেশের শত বর্ষের ইতিহাসও বিস্তৃত গ্রন্থের উপাদান, অতএব এ স্থানে বিবেচ্য নহে। বিগত পঞ্চবিংশতি বা কিয়ৎ সংখ্যায় ততোধিক বর্ষের কয়েকটা স্মরণীয় কথা এবং সেই সময়ের তুলনায় এই দেশের বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনা কথঞ্চিৎ সম্ভবপর, এবং তাহাতে কিছু ফল হইতে পারে।

অতীতের গৌরব এবং বর্ত্তমানের অগৌরব করা কতক পরিমাণে সকল দেশেই মনুষ্যের প্রকৃতিগত। সেই কারণে ইয়োরোপে Golden Age (স্বর্ণযুগ) এবং এ দেশে সত্য যুগের অস্তিত্বে বিশ্বাস। যাহা ছিল তাহা ভাল এবং যাহা রহিয়াছে তাহা মন্দ, এরূপ একটা ধারণা লোকের স্বভাবসিদ্ধ। প্রাচীনেরা আপনার বাল্য অথবা যৌবন কাল তাহাদিগের বয়োকনিষ্ঠদিগের বাল্য অথবা যৌবন কালের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করে। এইরূপে তুলনায় সর্ব্বদা কালের শ্রেষ্ঠতা ও নিকৃষ্টতা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা মনুষ্যপ্রকৃতির দুর্ব্বলতা মাত্র, বস্তুতঃ এ বিশ্বাসের মূলে সত্য নিহিত নাই। এই দুর্ব্বলতা অতিক্রম করিতে পারিলে মনুষ্যের ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি পতিত হয়। এই ভবিষ্য দৃষ্টিই সকল প্রকার মহত্ত্বের সূচনা। কিন্তু কালের যে উন্নতি অবনতি আছে এ কথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। কোন সময় বর্ত্তমান ভূতের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কখনও বা অতীত বর্ত্তমানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভবিষ্যৎ অজানিত বলিয়া তাহার নির্ণয় হয় না। কিন্তু অতীতের ও বর্ত্তমানের লক্ষণ দেখিয়া ভবিষ্যতের কিয়দংশ অনুমান করিতে পারা যায়।

যদি এরূপ বলা যায় যে, দেশের এখন যে অবস্থা পঞ্চবিংশতি বৎসর পূর্ব্বে তাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল, তাহা হইলে সহজ বিশ্বাসের অনুকূল কথাই বলা হয়। ইহাই যথার্থ কথা, কিন্তু এ কথা প্রামাণিক কি না তাহা বিচার্য্য। বিচারের বিশেষ প্রয়োজন আছে। উন্নত দেশে অথবা সমাজে কয়েক বৎসরের গতি তরঙ্গের উত্থান পতনের তুল্য কেহ গণনা করে না, করিবার প্রয়োজন হয় না। জাতীয় মহত্ত্ব দীর্ঘ সাধনার ফল, অত্যন্ত আয়াসসাধ্য। সে মহত্ত্ব প্রাপ্ত হইলে অথবা প্রাপ্তি সম্মুখাগত হইলে কয়েকটি বৎসর গণনা করিয়া তাহার ফলাফল হিসাব করিবার আবশ্যক হয় না। সে অবস্থা আমাদের নহে। যে অতীতের গৌরব আমরা সর্ব্বদা করিয়া থাকি, সে অতীতের সহিত আমাদের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। সে ব্রহ্মণ্য বলও নাই, সে ক্ষাত্র তেজও নাই। সেই লুপ্ত মহত্ত্ব পুনঃ প্রাপ্ত হইবার আমাদের

প্রকৃত চেষ্টাও নাই। কন্যকাবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম যৌবনাবস্থায় জননী ভারতভূমি যে সকল সন্তানকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছিলেন প্রাচীনাবস্থায় যে পুনরায় সেইরূপ অতুল মহিমাশালী সন্তানের প্রসূতি হইবেন, এরূপ আশা অসম্ভব না হইলেও স্বভাবের নিয়মানুযায়ী নহে। এক্ষণে আমাদের যে হীনাবস্থা তাহার তুলনায় বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বের অতীতের অভিমানে অনেক শান্তি আছে, কিন্তু সেই অতীতের বৃথা কামনায় আমরা গুরুতর ঐতিহাসিক ভ্রমে পতিত হই। সত্য সত্যই কি কেহ মনে করেন যে সেই বৈদিক অথবা পৌরাণিক যুগ আবার ফিরিয়া আসিবে, শ্রীরামচন্দ্র ও সীতা দেবী পুনরায় অযোধ্যায় অবতীর্ণ হইবেন, কুরুক্ষেত্রে সেই অক্ষৌহিণী সমুদয় আবার সমবেত হইবে, লক্ষ লক্ষ অরাতিবেষ্টিত আসন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে সংশয়াকুল ধনঞ্জয়ের সন্দেহভঞ্জনার্থ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগীতার গভীর অধ্যাত্ম তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি করিবেন? সেইরূপ অনির্দ্দিষ্ট, অনির্দ্ধারিত একটা আকাঙ্ক্ষা আছে মাত্র, কিন্তু কেহ নির্ণয় করিতে পারে না যে কাল, অবস্থা, ঘটনা এবং জাতীয় শারীরিক ও মানসিক গঠন প্রভেদে কিরূপ বৈলক্ষণ্য অবশ্যম্ভাবী। অতীতের কল্পনা ও চিন্তা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত শান্তিপ্রদ কিন্তু অতীতের পুনরাগমনের প্রার্থনা কি বিশেষ মঙ্গলকর? ইহাই ঐতিহাসিক ভ্রম। ইতিহাসে কি কোথাও কোন দৃষ্টান্ত আছে যে কোন জাতি পূর্ব্ব মহত্ত্ব হারাইয়া অবিকল সেই মহত্ত্ব আবার ফিরিয়া পাইয়াছে? রোম গেল, ইটালী আবার উঠিল, কিন্তু সে রোম ত আর আসিল না! গ্যারিবল্ডী, ম্যাট্সীনী জন্মগ্রহণ করিলেন বটে কিন্তু সীজর ও সিসিরো ত আর আসিলেন না! ইটালিয়ান জাতি আবার উঠিয়াছে কিন্তু রোমানেরা কোথায়? সক্রেটিস্ আরিষ্টটল্ আলেকজাণ্ডারের গ্রীস ত আর দেখা গেল না! সে দিন রুমের মুসলমানেরা গ্রীসকে পদদলিত করিল। মুসলমানেরাই বা কোথায় গেল? পূর্ব্বে ভারত হইতে স্পেন পর্য্যন্ত আর কি মুসলমানের সাম্রাজ্য স্থাপিত হইবে? মিসর রাজবংশীয়েরা কি হইল? ভ্রষ্টমহত্ত্ব জাতি সে মহত্ত্ব আর ফিরিয়া পায় না ইতিহাসে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। অতএব, যে দেশে বৈদিক ও পৌরাণিক মহত্ত্ব ছিল সে দেশে ঠিক সেইরূপ মহত্ত্ব আর ফিরিয়া আসিবে না।

অপর পক্ষে, সেই প্রাচীন মহত্ত্বের উত্তরাধিকারী হইবার জন্য যদি আমরা বিশেষ উৎসুক না হই, সকলেই সাক্ষাৎ ঋষিদিগের অথবা চন্দ্র সূর্য্যবংশীয়দিগের বংশধর হইবার দাবী না করি, তাহা হইলে আশার অনেক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যে সেই প্রাচীন আর্য্যবংশ সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ না থাকিলেও তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ কুটুম্বিতা প্রামাণ্য নহে স্বীকার করিলে মিথ্যা অভিমান ও ভ্রম হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় এবং জাতীয়োন্নতির পথ কিছু পরিষ্কৃত হয়। অতীত কালে বঙ্গদেশবাসীর বিশেষ মহিমশালিতার প্রমাণ যদি না পাওয়া যায় তাহা হইলে বর্ত্তমানের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ভবিষ্যতে আশা করা যাইতে পারে। নবীন জাতির পক্ষে পঞ্চবিংশতি বৎসর স্বল্পকাল নহে, কেন না সেই কালের মধ্যে জাতি কোন পথে যাইতেছে কিছু বুঝিতে পারা যায়। এই কথা স্মরণ রাখিয়া এই পঞ্চবিংশতি বৎসরের ইতিহাসের বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

বাঙ্গালীর জাতীয় অভিমান জন্মিয়াছে। সে অভিমানের সার্থকতা আছে। ভারতবর্ষে বাঙ্গালীর মত বুদ্ধিমান জাতি নাই ইহা এক্ষণে সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইতেছে। তাহার কারণ বাঙ্গালী অনেকটা আধুনিক জাতি, ভারতবর্ষের ইতিহাসে বাঙ্গালী ইতিপূর্ব্বে কোন বিশেষ কীর্ত্তি সংস্থাপন করে নাই। কিন্তু আমাদের উন্নতির পথ মুক্ত, প্রশস্ত নহে। শারীরিক সুস্থতা ও সবলতা ব্যতীত কোন দিকেই উন্নতি হয় না। আমাদের দেশে এক ম্যালেরিয়া রোগে জাতির সর্ব্বনাশ হইতেছে। এতদ্ব্যতীত, আমরা পরাধীন, অনেক দিকে আমাদের পথ রুদ্ধ। যুদ্ধ ব্যবসা আমরা শিখিতে পারি না, স্থলপথে বা জলপথে যুদ্ধ শিক্ষার কোন উপায় নাই। অক্ষম, ভীরু জাতি বলিয়া আমাদের একটা চিরকলঙ্ক রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে কলঙ্ক মিথ্যা। বাঙ্গালীর ভয় শিক্ষা-গুণে অনেকটা ঘুচিয়া গিয়াছে। সৈন্যবিভাগে প্রবেশের আদেশ পাইলেই সহস্র সহস্র বাঙ্গালী এখনই সৈন্যশ্রেণী-ভুক্ত হইবে। আমেরিকায় গিয়া অন্য জাতির সৈন্যাধ্যক্ষ হওয়া কেবল বাঙ্গালীর অদৃষ্টেই ঘটিয়াছে। বাঙ্গালী ব্যতীত ভারতবর্ষে অন্য কোন জাতি কখন বেলুনে উঠে নাই ও আকাশমার্গ হইতে অদ্ভুত সাহসবলে প্যারাশুট ধরিয়া অবতরণ করে নাই। সর্কস্ প্রথম বাঙ্গালী করে, ব্যাঘ্রের পিঞ্জরে বাঙ্গালী প্রথম প্রবেশ করে। বাঙ্গালীর সাহস নাই কে বলিবে? তবে সাহস বাড়াইতে হইবে, অকুতোভয় হইয়া সর্ব্বত্র সকল ক্ষেত্রে নিযুক্ত হইতে হইবে। কেবল পরাধীনতার যে অক্ষমতা তাহা আমাদের ঘুচিতে পারে না। সৌভাগ্যক্রমে, যাঁহারা আমাদের রাজা, তাঁহারা অনেক বিষয়ে আমাদিগকে কোন ক্লেশ দেন না, মানসিক বৃত্তিসমূহের অনুশীলনে কোনরূপ রাজকীয় প্রতিষেধ নাই। আমাদের উন্নতির পক্ষে এ পর্য্যন্ত ইংরাজের শাসন সাতিশয় অনুকূল।

এই আনুকূল্যের ফল অত্যন্ত শুভ এবং আশাপ্রদ। এই ম্যালেরিয়াপীড়িত, অস্বাস্থ্যকর দেশে সময়ে সময়ে যে সকল ক্ষণজন্মা পুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম স্মরণ করিলে গৌরব করিবার আমাদের যথার্থ অধিকার আছে। যে কোন দেশে, যে কোন সময়ে তাঁহারা জন্ম-গ্রহণ করিতেন সেই দেশের ইতিহাসে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত হইত। মাতৃভূমি এখনও রত্নগর্ভা, সাহস করিয়া এ কথা আমরা বলিতে পারি। পঞ্চবিংশতি বর্ষ পূর্ব্বের কথা স্মরণ করুন। সেই সময়কার দুই এক জন ঋষিতুল্য মহাপুরুষ এখনও ইহলোক আছেন, তাঁহাদের নামোল্লেখ করিব না। ধর্ম্মপ্রচারকদিগের মধ্যে রামকৃষ্ণ পরমহংস ও কেশবচন্দ্র সেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস সেই সময় বহির্মুখী শিক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের লোকমনোমোহিনী বাগ্মিতা ও ধর্ম্মান্দোলনে দেশ মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী। পাণ্ডিত্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইয়োরোপীয় বিদুষীদিগকে চমৎকৃত করিতে-ছেন। সাহিত্যে, সমাজ সংস্কারে, শিক্ষাদানে, সাহসিকতায় দানশীলতায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দেশের শীর্ষস্থানীয়। মাইকেল মধুসূদন তখন ইহলোকে নাই, কিন্তু তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি সর্ব্বত্র ঘোষিত হইতেছে। গভীর রাজনৈতিক বিদ্যায়, সংবাদ পত্রের চালনায়, এবং ধনীদিগের নেতৃত্বে কৃষ্ণদাস পালের যশ রাজা প্রজার মধ্যে বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছে। দেশের সেই এক দিন! বহুসংখ্যক শুভ নক্ষত্রের শুভ সম্মিলন ঘটিয়াছিল! দিকে দিকে আশার পথ উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছিল!

সেইরূপ যে চিরকাল যাইবে, সেইরূপ শক্তিশালী পুরুষগণ পরম্পরাক্রমে আবির্ভূত হইতে থাকিবেন এরূপ দুরাশা করা অন্যায়। কোন দেশেই ধারাবাহিকরূপে অসাধা-রণ শক্তিসম্পন্ন পুরুষেরা জন্ম গ্রহণ করেন না। করেন না বলিয়াই তাঁহারা অসাধারণ, কারণ সাধারণ লোকের জন্ম-মৃত্যুর পর্য্যায় ত অবিচ্ছিন্ন। জাতীয় জীবনের মন্দস্রোত ধীরে ধীরে সর্ব্বকাল বহিতে থাকে, এই অল্প সংখ্যক অসা-ধারণ পুরুষেরা সেই স্রোতে তরঙ্গ, স্ফীতি, কলধ্বনি, আনয়ন করিয়া দেন, তীরতট উদ্বেলিত করিয়া, বর্দ্ধিত-কলেবরা হইয়া জীবন স্রোত বহিতে থাকে। ইঁহাদিগের আগমনের নির্দ্ধারিত সময় নাই। Heirs of all the ages (সর্ব্বকালের উত্তরাধিকারী) একটা ইংরাজী কথা আছে বটে, কিন্তু তাহাতে গৌরব কোথায়? যে ধন উপা-র্জ্জন করে তাহার উত্তরাধিকারী কিরূপে তাহার সমকক্ষ হইবে? পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেই সেই পূর্ব্ব জ্ঞানা-র্জ্জনকারিগণকে অতিক্রম করা যায় না। অপর পক্ষে, পূর্ব্বে মহাজ্ঞানিগণ ছিলেন বলিয়া সেইরূপ মহাপুরুষেরা আর কখন দেখা দিবেন না এরূপ বিবেচনা করাও অযৌক্তিক, কারণ যে নিয়মে ক্ষমতাশালী পুরুষগণ আবির্ভূত হয়েন তাহা আমাদের জ্ঞানাতীত, এবং সে নিয়মকে কোনরূপ সীমাবদ্ধ করা আমাদের ক্ষমতার বহির্ভূত। আবার নিরূ-পিত সময় উপস্থিত হইলেই ক্ষণজন্মা পুরুষগণ আগমন করিবেন। এক্ষণে সেরূপ কেহ বর্ত্তমান না থাকিলে আক্ষেপের বিশেষ কারণ নাই, এবং আক্ষেপ করিলেও কোন ফল নাই। কিন্তু যে কয়জন প্রতিভাশালী ক্ষমতাবান পুরুষের নামোল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহারা যে যুগান্তর উপ-স্থিত করিয়া গিয়াছেন সেই নবযুগের প্রবাহ কিরূপ বহিতেছে তাহার প্রতি আমাদিগকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। লক্ষ্য পূর্ব্বক দেখিলে কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হইতে হয়। সেই কূলপ্লাবী স্রোত এখন শীর্ণ, ক্ষীণ, মন্দ। ধর্ম্ম প্রচারকের মধ্যে এক্ষণে দুই চারি খানি সংবাদ পত্র! ধর্ম্ম প্রচার যে কেবল লেখ-কের কর্ম্ম নহে, মহচ্চরিত্রবান মহাপুরুষেরই যোগ্য, এ কথা আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। সাহিত্যে সে প্রতিভা নাই। কর্ম্মক্ষেত্রে সে বলবীর্য্য নাই। কার্য্যের গুণের হ্রাস হইয়াছে, কোলাহল অনেক বাড়িয়াছে। শূন্য কুম্ভই অধিক, পূর্ণ কুম্ভ বড় দেখিতে পাই না। লোকের বিচার শক্তি হ্রাস হইতেছে; ব্যস্ততা বাড়িতেছে কিন্তু কর্ম্ম বাড়ে নাই। পথিক অনেক, পথ প্রদর্শক নাই। উন্নতির স্রোত বড় মন্দ বহিতেছে। যদ্যপি আমাদের উন্নতির পথ অবারিত থাকিবার আশা থাকে তাহা হইলে পুনরায় যুগান্তর উপস্থিত হইবার সময় আসিয়াছে।

এরূপ পরিবর্ত্তন আমাদের ইচ্ছা অথবা আয়ত্তাধীন নহে, এ কথা জানি। কিন্তু যাহার যত ক্ষুদ্র ক্ষমতা হউক কাহারও চেষ্টা নিষ্ফল হয় না। সকলের সমবেত সাধনাতে এই অভিলষিত পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হইতে পারে। প্রতিভা দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু চরিত্রবল মনুষ্যের স্বেচ্ছাধীন। যে জাতির চরিত্রে বল আছে সেই জাতিই মহতী কীর্ত্তি সংস্থাপনে সক্ষম হইবে। দুই চারি জন প্রতিভাশালী পুরুষ হইলেই সমগ্র জাতির মহত্ত্ব হয় না, কিন্তু দুই চারি জন প্রতিভাশালী পুরুষেই জাতির সাধারণ আদর্শকে উন্নত করিতে পারেন। সেই আদর্শের অনুসরণ করিলেই জাতি উন্নত হয়। বৃথা আস্ফালনে, পূর্ব্ব গৌরব স্মরণে কি হইবে? যাঁহাদিগকে লইয়া গৌরব কর তাঁহাদের সেই গৌরব রক্ষা করিবার জন্য কি করিতেছ? এই প্রশ্নের সদুত্তরে জাতির উন্নতি নিহিত রহিয়াছে। যখন আমরা বুঝিতে পারিব যে ক্ষুদ্র মহৎ-নির্ব্বিশেষে আমরা সকলেই উন্নতিমার্গ মুক্ত করিতে পারি, এবং সেই অনুসারে কর্ম্ম করিতে পারিব, সেই সময় আমাদের কর্ত্তব্য যথার্থরূপে পালিত হইবে এবং পূর্ব্ব গৌরব রক্ষিত হইবে। তাহা হইলেই যুগান্তরের প্রবাহ প্রশস্ত, পূর্ণ কলেবর হইতে আরম্ভ হইবে ও দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে।

যে কয়জন ক্ষমতাশালী পুরুষের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহাদের আসন কত দিন শূন্য থাকিবে বলিতে পারা যায় না। তাঁহাদের তুল্য অথবা তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক প্রতিভাশালী পুরুষেরাও আবির্ভূত হইতে পারেন, কিন্তু তাহা হইলেই উন্নতির পরাকাষ্ঠা আমরা প্রাপ্ত হইব না। সমগ্র জাতির মধ্যে উদ্যম ও বল প্রাদুর্ভূত হওয়া আবশ্যক। অধ্যবসায়ের এবং চরিত্রবত্তার অভাবই আমাদের অবনতির প্রধান কারণ। এই দুইটী অভাব পূর্ণ হইলেই কালে আমাদের সকল অভাব পূর্ণ হইবে। যাহার যে কর্ম্ম সে তাহাই যদি সর্ব্বান্তঃকরণে যথাসাধ্য করে, তাহা হইলেই সকল দিকে জাতির মঙ্গল হয়। বিশ্বাস অথবা অবিশ্বাস এক প্রকারের, কর্ম্ম আর এক প্রকারের, ইহাতেই আমাদের মহৎ দোষ ঘটিয়াছে। জাতির উন্নতির পক্ষে ইহাই প্রধান অন্তরায়। সাধনায় সিদ্ধি। প্রকৃত সাধনা আমাদের এ পর্য্যন্ত আরম্ভ হয় নাই। যুগান্তরের সূচনা হইয়া রহিয়াছে। যদ্যপি নবযুগ প্রবর্ত্তিত ও প্রবর্দ্ধিত না হয় তাহা হইলে দোষ আমাদের, মন্দ ভাগ্য আমাদের।

তত্রাপি আশার যে কোন চিহ্ন নাই এরূপ বলিতে পারা যায় না। কয়েকটী মঙ্গল চিহ্ন দেখা দিয়াছে। স্বদেশের ভাষার প্রতি, আচার ব্যবহারের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি বাড়িতেছে। দলাদলির ভাব বিদূরিত না হইলেও একতার অনেক লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ধর্ম্মবিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা পূর্ব্বের ন্যায় প্রবল নাই। ধর্ম্মভাবের প্রগাঢ়তা ও বিস্তৃতি সর্ব্বত্র লক্ষিত হইতেছে। এ সমুদয় শুভ চিহ্ন। নবীন, শুভ যুগের অভ্যুদয় হইলে দেশের, জাতির মঙ্গল। দেশ-বৎসল, জাতিবৎসল ব্যক্তি মাত্রেরই তাহা প্রার্থনীয়।

চৈতন্য প্রভু ও পদাবলী।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস চৈতন্য-প্রভুর পূর্ব্বে পদ-রচনা করিয়াছিলেন, পাঠকবর্গ অবগত আছেন, চৈতন্যপ্রভু সেই সব গান শুনিয়া প্রেমাবেশে বিহ্বল হইতেন; মহাপ্রভুর মুখারবিন্দের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হেতু "কি কহব রে সখি আনন্দ ওর। চিরদিন মাধবমন্দিরে মোর॥" প্রভৃতি পদ পাঠকগণের নিকট চিরমাধুর্য্যপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ধর্ম্মোদ্দেশ্যে পদ-রচনা করিয়াছিলেন কিনা প্রশ্ন হইতে পারে; বিদ্যাপতি বর্ণিত রাধিকার বয়ঃসন্ধি, পূর্ব্বরাগ, অভিসার প্রভৃতি পাঠ করিলে উহা সামান্য নায়ক নায়িকার গীতি বলিয়া ধারণা হয়। নানা উপমায় দেহসৌন্দর্য্যের কতকগুলি চিত্রপট অঙ্কণ করিবার চেষ্টা, অভিসারের বিচিত্র বিলাসকলা ইত্যাদি যতই কেন মনোহর না হউক, কষ্টকল্পনা না করিলে তাহাতে আধ্যাত্মিকতা আরোপ করা কঠিন হয়। "রাধিকা কখনও কেশদাম বাঁধিয়া রাখেন কখনও উহা এলাইয়া দেন"। "প্রেমের প্রসঙ্গ শুনিলে অবনতমুখী অন্যদিকে চাহিয়া সেই দিকে কর্ণ নিবেশ করেন, ইহা যদি কেহ লক্ষ্য করিয়া প্রচার করে তবে কান্নার সহিত হাসি মিশাইয়া তাহাকে গালি দেন," "তাঁহার দুইটি চক্ষু স্থির ভ্রমরের মত, যেন মধুতে ডুবিয়া পড়িয়াছে, উড়িতে পারে না।" প্রভৃতি ভাবের নানা চারু শব্দ ও উপমা দ্বারা আবেশময়ী রাধিকার যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা সুন্দরী নায়িকার মূর্ত্তি। সাহিত্যদর্পণ অনুসারে তাহা নির্দ্দোষ ও কবিত্বের হিসাবে

উহা সুকুমার সাহিত্যের একখানি অমর আলেখ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু সৃষ্টির প্রথম সময় হইতে নব-বসন্তাগমে কুহুরব মুখর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে প্রফুল্লিত নায়ক নায়িকা যে প্রেম দৃষ্টিতে আত্মহারা হইয়া আত্ম-বিনিময় করিয়া আসিয়াছেন, ইহাতে সেই নিত্য নবীন অথচ চির পুরাতন বাস্তব জগতের প্রেমলীলা, ইহা মধুর ও মনোজ্ঞ কিন্তু ইহার আধ্যাত্মিকত্ব কোথায়? কবি কোন ইঙ্গিতে আমাদের নিত্য অভিনীত ভালবাসা ব্যাপারের ঊর্দ্ধে উঠিলেন, ইহাই জিজ্ঞাস্য।

বিদ্যাপতির পূর্ব্বরাগে যাহা নাই, চণ্ডীদাসের পূর্ব্বরাগে তাহা আছে, চণ্ডীদাসের পদে ভালবাসার এক নূতন আদর্শ আছে, যাহা অনেক সময় নায়ক নায়িকার অভিনীত প্রেম দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে কষ্ট হয়; একবারে ব্যাখ্যা করা যায় না এ কথা বলি না, প্রেমের চূড়ান্ত কথা মানুষ মানুষকে বলিতে পারে না, তাহা নহে; তবে যখন নর নারীর প্রেমে আত্মসমর্পণের উন্নততম আদর্শ ফলিয়া উঠে, তখন উহা ধর্ম্মজগতের কথার ন্যায় শুনায়। চণ্ডীদাস রাধিকার মুখে প্রেমের প্রথম অবস্থায় কৃষ্ণনামের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন, "সখি! কেবা শুনাইল শ্যাম নাম," সে নাম মধুময়, তাহা "বদন ছাড়িতে নাহি পারে।" নাম শুনিয়া অনুরাগের দৃষ্টান্ত মানুষীয় ভালবাসার সাহিত্যে বিরল, কিন্তু "জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো" এই নাম জপের দৃষ্টান্ত সাধারণ সাহিত্যে একবারে দুষ্প্রাপ্য। বস্তুতই ভগবানের নাম জপ করিতে করিতে সংসার পাশরিয়া মন আপনা ভুলিয়া যায়, এই দৈহিক বন্ধন যেন তখন থাকিয়াও থাকে না,—ইন্দ্রিয়-প্রশমিত মনে নামের মধু-ভরা মোহ সর্ব্বাঙ্গ শিথিল ও অবসন্ন করিয়া ফেলে; এই পূর্ব্বরাগ মানবীয় প্রেমের পূর্ব্বরাগের উন্নততম আদর্শ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে, কিন্তু ইহা ঐশ্বরীয় প্রেমের স্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করা সহজ হয়। তার পর শ্রীমতী রাধিকার "বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে, যেমন যোগিনী পারা।" নীল নিচোল-পরিহিত রাধিকামূর্ত্তিই বৈষ্ণবসাহিত্যে সুলভ কিন্তু রাঙ্গাবাস (গেরুয়া) পরা রাধিকা এখানে সন্ন্যাসিনীর মত, তাহার পরিধান গেরুয়া ও আহারে বিরতি—(উপবাস আচরণ) এবং মেঘ দেখিলেই কৃষ্ণভ্রমে করজোড়ে সকাতর অনুনয়, এক দৃষ্টে ময়ূর ময়ূরীর কণ্ঠ দেখিয়া বর্ণমাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া পড়া*, এ সকল বৈষ্ণব সাধুভক্তদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। রাধিকা যখন শ্রীহরির চরণে আত্মসমর্পণ করিতেছেন, তখন তিনি ভক্তি ও প্রেমের নির্ম্মল সলিলে অবগাহন করিয়া পাপপুণ্য ভুলিয়া গিয়াছেন, সেখানে অপর জ্ঞানলুপ্ত, কেবল বাঞ্ছিতের পদে লীন হওয়ার আনন্দ বর্ত্তমান। "সতী কি অসতী, তোমাতে বিদিত, ভালমন্দ নাহি জানি, কহে চণ্ডীদাস পাপপুণ্য মম, তোমার চরণ খানি।" ভজনপূজনের কথা সাধারণ প্রেম-সাহিত্যে সুলভ নহে—

নিম্নোদ্ধৃত পদে তাহা আছে,

"অখিলের নাথ, তুমি হে কালিয়া যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী, হাম অতি দীনা না জানি ভজন পূজন॥"

এই ভাবের পদগুলি যেন নৈবেদ্য ও তুলসীপত্রের গন্ধ-পূতঃ বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ চণ্ডীদাস বর্ণিত রাধিকার প্রেম বিহ্বলতা এক আশ্চর্য্য প্রকারের, অপরের মুখে নায়কের নাম শুনিয়া তাহার পদ ধরিয়া ভূতলে লুটাইয়া পড়ার দৃষ্টান্ত সাধারণ সাহিত্যে কোথায়? "যে করে কানুর নাম তার ধরে পায়। পায় ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়। সোণার পুতলি যেন ভূতলে লোটায়।" এই স্বর্ণ পুত্তলি প্রেমিকের নয়ন পুত্তলি কোন সুন্দরীর ছবি বলিয়া মনে করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। যিনি ধূলিময় প্রাঙ্গণ ভূমিতে ইতর জাতির মুখেও হরিনাম শুনিলে অবলুণ্ঠিত হইয়া তাহার পদে পড়িতেন, সেই স্বর্ণ পুত্তলি গৌরহরির ছবিই এই সব পদে সূচিত হইতেছে। চণ্ডীদাসের পদে সর্ব্বত্রই অনাবিল ধর্ম্মের কথা, ইহা কাহাকেও স্বীকার করিতে আমরা বলি না, কিন্তু অনেক স্থলে তাঁহার পদাবলী সাধারণ প্রেম দ্বারা বুঝিতে কষ্ট হয়, ঐশ্বরীক প্রেম দ্বারা তাহার ব্যাখ্যা করা সহজ হয়: বাস্তব জগতের কথা যেন ক্ষণে ক্ষণে অবাস্তব জগত ছুঁইতে সক্ষম হইয়াছে, উহা মানবীয় প্রেমের গীতি গাহিতে গাহিতে যেন সহসা সুর চড়াইয়া কি এক অজ্ঞাত সুন্দর রাগিণী ধরিয়াছে, তাহা ভক্ত ও সাধকগণের কর্ণে পৌঁছিতে সক্ষম হইয়াছে। রাধার

* "আকুল নয়নে, চাহে মেঘ পানে, কি কহে দুহাত তুলি।"
"এক দিঠি করি ময়ূর ময়ূরী কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।" চণ্ডীদাস।

† "মাধবেন্দ্র পুরীর কথা অকথ্য কথন।
মেঘ দরশন মাত্রে হয় অচেতন॥" চৈতন্য ভাগবত।

কথা কহিতে যাইয়া চণ্ডী বলিয়াছেন "তুমি সে ধর্ম্ম, তুমি সে কর্ম্ম, তুমি উপাসনা-রস।" সেই ব্রাহ্মণ্য মহিমার প্রবল ও তেজস্বী অহঙ্কারের যুগে দূরপল্লী নান্নুরের এক ক্ষুদ্র দেবমন্দিরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ যে দিন রজকিনীর উদ্দেশে "তুমি বেদমাতা গায়ত্রী," "তুমি হও পিতৃমাতৃ তুমি বেদবাসিনী হরের ঘরণী" প্রভৃতি ভাবের স্তোত্র পাঠ করিয়া তাহাকে তেত্রিশ কোটি দেবতার সকলের উর্দ্ধে দাঁড় করাইয়াছিলেন, মনে হয় যেন সেদিন নির্ম্মল প্রগাঢ়তা বলে তাঁহার "নিকষিত হেম" তুল্য রজকিনী-প্রেম ঐশ্বরীয় প্রেমের শক্তিলাভ করিয়া পার্থিব সমস্ত সংস্কারের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন তেজস্বীতা লাভ করিতে পারিয়াছিল, সে প্রেমের কথা পুরোহিত মুখ-নিঃসৃত স্তোত্রের মত হইয়াও আবার সাধারণ মনুষ্যের চিত্তে সকরুণ আবেদন জানাইয়া সহানুভূতি লাভ করিতে তুল্যরূপে সক্ষম :—

"তোমা বিনা মোর, সকল আঁধার
দেখিলে জুড়ায় আঁখি।
যে দিনে না দেখি, ও চাঁদ বদন
মরমে মরিয়া থাকি॥"

প্রভৃতি পদে সুকোমল চিত্তের সৌন্দর্য্য-পিপাসা অতি সকাতর দৈন্যে প্রকাশিত হইয়াছে। চণ্ডীদাস জানিয়াছিলেন, এই প্রেমের উপমা চলে না। তিনি একদিকে রজকিনীকে দেবদেবীর মন্দিরের সর্ব্বোচ্চ বেদীতে উপবিষ্ট করাইয়া লৌকিক ধর্ম্ম-সংস্কার হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন, অপরদিকে নির্ম্মল আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ আবেগের বলে প্রেমের স্বরূপ যেন চাক্ষুষ করিয়া আলঙ্কারিকগণের অবিসম্বাদে গৃহীত বহুযুগের প্রতিষ্ঠিত উপমাগুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় প্রেম-আদর্শের উপমাবিহীন অনাড়ম্বর অথচ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিত্ব দেখাইয়াছেন :—"ভানু কমলে কলি সেহ হেন নহে। হিমে কমল মরে ভানু সুখে রহে॥ চাতক জল দে কহি, সে নহে তুলনা। সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা॥ কুসুমে মধুপ কহি সেহ নহে তুল। না আইলে ভ্রমর, আপনি না যায় ফুল॥ কি ছার চকোর চাঁদ দুঁহু সম নহে। ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে॥" তাঁহার অল্প বিদ্যা লইয়া তিনি কি সাহসে আলঙ্কারিকগণের বহু যত্নের উপমা সূত্রগুলি কাটিয়া দিলেন? বস্তুতঃ কি জীবনে কি সাহিত্যে কোথায়ও চণ্ডীদাস সংস্কারের বশীভূত নহেন, তাঁহার সরল কথাগুলি প্রাণের গূঢ় তন্ত্রী স্পর্শ করিয়া সমস্ত সংস্কারের উচ্ছেদ গীতিতে বাজিয়া উঠে। এই পৃথিবীতে তিনি ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান প্রেম লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, এবং সেই ভাগ্যে "পাগলাচণ্ডী" পুঁথিগত ও সমাজগত কুনীতিগুলি বিদলিত করিয়া অপূর্ব্ব বিদ্বান ও সামাজিক পদে বাচ্য হইবার যোগ্য হইয়াছেন। তাই চণ্ডীদাস সাধারণ প্রেমিক ও প্রেমিকার মনোরঞ্জন করিতে সক্ষম অথচ তাঁহার পদে এরূপ ঐশ্বরীক প্রেমের বিকাশ আছে যে সাধুভক্তগণ গীতার শ্লোকের সঙ্গে তাহা একসূত্রে গাঁথিয়া অধ্যাত্ম-সাহিত্যে স্থান দিতে পারেন। দুঃখের বিষয় কষ্টকল্পনাশীল অধ্যাপকগণের চেষ্টায় "অধ্যাত্ম" কথাটি আজকাল কুহকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, আমরা অধ্যাত্ম প্রেম ও মানবীয় প্রেম এই দুইটি ভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করিলেও এতদুভয়ে কোন সম্পর্ক নাই, এরূপ সূচনা করিতেছি না, এ দুইই কি এক দ্রব্য নহে? মানুষীয় প্রেম হইতে স্বার্থের স্তর ঘুচিয়া গেলে, নির্ভর ও আত্মসমর্পণের ভাব দ্বারা উহা পরিশোধিত হইলে সেই পরম প্রীতিতে আত্ম নিমজ্জনই অধ্যাত্ম সংজ্ঞায় অভিহিত হইতে পারে। চণ্ডীদাসের কবিতা তাই বাস্তব ও অবাস্তব জগতে উভয়েরই কবিতা,—উহার পাঠক নবযুবক ও সাধুভক্ত; চৈতন্য প্রভু সেইপদ আবৃত্তি করিয়া সুখী হইয়াছেন, এবং আমরাও কি নই?

এই উন্নত প্রেম বিদ্যাপতির 'বিরহ' ও 'সম্ভোগ মিলনে' পাওয়া যায়, তৎপূর্ব্ব-পদাবলীতে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবিত্ব ও সৌন্দর্য্য জ্ঞানের পরিচয় থাকিলেও উহা সাধারণ প্রেম সাহিত্যের উর্দ্ধে উঠিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

চৈতন্যদেবের পরে তাঁহার লীলা মাধুর্য্য বৈষ্ণব পদাবলীতে অভাবনীয় সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দিয়াছে, গৌরলীলা-সূচক পদের কথা আমি বলিতে চাই না, গৌরজীবনাখ্যায়িকাগুলিও এ প্রবন্ধের প্রসঙ্গাধীন নহে. পরবর্ত্তী পদকর্ত্তাগণের বর্ণিত রাধাপ্রেমের বহু বিচিত্র সৌন্দর্য্য চৈতন্যলীলা স্মরণে পরিপুষ্ট হইয়াছে, সে বিষয়ে বৈষ্ণব সাহিত্যজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই সন্দেহ নাই। কৃষ্ণকমলের "রাই উন্মাদিনী" কাব্যের আলোচনা করিলে এই বিষয়টি ভাল করিয়া বোঝা যাইবে।

কৃষ্ণকমল গোস্বামীর বাড়ী নদীয়া জেলার ভাজন ঘাট গ্রামে, কিন্তু তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ ঢাকায় অতিবাহিত

করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বপ্নবিলাস ও রাই উন্মাদিনী যাত্রা এক সময়ে ঢাকাবাসীকে সুরাপায়ীর ন্যায় উন্মত্ত করিয়াছিল! বস্তুতঃ পূর্ব্ববঙ্গে কৃষ্ণকমলের যাত্রা যে প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা কঠিন। পূর্ব্বোক্ত দুই পালা গান শ্রোতাকুলকে আকুল করিয়া ফেলিত, গায়কগণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া গাইত ও শ্রোতাগণ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া শুনিতেন।

রাই উন্মাদিনীতে রাধিকার বিরহ বর্ণিত হইয়াছে, উহা চির-পরিচিত "মাথুর"। কিন্তু বৃন্দাবনের রাধিকার এ নব মূর্ত্তিতে নবদ্বীপের পবিত্রতা প্রতিফলিত হইতেছে, 'নায়িকা' অধ্যায়ে রাধিকাকে স্থান নির্দ্দেশ করিলে অন্যায় করা হইবে, এই অভিনব নির্ম্মল মূর্ত্তি ঐতিহাসিক চিত্র বলিয়া মনে হয়। কুঞ্জকাননে যাইয়া যূথি, জাতির নিকট রাধিকা যুক্তকরে কৃষ্ণতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়া সকরুণ বিলাপ করিতেছেন, তমাল দেখিয়া, উদিত নবমেঘ লাবণ্যে মুগ্ধা হইয়া রোমাঞ্চিত শরীরে কৃষ্ণ দর্শন সুখ ক্ষণিক ভ্রান্তিতে উপভোগ করিতেছেন, কৃষ্ণ-উপভোগ সুখ ভ্রান্তি কি সত্য কোন্ যোগী বলিবেন? বহু কামনাহীন যোগকৃচ্ছ্রের পর লব্ধ সেই পবিত্র চৈতন্য মুহূর্ত্ত স্থায়ী স্বপ্নের মত, যোগীজনও ইহাই ইঙ্গিতে বলিয়াছেন। রাধিকার ক্ষণে ভ্রান্তি, ক্ষণে মূর্চ্ছা, কুসুম গন্ধে কৃষ্ণ-অঙ্গ পরিমল ভ্রান্তি, কুহু-স্বরে বংশীর আমন্ত্রণ বিভ্রম,—মধুময় অথচ উন্মাদকর প্রেমের মোহে জগতকে কৃষ্ণ ভ্রম করিয়া রাধা বিচ্ছেদ কারুণ্যে বিপ্লাবিত হইয়াছেন। সেই অত্যধিক হৃদয়াবেগে একান্ত নিঝুম, বাষ্পাকুল সংবদ্ধ—দৃষ্টি শ্রোতাগণের সম্মুখে এলায়িত কুন্তলা শ্যামানুরাগিনীর মুখে যখন চিত্তবিদারী শোকের কথায় অসংলগ্ন এলান বাক্য গীত হইতে থাকিত, যখন সখিগণ কৃষ্ণ প্রেমিকার মুহুর্মুহু ভ্রান্তির ব্যাকুলিত দর্শনে বিহ্বল হইতেন, তখন শ্রোতার মনে সুছন্দ রাগিণীতে বিরহ যেন চির মূর্ত্তিমতী হইত, এই দৃশ্যের মত সুকোমল ও হৃদয়বিদারক দৃশ্য কেহ কিছু দেখিয়াছেন, বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেন না। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে ইহা দৃষ্টে গৌরাঙ্গ কি অন্য কোন ধর্ম্মের আদর্শ মনে হওয়ার বিষয় কি? সাধারণ প্রেম সাহিত্য দ্বারা এ লীলা আরম্ভ করিলেই ত সর্ব্বসাধারণে ইহার রস উপলব্ধি করিতে পারেন; যতই নিষ্কাম এবং মধুর হউক না কেন, ইহা রূপক স্বীকার করিয়া এ লীলা কুহকাচ্ছন্ন করিবার আবশ্যকতা কি? ধর্ম্ম তত্ত্বের বেদী চাপিয়া আচার্য্যের ভেক না ধরিলে কি রাধা-লীলা ব্যাখ্যাত হইতে পারে না? যাহারা রাই-উন্মাদিনী প্রভৃতি কাব্য সাধারণ প্রেম-সাহিত্যের অন্তর্গত করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহারা কি উহার স্বাদ পাইবেন না?

চৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত্য খণ্ডে চৈতন্যদেবের প্রেমোন্মাদাবস্থা বর্ণিত আছে, দেখা যায় তদবস্থায় তিনি ভাগবতের দশম স্কন্দের ত্রিংশ অধ্যায়ের নবম শ্লোকটি পড়িয়া প্রেমাবেশে বিভোর হইতেছেন, চৈতন্যচরিতামৃত হইতে সেই শ্লোকটির ব্যাখ্যার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"আম্র পনস পিয়াল জাম্ব কোবিদার।
তীর্থবাসী কর পর উপকার॥"
"তুলসি, মালতি, যূথি, মাধবি, মল্লিকে
তোমার প্রিয় কৃষ্ণ আইল তোমার অন্তিকে॥
তুমি সব হও আমার সখীর সমান।
সব রাখ কৃষ্ণোদ্দেশ কহিপরাণ॥"

কৃষ্ণ কমলের উন্মাদিনী রাধিকা কুঞ্জকাননে যাইয়া অশ্রু বিপ্লাবিত চক্ষে বলিতেছেন,

"ওহে তমাল তাল হিমতালধর রসাল সাল শিশংপাহে
তোমরা তীর্থবাসী পরহিত কর
এ বিপদে মোদের পরহিত কর
ওগো মালতি, জাতি কুন্দলতিকে যুথি কনকযুথিকে গো,
ওগো লবঙ্গলতিকে, চপলমতিকে দেখেছ কি যেতে অন্তিকে গো
অবশ্য দেখেছ বল্লভে রাধার
মকরন্দ ছলে বহে অশ্রুধার
সবে দেখে রোমাঞ্চিত, ক'র না বঞ্চিত
নারী হোয়ে নারীজাতিকে॥"

চৈতন্য প্রভু গোবিন্দলীলামৃতের অষ্টম স্বর্গের চতুর্থ শ্লোকের কৃষ্ণরূপ-সূচক পদ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কৃষ্ণকমলের রাধিকা-স্ফুরিত নব-মেঘোদয়ে উতলা হইয়া কৃষ্ণরূপ বিভ্রমে উন্মাদিনীর মত সেই শ্লোকের সুন্দর অনুবাদ আবৃত্তি করিতেছেন, বলা বাহুল্য চৈতন্যচরিতামৃতের সেই ব্যাখ্যার সঙ্গে ও কৃষ্ণকমলের গানের ভাষার সঙ্গে আশ্চর্য্যরূপ ঐক্য বিদ্যমান। চৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্য খণ্ডে রায় রামানন্দের নিকট চৈতন্য প্রভু রাধার কৃষ্ণ-প্রীতি বর্ণনা করিয়া গোবিন্দলীলামৃতের একাদশ

সর্গের দ্বাদশাধিক শত শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন "যাহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা। যার ঠাঁই কলাবিলাস শিখে ব্রজরামা॥ যার সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্ব্বতী। যার পতিব্রতা ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥" কৃষ্ণকমল চন্দ্রার মুখে রাধিকার এইরূপ বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন "যরি যে রাধার রূপ বাঞ্ছে শ্রীপার্ব্বতী। যার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥ যার স্থানে ব্রজযুবতী সংহতি শিক্ষা করে কলাবিলাস আরতি "যে রমণী রমণীর শিরোমণি শ্যামগুণমণির হিয়ার হৈমমণি॥" ইত্যাদি চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য খণ্ডে মহাপ্রভু-মুখোচ্চারিত কৃষ্ণ দর্শন সুখের অন্তরায় স্বরূপ "আনন্দ মদন" উল্লিখিত হইয়াছে, জগন্নাথ বল্লভ নাটকের একটি শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া প্রভু বলিতেছেন "যে কালে স্বপনে, দেখিনু বংশীবদনে, সেই কালে আইসে দুই বৈরী। আনন্দ আর মদন হরি নিল মোর মন, দেখিতে না পাইল নেত্র ভরি।" এই পদের ভাব লইয়া কৃষ্ণকমলের প্রসিদ্ধ গান "কি হেরিব শ্যাম।" রচিত হইয়াছে, "আনন্দ মদন দুই বারি বরিষয়" প্রভৃতি ছত্রে কৃষ্ণকমলের ঋণ অভিব্যক্ত হইবে!

"সূক্ষ্ম তূলা আনি নাসা অগ্রেতে ধরিল। ঈষৎ চলয়ে তূলা দেখি ধৈর্য্য হ'ল।" প্রভৃতি মহাপ্রভু সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে, রাধিকার "আনিয়া কমল তন্তু, নাসাগ্রে ধরিল কিন্তু, দেখা গেল না চলে নিশ্বাস। ধনীর কি হ'ল গো নব ধরাধর হেরি" প্রভৃতি অবস্থা তাহারই অনুকরণ। এই ভাবে পদাবলীর সঙ্গে চৈতন্যলীলার সম্বন্ধে শত শত উদাহরণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতে পারে, কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। যাহারা বৈষ্ণব সাহিত্যে সম্যক অধীত বিদ্য, তাঁহারা পদাবলীর রাধিকা প্রসঙ্গে চৈতন্য দেবকে অপরিহার্য্য ভাবে স্মরণ করিতে বাধ্য হইবেন, এবং তদ্রূপ করিলে যে নির্ম্মলতর প্রীতি উপভোগ করিতে সক্ষম হইবেন, সে সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ নাই। তাদৃশ পাঠকের নিকট পদাবলী এক নূতন শ্রীতে বিভাসিত হইয়া উঠিবে, উহা পড়িতে পড়িতে রাধিকা ছায়ার ন্যায় চক্ষু হইতে অপসারিত হইয়া পড়িবেন ও তৎস্থলে এক উপবাসকৃশ, দীন অথচ পরম সুন্দর ব্রাহ্মণ বালকের মূর্ত্তি হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া পড়িবে, তিনি হরিপ্রেমে আত্মহারা, পাগল, তাঁহার অন্য জ্ঞান নাই, তিনি জগতের স্তরে স্তরে কৃষ্ণ সত্য অনুভব করিয়া হৃদয় বিকাইয়া দিয়াছেন, তাঁহার জীবন এক অতি মধুর অলৌকিক প্রীতির স্বপ্নবৎ, তাঁহার জাগরণ ও চৈতন্য প্রেমানুভূতিতে লীন হইয়া পড়িয়াছে। "মহানদী দেখে তাহা মানয়ে কালিন্দী, মহাপ্রেমবসে প্রভু নাচে পড়ে কাঁদি।" (চৈতন্য চরিতামৃত)

"তমালের বৃক্ষ এক নিকটে দেখিয়া
কৃষ্ণ বলি ধেয়ে গিয়া ধরে জড়াইয়া।"

(গোবিন্দের করচা)

ঈশ্বর প্রেম কি? আমরা তাহা বুঝি না, সাংসারিক প্রেমই আমাদের চক্ষে প্রকৃত কিন্তু ভগবানের প্রেমও যে অনুভূত হইতে পারে, উহার আকর্ষণে মানুষ আত্মহারা হইতে পারে, উহার রসাস্বাদে পরিপ্লাবিত হইলে সে দৃশ্য জগতে অতুলনীয় হয়, ইহা নদীয়ার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বালক জগতকে দেখাইয়া গিয়াছেন। স্ফুরমান হৃদয় উচ্ছ্বাসে তাঁহার প্রেমের যে অধ্যাত্ম সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়াছে, প্রাচীন পদাবলী শত মনোহর গীতে তাহারই প্রতিরূপ জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছে, তাই এ পদাবলী সাহিত্য আমাদের নিকট পুণ্য তীর্থের মত বোধ হয়, ইহাতে যেন ভগবানের পদরজঃ পড়িয়া আছে। কোন্ প্রেমিক জগতের ইতিহাসে ইঙ্গিত ব্যক্তির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সাদৃশ্য অনুসরণ করিয়া বিমূঢ়, মুগ্ধ ও অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে? কোকিলের কুহু, তমালের কৃষ্ণবর্ণত্ব, মেঘের নবমাধুরী দেখিয়া কে কবে সুমধুর প্রেমের উদ্বেলে ধরাবলুণ্ঠিত হইয়াছে? কে এই সৌন্দর্য্য সাগরের প্রত্যেক উর্ম্মিতে সনাতন পুরুষের প্রেম লাভ করিয়া তন্মাধুরী মুগ্ধ হইয়াছে ও পাগল হইয়া সংসারের বাঁধ কাটিয়া প্রীতিতে নিমগ্ন হইয়াছে? "পাগলের মত বেশ শিথিল অম্বর, সর্ব্বাঙ্গে উড়িছে খড়ি ধূলায় ধূসর।" (গোবিন্দের করচা) শচীমায়ের এই পাগল ছেলে অতীন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিয়া মানবপ্রেমে তাঁহার স্থায়ী শ্রেষ্ঠ নিকেতন নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাই পদাবলী এত মধুর উহার অশ্লীলতা ও যমক অলঙ্কারের বিকৃত চাঁদের কলঙ্কের ন্যায়, উহা মহামহিমান্বিত প্রেমের গৌরব পরাভূত করিতে সক্ষম হয় নাই।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (তরুণ বয়সে)।

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

বসন্ত অন্তে।

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রিয়বরেষু

অচির বসন্ত হায় এল—গেল চলে—
নিবে গেল কোকিলের দীপক-পঞ্চম,
ভঙ্গুর কুসুম-শোভা ভেঙ্গে পড়ে ঢলে,
প্রভঞ্জনে পরিণত—উৎপাৎ বিষম—
অলস—পরশ-মধু মলয়ার বায়!
যায় যদি যাক চলে ক্ষণিকের স্নেহ।
অফুরাণ ফুলবীথি কোথা তাহা হায়!
এ যে শুধু ছলনার মরীচিকা গেহ।

যে মদিরা পান তরে প্রাণ তৃষাতুর
কোথা তাহা?—কোথা জ্বলন্ত যৌবনা তব
শোভনা প্রতিভা কবি? বিশাল চিকুর
আবরে প্রকাশে যার তনুর বিভব—
নগ্ন দেহ—কম্প্র বক্ষ—মদির নয়ন—
ঢালুক অশেষ নেশা—পুলক-দহন।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন

প্রত্যুপহার।

(পূর্ব্বোক্ত কবিতা-প্রসঙ্গে রচিত)

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেনের করকমলে উপহৃত।

'অচির বসন্ত হায় এল, গেল চলে,'—
এবার কিছু কি কবি করেছ সঞ্চয়?
ভরেছ কি কল্পনার কনক অঞ্চলে
চঞ্চল-পবন-ক্লিষ্ট শ্যাম কিশলয়,
ক্লান্ত করবীর গুচ্ছ? তপ্ত রৌদ্র হতে
নিয়েছ কি গলাইয়া যৌবনের সুরা
ঢেলেছ কি উচ্ছলিত তব ছন্দঃস্রোতে,
রেখেছ কি করি তারে অনন্ত মধুরা!

এ বসন্তে প্রিয়া তব পূর্ণিমা নিশীথে
নবমল্লিকার মালা জড়াইয়া কেশে,
তোমার আকাঙ্ক্ষা-দীপ্ত অতৃপ্ত আঁখিতে
যে দৃষ্টি হানিয়াছিল একটী নিমেষে,
সে কি রাখ নাই গেঁথে অক্ষয় সঙ্গীতে?
সে কি গেছে পুষ্পচ্যুত সৌরভের দেশে?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বেহালা।

বেহালার নাম শুনিলেই আপনাদের হয়ত বৈষ্ণবদের কথা মনে পড়িবে। আজকাল বৈষ্ণবেরা বেহালা বাজাইয়া গান করে; আগে তাহারা সারিন্দে বাজাইত। কলিকাতা ছাড়িয়া একটু দূরে গেলে এখনও অনেক বৈষ্ণবের হাতে সারিন্দে দেখা যায়।

সারিন্দে বেহালার একজন পূর্ব্বপুরুষ। আদি বৈষ্ণব দেবর্ষি নারদ যে বীণা বাজাইয়া গান করিতেন, তাহা হয় ত আবার সারিন্দেরও কোনরূপ পূর্ব্বপুরুষ ছিল।

মানুষ যখন অসভ্য ছিল, যখন সে কৃষি জানিত না, তীর ধনুকের সাহায্যে আহার সংগ্রহ করিত,—শুনিয়াছি তখন হইতেই সে সঙ্গীতের চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছে। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে উহার ঐ ধনুকের ভিতরেই বেহালার বীজ লুকান থাকা আশ্চর্য্য নহে।

তারকে খুব টান করিয়া তাহাতে টোকা দিলে, টং করিয়া তাহা হইতে একটি বেশ মিষ্ট আওয়াজ বাহির হয়; এই সন্ধানটুকু লইয়া প্রথমে যে বাদ্য যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাই বেহালা বংশের আদি পুরুষ। আজকালকার বেহালা তাহাকে দেখিলে আর পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া চিনিতে পারিবে না।

গাছের তলা, পর্ব্বতের গুহা ইত্যাদি হইতে কুটীর, কুটীর হইতে কোঠাবাড়ী,—এইরূপ করিয়া ক্রমে মানুষের বাসস্থানের রূপান্তর ঘটিয়াছে। প্রথমে সে আশ্রয় মাত্রে সন্তুষ্ট হইত। এখন তাহার আর শুধু আশ্রয়টুকুতেই চলে না। তাহার আলো চাই, হাওয়া চাই; স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, সুবিধা ইত্যাদি সহস্র বিষয়ের ব্যবস্থা চাই; এত করিয়াও আবার সকল সময় তাহার মন উঠে না।

বেহালার সম্বন্ধেও অনেকটা এইরূপ ঘটিয়াছে। ধনুকের টংকার শুনিয়া যে ব্যক্তি সুখানুভব করিয়াছিল, তাহাকে অনেকটা সাদা সিধে লোক বলিতে হইবে। এখনকার মানুষের মনোবৃত্তিগুলি ইহার চাইতে অনেক জটিল হইয়া উঠিয়াছে। ধনুরিরা জুটিয়া কন্‌সার্ট করিলে আজকাল আর অধিক শ্রোতা মিলিবে কিনা সন্দেহ। যন্ত্রের আওয়াজ মিষ্ট হইবে, জোরালো হইবে, তাহাকে বাজাইতে বেশী পরিশ্রম হইবে না; নিতান্ত ভারি না হয়; দেখিতে একটু সুন্দর হওয়াও আবশ্যক;—এখনকার সৌখীন লোককে সন্তুষ্ট করা বড় কঠিন কাজ। মহারাজ মান্ধাতার সময় হইতে এপর্য্যন্ত কত লোকের জীবন এই এক কাজে কাটিয়া গেল, তথাপি এ কাজের শেষ নাই। আর শেষ যে হইবে, তাহার ভরসাও খুব কম।

কথাটা যে অনেক পরিমাণে সত্য তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। বেহালা যন্ত্রের সম্বন্ধে ইহা বিশেষ ভাবে সত্য। একথা বলিবার কারণ এই যে, বেহালা নির্ম্মাণ বিদ্যার চরম উন্নতির সময় প্রায় তিন শত বৎসর যাবৎ গত হইয়াছে। সেই সময়ে যে সকল যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল, তেমন যন্ত্র আর এখন কেহ প্রস্তুত করিতে জানে না। পূর্ব্বে গীর্জায় গানের সঙ্গে বেহালার সঙ্গত হইত। গীর্জায় ব্যবহারের জন্য ভাল ভাল বেহালার প্রয়োজন হওয়াতে, তখন কারিকরদিগের উৎসাহের অভাব ছিল না। সুতরাং তখন এই যন্ত্রের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। গ্যাস্পার্ ডি সাল, আমাতি, স্ত্রাদিবেরি, গুআরিণি প্রভৃতিরা ঐ সময়েরই লোক ছিলেন। ইঁহাদের পসার নিতান্ত মন্দ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। স্ত্রাদিবেরি এই ব্যবসায় করিয়া এত টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন যে, ধনীর তুলনা দিতে হইলে লোকে বলিত "স্ত্রাদিবেরির মতন ধনী"।

সেই এক দিন গিয়াছে। তখন উৎসাহ ছিল, কাজেই উন্নতিও হইয়াছিল। তার পর যখন অর্গ্যান যন্ত্রের আবিষ্কার হইল, তখন হইতেই বেহালার অবনতির সূত্রপাত। ৩০।৪০ জন বাদক নিযুক্ত না করিলে বেহালার সঙ্গত ভাল হয় না; কিন্তু এক জন লোক রাখিলেই অর্গ্যানের সঙ্গত চলে। গীর্জার কর্ত্তৃপক্ষেরা এ কথাটা অতি শীঘ্রই বুঝিয়া লইলেন। ইহাতে অর্গ্যান্ যন্ত্রের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইল বটে, কিন্তু বেহালা তখন হইতেই মুরব্বি হারা হইল। মুরব্বি-হীন ব্যবসায়ে লাভের আশা কম, কাজেই ভাল ভাল কারিগরের আর এ ব্যবসায় করিতে উৎসাহ রহিল না। এর পর অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইল তাহা আমাদের দেশের তাঁতিদের অবস্থা হইতে কতক বুঝিতে পারিবেন।

এ স্থলে একটা কথা বলার দরকার; আর, তাহা শুনিলে হয়ত অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। বেহালা প্রস্তুত করার বিদ্যাটা ষোড়শ শতাব্দীতে যেমন উন্নতি লাভ

করিয়াছিল, বেহালা বাদ্যের তেমন উন্নতি তখন হয় নাই। তখন বেহালা নির্ম্মাণ বিষয়ে অদ্বিতীয় লোক সকল জন্মাইয়াছিলেন, কিন্তু আজকালকার মতন ভাল বেহালা-বাদক তখন ছিলেন না। আজকাল বেহালা বাদ্যের উন্নতি খুবই হইয়াছে, কিন্তু বেহালা নির্ম্মাণের বিদ্যাটি লোপ পাইয়াছে।

অদ্ভুত হইলেও কথাটা সত্য। সাধারণ লোকের ভিতরে সঙ্গীতের চর্চ্চা যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেই পরিমাণে সঙ্গীত চর্চ্চার সুবিধাও বাড়িয়াছে—সঙ্গীত বিদ্যারও উন্নতি হইয়াছে। এখন লোকে বেহালার মূল্য বুঝে, ভাল বেহালা পাইলে তাহা ক্রয় করিবার জন্য ব্যস্ত হয়। কিন্তু তেমন ভাল বেহালা এখন আর প্রস্তুত না হওয়ায় সকলের অভিলাষ পূর্ণ হইতে পায় না। সাবেক কারিকরদের বেহালাগুলি এখন এত দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে যে তাহার ওজনে সোণা মাপিয়া দিলেও তাহার দাম হয় না। স্ত্রাদিবেরি অথবা গুআরিণির হাতের একখানি বেহালার বাজার দর এখন কুড়ি পঁচিশ হাজার টাকা হইবে, এত টাকা দিয়া একখানি বেহালা কিনিবার শক্তি অল্প লোকেরই আছে।

আর সেই বেহালাখানি কি রকমের? তাহার বয়ঃক্রম তিনশত বৎসরের অধিক। তাহার দাঁত থাকিলে তাহা কত আগেই পড়িয়া যাইত; চামড়া থাকিলে কবে গলিয়া যাইত। যে সের খানেক কাঠ তাহাতে আছে, তাহা শুকাইয়া কিরূপ হইয়া আছে, বুঝিতেই পারেন। কতবার তাহা ফাটিয়াছে, কতবার ভাঙ্গিয়াছে, তথাপি তাহাকে ফেলিয়া দিবার সময় হয় নাই। বরং তাহার দাম ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে! এখন যে বেহালাখানি দশ হাজার টাকায় বিক্রয় হয়, দশ বৎসর পরে তাহারই দাম বারো হাজার টাকা হইবে। বৃদ্ধকালে ক্রোরপতির একমাত্র উত্তরাধিকারী পুত্র জন্মিলে তাহার যেমন আদর হয়, ঐ জীর্ণশীর্ণ শততালীযুক্ত পুরাতন বেহালাখানির তেমনি আদর। এক রাজা আর এক রাজার হাতে সন্তর্পনে তাহা তুলিয়া দিবার সময় হয়ত বলিবেন "আহা, ভাই, যত্ন করিয়া রাখিয়ো; এমন জিনিসটি আর হইবে না।"

"ওল্‌ড্ মাষ্টার"দের হাতের এক একখানি বেহালার কিরূপ আদর, দুটি গল্প বলিলে তাহা বুঝিতে পারিবেন—

পুরাতন বেহালা বিষয়ে তারিজিয়ো একজন অতিশয় প্রামাণ্য এবং বিশেষজ্ঞ লোক ছিলেন। একবার তিনি জাহাজে চড়িয়া কোথাও যাইতেছেন; সঙ্গে গুআরিণির (নাকি গ্যাস্পার ডি সালর, ভুলিয়া গিয়াছি) হাতের একখানি 'চেলো' (বড় আকারের বেহালা)। বিস্কে উপসাগরে আসিয়া জাহাজ ঝড়ে পড়িয়াছে; রক্ষার আশা অতি কম; আরোহীরা আপন আপন প্রাণ বাঁচাইবার জন্য ব্যাকুল। ইহার মধ্যে তারিজিয়ো করিয়াছেন কি,—জাহাজের একটু উচু এবং ফাকা একটা জায়গায় দাঁড়াইয়া দুহাতে প্রাণপণে চেলোখানিকে উচু করিয়া ধরিয়া রহিয়াছেন! ডুবিতে হইলে নিজে আগে ডুবিবেন, কিন্তু বেহালাখানিকে বাঁচান চাই! ঈশ্বরেচ্ছায়, সে যাত্রা ঝড়ের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া তারিজিয়ো দেশে ফিরিলেন। তাঁহার ঝড়ে পড়ার সংবাদ পাইয়া বন্ধুরা যারপর নাই ব্যস্তভাবে তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। "কি হে! বড় নাকি ঝড়ে পড়িয়াছিলে?" "আর, ভাই, সে কথা ব'লো না;—বেহালাটা আর একটু হইলে গিয়াছিল আর কি!"

একজন ভারি সৌখীন লোকের একটি "পুরাতন" বেহালা ছিল। ঐ বেহালার কোন স্থান মেরামৎ করাইবার দরকার হওয়ায় তিনি এক প্রসিদ্ধ কারিকরের দোকানে গেলেন। কারিকর বলিল যে, "বেহালাখানি না খুলিলে ও দোষ মেরামৎ হইবে না।" কিন্তু সৌখীন ব্যক্তি কিছুতেই বেহালা খুলিতে দিতে রাজি হইলেন না। ইহাতে কারিকর বলিল "তবে আমার দ্বারা এ কাজ হইবে না; আপনি অন্যত্র দেখুন।" তখন আর কি করা যায়, অগত্যা তিনি বলিলেন "আচ্ছা, খোল; কিন্তু আমি সামনে থাকিব।" কাজেই বেহালা খুলিবার সময় তাঁহাকে একখানি চেয়ার দেওয়া হইল। পুত্রের শরীরে সাংঘাতিক অপারেশন্ হইতে দেখিলে পিতার মুখ যেমন হয়, তেমনি মুখখানি করিয়া তিনি চেয়ারে বসিয়া বেহালা খোলা দেখিতে লাগিলেন। বেহালার কোন স্থান ফাটিয়াছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে কারিকরেরা বেহালায় টোকা মারিয়া দেখে। কিন্তু এ বেহালাখানিতে টোকা মারিবামাত্রই তাহার মালিক "উঃ" করিয়া উঠিলেন! টোকার পর টোকা পড়ে, আর তিনি বলেন "উঃ"! তারপর একখানি ছুরির সাহায্যে কারিকর বেহালার যোড় খুলিতে আরম্ভ করিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, তখন সৌখীন ব্যক্তি

কোন গোলমাল করিলেন না। খোলা শেষ হইলে কারিকর তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিল "এইত হইয়া গেল মহাশয়" কিন্তু তাহার কথা শোনে কে?— সৌখীন ব্যক্তি ততক্ষণে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন।

জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যে বেহালার এত আদর, সে বেহালা বাজে কেমন? দুঃখের বিষয় তাহা স্বকর্ণে শুনিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা ছড়া কাটিতে আরম্ভ করেন—তাঁহাদের মুখে যেন লাল পড়ে। তেমন ভাল একখানি পুরাতন বেহালা সুর বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিলে তাহা নাকি হাওয়ায় বাজিতে দেখা গিয়াছে!

এই সকল পুরাতন বেহালার মতন বেহালা পুনরায় প্রস্তুত হওয়ার পক্ষে অনেক বিঘ্ন আছে।

প্রথমতঃ এই বেহালাগুলি যে এত পুরাতন, তাহাই একটা বিঘ্ন। কারণ এখন যত ভাল বেহালাই প্রস্তুত করুন, তাহা নূতন বেহালাই হইবে। নূতন বেহালা কখনই পুরাতনের ন্যায় ভাল বাজে না। বেহালা পুরাতন হইলে তাহার কাঠ খুব শুষ্ক হয়, ইহাই যে ইহার বিশেষ কারণ, তাহা নহে। অনেক দিন ধরিয়া সুর লয়ে বাজিতে বাজিতে যন্ত্রের কাঠের পরমাণুগুলি সুরের পক্ষে কেমন একটা বিশেষ সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া উঠে। নদীর তলার বালিতে কেমন ঢেউয়ের দাগ পড়ে, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা আমার কথা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় বিঘ্ন এই যে, আগে যেমন ভাল কাঠ পাওয়া যাইত, এখন আর তেমন ভাল কাঠ পাওয়া যায় না। যে সকল বনে ভাল ভাল গাছ জন্মাইত তথাকার প্রাচীন পরিপক্ক গাছগুলিকে অনেক দিন যাবৎ কাটিয়া শেষ করিয়া ফেলা হইয়াছে। এখনকার গাছগুলি আর তেমন বড় হইবার অবসর পায় না—তাহার আগেই তাহাদিগকে কাটিয়া ফেলে। স্ত্রাদিবেরি প্রভৃতির সময়েও ভাল কাঠ দুষ্প্রাপ্য ছিল বলিয়া বোধ হয়। কারণ, দেখা যায় যে তাঁহারা এক খণ্ড ভাল কাঠ পাইলে নিতান্ত কৃপণতার সহিত তাহা ব্যবহার করিতেন। এক ইঞ্চি পরিমাণ কাঠও তাঁহারা অপব্যয় করিতেন না। কাঠের কোন্ গুণে তাঁহারা এত মুগ্ধ হইতেন, তাহা জানি না। কিন্তু একখানি কাঠের টুকরা মনোমত হইলে, তাহা ফাটা হউক, ভাঙ্গা হউক, যোড়া তালি দিয়া তাহাকেই ব্যবহার করিতেন। সে তালি কি যেমন তেমন তালি? এই তিন শত বৎসর পরেও অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত তাহার যোড় ধরা যায় না। সাধারণ চক্ষে নিখুঁত এত কাঠ পৃথিবীতে থাকিতে কেন যে তাঁহারা ছিদ্রযুক্ত এক এক খণ্ড কাঠের এত পক্ষপাতী হইতেন, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

তারপর মস্ত কথা এই যে, বেহালা নির্ম্মাণ বিদ্যার আচার্য্যগণ চলিয়া গিয়াছেন; আর যাইবার সময় সেই বিদ্যাটিকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। পুরাতন বেহালা কেন এত ভাল, এ কথার সম্পূর্ণ উত্তর এখন কেহ দিতে পারেন না।

তখনকার কাঠ ভাল ছিল, তাহা হইতে পারে; কিন্তু, তেমন ভাল কাঠ এখন পাওয়া গেলেই তাহা চিনিয়া লইবে কে? পুরাতন কারিকরেরা অনেক দিনের পথ হাঁটিয়া ভাল কাঠের সন্ধানে যাইতেন। সেই কাঠকে নানারূপে পরীক্ষা করিয়া (তাহার স্বাদ পর্য্যন্ত নাকি পরীক্ষা করা হইত) তবে তাহা মনোনীত করিতেন।

পুরাতন কারিকরেরা বেহালায় যে রং মাখিতেন, তাহার নাকি বিশেষ গুণ ছিল। কিন্তু সে বার্ণিশ এখন কেহ প্রস্তুত করিতে পারে না। বেহালার কাঠকে চাঁছিবারও বিশেষ হিসাব ছিল। কাঠ সকল জায়গায় সমান পুরু নহে অথচ ঠিক কিরূপ হিসাবে সরু মোটা করিতে হয় তাহার পরিষ্কার জ্ঞান এখনকার লোকের নাই। যন্ত্রের গঠনেরও প্রকার ভেদ ছিল। প্রত্যেক কারিকরের বেহালার এক এক বিশেষরূপ গঠন। সমজদারেরা সেই গঠন দেখিয়া যন্ত্রের নির্ম্মাতাকে এত সূক্ষ্ম ভাবে চিনিতে পারেন যে নকল যন্ত্র দিয়া তাঁহাদিগকে ঠকাইবার সাধ্য নাই। প্রত্যেক কারিকরের যন্ত্রের আওয়াজের এক একটা বিশেষত্ব আছে। স্ত্রাদিবেরিতে মাধুর্য্য, গুআরিণিতে গাম্ভীর্য্য ইত্যাদি সকল কারিকরেরই এক একটা বিশেষ গুণ দেখা যায়। আর ইহাও স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তাঁহারা ঐ সকল গুণবিশিষ্ট করিয়া যন্ত্র প্রস্তুত করিবার উপায় বিশেষ ভাবে জানিতেন। এখনকার লোকেরা "মাছিধরা" নকল নবীশের ন্যায় তাঁহাদের যন্ত্র নকল করে, কিন্তু তাহাতে সে সকল গুণ বর্ত্তাইতে পারে না।

ইউরোপীয় কারিকরদিগের হাতেই বেহালার বর্ত্তমান্

উন্নতি হইয়াছে। বেহালা আমাদের দেশীয় যন্ত্র, ইউরোপীয়েরা তাহা নকল করিয়া লইয়াছেন, এই কথাটার উপরে এক এক জনকে বড়ই ঝোঁক দিতে দেখা যায়। কেহ কেহ এমনও বলিয়াছেন যে সংস্কৃত "বাহুলীন" শব্দ হইতে "ভায়ালিন্" শব্দের উৎপত্তি। সাহেবের মুখে "বাহুলীন" শব্দ পরিষ্কার বাহির না হওয়াতে তাহারা তাহাকে মোচড়াইয়া "ভায়লিন্" করিয়াছে। আমরা আবার এই প্রাচীন তত্ত্বটুকু ভুলিয়া গিয়া সেই মোচড়ের উপর আর এক পাক দিয়া আমাদের পৈতৃক পুরাতন বাহুলীন্ যন্ত্রটিকেই এখন "বেহালা" বলিতেছি!

বেহালা প্রথমে এ দেশে হইয়াছিল, এ কথা এই হিসাবে সত্য যে, আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই এমন কয়েকটি তাঁতের এবং তারের যন্ত্র আছে, যাহা ছড়ি দ্বারা বাজান হয়। এই সকল যন্ত্রের ক্রমিক উন্নতি হইয়াই যে শেষে বেহালার সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা সহজেই প্রমাণ করা যায়। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা যেন মনে না করা হয় যে বেহালার ন্যায় বিজ্ঞানসম্মত কোন যন্ত্র আমাদের দেশে কোন কালে ছিল। মনে করুন, যখন রেলগাড়ীর কথা মানুষের মাথায় আদবেই আসে নাই, তখন হইতেই এ দেশের লোকেরা এক্কা চড়িয়া আসিতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া যদি কেহ বলেন যে রেলগাড়ী এদেশেই পূর্ব্বে হইয়াছিল, সাহেবেরা তাহা নকল করিয়া লইয়াছে, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় তাঁহার কথার অনেকখানি বাদ দিয়া গ্রহণ করিব। রেলগাড়ীতে আর এক্কাতে যত তফাৎ, বেহালায় আর সারিন্দে সারঙ্গী ইত্যাদি যন্ত্রে ঠিক ততটা না হউক, অনেকটা সেইরূপ তফাৎ।

তারকে খুব টান করিয়া তাহাতে টোকা দিলে মিষ্ট আওয়াজ বাহির হয়, কিন্তু সেই আওয়াজের ভিতর অনেক ত্রুটি থাকে। আওয়াজের মিষ্টতাকে বাড়ান, আর তাহার ত্রুটি সকলকে কমান, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাজাইবার সুবিধা, যন্ত্রের সৌন্দর্য্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করা—ইত্যাদি বিষয়ক চেষ্টার ফলেই যন্ত্র উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করে।

শুধু তারের আওয়াজ নিতান্ত নিস্তেজ; সুতরাং তাহাকে জোরালো করিবার চেষ্টাই হয় ত প্রথমে হইয়াছিল। তারকে কাঠের সংস্রবে আনিলে তাহার আওয়াজ বাড়ে; সেই কাঠখানি ফাঁপা হইলে তাহা আরো বাড়ে—এইরূপে ক্রমে যন্ত্রের একটি খোল হইল। সেই খোলের জন্য কিরূপ কাঠ ভাল? খোলটির কিরূপ আকৃতি হইবে? তাহাকে কত বড় করিব? কাঠ খুঁড়িয়া তাহাকে কতখানি পাতলা করা চাই? ইত্যাদি প্রশ্ন ক্রমে উঠিয়া মীমাংসিত হইয়াছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে তারের আওয়াজকে মিষ্ট করিবার চেষ্টাও চলিয়াছে। খোলেতে চামড়ার ছাউনি দেওয়া, তরবের তার ব্যবহার করা, ইত্যাদি সকল বিষয়ের পরীক্ষার পর হয় ত দেখা গেল যে শুধু খোলটি বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রস্তুত করিতে পারিলে এক সঙ্গে সকল বিষয়েরই ব্যবস্থা হয়। যখন এই কথাটি পরিষ্কার বুঝা গিয়াছিল, সেই সময় হইতেই প্রকৃত পক্ষে বেহালা নির্ম্মাণের সূত্রপাত বলিতে হইবে।

শেষে একটা কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন কালে আমাদের দেশে বীণা যন্ত্রেরই বিশেষ প্রাধান্য ছিল। এই যন্ত্রের খোলের প্রধান উপকরণ লাউ। অতি উপাদেয় জিনিস, সন্দেহ নাই! চিংড়ি মাছের সঙ্গে খাইতে যেমন, যন্ত্রে পরাইয়া বাজাইতেও তেমনি। একটি গাছ পুতিলে অনেক দিনের পরিপাটি আহার এবং অনেকগুলি বীন্ সেতার আর তাম্বুরার খোলের ব্যবস্থা এক সঙ্গেই হয়। কাঠ খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না, মেহন্নত করিয়া তাহা খুঁড়িতে হয় না; খানিকটা গোবর দিয়া শাঁসটাকে পচাইয়া ফেলিলেই ল্যাঠা চুকিয়া যায়। এমন সুবিধা পাইয়া যে কারিকরেরা কাঠের খোল প্রস্তুত করা এক প্রকার ছাড়িয়া দিবে তাহা বিচিত্র কি? কিন্তু ইহাতে একটু বিশেষ অনিষ্ট এই হইয়াছে যে, কাঠের খোল প্রস্তুত করার বিদ্যাটা আমাদের দেশে উচিত আদর পায় নাই।

কাঠের খোল এ দেশে একেবারে হয় না, তাহা নহে। কিন্তু যাহা হয়, তাহার মধ্যে আবার এক বৃহৎ উপসর্গ জুটিয়াছে। খোলের উপরে চামড়ার ছাউনি দিলে আওয়াজ একটু ভাল হয়। সুতরাং কাঠের যে খোল বিশিষ্ট যন্ত্র প্রস্তুত করিতে হইলেই তাহাতে চামড়ার ছাউনি দেওয়া এ দেশের রীতি।

আসল কথা, যাহাতে বেশী ভাবিতে না হয়: স্বাভাবিক লাউ আর চামড়া উপস্থিত থাকিতে, কে এত পরিশ্রম করিয়া কাঠ খুঁড়িতে যায়!

এই দুটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার কারণ এখন বলি। বেহালার প্রাণ তাহার ঐ কাঠের খোলটি।

সেই খোলটি প্রস্তুত করিতে পদে পদে এত সূক্ষ্ম হিসাবের প্রয়োজন যে, সাধারণ লোকে তাহার ধারণাই করিতে পারে না। যে দেশের লোক লাউ আর চামড়া দিয়া হিসাবের কাজ চালাইতে চাহে, তাহারা বেহালার সৃষ্টি করিয়াছিল, একথা মানিতে হইলে ইহাও মানিতে হয় যে, এক্কার কারিকর রেলগাড়ী আবিষ্কার করিয়াছিল।

প্রণয়ী যুগল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একদিন শরৎকালের অপরাহ্ণে ইদর পর্ব্বতের পাদদেশবাহিনী বক্রগামিনী স্বচ্ছকায়া স্রোতস্বিনী শুভ্রমতীর তীরে এক প্রাচীন শিব মন্দিরের প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া একজন যুবক ও একটি যুবতী আলাপ করিতেছিল।

যুবক রাজপুত, রণবেশধারী; যুবতী ভীল কুমারী, কিন্তু সুন্দরী।

যুবক বলিল, "ময়না, তুমি আমার প্রতি এত বিরক্ত কেন বুঝিতে পারি না, কেন তুমি পুনঃ পুনঃ আমার অনুরোধ এরূপভাবে প্রত্যাখ্যান করিতেছ? আমার হৃদয়ে কি প্রেম নাই, আমি কি তোমার ভালবাসার যোগ্য নহি?"

ময়না বলিল, "রাজপুত, তুমি আমাকে ভুলিয়া যাও, আমি তোমার উপযুক্ত নহি, ময়না রাজপুতের উপপত্নী হইবে না; আমি যাহা আছি, তাহাই থাকিতে দাও।"

যুবক—"কেন ময়না, আমি ত তোমাকে বিবাহ করিতে পারি, রাজপুত পুরোহিত আমাদের বিবাহ দিবেন।"

ময়না—"না, ভীল কখন রাজপুত হইতে পারিবে না; তুমি আর আমার সঙ্গে দেখা করিয়ো না।"

যুবক—"আমি ভীল না হইয়া রাজপুত হইয়াছি বলিয়া কি আমার উপর এ অবজ্ঞা, ময়না? তোমার কি কোন ভীল প্রণয়ী আছে?"

ময়না নিরুত্তর।

যুবক—"বুঝিয়াছি ময়না, তুমি ভীল প্রণয়ী পাইয়াছ, জানিনা বন্যভীল রাজপুত অপেক্ষা বেশী ভালবাসিতে পারে কি না! কে সেই সৌভাগ্যবান্ ভীলযুবক?"

ময়না যুবকের মুখের উপর সরল দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিল, কোন উত্তর করিল না।

যুবক পুনর্ব্বার বলিল, "বল ময়না সে কে, আমি তাহার কোন ক্ষতি করিব না।"

ময়না এবার কথা কহিল। বলিল, "সে আমার বাবার বাগানের মালী নাথু, সে বাবার মেষ চরায়, ক্ষেত চষে, বাগানের মালীগিরি করে। নাথু আমাকে তাহার বুকের পাঁজরার মত মনে করে, নাথু ছাড়া আমি কাহারো হইতে পারি না।"

যুবক এবার অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল, "ময়না, তোমার উপযুক্ত ভালবাসার পাত্র পাইয়াছ, একটা বাগানের মালী শেষে তোমার ভালবাসা লাভ করিল, কি ঘৃণা!"

ময়না বলিল, "আমি ত বলিয়াছি, রাজপুত্নী নহি! আমার যাহা আছে তাহাই ভাল।"

যুবক বলিল "কিন্তু আমি রাজপুত, দেখিব ভীল কেমন করিয়া আমার প্রণয় পাত্রীকে বিবাহ করে। সকল ভীল একদিকে হইলেও আমি তোমাকে ত্যাগ করিব না, ইচ্ছায় না হয় অনিচ্ছায় তুমি আমাকে বিবাহ করিবে।"

"ভীলরমণী ভালবাসিয়া মরিতে পারে, ভাল না বাসিয়া বিবাহ করিতে পারে না।" বলিয়া দর্পিতা ময়না তাহার ললিত দেহের মধুর ভঙ্গিতে সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

সেই মন্দির তলে প্রণয়াহত, ব্যথিত, ক্রুদ্ধ, রাজপুত যুবক নদীর দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া একাকী দাঁড়াইয়া রহিল। সুবর্ণ কিরণে গগন প্লাবিত করিয়া তপনদেব গিরি অন্তরালে অদৃশ্য হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ময়নার বাপ সামো ভীল ভীলেদের মধ্যে বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ; পূর্ব্বে যে মন্দিরের কথা বলিয়াছি তাহার অদূরেই সামোর ঘর। ঘরে যখন কোন কাজ না থাকিত, ময়না তখনই দুদণ্ড এই মন্দিরে আসিয়া বসিত, এই মন্দিরেই তাহার সর্ব্ব প্রথম রাজপুত যুবকের সহিত সাক্ষাৎ হয়।

সামোর ঘর পাহাড়ের উপর, পত্রকুটীর, কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। উপরে যে দিনের কথা বলিয়াছি তাহার পরদিন প্রভাতে ময়না একটা ঝরণা হইতে এক কলসী জল মাথায় লইয়া আসিতেছে, এমন সময় সামোর কুটীরের সন্নিকটবর্ত্তী তমাল তলায় বসিয়া একটা লোক জ্বালানী কাঠ কাটিতে কাটিতে বলিল—"ময়না শোন্।"

ময়না একবার দাঁড়াইল, মৃদু হাসিয়া দক্ষিণ হস্ত কানের কাছে আনিয়া বলিল, "বল শুনি, কান আছে।"

এ লোকটাই নাথু।

নাথু বলিল "অনেক কথা, জল রাখিয়া আয়।"—নাথু কাঠ কাটিতে মন দিল।

শীঘ্রই ময়না ফিরিয়া আসিয়া তমাল তলে নাথুর কাছে একখানি কাঠের উপর বসিল। নাথু কাঠ রাখিয়া তাহার পাশে আসিয়া বসিল, মৃদু হাসিয়া বলিল,—"কাল মন্দিরে কার সঙ্গে কথা হইতেছিল, কোন রাজপুত হবে, কি বলিতেছিল?"

ময়না বলিল, "তুমি কোথা হইতে দেখিলে? আমি ত তোমাকে দেখিতে পাই নাই!"

নাথু—"আমি তখন মেষ চরাইয়া উপরের বাঁক দিয়া আসিতেছিলাম!—কে সে, কি বলিল?"

ময়না বলিল—"সে একজন রাজপুত, বলে আমাকে ভালবাসে, আমাকে বিবাহ করিতে চায়, অনেক দিন হইতে বলিতেছে।

"তোকে বিবাহ করিতে চায়! আমার সর্ব্বস্ব চুরী করিবে? এতদিন এ কথা বলিস নাই কেন ময়না, তোর কি মন হইয়াছে?"—কাতর স্বরে নাথু এই কথা বলিল।

ময়না নাথুর কাঁধে মাথা রাখিয়া বলিল, "তুমি কি পাগল? আমি তাহাকে বিবাহ করিব না, আমি রাজপুতের উপপত্নী হইব না; নাথু, আমি কি তোমাকে ভুলিতে পারি? তাহাকে আমি আমার মনের কথা জানাইয়াছি।"

"কিন্তু সে বড় সুন্দর, যে স্ত্রীলোক তাহাকে দেখিবে সেই ভালবাসিবে।"

ময়না বলিল—"এ তোমার বড় ভুল বিশ্বাস নাথু, সে যতই সুন্দর হোক, আমি তোমারই।"

"আমি কাল যখন মেষ চরাইয়া আসি, তখন তোকে রাজপুতের সঙ্গে কথা কহিতে দেখিয়া শালগাছের পাশে দাঁড়াইয়া কতক্ষণ দেখিলাম, কিন্তু তোর কাছে যাইতে সাহস হইল না, তোর কথা শুনিতেও ভরসা হয় নাই, যদি শুনিতাম তুই তাকে ভালবাসিস্!"

ময়না হাসিয়া বলিল, "আমি তাকে ভালবাসি না,—এখন ভয় গিয়াছে ত?"

নাথু বলিল, "ময়না আমাদের অদৃষ্টে সুখ নাই, এই রাজপুতের হাতে কোন বিপদ না হইলেও ভবানী মন্দিরের পুরোহিত রত্নাচার্য্যের হাত হইতে তোকে কিরূপে রক্ষা করিব, বুঝিতে পারিতেছি না।"

রত্নাচার্য্যের নামে ময়না শিহরিয়া উঠিল, বলিল, "সে আমার কি করিবে? তাহাকে ভয় কেন?—ভয় কেন, তাহা ময়না জানিত।

নাথু বলিল, "তাহাকে তুই জানিস না, সে তোকে মন্দিরের দাসী করিবার চেষ্টায় আছে, তোকে সেবাদাসী করিয়া রাখিবে, ইদরের কোন সুন্দরী এ পর্য্যন্ত রত্নাচার্য্যের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই।"

ময়না বলিল—"বাবা কি ইহাতে মত দিবেন?—আমি জানি তাঁহার মত হইবে না।"

নাথু—"আমিও সে কথা জানি। সেই জন্যই ত রত্নাচার্য্য কৌশল করিয়া তোর বাপকে দূর দেশে পাঠাইয়াছে, পাছে সে শীঘ্র আমার সঙ্গে তোর বিবাহ দিয়া ফেলে, রত্নাচার্য্য আমার উপরও বিরক্ত, তুই আমাকে ভালবাসিস্—সেই জন্য; তাহার অর্থ আছে, তাহার অধীনে সৈন্য আছে, তাহার বিরুদ্ধে আমি কি করিব?"

ময়না—"তাহার বল আছে বলিয়া কি সে স্বামীর কোল হইতে স্ত্রীকে কাড়িয়া লইয়া যাইবে, তবে উপায় কি নাথু?"

"আমি মহারাজ গুহের কাছে নালিশ করিব। আমি জানি রত্নাচার্য্য গুহ মহারাজের নিযুক্ত পুরোহিত, রাজা পুরোহিতের গুণ জানেন না, সকল কথা শুনিলে তিনি নিশ্চয়ই তোকে রক্ষা করিবেন। রাজপুত গুহ ন্যায়বান, নিজের গুণে তিনি ভীলদের বশীভূত করিয়া তাহাদের রাজা হইয়াছেন।"

ময়না বলিল—"নাথু, তোমার এত সাহস হইবে না, এত সাহস করিয়ো না, তোমার আমার মত লোক গুহ মহারাজের কাছে বিচার প্রার্থনা করিবে ইহা অসম্ভব। তোমার আমার কথা শুনিয়া তিনি তাঁহার পুরোহিতকে শাসন করিবেন, ইহা আমি বিশ্বাস করি না।"

নাথু বলিল, "আমি বিশ্বাস করি, আমি জানি তিনি ন্যায়বান। আমি কখন তাঁহাকে দেখি নাই বটে, কিন্তু তাঁহার গুণের অনেক কথা শুনিয়াছি। তিনি কখন কখন মৃগয়া করিতে এ পর্ব্বতে আসিয়া থাকেন।"

ময়না নীরব হইয়া শুনিতে লাগিল।

"আমি জানি গুহ মহারাজ অপরাধীকে কখন ক্ষমা করিবেন না, তিনি জীবনে কখন কাহারো প্রতি অবিচার করেন নাই, আমার প্রতিও তিনি অবিচার করিবেন না, সামান্য ভীল প্রজাও তাঁহার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত নয়।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ময়নার সহিত নাথুর যখন এই প্রকার কথা চলিতে ছিল, সেই সময় সহসা নিকটবর্ত্তী মহুয়া কুঞ্জের অন্তরাল হইতে একজন রাজপুত যুবক সেই প্রভাতসূর্য্যকরোদ্ভাসিত তমাল তলে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজপুতের যোদ্ধবেশ, কটিদেশে দীর্ঘ তরবারি।

রাজপুতকে দেখিয়াই ময়না ভীতাহরিণীর মত এক লম্ফে নাথুর পাশ পরিত্যাগ করিল। নাথু তীর বেগে উঠিয়া তাহার হস্তস্থিত কুঠার উচু করিয়া কাঁধের উপর রাখিল। তাহার পর বলিল, "তুমি কে, কেন এখানে আসিয়াছ?"

রাজপুত বলিল—"ভীল, তোর কুঠার পরিত্যাগ কর।"

ময়না বলিল, "নাথু, এ সেই রাজপুত।"

রাজপুত উত্তর করিল—"হাঁ, আমি রাজপুত, এই যুবতীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী রাজপুত।"

নাথু কুঠার না নামাইয়াই বলিল, "রাজপুত, তুমি কেন এখানে আসিয়াছ, আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করাই কি তোমার ইচ্ছা?"

রাজপুত ভ্রূকুটী করিয়া বলিল—"বাগানের মালী অসভ্য ভীলকে আমি সে উত্তর দিই না। তুই রাজপুতকে এমন প্রশ্ন করিতে সাহসী হইয়াছিস্?"

"আমার ময়নাকে যে লইতে চাহে তাহাকে কোন প্রশ্ন করিতে আমার ভয় নাই, আজ মহারাজ গুহ আসিয়া এ কথা বলিলেও আমি তাঁহাকে এ প্রশ্ন করিতাম।"

ময়না দৌড়িয়া আসিয়া নাথুর মুখ চাপিয়া ধরিল, বলিল, "ওকথা বলিয়ো না, মহারাজ গুহের সেনাদল সর্ব্বত্র আছে, তাহারা একথা শুনিলে তোমার কাঁধে মাথা রাখিবেন না। এই রাজপুতই হয়ত তোমার বিপক্ষে বলিতে পারে।"—ময়না কাতর দৃষ্টিতে রাজপুতের মুখের দিকে চাহিল।

রাজপুত মাথা নাড়িয়া বলিল—"ময়না, তোমার ভয় নাই, আমি এখানে গোয়েন্দাগিরি করিতে আসি নাই।"

ময়না মৃদু হাসিল, রাজপুত বুঝিল ময়না তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়াছে, ময়নার সেই সুমধুর হাসিটুকুর জন্য রাজপুত সর্ব্বস্ব দিতে পারিত।

সহসা সম্মুখে একজন দীর্ঘকায় ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইল। নাথু শিহরিয়া দুই হাত দূরে সরিয়া গেল, সভয়ে বলিল, "এ সেই।"

ময়না জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

"ভবানী মন্দিরের পুরোহিত, রত্নাচার্য্য।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রত্নাচার্য্য বলিল, "ময়না, দেব মন্দিরের জন্য তোমাকে দরকার, মহাদেবীর সেবায় তোমার জীবন ধন্য করিবে, আমি তোমাকে লইতে আসিয়াছি উঠিয়া এস।"

ময়না ছুটিয়া গিয়া নাথুর ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িল, বলিল, "নাথু আমাকে রক্ষা কর, আমাকে যাইতে দিয়ো না।"

নাথু হতাশ স্বরে বলিল, "কেমন করিয়া আমি তোকে রক্ষা করিব? দেবতার কাজ বলিয়া যে তোকে লইয়া যাইতেছে, ইদরের সকল ভীল একত্র হইয়াও তোকে তাহার হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে না।"

দেখিতে দেখিতে পঞ্চাশ জন রাজপুত অশ্বারোহী সেই তমাল গাছের অদূরে উপস্থিত হইল। ইহারা দেবীমন্দিরের রক্ষক।

ময়না সেই সমবেত সৈন্যমণ্ডলীর দিকে চাহিয়া বলিল, "নাথু, বুঝিলাম আমাকে রক্ষা করা তোমার সাধ্য নয়, তোমাকে ছাড়িয়া আমি বাঁচিব না, ঐ কুঠার আমার বুকে বসাইয়া দাও, আমি মরিয়া বাঁচি।"

নাথু বলিল "তাই হোক, তোকে রক্ষা করিবার এই একটি উপায়ই আছে।"

নাথু ময়নার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া কুঠার তুলিল। রাজপুত যুবক এক লম্ফে নাথুর উপর আসিয়া পড়িল, উভয় হস্ত চাপিয়া ধরিয়া কঠোর স্বরে বলিল, "নাথু, পামর, স্ত্রীলোকের বুকে অস্ত্র মারিতে চাস্, পুরোহিতকে তোর এত ভয়?"

নাথু বুঝিল রাজপুত শুধু সুন্দর নয়, তাহার হাত দুখানিতেও অসুরের মত বল, ক্রুদ্ধ নাথুর উন্নত হস্ত সবলে টানিয়া নত করিতে পারে ইদরে এমন ভীল কেহ ছিল না। নাথু কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "রাজপুত বাধা দিওনা, দেবী মন্দিরের পরিচারিকার কাজ কি তাহা আমার জানা আছে; অপমানের হাত হইতে ময়নাকে রক্ষা করিব।"

"কাপুরুষ, স্ত্রীলোককে এমনি করিয়া রক্ষা করে?"

নাথু বলিল—"তবে উপায় কি, সম্মুখে ঐ পঞ্চাশ জন অস্ত্রধারী অশ্বারোহী,—আমি একা।"

"একা, না দুজন?"

নাথু বলিল—"আর একজন কে, তুমি?—তুমি রাজপুত, ভীলের পক্ষ হইয়া রাজপুতের পুরোহিতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে?"

রাজপুত বলিল, "আমি অসহায়া নারীর পক্ষ হইয়া বীর পুরুষের সাহায্য করিব। নাথু, তোর হাতে কি বল নাই?—আমি সশস্ত্র আছি।"

রত্নেশ্বর এতক্ষণ কথা কহে নাই, এবার চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল—"রাজপুত যুবক তুমি কে, জানি না, সাবধান, দেবতার কার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ করিয়ো না, দেবতার সেবার জন্য আমি এই যুবতীকে গ্রহণ করিব।"

রাজপুত যুবক উত্তর করিল—"তুমি এই যুবতীকে তাহার পিতার অসম্মতিতে গ্রহণ করিতে পার না; দেবীর কার্য্যে যুবতীদলকে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের জীবন তোমরা কিরূপ ঘৃণিত করিয়া তোল তাহা আমার অজ্ঞাত নাই, দেবীর নাম করিয়া আর একটী বালিকার জীবন তুমি নষ্ট করিতে পারিবে না। দেবতার নামে এরকম ভ্রষ্টাচার আর হইতে পাইবে না।"

রত্নাচার্য্য বলিল, "যুবক তোমার বড় সাহস, দেবসেবার প্রতিকূলে তুমি কথা বল, আমি তোমায় ক্ষমা করিতে পারি না। মন্দিররক্ষকগণ, তোমরা এই যুবক ও এই ভীল যুবক যুবতীকে বাঁধিয়া মন্দিরকারাগারে নিক্ষেপ কর।—কাল ইহাদের বিচার হইবে।"

দশজন রক্ষী সশস্ত্র ছুটিয়া আসিল।

যুবক ক্রোধে কোষ হইতে অসি বাহির করিয়াছিলেন, তাহা পুনর্ব্বার কোষপ্রবিষ্ট করিয়া বস্ত্রান্তরাল হইতে তাঁহার রত্নখচিত উষ্ণীষ লইয়া মস্তকে ধারণ করিলেন; সৈন্যগণের মধ্যে বৃদ্ধ রাঠোর গুণাবৎ সিংহ সহসা তাহার তরবারি যুবকের পদতলে রাখিয়া জানু নত করিয়া বলিল,—"আমি ও উষ্ণীষ চিনি, না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি, ক্ষমা করুন। মহারাণা গুহাদিত্যের বিরুদ্ধে অসি ধারণে আমি অক্ষম।"

রত্নাচার্য্য তাঁহার দেশের রাজা গুহকে চিনিতেন না, তিনি কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন; মন্দির রক্ষকগণ তরবারি খুলিয়া মহারাণার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিল।

গুহ বলিলেন, "রত্নাচার্য্য তুমি ব্রাহ্মণ, অবধ্য; দেবতার নাম করিয়া তুমি তোমার ক্ষমতার অপব্যবহার করিতেছ, তোমাকে পৌরহিত্য পদ হইতে অপসারিত করা হইল, এখান হইতে চলিয়া যাও।"

রত্নাচার্য্য বিনা বাক্যব্যয়ে প্রস্থান করিলেন।

নাথু বলিল, "ময়না মহারাণা স্বয়ং তোকে চাহে, আমি সকল আশা ত্যাগ করিলাম, এই শেষ দেখা।"

গুহ বলিলেন, এই ভীল যুবক ও যুবতীকে লইয়া গিয়া উপযুক্ত স্থানে রাখ। নাথু তাহার রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলিয়াছিল, এই যুবতী তাহার সাহায্যকারিনী। কাল প্রভাতে দরবারে ইহাদের বিচার করিব।"

সৈন্যগণ নাথু ও ময়নাকে লইয়া প্রস্থান করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পর দিন প্রভাতকালে সুপ্রশস্ত গিরি উপত্যকায় মহারাণা গুহের দরবার বসিল। সুসজ্জিত উচ্চাসনে গুহ উপবেশন করিলেন, লোহিত পরিচ্ছদধারী সৈন্যগণ সম্মুখে সারি দিয়া দাঁড়াইল, তাহাদের কোষে অসি, ছত্রধর মহারাণার মস্তকের উপর রাজছত্র ধারণ করিল, অদূরে নহবৎ হইতে বন্দীগণ মহারাণার স্তুতিগান গাহিতে লাগিল, বহুসংখ্যক রাজকর্ম্মচারী দরবার স্থলে সমাগত, নিশানে, পুষ্পতোরণে বস্ত্রাবাসে সেই উপত্যকা পরিপূর্ণ,—দলে দলে ভীলগণ ধনুর্ব্বান হস্তে নাথু ও ময়নার বিচার দেখিতে আসিতেছে, আজ তাহাদের বিচারের দিন।

রাজ আজ্ঞায় নাথু ও ময়না বিচার স্থলে আনীত হইল, প্রহরীগণ তাহাদিগকে কিছু দূরে দণ্ডায়মান করিল।

আজ নাথু ও ময়না উভয়েই নির্ভয়, আর কোন আশা নাই, আজ জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে দুজনকেই দুজনের মনের

সকল কথা বলিবার জন্য পরস্পর কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইল, কেহ তাহাতে বাধা দিল না ।

নাথু বলিল, রাজপুতের তরবারি এখনি আমার গলায় পড়িবে, ময়না তোকে আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে লইয়া যাইবার আগে যেন আমার মাথা কাটা পড়ে, রাজার কাছে আমি এই ভিক্ষা চাহিব ।”

ময়না বলিল, “আমি রাজার কাছে তোমার প্রাণ ভিক্ষা চাহিব, পাইলে দুজনে ইদর ছাড়িয়া চলিয়া যাইব । ভবানী মন্দিরের পুরোহিতের হাত হইতে যিনি আমাদের রক্ষা করিয়াছেন, তিনি আমাদের সর্ব্বনাশ করিবেন না । তুমি ত বলিয়াছ মহারাণা ন্যায়বান ।”

“মহারাণা মানুষ ।”

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উভয়ের দিকে চাহিয়া মহারাণা বলিলেন “উহাদিগকে আমার কাছে লইয়া এস ।”

উভয়ে মহারাণার সমীপবর্ত্তী হইল ।

মহারাণা নাথুকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, “ভীলযুবক, আমার কথার ঠিক উত্তর দেও ; তুমি কি এই ভীলযুবতীকে ভালবাস ।”

নাথু বলিল, “প্রাণের ভয়ে ভীল মিথ্যা বলিবে না, আমি ময়নাকে ভালবাসি ভাবিয়াই সুখে মরিতে পারি ।”

“ময়না তুমি ?—তুমি কি তোমার পিতার এই সামান্য ভৃত্যের প্রতি অনুরক্ত ?”

ময়না কোন কথা বলিতে পারিল না ; তাহার চক্ষে অশ্রুবিন্দু সঞ্চিত হইল, সে নত মুখে রহিল । ময়না বুঝিয়াছিল, স্বয়ং মহারাণা যাহাকে তাঁহার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দী মনে করেন, তাহার জীবনের আশা নাই ।

নাথু ময়নার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “ময়না ভয় কি, রাজার কথার উত্তর দে । তুই আমাকে ভালবাসিস্ এ কথা মরিবার আগে তোর মুখে আর একবার শুনিয়া লই, আমার প্রতি তোর ভালবাসা নাই, এ কথা শুনিয়া আমি বাঁচিয়া থাকিতে চাহি না । তোর ভালবাসা লইয়া আমি শত বার মরিতে পারি ।”

ময়না মাথা তুলিল, মহারাণার দিকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল,—“মহারাজ, এক দিন তোমাকে ত এ কথা বলিয়াছি, আজ এই দরবারে সকলের সাক্ষাতে মরিবার আগে আর একবার তোমাকে তাহা বলিব । নাথুকে আমি ভালবাসি, নাথু ভিন্ন আমার ভালবাসার পাত্র আর কেহ নাই, মহারাজ তুমিও না ।”

চকিতের মধ্যে মহারাণার চক্ষুদ্বয় রোষপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, “বিচার শেষ হইয়াছে, যতক্ষণ না আমি লিখিত আদেশ প্রদান করি ততক্ষণ উহাদিগকে হাজির রাখ ।”

আদেশ লিখিত হইল, মহারাণা তাহাতে মোহর সংযুক্ত করিলেন ; তাহার পর সেই আদেশ পত্র ময়নার হস্তে দান করিয়া বলিলেন—“ময়না, ভীল কন্যার এমন প্রেম আমি আর কখন দেখি নাই, তুমি নাথুকে ভালবাস, নাথু তোমার জন্য প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত ; রাজপুত যুবক যখন তোমার ভালবাসা প্রার্থনা করিয়াছিল, পুরোহিত ব্রহ্মচারী যখন তোমাকে অন্যায় করিয়া কাড়িয়া লইয়া যাইবার মন্ত্রণা করিয়াছিল, তখন নাথু বলিয়াছিল, সে মহারাণার নিকট বিচার প্রার্থনা করিবে, মহারাণা ন্যায়বান । আমি সে কথা শুনিয়াছি, আজ তোমাকে আমি নাথুর হাতে সমর্পণ করিতেছি, আর এই দানপত্র তোমাকে দান করিতেছি, ইহারই বলে নাথু ইদরের এক বিস্তীর্ণ ভীল জায়গীরের অধিস্বামী হইবে ।—অন্যের অধিকৃত হৃদয় দুষ্ট তস্করের ন্যায় চুরী করিবে না । তোমরা আমার সম্মুখ হইতে বিদায় হও, আর কখন আমার সম্মুখে আসিয়ো না ।”

নাথু ভাবিতেছিল কখন তাহার মাথায় তরবারি পড়ে ; সে নির্ভিক হৃদয়ে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল, এতটা অনুগ্রহ সে সহিতে পারিল না, অবোধ শিশুর ন্যায় রাজ চরণে নিপতিত হইল, কেবল নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল, একটা কৃতজ্ঞতার কথাও বলিতে পারিল না ।

ময়না বলিল, “মহারাণা তুমি আমার শরীরে প্রাণ দিয়াছ, তুমি ন্যায়পর, তোমার জয় হউক ।”

সহস্র সহস্র ভীল রাজদরবারের চতুর্দ্দিকে সমবেত হইয়াছিল, রাণার বিচারে সন্তুষ্ট হইয়া তাহারা “জয় মহারাণার জয়” বলিয়া চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল । সে শব্দ শূন্যে না মিশাইতেই সহস্র ভীলকণ্ঠে আবার ধ্বনিত হইল—ন্যায়বান মহারাণা গুহাদিত্যের জয় ।”

সেই গগণভেদী জয় শব্দের মধ্যে প্রহরীগণ সমাদরে ময়না ও নাথুকে লইয়া দরবারের বাহিরে গেল ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় ।

সামান্য লোকের অবস্থোন্নতি ও শিক্ষা ।

দেশের সর্ব্বসাধারণ সামান্য লোকের অবস্থা, শ্রমজীবী-দের অবস্থার বিষয় কেহ ভাবে না, কেহ দেখে না । শিক্ষিত লোক বড় বড় কথা লইয়া আন্দোলন করিতেছেন, কিন্তু দুঃখীদের অবস্থার বিষয় কেহ ভাবে না । সিবিল সার্ব্বিস, ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হওয়া, পার্লেমেণ্টের সভ্য হইবার অধিকার লাভ করা ইত্যাদি বড় বড় কথা লইয়া আন্দোলন চলিতেছে, কিন্তু দেশের সর্ব্বসাধারণ দুঃখী লোক, যাহাদের লইয়া দেশ, তাহাদের বিষয় কয় জন ভাবে ?

যদি বা কখন কথা উঠে, বক্তৃতায় কিছু বলা হয়, কিন্তু কার্য্যে কি হয় ? যাহাতে তাহাদের অবস্থোন্নতি হয়, তাহারা শিক্ষা লাভ করে, সে বিষয়ে কয় জন মনোযোগী হইয়াছেন ? বঙ্কিম বাবু বঙ্গদর্শনে তাহাদের জন্য অনেক কাঁদিয়াছেন, কিন্তু কাজে কে কি করিয়াছেন ?

এ বিষয়টি দুই প্রকারে ভাবিতে হয়, ১ম তাহাদের অবস্থোন্নতি, ২য় তাহাদের শিক্ষা । এই দুই দিকের কোন দিকেই, কোন বিষয়েই বিশেষ চেষ্টা দেখিতেছি না । যাহাতে তাহাদের অবস্থোন্নতি হয়, তাহারা শিক্ষালাভ করে, তদ্বিষয়ে কয় জন লোক চেষ্টা করিয়া থাকেন ?

সামান্য দরিদ্র লোকের মধ্যে যাহারা জরাগ্রস্ত, রুগ্ন ও অক্ষম তাহাদিগকে বসাইয়া খাইতে দেওয়া উচিত । আর সকলে কাজ করিবে ও পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে ; সর্ব্বত্র এরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত । কলিকাতা আমস্ হাউসে ইয়োরোপীয় দুঃখী লোক কাজ না থাকিলে আসে, তথায় কাজ করে ও খাইতে পায় । কিন্তু সে ইয়োরোপীয়দিগের জন্য । এদেশীয় দুঃখী প্রাণীদের জন্য আমস্‌হাউস কোথায় ?

খোঁড়া, অন্ধরাও কাজ করিতে পারে । খোঁড়া পাট কাটিতে পারে, বসিয়া বসিয়া অনেক প্রকার কাজ করিতে পারে । বিলাতে অন্ধদিগকে অনেক প্রকার শিল্পকার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছে । অন্ধের হস্তের শিল্পকার্য্য দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় ।

যদি আমাদের দেশে অনেক কলকারখানা হয়, তাহা হইলে দুঃখী লোকের বিশেষ উপকার হয় । বোম্বাই নগরে দেখিয়াছি যে, সেখানকার কলে কত পুরুষ, কত স্ত্রীলোক কাজ করিয়া সুখে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেছে । কারখানায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তাহাদের যেপ্রকার অবস্থা ছিল, কারখানায় কাজ পাইয়া অবধি কি শারীরিক, কি সাংসারিক সকল বিষয়েই তদপেক্ষা উন্নতি হইয়াছে । বোম্বাই নগরের কলের বিষয় আমি বঙ্গদর্শনে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা হইতে কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

“আমরা একদিন বোম্বায়ের একটি কল দেখিতে গেলাম । উহার নাম গোকুল দাসের কল । একটি প্রকাণ্ড বাষ্পীয় যন্ত্র চলিতেছে ; কোন স্থানে তুল পিজা হইতেছে, কোন স্থানে তুল হইতে সুতা হইতেছে, কোন স্থানে বস্ত্রের টানাপড়েন হইতেছে, কোন স্থানে কাপড়ের পাড় হইতেছে । এতদ্ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে । এই সমস্ত কার্য্য সেই একটিমাত্র বাষ্পযন্ত্রের সাহায্যে চলিতেছে । কোন স্থানে কেবল দুই তিন শত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ কার্য্য করিতেছে, কোন স্থানে দুই তিন শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক কার্য্য করিতেছে, এবং একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্থানে প্রায় পাঁচ ছয় শত স্ত্রীলোক কাজ করিতেছে । কল হওয়াতে এই সকল দুঃখী লোকের যে, কি পর্য্যন্ত উপকার হইয়াছে, বলিয়া শেষ করা যায় না। কলে ধনী দরিদ্র উভয়েরই সমান উপকার ।”

সমুদ্রকূলবর্ত্তী জাতিদিগের স্বভাবতঃ ব্যবসায় বাণিজ্যের দিকে প্রবৃত্তি ধাবিত হয় । বোম্বাইয়ে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির ইহা একটি কারণ । কিন্তু তথায় ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না থাকা একটি প্রধান কারণ । চিরস্থায়ী আয় আছে বলিয়া বাঙ্গালার জমিদারেরা কোন প্রকার শিল্পবাণিজ্যের দিকে মন দেন না । তাঁহারা বুঝেন না যে, সে বিষয়ে মন দিলে, তাঁহাদের একগুণ সম্পত্তি দশগুণ হয় । এখানে যেমন কোন ব্যক্তির কিছু অর্থ হইলে, তিনি জমিদারি ক্রয় করিবার জন্য ব্যস্ত হন, বোম্বাইয়ে কাহারও অর্থ হইলে তিনি বাণিজ্যে খাটাইতে ইচ্ছা করেন । আমাদের ধনিগণ কবে বুঝিবেন যে, তাঁহারা শিল্পবাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদের নিজের উপকার, মধ্যবিত্ত লোকের উপকার এবং নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র লোকের মহোপকারসাধন করিতে পারেন । অর্থের সদ্ব্যবহার না করা যে পাপ, ইহা সকলেরই জানা আবশ্যক ।

দরিদ্র লোকের অবস্থোন্নতি হইলে নীতি সম্বন্ধেও তাহাদের উন্নতি হয় । নীতির সহিত আর্থিক অবস্থার বিশেষ সম্বন্ধ আছে । এক সময়ে আমি কোন্নগরে বাস করিতাম । অনেকদিন তথায় বাস করিয়া দেখিলাম যে, তথায় চুরি হয় না ;—চুরির সংবাদ শুনিতে পাই না । এক দিন ভক্তিভাজন স্বর্গীয় শিবচন্দ্র দেব মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, “মহাশয় ! আপনাদের দেশে চুরি হয় না ?”

শিবচন্দ্র বাবু উত্তর করিলেন, "পূর্ব্বে অনেক চুরি হইত, কিন্তু রিসড়ায় কল হইয়া পর্য্যন্ত, আর বড় চুরি হয় না। এ অঞ্চলের দুঃখী লোক কলে কাজ পাইয়াছে, সুতরাং আর চুরির সংবাদ পাওয়া যায় না।"

গরিব দুঃখীদের অবস্থোন্নতি ও শিক্ষার বিষয় কয়জন লোক চিন্তা করেন? তাহাদের কল্যাণের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে লোকে সঙ্কুচিত হয়। কত ধনীর অর্থ কতদিকে অপব্যয় হইতেছে, কেবল দুঃখীর দুঃখ নিবারণের সময়ই যত সঙ্কোচ! ধনীগণের কত অর্থ যে অনর্থক ব্যয় হয়, তাহার কি সীমা আছে? একজন ধনীসন্তান তাঁহার এক রক্ষিতা বারাঙ্গনার বিড়াল শিশুর অন্নপ্রাশনে দ্বাবিংশতি সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন!! অনেকেই জানেন, আমাদের বাঙ্গালা দেশের এক রাজা বানরের বিবাহ দিয়াছিলেন। মহাসমারোহে বিবাহ হইয়াছিল। তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। নবদ্বীপ, বিক্রমপুর প্রভৃতি সমাজসকলের অধ্যাপকগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। যখন ঘোর ঘটায় বিবাহ ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে, তখন রাজা, তাঁহার একজন বিজ্ঞ ও সুরসিক সভাসদ্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন হে! এমন বিবাহ পূর্ব্বে কখন দেখিয়াছ কি?" সুরসিক সভাসদ্ কৃতাঞ্জলিপুটে উত্তর করিলেন, "মহারাজ! গোস্তাকি মাপ্ করিবেন, আপনার বিবাহের সময়ই দেখা হইয়াছিল!!"

এখন সামান্য শ্রেণীর লোক,—শ্রমজীবীদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলি। বালক, যুবা, বৃদ্ধ, সমস্তদিনই যাহারা খাটে, তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার সময় কই? এক উপায় নৈশবিদ্যালয়। কিন্তু শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কিছু বলিবার পূর্ব্বে, সাধারণ লোকের শিক্ষার বিরুদ্ধে দুই একটি আপত্তির উত্তর করা আবশ্যক। আমাদের দেশের অনেক ভদ্রলোক এই সকল আপত্তি করিয়া থাকেন।

প্রথম আপত্তি। লেখা পড়া শিখিলে ভদ্রলোককে মানিবে না, গ্রাহ্য করিবে না। এ কথা অমূলক। বরাহনগরের শ্রমজীবীরা তাহার দৃষ্টান্তস্থল। তাহারা যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছে, তাহাতে তাহাদের ব্যবহার পূর্ব্বাপেক্ষা ভালই হইয়াছে।

যদি সাধারণ লোকেরা, দেশের শ্রমজীবীরা অন্যায় অত্যাচারে বাধা দেয়,—যদি তাহারা তাহাদের ন্যায্য অধিকার বুঝিয়া লয়, তাহা তো ভালই, উহা উন্নতির চিহ্ন। অনেক জমিদার মহাশয়েরা তাহা চান না। তাঁহারা শ্রমজীবীদিগকে চিরদিনই পদবিদলিত করিয়া রাখিতে চান। দুঃখী লোক নিজেদের স্বার্থ বুঝিয়া লইতে শিখিতেছে দেখিয়া অনেক ভদ্রলোক বলিয়া থাকেন, "ছোট লোকের বড় বাড় হইয়াছে।" দুঃখী লোককে দুর্ব্বাক্য বলিব, অকারণে অথবা সামান্য কারণে তাহাদিগকে ধরিয়া প্রহার করিব, অথচ তাহারা কিছু বলিবে না, মাথা তুলিয়া কথা বলিবে না, ভদ্রলোকেরা যদি ইহাই চান, তাহা হইলে তাঁহাদের সে ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না;—হওয়া উচিত নহে। কিন্তু বাস্তবিক কোন কোন স্থলে এমন দেখা যায় না কি, যে সামান্য লোকে ভদ্রলোকের উপর অসদ্ব্যবহার করিতেছে? নিশ্চয়ই তাহা দেখা যায়। উহা সমাজের পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার ফল। চিরদিন এরূপ থাকিবে না; শিক্ষার অভাবই উহার কারণ। শিক্ষা পাইলে, তাহাদের ব্যবহার ভাল হইবারই সম্ভাবনা।

দ্বিতীয় আপত্তি। সকলেই যদি লেখাপড়া শিক্ষা করে, তাহা হইলে, কৃষক আর কৃষিকার্য্য করিবে না, তন্তুবায় আর বস্ত্র বয়ন করিবে না, কুম্ভকার আর কলসাদি নির্ম্মাণ করিবে না, সকলেই আপনার আপনার ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়া চাকুরি করিতে যাইবে। তাহা হইলে কৃষিকার্য্য প্রভৃতি জগতের অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য সকল কেমন করিয়া চলিবে? তাহা হইলে সংসার কি নষ্ট হইয়া যাইবে না? এ সকল কথার উত্তর কি?

আমেরিকার যুক্তরাজ্য, জর্ম্মেনি, সুইজরলণ্ড প্রভৃতি দেশে সর্ব্বসাধারণ লোকে শিক্ষা লাভ করিতেছে। এ সকল দেশে জনসমাজের কার্য্য কি চলিতেছে না? সেখানকার চাষারা কি চাষ করে না? শিক্ষা পাইলে চাষা আরও ভাল করিয়া চাষ করিবে। এ স্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, শিক্ষিত চাষার চাষ করিতে ইচ্ছা হইবে কেন? সে দোষ কোথাও কোথাও ঘটিতেছে বটে, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে উহা চলিয়া যাইবে। যেরূপ কাল পড়িতেছে, পেটের দায়ে লাঙ্গল ধরিতে হইবে।

ব্রাহ্মণ কায়স্থের সন্তানেরা পূর্ব্বে যাহা করিতেন না, এখন তাহা করেন। কুলীন ব্রাহ্মণ দোকানদার হইতেছেন। ব্রাহ্মণ সন্তান চামড়ার ব্যবসায় করিতেছেন; জুতা বিক্রয় পর্য্যন্ত করিতে বাধ্য হইতেছেন। সুতরাং সকলেই লেখাপড়া শিখিলে সংসার চলিবে না, চাষা আর চাষ করিবে না ইত্যাদি কথা যে অমূলক তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইল।

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি ভদ্রজাতীয় লোক যদি সূত্রধরের কাজ, কুম্ভকারের কাজ করিতে থাকে, তাহা কি দেশের অবনতির চিহ্ন? অনেক লোক সেরূপ মনে করেন বটে, কিন্তু বাস্তবিক উহা উন্নতির চিহ্ন। শারীরিক পরিশ্রমদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করা কখনই হীন কার্য্য নহে। কৃষক শিক্ষালাভ করিলে আরও ভাল করিয়া কৃষিকার্য্য করিতে পারিবে।

এস্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, লোকের কি অসন্তোষ বৃদ্ধি হইবে না? অর্থাৎ লেখাপড়া শিখিয়া কৃষকের কার্য্য করিতে, সূত্রধরের কার্য্য করিতে কি লোকের ইচ্ছা হইবে? কৃষক সন্তান, সূত্রধর সন্তান প্রভৃতি যদি লেখাপড়া শিখে, তাহা হইলে তাহাদের স্ব স্ব ব্যবসায় করিতে কি আর ভাল লাগিবে? চাকুরি করিবার জন্য তাহাদের মন কি ধাবিত হইবে না? এবং চাকুরি না জুটিলে কি অসন্তোষ বৃদ্ধি হইবে না? এখনই কি এমন দেখা যায় না যে, কৃষকসন্তান বা সূত্রধর সন্তান প্রভৃতি কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছে বলিয়া আর স্ব স্ব পৈতৃক ব্যবসায় করিতে চাহে না, চাকুরি করিতে চায়? তাহারা যদি মনের মত চাকুরি না পায়, তাহাতে কি তাহাদের অসন্তোষ বৃদ্ধি হইবে না? হইবে সত্য, কিন্তু উহাই উন্নতির কারণ। এস্থলে একটি গল্প বলি।

একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক ইংলণ্ড্ হইতে সুইজর্‌লণ্ড্ দেশ দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি তথাকার একটি প্রধান নগরের রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া, একজন মুটিয়াকে ডাকিলেন, মুটিয়া আসিয়া তাঁহার দ্রব্যাদি স্কন্ধে গ্রহণ করিল। বিশেষ কোন একটি হোটেলে মুটিয়াকে যাইতে বলিলেন; সে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পথে যাইতে যাইতে মুটিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয় আপনি কোন্ দেশের লোক? আপনার আকৃতি দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছিনা।" বাঙ্গালী ভদ্রলোকটী উত্তর করিলেন যে, তিনি ভারতবর্ষের লোক। তখন মুটিয়া একটু চিন্তা করিয়া তাঁহাকে বলিল যে, 'আপনাকে একটী বিশেষ কথা জিজ্ঞাসা করিব। আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহার উত্তর দিবেন কি?' বাঙ্গালী ভদ্রলোকটী বলিলেন "তোমার যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পার, আমি যথাসাধ্য উত্তর করিব।" তখন সেই মুটিয়া বলিল যে, 'আমাদের একটী সভা আছে। একদিবস সেই সভায় এই কথা লইয়া আলোচনা হইয়াছিল যে, ভারতবর্ষ এত বড় দেশ, বহুসংখ্যক লোকের বাস, কোন বিষয়েই অভাব নাই, অথচ তাহারা এত দীর্ঘকাল ধরিয়া পরাধীন রহিয়াছে কেন? এই বিষয় লইয়া আমাদের সভায় অনেক তর্ক বিতর্ক হইল, কিন্তু আমরা কোন পরিষ্কার মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিলাম না। আপনি সেই দেশের লোক, আপনি এ বিষয়ের প্রকৃত কারণ কিছু বলিতে পারেন কি?" বাঙ্গালী ভদ্রলোকটী মুটিয়ার প্রশ্ন শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন। তাহার প্রশ্নের কি উত্তর করিয়াছিলেন, বলিতে পারি না। কিন্তু তিনি সেই মুটিয়াকে বলিলেন যে, 'তুমি শিক্ষিত লোকের মত কথা কহিতেছ, তুমি মুটিয়ার কাজ কর কেন?' মুটিয়া তাঁহাকে বলিল যে, "পরের গলগ্রহ হওয়া অপেক্ষা মুটিয়ার কাজ করা ভাল মনে করি। আজ আমি মুটিয়ার কাজ করিতেছি, কিন্তু এমন দিন আসিতে পারে, যে দিন আমি সাধারণতন্ত্রের সভাপতি হইতে পারি।" বাঙ্গালী বাবুটী মুটিয়ার কথা শুনিয়া যথার্থই আশ্চর্য্য হইলেন। এই বাঙ্গালী বাবুটী কে? পাঠক জানিতে ইচ্ছা করিতেছেন কি? ইনি হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ মনোমোহন ঘোষ মহাশয়।

সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সুশিক্ষা বিস্তার হইলে, তাহার ফল কিরূপ হইতে পারে, উপরের গল্পটী দ্বারা তাহা আমরা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতেছি। সুইজরলণ্ডের মুটে শিক্ষিত ব্যক্তি হইয়াও মোট বহন করিতেছে! পরের গলগ্রহ হওয়া অপেক্ষা মুটিয়া হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা ভাল মনে করিতেছি! ইহা কি প্রকৃত মহত্ত্ব নহে! আর দেখ, সে মুটিয়া হইয়াও মনে করিতেছে যে, সে হয় তো এক দিন সাধারণ তন্ত্রের সভাপতি হইবে! (সুইজরলণ্ড দেশ সাধারণ তন্ত্র)।

কৃষকের কাজ, সূত্রধরের কাজ, কুম্ভকারের কাজ, মুটিয়ার কাজ, কোন কাজই নীচ কাজ নহে। কোন কাজই হীন নহে। এ সমস্ত কাজই জনসমাজের পক্ষে হিতকর, সুতরাং এ সকল কাজই ভাল কাজ। কিছুই মন্দ কাজ নহে। নীতিবিরুদ্ধ কাজই মন্দ কাজ। ধর্ম্মপথে

থাকিয়া আপনার শরীরকে খাটাইয়া জীবিকানির্ব্বাহ করা মন্দ কাজ নহে।

কোন ব্যক্তি উচ্চ বংশে জন্মিয়াছে বলিয়াই যে, তাহাকে উচ্চ পদ দিতে হইবে, এমন নহে। তাহার যেমন ক্ষমতা তাহাকে সেইরূপ কাজই করিতে হইবে। শরীর খাটাইয়া কাজ করা হীনতা হইল, আর পরের গলগ্রহ হওয়া হীনতা নয়!! আমাদের দেশের অনেক ভদ্রসন্তান এ সোজা কথাটা বুঝেন না যে, পরের গলগ্রহ হওয়া অপেক্ষা মুটে হওয়াও ভাল। দুষ্কার্য্য করাতেই নীচতা, হীনতা। ক্ষমতা থাকিতে, অন্যের গলগ্রহ হওয়াই নীচতা। চাষার কাজ নীচ কাজ নহে, অতি মহৎ কাজ অতি পবিত্র কাজ।

যার যেমন ক্ষমতা সে তেমনি কাজ করিবে। পরামাণিকের সন্তান যদি হাইকোর্টের জজ হইবার উপযুক্ত হয়, সে তাহাই হইবে। সে পরামাণিকের সন্তান বলিয়া যে চিরজীবন দাড়ি কামাইবে এরূপ কখন হইতে পারে না। আবার কুলের মুখটি বিষ্ণু-ঠাকুরের সন্তান যদি বিদ্যাবুদ্ধিবিহীন হন, তাঁহাকেও লাঙ্গল ধরিতে হইবে। এখন না ধরুন, কালে ধরিতে হইবে। যাহার যেমন ক্ষমতা, জন সমাজে সে তেমনি কাজ করিবে। সকলের জন্য সকল পথ খোলা থাকিবে, সকলের সকল বিষয়ে অধিকার থাকিবে। আপনার আপনার ক্ষমতা অনুসারে সকলে তাহা গ্রহণ করিবে। স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল তেলির সন্তান বলিয়া তাঁহাকে চিরজীবন ঘানিগাছে বসাইয়া রাখা এবং কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান বলিয়া হস্তীমূর্খকে হাইকোর্টের জজিয়তি দেওয়া কখন বিধেয় নহে।

আমাদের দেশে সাধারণ দুঃখী লোকের,—শ্রমজীবী-দিগের উপকারের জন্য কে কি করিয়াছেন? এ বিষয়ে বরাহনগরের শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ স্থলে তাঁহার কার্য্যের কিছু সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বলিলে অসঙ্গত হইবে না।

১৮৬৩ সালে, শশীপদ বাবু বরাহ নগরের শ্রমজীবীদিগকে একত্র করিয়া একটি বক্তৃতা করেন, ও তাহাদের শিক্ষার জন্য একটি নৈশবিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। নৈশ-

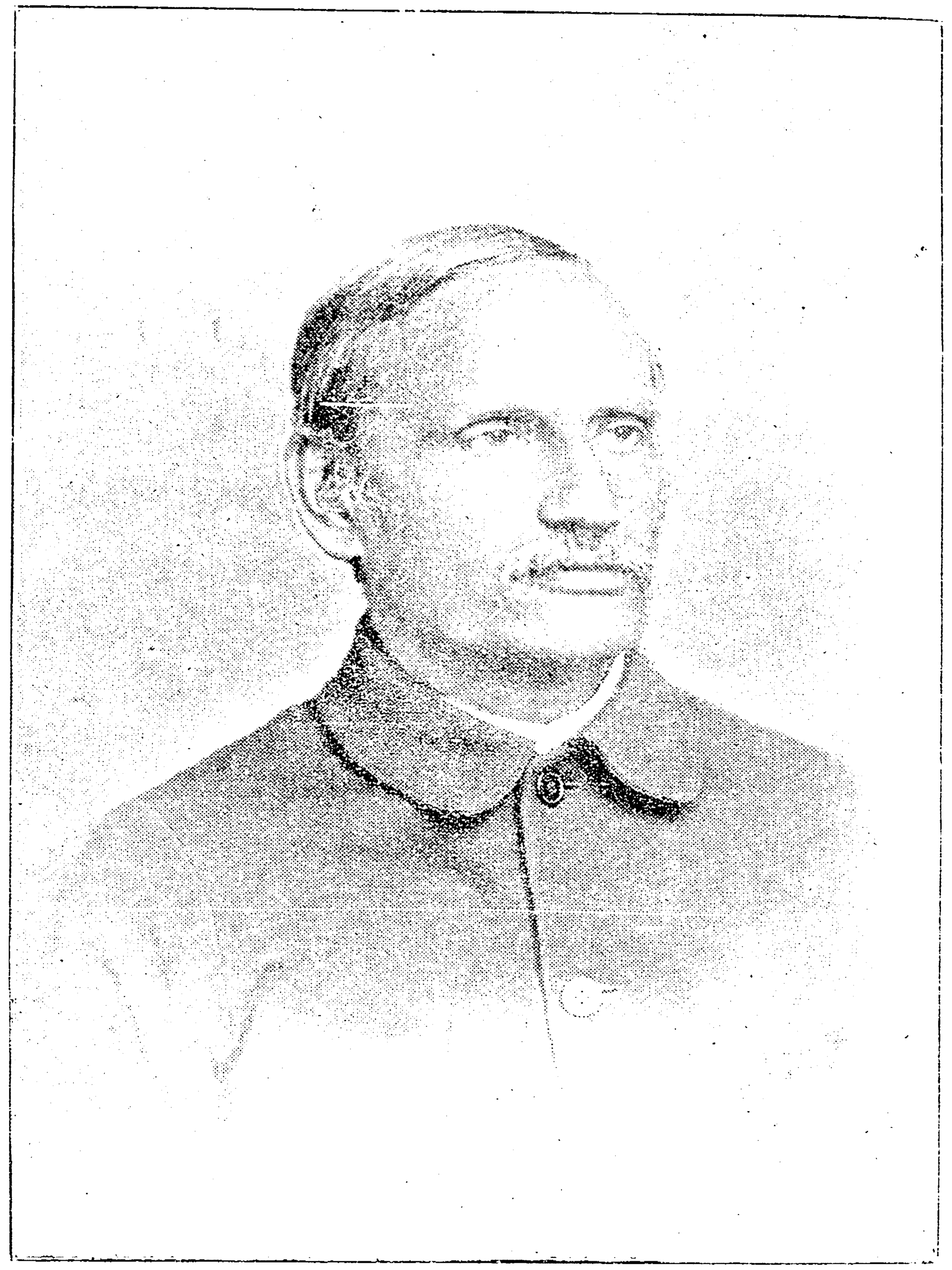

শ্রীযুক্ত শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিদ্যালয় একটি ভাড়াটিয়া বাটীতে হইতে লাগিল। শশীপদ বাবু দিবাভাগে আপিসে কার্য্য করিতেন এবং রাত্রে নৈশবিদ্যালয়ে শ্রমজীবীদিগকে পড়াইতেন। অবৈতনিক শিক্ষকের দ্বারা নৈশ বিদ্যালয়ের কার্য্য ভাল চলে না দেখিয়া তিনি বেতনভোগী শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন।

এই সময়ে এডিন্‌বরার ডাক্তার আলেক্‌জাণ্ডারের পুত্র উইলিয়ম্ আলেক্‌জাণ্ডার, বর্ণিও কোম্পানির কলিকাতার আপিসের অধ্যক্ষ হইয়া এদেশে আসিলেন। শশীপদ বাবু তাঁহার সহিত দেখা করিয়া বরাহনগরের শ্রমজীবীদিগের অবস্থা তাঁহার নিকট বর্ণনা করিলেন। বর্ণনা করিয়া তাঁহার নিকট এই প্রস্তাব করিলেন যে, বরাহ নগরের কলবাটীর মধ্যেই শ্রমজীবীদিগের জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় সংস্থাপন করা হয়। আলেক্‌জাণ্ডার সাহেব কলের অধ্যক্ষ মেয়র সাহেবকে একখানি পত্র দিলেন। মেয়র সাহেব বলিলেন, নৈশবিদ্যালয়ের বাটীর জন্য ভূমি ক্রয় করিতে হইবে।

নৈশবিদ্যালয়ের জন্য একটি নূতন সুন্দর বাঙ্গালা নির্ম্মিত হইল। ১৮৬৯ সালের ১৪ই জুন দিবসে নৈশ-বিদ্যালয় উক্ত গৃহে উঠিয়া আসিল। কিন্তু কিছু দিন পরে আগুন লাগিয়া উহা পুড়িয়া যাওয়াতে উহার টিনের ছাদ হইল। ১৮৭০ সালে ৫ই জুলাই এই নূতন গৃহে নৈশ বিদ্যালয় হইতে লাগিল।

দুর্ভাগ্যক্রমে বরাহ নগরের অনেক লোক এই নৈশ-বিদ্যালয়ের বিপক্ষতাচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "ছোট লোকে লেখা পড়া শিখিলে চাকর, চাকরাণী পাওয়া যায় না। ছোট লোক লেখা পড়া শিখিলে তাহারা ভদ্র লোককে গ্রাহ্য করিবে না।"

নৈশবিদ্যালয়ে যাহাতে নীতিশিক্ষা ভাল হয়, তদ্বিষয়ে শশীপদ বাবু বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার যত্ন বিফল হয় নাই। চরিত্র ও ব্যবহার সম্বন্ধে বিদ্যালয়ের ছাত্র-গণের অনেক উন্নতি হইয়াছিল। কলের ক্রোল সাহেব একবার প্রকাশ্য সভায় বলিয়াছিলেন:—"কলের শ্রমজীবী-দের মধ্যে যাহারা নৈশবিদ্যালয়ের ছাত্র, তাহাদেরই কাজ সর্ব্বাপেক্ষা ভাল।"

ইহার পর একটি দুর্ঘটনা ঘটিল। দেশের লোকের অসদ্ব্যবহারে কলের সাহেবেরা বিরক্ত হইয়া বিদ্যালয়ের গৃহ ও সাহায্য কাড়িয়া লইলেন। সুতরাং বিদ্যালয় অন্য স্থানে উঠিয়া গেল।

১৮৭০ সালের ২৭শে আগষ্ট, শশীপদ বাবু শ্রমজীবীদিগের কল্যাণের জন্য একটি সভা সংস্থাপন করেন। দোকানদার, কারিকর প্রভৃতি লোকের চরিত্রসংগঠন, ধর্ম্মশিক্ষা, অবস্থার উন্নতি প্রভৃতি কার্য্য এই সভার উদ্দেশ্য। শ্রমজীবীদিগকে শিক্ষাদান, তাহাদের জন্য বক্তৃতা, তাহাদিগকে বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ প্রদান করা, মাদক সেবন নিবারণ করা ইত্যাদি এই সভার প্রধান কার্য্য।

শশীপদ বাবু বরাহনগরে একটি সুরাপান নিবারণী সভা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। যাঁহারা শ্রমজীবীদিগের সভার সভ্য হইতেন, তাঁহাদিগকে সুরাপান নিবারণী সভারও সভ্য হইতে হইত।

শশীপদ বাবু একবার ৫০।৬০ জন শ্রমজীবীকে সঙ্গে লইয়া চানকের বাগানে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তথায় একত্রে আহারাদি হইয়াছিল। বিলাতের শ্রমজীবী সভা দ্বারা এই সংবাদ মহারাণীর নিকট পৌঁছিয়াছিল। এখান-কার ডেলিনিউসপত্র বলিয়াছিলেন যে, এদেশে এরূপ দৃশ্য দুর্লভ। 'নববার্ষিকী' নামক পত্রিকা বলিয়াছিলেন :—

"শ্রমজীবীদের উন্নতির জন্য শশীপদ বাবু বরাহনগরে যতদূর চেষ্টা করিয়াছেন, এ দেশে আর কোথাও সেইরূপ হয় নাই। যদি ভবিষ্যতে কোথাও হয়, তবে তাঁহারই দৃষ্টান্তে হইবে।"

১৮৬০ সালে শ্রমজীবীদের সামাজিক উন্নতির জন্য শশী-পদ বাবু শ্রমজীবীসভা প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহাদের ধর্ম্মো-ন্নতির জন্য সাধারণধর্ম্মসভা সংস্থাপিত হয়। শ্রমজীবীরা যাহাতে কিছু কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে, সে জন্য শশী বাবু বহু চেষ্টা করিয়া বরাহনগরে সেবিংস্‌ব্যাঙ্ক Savings Bank সংস্থাপন বিষয়ে কৃতকার্য্য হন।

শশীপদ বাবু শ্রমজীবীদের বাটীতে গিয়া সভা করিতেন ও তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন। শ্রমজীবীদের বাটীর স্ত্রীলোকেরাও এই সকল সভায় যোগ দিতেন। শ্রমজীবীদের বাটীতে গিয়া সভা করাতে তাহাদের স্ত্রীলোকদের বিশেষ উপকার হইত।

শ্রমজীবীদের মধ্যে অনেকের সুরাপান অভ্যাস ছিল। তাহারা সে অভ্যাস ত্যাগ করিল;—সর্ব্বপ্রকার মাদক সেবন ত্যাগ করিল। এই সকল চেষ্টায় অনেকের চরিত্র নির্ম্মল হইয়াছে। সকলেই উৎসাহের সহিত নৈশবিদ্যালয়ে পাঠ করিত। তাহারা কুসংসর্গ একেবারে ত্যাগ করিল। চরিত্র ভাল হওয়াতে তাহারা সেবিংস্ ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতে সক্ষম হইতে লাগিল!

শ্রমজীবীদের পীড়া হইলে শশীপদ বাবু তাহাদের বাটীতে গিয়া তাহাদিগকে দেখিয়া আসিতেন। যে ব্যক্তি বড় গরিব তাহাকে নিজে ঔষধ ক্রয় করিয়া দিতেন। এই সকল উপকারের জন্য শ্রমজীবীরা তাঁহার বিলাত গমনের পূর্ব্বে তাঁহাকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করিয়াছিল।

শশীপদ বাবু বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভারত শ্রম-জীবী নামক সচিত্র মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। ১২৮১ সালের ১লা বৈশাখ উহা প্রকাশ হইতে আরম্ভ হয়। ত্রিংশৎ সহস্র 'ভারত শ্রমজীবী' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইত। সকল জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটরা উক্ত পত্র লইতেন। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের কৃষকদিগের হস্তে উক্ত পত্রিকা দেখা গিয়াছিল!

ইংলিসম্যান, পাইওনিয়র প্রভৃতি কাগজে উক্ত পত্রিকার বিশেষ প্রশংসা প্রকাশ হইয়াছিল।

শশীপদ বাবু মনে করিয়াছিলেন যে, হিন্দি ও আসামী ভাষাতেও 'ভারতশ্রমজীবী' প্রকাশ করিবেন। কিন্তু সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

ইয়োরোপে শ্রমজীবীদের উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা হইয়াছে। অনাথ বালক বালিকাদের শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে নানাস্থানে একপ্রকার স্কুল হইয়াছে; উহার নাম 'Ragged Schools.' এই র‍্যাগেড স্কুল সংস্থাপন বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী ডাক্তার গাথ্রি (Dr. Guthrie)। তিনি এ বিষয়ে কেমন করিয়া বিশেষভাবে উৎসাহিত হইয়াছিলেন, তদ্বিবরণ বড়ই আশ্চর্য্য ও শিক্ষাপ্রদ।

পোর্টস্‌মাউথ নগরে একজন সামান্য দীন হীন লোক ছিলেন। লোকের জুতা সিলাই করিয়া তিনি জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার নাম জন পাউণ্ডস্ (John Pounds)। এই জন পাউণ্ডস্ অন্যূণ ৫০০ শত অনাথ বালককে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তাঁহাকে নিজের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য অবশ্য সময় দিতে হইত। তাহার উপর, যে সকল অনাথ বালক পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়, যাহাদের ভবিষ্যতে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াই উদর পূরণ করিবার সম্ভাবনা, তাহাদের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করিতেন। এই সকল পিতৃমাতৃহীন, অনাথ বালককে বিদ্যালয়ে আনিবার জন্য তিনি পথে পথে ঘুরিতেন। বালকেরা সহজে তাঁহার আহ্বানে আসিবে কেন? তিনি সেই জন্য তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিবার উদ্দেশ্যে গরম আলু সিদ্ধ লইয়া পথে পথে ঘুরিয়া তাহাদিগকে ডাকিতেন। গরম আলুসিদ্ধ পাইবার লোভে তাহারা জন পাউণ্ডসের সঙ্গে আসিত ও স্কুলে ভর্ত্তি হইত। এইরূপে তিনি অন্যূন ৫০০ শত অনাথ বালককে মানুষ করিয়াছিলেন। তাহারা লেখা পড়া শিখিয়াছিল ও ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিল।

জন পাউণ্ডসের বিষয় অবগত হইয়া ডাক্তার গথরি বলিয়াছিলেন;—

> আমি মনে মনে আপনাকে ধিক্কার করিলাম। আমি যে সামান্য কার্য্য করিয়াছিলাম তাহার জন্য আমি আপনাকে তিরস্কার করিলাম। জন পাউণ্ডসের কার্য্যের কথা অবগত হইয়া আমার হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। তাঁহার কার্য্য দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। আমার স্মরণ হইতেছে যে, জন পাউণ্ডসের বিষয় উল্লেখ করিয়া আমার এক জন সঙ্গীকে উৎসাহের সহিত বলিয়াছিলাম, 'ঐ লোকটি মানবজাতির গৌরবস্বরূপ, উনি বৃটেন দ্বীপের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রাপ্ত হইবার যোগ্য ব্যক্তি। *

জন পাউণ্ডসের বিবরণে আমরা এই একটি মহৎ শিক্ষা লাভ করিতে পারি যে, আমরা যত কেন দরিদ্র, যত কেন সামান্য অবস্থার লোক হই না, যত কেন মূর্খ হই না, তথাচ আমরা লোকের হিতের জন্য অনেক মহৎ কার্য্য করিতে পারি। আমি গরিব, আমি কি করিতে পারি, ইত্যাদি কথার কোন অর্থ নাই। যদি ইচ্ছা থাকে, যত্ন থাকে, মানুষ অনেক হিতকর কার্য্য করিতে পারে।

ইয়োরোপের এক জন বড় লোক বলিয়াছেন, অন্য লোকের হিতের জন্য জীবনধারণ কর। ভারতের পূজ্যপাদ প্রাচীন মহর্ষি বলিয়াছেন, "বৃক্ষ লতাও জীবনধারণ করে, পশু পক্ষীরাও জীবনধারণ করে, কিন্তু পরের জন্য যিনি জীবনধারণ করেন, তিনিই যথার্থ জীবনধারণ করেন।"

ধনী লোক বা মধ্যবিত্ত লোক কয় জন? দেশের অধিকাংশই গরিব লোক, তাহারা কত কষ্টে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পরিবারগণের অন্ন সংগ্রহের চেষ্টা করে। কত দুঃখী লোক রহিয়াছে যাহারা উপযুক্তরূপ অন্নসংগ্রহে অক্ষম। এই সকল দুঃখী লোকের হিতসাধনের জন্য, তাহাদের অবস্থোন্নতি ও শিক্ষার জন্য, যাঁহারা চেষ্টা করিবেন তাঁহারাই দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিবেন। তাঁহাদের জীবন ধন্য হইবে।

জেমস্ মার্টিনো।

বর্ষপ্রারম্ভে জ্ঞান ও বয়োবৃদ্ধ ভক্তিভাজন ডাক্তার জেমস্ মার্টিনো দীর্ঘজীবনব্রত উদ্যাপনান্তর অমরধামে আহূত হইয়াছেন। তাঁহার জন্য দুঃখ করিবার কিছু নাই। ইহকাল ও পরকালের ব্যবধান তাঁহার পক্ষে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; জীবনপথের সহযাত্রীগণ সকলেই বহুপূর্ব্বে অমৃতরাজ্যে স্থান লাভ করিয়াছেন। সুতরাং যদি কোনও বিশেষ স্থান

*"I felt ashamed of myself. I felt reproved for the little I had done. My feelings were touched. I was astonished at his achievements; and I well remember, in the enthusiasm of the moment, saying to my companion * *.

'That man is an honour to humanity and deserves the tallest monument ever raised within the shores of Britain.

মহাত্মা জেমস্ মার্টিনো।

ডাক্তার মার্টিনোর নিকট বিশেষভাবে আপন ও প্রিয়দেশ বলিয়া গণ্য হইত, তবে তাহা সেই মৃত্যুর পরপারস্থিত অমৃতময় রাজ্য।

প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার মার্টিনো কার্য্যক্ষেত্র হইতে একপ্রকার অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বশেষ পুস্তক Seat of Authority in Religion ১৮৯০ সালে প্রকাশিত হয়। তারপর কদাচিৎ সাময়িক পত্রিকাতে দুই একটী প্রবন্ধ লিখা ভিন্ন তিনি আর কিছুই করিতে পারেন নাই। কিন্তু যদিও ধর্ম্মমন্দির বা কলেজের গৃহে তাঁহার গম্ভীর বাণী বহু দিন শ্রুত হয় নাই, এবং শত বর্ষের শ্রমে শ্রান্ত অঙ্গুলি হইতে তাঁহার অমরলেখনী ধীরে ধীরে প্রায় স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি জ্ঞানী ও তত্ত্বানুসন্ধিৎসু সমাজে মার্টিনোর জীবনের প্রভাব শেষ দিন পর্য্যন্ত জীবন্ত ছিল। মার্টিনো বর্ত্তমান সময়ের আস্তিক দার্শনিকগণের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়াইয়া স্থিরদীপ্তি নক্ষত্রের ন্যায় চতুর্দ্দিকে শান্তোজ্জ্বল কিরণধারা বর্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ও "ঈশ্বর ও আত্মা" (God and the Soul) প্রণেতা রেভারেণ্ড রিচার্ড আর্ম্মষ্ট্রং মার্টিনোর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে একটী উপদেশে বলিয়াছেন—"আজ এই দেশে (ইংলণ্ডে) এবং অন্যত্র এমন সহস্র সহস্র নরনারী রহিয়াছেন যাঁহাদের মনের উপর, অনেক স্থলে তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে, মার্টিনোর প্রভাব আশ্চর্য্যভাবে কার্য্য করিতেছে। কারণ তিনি কত লেখক, কত শিক্ষক, কত চিন্তাশীলকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং কত শত ধর্ম্মাচার্য্যগণ তাঁহারই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন! তাঁহাদের চিন্তা গর্ডনস্কোয়ারের (মার্টিনের লণ্ডনস্থ আবাস-ভবন) নিভৃত কক্ষনিঃসৃত চিন্তায় অনুরঞ্জিত হইয়াছে; এবং সূত্র হইতে সূত্রান্তর বহিয়া সেই বৈদ্যুতিক প্রভা অসংখ্য মানবপ্রাণে প্রতিভাত হইয়াছে! তাঁহারা জানেনওনা কেমন করিয়া সেই জীবন্ত বাণী তাঁহাদিগের হৃদয় পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। যখন আমি চিন্তা করি, মার্টিনোর শিক্ষা ও প্রভাব ভিন্ন আমি কোন্ অন্ধকারে পড়িয়া থাকিতাম, তখন আমার হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া যায়"।

মার্টিনোর ধর্ম্ম ও দার্শনিক মত বিষয়ে এ প্রবন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা নাই। দার্শনিক তত্ত্ববিষয়ে বহুল মতভেদ চিরদিনই রহিয়া গিয়াছে এবং হয়ত থাকিবে। এমন কোনও দার্শনিক এ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই, যিনি সকল তত্ত্বে সকল প্রকার লোককে সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছেন। মার্টিনোও এ বিষয়ে অন্য দর্শনবিৎ অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যশালী নহেন। কিন্তু মার্টিনো যে স্বপক্ষ ও বিপক্ষ সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। তাঁহার দীর্ঘ জীবনের যত্নসঞ্চিত জ্ঞানরাশি ও বিমলচরিত্রের দৃষ্টান্ত জগতের চিরন্তন সম্পত্তি হইয়া থাকিবে।

যে সকল সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি মার্টিনোর সহিত সাক্ষাৎ যোগে যুক্ত ছিলেন, তাঁহারা জীবনের অবশিষ্ট সময় নিশ্চয়ই এক মহা শূন্যতা অনুভব করিবেন। মহাপুরুষগণের এই এক বিশেষ লক্ষণ, যে তাঁহাদের উপদেশ ও শিক্ষার প্রভাব ভিন্ন আরও কি এক রহস্যময়ী বৈদ্যুতিক শক্তি তাঁহাদের প্রাণ হইতে বহির্গত হইয়া নিকটবর্ত্তী জনসমূহকে অনুপ্রাণিত করে। তাঁহাদের নিকট দুই এক দণ্ড বসিলে প্রাণে যেন নূতন বল আসে। চুম্বক নিকটস্থ লৌহ খণ্ডকে আত্মগুণ সমন্বিত করে; মহাপুরুষদিগেরও সেই শক্তি আছে। যাঁহারা ডাক্তার মার্টিনোর সন্নিহিত হইবার সুবিধা পাইতেন, সকলেই এই উন্মাদিনী শক্তি অনুভব করিতেন। নবতিবর্ষের বৃদ্ধ উৎসাহে যেন আগুনের মত জ্বলিতেন। সৌভাগ্যক্রমে আমার একবার মার্টিনোকে দেখিবার সুবিধা হইয়াছিল। সে মুহূর্ত্ত আমার হৃদয়ে যে ছবি অঙ্কিত করিয়া গিয়াছে, তাহা কখনও মুছিয়া যাইবে না। আমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, কি দেখিতে গিয়াছিলে? তাহা হইলে ঈশার ভাষায় উত্তর দিই—"Ay a prophet and more than a prophet."

গত বৎসর মার্চ্চমাসে এক দিন অপরাহ্ণে আমি মার্টিনোকে দেখিবার জন্য তাঁহার বাড়ী গেলাম। কুমারী মার্টিনো পূর্ব্বেই আমাকে সাবধান করিবার জন্য বলিয়া দিলেন—"বাবা বড় দুর্ব্বল, বেশী ক্ষণ কথা বলিতে পারেন না"। আমি গৃহদ্বারে প্রবেশ করিবা মাত্র বৃদ্ধ কাঁপিতে কাঁপিতে অগ্রসর হইয়া আমার হস্ত গ্রহণ করিলেন। এমন এক সহৃদয়তা—যেন কত দিনের বন্ধু! বেশী কথা বলিতে পারিলেন না; কিন্তু স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম, কত কথাই বলিতে চান। আমি যখন বিদায় হইবার জন্য উঠিলাম, বৃদ্ধ আমার সঙ্গে দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আসিতে চান। আমি তাহাতে কিছুতেই সম্মত হইব না, তিনিও না আসিয়া ছাড়িবেন না। শেষে কুমারী

মার্টিনো মাঝে পড়িয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। আমি চলিয়া আসিলাম। যত ক্ষণ দেখা গেল ততক্ষণ তিনি আমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। শেষে যখন আমি দ্বারের অন্তরালে পড়িলাম, তখন বৃদ্ধ আপনার হস্ত চুম্বন করিয়া আমার দিকে প্রসারিত করিলেন! এ কি অপূর্ব্ব প্রেম! না জানি যাঁহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহার সহবাস সম্ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা সে চরিত্রের কতই মহত্ত্ব দেখিয়াছেন! সেদিন হইতে আমি এক নূতন মার্টিনোকে জানিয়াছি।

এত দিন মার্টিনো আমার নিকট তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন দার্শনিক মাত্র ছিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই মার্টিনোর পুস্তকগুলির সঙ্গে আমার পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহার গভীর চিন্তা ও ভাষার ঐশ্বর্য্যের অনুসরণ করিতে অনেক সময় আমার দুর্ব্বল মস্তিষ্ক শ্রান্ত হইয়া পড়িত। সুতরাং আমি মনে করিতাম, মানুষটাও তাঁর রচনার ন্যায় দুর্ব্বোধ্য; তিনি এত উর্দ্ধে যে আমরা কখনই তাঁহার নিকটস্থ হইতে পারিব না। কিন্তু তাঁহাকে দেখিবা মাত্র সে ভ্রম ঘুচিয়া গেল। এমন করিয়া এক মুহূর্ত্তে মানুষকে বুকের ভিতর টানিয়া লইবার শক্তি তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষদেরই থাকে! এক দিকে এমন সরল সহজ শিশুভাব, অপর দিকে গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য্য—এই উভয়ের সম্মিলন বর্ত্তমানকালে আমাদের দেশে বড় দুর্ল্লভ। মার্টিনোকে দেখিয়া আমাদের পুরাকালের ঋষিগণের কথা মনে পড়িয়াছিল।

ডাক্তার মার্টিনোর বাহ্যজীবন বহু ঘটনাপূর্ণ নয়। সংসারের ত তিনি ছিলেন না, সংসারও তাঁহার বেশী সংবাদ রাখিত না। কিন্তু মার্টিনোর নাম ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রকৃত ইতিহাস হইতে মুছিয়া যাইবে না। মার্টিনো আপনার জীবন সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"আশী বৎসরের কার্য্য প্রবাহের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখি, যে জীবনের ইতিহাস এই সামান্য কয়টা কথায় ব্যক্ত করা যায়ঃ—যখন যাহা সৎ ও সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, কিছুমাত্র গোপন না করিয়া তাহার প্রকাশ করিয়াছি।" ইহাই মার্টিনোর সমগ্র জীবনের ইতিহাস। তাঁহার সমাধিস্তম্ভে এই কয়টী কথা বেশ লিখিয়া রাখা যায়।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল তারিখে নরউইচ সহরে জেমস মার্টিনোর জন্ম হয়।* ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে ধর্ম্মবীর লুথার কর্ত্তৃক প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় স্থাপিত হওয়ার পর ফ্রান্সের দরিদ্র কৃষকগণের মধ্যে বহুলপরিমাণে তাহার বিস্তার হয়। প্রথম হইতেই কাথলিক সমাজের উত্তেজনায় গবর্ণমেণ্ট তাহাদের প্রতি অমানুষিক উৎপীড়ন করেন। পরে কিছু দিনের জন্য "এডিক্ট অব ন্যাণ্ট্স্" নামক বিখ্যাত রাজাজ্ঞায় তাহাদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীনতা দেওয়া হয়। মহাপ্রতাপশালী রাজা চতুর্দ্দশ লুইএর রাজত্বকালে ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে সেই অধিকার প্রত্যাহৃত হইলে, আবার তাহাদিগের প্রতি ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ হয়! সেই সময়ে মার্টিনোর পূর্ব্বপুরুষগণ প্রাণভয়ে ফ্রান্স হইতে পলায়ন করিয়া ইংলণ্ডে নরউইচ নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে জেমস্ নরউইচের গ্রামার স্কুলে প্রেরিত হন। মার্টিনোর পিতামাতা ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। তৎকালে ইউনিটেরিয়ানদিগকে সাধারণ বিদ্যালয়ে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইত; এই জন্যই, বোধ হয়, চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রমকালে জেমস্‌কে ব্রিষ্টল সহরে পাঠান হয়। ব্রিষ্টলে ডাক্তার

* জেমসের পিতা টমাস মার্টিনো কামলেট নামক এক প্রকার বস্ত্র ও সুরার বণিক ছিলেন; তাঁহার মাতার নাম এলিজাবেথ। অন্যান্য অনেক বিখ্যাত লোকের ন্যায় মার্টিনোর জীবনেও পিতা অপেক্ষা মাতার প্রভাব অধিক। মার্টিনো তাঁহাদের সপ্তম সন্তান; তাঁহার ভগ্নি হ্যারিয়েট মার্টিনো তাঁহার অপেক্ষা তিন বৎসরের বড় ছিলেন। হ্যারিয়েট অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্না ছিলেন, এবং স্বীয় রচনা দ্বারা জেম্‌সের অনেক পূর্ব্বে যথেষ্ট সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। শৈশবে তাঁহাদের মধ্যে সহোদরসুলভ প্রীতির অভাব ছিল না। কিন্তু দুঃখের বিষয় ফ্রান্সিস ও জন নিউম্যানের ন্যায়, হ্যারিয়েট ও জেমসের মত ও বিশ্বাস পরিণামে সম্পূর্ণ বিভিন্ন দিকে যাওয়ায়, তাঁহাদের সৌহার্দ্যে ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। হ্যারিয়েট অল্প বয়সেই প্রত্যক্ষবাদের (Positivism) প্রতি অনুরক্তা হইয়া পড়েন। জেমস্ তাঁহার রচিত Mesmeric Atheism নামক পুস্তকের তীব্র সমালোচনা করেন; সেই হইতে উভয়ের মধ্যে দূরত্ব আসিয়া পড়ে। ১৮৮৪ সালে মার্টিনো দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, তিনি সহোদরার বিরাগভাজন হওয়ার মত কোন কাজ করিয়াছেন বলিয়া জানেন না। নিউম্যান সহোদরদ্বয়ের একজন পোপের নিকট আত্মসমর্পণ ও অপর একেশ্বরবাদ ঘোষণায় ব্রতী হওয়ার পরেও তাঁহাদের মধ্যে স্নেহের বন্ধন যেমন অটুট ছিল আমাদের তেমন না থাকার কোনও কারণ ছিল না। এরূপ দূরব্যবহিত চিন্তার গতি অবশ্য পরস্পরের সমউদ্দেশ্য ভূমিকে অল্পায়ত্ত না করিয়াই থাকিতে পারে না। কিন্তু তবু ত সেই এক বিবেকবাণীর নিকট বিশ্বস্ততা রহিয়াছে। তা ছাড়া শৈশবের শত মধুর স্মৃতি, সম উদ্দীপনা, বন্ধুত্ব, অবশিষ্ট অনেক প্রীতি ও কর্ত্তব্যে একপ্রাণতা অক্ষত রহিয়াছে। সুতরাং আমার পক্ষ হইতে আমি তাঁহার প্রতি কোনও স্নেহের ত্রুটি অনুভব করি নাই।"

কার্পেণ্টার ও তাঁহার কন্যা ভারতে সুবিখ্যাত কুমারী মেরী কার্পেণ্টারের অধীনে দুই বৎসর কাল থাকিয়া জেমস্ শিক্ষালাভ করেন। এখানেই মার্টিনোর জীবনে প্রথম ধর্ম্মভাবের বীজ রোপিত হয়। এই সময়ের কথা উল্লেখ করিয়া মার্টিনো লিখিয়াছেন, যে "ইহা এমনি প্রগাঢ়-রূপে আমার উপর কার্য্য করিয়াছিল এবং এমনি স্পষ্টভাবে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের গতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল যে, তখন হইতেই আমার বর্ত্তমান জীবনের প্রকৃত আরম্ভ বলিয়া সর্ব্বদা আমার মনে হয়।"।

মার্টিনোর পিতা তাঁহাকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। সুতরাং ১৮ আঠার বৎসর বয়ঃক্রমকালে ডার্বি নগরে একটা কারখানায় তাঁহাকে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু মার্টিনোর স্বভাবতঃ গভীর ও জ্ঞান পিপাসু মন এই কার্য্যে তৃপ্ত হইল না। পর বৎসর ডার্বি নগরে অবস্থান কালেই তাঁহার জীবনের মহা পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহার মাতুল কন্যা ক্যাথারাইন র‍্যাঙ্কিন রেভারেণ্ড হেনরী টার্ণার এর সহিত শুভ পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু হেনরীর অকাল মৃত্যুতে ইঁহাদের বিবাহিত জীবনের সমস্ত আশা ভগ্ন হইয়া গেল। এবং এই সময়ে ১৮২২ সালে হেনরীর সমাধিক্ষেত্রের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শোক, প্রেম ও ধর্ম্মজীবনের প্রভাব দর্শন করিতে করিতে, মার্টিনোর মন এক অভিনব ভাবে পূর্ণ হইয়া গেল। মার্টিনো ঈশ্বর সেবায় আপনার জীবন উৎসর্গ করিতে মনস্থ করিলেন। ১৮২২ সালে মার্টিনো ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজে প্রবেশ করিলেন। ১৮২৭ সালে কলেজ হইতে বহির্গত হইয়া তিনি এক বৎসর কাল ব্রিষ্টলে ডাক্তার ল্যাণ্ট কার্পেণ্টারের স্কুলে তাঁহার সহকারীর কার্য্য করেন। পর বৎসর ডবলিন সহরে একটা ইউনিটেরিয়ান চেপেলে ধর্ম্মাচার্য্যের সহকারীর পদ পাইয়া তথায় যান। কিন্তু সেখানে বেশী দিন তাঁহার থাকা ঘটে নাই। চারি বৎসর পরে তিনি উক্ত চেপেলের প্রধান আচার্য্যের পদে বৃত হন। ঐ সময়ে এই চেপেলের জন্য রাজকোষ হইতে একশত পাউণ্ড সাহায্য প্রদত্ত হইত। মার্টিনো তাহা লওয়া ন্যায্য মনে না করিয়া আচার্য্যের পদ ত্যাগ করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁহার যশঃ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল; সুতরাং তাঁহাকে নূতন কর্ম্মের জন্য বেশী দিন অপেক্ষা করিতে হইল না। ১৮৩২ সালে তিনি লিভারপুল সহরে একটী উপাসকমণ্ডলী কর্ত্তৃক আচার্য্যপদে বৃত হইলেন। এবং এই সময় হইতে চল্লিশ বৎসর কাল একাগ্রমনে ইউনিটেরিয়ান্ সমাজের সেবা করিয়া, ইংলণ্ডের ধর্ম্মতত্ত্বে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন।

ধর্ম্মজগতে মার্টিনোর প্রভাব বুঝিতে হইলে ইংলণ্ডের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে দুই একটা কথা জানা আবশ্যক। ইউনিটেরিয়ান সমাজই ইংলণ্ডে ধর্ম্মসংস্কারের পথপ্রদর্শক। প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া প্রায় দুই শত বৎসর হইতে তাঁহারা পৃথক সমাজ স্থাপন করিয়াছেন। ক্রমে তাঁহাদের চেষ্টা ও আদর্শ অন্যান্য কারণের সহিত মিলিত হইয়া খৃষ্টসমাজকে দিন দিন প্রসারিত ও সংস্কৃত করিতেছে। কিন্তু মার্টিনো যখন ধর্ম্মাচার্য্যের কার্য্য গ্রহণ করেন, তখন ইউনিটেরিয়ান সমাজও নিতান্ত ভ্রম-সঙ্কুল ছিল। যদিও তাঁহারা ঈশাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করিতেন না, তথাপি তাঁহাকে একপ্রকার ঈশ্বররূপেই অর্চ্চনা করিতেন। বাইবেলের অভ্রান্তত্ব, ঈশার অমানুষিকতা, ঈশার সহায়তা ভিন্ন মুক্তির অভাব প্রভৃতি অনেক অলৌকিক বিশ্বাস ইউনিটেরিয়ান সমাজে অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া আসিতেছিল। মার্টিনো নিজেও এই সঙ্কীর্ণতার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। ডবলিনে আচার্য্যপদ গ্রহণ-সময়ে তিনি ঈশাকে ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে একমাত্র মধ্যবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে চিন্তা ও আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে লাগিল। মার্টিনোর মত পরিবর্ত্তনে পুরাতন সম্প্রদায়ের ইউনিটেরিয়ানগণ বড় ভীত হইলেন; কারণ তাঁহারা জানিতেন যে তাঁহার মত ক্ষমতাশালী আচার্য্য শীঘ্রই অনেককে আপনার মতাবলম্বী করিতে সমর্থ হইবেন। সুতরাং মার্টিনোর বিরুদ্ধে শীঘ্রই ঘোর প্রতিবাদ আরম্ভ হইল। আচার্য্যপদ গ্রহণের পর হইতে জীবনের শেষ কাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে সর্ব্বদা সংগ্রামের মধ্যেই বাস করিতে হইয়াছিল। তর্কবিতর্কে মার্টিনো অসাধারণ ক্ষমতাশালী ছিলেন। তিনি যাহার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিতেন, তাহার মত খণ্ড বিখণ্ড না করিয়া ছাড়িতেন না। একদিকে অন্ধ বিশ্বাসিগণের যুক্তিবিহীন কুসংস্কার, অপরদিকে বিজ্ঞানবিদ্‌গণের অযথা সন্দেহ, এই উভয় শত্রুর আক্রমণ হইতে মানবহৃদয়নিহিত সহজ সরল বিমল একেশ্বরবাদ রক্ষা করা মার্টিনোর জীবনের ব্রত হইয়াছিল। দার্শনিক বলিয়াই ইউরোপে মার্টিনো বিখ্যাত; কিন্তু দর্শন মার্টিনোর প্রধান লক্ষ্য ছিল না। ধর্ম্মবিশ্বাস তাঁহার জীবনের কেন্দ্র; দার্শনিকগণ যখন তাঁহার বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন তিনি তাঁহাদেরই অস্ত্রে তাঁহাদের আক্রমণ নিবারণ করিবার জন্য দর্শনের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ যদি কেবল মার্টিনোর দর্শনবিষয়ক পুস্তকগুলি পাঠ করেন, তবে তিনি তাঁহাকে সম্যক্ বুঝিতে পারিবেন না। তিনি তাঁহার পাণ্ডিত্য, চিন্তাশীলতা, তীক্ষ্ণধীশক্তি দেখিয়া মোহিত হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের গভীরতা ও আত্মার সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে তাঁহার ধর্ম্মোপদেশগুলি পাঠ করা প্রয়োজন। মার্টিনোর দর্শনবিষয়ক পুস্তকগুলি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতার পরিচায়ক, কিন্তু উপদেশগুলি তাঁহার আত্মার প্রকৃত ছবি। যাহা হউক ঊনবিংশ শতাব্দীর ভ্রম কুসংস্কার ও অবিশ্বাসের মধ্যে মানবাত্মার জন্য সরস সুবিমল ধর্ম্মের উৎস রক্ষা করা উভয়েরই উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে মার্টিনো যেমন কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, সকল সংস্কারকদিগের অদৃষ্টে তাহা ঘটে না।

প্রচলিত খৃষ্টীয় কুসংস্কারের সঙ্গে মার্টিনোর প্রথম সংগ্রাম উপস্থিত হয়। তাঁহার লিভারপুলে আগমনের কিছুদিন পরেই তত্রত্য খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মযাজকগণ ইউনিটেরিয়ান মতের ভ্রান্তি ঘোষণা করিয়া তর্কযুদ্ধ প্রার্থনা করিলেন। ইউনিটেরিয়ানদের পক্ষ হইতে মার্টিনো ও তাঁহার কয়েকজন বন্ধু উত্তর দিলেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত সেই যুদ্ধ চলিয়াছিল, এবং তাহাতে মার্টিনো সম্পূর্ণ জয়ী হইয়াছিলেন। আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজক ডাক্তার চ্যানিং এই তর্ক সম্বন্ধে হ্যারিয়েট মার্টিনোকে লেখেন—"আপনি আপনার ভ্রাতা জেমসের কথা লিখিয়াছেন। আপনাকে শেষ পত্র লেখার পর আমি তাহার সমস্ত বক্তৃতাগুলি পড়িয়াছি। আমার নিকট সেগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। সেগুলি হইতে আমি যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিয়াছি। বাস্তবিক তাহার ও মিঃ টমের বক্তৃতার ফলে ইংলণ্ডে সত্যের বিস্তার সম্বন্ধে আমার নূতন আশা হইতেছে।" প্রাচীন মহারথীর মুখ হইতে অনভিজ্ঞ যুবকের সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা অধিক প্রশংসার কথা আর কি হইতে পারে?

প্রাচীন সম্প্রদায়ের ইউনিটেরিয়ানেরা আপনাদের পিতৃ-পিতামহদিগের নিকট প্রাপ্ত মত লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন, আর বেশী অগ্রসর হইতে প্রস্তুত ছিলেন না। মনে করিতেন, একটু উদারতা ভাল, বেশী বাড়াবাড়ি কিছু নয়। সুতরাং মার্টিনো যখন বিশ্বজনীন সর্ব্বজনহৃদয়নিহিত উদার একেশ্বরবাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। কিন্তু মার্টিনো পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র নন; তাঁহার অকাট্য যুক্তি, অতুল সহিষ্ণুতা, ও পবিত্রজীবনের প্রভাবের সম্মুখে সব বাধা বিঘ্ন ভাসিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহা এক দিনে হয় নাই। চল্লিশ বৎসরের অবিরাম চেষ্টার পর মার্টিনো সমগ্র ইউনিটেরিয়ান সমাজের হৃদয় অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রথম জীবনের অবিশ্বাস ও প্রতিকূলতার পরিবর্ত্তে শেষ জীবনে মার্টিনো ইউনিটেরিয়ান সমাজে সাধুর (Saint) ন্যায় সম্মানলাভ করিয়াছিলেন। মার্টিনোর শেষ জীবন বড়ই সুখে কাটিয়াছে। দীর্ঘজীবনের কর্ম্মাবসানে সর্ব্বজনপূজিত হইয়া এরূপ বিশ্রামসম্ভোগ কয় জনের ভাগ্যে ঘটে?

১৮৪০ সালে মার্টিনো আংশিকরূপে ম্যাঞ্চেষ্টর কলেজের দর্শনাধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। তখন ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজ ম্যাঞ্চেষ্টার নগরে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মার্টিনো লিভারপুল সহর হইতে সপ্তাহে দুই দিন ম্যাঞ্চেষ্টরে আসিয়া বক্তৃতা দিতেন। জন জেমস্ টেলার তখন ম্যাঞ্চেষ্টার কালেজের প্রিন্সিপাল ও মিঃ টম অদূরবর্ত্তী নটিংহাম সহরে একটা চেপেলের আচার্য্য। সাপ্তাহিক উপদেশ ও কালেজে শিক্ষাদান ভিন্ন তাঁহারা আপনাদিগের মত প্রচারের জন্য Prospective Review ও National Review নামে সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত করিলেন। মার্টিনোর অনেকগুলি বিখ্যাত প্রবন্ধ এই দুই পত্রিকাতে বাহির হয়। এইরূপে ক্রমে মার্টিনোর কার্য্যক্ষেত্র পরিসর লাভ করিতেছিল; এমন সময়ে তাঁহার জীবনে এক মহাপরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। তিনি নিজে তাহাকে "জ্ঞানরাজ্যে নবজীবন লাভ" বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

১৮৪৮ সালে ১৫ মাসের ছুটী লইয়া মার্টিনো জর্ম্মাণীতে যান; সেখানে তিনি অধ্যাপক ট্রেণ্ডেলেনবার্গের বক্তৃতা শ্রবণ করেন; এবং অধিকাংশ সময় প্লেটো, এরিষ্টোটল ও হেগেল পাঠে অতিবাহিত করেন। এই পোনের মাসের

পাঠ ও আলোচনার কালে তাঁহার চিন্তারাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত হয়। বিগত পঁচিশ বৎসর কাল যে দর্শনের মতে আস্থা স্থাপন করিয়া আসিতেছিলেন, এখন তাহা তাঁহার নিকট অসম্পূর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হইল। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সে আপনার দার্শনিক মত পরীক্ষা করিয়া নূতন বিশ্বাসের নূতন ভিত্তি স্থাপন, মার্টিনোর জীবনে আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ ঘটনা বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। তিনি যে বলিয়াছিলেন, যখন যাহা সৎ ও সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহাই প্রকাশ করিয়াছি, ইহাই তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। আপনার ভ্রম দেখিয়া তাহা সংশোধন করিতে বিশেষ কিছু মহত্ত্বের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ৫০ বৎসর বয়সে ২৫ বৎসর কাল যে মত নিজে বিশ্বাস করিয়াছেন ও অন্যকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার ভ্রম দেখিতে বিশেষ মহত্ত্বের প্রয়োজন হয়। দার্শনিক জগতে এমন দৃষ্টান্ত বড় বেশী দেখি না। আজীবনের চিন্তার ছাঁচ ভাঙিতে প্রবল মনের প্রয়োজন। আমি অনেক সময় দেখিয়াছি, যে পঁচিশ বৎসরের পর মানুষ আর নূতন শিক্ষা লাভ করিতে প্রস্তুত থাকে না। মার্টিনো আজীবন ছাত্র ছিলেন। ১৮৪০ সালে তিনি অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার দর্শনবিষয়ক বক্তৃতাগুলি এই সময়েই আরম্ভ হয়। কিন্তু দর্শনবিষয়ে তাঁহার প্রথম পুস্তক Types of Ethical Theory ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত হয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি সেগুলিকে ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত করিতেছিলেন। কোনও বিশেষ মতের নিকট তিনি আত্মবিক্রয় করেন নাই। সত্য তাঁহার লক্ষ্য; এবং যখন যেখানে যে সত্য পাইয়াছেন আগ্রহের সহিত আপনার ভ্রম স্বীকার করিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। মার্টিনো জর্ম্মানী হইতে সম্পূর্ণ নূতন চিন্তা লইয়া ফিরিলেন।

ইংরাজের চিন্তার গতি স্বভাবতঃই জড়বাদ অভিমুখীন বলিয়া মনে হয়। মার্টিনোর অনতিপূর্ব্বে বিখ্যাত ডাক্তার প্রিষ্ট্‌লী ইংলণ্ডের ধর্ম্মদর্শনের নেতা ছিলেন। মার্টিনোর সম্বন্ধে দেশ কাল শিক্ষা সকলই অধ্যাত্মদর্শনের প্রতিকূল ছিল। মার্টিনো আপনার মনের অবস্থা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, —"I was inevitably shut up in the habit of interpreting the human phenomena by the analogy of external nature Steeped in the emperical and necessarian mode of thought, I served out successive terms of willing captivity to Locke and Hartlay, to Collins, Edwards and Priestley, to Bentham and James Mill; aud though at times I was driven to disaffection by the dogmatism and acrid humours of the last two of these philosophers, my allegiance was restored and lengthened by literay and personal relations with the younger Mill."*

মার্টিনো মধ্যবয়স পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষবাদ (Empericism) ও মানব ইচ্ছার স্বাধীনতার হীনতায় (Necessarianism) এ বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিলেন। জর্ম্মানী যাইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মনে অসন্তোষ ও সংশয় উঠিয়াছিল। জর্ম্মণীতে ১৫ মাস অবস্থানের পর তিনি আপনার পূর্ব্ব গুরুগণের হস্ত হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাইলেন।

জর্ম্মণীতে মার্টিনো অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই; কিন্তু অন্যান্য অনেক ইংরাজ দার্শনিকের ন্যায় তিনি জর্ম্মান দার্শনিকগণের পরিত্যক্ত পরিচ্ছদ পরিধান করেন নাই। এক জন জর্ম্মাণ লেখক পরিহাস করিয়া বলিয়াছেন, মানবআত্মার অমরত্বের প্রমাণ এই যে জর্ম্মাণ দার্শনিকগণ মৃত্যুর পরে অক্সফোর্ডে স্থান প্রাপ্ত হন। অক্সফোর্ডের প্রতি শ্রদ্ধা সত্বেও সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতে হইতেছে যে কথাটা বড় মিথ্যা নয়। বর্ত্তমান সময়ে, অন্ততঃ দশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত—হেগেল অক্সফোর্ডে রাজত্ব করিতেছিলেন; তাহার অনেক পূর্ব্বেই তিনি জর্ম্মানি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু মার্টিনো যখন জর্ম্মাণীতে গিয়াছিলেন, সে সময়ে হেগেল জর্ম্মানির অস্থি-মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্দ্ধভাগে হেগেল জর্ম্মাণীতে যেমন আধিপত্য করিয়াছিলেন, আর কোনও দার্শনিক কোনও দেশে তেমন করিয়াছেন বলিয়া জানি না। চতুর রাজনীতিবিদ্ প্রিন্স বিসমার্ক, ভাবুক কবি গয়থে (Goethe) হইতে স্কুলের বালক ও রাস্তার মুটে সকলেই হেগেলিয়ান। মার্টিনোর মনের মৌলিকতা সে সংক্রামকতা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তিনি প্রত্যক্ষবাদের সংশয় হইতে ঝাঁপ দিয়া সর্ব্বগ্রাসী অদ্বৈতবাদের পাথারে আপনাকে হারাইলেন না। ঈশ্বরের সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব ও মানবত্মার দায়িত্বের সামঞ্জস্য তাঁহার দর্শনের মুখ্য সমস্যা। কত দূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছেন, সে অন্য প্রশ্ন।

পাঠকগণকে আশ্বাস দিয়াছিলাম যে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে মার্টিনোর দর্শনতত্ত্বসম্বন্ধে কিছু বলিব না। কিন্তু তাঁহার চরিত্র পরিস্ফুট করিবার জন্য যে কয়টী কথা লিখিতে হইল, আশা করি তজ্জন্য কেহ অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। মার্টিনোর দর্শনের স্থায়ী মূল্য নিরূপণ করিবার সময় এখনও হয়ত আইসে নাই। ইংলণ্ডে এপর্য্যন্ত মার্টিনোকে উপযুক্ত আদর প্রদত্ত হয় নাই। আমার মনে হয় ইংলণ্ড অপেক্ষা আমেরিকা ও ভারতবর্ষে মার্টিনো অধিক সম্মানিত হইয়াছেন। তাহার প্রধান কারণ এই যে, মার্টিনো ইউনিটেরিয়ান। তিনি যদি চার্চ্চ অব ইংলণ্ডের সভ্য হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় তাঁহার সম্মান ও প্রতিপত্তি অনেক অধিক হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইংলণ্ডেও সাম্প্রদায়িকতা বড় প্রবল। মার্টিনোর অপেক্ষা কত হীন লোককে যে সম্মান দেওয়া হইতেছে, মার্টিনোকে তাহাও দেওয়া হয় নাই, অথবা নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত প্রদত্ত হইতেছে। আমেরিকা ও জর্ম্মানীতে প্রথম ডাক্তার মার্টিনোর পাণ্ডিত্য স্বীকৃত হয়। ১৮৭২ সালে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে এস, এস, ডি এবং ১৮৭৫ সালে জর্ম্মানীর লীডেন বিশ্ববিদ্যালয় এস্, টি, ডি উপাধি প্রদান করেন। কিন্তু ১৮৮৮ সাল পর্য্যন্ত অক্সফোর্ড তাঁহার কোনও সংবাদ লন নাই। ইংলণ্ডে মার্টিনোর সম্যক্ সম্মানাভাবের আর এক কারণ এই, যে তিনি অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ করেন নাই। অক্সফোর্ড আপন সন্তানগণের প্রতি যেমন অনুরক্ত, অপর দিকে অন্যের প্রতি তেমনি উদাসীন। এই স্বজাতি, স্বজন ও স্বদলপ্রিয়তা ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র বিদ্যমান। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিপত্তি লাভ করিতে হইলে অক্সফোর্ডের শরণাগত হওয়া ভিন্ন উপায় নাই। সাধারণের নিকট মার্টিনোর প্রতিপত্তি লাভের আর এক প্রতিবন্ধক তাঁহার ভাষা। আমি বলিতে ইচ্ছা করি না, যে মার্টিনোর ভাষা অন্যরূপ হইলে ভাল হইত। তাঁহার পুস্তকের এক প্রধান সৌন্দর্য্য ভাষার ঐশ্বর্য্য; তাঁহার উপমাগুলি এমনি হৃদয়গ্রাহী, ছন্দের এমনি গাম্ভীর্য্য, শব্দবিন্যাসের এমনি পারিপাট্য যে অনেক সময়ে শুধু ভাষার মনোহারিত্বের জন্য তাঁহার পুস্তক পড়িতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু এই সব কারণেই প্রথমে বহু দিন পর্য্যন্ত অনেকের নিকট মার্টিনোর গ্রন্থ অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হইয়াছে। মার্টিনোর সঙ্গে বেড়াইতে হইলে খুব সবল পদ প্রয়োজন। পর্ব্বতোপরি ভ্রমণের ন্যায় মার্টিনোর গ্রন্থ পাঠে যথেষ্ট আনন্দ ও উৎসাহও আছে, কিন্তু প্রথমে অনেক ক্লেশ অপরিহার্য্য। এ পর্য্যন্ত কোনও বিদেশীয় ভাষায় মার্টিনোর পুস্তকগুলি অনুবাদিত হইয়াছে বলিয়া জানি না। আমার মনে হয়, ইহার প্রধান কারণ, তাঁহার ভাষার গাম্ভীর্য্য। উপরে প্রয়োজনবশতঃ যে কয়টী ছত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, পাঠকগণ তাহা হইতেই দেখিবেন মার্টিনোর গ্রন্থের অনুবাদ কত দুরূহ। আমাকে যদি কেহ বলেন যে মার্টিনোর গ্রন্থ অনুবাদের ফল স্বর্গলাভ, তাহা হইলেও আমি হয়ত একার্য্যে হাত দিতে সম্মত হই না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহার বহুমূল্য বক্তৃতাগুলি দুই তিনটী মাত্র ছাত্রের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। বৎসরের পর বৎসর তাঁহার দর্শন-শ্রেণীতে কয়েকজন মাত্র ছাত্র লইয়াই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। সহস্র শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে বক্তৃতা দিতে হইলে যেমন যত্নের সহিত প্রস্তুত হইতেন, ম্যাঞ্চেষ্টার কালেজে অধ্যাপনায়ও তাহাই করিয়াছিলেন। এক দিন মার্টিনো তাঁহার ছাত্রগণের সঙ্গে প্লেটো পড়িতেছিলেন। সক্রেটিস যেখানে আপনার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, যে তিনি এক কোণে দুটী কি তিনটী বালকের সঙ্গে দর্শনালাপ করিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, সেই স্থানে আসিয়া মার্টিনো একটুকু থামিয়া বলিলেন, "এ যেন ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া লেখা হইয়াছিল।" তাঁহার ছাত্রগণ ও তিনি খুব হাসিলেন।

চল্লিশ বৎসর এতাদৃশ পরিশ্রমের পর ১৮৮৫ সালে অশীতিবর্ষ বয়সে মার্টিনো কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৮০ ও ১৮৯০ সালের মধ্যে তাঁহার বক্তৃতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ১৮৯০ সাল হইতে তিনি ইহ জগৎ হইতে এক প্রকার বিদায় লইয়া অমৃতময়ের আহ্বান প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বর্ত্তমান বৎসরের ১১ই জানুয়ারি তারিখে ৯৫ বৎসরের দীর্ঘ জীবন ব্রত উদ্‌যাপনান্তর অমৃতের রাজ্যে প্রস্থান করিয়াছেন।

---

* পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া মার্জ্জনা করিবেন। একটু বিশেষ অভিপ্রায়েই আমি অনুবাদ এর পরিবর্ত্তে মূল ইংরাজী উদ্ধৃত করিয়াছি; পরে তাহার কৈফিয়ৎ দিব।

প্রদীপের উন্নতিকল্পে।

বাঙ্গালা সাহিত্য ও প্রদীপ আমাদের নিকট অভিন্ন। প্রদীপের পরিচর্য্যা করিয়া মাতৃভাষারই সেবা করিলাম ভাবিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধকরি। প্রদীপের উন্নতিকল্পে যাহা প্রয়োজন, সহজসাধ্যই হউক আর কষ্টসাধ্য হউক, করিতে কখনই কুণ্ঠিত নহি। এত কাল ব্যক্তি বিশেষের হস্তে প্রদীপ সম্পাদন ভার ন্যস্ত ছিল। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বিশেষ দক্ষতার সহিত প্রদীপ সম্পাদন করিয়া গ্রাহকবর্গ ও সাধারণের প্রীতি বর্দ্ধন করিয়াছেন। আমরা সেই জন্য তাহাদের নিকট চিরঋণী। কিন্তু দেখিলাম একের অনুরাগ ও যত্নের উপর নির্ভর না করিয়া যদি প্রদীপ দশের সমবেত যত্ন ও পরিচর্য্যা লাভ করিতে পারে, তবে ইহার উন্নতি ক্ষিপ্রতর হইবে। উদ্দেশ্য প্রদীপের উন্নতি, উপায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইবেই হইবে। এই উন্নতির উদ্দেশ্যে কয়েকজন সাহিত্যানুরাগী লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুলেখক লইয়া প্রদীপ পরিষদ গঠিত হইল। এখন হইতে প্রদীপ সম্পাদনভার এই পরিষদের হস্তে ন্যস্ত হইল। আশা করি পাঠক পাঠিকা স্বস্তি স্বস্তি বলিয়া এই শুভ অনুষ্ঠানে কায়মনোবাক্যে আমাদের সহায় হইবেন।

অবসান।

যাও তবে, সুরকন্যা, যামিনী পোহায় :
শুকতারা দেখে বা তোমায় !
এতকাল বুকে ভরি তোমারে রাখিনু ধরি,
সে সাধনে ঠেকে গেছি প্রণয়ের দায় ;
দেবতা সাধকে যথা, সবপ্রেমে একি প্রথা ?
জলে পশি কণ্ঠ তালু আরো যে শুকায়।

সবশেষ ? যাও যাও, কাল ব'য়ে যায় ;
সুখ নিশি পোহায় পোহায় !
কোন্ ত্রাসে কাঁপে বুক, কোন্ লাজে ম্লান মুখ ?
ধরা যদি পড়ে যাও জাগ্রত ধরায় ?
যাও তবে,—হায় হায়, যেওনা, কি বলাযায় ?
অবসান আচম্বিতে ডাকে যবে—আয়।

পূর্ণিমার রাজা, হের, সে ডাকে পালায় :
জ্যোৎস্নাময়ী হতাশে মিলায়।
সোনামুখি যূঁইবেলা, ছাড়ি ছাড়ি ফুল খেলা
সে সঙ্কেত ধ্বনি শুনি চমকিয়া চায় :
ভরি রজনীর ডালি শেষে ওই দিল ঢালি
আপনার মরণের লহরী লীলায়।

তোমার ভক্তের বাজী ভোর হয় প্রায় :
সুরকন্যা লুকাবে কোথায় ?
দিলে সারারাত্র ধ'রে সুধাপাত্র ভরে ভরে,
নিশি শেষে কেন এলে মাগিতে বিদায় ?
তোমার করুণা লভি কি রত্ন লুটিল কবি,
থাক্ থাক্, বুক ফাটে, কথা না জুয়ায়।

কি বলিব, প্রাণ কাঁদে ছাড়িতে তোমায় ;
কি আশ্বাসে দিবলো বিদায়।
আঁধারে দেখি ও ছবি কি সে কি এঁকেছে কবি.
পাগল ঘুরিতে ছিল রূপের নেশায়।
ধিকি ধিকি বহে আশা, প্রাণপূর্ণ ভালবাসা
আবার বাঁধিবে তোমা মর্ত্তের মায়ায়।

শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী।

সাবিত্রী।

হে সাবিত্রি, দাঁড়াইয়া পিতার সম্মুখে,
তেজোদীপ্ত কলেবরে, দেবর্ষির পাশে,
প্রদীপ্ত বিশালনেত্রে, স্থির দৃঢ় মুখে,
যে দিনে কহিলা তুমি মনের উচ্ছ্বাসে :—
"হে পিতঃ কন্যাকে দান করে একবার :
'দদানি' বচন বলা একবার যায় :
দত্ত ধনে কেহ কভু ফিরে নাহি চায় ;
সত্যবানে কেমনে গো করি পরিহার ?
পতিরূপে যবে তাঁরে বরিয়াছি, হায়,
অল্পায়ু, দীর্ঘায়ু, কিম্বা কুরূপ, সুন্দর,
তিনিই আমার পতি। কহি শুন সার,
কর্ম্মের নিশ্চয় মনে, ব্যক্তি রসনায়,
কার্য্যে অনুষ্ঠান ; তাই প্রমাণ অন্তর।"—
সেই দিনে রাখিলে গো মান মহিলার !

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

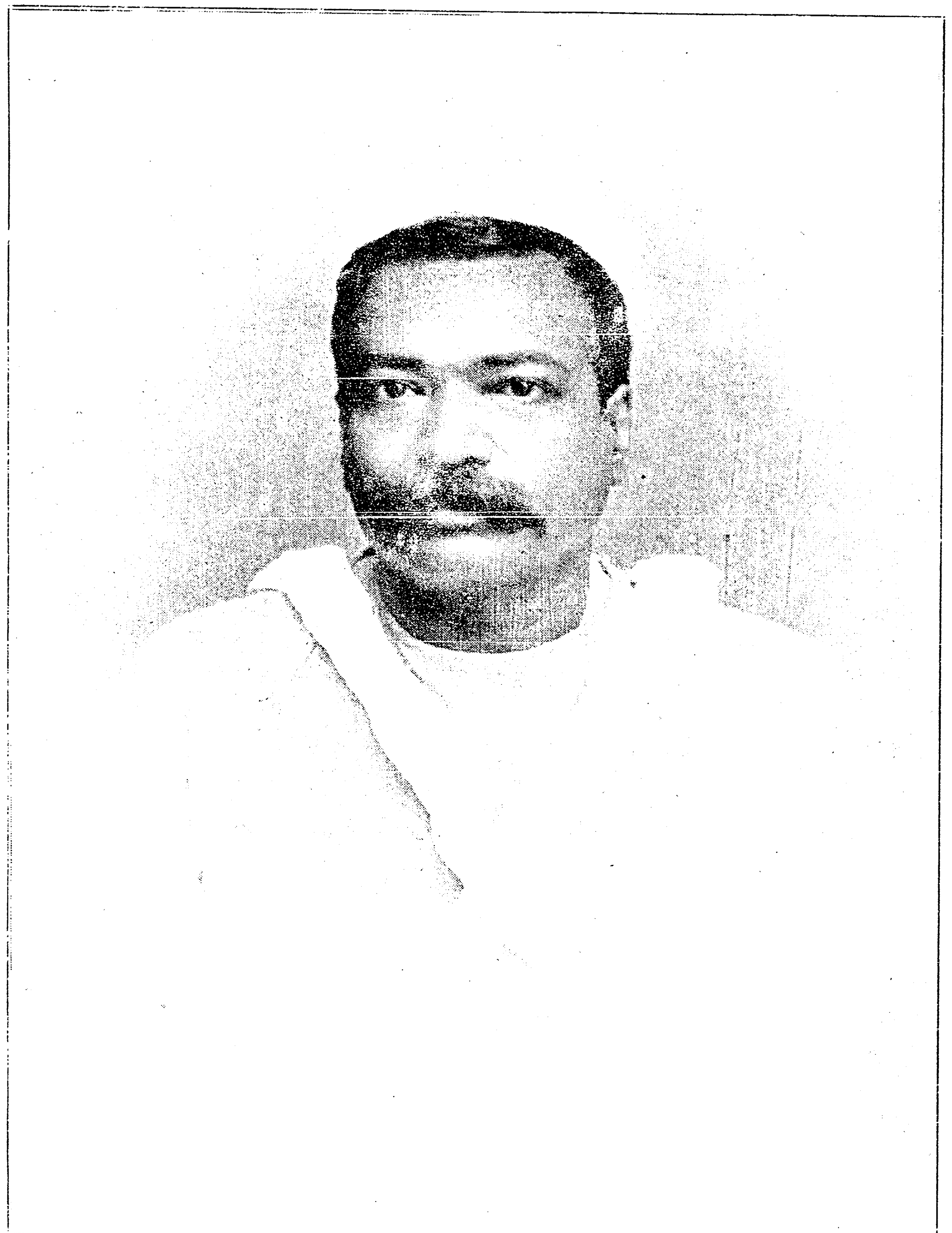

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন।

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

তৃতীয় ভাগ। } আষাঢ়, ১৩০৭। { ৭ম সংখ্যা।

মরত্ব।

কেহ বলে আছে প্রাণ মরণের তীরে ;
কেহ বলে, নাহি লোক মরত-অতীত ;
জগতের আদি হ'তে, মৃত অগণিত
নরনারী ; কেহ কভু আসে নাহি ফিরে !
কল্পনায় বিরচিয়া চির সুখধাম,
চলেছে জীবন-পথে দুঃখ ভারাকুল,
আশায় রাখিয়া ভর, অনন্ত বিপুল
বিমুগ্ধ এ জীবলোক !—কোথা পরিণাম ?
বৃথা আশা, বৃথা প্রেম ! কোথা কল্পতরু ?
সকলি মিলায়ে যায় বুদ্‌বুদ সমান !
এক যায়, আর আসে, জাগে নবপ্রাণ,
পুরাতন প'ড়ে থাকে শূন্য মহামরু !—
অজ্ঞেয় এ আদি অন্ত !—বংশ-পরম্পরা,
মরণের পর স্মৃতি—রাখে বসুন্ধরা।

মায়া।

ইন্দ্রিয়-দুয়ার দিয়া চলেছে বাহিয়া
অনন্ত বিশ্বের স্রোত অনন্ত লীলায় ;
পশ্চাতে বসিয়া 'আমি' মগ্ন আপনায়,
নিরুদ্দেশ, আনমনে, র'য়েছি চাহিয়া !
কিছু নাহি লাগে মনে 'আপন' বলিয়া,
শুধু এ বিদেশ যেন বিরহ-বিজন ;
একাকী ;—যদিও পাশে আছে পরিজন ;
একাকী,—দুদিনে সবে যাইবে ছলিয়া !
পূর্ব্বজন্ম, কোন্ দূর কালসিন্ধু-লীন ;—
পরলোক, অগোচর সংশয়-তিমিরে ;—
বর্ত্তমান এ জীবন প্রহেলি, প্রলাপ ;—
আত্মজ্ঞান কি অজ্ঞেয় নিয়তি-অধীন !—
একি দায় ! উদাসীন জীবনেরে ঘিরে,
চিরদিন আছে একি মোহ-অভিশাপ !

শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার।

জাতীয় উদ্দীপনা ও জাতীয় সাহিত্য।

প্রথম প্রস্তাব।

আমাদের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল লর্ড রিপন বাহাদুর যখন এদেশ পরিত্যাগ করেন, তখন আমি বোম্বাই সহরে ছিলাম। তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা সূচক অভ্যর্থনা পূর্ব্বক বিদায় দিবার নিমিত্ত বোম্বাই সহরের লোক যেরূপ আয়োজন করিয়াছিলেন, সে দৃশ্য আমি কখনও ভুলিব না। তাহা চিরদিনের মত আমার স্মৃতিতে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। কয়েক দিনের জন্য যেন ভেল্কী বাজির ক্রীড়া দেখিলাম। দশ দিন পূর্ব্বে মানুষ যাহা সম্ভব বিবেচনা করে নাই তাহা সম্ভব হইয়া গেল, লাগ্ লাগ্ করিতে করিতে যেন জমি ফুঁড়িয়া মানুষ উঠিল, আকাশ হইতে টাকা বর্ষিল, এবং যে কাজ যাহার দ্বারা হইলে ভাল হয় এবং যখন হইলে ভাল হয় তাহাই হইয়া গেল। বোম্বাই সহরে দেশীয় লোকদিগের দ্বারা যে এরূপ আয়োজন হইতে পারে তাহা কেহ কখনও ভাবে নাই। আমরা অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম,—একি ব্যাপার! শুধু আমরা কেন, ইংরাজ রাজপুরুষগণেরও তাক লাগিয়া গেল। পাওনিয়র নামক ইংরাজসম্পাদিত কাগজে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের ছোট লাট কলভিন বাহাদুর এক প্রবন্ধ লিখিলেন—If all this is real. what does it mean?"

বোম্বায়ে অসম্ভব সম্ভব হইল, এইজন্য বলিতেছি। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে আমি যখন প্রথমে বোম্বাই সহরে গমন করি, তখন তথাকার হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি সুপ্রসিদ্ধ কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্গ মহোদয়ের নিকট আমি একটী প্রস্তাব উপস্থিত করি। তিনি তখন উকীল ছিলেন, বিচারপতি হন নাই। আমি তাঁহাকে বলি—কলিকাতার ভারত সভার ন্যায় বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য একটা সভা করিলে হয় না? তেলাঙ্গ আমাকে বলেন—"তুমি কি ভাবিতেছ বোম্বাই তোমার কলিকাতা? একবার বোম্বায়ের একখানা ট্রাম গাড়িতে চড়িয়া দেখ, কত রঙ্গের, কত বর্ণের, কত দেশের, কত পরিচ্ছদের মানুষ দেখিতে পাও! কত প্রকারের পাগড়ী তোমার চক্ষুগোচর হয়! বোম্বায়ের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে এক কাজে এক ভাবাপন্ন করার ন্যায় অসম্ভব ব্যাপার আর নাই।" তৎপরে আমি ভাবিয়া দেখিলাম তাহা ত সত্য। এক বোম্বাই সহরে গুজরাটী, মহারাষ্ট্রীয়, মুসলমান ও পার্শি এই চারি প্রধান সম্প্রদায়ভুক্ত লোক আছে; ইহারা সকলেই ধনে ও পদে প্রবল। ইহাদের মধ্যে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা তৎপরে সেখানে অপরাপর অগণ্য প্রকার লোকের বসতি তাহাদের রীতি নীতি পরস্পর হইতে এত বিভিন্ন যে তাহাদিগকে এক কাজে একত্র করা বাস্তবিকই একটা অসাধ্য ব্যাপার। তদবধি সেই কথাটাই আমার মনে ছিল। কিন্তু লর্ড রিপন বাহাদুরকে বিদায় দিবার সময়ে কি দেখিলাম! কোনও এক আশ্চর্য্য ভেল্কীর প্রভাবে যেন সেই সকল খণ্ড অংশ নিমেষের মধ্যে যোড়া লাগিয়া গেল! বোম্বায়ের সকল সমাজের সকল লোক এক ভাবাপন্ন হইয়া যেন এক তারে বাজিতে লাগিল!

কেবল যে অনৈক্যের স্থলে একতা আসিল তাহা নহে; অল্পদিনের মধ্যে এত অর্থ সংগ্রহ হইতেও কেহ কখনও দেখে নাই। এক একটী রাস্তা সাজাইতে, রাজপথের উভয় পার্শ্বে স্থানে স্থানে ভদ্র পুরুষ ও মহিলাগণের বসিবার এক একটী মঞ্চ নির্ম্মাণ করিতে, ও অপরাপর প্রকারে যে কত সহস্র টাকা ব্যয় হইয়া গেল তাহা বলা যায় না। এ সকল অর্থ যে কোথা হইতে আসিল, কে সংগ্রহ করিল, কে ব্যয় করিল, তাহা যেন বুঝিতে পারা গেল না! বোম্বাইবাসী প্রত্যেক ধনী যেন কোনও অলৌকিক ও ঐশী শক্তির প্রভাবে অঞ্চল ভরিয়া অর্থ লইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন, যত টাকার প্রয়োজন হয় দিব। কেবল কি প্রচুর অর্থ ব্যয়? এরূপ সুশৃঙ্খলরূপে কার্য্যের ব্যবস্থা করিবার শক্তিও পূর্ব্বে কখনও দৃষ্ট হয় নাই। আমার একটা মোটামুটি সংস্কার এইরূপ আছে যে, এদেশের লোক সমবেত ও সুশৃঙ্খলভাবে কার্য্যের ব্যবস্থা করিবার পক্ষে অপটু। কিন্তু যে আশ্চর্য্য ভেল্কীর উল্লেখ করিয়াছি, তাহার প্রভাবে সে সংস্কারও ভাঙ্গিয়া গেল! অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, সর্ব্বাপেক্ষা কোন্ বিষয়ের অধিক প্রশংসা করিব? একতা প্রবৃত্তির বা দানপ্রবৃত্তির বা সমবেত ও সুশৃঙ্খলভাবে কার্য্যকরিবার শক্তির? ফলতঃ এমন দৃশ্য কখনও দেখি নাই, ত্বরায় আর দেখিব কিনা জানি না।

সেই দিন হইতে একটা সত্য বড়ই অনুভব করিয়াছি ও সেটা নিরন্তর হৃদয়ে জাগিতেছে। সে সত্যটা এই; তোমরা যে সকলে বসিয়া বসিয়া এই বলিয়া দুঃখ করিতেছ, মানুষ নাই, টাকা নাই, সমবেতভাবে কাজ করিবার শক্তি নাই, কাজ করিব কিরূপে? ওটা কাজের কথা নয়। আমাদিগকে মাতাইতে পারে, অনুপ্রাণিত করিতে পারে, উদ্দীপ্ত করিতে পারে, এরূপ একটা প্রেম, বা একটা আশা বা একটা আকাঙ্ক্ষা জাতীয় হৃদয়ে আবির্ভূত হউক, দেখিবে শক্তি, সাহস, দানশক্তি, সমবেত কার্য্যের বুদ্ধি সকলি প্রকাশ পাইবে। জাতীয় উদ্দীপনা জাতীয় শক্তির দীক্ষা গুরু।

এই উদ্দীপনাটা একটা প্রধান আলোচ্য বিষয়। ব্যক্তিগতভাবে একজন মানুষই ধর, আর একটা জাতিই ধর, তাঁহাদের উদ্যম, কার্য্যশক্তি, শৌর্য্য বীর্য্যের মূলে একটা উদ্দীপক কারণ থাকে। একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা, একটা খাতিক, একটা ঝোঁক, একটা অভিসন্ধি, একটা আদর্শ, যেরূপেই তাহাকে ব্যক্ত কর না কেন, ভিতরকার কথাটা এই, সেইটা যতদিন হৃদয়ে সজাগ থাকে, ততদিন তাহারা নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায়; সেটার অভাবেই শয়ন করে। তুমি আমি যে জগতে বাস করিতেছি ও কাজ করিতেছি, আমাদের প্রত্যেকেরই এক একটা বিশেষ আকাঙ্ক্ষা আছে; একটা জিনিস আছে, যেটা লক্ষ্য আর সমুদয় উপলক্ষ্য। প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় পদতলের ভূমি পরীক্ষা করিয়া দেখ প্রত্যেকের শক্তি বা সাহস একটা কিছুর উপরে দাঁড়াইয়া আছে। জাতীয় জীবনে তাহাই, জাতীয় শক্তির মূলে একটা উদ্দীপনা থাকে। সেটা না ধরিতে পারিলে সে জাতির ইতিবৃত্ত বুঝিতে পারা যায় না। আমার আসল জিনিসটা যে জানে না সে যেমন আমাকে চেনে না, তেমনি কোনও জাতির উদ্দীপনাটা বা প্রধান আকাঙ্ক্ষাটা যে ধরিতে পারে না, সে সে জাতির ইতিবৃত্ত বুঝিতেই পারে না। ইহার প্রমাণ অন্বেষণে বহুদূর গমন করিতে হইবে না। পাঠক মাত্রেরই সুপরিচিত বিষয় হইতে প্রমাণ দিতেছি। বিগত তিন সহস্র বৎসরের মধ্যে ইতিহাস পাঠক মাত্রেই ইটালীর অভ্যুদয়, পতন ও পুনরভ্যুদয় দেখিয়াছেন। কেনই বা রোম উঠিয়াছিল, কেনই বা রোম পড়িয়াছিল, কেনই বা আবার ইটালীর স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? যখন রোমকগণ মুষ্টিমেয় তখন তাহারা বলী, রোম সাম্রাজ্যের লক্ষ লক্ষ সৈনিক যখন দিগ্ দিগন্ত ছাইতেছিল তখন তাহারা দুর্ব্বল! আবার যখন তাহারা পরপদদলিত তখন তাহাদের অভ্যুত্থান, এ রহস্যের মর্ম্ম কোথায়? মর্ম্মটা সংক্ষেপে এই—রোম প্রথমে যখন উঠিয়াছিল তখন একটা আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা জাতীয় হৃদয়ে প্রবল ছিল, তাহাই কয়েক শতাব্দী তাহাদিগকে উন্নতির অভিমুখে লইয়া গিয়াছিল। রোমকগণ যখন দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হইল, তখন প্রভূত ধনাগমে, সম্পদ ঐশ্বর্য্যের শ্রীবৃদ্ধিতে, দাসত্ব প্রথার সংস্পর্শে রোমকদিগের প্রাচীন আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা, পুরাতন জাতীয় উদ্দীপনা, ম্লান হইয়া গেল; ইহাই হইল রোমের পতনের কারণ। আবার ম্যাটসিনি প্রভৃতি স্বদেশহিতৈষিগণের ফুৎকারে জাতীয় হৃদয়ে নব আকাঙ্ক্ষার অগ্নি জ্বলিল, ইহাই হইল ইটালীর পুনরভ্যুদয়ের কারণ। এই জন্য বলি একটা উদ্দীপনা, জাতীয় হৃদয়ে পরিব্যাপ্ত হউক, দেখিবে কোথা হইতে শক্তি সামর্থ্য আসিবে? একটা নব অগ্নি সকলের হৃদয়কে অধিকার করুক, দেখিবে এই সকল ক্ষীণ-প্রাণ প্রজাপুঞ্জের ভিতর হইতেই মানুষ উঠিবে, অর্থ আসিবে, ও কার্য্যশক্তি প্রকাশ পাইবে।

বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় হিন্দুগণ যেমন আপনাদিগকে ঋষি মুনির সন্তান বলিয়া গৌরবের চক্ষে দেখেন, তেমনি প্রাচীন য়িহুদীগণও এই বলিয়া বড়াই করিতেন যে তাঁহারা ইব্রাহিমের বংশজাত। এই কারণে তাঁহারা ধর্ম্ম বা সমাজ সংস্কার সম্বন্ধীয় কোনও নূতন কথার প্রতি কর্ণপাত করিতেন না। এজন্য তাঁহাদের একজন প্রতিভাশালী ধর্ম্ম সংস্কারক একদিন তাঁহাদের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন—"তোমরা কি জান না ঈশ্বর মনে করিলে ঐ পথের প্রস্তর খণ্ড সকল হইতে রাশি রাশি ইব্রাহিমের সন্তান উৎপন্ন করিতে পারেন?" ঠিক কথা! বজ্রাগ্নির ন্যায় কোনও অগ্নিময় আকাঙ্ক্ষা যখন জাতীয় হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়, তখন পথের পাথর হইতেই মানুষ প্রস্তুত হয়। প্রমাণ দেখ,—পঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায় কি ছিল, আর গুরুগোবিন্দ তাহাদিগকে কি করিলেন? তাহারা মুসলমান রাজাদিগের অত্যাচারে বৃকতাড়িত মেষযূথের ন্যায় বনে জঙ্গলে দশ দিকে ছুটিতেছিল, গুরুগোবিন্দ এরূপ উদ্দীপনার অবতারণা করিলেন যে তাঁহারা সিংহ প্রায় অজেয় হইয়া দাঁড়াইল!

এই জাতীয় উদ্দীপনা যদি আসে, আমরা খণ্ড অংশের ন্যায় পরস্পরের সহিত যোড়া লাগিয়া যাইব, দরিদ্রের অস্থির ভিতর হইতে অর্থ বাহির হইবে, যে অকর্ম্মা হইয়া বসিয়া আছে তাহার কাজের বুদ্ধি যোগাইবে। ইহা—

"ভীরুকে সাহসী করে বোবাকে বলায়"—

আর ইহার অভাবে প্রত্যেকে ক্লেশ পাইব, প্রত্যেকে হা হতোস্মি করিব, অথচ প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বার্থেই নিমগ্ন থাকিব। মানুষের স্বার্থ টা নিরন্তর তাহার সম্মুখে রহিয়াছে; প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার হৃদয়দ্বারে আঘাত করিতেছে; যদি জোর করিয়া মানুষের চক্ষুদুটা অন্য দিকে দিতে না পার, তাহার দৃষ্টি নিজের স্বার্থের প্রতি আবদ্ধ থাকিবেই থাকিবে।

পরাধীন দেশে এই স্বার্থ প্রবৃত্তির প্রবলতা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। জাতীয় পরাধীনতার অনেক প্রকার অনিষ্ট ফলের উল্লেখ অনেকে করিয়া থাকেন; কিন্তু আমার মনে লাগে, সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অনিষ্ট ফল এই, যে ইহাতে প্রজাদিগকে ক্ষুদ্র স্বার্থে নিবিষ্ট করে; লোকে ক্ষুদ্র চিন্তা, ক্ষুদ্রভাব, ক্ষুদ্র কথা, ক্ষুদ্র কাজ লইয়া থাকিতে থাকিতে ক্ষুদ্রাশয় হইয়া যায়। স্বাধীন দেশে প্রত্যেক প্রতিভাশালী ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা করিতে পারেন যে একদিন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সহস্র সহস্র মানবের কল্যাণসাধন করিতে পারেন; একদিন সেনাদল লইয়া স্বদেশ রক্ষার্থ অগ্রসর হইতে পারেন; এক দিন জ্ঞানে গুণে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া সর্ব্বজনপূজিত হইতে ও দেশের মহোপকার সাধন করিতে পারেন। এইরূপে একজনের জন্য আশার দ্বার উন্মুক্ত হইলেই দশজনের চিত্ত ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলিয়া আংশিকরূপেও পরার্থ চিন্তাতে নিযুক্ত হয়; দায়িত্বজ্ঞানের প্রভাব দ্বারা ক্ষুদ্র স্বার্থ হইতে উন্নতি হইতে থাকে। পরাধীন দেশে এসকল উত্তেজক ও উদ্দীপক কারণের অভাব, সুতরাং তথায় প্রজাপুঞ্জের চিত্তের অধোগতিই দৃষ্ট হয়। তাহাদের সংকল্প ক্ষুদ্র, তাহাদের আলাপ ক্ষুদ্র, তাহাদের আমোদ প্রমোদ ক্ষুদ্র, সকলি ক্ষুদ্র হইয়া যায়। ক্ষুদ্রাশয়তার মধ্যে মানবের চিত্তকে তুলিয়া ধরিতে পারে এমন কিছুই থাকে না, সুতরাং সেরূপ সমাজে পাপ প্রবৃত্তির প্রবলতা হয়। সে সমাজ বিবিধ দুষ্ক্রিয়াতে নিমগ্ন হইতে থাকে।

কিন্তু বিধাতার মঙ্গলময় রাজ্যে সকল ব্যাধিরই ঔষধ আছে। গীতাকার ভগবানের মুখে এই বাণী দিয়াছেন—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থান মধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥

হে ভারত! যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় তখন আমি আপনাকে সৃষ্টি করি। অর্থাৎ আপনার পতিতপাবনী শক্তিকে প্রকট করি

এই ঐশী শক্তি এক নব উদ্দীপনার আকারে প্রকাশ পায়। সেই উদ্দীপনা জাতীয় হৃদয়কে অধিকার করিলেই তাহা ক্ষুদ্র স্বার্থ চিন্তা হইতে উঠিতে পারে। এই উদ্দীপনা কিরূপ? ইতিবৃত্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই, ইহা হয় একটা প্রবল আশা, না হয় একটা প্রবল প্রেম, না হয় একটা প্রবল বিদ্বেষ। এই আশা, প্রেম বা বিদ্বেষ কিছু একটা জাতীয় হৃদয়ে জাগিলে ও ব্যাপ্ত হইলে নূতন শক্তি জাগিতে থাকে।

ইতিহাসের দৃষ্টান্ত দুই একটা প্রদর্শন করি। খ্রীষ্টধর্ম্মের অভ্যুদয়ের মূলে একটা প্রবল আশা ও একটা প্রবল প্রেম। আশা এই—ঈশ্বরের রাজ্য ধরাতে প্রতিষ্ঠিত হইবে; প্রীতি—মহাত্মা যীশুর প্রতি। এই প্রেমটাই খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রধান শক্তি। প্রীতির একটা সংবর্দ্ধনী শক্তি আছে। ইহা এককে দুই করে, দুইকে চারি করে, চারিকে আট করে ইত্যাদি। যীশুর ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের মূলে তাঁহার প্রতি প্রেম। এই প্রেমোদ্দীপন করিবার শক্তি মহাপুরুষদিগের একটা প্রধান লক্ষণ। তাঁহার শিষ্য জুডাশ সামান্য অর্থলোভে তাঁহাকে ধরাইয়া দিল, কিন্তু পরক্ষণেই বলিতে লাগিল,—হায় হায়! কি করিলাম! এই বলিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিল। যীশুর প্রতি তাঁহার শিষ্যগণের প্রেমটা যে কত প্রবল ছিল, ইহা তাহারই প্রমাণ। মেরী নাম্নী এক কুলটাকে যীশু পাপ পথ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। যীশুর বিরোধিগণ তাঁহাকে হত্যা করিলে, যখন তাঁহার দেহকে সমাহিত করা হইল, তখন মেরী সেই সমাধিক্ষেত্রের উপরে তিন দিন তিন রাত্রি অনাহার অনিদ্রায় পড়িয়া থাকিল। আহা কি প্রেম! এই প্রেমই সহস্র সহস্র হৃদয়ে ব্যাপ্ত হইয়া খ্রীষ্টধর্ম্মকে বলশালী করিয়াছে। মক্কাবাসিগণ যখন মহম্মদকে হত্যা করিবার মানসে আলির গৃহে তাঁহাকে আবেষ্টন করিল, তখন আলি নিজ পরিচ্ছদ পরাইয়া মহম্মদকে বাহির করিয়া

দিলেন ও নিজে মহম্মদের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তাঁহার শয্যাতে শয়ন করিয়া রহিলেন; মনের কথা, হত্যাকারিগণ আমাকে মহম্মদ জানিয়া হত্যা করুক, কিন্তু মহাপুরুষ মহম্মদ বাঁচুন। আহা কি প্রেম! তৎপরে মহম্মদ অপর শিষ্য আবু বেকরের সঙ্গে পলাইতে পলাইতে অনুসরণকারী শত্রুগণের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশে যখন এক গিরি কন্দরে দুই তিন দিন লুকাইয়া রহিলেন, তখন একদিন তিনি আবু বেকরের উরুদেশে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক ঘুমাইয়া পড়িলেন। হঠাৎ আবু বেকরের অশ্রুজল তাঁহার কপোলে পতিত হওয়াতে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল; চাহিয়া দেখেন আবু বেকর নগ্নদেহে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন;—"মহাপুরুষ! তুমি ঘুমাইলেই দেখিলাম এই গুহার চারিদিকে অনেক গর্ত্ত রহিয়াছে, ভাবিলাম ঐ সকল গর্ত্তে বীচ্ছু নামক ভয়ানক বিষাক্ত জন্তু থাকিতে পারে, তাই নিজ অঙ্গের বস্ত্র ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া গর্ত্তগুলি বন্ধ করিয়াছি; উরুতে তোমার মস্তক ছিল বলিয়া তাহার বস্ত্র ছিঁড়িতে পারি নাই, পাছে তোমার নিদ্রাভঙ্গ হয়। অবশেষে বামহস্ত দ্বারা একটী গর্ত্তের মুখ আবরণ করিয়াছিলাম, সেই হস্তে বীচ্ছুতে দংশন করিয়াছে; তাই যন্ত্রণাতে অধীর হইয়া কাঁদিতেছি।" আহা কি প্রেম! এই প্রেম দশ হৃদয় হইতে শত হৃদয়ে, শত হৃদয় হইতে সহস্র হৃদয়ে উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। ইহাই মহম্মদীয় ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের ভিতরকার কথা।

মহম্মদের ধর্ম্মে কেবল একটা প্রবল প্রেম ছিল না, একটা প্রবল বিদ্বেষও কার্য্য করিয়াছিল। একদিকে মহাপুরুষ মহম্মদের প্রতি প্রেম, অপর দিকে কাফের-বিদ্বেষ, এই দুইটী শক্তি দুই দিক হইতে কার্য্য করিয়া তাঁহার শিষ্যদলকে ঘোর সংকীর্ণ, অনুদার, সাম্প্রদায়িক অথচ দৃঢ়চেতা, নির্ভীক, সাহসী ও তেজীয়ান্ করিয়াছে। একটা প্রবল বিদ্বেষে জাতীয় হৃদয়ে কিরূপ উদ্দীপনা আনিয়া দেয় তাহার প্রমাণ শিখ সম্প্রদায়ের অদ্ভুত বিকাশের মধ্যেও পাওয়া যায়। মুসলমানগণ গুরুগোবিন্দের পিতা তেগ বাহাদুরকে দিল্লীতে বন্দী করিয়া হত্যা করে; তন্নিবন্ধন প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি দ্বারা উদ্দীপ্ত হইয়া তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে মুসলমান বিদ্বেষের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন; সুতরাং শিখ সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ও শক্তির মধ্যে বাবা নানকের প্রতি প্রেম যেরূপ কার্য্য করিয়াছিল, মুসলমান বিদ্বেষও তদনুরূপ মাত্রায় কার্য্য করিয়াছিল। অতি প্রাচীন কালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই, প্রাচীন রোমকগণ যে দলবদ্ধ হইয়া সাধারণতন্ত্র প্রণালী স্থাপনে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহার মূলে টার্ক্‌ইন্ পরিবারভুক্ত রাজবংশীয়গণের প্রতি বিদ্বেষ। সতী লুক্রিশিয়ার প্রতি অত্যাচার করাতেই এই বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই মহা উত্তেজনা বা উদ্দীপনা সেই জাতীয় হৃদয়ে আবির্ভূত হইল, অমনি রোমকগণ সকল বিভিন্নতা ভুলিয়া এক হইয়া গেলেন; অমনি স্বায়ত্ত শাসনের শক্তি জাগিয়া উঠিল।

লর্ড রিপণের বিদায়কালে বোম্বাইএ যে শক্তি জাগিয়াছিল তাহারও মূলে একটা উদ্দীপনা ছিল—সেটা লর্ড রিপণ বাহাদুরের প্রতি প্রেম ও ইলবার্ট বিল বিরোধী ভারতীয় ইংরাজমণ্ডলীর প্রতি বিদ্বেষ। সে উদ্দীপনা ক্ষণিক-কারণ-সম্ভূত ছিল, এজন্য তাহার ফলও ক্ষণিক হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন এই, বর্ত্তমান সময়ে জাতীয় উদ্দীপনার এরূপ কারণ কি আছে যাহা দেখিয়া আমরা জাতীয় জীবনে নবশক্তির অভ্যুদয়ের প্রত্যাশা করিতে পারি? তদুত্তরে জিজ্ঞাসা করি, স্বদেশের প্রতি প্রেম ও স্বজাতির উন্নতির আশা—উদ্দীপনার এই দুইটা উপাদান কি নিরন্তর বিদ্যমান নহে? তবে কথা এই, এই দুইটা জাতীয় হৃদয়ে পরিব্যাপ্ত না হইলে জাতীয় উদ্দীপনার আকার ধারণ করিতেছে না। পরিব্যাপ্ত করিবার উপায় কি? সচরাচর ত্রিবিধ উপায়ে এই সকল ভাব জাতীয় হৃদয়ে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে; প্রথম রাজনীতি প্রভৃতির আন্দোলনাদির দ্বারা, দ্বিতীয় সংবাদপত্রাদি দ্বারা, তৃতীয় জাতীয় সাহিত্যের দ্বারা। এই জন্য সর্ব্ব দেশেই এই তিনটীর প্রতি বিদেশীয় রাজাদিগের তীব্র দৃষ্টি থাকে। তিনটীকেই তাঁহারাও শাসনে রাখিবার চেষ্টা করেন। তাহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; তাহাকে স্বাভাবিক বলিয়াই জানা উচিত। আমরাও দেখিতেছি আমাদের রাজপুরুষগণ ঐ তিনটীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেছেন। এমন কি শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলী হইতে জাতীয় উদ্দীপনার অনুকূল যাহা কিছু, সমুদয় যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিতেছেন। জাতির ভবিষ্যতের প্রতি যাঁহাদের দৃষ্টি তাঁহাদিগকে শিশুদের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট তাহা রাখিতেছেন। দুঃখের বিষয় এই, দেশের লোকের এ বিষয়ে মনোযোগ না

থাকাতে শিশুদিগের শিক্ষার যথেষ্ট দুর্গতি হইতেছে, যাহাতে মানুষ, মানুষ হইতে পারে সে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হই-তেছে না; অনেকস্থলে সত্যের নামে অসত্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

যাক্ সে কথা; শিশুপাঠ্য সাহিত্য ছাড়িয়া দিলেও সাহিত্যের একটা সুদূর প্রসারিত ক্ষেত্র পড়িয়া থাকে, যাহাতে স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতির উন্নতির আশার প্রসারের ক্ষেত্র আছে। সাহিত্য স্বজাতি প্রেমিকদিগের হস্তে একটা মহা যন্ত্রস্বরূপ। প্রাচীনকালের ঋষিগণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন—"হে ইন্দ্র বণিকের অর্ণবপোত যেমন ধন বহন করিয়া আনে, তেমনি তুমি আমাদের জন্য ধন বহন কর।" সাহিত্য কি বণিকের অর্ণব-পোতের ন্যায় নয়? ইহাতে করিয়া কি আমরা স্বদেশ বিদেশের প্রাচীন সাহিত্যের খনি হইতে, বিদেশীয় চিন্তার সাগর হইতে, মণিমুক্তা বহন করিয়া স্বদেশের ও স্বজাতির চিন্তাসম্পদ পোষণ করিতে পারি না? একবার ভাবিয়া দেখ, বিগত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ইংরাজগণ প্রাচীন লাটিন ও গ্রীক সাহিত্য হইতে কত চিন্তা সংগ্রহ করিয়াছেন! অধিক দিনের কথা নয়, অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে কার্লাইল প্রমুখ সুধীগণ জর্ম্মাণ-সাহিত্য হইতে কত ভাব সম্পদ সংগ্রহ করিয়াছেন? সে সকল অমূল্য সম্পদে ইংলণ্ড কি ধনী হন নাই? স্বজাতি প্রেম কি কেবল বিদেশীয় রাজাদিগকে গালি দিলেই প্রকাশ পায়? অথবা আমরা আর্য্যসন্তান, আমাদের মত কে আছে, এই বড়াই করিলেই প্রকাশ পায়? দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ মানুষের ন্যায় দেশের ভবিষ্যতটা চক্ষের সমক্ষে ও স্বদেশ প্রেমটা হৃদয়ে রাখিয়া বসিতে হয়, তবে সাহিত্য জাতীয় উদ্দীপনার কারণ হইতে পারে।

যেমন উদ্যানমধ্যে বৃক্ষের চারাগুলি বসাইয়া যদি দেখিতে পাও প্রত্যেকটা নিজের পূর্ণবিকাশ পাইতেছে, তবে যেমন জান, যে উদ্যানটা সুন্দর ও সুফলপ্রদ হইবে, তেমনি জানিও তুমি আমি যদি জ্ঞানে উন্নত, ভাবসম্পদে ধনী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠাতে দৃঢ়, স্বাধীন চিন্তাতে সুদক্ষ হই, দেশটা চরমে বড় না হইয়া যায় না। কেমন করিয়া হইবে বলিয়া দিতে পারি না, কিন্তু হইবেই এই মাত্র বলিতে পারি; কারণ আমি নাস্তিক নই। বিশ্বাস করি এ জগতের একজন মালিক আছেন। তাঁহার মঙ্গলময় রাজ্যে সত্যের অপলাপ সম্ভব নহে। ঘরে ঘরে এই মানুষ গড়ার কাজটা সাহিত্যের হস্তে। এই জন্যই জাতীয় উদ্দীপনা ও জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে একটা চিরসম্বন্ধ দেখিতে পাই।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

মহাত্মা ডেভিড হেয়ার।

যাঁহাদিগের যত্নে ও চেষ্টায়, অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল হইতে এ দেশে উন্নতির স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে মহাত্মা ডেভিড হেয়ার একজন প্রধান।

ডেভিড হেয়ার ১৭৭৫ সালে, স্কট্লণ্ড দেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঘড়ির ব্যবসায় শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮০০ সালে তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। সে সময়ে এখানে ঘড়ির ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতা ছিল না, সুতরাং তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

১৮১৬ সালে তিনি শ্রীযুক্ত ই, গ্রে সাহেবকে তাঁহার কারবার সমর্পণ করেন। সেই জন্য, সেই সময়ের কোন সংবাদপত্রে আমোদ করিয়া লেখা হইয়াছিল, "Old hair turned grey."

হেয়ার সাহেব রাজা রামমোহন রায়ের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের নিকটে হেয়ার সাহেব মদ্গুর (মাগুর) মৎস্য আহার করিতে শিক্ষা করেন। হেয়ার সাহেব উহা আহার করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। যখন রাজা বিলাত যান, তখন হেয়ার সাহেব তাঁহার লণ্ডনস্থ

সহোদর ভ্রাতৃগণকে পত্র দিয়াছিলেন যে, রাজা ইংলণ্ডে বিদেশী, অনেকপ্রকার অসুবিধায় পড়িবার সম্ভাবনা, সুতরাং তাহারা তাঁহাকে যেন বিশেষ যত্ন করেন। রাজার ইংলণ্ডবাস কালে তাঁহারা রাজার কিরূপ সেবা করিয়াছিলেন, তাহা রাজার জীবনবৃত্তান্তে বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে।

বাঙ্গালীদিগের সহিত হেয়ার সাহেবের যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল। তিনি বন্ধুভাবে লোকের বাড়ী বাড়ী যাইতেন, সকলের সুখ দুঃখের সংবাদ লইতেন। তিনি বাঙ্গালী জাতির কল্যাণের জন্য আপনার জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন!

সে সময়ে ইংরেজী শিক্ষার বড়ই দুরবস্থা, রাম রাম মিশ্র প্রথম ইংরেজীওয়ালা। তখন যিনি যত অধিক ইংরেজী শব্দ জানিতেন, তিনি তত বড় পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইতেন। ইংরেজী শিক্ষার জন্য ক্রমে ক্রমে কলিকাতা নগরে কয়েকটি বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। রামমোহন নাপিত, কৃষ্ণমোহন বসু, ভুবন দত্ত, শিবু দত্ত, আরাটুন পিটার্স, সেরবরণ (Sherburn) প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি কলিকাতায় ইংরেজী বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। এই সকল বিদ্যালয়ে অতি সামান্য ইংরেজী শিক্ষা হইত।

পড়াইবার পুস্তক প্রায় কিছুই ছিল না। Thomas Dyce's Spelling, School Master, Arabian nights, Pleasing Tales, ইত্যাদি পাঠ্যপুস্তক ছিল।

বাঙ্গালা সাহিত্যের অতি শোচনীয় অবস্থা ছিল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মনসামঙ্গল, ধর্ম্মজ্ঞান, কাশীদাসী মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, গুরুদক্ষিণা, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর, এই কয়েকখানি প্রচলিত পুস্তক ছিল। বালকদের পড়িবার উপযুক্ত পুস্তক কিছুই ছিল না। গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় সামান্য লেখা পড়া শিক্ষা হইত।

এই সময় ইংরেজী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিবার জন্য হেয়ার সাহেব সুপ্রীম কোর্টের চীফ জষ্টিস্ স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইষ্ট সাহেবের সহিত দেখা করেন। তিনি সকল কথা শুনিয়া বলিলেন যে এ বিষয়ে আমি বিবেচনা করিব।

ক্রমে হিন্দুকলেজ সংস্থাপিত হইল। হিন্দুকলেজ সংস্থাপন জন্য একটি কমিটি হইয়াছিল। ৮ জন ইয়ো-রোপীয় এবং ২০ জন দেশীয় উহার সভ্য ছিলেন। হেয়ার সাহেব দর্শকরূপে উপস্থিত থাকিতেন এবং সকল বিষয়ে সৎ পরামর্শ দিতেন।

১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারি গরানহাটার গোরাচাঁদ বসাকের বাটীতে হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠা দিবসে অনেক দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক এবং তিনজন সম্ভ্রান্ত ইয়োরোপীয় উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে হেয়ার সাহেব অবশ্য একজন।

হিন্দু ও সংস্কৃত কলেজের জন্য বাটী নির্ম্মিত হইল। কিন্তু হিন্দুকলেজের নামেই ভিত্তি সংস্থাপন হইয়াছিল। এই গৃহ নির্ম্মাণের জন্য গবর্ণমেণ্ট ১২৪০০০ টাকা দিয়া-ছিলেন। কলেজ স্কোয়ারের উত্তর দিকে ডেভিড হেয়ারের কিছু ভূসম্পত্তি ছিল। তিনি উহা এই মহৎ কার্য্যে দান করেন। ১৮২৪ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি, বিদ্যালয়গৃহের ভিত্তি সংস্থাপন হয়।

পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ রামগোপাল ঘোষ মহাশয় হিন্দু কলেজের একজন প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন। হেয়ার সাহেব এইরূপ ছাত্রদিগের উপকার করিতে ও তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিতে সর্ব্বদাই বিশেষ যত্নশীল থাকিতেন। হেয়ার সাহেবের সুপারিসে রামগোপাল বাবু কলিকাতার এক সদাগরের আপিসে সহকারিরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই কার্য্য হইতে ক্রমে যে তাঁহার কতদূর উন্নতি হইয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

হেয়ার সাহেবের মহৎ চরিত্র ও সদ্গুণ সকল দেখিয়া হিন্দুকলেজের শিক্ষক ডিরোজিওর ছাত্রগণ তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি করিতে লাগিলেন। হেয়ার সাহেবকে প্রকাশ্যরূপে সম্মান করিবার জন্য তাঁহারা তাঁহার যোড়াসাকোস্থ মাধব চন্দ্র মল্লিকের বাটীতে একটি প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিলেন।

উক্ত সভায় শ্রীযুক্ত রাধানাথ শিক্দার বলিলেন, "হেয়ার সাহেব আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিবার পক্ষে প্রভাত-তারা।" পার্চমেণ্ট কাগজে একখানি অভিনন্দন পত্র লিখিত হইয়াছিল। উহা হেয়ার সাহেবকে প্রদত্ত হইল। পরলোকগত দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বলিলেন, —"আপনি মাতার ন্যায় আমাদিগকে স্তন্যপান করাইয়া-ছেন।" হেয়ার সাহেব এই মিষ্ট কথাটিতে ঈষৎ হাস্য করিয়া মাথা নাড়িলেন।

হেয়ার সাহেবের প্রশংসা করিয়া ছাত্রগণ যে সকল বক্তৃতা করিলেন, তিনি তাহার উত্তরে যাহা বলিলেন, তাহার

সারমর্ম্ম এই, "আমি বীজ বপন করিয়াছিলাম; এক্ষণে উহা বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছে দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেছি।" ইত্যাদি।

এই সকল ছাত্রদিগের উদ্যোগে ও ব্যয়ে হেয়ার সাহেবের একটি ছবি প্রস্তুত হইয়াছিল। উহা এক্ষণে হেয়ারস্কুলে আছে।

অনেকের চেষ্টায় হিন্দুকলেজ সংস্থাপিত হয়, সত্য, কিন্তু তন্মধ্যে হেয়ার সাহেবই প্রকৃত সংস্থাপক। তিনি ভিন্ন এ কার্য্য হইতে পারিত না। কলেজ সংস্থাপন বিষয়ে, হেয়ার সাহেব সকলকে এক মতে আনেন, এবং তজ্জন্য উপযুক্ত উপায় সকল অবলম্বন করিবার জন্য তিনি সকলকে উৎসাহিত করেন। এই হিন্দুকলেজের কলেজবিভাগ এক্ষণে প্রেসিডেন্সি কলেজরূপে, এবং স্কুলবিভাগ হিন্দু স্কুলরূপে পরিণত হইয়াছে।

হিন্দুকলেজ সংস্থাপনের কিছু কাল পরে তিনি কলিকাতা ছোট আদালতের কমিসনর নিযুক্ত হন। তথাচ তিনি অধিকাংশ সময় হিন্দুকলেজের তত্ত্বাবধানে ক্ষেপণ করিতেন।

হেয়ার সাহেবের দ্বারা বহুল পরিমাণে মেডিকেল কলেজের উন্নতি হইয়াছিল। উক্ত কলেজ সংস্থাপন সময়ে যে সকল গুরুতর বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা হেয়ার সাহেবের চেষ্টাতেই দূরীভূত হয়। হিন্দুসন্তান শবচ্ছেদ করিয়া ধর্ম্মচ্যুত হইবে বলিয়া গোড়া হিন্দুরা ঘোরতর আপত্তি উপস্থিত করিয়া ছিলেন।

বাবু শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, তিনি এক দিবস হেয়ার সাহেবের নিকট বসিয়া আছেন, এমন সময় সংস্কৃত কলেজের আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপক মধুসূদন গুপ্ত মহাশয় দ্রুত পদে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হেয়ার সাহেব তাঁহাকে দেখিবা মাত্র বলিলেন, "মধু, তুমি এত কাল কি করিতেছিলে? তুমি কি জান না যে, প্রায় এক সপ্তাহ কাল আমি কিরূপ দুর্ভাবনা ভোগ করিতেছি? আমি রাধাকান্তের (রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর) সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি আমাকে যাহা বলিলেন, তাহাতে আমার আশা হইয়াছে। তোমার কি বলিবার আছে বল? তুমি কি তোমাদের শাস্ত্রে এমন কোন শ্লোক পাইয়াছ, যাহাতে শবচ্ছেদের ব্যবস্থা আছে?" মধুসূদন উত্তর করিলেন, "মহাশয়, গোড়া হিন্দুদের আপত্তির জন্য কোন ভয় করিবেন না। যদি তাঁহারা প্রতিবাদ করেন, আমি এবং আমার পণ্ডিত বন্ধুগণ তাহার উত্তর দিবার জন্য প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, তাঁহারা তাহা করিবেন না।" হেয়ার সাহেব এই সকল কথায় সান্ত্বনা পাইলেন। বলিলেন, আমি কল্য এ বিষয়ের জন্য লাট সাহেবের সহিত দেখা করিতে যাইব।

১৮৩৬ সালে তিনি মেডিকেল কলেজের সেক্রেটারি হন এবং কলেজের উন্নতি সাধনের জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিছু কাল পরে তিনি উক্ত পদ পরিত্যাগ করিলে, গবর্ণমেণ্ট তাহাকে কলেজের সম্মানিত সভ্যের পদে নিযুক্ত করেন। সম্মানিত সভ্যরূপেও তিনি কলেজের অনেক উপকার করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তিনি চিরজীবনই মেডিকেল কলেজের হিতসাধনে যত্নশীল ছিলেন।

হেয়ার সাহেব কলিকাতা স্কুল সোসাইটির ইয়োরোপীয় সম্পাদক ছিলেন। এই সভার সম্পাদকরূপে তিনি ইহার পাঠশালা সমূহের ভার গ্রহণ করিয়া সে সকলের উন্নতির জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। আরপুলি পাঠশালা তাঁহার বিশেষ তত্ত্বাবধানে ছিল। তাঁহার সমস্ত ব্যয় তিনি নিজে বহন করিতেন।

ছাত্রগণ যাহাতে বাঙ্গালা ভাষা উত্তমরূপ শিক্ষা করে, তদ্বিষয়ে তিনি অতিশয় মনোযোগী ছিলেন। তিনি মনে করিতেন যে, কেবল ইংরেজী শিখিলেই হইবে না, বাঙ্গালা ভাষা সুন্দররূপে শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক।

কলিকাতায় জুভিনাইল সোসাইটি নামে একটি সভা ছিল। উক্ত সভা হইতে শ্যামবাজার, জানবাজার, ইটালি, পদ্মপুকুর প্রভৃতি স্থানে বালিকা বিদ্যালয়সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যে স্কুল-বুক-সোসাইটির কথা বলিয়াছি, স্ত্রীশিক্ষা প্রচার করা তাহারও একটি উদ্দেশ্য ছিল। এই সকল সভার সহিত যোগ দিয়া হেয়ার সাহেব অনেক কার্য্য করিতেন। রাধাকান্ত দেবের বাটীতে বালিকাদিগের বাৎসরিক পরীক্ষা গৃহীত হইত। ক্রমে উহা রহিত হইয়াছিল।

হেয়ার সাহেব স্কুল-বুক-সোসাইটিতে বাৎসরিক ১০০ শত টাকা চাঁদা দিতেন। এই সভা হইতে যে সকল পুস্তক প্রকাশ হইত, তাহা স্কুলের শিক্ষকদিগের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরণ করা হইত।

হিন্দুকলেজের ছাত্র, বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু দক্ষিণারঞ্জণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিকে লইয়া হিন্দুকলেজের শিক্ষক ডিরোজিও সাহেব একেডেমিক এসোসিয়েসন (Academic Association) নামক একটি সভা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। মানিকতলার যে বাড়ীতে ওয়ার্ডন্ ইনিষ্টিটিউশন ছিল, সেই বাড়ীতেই উক্ত সভা হইত। হেয়ার সাহেব তথায় নিয়মিতরূপে গমন করিতেন, ও মনোযোগপূর্ব্বক বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন। কিছু দিন পরে মানিকতলার বাটী হইতে হেয়ার সাহেবের স্কুল গৃহে সভা উঠিয়া আসিয়াছিল। ডিরোজিও সাহেব উক্ত সভার সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিলে হেয়ার সাহেব সভাপতি হইয়াছিলেন। সভার দিনে, সভার কার্য্য হইয়া গেলে পর, হেয়ার সাহেব কোন কোন সভ্যের সহিত গল্প করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন।

১৮৩৮ সালের ১২ই মার্চ্চ একটি নূতন সভা সংস্থাপিত হইল। উহার নাম Society for the Acquisition of General Knowledge। হেয়ার সাহেব এই সভার সম্মানিত দর্শক (Honorary Visitor) পদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি নিয়মিতরূপে সভার অধিবেশনে উপস্থিত হইতেন।

হিন্দুকলেজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কলেজের নিকটেই একটী পাঠশালা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। হেয়ার সাহেব উক্ত পাঠশালার ভিত্তি সংস্থাপন করেন।

হেয়ার সাহেব যে কেবল এ দেশের বালক ও যুবকদিগের শিক্ষার জন্যই যত্ন করিতেন এমন নহে, অন্যান্য দেশহিতকর কার্য্যেও তিনি উৎসাহের সহিত নিযুক্ত হইতেন। কয়েকটি রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি বিশেষ ভাবে যোগ দিয়াছিলেন। প্রথম তাঁহার সময়ে এরূপ একটি আইন হইয়াছিল, যাহাতে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা এবং প্রকাশ্য সভা করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি হস্তক্ষেপ করা হয়। এই আইনের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিবার জন্য কলিকাতাবাসিগণের এক সভা হয়। এই সভায় হেয়ার সাহেব একজন বক্তা ছিলেন। এই সভার উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যে কমিটি হইয়াছিল, হেয়ার সাহেব তাহারও একজন সভ্য ছিলেন।

দ্বিতীয়, যাহাতে দেওয়ানি মোকদ্দমায় সুপ্রীম্ কোর্টে জুরির বিচার প্রবর্ত্তিত হয়, এবং যাহাতে মফঃস্বল আদালতেও ক্রমে ক্রমে উক্তরূপ বিচারের ব্যবস্থা হইতে পারে, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিবার জন্য ১৮৩৫ সালের ৮ই জুলাই টাউন হলে কলিকাতাবাসিগণের একটি প্রকাণ্ড সভা হয়। এই সভার উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যে কমিটি হইয়াছিল, হেয়ার সাহেব তাহারও একজন সভ্য ছিলেন।

তৃতীয়, সে সময়ে এমন একটি আইন হইয়াছিল যাহাতে মফঃস্বল আদালতের বিচারের বিরুদ্ধে, ব্রিটিশ্ প্রজাগণের বিলাত আপিল করিবার ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হয়। এই অন্যায় আইন রহিত করিবার জন্য পার্লেমেণ্টে আবেদন করিবার উদ্দেশ্যে ১৮৩৬ সালের ১৮ই জুন কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিবাসিগণের এক মহা সভা হইয়াছিল। হেয়ার সাহেব উক্ত সভায় এই প্রস্তাব করেন, যে সভার উদ্দেশ্য সংসাধনজন্য বিলাতে একজন এজেণ্ট প্রেরণ করা হয়।

চতুর্থ, সে সময়ে কুলীদিগের প্রতি ভীষণ অত্যাচার হইতেছিল। হেয়ার সাহেব তাহা নিবারণ করেন। ১৮৩৫ সালে এদেশীয় কুলিদিগের মরিসস ও বোর্‌বোন্ যাত্রা আরম্ভ হয়। যাইবার উদ্দেশ্য পরিষ্কাররূপে বুঝিয়া, স্বাধীনভাবে যে সকলে যাইত, এমন নহে। অনেক কুলি প্রতারিত হইত। অনেক মিথ্যা কথা বলিয়া, অনেক মিথ্যা প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদিগকে স্বদেশ হইতে লইয়া যাওয়া হইত।

পটলডাঙ্গার একটা বাড়ীতে প্রায় একশত কুলিকে দরজায় তালা দিয়া বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। হেয়ার সাহেব এ বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য প্রায় প্রতিদিন উক্ত স্থানে যাইতেন। তিনি চেষ্টা করিয়া ঐ সকল কুলিকে মুক্ত করিলেন।

কুলিদিগের উপকার করার অপরাধে অনেক লোক হেয়ার সাহেবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু হেয়ার সাহেব ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। কুলিদিগের প্রতি অত্যাচারের বিষয়ে তিনি ক্রমাগত অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। শেষে এই অত্যাচার নিবারণ জন্য ১৮৩৮ সালের ১০ই জুলাই টাউন হলে একটি সভা হইল। এই সভা হইতে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করা হইল যে, কুলীদিগের প্রতি অত্যাচারের বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি কমিসন নিযুক্ত করা হয়। গবর্ণমেণ্ট তজ্জন্য ১৮৩৮ সালে একটি কমিসন নিযুক্ত করেন। হেয়ার সাহেব এই

কমিসনের সম্মুখে কুলিদিগের প্রতি অত্যাচারের বিষয়ে সাক্ষ্যদান করেন। কমিসন রিপোর্ট করিলেন যে, কুলিদিগকে যথার্থই ঠকাইয়া, ভুলাইয়া বিদেশে লইয়া যাওয়া হয়। ইহাদ্বারা তৎকালে এই অত্যাচার নিবারিত হইয়াছিল।

পঞ্চম, ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য বিলাতে ব্রিটিস ইণ্ডিয়া সোসাইটি নামে একটি সভা সংস্থাপিত হইয়াছিল। তাহার সহিত যোগ দিয়া কার্য্য করিবার জন্য ১৮৩৯ সালে এখানে একটি সভা হয়। হেয়ার সাহেব ইহার একজন উদ্যোগী ছিলেন। রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর এ বিষয়ে সভাতে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, হেয়ার সাহেব তাহার সমর্থন করেন।

হেয়ার সাহেবের আর একটি কার্য্য। সে সময়ে এ দেশের আদালত সমূহে ইংরেজী ভাষা প্রচলিত ছিল না। হেয়ার সাহেব জানিতেন, ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার হইলে, এ দেশের বিশেষ কল্যাণ হইবে। আদালত সমূহে যদি ইংরেজী ভাষা ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে, এবং ইংরেজী স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণের জীবিকা অর্জ্জনের বিশেষ সুবিধা হইবে। সেই জন্য তিনি হিন্দুকালেজের ম্যানেজার, ছাত্রগণ ও তাঁহাদের অভিভাবকগণের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করাইলেন যে, আদালত সমূহে ইংরেজী ভাষা প্রচলিত হয়। গবর্ণমেণ্ট উহার উত্তরে বলিলেন যে, আপাততঃ পরীক্ষাস্বরূপ নিকটবর্ত্তী কোন কোন জিলার আদালতে ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করিবার আজ্ঞা দেওয়া হইবে।

সর্ব্বপ্রকার সৎকার্য্যের সহিত হেয়ার সাহেবের যোগ ছিল। ১৮৩৬ সাল হইতে তিনি ভারতবর্ষীয় কৃষিজাত ও উদ্যানজাত সামগ্রী সম্বন্ধীয় সভার (Agricultural and Horticultural Society in India) জনৈক সভ্য ছিলেন। তিনি উহার মাসিক অধিবেশনে নিয়মিতরূপে উপস্থিত হইতেন। তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির একজন সভ্য ছিলেন। ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেবল্ সোসাইটিতে নিয়মিতরূপে চাঁদা দিতেন।

হেয়ার সাহেবের শরীর সুস্থ ও সবল ছিল। পদব্রজে দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করিতে পারিতেন। একদিবস তাঁহার বাসস্থানে একটি যুবা পুরুষ আসিয়া চা পান করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত পদব্রজে ভ্রমণের কথা হওয়াতে তিনি হেয়ার সাহেবকে এমন কিছু কথা বলিলেন, যাহাতে হেয়ার সাহেব পদব্রজে ভ্রমণ বিষয়ে তাঁহার সহিত লড়াই দিতে চাহিলেন। যুবা পুরুষটি তাহাতে সম্মত হইলেন। তখন উভয়ে একত্র ব্যারাকপুর পর্য্যন্ত সাত ক্রোশ পথ হাঁটিয়া গেলেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যখন তাঁহারা হেয়ার ষ্ট্রীটে, অর্থাৎ হেয়ার সাহেবের বাসস্থানের নিকটে পৌঁছিলেন, তখন সেই যুবা পুরুষটি অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। আর তাঁহার পা উঠে না। কিন্তু হেয়ার সাহেব তখনও শ্রান্ত হন নাই। তিনি অবশিষ্ট পথটুকু দৌড়িয়া গিয়া আপনার গৃহে পৌঁছিলেন। হেয়ার সাহেবেরই জয় হইল!

হেয়ার সাহেব সামান্য দ্রব্য আহার করিতেন। কলিকাতার মাখন ভাল নয় বলিয়া উহা খাইতেন না। বলিতেন, উহা কেবল গাড়ীর চাকাতে লাগাইবার যোগ্য।

ছাত্রগণের প্রতি হেয়ার সাহেবের অসাধারণ যত্ন ছিল। যদি শুনিতেন কোন ছাত্রের পীড়া হইয়াছে, তিনি ঔষধ লইয়া তাহার বাসস্থানে গিয়া নিজে তাহার চিকিৎসা ও সেবা করিতেন। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, তিনি একবার জ্বররোগে আরোগ্য লাভ করিয়া হেয়ার সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। হেয়ার সাহেব অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আমাকে জ্বরের সময় সংবাদ দেও নাই কেন? আমি তাহা হইলে ঔষধ লইয়া গিয়া তোমার চিকিৎসা করিতাম।"

স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি যখন হিন্দু কালেজের ছাত্র ছিলেন, তখন তিনি একবার ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। হেয়ার সাহেব তাঁহাকে কিছু ঔষধ সেবন করিতে দিয়াছিলেন। কিন্তু তৎপরে তাঁহার কোন সংবাদ না পাইয়া তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। একটি অতি জঘন্য, অপরিষ্কার গলির ভিতর রামতনু বাবুর বাসা ছিল। হেয়ার সাহেব গভীর রাত্রিকালে তথায় আসিয়া দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন। বাটীর লোক মনে করিল, কোন মদ্যপায়ী ইয়োরোপীয় খালাসি ঐরূপ করিতেছে। সুতরাং তাহারা ভয় পাইয়া কিছুতেই দ্বার খুলিয়া দিতে চাহিল না। হেয়ার সাহেব তাহা বুঝিতে পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন;—"হাম হেয়ার সাহেব হ্যায়, খোল্ দেও।" তখন দরজা খোলা হইল। তিনি ভিতরে আসিলেন।

আর একবার স্বর্গীয় লাহিড়ী মহাশয়ের জ্বর হইয়াছিল। তিনি জ্বরবিচ্ছেদে গুঁড়া কুইনাইন সেবন করিতে সম্মত নহেন বলিয়া, হেয়ার সাহেব কুইনাইনের বড়ি প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে দিয়া গিয়াছিলেন।

বাবু চন্দ্রকুমার মৈত্র বলেন;—"একদিন হেয়ার সাহেব শুনিলেন যে, বাগবাজারে রাধানাথ সেন জ্বররোগে কষ্ট পাইতেছেন। আমারও বাসস্থান ঐ অঞ্চলে শুনিয়া তিনি আমাকে অনুরোধ করিলেন যে, আমি তাঁহার সঙ্গে রাধানাথ সেনের বাটীতে যাই। সে দিন বেলা চারিটা হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত মুষলধারে বৃষ্টি হইয়াছিল। তথাচ তিনি রাত্রি ৯টার সময় আমাকে সঙ্গে লইয়া একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ীতে রাধানাথ সেনের বাটীতে গমন করিলেন। তথায় দুই ঘণ্টা কাল রোগীর চিকিৎসায় নিযুক্ত ছিলেন।

হেয়ার সাহেবের স্কুলের কোন ছাত্র পীড়িত হইলে তিনি তাহার বাসস্থানে গিয়া তাহার চিকিৎসা ও সেবায় নিযুক্ত হইতেন। ছাত্র দরিদ্র হইলে নিজ ব্যয়ে ঔষধ দিতেন এবং পথ্যের জন্য টাকা দিতেন। স্কুলের ছুটির সময় বৃষ্টি হইলে তিনি বালকদিগকে ভিজিয়া বাটী যাইতে দিতেন না। ক্ষুধায় কষ্ট পাইবে বলিয়া নিজ ব্যয়ে খাদ্য আনাইয়া তাহাদিগকে খাইতে দিতেন। বৃষ্টি শীঘ্র না থামিলে ভাড়াটিয়া গাড়ী অথবা ছাতাওয়ালা* ডাকিয়া নিজ ব্যয়ে বালকদিগকে বাটী পাঠাইয়া দিতেন।

স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, বালকেরা যাহাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। প্রায়ই দেখা যাইত যে, অপরাহ্নে স্কুলের ছুটি হইবার সময় হেয়ার সাহেব একখানি পরিষ্কার তোয়ালে হস্তে লইয়া সদর দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিতেন। উহা দ্বারা অনেক বালকের শরীর মুছিয়া দেখিতেন, তাহারা পরিষ্কার থাকিতে যত্ন করে কিনা। হেয়ার সাহেবের ভয়ে বালকেরা নিজ নিজ দেহ নির্ম্মল রাখিতে যত্ন করিত।

হেয়ার সাহেব বালকদিগকে প্রহার করা ভাল বাসিতেন না। বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত বলেন যে, তিনি বাল্যকালে হিন্দুকলেজের স্কুলবিভাগের ছাত্র ছিলেন। তিনি যে শ্রেণীতে পাঠ করিতেন তাহার শিক্ষক, ছাত্রদিগকে অতিশয় প্রহার করিতেন। তিনি মনে করিতেন যে, চকমকির পাথরে ইস্পাতের আঘাত করিলে যেমন তাহাতে অগ্নির প্রকাশ হয়, সেইরূপ বালকদিগকে প্রহার করিলে তাহাদের বুদ্ধির বিকাশ হইয়া থাকে। বাৎসরিক পরীক্ষার সময় যত নিকট হইত, তাঁহার প্রহারের পরিমাণও সেই অনুসারে বৃদ্ধি হইত। অর্থাৎ পরীক্ষা হইবার আটাশ দিন যখন বিলম্ব থাকিত, তখন প্রত্যেক ভুলের জন্য একখানি তালের পাখার বাঁটের দ্বারা দুই ঘা করিয়া প্রহার করিতেন। ছাব্বিশ দিন বিলম্ব থাকিতে তিন ঘা। চব্বিশ দিন বিলম্ব থাকিতে চারি ঘা। পরীক্ষা নিতান্ত নিকটে আসিয়া পড়িলে প্রত্যেক ভুলের জন্য দশ কিম্বা বার ঘা প্রহার হইত। গোবিন্দ বাবু বলেন যে, যে দিন আট ঘা প্রহারের দিন, সে দিন তাঁহার একটা ভুল হওয়াতে তিনি প্রথম একটা ঘা খাইয়াই এত কাঁদিতে লাগিলেন যে, শিক্ষক মহাশয় বলিলেন, আজ তবে থাক্, অবশিষ্ট কয়েক ঘা আর একদিন হইবে। অনাদায়ী ঋণের ন্যায় উহা তিনি আর একদিন আদায় করিবেন। কিন্তু গোবিন্দ বাবুর ভাগ্যক্রমে তিনি উহা আর আদায় করিতে চেষ্টা করেন নাই।

শিক্ষক মহাশয়ের তাল বৃন্তটিতে দুটি কার্য্য হইত। প্রথম, বালকদিগকে প্রহার করা, দ্বিতীয় গ্রীষ্মকালে আপনাকে বাতাস করা। একদিন কিছু অতিরিক্ত পরিমাণে ঐ পাখার বাঁটের দ্বারা তিনি একটি বালককে প্রহার করিয়াছিলেন। হেয়ার সাহেব প্রত্যহ কলেজে আসিয়া তত্ত্বাবধান করিতেন ও প্রত্যেক শ্রেণীর সংবাদ লইতেন। সুতরাং এ কথা তাঁহার কর্ণে উঠিল। তিনি মৃদু হাস্য করিতে করিতে ঐ শ্রেণীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিক্ষক মহাশয়ের নিকটে আসিয়া তাঁহার সহিত অনেকক্ষণ কথা কহিলেন। তৎপরে তাঁহার পাখাখানি লইয়া আপনার জেব হইতে একখানি সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া উহার বাঁটটী গোড়া পর্য্যন্ত কাটিয়া ফেলিলেন। এই মহৎ কার্য্যটি সম্পন্ন করিয়া তিনি দণ্ডায়মান হইয়া

* সে সময়ে কলিকাতার নানা স্থানে উৎকল দেশীয় অনেক ছাতাওয়ালা দেখিতে পাওয়া যাইত। রৌদ্র বা বৃষ্টির সময় তাহাদিগকে পয়সা দিলে তাহারা ছত্রধারণ করিয়া লোককে গম্যস্থানে রাখিয়া আসিত। কার্ত্তিকপূজার সময় অনেক কার্ত্তিকের পশ্চাতে যে ছত্রধারী উড়িয়া বেহারা দেখা যায়, তাহার মূল এই।

ছাত্রদিগের প্রতি একবার তাকাইলেন। তৎপরে উচ্চ হাস্য করিয়া অবশিষ্ট তালবৃন্তটি বায়ুসেবন করিবার জন্য শিক্ষক মহাশয়ের হস্তে দিয়া তাঁহাকে নমস্কার পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন।

হেয়ার সাহেব অতিশয় সাহসী লোক ছিলেন। একদিন কলেজের সম্মুখ দিয়া একজন বলবান্ বিলাতি খালাসী মাতাল যাইতেছিল। কলেজের সম্মুখে একজন ছাত্রের গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। সে উহার কোচম্যানের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। কোচম্যান ও সহিস ভয়ে গাড়ী ফেলিয়া পলায়ন করিল। তখন সে কলেজের প্রাঙ্গণ হইতে একটা প্রকাণ্ড যষ্টি কুড়াইয়া লইয়া গাড়ীখানা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল। কলেজের দরোয়ানেরা উহা নিবারণ করিতে আসিল বটে, কিন্তু সে তাহাদিগকে এমন প্রবলভাবে আক্রমণ করিল যে, তাহারাও ভয়ে চম্পট দিল। তখন খালাসী গাড়ীখানি চূর্ণ করিয়া অদৃশ্য হইল।

এমন সময় হেয়ার সাহেব আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন দরোয়ানেরা আসিয়া তাঁহার নিকট আনুপূর্ব্বিক সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া যে দিকে সেই খালাসি চলিয়া গিয়াছে, দেখাইয়া দিল। হেয়ার সাহেব তখন বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। তথাচ তিনি তীরের ন্যায় বেগে দৌড়িয়া গিয়া সেই মাতাল খালাসিকে ধরিয়া পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয় বলেন যে, সিমলা কালীতলায় একদিন রাত্রে একজন চোর এক শিশুর অলঙ্কার চুরি করিয়া পলায়ন করিতেছিল। হেয়ার সাহেব তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করাতে, সে একটা যষ্টি দ্বারা তাঁহার মস্তকে এমন আঘাত করিল যে, তাঁহাকে কিছু দিন শয্যাগত থাকিতে হইয়াছিল।

বালকেরা হেয়ার সাহেবকে এত ভালবাসিত যে, তাহারা তাঁহার বাটীতে পর্য্যন্ত গমন করিত। তিনি তাহাদিগকে অতিশয় যত্ন করিতেন। তাহাদের সহিত গল্প করিতেন, তাহাদিগকে ক্রীড়ার সামগ্রী সকল উপহার দিতেন।

বাবু চন্দ্রশেখর দেব বলেন যে, তিনি এক দিন অপরাহ্নে হেয়ার সাহেবের বাটীতে যাইবার সময় পথে বৃষ্টিতে ভিজিয়াছিলেন। তথায় পৌঁছিবামাত্র হেয়ার সাহেব তাঁহাকে আর্দ্র বস্ত্র ছাড়াইলেন। নিজ হস্তে উহা নিঙ্গড়াইয়া ভৃত্যকে শুকাইতে দিলেন। নিজের রুমাল দিয়া তাঁহার মাথা মুছাইয়া দিলেন। পরে একটা তাড়িত যন্ত্র ও একটা গ্যালভেনিক ব্যাটারি লইয়া তাঁহাকে আমোদ দিতে লাগিলেন।

আর একদিন চন্দ্রশেখর বাবু হেয়ার সাহেবের বাটীতে অপরাহ্নে উপস্থিত হইলে পর বৃষ্টি হইতে লাগিল, শীঘ্র থামিল না। সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত বৃষ্টি হইতে লাগিল। চন্দ্রশেখর বাবু বাটী ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাকে ভিজিয়া বাটী যাইতে দিলেন না; তাঁহার আহারের সময় উপস্থিত হওয়াতে তিনি নিকটবর্ত্তী ময়রার দোকানে চন্দ্রশেখর বাবুর আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া নিজে আহার করিতে গেলেন। তৎপরে তিনি চন্দ্রশেখর বাবুকে বাটী পৌঁছিয়া দিবার জন্য তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পটলডাঙ্গায় তাঁহার পৈতৃক বাটীর নিকটে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি কি এখান হইতে বাটী যাইতে পারিবে? যাইতে পারিব, বলিয়া চন্দ্রশেখর বাবু বাটীর দিকে দৌড়িয়া গেলেন। কিন্তু ইহাতে হেয়ার সাহেবের মন বুঝিল না। তিনি তাঁহার পৈতৃক বাটীর সম্মুখে গিয়া চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বালক পৌঁছিয়াছে কি না। তাঁহার পিতা আসিয়া বলিলেন যে, সে বাটী পৌঁছিয়াছে। তখন হেয়ার সাহেব নিশ্চিন্তমনে ফিরিয়া গেলেন।

বালকদিগের উন্নতির জন্য হেয়ার সাহেব নানাপ্রকার চেষ্টা করিতেন। অলস বালকদিগকে পরিশ্রমী হইবার জন্য উত্তেজিত করিতেন, পরিশ্রমী বালকদিগকে পুরস্কার দিয়া উৎসাহিত করিতেন। কোন্নগর নিবাসী স্বর্গীয় শিবচন্দ্র দেব মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, তিনি যখন হিন্দু কলেজের চতুর্থ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন, তখন এক দিবস একজন দর্শক আসিয়া তাঁহাদের শ্রেণীর পরীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি উত্তম পরীক্ষা দেওয়াতে হেয়ার সাহেব তাঁহাকে একখানি তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর ইংরেজী ও বাঙ্গালা ডিক্‌সনারি পুরস্কার দিয়াছিলেন।

বালকদিগের চরিত্রের প্রতি তাঁহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। যে সকল বালক বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত হইত তাহারা কোথায় থাকে, কি করে, অনুসন্ধান করিবার জন্য, তিনি কাশীনাথ নামক একজন ভৃত্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে কেবল ভৃত্যের উপরেই নির্ভর করিতেন না। অনুপস্থিত বালকদিগের গৃহে নিজে গিয়া জানিতেন যে, তাহারা তথায় আছে কি না। গৃহে দেখিতে না পাইলে, অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের গুপ্ত আড্ডায় গিয়া তাঁহাদিগকে ধরিতেন। অনেক মন্দ বালককে তিনি ভাল করিয়াছিলেন। অনেক অসচ্চরিত্র ছাত্রকে তিনি সচ্চরিত্র করিয়াছিলেন। যে সকল বালক সম্বন্ধে কেহই মনে করিত না যে, তাহারা কখন মানুষ হইবে, এমন অনেক বালক হেয়ার সাহেবের প্রসাদে সুশিক্ষিত ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়াছিল। কেহ কেহ তাহাদের পরিবারের ও জনসমাজের পক্ষে অলঙ্কারস্বরূপ হইয়াছিলেন। বালকদিগের ব্যবহার ও কার্য্য সম্বন্ধে হেয়ার সাহেব কত দূর অনুসন্ধান করিতেন, তাহা একটি ঘটনার কথা বলিলে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন। কোন ধনী পরিবারের একটি দুষ্ট বালক, তাহার অপেক্ষা অল্প বয়স্ক আর একটি বালকের সঙ্গ লাভের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিত। কিন্তু সেই অল্প বয়স্ক বালক তাহার নিকট থাকিতে ভালবাসিত না। ইহাতে সেই দুষ্ট বালকটি উহার উপর বড়ই বিরক্ত হইল এবং উহাকে সকলের নিকট অপদস্থ ও অপমানিত করিবার জন্য একটি উপায় স্থির করিল। সে কোন ব্যক্তির দ্বারা ঐ বালকের নিন্দাসূচক একটি কুৎসিত কবিতা রচনা করাইয়া লইল। স্থির করিল, স্কুলের দরোয়ানদিগকে বশীভূত করিয়া গভীর রাত্রে আসিয়া স্কুলের হলে, প্রকাশ্য স্থানে উহা লাগাইয়া দিবে। এক দিন রাত্রি একটার সময় সে একটি লণ্ঠন হস্তে স্কুলের হলে আসিয়া সেই নিন্দাসূচক কবিতা দেয়ালে লাগাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় হঠাৎ দেখিল যে, হেয়ার সাহেব হলের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তখন বৃষ্টি হইতেছিল; সুতরাং হেয়ার সাহেবের সমস্ত শরীর ভিজিয়া গিয়াছিল। হেয়ার সাহেব পূর্ব্ব হইতেই এ বিষয়ের সংবাদ পাইয়াছিলেন। তিনি সেই দুষ্ট বালককে ধরিয়া ফেলিলেন। একটি নির্দ্দোষী বালক অপমান, লজ্জা ও অমূলক কুৎসা হইতে রক্ষা পাইল।

যে সময়ে, মাহেশের স্নানযাত্রার সময়, কলিকাতার অনেক বাবু, বারাঙ্গনা সমভিব্যাহারে, নৌকা করিয়া আমোদ করিতে করিতে মাহেশে যাইতেন। বালকদিগের চরিত্রের প্রতি হেয়ার সাহেবের এরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল যে, যাহাতে তাঁহার বালকগণ কেহ ঐ প্রকার কুসংসর্গে মাহেশ গমন না করে, সে জন্য তিনি গঙ্গার ঘাটে ঘাটে অনুসন্ধান করিতেন; কোন বালককে ঐরূপ কুসঙ্গে দেখিতে পাইলে, তাহাকে ধরিয়া আনিতেন ও উপযুক্ত শাস্তি দিতেন।

গরিব লোকের সন্তানকে হেয়ার সাহেব বিনা বেতনে তাঁহার স্কুলে ভর্ত্তি করিতেন। কত গরিব দুঃখীর ছেলে তাঁহার স্কুলে পড়িয়া মানুষ হইয়াছে, কে তাহা নির্দ্ধারণ করিবে? তিনি গরিবের মা বাপ ছিলেন। একদিন হেয়ার সাহেব একটী বাঙ্গালী বাবুর সঙ্গে তাঁহার স্কুল গৃহে বসিয়া আছেন, এমন সময় একটি দুঃখিনী বিধবা নারী তাহার শিশু সন্তানটিকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিল যে, তিনি তাহাকে তাঁহার স্কুলের লাষ্টক্লসে বিনা বেতনে ভর্ত্তি করিয়া লন। লাষ্টক্লাসে তখন অনেক বালক ভর্ত্তি হওয়াতে ক্লাস পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া হেয়ার সাহেব ঐ শিশুটিকে ভর্ত্তি করিতে অস্বীকার করিলেন। ইহাতে ঐ দুঃখিনী বিধবা ক্রন্দন করিতে করিতে নিজ গৃহে চলিয়া গেল।

ডেভিড হেয়ারের কোমল হৃদয়ে ইহা বড়ই লাগিল। তিনি যে বাঙ্গালী বন্ধুটির সহিত একত্রে বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে বলিলেন যে, ঐ স্ত্রীলোকটির প্রকৃত অবস্থা জানা এবং উহার বাসস্থান খুঁজিয়া বাহির করা আবশ্যক। তখন তিনি সেই বন্ধুটির সহিত বাহির হইয়া অনেক অন্বেষণের পর সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে তাহার সন্ধান পাইলেন। হেয়ার সাহেব ও একটি বাঙ্গালী বাবু আসিয়াছেন শুনিয়া স্ত্রীলোকটি তাহার শিশু সন্তানটিকে সঙ্গে লইয়া অতি ব্যগ্রভাবে তাহার কুটীর হইতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে একটিও কথা বলিতে পারিল না। নীরবে দণ্ডায়মান রহিল। তাহার গণ্ডস্থল ধৌত করিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাহার এইরূপ ভাব দেখিয়া হেয়ার সাহেব এত দূর অভিভূত হইলেন যে, কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত একটিও কথা বলিতে পারিলেন না। পরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, আমি অদ্য হইতে তোমার পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার ভার গ্রহণ করিলাম। তোমার পুত্র যতদিন না অর্থোপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইবে, ততদিন তোমাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য প্রতি মাসে নিয়মিতরূপে চারি টাকা করিয়া দিব। এই কথা বলিয়া তিনি তখনই তাহাকে চারিটি টাকা

দিলেন। হেয়ার সাহেবের এই প্রকার দয়া দেখিয়া স্ত্রী লোকটি আশ্চর্য্য হইল। সে প্রাণের সহিত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল! সে বলিতে লাগিল যে, সাহেব মানুষ নহেন। কোন দেবতা মানবাকার ধারণ করিয়া দুঃখীর উপকারের জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছেন। হেয়ার সাহেব নিজের প্রশংসা শুনিতে ভাল বাসিতেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

হেয়ার সাহেব যে কেবল বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্যই অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন, এমন নহে। তিনি গরিব দুঃখীর উপকারের জন্য নানাপ্রকারে অর্থ ব্যয় করিতেন। বাবু শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, দুইবার পূজার সময় হেয়ার সাহেব চারি শত টাকার ধুতি ও সাড়ী ক্রয় করিয়া তাঁহার স্কুলের দুঃখী বালকদিগকে ও তাহাদের মাতা ও ভগিনীদিগকে বিতরণ করিয়াছিলেন। পূজার সময় নূতন বস্ত্র না হইলে তাহাদের মনে বড়ই কষ্ট হইবে বুঝিতে পারিয়া হেয়ার সাহেব নিজব্যয়ে বস্ত্র বিতরণ করিয়াছিলেন।

এদেশীয়দিগের কল্যাণ সাধন করিবার জন্য হেয়ার সাহেব কয়েক লক্ষ টাকা রাখিয়া দিয়াছিলেন। উহা ক্রমে নিঃশেষ হইয়া গেল। তখন চীনদেশ প্রবাসী তাঁহার কোন ধনী আত্মীয়ের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। সেই ধনী আত্মীয় তাঁহারই ন্যায় দয়ালু লোক ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার যাহা কিছু ভূসম্পত্তি ছিল সৎকার্য্যের ব্যয় করিবেন বলিয়া সকলই বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। কলেজ স্কোয়ারের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের যত ভূমি সকলই হেয়ার সাহেবের ছিল। তিনি ঐ সমস্তই বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া ছিলেন।

১৮৪২ সালের ৩১শে মে হেয়ার সাহেব ওলাউঠা রোগাক্রান্ত হইলেন। তিনি ইহাতে কিছুমাত্র ভয় পান নাই। মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইলেন। তিনি, তাঁহার সরদার বেহারাকে আজ্ঞা করিলেন, গ্রে সাহেবের নিকটে গিয়া বল যে, আমার জন্য একটা কফিন নিম্মাণ করিয়া দেন। সরদার বেহারা তাঁহার আজ্ঞাপালন করে নাই। চিকিৎসা যথেষ্ট হইল, কিন্তু কোন ফল হইল না। মৃত্যুশয্যায় তিনি তাঁহার ডাক্তার প্রসন্ন মিত্রকে বলিলেন "আর শরিষার পুল্টিস্ লাগাইও না, আমি শান্তিতে মরিতে চাই।" মহাপুরুষ পরদিবস অর্থাৎ ১৮২৪ সালের ১লা জুন দেহ ত্যাগ করিলেন।

হেয়ার সাহেবের পরলোক গমনে আপামর সাধারণ সকলেই শোকার্ত্ত হইলেন। শত শত চক্ষে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। মৃত্যুসংবাদ পাইয়া বহুসংখ্যক বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাঁহার গৃহে আসিলেন, গৃহ পূর্ণ হইয়া গেল। রাজা রাধাকান্ত দেব, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, বাবু রসময় দত্ত প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাত্মা হেয়ার সাহেবের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, সে দিন অতিশয় বৃষ্টি, পথে অতিশয় জল ও কাদা, তথাচ পাঁচ হাজার লোক কাঁদিতে কাঁদিতে শবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়াছিল। হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ তাঁহার কফিন বহন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে আমাদের ভক্তিভাজন স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় একজন।

শব লইয়া যাইবার সময় পথের দুই পার্শ্বে, রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী বাটী সকলের বারান্দায় ও জানালায়, ছাদের উপর, আবাল বৃদ্ধ বনিতা দণ্ডায়মান হইয়া কফিন দর্শন ও শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। ক্রমে সকলে কলেজ স্কোয়ারে আসিয়া উপনীত হইলেন। তথায় লোকে লোকারণ্য হইল। সেই স্থানেই হেয়ার সাহেবের সমাধি হইল।

পাঠকবর্গ এস্থলে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন হেয়ার সাহেবের সমাধি, সাহেবদিগের গোরস্থানে না হইয়া কলেজ স্কোয়ারে হইল কেন? ইহার উত্তর এই যে, প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্মে হেয়ার সাহেবের বিশ্বাস ছিল না।

হেয়ার সাহেব এদেশের জন্য কি করিয়াছেন? এ দেশে যাঁহারা পাশ্চাত্য জ্ঞানের আলোক আনয়ন করেন, তন্মধ্যে তিনি একজন প্রধান! তাঁহাকে হিন্দুকলেজের সংস্থাপক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হিন্দু কলেজ সংস্থাপন বিষয়ে সকলের মত করিবার জন্য তিনি ভিক্ষুকের ন্যায় দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। স্কুল সোসাইটির পক্ষ হইয়া তিনি স্থানে স্থানে বাঙ্গালা ইংরেজী স্কুল সংস্থাপন করেন। স্কুলবুক সোসাইটি হইতে তাঁহারই যত্নে বাঙ্গালা ও ইংরেজী ভাষায় ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী অনেক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। বালকদিগের ন্যায় যাহাতে বালিকাদিগেরও শিক্ষা হয়, তজ্জন্যও তিনি বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। বালক বালিকাদিগের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া দরিদ্র হইয়া গিয়াছিলেন। এমন কি তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পরমেশ্বর তাঁহার দ্বারা যে উন্নতি স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা চিরদিনই প্রবাহিত হইয়া ভারতের অশেষ কল্যাণ সংসাধন করিবে।

কেবল কি শিক্ষা সম্বন্ধে? অত্যাচরিত কুলিদিগের মা বাপ কে ছিলেন? মহাত্মা হেয়ার সাহেব। তাঁহার সময়ে যে সকল রাজনৈতিক আন্দোলন হইয়াছিল, তাহাতে কোন্ ইয়োরোপীয় উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়া এদেশীয়দিগের কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন? মহাত্মা হেয়ার সাহেব।

হেয়ার সাহেবের চরিত্র ও জীবন দেখিয়া আমরা কি শিক্ষা করিতে পারি? কেমন করিয়া মানবের হিতার্থে দেহ, মন, প্রাণ সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে হয়, কেমন করিয়া দুঃখী ধনী সকলকে সমভাবে ভালবাসিতে হয়, কেমন করিয়া সকলের বন্ধু হইয়া সকলের হিতার্থে সকলের গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিতে হয়, কেমন করিয়া দুঃখীর দুঃখে চক্ষের জল ফেলিতে হয়, কেমন করিয়া নিজের শ্রমোপার্জ্জিত অর্থ দুঃখীর দুঃখ নিবারণ ও বিপন্নের উদ্ধারের জন্য অকাতরে ব্যয় করিতে হয়, কেমন করিয়া কাঙ্গালেরমা বাপ হইতে হয়, কেমন করিয়া আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়া পরকে সুখী করিতে হয়, হেয়ার সাহেবের চরিত্রে ও জীবনে আমরা তাহাই শিক্ষা করিতে পারি।

হেয়ার সাহেব চির কুমার ছিলেন। এ দেশের বালক বালিকারাই তাঁহার সন্তান সন্ততি। তিনি আমাদের জন্য খাটিয়া খাটিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাঋণে চিরবদ্ধ। পরমেশ্বর আমাদিগকে এরূপ সুবুদ্ধি দিন যাহাতে আমরা এই মহাত্মার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া জীবন পথে অগ্রসর হইতে পারি।

চান্দ্ররহস্য।

প্রাচীন কবি লিখিয়াছেন,—

"একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি ন চ তারা গণৈরপি।"

অনন্ত আকাশে ব্যাপ্ত ক্ষীণপ্রভ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকাগুলির তুলনায়, শুভ্র স্নিগ্ধ কিরণবর্ষী পূর্ণচন্দ্রের প্রাধান্য দেখিয়া মুগ্ধ কবি নিশ্চয়ই চির উজ্জ্বল ভীমকায় নক্ষত্রগণ অপেক্ষা শশাঙ্ককে উচ্চ আসনে বসাইয়াছেন। চন্দ্রদেব কুটিলগতি দ্বারা সূক্ষ্মদর্শী জ্যোতিষিগণের শত চেষ্টা যেপ্রকার নিষ্ফল ভাবে ব্যর্থ করিতেছেন এবং নিয়তই এক রহস্যময় আবরণে স্বীয় বপুখানি ঢাকিয়া বিজ্ঞানবিদ্গণের অজ্ঞানান্ধকার যে প্রকারে ক্রমেই গাঢ়তর করিয়া তুলিতেছেন, তাহা জানিলে নিশ্চয় সেই কবিই বলিতেন,—

"তারাস্তোমস্তমো হন্তি নচৈব সিতরশ্মিনা।"

কিছুদিন পূর্ব্বে একটা গল্প শুনিয়াছিলাম, কোন এক ব্যক্তি চন্দ্র ও সূর্য্যের তুলনা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, দশটা সূর্য্য এক চন্দ্রের সমান: কারণ সূর্য্য কেবল দিবালোকে উদিত হইয়া আলোকের পরিমাণ বৃদ্ধি করে মাত্র, কিন্তু রজনীর অন্ধকারে এক চন্দ্রই আমাদের পথপ্রদর্শক। পাঠকপাঠিকাগণ নিশ্চয়ই বলিবেন, লোকটা বিজ্ঞান বিষয়ে নিতান্তই অনভিজ্ঞ, এবং উহার বুদ্ধিটাও বড় স্থূল। আমরা পাঠকপাঠিকাগণের এই সিদ্ধান্তের বিরোধী হইব না, কিন্তু তাঁহারা যদি কোন এক সূক্ষ্মবুদ্ধি জ্যোতিষীকে চন্দ্র সূর্য্যের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তিনিও অপরাপর নানা যুক্তি দ্বারা সেই বিজ্ঞানরসবর্জ্জিত মূঢ় লোকটার উক্তি সমর্থন করিয়া বলিবেন, "দশটা সূর্য্য এক চন্দ্রের সমান।" কোটি যোজন ব্যবহিত সূর্য্যের আকার ও গঠনোপাদান প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রায় সকল জ্ঞাতব্য বিষয় আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ অভ্রান্তরূপে স্থির করিয়াছেন,— কিন্তু জ্যোতিষ্ক পরিদর্শনের উপযোগী নানা যন্ত্রের আবিষ্কার সত্ত্বেও কেবল পাঁচলক্ষ ক্রোশ দূরবর্ত্তী ভূসখ চন্দ্রের অনেক তত্ত্ব রহস্যাবৃত রহিয়া গিয়াছে। হঠাৎ শুনিলে কথাটি অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু ইহা সত্য।

পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন, পৃথিবী যেমন এক নির্দ্দিষ্ট পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, চন্দ্রও সেই প্রকার মাসে একবার ভূপ্রদক্ষিণ করিতে করিতে,

পৃথিবীর সহিত সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। এতদ্ব্যতীত পৃথিবীর আহ্নিকগতির ন্যায় চন্দ্রের অপর একটা গতি আছে। ইহা দ্বারা একবার পূর্ণ-ভূ প্রদক্ষিণ কালে চন্দ্র স্বীয় অক্ষরেখায় (axis) একবার পূর্ণ আবর্ত্তন করিয়া থাকে। যুগপৎ এই গতিত্রয় দ্বারা চালিত হওয়ায় চন্দ্রমণ্ডল পরিদর্শন বড়ই দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। পাঠক-পাঠিকাগণ দেখিয়া থাকিবেন, আমরা সকল তিথিতেই চন্দ্রের এক নির্দ্দিষ্ট গোলকার্দ্ধের অংশবিশেষ দেখিতে পাই, চন্দ্র উদিত হইলেই সেই চির পরিচিত শশাঙ্কিত মণ্ডল আমাদের চক্ষে পড়ে; ইহার অপরার্দ্ধের আকৃতি কিরূপ, এবং ইহা বাস্তবিকই সেই কবি-কল্পিত নিষ্কলঙ্ক মণ্ডল কি না, তাহা জানিবার আর উপায় নাই। চন্দ্রের অপরার্দ্ধ এই প্রকার চিরাবগুণ্ঠিত থাকিবার কারণ, ইহার গতির পূর্ব্বোক্ত জটিলতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। চন্দ্র যখনই পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে লুক্কায়িত বদন উন্মুক্ত করিয়া একবার ধরাসুন্দরীকে দেখিবার আয়োজন করে, অমনি তাহার স্বীয় অক্ষাবর্ত্তনগতি জোরে ধাক্কা মারিয়া, তাহার সেই অতি পুরাতন কলঙ্কিত মুখখানি আমাদের দৃষ্টিগোচর করাইয়া দেয়। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের উদ্যোগের ক্রটী নাই: চন্দ্রের কলঙ্কাপবাদ মোচন করিবার জন্য প্রাচীন ও আধুনিক জ্যোতিষিগণ বহু চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, এবং লুক্কায়িত অংশটা ভূপৃষ্ঠের ন্যায় "সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা" বলিয়াও অল্প দিন হইল কয়েকটা পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু চন্দ্রের অক্ষাবর্ত্তনগতির বিভ্রাটে সকল চেষ্টা ও সকল অনুমানই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।

সম্প্রতি চান্দ্ররহস্য সম্বন্ধে একটা নূতন তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে; কিন্তু এই আবিষ্কার দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত কলঙ্ক-ক্ষালনের পরিবর্ত্তে, চন্দ্রের কলঙ্ক বৃদ্ধিরই অধিক সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। সুপ্রসিদ্ধ গ্রীনউইচ্ মানমন্দির ও আমেরিকার লিক্ পরিদর্শনাগারের সুবৃহৎ দূরবীক্ষণের সাহায্যে, কিছু দিন হইতে কয়েকটী পণ্ডিত চন্দ্রমণ্ডল পরিদর্শন করিতেছিলেন। চান্দ্রগোলকে নানা অবস্থায় ফোটোগ্রাফ্ ছবি তুলিয়া তাঁহারা প্রচার করিয়াছেন, চন্দ্রের কেবল একার্দ্ধ ভূ-বাসিগণের দৃষ্টির অন্তর্ভূত বলিয়া আমাদের যে বিশ্বাস ছিল, তাহা ভুল; বিশেষ সতর্কতার সহিত বৃহৎ দূরবীক্ষণ দ্বারা চন্দ্রমণ্ডল পরিদর্শন করিলে, ইহার পশ্চাদার্দ্ধের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ অনায়াসেই আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত ফোটোগ্রাফ্ ছবি ব্যতীত, আরও অনেক যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ইঁহারা উল্লিখিত অভিনব উক্তিটীর সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। প্রযুক্ত প্রমাণগুলি কিঞ্চিৎ নীরস ও জটিল হইলেও, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহাদের কিঞ্চিৎ আভাস প্রদানের চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, একবার ভূপ্রদক্ষিণ কালে চন্দ্র তাহার অক্ষরেখায় একটী পূর্ণাবর্ত্তন করিয়া থাকে, এবং এই আবর্ত্তন জন্যই আমরা পৃথিবী হইতে চন্দ্র গোলকের এক নির্দ্দিষ্ট অর্দ্ধাংশ সর্ব্বদা দেখিয়া থাকি; নচেৎ চন্দ্রমণ্ডলের সর্ব্বাবয়বই ক্রমে আমাদের চক্ষুগোচর হইয়া পড়িত। চন্দ্রের এই অক্ষাবর্ত্তন গতিটীর একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহা সকল সময়েই সমবেগসম্পন্ন থাকে, এই গতির হ্রাসবৃদ্ধি নাই। সম্ভবতঃ সেই একই বেগে লাটিমের ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে চন্দ্র সৃষ্টিকাল হইতে ধরা প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহা যে পরিধিতে ডিম্বাকৃতি (Elliptical) পথে ভূ-প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে, তাহার পরিমাণ সকল সময়ে সমান থাকে না। চান্দ্রকক্ষের যেস্থান সর্ব্বাপেক্ষা পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী, আকর্ষণের আধিক্য প্রযুক্ত তথাকার গতির পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে, তার পর চন্দ্রদেব সেই বৃত্তাভাষ পথ অবলম্বন করিয়া পৃথিবী হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী অংশাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিলে তাহার গতির পরিমাণও ক্রমে হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়।

এখন এই কক্ষাবর্ত্তন ও ভূ-প্রদক্ষিণের দুইটী বিসদৃশ গতির বিষয় ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে, যুগপৎ গতিযুগল দ্বারা চালিত হইয়া চন্দ্র পৃথিবীর অতি নিকটবর্ত্তী হইলে, গতিদ্বয়ের সাম্যতা রক্ষা অসম্ভব হইয়া পড়ে, এবং সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রের কেবল একই অংশ ধরাভিমুখে উন্মুক্ত থাকাও অসম্ভব হইয়া যায়; কাযেই ঐ সময়ে ভূ-প্রদক্ষিণী গতির আতিশয্য হেতু চন্দ্রের পশ্চাদ্ভাগের কিয়দংশ আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত অবস্থায় প্রতিভাত হয়। তার পর আবার পৃথিবী হইতে সর্ব্বাধিক দূরবর্ত্তীস্থানে চলিতে আরম্ভ করিলেও চন্দ্রের অপচীয়মান গতিপ্রযুক্ত ঠিক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শশাঙ্কগোলকের পশ্চাদ্ভাগের বিপরিত প্রান্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া পড়ে। লিক্ মানমন্দিরস্থ

সুবৃহৎ দূরবীক্ষণের সাহায্যে, এই উপায়ে, চন্দ্রমণ্ডলের পশ্চাদার্দ্ধের পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্তের কতকটা আবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছে।

এতদ্ব্যতীত, অপর উপায়ে, চন্দ্রের অদৃশ্যাংশের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তেরও বিষয় আমরা কিঞ্চিৎ জানিতে পারিয়াছি। চন্দ্র নিয়তই পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে বলিয়া, পৃথিবী যে সমতলক্ষেত্রে (plane) সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, চন্দ্র সেই সমতলস্থ হইয়া অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না; কাজেই ঐ সমতলের তুলনায় একবার উহার উর্দ্ধে এবং তৎপরে উহার অধোদিকে চন্দ্রের গতি হইতে দেখা যায়। এই প্রকারে চন্দ্র যখন ভূকক্ষ-সমতলের সর্ব্বোচ্চ স্থানে থাকে, তখন চন্দ্রমণ্ডলের লুক্কায়িত দক্ষিণ মেরুর কিয়দংশ আমরা দেখিতে পাই, এবং তা'র পর ক্রমে সর্ব্বনিম্ন-স্থান অধিকার করিলে, উত্তর মেরুরও কতকটা নয়নগোচর হইয়া পড়ে*।

আধুনিক জ্যোতিষিগণ, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চন্দ্রমণ্ডল পরিদর্শন করিয়া, ইহার পশ্চাদ্ভাগের প্রায় একপঞ্চমাংশ আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু এই আবিষ্কার দ্বারা জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের পূর্ব্ব অনুমান সফল হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না; পুরোভাগের ন্যায়, চন্দ্রমণ্ডলের পশ্চাদ্ভাগের ছবিতেও, সেই বৈচিত্র্যহীন গভীর গহ্বর ও তরুলতাশূন্য অত্যুচ্চ শৈলমালা ব্যতীত আর কিছু দেখা যায় না। চন্দ্রের উভয় পার্শ্বই জীবাবাসচিহ্নরহিত ভীষণ প্রান্তর. তথায় জলবায়ুর অস্তিত্ব নাই, সুতরাং মেঘ নাই, ঝড় ঝঞ্ঝা নাই; সর্ব্বদা এক ভয়াবহ নিস্তব্ধতা বিরাজিত থাকিয়া বৈচিত্র্যহীন চন্দ্রপৃষ্ঠকে আরও বিভীষিকাময় করিয়া তুলিতেছে! পূর্ণ একপক্ষব্যাপী ঘোরান্ধকারময়ী রজনীর পর, হঠাৎ সূর্য্যদেব উদিত হইয়া একপক্ষকাল অবিরাম আলোকবর্ষণ করিয়া মৃত চন্দ্রের ভয়াবহ পরিণাম জগতে প্রচার করেন।—তা'র পর আবার সেই সুদীর্ঘ তামসী নিশা.—সেই অচিন্তনীয় শীত। কবিদিগের কল্পনা-চাতুর্য্য প্রদর্শনের প্রধান অবলম্বন, এবং নায়ক নায়িকার প্রীতিবর্দ্ধক সিতরশ্মি সুধাকরের গার্হস্থ্য অবস্থার এই বিভীষিকাময় চিত্র বাস্তবিকই হৃদয়বিদারক।

আচার্য্য হান্‌সেন্ (Prof. Hansan) প্রমুখ কয়েকটী পণ্ডিত চন্দ্রের পশ্চাদ্ভাগ জীববাসোপযোগী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। কি আশ্চর্য্য! এই আবিষ্কার বিবরণ প্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও, তাঁহারা অদ্যাপি স্বীয় সিদ্ধান্তের পোষক যুক্তি প্রদর্শন করিতে ছাড়িতেছেন না! তাঁহাদের প্রধান যুক্তি এই যে, "চন্দ্রের পশ্চাদ্ভাগের কেবল এক-পঞ্চমাংশ দেখিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিগণ কিপ্রকারে "সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা" সুবৃহৎ চান্দ্র-"ভূমি"র অস্তিত্বটা ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে সাহসিক হইতেছেন? অবশিষ্ট অনাবিষ্কৃত চারিপঞ্চমাংশে মনোরম পরীর রাজ্য ত থাকিতে পারে।" জ্যোতিষ-শাস্ত্রের বর্ত্তমান অবস্থায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইয়া এই তর্কের মীমাংসা করা বড় দুরূহ, তবে পূর্ব্ববর্ণিত আবিষ্কারের বিষয়গুলি মনে রাখিয়া, নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে, আচার্য্য হান্‌সেনের কল্পিত চান্দ্ররাজ্যটা যে কেবল তাঁহার কল্পনাসুলভ মস্তিষ্ক হইতেই প্রসূত, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। এখন রন্‌জেনের রশ্মির (Rontgen's rays) ন্যায় একটা অদ্ভুত আবিষ্কার সাধিত হইয়া, চন্দ্রের অপরার্দ্ধের সমগ্র অংশটা আমাদের দৃষ্টিগত না হইলে, কিম্বা কোন এক আকস্মিক দৈব উপায় দ্বারা উক্ত অংশটা ধরাভিমুখে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইয়া না পড়িলে, অধ্যাপক হান্‌সেনের অদ্ভুত কল্পনার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রয়োগ করা এক প্রকার অসম্ভব।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

ছত্তিশগড়ে স্ত্রীশিক্ষা।

মধ্যপ্রদেশের পূর্ব্বতম বিভাগের নাম ছত্তিশগড়। ইংরাজাধিকারের পুর্ব্বে ইহা ছত্রিশটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তাহা হইতেই ইহার নাম ছত্তিশগড় হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ইহার অন্তর্গত অনেক গুলি ক্ষুদ্র রাজ্য বিলুপ্ত হইয়া রায়পুর, বিলাসপুর ও সম্বলপুর এই তিন জিলার উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু এই তিন জিলা ছাড়া, সোণপুর, পাটনা, বামড়া, গাঙ্গপুর, নন্দগাঁও, রায়গড় প্রভৃতি অনেক গুলি করদরাজ্য এখনও ছত্তিশগড়ের Feudatories নামে

* একটি খেলিবার "বল" ঠিক্ চক্ষের সম্মুখে ধরিলে তাহার একার্দ্ধাংশ আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু ঠিক্ সেই অবস্থায় সেটীকে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিলে, তাহার নিম্ন প্রান্তের কিয়দ্ভাগও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। উল্লিখিত ব্যাপারটী কতকটা সেই প্রকারের।

পরিচিত হইয়া আসিতেছে। উপরোক্ত তিনটী জিলা লইয়াই ছত্তিশগড়ে ইংরাজের খাসমহল গঠিত। ইহা মধ্য প্রদেশের পূর্ব্ব বিভাগ নামে পরিচিত ও একজন কমিশনর কর্ত্তৃক শাসিত।

ছত্তিশগড়ের খাসমহল বাদ দিয়া অবশিষ্টাংশ "রাজোয়াড়া" নামে পরিচিত। তাহাতে ইংরাজ প্রভুত্ব অটুট্ রাখিবার ও তাহার তত্ত্বাবধান করিবার জন্য একজন Political Agent নিযুক্ত আছেন। বিভাগীয় কমিশনর ও রাজোয়াড়ার পলিটিক্যাল এজেণ্ট উভয়েরই বাসস্থান (Head Quarters) রায়পুরে।

রায়পুর ও বিলাসপুরের অধিবাসীরা হিন্দুস্থানী ছত্তিশগড়ী বলিয়া খ্যাত, কারণ এই দুই জিলাতে হিন্দী ভাষা প্রচলিত। সম্বলপুরের অধিবাসীরা উড়িয়া, ইহাদিগকে ছত্তিশগড়ী না বলিলেও চলে। এই জিলাত্রয় পরস্পরের সহিত সংলগ্ন। কিন্তু কেহ যদি রায়পুর কিম্বা বিলাসপুর হইতে সম্বলপুর যাইতে যাইতে এক জিলার সীমা অতিক্রম করিয়া অন্য জিলায় প্রবেশ করেন, তবে দেখিতে পাইবেন, যে ৫ মাইলের ভিতর দুইটী গ্রামের লোক পরস্পরের অজ্ঞাত ও অবোধ্য দুই বিভিন্ন ভাষায় কথা কহিতেছে। ছত্তিশগড়ের ভাষা বিশুদ্ধ হিন্দী নহে, কিন্তু তথাপি রায়পুরের ভাষা ও সম্বলপুরের ভাষাতে আকাশ পাতাল প্রভেদ। রায়পুরের সীমান্তভাগে কোন কোন বিদ্যালয়ে দেখা যায় হিন্দী ভাষায় পাঠ চলিতেছে, হিন্দীতে পাঠ বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে, বালকগণ যথাসাধ্য বিশুদ্ধ হিন্দীতে প্রশ্নের উত্তর দিতেছে। একবার সীমা অতিক্রম করিয়া ৫ মাইল চলিয়া গিয়া সম্বলপুরের সীমান্তর্গত হও, অমনি যেন স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করিবে। বিচিত্র ভাষায়, বিচিত্র অক্ষরে, অহিন্দী ভাষাতে লিখিত গ্রন্থ দেখিতে পাইবে। এইরূপ একটী উড়িয়া জিলা কেমন করিয়া হিন্দী-প্রধান মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত হইল, তাহা সাধারণ লোকের বোধগম্য নহে।

মধ্য প্রদেশের পূর্ব্ব বিভাগীয় কর্ম্মচারীদিগকে হিন্দী ও উড়িয়া এই উভয় ভাষাতে ব্যুৎপন্ন হইতে হয়। যাঁহারা কখনও উড়িয়া অক্ষর দেখেন নাই, তাঁহাদিগকে সহজে বুঝাইতে হইলে ইহা বলা যাইতে পারে যে, কতক হিন্দী ও কতক বাঙ্গালা অক্ষর সারি সারি সাজাইয়া, তাহাদের মাথায় একটা করিয়া হাঁড়ি উপুড় করিয়া বসাইয়া রাস্তায় ছাড়িয়া দেও, দেখিবে সারি সারি উড়িয়া অক্ষর চলিয়া যাইতেছে। এ সম্বন্ধে একটী ঘটনা মনে পড়িতেছে:—আমি পরিদর্শন কার্য্যোপলক্ষে সম্বলপুরের কোন বিদ্যালয়ে গিয়া পরিদর্শন পুস্তকের এক স্থানে দেখিতে পাইলাম, পরিষ্কার বাঙ্গালা অক্ষরের উপর সারি সারি হাঁড়ি বসাইয়া মন্তব্য লেখা হইয়াছে। পাতা উল্টাইয়া দেখি বাবু চারুচন্দ্র ঘোষ সব-ইন্‌স্পেক্টরের মন্তব্য। বিদ্যালয়ের শিক্ষককে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি ঐ লেখা পড়িতে পারেন কিনা। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, সম্বলপুরে অনেক শিক্ষক বাঙ্গালা পড়িতে পারেন; কিন্তু আমি যে বিদ্যালয়ের কথা বলিতেছি, তথাকার শিক্ষক বাঙ্গালা জানিতেন না। তিনি উত্তর করিলেন যে অধিকাংশ অক্ষরই তাঁহার অপরিচিত। উড়িয়া অক্ষর কোন কোন স্থলে বাঙ্গালার অনুরূপ হইলেও সর্ব্বস্থলে নহে। কোথাও অক্ষর হিন্দীর অনুরূপ (অর্থাৎ হিন্দী অক্ষরের মাথায় হাঁড়ি চাপা), আবার অনেক স্থলে না হিন্দী না বাঙ্গালা কিম্ভূত কিমাকার। চারু বাবু প্রথম যখন সম্বলপুরে যান, তখন উড়িয়া জানিতেন না; অথচ মন্তব্য দেশীয় ভাষায় লিখিতে বাধ্য হওয়াতে ঐরূপ করিয়া লিখিয়াছিলেন। শিক্ষক মহাশয় বলিলেন চারু বাবু নিজেই তাহা পড়িয়া উড়িয়াতে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, নতুবা শিক্ষক মহাশয়ের তাহা পড়িবার সাধ্য ছিল না।

ভারতের অপরাপর স্থানের সহিত তুলনায় মধ্য প্রদেশ অশিক্ষিত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ছত্তিশ গড় তাহার ভিতরে আরও অশিক্ষিত। এইরূপ অশিক্ষার চরম পদবীতে অবস্থিত একটী বিভাগে স্ত্রীশিক্ষা কিরূপ বিস্তৃতিলাভ করিতেছে, তাহা আলোচনা করিবার জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

বর্ত্তমান বৎসরে ছত্তিশ গড়ের তিন জিলাতে মোট ২৮০০ বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে; তন্মধ্যে ১০০০ বালিকা-বিদ্যালয়ে ও অবশিষ্ট ১৮০০ বালিকা বালকদিগের বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়।

ভারতের রাজধানী সুসভ্য কলিকাতা নগরে যখন বালকদিগের বিদ্যালয়ে বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার অধিকার বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, তখন সভা সমাজে কত হুলস্থূল পড়িয়াছিল। যখন দুইটী বালিকা সাহসে ভর করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করিল, তখন

চারি দিকে কত আন্দোলন হইল, বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাসভায় পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কত প্রশ্ন উঠিল! আর এখানে অসভ্য ছত্তিশ গড়ে তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে গ্রাম্য কৃষক-বালা কৃষক বালকদিগের সহিত একত্রে এক বিদ্যালয়ে একাসনে বসিয়া অধ্যয়ন করিয়া আসিতেছে! এস্থলে ইহা বলা প্রয়োজন যে, বালক বালিকাদিগের একত্রে এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের গুণাগুণ আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এ প্রস্তাবের অবতারণা করিয়া ইহা দেখান আমার উদ্দেশ্য যে, যে কার্য্যের জন্য সুসভ্য কলিকাতায় সামাজিক আন্দোলন উপস্থিত হয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রার্থী তরলমতি যুবকদিগের রুচিবিকৃতির পরিচয় পাইয়া লজ্জাবোধ করিতে হয়, সেই কার্য্য অসভ্য ছত্তিশ গড়ের গ্রামে গ্রামে কৃষক বালক বালিকাগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বিরোধে, বিনা আন্দোলনে, সম্পন্ন হইতেছে। এস্থলে হয়ত কেহ বলিবেন, অল্পবয়স্কা বালিকাগণ হয়ত গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষা পায়। তাঁহাদের অবগতির জন্য ইহা বলা প্রয়োজন যে, আমি ঐ সকল বিদ্যালয়ে পঞ্চদশবর্ষীয়া বা ষোড়শী বালিকা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতে দেখিয়াছি।

বাঙ্গালা দেশে দেখা যায় যে, অষ্টম বর্ষেই হউক কিম্বা অষ্টবিংশতি বর্ষেই হউক, বিবাহ হইয়া গেলে বালিকার বিদ্যালয়ে যাওয়া ঘুচিয়া গেল। যাঁহারা ইহার ব্যতিক্রম জ্ঞাত নহেন, তাঁহারা হয়ত মনে করিবেন যে ছত্তিশগড়ে বুঝি কন্যাকে বয়ঃস্থা করিয়া বিবাহ দিবার রীতি আছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, এখানে বিবাহের পরেও অনেক বালিকা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে যায়। শ্বশুর বাড়ীতে থাকিয়া বধূকে রীতিমত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে যাইতে দেখিয়াছি। বধূগণ সাধারণতঃ বালকদিগের স্কুলে পড়িতে যায় না, বালিকা স্কুলেই পড়িতে যায়। তাহার কারণ এই যে, ঐরূপ স্থলে হয়ত স্বামী ও স্ত্রীকে একত্রে এক বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইতে হয়; ইহা অতীব লজ্জাজনক বলিয়া মনে করা হয়।

একদিন আমি সম্বলপুরে এক গ্রাম্য বালিকা-বিদ্যালয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করিতেছিলাম। মধ্যম শ্রেণীর একটী নবম বর্ষীয়া বালিকা তাহার পাঠ বলিতে হঠাৎ একটী শব্দের কাছে থামিয়া গেল। সেই শব্দটী "দীন।" বালিকা মুখ নত করিয়া চুপ করিয়া রহিল, তাহাকে আর কিছুতেই পড়ান গেল না। তাহার পাশের একটী সমবয়স্কা বালিকা তখন বলিয়া ফেলিল "বরকু নাম আছে"। তাইত, বরের নাম দীননাথ! নবমবর্ষীয়া গৌরী কি করিয়া বরের নাম মুখে আনিবে?

যেখানে বালিকা বিদ্যালয় নাই, সেখানে বিবাহান্তে বালিকাগণ স্কুল ছাড়িয়া যায়। তবে ইহাও দেখা যায় যে, স্বামী বিদ্যালয়ের সম্পর্কশূন্য হইলে, কোন কোন স্থলে বালিকাগণ বিবাহান্তেও ঐরূপ বালক বিদ্যালয়ে গমন করিয়া থাকে।

যাঁহারা মনে করেন যে, বিদ্যাশিক্ষা করিলে স্ত্রীজাতি গৃহকর্ম্মে মনোযোগী হয় না, তাঁহারা ইহারও প্রতিবাদ ছত্তিশগড়ে দেখিতে পাইবেন। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি কৃষক দুহিতৃগণ প্রাতে ১১টা পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া, তদ্দণ্ডে গৃহে গিয়া, কাপড় ছাড়িয়া, একখানি ছিন্ন মলিন কাপড় পরিয়া, চুবড়ী মাথায় করিয়া, মাঠে গোবর কুড়াইতে চলিয়া গেল। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ সহ্য করিয়াও গ্রাম্য কৃষকগণ আপন বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে বাধ্য হয়। ইহা মধ্য প্রদেশের একটী বিশেষত্ব যে, জর্ম্মেনির ন্যায়, এখানে শিক্ষা বিষয়ে কতকটা বাধ্য বাধকতা রহিয়াছে। যে গ্রামে বিদ্যালয় আছে, তথায় নির্দ্দিষ্টসংখ্যক বালক বিদ্যালয়ে না গেলে, ঐ গ্রামের জমীদারকে জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হয়। বালিকা সম্বন্ধে বাধ্য বাধকতা ঠিক না থাকিলেও প্রলোভন আছে। বালিকাগণ তিন বৎসর অধ্যয়ন করিয়া নিম্ন প্রাইমারি পাশ করিলেই বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া যে শিক্ষক যত বেশী বালিকা পাশ করাইতে পারে, তাহার বেতন সে অনুসারে বৃদ্ধি পায়। এই কারণে বালকদিগের স্কুলের শিক্ষকগণ অতি আগ্রহ পূর্ব্বক বালিকা গ্রহণ করিয়া থাকে।

বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের ভীষণ কবলে রায়পুর ও বিলাসপুর গ্রাসিত হইয়া রহিয়াছে। এই দুর্দ্দৈবের দিনে একদা কোন গ্রাম্য বালকবিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে গিয়া দেখিতে পাইলাম, এক শ্রেণীতে একটী মাত্র বালিকা উপস্থিত। তাহার দেহ এত কৃশ ও বদন এত মলিন যে, দেখিলে মনে হয় যেন কত দিন খাইতে পায় নাই। পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, সেই বালিকা তাহার শ্রেণীর সকল

বালক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তাহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলাম। পরে জানিতে পারিলাম, ঐ বালিকার এক মাত্র মাতা ভিন্ন আর কেহ নাই। তাহাদের একটী ধানক্ষেতই জীবনোপায়; এ বৎসর ফসল না হওয়াতে দুঃখিনী মাতা মজুরী করিয়া ঐ বালিকাকে বিদ্যালয়ে পড়াইতেছে। এখানে অবশ্য ইহা বলা প্রয়োজন যে, বিদ্যালয়ে বালিকাদিগকে বেতন দিতে হয় না, ও একান্ত দরিদ্র হইলে পুস্তক, শ্লেট ইত্যাদি সরঞ্জামও বিনা মূল্যে পাইয়া থাকে। কিন্তু তথাপি একটী মজুরের কন্যাকে এত আগ্রহ করিয়া বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া ভারতের অনেক সুসভ্য প্রদেশেও একটী দেখিবার জিনিষ বলিয়া গণ্য হইবে।

এদেশীয় বালিকাবিদ্যালয়ে ভাষা, গণিত ও ভূগোলের ন্যায় শিল্পকার্য্য (-যথা সূচীকর্ম্ম ও চিত্রবিদ্যা) একটী অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়। তদ্ভিন্ন গানের সহিত অভিনয় (action-songs) কিণ্ডারগার্টেণ প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এ দেশে ইংরাজিশিক্ষা কেবল দেশীয় খ্রীষ্টান সমাজেই দেখা যায়। তদ্ভিন্ন যে সকল বাঙ্গালী ও পার্সী প্রবাসী এ দেশে বাস করিতেছেন, তাঁহারা আপন আপন কন্যাদিগকে ইংরাজি শিক্ষা দিতে চাহিলে সাধারণতঃ ইয়ুরোপীয় বালিকা বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া থাকেন। দেশীয় খ্রীষ্টান ছাড়া ছত্তিশগড়ী কোন বালিকা এ যাবৎ ইংরাজি শিক্ষা পাইয়াছে, শুনা যায় নাই।

এ দেশে এক শ্রেণীর জমীদার আছেন তাঁহারা রাজোয়াড়ার ন্যায় স্ব স্ব অধিকারের শাসনভার প্রাপ্ত নহেন, অথচ বঙ্গদেশীয় জমীদারগণের ন্যায় কেবল মাত্র ভূম্যধিকারীও নহেন। তাঁহারা স্ব স্ব অধিকারে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, অনরারি মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য ও সাধারণ দেওয়ানী কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এইরূপ জমীদার ছত্তিশগড়ে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের জমিদারী ইংরাজের খাসমহল ভুক্ত হইলেও অনেক বিষয়ে তাহা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে। এইরূপ জমীদারদিগের অধিকার মধ্যে বহু স্থলে দেখিয়াছি, জমীদারগণ নিজ ব্যয়ে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া আপন প্রজাবর্গের কন্যাদিগের শিক্ষার সুবন্দবস্ত করিয়া দিয়াছেন। সম্বলপুরের একজন অতি ক্ষমতাশালী জমীদার, যাঁহার সহিত অনেক রাজারাজড়ার বৈবাহিক সম্বন্ধ আছে, তিনি আপন জমীদারীর সহরে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহাতে সামান্য লোকদিগের বালিকার সহিত নিজের কন্যাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, উচ্চ শ্রেণীর লোকগণ (নিজেরা উচ্চ শিক্ষিত না হইলেও) স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ উদারনীতি অবলম্বন করিয়া, স্ত্রীশিক্ষাকল্পে যথেষ্ট অর্থব্যয় ও চেষ্টা এবং যত্ন করিতেছেন।

এখনও এ প্রদেশে বালিকা শিক্ষার নৈতিক ফলালোচনার সময় হয় নাই। যাঁহারা শিক্ষা বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও আগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষাকে প্রলয়ঙ্করী অথবা সমাজের অনিষ্টকরী মনে করেন না। অসভ্য চত্তিশগড়ী স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে সু এবং কু উভয় বিধ সংস্কার-বর্জ্জিত; সুসভ্য সমাজের রুচিবিকৃতি ও অভদ্রোচিত ব্যবহারও তাহাদের মধ্যে স্থান পায় নাই। উচ্চ শ্রেণীর জমীদারবর্গের চেষ্টা এবং উৎসাহ যে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তৃতির সাহায্য করিতেছে, তাহা নিঃসন্দেহ।

এ প্রদেশের সকল বিদ্যালয়েই ব্যায়াম একটী অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়। গ্রাম্য পাঠশালায় কাওয়াত ও কসরত শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কোন কোন বিদ্যালয়ে সরকারী সাহায্য বিতরণের সময়ে কাওয়াত কসরতেরও পরীক্ষা গ্রহণ করা হইয়া থাকে। ব্যায়ামের পরীক্ষা পাশ করিতে না পারিলে কেহ সরকারী বৃত্তি পাইতে পারে না। এই নিয়ম গ্রাম্য পাঠশালা হইতে উচ্চ শ্রেণীর কলেজ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র প্রচলিত। বালিকা বিদ্যালয়ে কাওয়াত কসরতের পরিবর্ত্তে অন্য প্রকার শারীরিক ক্রীড়ার ব্যবস্থা আছে। যে স্কুলে বালিকা অধ্যয়ন করে, সেখানে তাহাদের জন্য একটী দোলা টানান হয়, বালিকাগণ তাহাতে চড়িয়া গান করে ও গানের তালে তালে দুলিতে থাকে। এ দেশীয় শিক্ষা বিভাগের নিয়মানুসারে প্রত্যেক স্কুলপ্রাঙ্গণে বাগান করা সম্বন্ধে বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে। স্কুল প্রাঙ্গণে বাগান না থাকিলে শিক্ষকগণকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণই ঐ বাগানের পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে। সম্বলপুরের উড়িয়া জাতি স্বভাবতঃই সৌন্দর্য্যপ্রিয়, একারণ সম্বলপুরে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফুল ও শাকসবজির বাগান দেখা যায়। উড়িয়া রমণীগণ এত অধিক সৌন্দর্যপ্রিয়া যে, তাহাদের দেহের লাবণ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য তাহারা হরিদ্রা মাখিয়া থাকে। সম্বলপুরে এমন বালিকা-বিদ্যালয় দেখি

নাই, যাহাতে প্রবেশ করিলে হরিদ্রাময়ী বালিকাদিগের দেহের সৌরভ নাসিকাকে অভিনন্দিত না করে। কিন্তু পুষ্পপ্রিয়তা হরিদ্রাপ্রিয়তা হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে। বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে গিয়া স্কুল গৃহে প্রবেশ করিলেই সর্ব্বপ্রধানা বালিকা পুষ্পমালা দ্বারা পরিদর্শককে বরণ করিবে ও কোন কোন সুললিত গানে তাঁহার অভিনন্দন করিবে। ঐ সকল গান সাধারণতঃ পরিদর্শকের আগমন উপলক্ষে শিক্ষক কর্ত্তৃক রচিত হইয়া থাকে। তাহাতে পরিদর্শকের নানা সদ্‌গুণের বর্ণনা ও তাঁহার উন্নতিকল্পে উড়িয়া জাতির উপাস্য দেবতা "প্রভুজীর" নিকট বন্দনা করা হইয়া থাকে। আমার মত পরিদর্শকেরও "আর্যবংশাবতংস," "ভুবনবিজয়ী" ও "বঙ্গকুলধুরন্ধর" হওয়া অতি সহজ হয়।

একটী কথা না বলিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তৃতি বিষয়ে খৃষ্টান মিশনারিদিগের যত্ন অতিশয় প্রশংসার্হ। ছত্তিশগড়ে যতগুলি বালিকা বিদ্যালয় আছে, তন্মধ্যে বিলাসপুরের মিশন পাঠশালা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই বিদ্যালয়ে যতগুলি বালিকা অধ্যয়ন করিতেছে, তাহার মধ্যে অর্দ্ধেকের বেশী হিন্দু ও মুসলমান বালিকা। শিক্ষার প্রতি আগ্রহ না জন্মাইলে এতগুলি অখৃষ্টান বালিকা খৃষ্টান বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিতে যাইত না।

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

গাজিপুরে সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবসায়।

অন্যত্র গ্রাম বা নগরের বাহিরে যেমন শস্যক্ষেত্র থাকে, গাজিপুরের বাহিরে তেমনই পুষ্পক্ষেত্র আছে। গোলাপই বেশী,—বেলা, চামেলি, যুঁই প্রভৃতি অন্য আরও অনেক ফুলের চাষও আছে।

এই ফুলের চাষ কোনও জাতি বিশেষে আবদ্ধ নয়, সকল জাতিই করিয়া থাকে। গোলাপের চাষ অতিশয় লাভজনক বোধ হয়। কিঞ্চিদধিক এক মাস কাল মাত্র ফুল ফুটে,—এক বিঘায় অনুমান লক্ষ ফুল উৎপন্ন হয়। এই লক্ষ গোলাপের মূল্য সাধারণতঃ ৮০৲ টাকা হইতে ১২০৲ অবধি। এক বিঘার বাৎসরিক খাজানা ৩৲ হইতে ৫৲ মাত্র, অন্যান্য ব্যয়ও নিতান্ত বেশী নহে।

ক্ষেত্রে প্রথম পুষ্পোদ্গম সম্বন্ধে গাজিপুরে একটা অদ্ভুত রকমের বিশ্বাস প্রচলিত আছে। শিবরাত্রি ব্রতের পূর্ব্ব রাত্রে সকলের ক্ষেতেই ফুল ফুটিবে। তাহার পূর্ব্বেও ফুটিবে না, পরেও নহে। কাহারও ক্ষেতে ২৫, কাহারও ক্ষেতে ৫০,—কিছু কিছু ফুটিবেই ফুটিবে। সে ফুল শিব পূজার জন্য। তাহার পর হইতে ক্রমেই বেশী ফুটিতে থাকে।

এক মাস দেড় মাস কাল গোলাপ ফুটিবার মৌসিম বা ঋতু। ক্ষেত্রগুলি বাগানের মত ঘেরা। একটু বেলা হইলে, গায়ের শিশির শুকাইলে, ফুল তোলা হয়। তাহার পর বস্ত্রের বড় বড় বস্তায় সে গুলিকে বাঁধিয়া আবার গোলাপের অসংখ্য কারখানায় বিক্রয়ার্থ পাঠান হয়। গণনার হিসাবে মূল্য ধরিবার রীতি; যে এক লক্ষ ফুল লইবে, তাহার গণনা কতকালে শেষ হইবে জানিবার জন্য আমি কুতূহলী হইয়াছিলাম; শুনিলাম প্রথমে শ-পাঁচেক ফুল গণনা করা হয়, তাহার পর ওজন,—অর্থাৎ সেই পাঁচ শতের সমভার ফুলও পাঁচ শত হইবে এইটা ধরিয়া লওয়া হয়।

গোলাপ হইতে জল, আতর এবং তৈল, এই তিন প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। জল এক বোতলের মূল্য ৷৷০ হইতে ৪৲। একটী বোতলে যতগুলি ফুলের সার আছে, সেই হিসাবে মূল্যের তারতম্য। নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল।

বোতলে	১০০	ফুলের	সার	থাকিলে,	মূল্য	৷৷০
„	২৫০	„	„	„	„	১৲
„	৫০০	„	„	„	„	২৲
„	১০০০	„	„	„	„	৪৲

আমার ধারণা ছিল, জল ফুলসংযোগে যত অধিকবার চুয়ান হইবে, মূল্য তত বেশী হইবে। শুনিলাম তাহা ঠিক নহে। তবে দুইবার চুয়ান প্রয়োজন বটে। যথেষ্ট ফুল না মিলিলে কাজেই বেশী বার চুয়াইতে হয়। যেমন ধরুন, আমি ২৲ মূল্যের ২০ বোতল গোলাপ জল চুয়াইব। তাহা হইলে আমার ২০ × ৫০০ = ১০,০০০ দশ হাজার গোলাপ চাই। প্রথম দিন ৫,০০০, দ্বিতীয় দিন বাকী ৫,০০০ চুয়াইলেই

চলে। কিন্তু প্রথম দিন হয়ত ৫,০০০ ফুল আমি সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। কাজেই দুই বারের স্থানে তিনবার বা চারিবার চুয়াইতে হইল।

চুয়াইবার যন্ত্রাদি অতি সামান্য। কলাই করা একটি বৃহৎ তাম্রস্থালীতে ফুল ও জল দিয়া সিদ্ধ করা হয়। সেই স্থালীর নাম ডেক। তাহার মুখে একটা সরার মত আছে, তাহার নাম "সরপোষ।" ডেকে ফুল ও জল ভরিয়া, ময়দা দিয়া সরপোষকে বায়ু প্রবেশ না করে এমন করিয়া

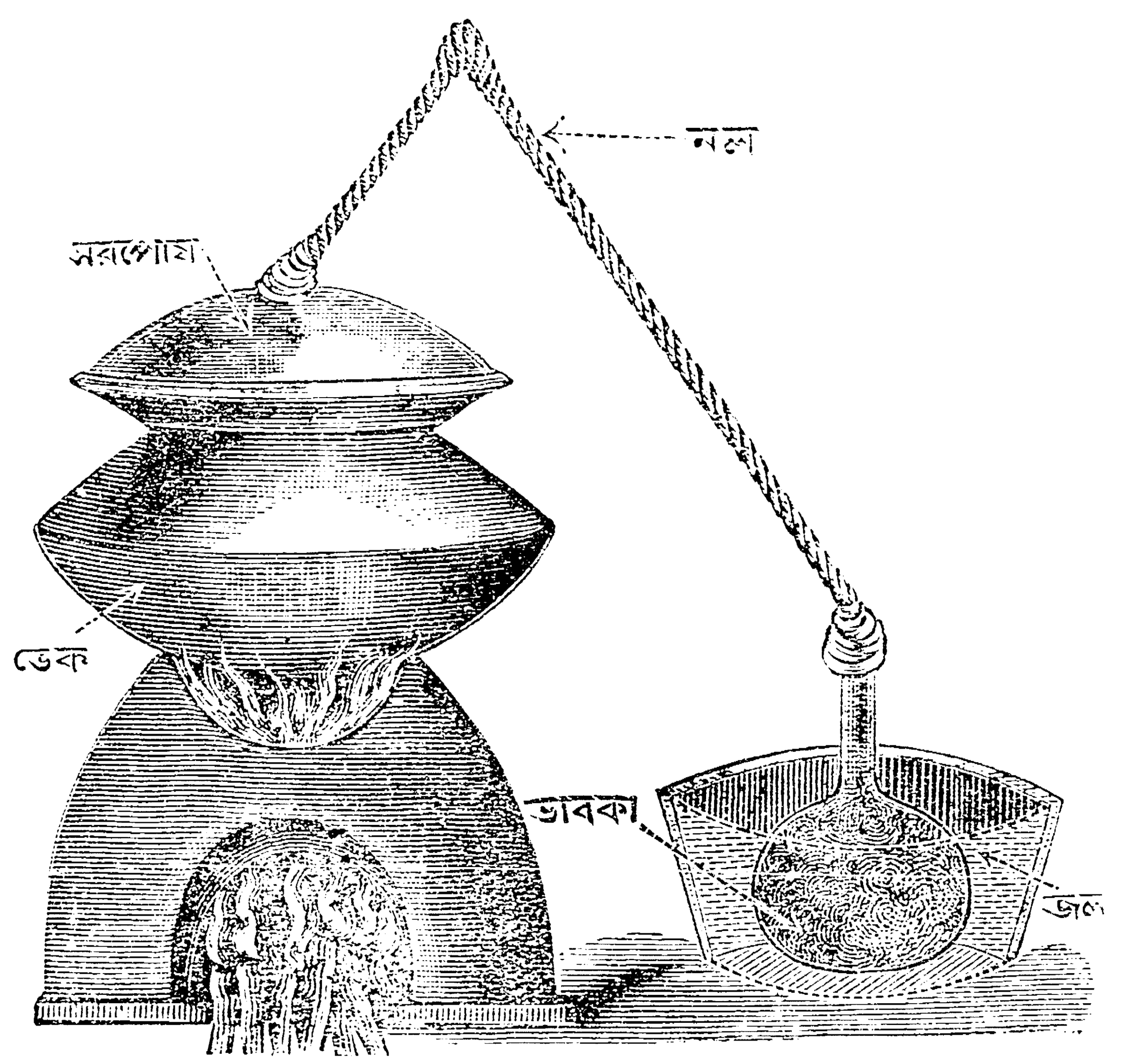

আঁটিয়া দেওয়া হয়। সরপোষের মধ্যস্থলে ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্রপথে একটা বাঁশের নলের প্রান্ত প্রবিষ্ট করা হয়। সেই নলের অপর প্রান্ত "ভাবকার" মধ্যে প্রবেশ করে। ভবকাগুলিতে অল্পাধিক ২০ বোতল জল ধরে। ভাবকা একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ শীতল জলের টবে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকে। ডেকে ফুল ও জল সিদ্ধ হইতে থাকে, আর নল দিয়া বাষ্প বহিয়া ভাবকায় প্রবেশ করে। উহা বেশী ক্ষণ বাষ্পাবস্থায় থাকিতে পারেনা, পাত্রের চতুর্দ্দিকে শীতল জল থাকায়, বাষ্পটা জমিয়া জল হইয়া যায়। এইরূপ প্রক্রিয়া কয়েক ঘণ্টা চলিলে, টবের পাত্রের যে শীতল জলটা ভাবকাকে বেষ্টন করিয়াছিল, তাহা গরম হইয়া ক্রমে ফুটিতে আরম্ভ করে*। তখন জানা যায় যে এবার হইয়াছে। নল খুলিয়া ফেলা হয়। পর দিন ভাবকার মধ্যস্থ এই চুয়ান জলটাকে আবার ডেকে ঢালিয়া নূতন ফু[illegible] দিয়া চুয়ান হইয়া থাকে।

আতর প্রস্তুত প্রণালী ইহা অপেক্ষা কিছু জটি[illegible] সকল সুগন্ধি ফুল, খস্‌খস্‌, পান, এমন কি মৃত্তিকা[illegible] পর্য্যন্ত আতর গাজিপুরে প্রস্তুত হইয়া থাকে। নিম্নে কতক গুলি আতরের মূল্য দেওয়া গেল।

কিসের আতর	মূল্য প্রতি ভরি
গোলাপ	১৲ হইতে ১০০৲
বেলা (ইহাকে মতিয়াও বলে)	১৲ .. [illegible]
চামেলি	১৲ .. [illegible]
কেওড়া (কেতকী)	১৲ .. [illegible]
খস্‌খস্‌	১৲ .. [illegible]
জুঁই	১৲ .. [illegible]
হেনা (অথবা মেদির পাতা যাহার বেড়া হয়)	১৲ .. [illegible]
মৃত্তিকা†	১৲ .. [illegible]
মুলসরি (বকুল)	২৲ .. —
পাণ	১৲ .. —

ইত্যাদি।

আতর প্রস্তুতের যন্ত্রাদি বিভিন্ন নয়; সেই ডেক, ন[illegible] ও ভাবকা। বিলাতী এসেন্সগুলির জমি (Vehicle) সুরা[illegible] সার (Spirit), দেশী আতরের জমি সেইরূপ চন্দনের তৈ[illegible] উৎকৃষ্ট চন্দন তৈল ভাবকায় ঢালিয়া, ডেক হইতে ফু[illegible] সংযুক্ত জলের বাষ্প আনিয়া ফেলা হয়। গোলাপ জ[illegible] প্রস্তুত করিবার প্রণালী হইতে বিভিন্নতা এই যে, জ[illegible] বেলায় শুষ্ক ভাবকায় বাষ্প আসিয়া জমা হয়, আতর করি[illegible] হইলে সেই বাষ্প চন্দন তৈলে আসিয়া প্রবেশ করে। ভাব[illegible] কার চতুর্দ্দিকে টবে ভরিয়া নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ শীতল জ[illegible] রাখা হয়। সেই জল গরম হইয়া ফুটিলে তাহা ফেলি[illegible] আবার শীতল জল ঢালা হয়। দ্বিতীয়বার ফুটিয়া গেলে[illegible] জানা যায় যে চুয়ান শেষ হইয়াছে। তখন নল খুলিয়া ফেলিয়া ভাবকা সারারাত্রি শীতল স্থানে রাখিয়া দেওয়া হয়। প্রভাতে সমস্তটা একটা পাত্রে ঢালিয়া ফেলা হয়। অল্পক্ষণে তৈলাংশ উপরে ভাসিয়া উঠে। সেই অংশটা পৃথক করিয়া লইয়া, আবার ভাবকায় ভরিয়া দ্বিতীয়বার চুয়ান হয়। এইরূপ তিন চারিবার হইলেই আতর প্রস্তুত হইল।

* সেই জলের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট; ফুটিতে আরম্ভ করিলেই জানা গেল যে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ উত্তাপ তাহাতে সংক্রামিত হইয়াছে। তা[illegible] হইতে এই বুঝায় যে, একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ চুয়ান জল ভাবকার ভিতরে আসিয়া জমিয়াছে।

† এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা আছে। গঙ্গার তীরভূমিতে এব[illegible] অন্যত্রও তাহা দৃষ্ট হয়। তাহার বেশ একটা সুগন্ধ আছে। এই মৃত্তিক[illegible] হইতে আতর বাহির করা হয়।

প্রতি ভরি আতরে যতগুলি ফুলের সার আছে, তাহা লইয়াই মূল্যের তারতম্য। নিম্নলিখিত মূল্যাবলীর এক তোলা গোলাপের আতরে কতগুলি করিয়া ফুলসার থাকে দেখান গেল:—

২৫০	ফুল	১৲	তোলা।
৫০০	"	২৲	"
১,০০০	"	৪৲	"
৪,০০০	"	৮৲	"
২৫,০০০	"	৪০৲	"
১,০০,০০০	"	১০০৲	"

শেষ তিন শ্রেণীর গোলাপী আতরের জমি চন্দনের তৈল নহে, কাহি নামক একটা সুগন্ধি তরল পদার্থ। কাহি জিনিষটা বিলাতী;—তীব্র সুগন্ধযুক্ত, চন্দন তৈল অপেক্ষাও সুলভ, কিন্তু অল্প মূল্যের আতরে উহা ব্যবহৃত হয় না। কারণ তাহা হইলে ফুলের আতর অপেক্ষা কাহির গন্ধই স্পষ্টতর হইবে। হাকিমজী—যিনি এই প্রবন্ধের উপকরণ আমাকে দিয়াছেন,—বলিলেন, উচ্চ মূল্যের গোলাপের আতরে কাহি ব্যবহার করার উদ্দেশ্যই এই যে, গোলাপের গন্ধ কাহির গন্ধকে দমন করিয়া আরও অধিক "খুসবুদার" বা অধিক হয়। স্বীকার করা ভাল, একটা গন্ধ আর একটা গন্ধকে কিরূপে "দমন" করিয়া নিজের গন্ধ বাড়াইতে পারে, তাহা আমি ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

উপরের তালিকায় পাঠক দেখিতেছেন, এক লক্ষ ফুল হইতে এক তোলা গোলাপের আতর বাহির করা হয়। তাহার এক তোলার মূল্য ১০০৲ এই দ্রব্যটার সম্বন্ধে কিছু শুনিতে সকলের কৌতূহল হইতে পারে। ইহার প্রস্তুত প্রণালী বিভিন্ন, ইহাকে খর্‌রা আতর কহে। গোলাপের ভিতর আতর খর্‌রার আকারেই থাকে; নিম্ন মূল্যের আতরে দুই চারি বিন্দু খর্‌রা আতর অনেকটা কাহি বা চন্দনের তৈলের জমিতে নিজেকে ব্যাপ্ত করিয়া দেয় মাত্র। খর্‌রা আতর কোনও জমির উপর থাকে না। ইহাই আতরের সারতম অবিমিশ্র পদার্থ।

প্রথম দিন বিশ হাজার উৎকৃষ্ট গোলাপ ফুল, গোলাপ-জল প্রস্তুত করিবার প্রণালী অনুসারে, চুয়াইয়া লওয়া হয়। চুয়ান জলটা ভাবকা হইতে একটা বিস্তৃতমুখ ধাতুপাত্রে ঢালিয়া, জলে মিশ্রিত বালুকা এবং সোরার মধ্যে সারারাত্রি ডুবাইয়া রাখা হয়। ইহাতে জলটা অত্যন্ত শীতল হইয়া পড়ে। প্রভাতে দেখা যায় একটা বিভিন্ন বর্ণ তৈলবৎ তরল পদার্থ সেই জলের উপরিভাগে ইতস্ততঃ বিন্দু বিন্দু ভাসিতেছে। অতি যত্নে পাখীর পালকের অগ্রভাগ দিয়া সেই বিন্দুগুতি তুলিয়া পাত্রে সঞ্চয় করা হয়। ইহাই হইল খর্‌রা আতর।

সেই দিন এই জল আবার ডেকে ঢালিয়া, বিশ হাজার নূতন ফুলসহ আবার চুয়ান হয়। পূর্ব্বদিনের মত এই দ্বিতীয় বার চুয়ান জল আবার বিস্তৃতমুখ ধাতু পাত্রে ঢালিয়া সমস্ত রাত্রি জলসিক্ত সোরা ও বালুকার মধ্যে শীতল করা হয়। প্রভাতে আবার কিয়দংশ আতর পাওয়া যায়। তখন সেই জলকে নূতন ফুল দিয়া আবার চুয়ান হয়।

যখন এইরূপ বারম্বার চুয়াইতে চুয়াইতে লক্ষ ফুল শেষ হইয়া যায়, তখন সঞ্চিত আতর এক তোলা পরিমাণ হইয়া উঠে। কোন কোন ঋতুতে ফুল অত্যন্ত ভাল হয়, লক্ষ ফুল হইতে দেড় তোলা পর্য্যন্ত আতর বাহির হইতে শুনা গিয়াছে।

লক্ষ ফুল চুয়ান শেষ হইলে, যে জলটা থাকিয়া যায়, তাহা আট টাকা মূল্যে গোলাপ জল বলিয়া বিক্রীত হয়। এই কয় বোতল (১৫ হইতে ২০ বোতল) জলই প্রস্তুত-কারকের প্রধান লাভ, কারণ লক্ষ গোলাপের মূল্যই ত প্রায় ১০০৲ টাকা।

এই আতরের ক্রেতা ভারতবর্ষে কয় জন? অনেক রাজা মহারাজা ইহার নিয়মিত খরিদ্দার। একবারে বাঁধা বরাদ্দ আছে। নেপালের মহারাজা নাকি একজন বড় খরিদ্দার—প্রতি বৎসর অনেক ভরি এই আতর লইয়া থাকেন।

হাকিমজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই আতরের বিশেষত্ব কি? তিনি বলিলেন, কিছুই নহে, কেবল ইহাতে কাঁচা

গোলাপের গন্ধ পাওয়া যায়। অল্প মূল্যের গোলাপের আতরে "গোলাপের আতরের" গন্ধই থাকে, "গোলাপের" গন্ধ থাকে না। খর্‌বার সদ্‌গন্ধ অতি দীর্ঘকাল স্থায়ী। এটা বলাই বাহুল্য, চারি টাকা বোতল মূল্যের গোলাপ জলে কখন কখন দুই এক ফোঁটা খর্‌বা ভাসিতেছে দেখা যায়।

কোন্ আতর খর্‌বা কিম্বা মিশাল, তাহা পরীক্ষা করিবার উপায় আছে। এক শিশি খর্‌বা আতর বরফ জলে ডুবাইলে জমিয়া যাইবে, অন্য আতর জমিবে না।

গোলাপ ছাড়া অন্য কোনও ফুলের খর্‌বা আতর বাহির হয় না। কেন হয় না তাহা বলিতে পারি না। আর কেবল এক মাত্র খস্‌খস্ হইতে খর্‌বা আতর বাহির করা হয়। ইহার একতোলার মূল্য ৪৲, দেখিতে সবুজবর্ণ।

সাধারণ আতর উচ্চ মূল্যের কিম্বা নিম্ন মূল্যের, তাহা পরীক্ষা করিবার আর কোনও বিশিষ্ট উপায় নাই, একমাত্র উপায় সুগন্ধ। তাহা ব্যবসায়ী ভিন্ন অপরে বড় একটা ধরিতে পারে না তাহার উপর বিক্রেতাগণ ধূর্ত্ততা করিয়া ক্রেতাকে প্রথমেই শ্রেষ্ঠ আতরের নমুনা দিয়া থাকে। তাহার আঘ্রাণে মস্তিষ্ক ভরিয়া যায়; পরবর্ত্তী নিকৃষ্ট আতরও সেইরূপ মনে হয়। তবে আজকাল একটা জুয়াচুরি চলিয়াছে, তাহা ধরিবার উপায় আছে বটে। চন্দন তৈলের পরিবর্ত্তে "ভেল্‌" নামক একটা নিকৃষ্ট সুলভ তরল পদার্থে আতর প্রস্তুত হয়। পরিষ্কার শাদা কাগজে এক ফোঁটা চন্দন তৈলের আতর ফেলিয়া, আগুণের উত্তাপে ধরিলে সবটা উড়িয়া যায়, কাগজে দাগ থাকে না, ভেলুর আতর হইলে কাগজে দাগ থাকিয়া যায়।

ভারতবর্ষে গাজিপুর ছাড়া কনৌজ এবং বরুণায় আতর গোলাপের কারখানা আছে, কিন্তু তত প্রসিদ্ধ নয়। এই দুই স্থানের গোলাপ তত ভাল এবং গন্ধযুক্ত নহে; মূল্যও সুলভ; এক তোলা খর্‌বা আতরের মূল্য ৩০৲।৪০৲ মাত্র।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

সদর ও অন্দর।

বিপিনকিশোর ধনিগৃহে জন্মিয়াছিলেন, সেই জন্য ধন যে পরিমাণে ব্যয় করিতে জানিতেন, তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণেও উপার্জ্জন করিতে শেখেন নাই। সুতরাং যে গৃহে জন্ম সে গৃহে দীর্ঘকাল বাস করা ঘটিল না।

সুন্দর সুকুমার মূর্ত্তি তরুণ যুবক, গান বাজনায় সিদ্ধহস্ত, কাজকর্ম্মে নিরতিশয় অপটু; সংসারের পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক; জীবনযাত্রার পক্ষে জগন্নাথদেবের রথের মত অচল; যেরূপ বিপুল আয়োজনে চলিতে পারেন, সেরূপ আয়োজন সম্প্রতি বিপিনকিশোরের আয়ত্তাতীত।

সৌভাগ্যক্রমে রাজা চিত্তরঞ্জন, ষ্টেট্ অফ্ ওয়ার্ড্‌স্ হইতে বিষয় প্রাপ্ত হইয়া, সখের থিয়েটার ফাঁদিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং বিপিনকিশোরের সুন্দর চেহারা ও গান গাহিবার ও গান তৈরি করিবার ক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে সাদরে নিজের অনুচরশ্রেণীতে ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন।

রাজা বি. এ. পাস। তাঁহার কোন প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল না। বড়মানুষের ছেলে হইয়াও নিয়মিত সময়ে, এমন কি নির্দ্দিষ্ট স্থানেই শয়ন ভোজন করিতেন। বিপিনকিশোরকে হঠাৎ তাঁহার নেশার মতন লাগিয়া গেল। তাঁহার গান শুনিতে ও তাঁহার রচিত গীতিনাট্য আলোচনা করিতে করিতে ভাত ঠাণ্ডা হইতে থাকে, রাত বাড়িয়া যায়। দেওয়ানজি বলিতে লাগিলেন, তাঁহার সংযতস্বভাব মনিবের চরিত্রদোষের মধ্যে কেবল ঐ বিপিনকিশোরের প্রতি অতিশয় আসক্তি।

রাণী বসন্তকুমারী স্বামীকে ভর্জ্জন করিয়া বলিলেন, কোথাকার এক লক্ষ্মীছাড়া বানর আনিয়া শরীর মাটি করিবার উপক্রম করিয়াছ, ওটাকে দূর করিতে পারিলেই আমার হাড়ে বাতাস লাগে।

রাজা যুবতী স্ত্রীর ঈর্ষায় মনে মনে একটু খুসী হইতেন—হাসিতেন, ভাবিতেন, মেয়েরা যাহাকে ভালবাসে, কেবল তাহাকেই জানে। জগতে যে আদরের পাত্র অনেক গুণী আছে, স্ত্রীলোকের শাস্ত্রে সে কথা লেখেনা। যে লোক তাহার কানে বিবাহের মন্ত্র পড়িয়াছে, সকল গুণ তাহার এবং সকল আদর তাহারই জন্য! স্বামীর আধঘণ্টা খাবার সময় অতীত হইয়া গেলে অসহ্য হয়, আর, স্বামীর আশ্রিতকে দূর করিয়া দিলে তাহার এক মুষ্টি অন্ন জুটিবে না—এ সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। স্ত্রীলোকের এই বিবেচনাহীন পক্ষপাত দূষণীয় হইতে পারে, কিন্তু চিত্তরঞ্জনের নিকট তাহা নিতান্ত অপ্রীতিকর বোধ হইল না। এই জন্য তিনি যখন তখন বেশি মাত্রায় বিপিনের গুণগান করিয়া স্ত্রীকে ক্ষ্যাপাইতেন ও বিশেষ আমোদ বোধ করিতেন।

এই রাজকীয় খেলা বেচারা বিপিনের পক্ষে সুবিধাজনক

হয় নাই। অন্তঃপুরের বিমুখতায় তাঁহার আহারাদির ব্যবস্থায় পদে পদে কণ্টক পড়িতে লাগিল। ধনীগৃহের ভৃত্য আশ্রিত ভদ্রলোকের প্রতি স্বভাবতই প্রতিকূল—তাহারা রাণীর আক্রোশে সাহস পাইয়া ভিতরে ভিতরে বিপিনকে অনেক প্রকার উপেক্ষা দেখাইত।

রাণী একদিন পুঁটেকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, তোকে যে কোন কাজেই পাওয়া যায় না, সমস্ত দিন করিস কি?

সে কহিল রাজার আদেশে বিপিন বাবুর সেবাতেই তাহার দিন কাটিয়া যায়!

রাণী কহিলেন, ইস্ বিপিন বাবু যে ভারি নবাব দেখিতেছি!

পর দিন হইতে পুঁটে বিপিনের উচ্ছিষ্ট ফেলিয়া রাখিত, অনেক সময় তাঁহার অন্ন ঢাকিয়া রাখিত না। অনভ্যস্ত হস্তে বিপিন নিজের অন্নের থালি নিজে মাজিতে লাগিল এবং মাঝে মাঝে উপবাস দিল; কিন্তু ইহা লইয়া রাজার নিকট নালিশ ফরিয়াদ করা তাহার স্বভাববিরুদ্ধ। কোন চাকরের সহিত কলহ করিয়া সে আত্মাবমাননা করে নাই। এইরূপে বিপিনের ভাগ্যে সদর হইতে আদর বাড়িতে লাগিল, অন্দর হইতে অবজ্ঞার সীমা রহিল না।

এদিকে সুভদ্রাহরণ গীতিনাট্য রিহার্শালশেষে প্রস্তুত। রাজবাটির অঙ্গনে তাহার অভিনয় হইল। রাজা স্বয়ং সাজিলেন কৃষ্ণ, বিপিন সাজিলেন অর্জ্জুন। আহা, অর্জ্জুনের যেমন কণ্ঠ, তেমনি রূপ! দর্শকগণ ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

রাত্রে রাজা আসিয়া বসন্তকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন অভিনয় দেখিলে?

রাণী কহিলেন, বিপিন ত বেশ অর্জ্জুন সাজিয়াছিল! বড় ঘরের ছেলের মত তাহার চেহারা বটে, এবং গলার স্বরটিও ত দিব্য!

রাজা বলিলেন, আর আমার চেহারা বুঝি কিছুই নয়—গলাটাও বুঝি মন্দ!

রাণী বলিলেন, তোমার কথা আলাদা! বলিয়া পুনরায় বিপিনের অভিনয়ের কথা পাড়িলেন।

রাজা ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্ছ্বসিত ভাষায় রাণীর নিকট বিপিনের গুণগান করিয়াছেন—কিন্তু অদ্য রাণীর মুখের এই টুকু মাত্র প্রশংসা শুনিয়া তাঁহার মনে হইল বিপিনটার ক্ষমতা যে পরিমাণে, অবিবেচক লোকে তদপেক্ষা তাহাকে ঢের বেশি বাড়াইয়া থাকে! উহার চেহারাই বা কি, আর গলাই বা কি এমন! কিয়ৎকাল পূর্ব্বে তিনিও এই অবিবেচক-শ্রেণীর মধ্যে ছিলেন, হঠাৎ কি কারণে তাঁহার বিবেচনা শক্তি বাড়িয়া উঠিল!

পরদিন হইতে বিপিনের আহারাদির সুব্যবস্থা হইল। বসন্তকুমারী রাজাকে কহিলেন, বিপিনকে কাছারি ঘরে আমলাদের সহিত বাসা দেওয়া অন্যায় হইয়াছে, হাজার হৌক, এক সময়ে উহার অবস্থা ভাল ছিল।

রাজা কেবল সংক্ষেপে উড়াইয়া দিয়া কহিলেন—হাঁঃ!

রাণী অনুরোধ করিলেন, খোকার অন্নপ্রাশন উপলক্ষে আর একদিন থিয়েটার দেওয়া হউক। রাজা কথাটা কানেই তুলিলেন না।

একদিন ভাল কাপড় কোঁচান হয় নাই বলিয়া রাজা পুঁটে চাকরকে ভর্ৎসনা করাতে সে কহিল, কি করিব, রাণীমার আদেশে বিপিন বাবুর বাসন মাজিতে ও সেবা করিতেই সময় কাটিয়া যায়।

রাজা রাগিয়া উঠিয়া কহিলেন, ইস্! বিপিন বাবুত ভারি নবাব হইয়াছেন, নিজের বাসন বুঝি নিজে মাজিতে পারেন না!

বিপিন পুনর্মূষিক হইয়া পড়িল।

রাণী রাজাকে ধরিয়া পড়িলেন, সন্ধ্যাবেলায় তাঁহাদের সঙ্গীতালোচনার সময় পাশের ঘরে থাকিয়া পর্দ্দার আড়ালে তিনি গান শুনিবেন, বিপিনের গান তাঁহার ভাল লাগে। রাজা অনতিকাল পরেই পূর্ব্ববৎ অত্যন্ত নিয়মিত সময়ে শয়ন ভোজন আরম্ভ করিলেন। গান বাজনা আর চলে না।

রাজা মধ্যাহ্নে জমিদারী কাজ দেখিতেন। একদিন সকাল সকাল অন্তঃপুরে গিয়া দেখিলেন রাণী কি একটা পড়িতেছেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, ও কি পড়িতেছ?

রাণী প্রথমটা একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন—বিপিন বাবুর একটা গানের খাতা আনাইয়া দুটো একটা গানের কথা মুখস্থ করিয়া লইতেছি; হঠাৎ তোমার সখ মিটিয়া গিয়া আর ত গান শুনিবার যো নাই! সখটাকে সমূলে বিনাশ করিবার জন্য রাণী যে বহুবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন সে কথা কেহ তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিল না!

পরদিন বিপিনকে রাজা বিদায় করিয়া দিলেন—কালি

হইতে কি করিয়া কোথায় তাঁহার অন্নমুষ্টি জুটিবে সে সম্বন্ধে কোন বিবেচনা করিলেন না।

দুঃখ কেবল তাহাই নহে, ইতিমধ্যে বিপিন রাজার সহিত অকৃত্রিম অনুরাগে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন; বেতনের চেয়ে রাজার প্রণয়টা তাঁহার কাছে অনেক বেশি দামী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কি অপরাধে সে হঠাৎ রাজার হৃদয়টা হারাইলেন, অনেক ভাবিয়াও বিপিন তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না এবং দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তাঁহার পুরাতন তম্বুরাটিতে গেলাপ পরাইয়া বন্ধুহীন বৃহৎ সংসারে বাহির হইয়া পড়িলেন—যাইবার সময় রাজভৃত্য পুঁটেকে তাঁহার শেষ সম্বল দুইটি টাকা পুরস্কার দিয়া গেলেন।

রস্কিন

ললিতকলা এবং রচনা-শিল্প।

(২)

রস্কিন্ যে ললিত কলার বিজ্ঞান অবধারণ করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। প্রত্যুত, বিজ্ঞান নিরূপণের পক্ষে যে মানস-শক্তি ও মনোধর্ম্মের প্রয়োজন, তাহা বোধ হয় তাঁহার যথেষ্ট পরিমাণে ছিল না। অনেকের মতে তাঁহার প্রভূত বিশ্লেষণ-শক্তি ছিল। অপর কেহ নয়, স্বয়ং ম্যাটসিনি (Mazzini) বলিয়াছেন যে, সমসাময়িক সমগ্র ইয়ুরোপে বিশ্লেষণে রস্কিন্ অদ্বিতীয়। কিন্তু, উপরোক্ত মত অভ্রান্ত বলিয়া ধরিয়া লইলেও, বিজ্ঞান-গঠনে যে সংযম, সমস্ত-দৃষ্টি, ও পূর্ব্ব-সংস্কার-বিবর্জ্জিত মুক্ত হৃদয়ের আবশ্যক, কেবল যে সে সকলের অভাব তাঁহাতে পরিলক্ষিত হয় তাহা নয়, বরং ইহাদের বিপরীত-ধর্ম্মী গুণ ও মনোবৃত্তি প্রকৃতি তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে দিয়াছিলেন। কিন্তু কোন বিষয়ে বিজ্ঞান নিরূপণ করা এক কথা, এবং সে বিষয় উপভোগ বা তাহাতে পারদর্শিতা লাভ করা আর এক কথা। তুমি উত্তম বৈয়াকরণ বা ভাষা-বিজ্ঞানবিৎ হইতে পার—কিন্তু সাহিত্যে, রচনাশিল্পে তোমার কোনরূপ প্রতিষ্ঠা না থাকিতে পারে। কেহ কবিতার সুন্দর সমজ্দার—কিন্তু নগণ্য কবি। রস্কিনের কলা-বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ বা ভ্রান্তিসঙ্কুল হইতে পারে—কিন্তু সৌন্দর্য্যের সন্ধান, সম্ভোগ, ও সমালোচনায়, এবং ক্ষেত্রবিশেষে তদ্‌বিষয়ে পারদর্শিতায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা—প্রতিভা ছিল। তাঁহার রচিত অসংখ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে কলা সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা বলিয়াছেন। কোন কোন স্থলে তাঁহার বিভিন্ন উক্তি সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব দেখা যায়। রস্কিনের সেই বিবিধ-মত-সঙ্কুল অসীম গ্রন্থসমুদ্র হইতে তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় মন্থন করা নিতান্ত সহজ নয়—প্রায় অসম্ভব। যাঁহারা তাঁহার পক্ষ, তাঁহারাও তাঁহার মত বুঝাইতে গিয়া অনেক সময় এমন অনেক কথা বলিয়াছেন, যাহা তিনি নিজে বলেন নাই—তাঁহাদের নিজ মত তাঁহার মতে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন; এবং তাঁহার বিরোধী পক্ষও তাঁহার ভ্রান্তি দেখাইতে গিয়া এমন অনেক কথা রস্কিনে আরোপ করিয়াছেন যে, সে সকল কথা শুধু রস্কিন বলেন নাই তাহা নহে, বরং তাহাদিগকে তিনি ভ্রমাত্মক এবং অসত্য বলিয়া নির্দ্দেশ ও প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যথাস্থানে তাহাদের দুই একটা উদাহরণ দেওয়া যাইবে। আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, মোটের উপর তাঁহার মত পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিতে চেষ্টা পাইব।

কলা সম্বন্ধে রস্কিনের মত খুব প্রশস্ত এবং উদার। তাহাতে কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা নাই। কলা সম্ভোগ হইতে তিনি কাহাকেও বঞ্চিত করিতে চাহেন না। ধনী নির্ধন সকলেই তাহাতে আমন্ত্রিত। কেবল তাহাই নহে, পরম ভক্ত ভাগবৎ-কার যেমন বলেন, “ধর্ম্ম সম্যক অনুষ্ঠিত হইয়াও, যদি ভগবানে ভক্তি উৎপাদন না করে, তবে তাহা ‘শ্রম এব হি কেবলং,’” রস্কিনও সেইরূপ বলেন, “যে জীবনে পরিশ্রম নাই, সে জীবন যেন একটা গুরুতর অপরাধ; এবং যে পরিশ্রমে কলা-সম্পর্ক নাই, তাহা পশুত্ব।” তাঁহার সমুদয় শিক্ষার মধ্যে এই একটা কথা নিরন্তর প্রতিধ্বনিত—মানব-চরিত্রের উন্নতি সাধনে কলা-বিদ্যা শ্রেষ্ঠ সহায়। তাই, তিনি জীবনের সকল কার্য্যে সকল বিষয়েই ললিত-কলার বিকাশ দেখিতে চান। তিনি আরও বলেন, কলা বিদ্যার শিক্ষাদান করা, এবং সকল বিষয় শিখান একই কথা। কারণ, এই জগতে যাহা কিছু আছে—অসীম বাহ্য প্রকৃতির বিরাট ব্যাপার হইতে সূক্ষ্মতম পরমাণু পর্য্যন্ত, এবং অনন্ত দুরবগাহ মানব-হৃদয়ের সুখ দুঃখের গভীর আলোড়ন হইতে সামান্য সাধটী পর্য্যন্ত—সকলই কলা বিদ্যার বিষয়ীভূত হইতে পারে! ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, কলা-ব্যবসায়ী যে বিষয় লইয়া কলা-

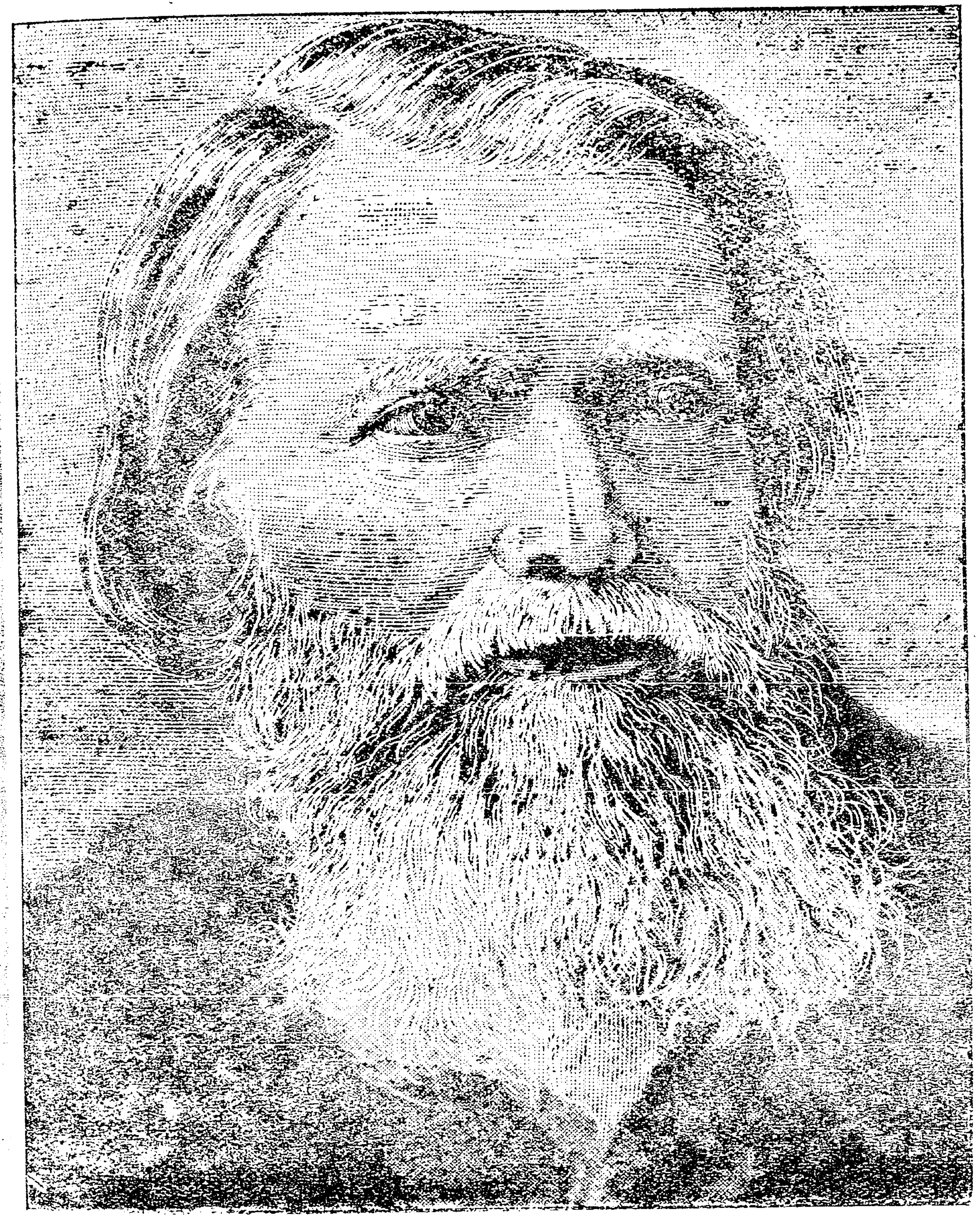

রস্কিন—বার্দ্ধক্যে

চর্চ্চা করিবেন সে বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব এবং তথ্য অবগত হওয়া তাঁহার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। এই পর্য্যন্ত রস্কিনের সঙ্গে কাহারও বা কোন সম্প্রদায়ের বিবাদ নাই। কলা সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা প্রশস্ততর মত থাকিতে পারে না। কিন্তু কলা বিদ্যা বলিলে আমরা কি বুঝি? কলা বিদ্যা কাহাকে বলে? এই লইয়া তাঁহার সহিত অনেকেরই মত-ভেদ আছে। রস্কিন প্রথমে বলেন যে, কলা মাত্রই একটা উন্নত এবং প্রশস্ত ভাষা—ভাব প্রকাশের পক্ষে অমূল্য। অতি সুন্দর কথা! সকলেরই গ্রাহ্য। কিন্তু, তৎপরেই জিজ্ঞাস্য, কোন শ্রেণীর ভাব প্রকাশ? রস্কিন যদি বলিতেন, সৌন্দর্য্যের ভাব প্রকাশ করা, তাহা হইলে কাহারও সহিত তাঁহার বিবাদ থাকিত না। যদিও তিনি সৌন্দর্য্যকে কোথাও বাদ দেন নাই, কিন্তু কোথাও তাহাকে কলা বিদ্যার সর্ব্বস্ব—মর্ম্ম—প্রাণ—বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই, এবং তাহাকে মুখ্য স্থানও দেন নাই।

তাহা ছাড়া ললিত কলা সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে উদার মতের উল্লেখ করা হইয়াছে, সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে তাঁহার মত ঠিক বিপরীত। তাহা অনুদার, সাম্প্রদায়িক, সঙ্কীর্ণ—সুতরাং ভ্রমাত্মক। রস্কিন কোথাও ললিত কলার লক্ষণ বা সংজ্ঞা নিরূপণ করেন নাই। কিন্তু উচ্চ কলা ("great art") বলিলে তিনি কি বুঝেন তাহা বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি বলেন, "উচ্চ কলা আমি তাহাকেই বলি, যাহা মানবের মনে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম ভাব-সকল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় উদিত করে।" এবং সেই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিয়া, ললিত-কলা-প্রিয় ব্যক্তি মাত্রকেই আশ্চর্য্য ও স্তম্ভিত করিয়াছেন:—"এমনও কলা আছে যাহার কার্য্য আনন্দ দান করা নয়, পরন্তু শিক্ষা দান করা" (There is some art whose end is to teach and and not to please)—ভয়ানক কথা! রস্কিনের মুখ হইতে যে ইহা নির্গত হইয়াছে, তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে ঐ উক্তি স্বচক্ষে না দেখিলে, কোনরূপে প্রত্যয় করা যায় না। কিন্তু উপরোক্ত উক্তি যে মুহূর্ত্তের খেয়াল বা অনবধানতা-জন্য তাহা বলা যায় না। কারণ, তাঁহার অপেক্ষাকৃত আধুনিক কোনও গ্রন্থে* তিনি সমস্ত কলাবিদ্যা সম্বন্ধে খুব দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন, "আমি আজি পর্য্যন্ত যে শিক্ষা দিতে চেষ্টা পাই-

* Lectures on Art.

য়াছি তাহার অধিকাংশ সম্বন্ধে এই আপত্তি উপস্থিত করা হয় যে, কলা বিদ্যাকে প্রাকৃতিক ঘটনার বা তথ্যের প্রকটন বলিয়াই আমি তাহার অত্যধিক আদর করিয়াছি, তাহার চিত্তরঞ্জিনী প্রকৃতির অত্যল্প আদর করিয়াছি। আমি এক্ষণে নিঃসংশয়ে বলিতে চাই এবং তোমাদিগকে বুঝাইতে চাই যে, কলা বিদ্যার সমস্ত জীবন—সত্বা—তাহার সত্য-পূর্ণতার উপর বা ব্যবহার্য্যতার উপর নির্ভর করে, এবং উহা নিজে যতই কেন চিত্ত-রঞ্জক, বিস্ময়-কর বা গভীর-ভাব-ব্যঞ্জক হউক, যদি ইহার উদ্দেশ্য কোন প্রকৃত তথ্যের প্রকাশ বা কোন ব্যবহার্য্য পদার্থের অলঙ্করণ না হয়, তাহা হইলে ইহা নিকৃষ্ট কলা, এবং ক্রমে আরও নিকৃষ্ট হইতে চলিবে।" রস্কিন এইরূপে কলাবিদ্যার আনন্দদায়িনী প্রকৃতিকে একেবারে উপেক্ষা বা তাহাকে অত্যন্ত গৌণ স্থান দিয়া তৎসম্বন্ধে মৌলিক—মর্ম্মগত ভ্রান্তি করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ভক্তবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার এ ভ্রম দেখা দুরে থাকুক, তিনি যে এমন ভ্রমাত্মক শিক্ষা দেন নাই বরং তাহার বিপরীত শিক্ষাই দিয়াছেন, তাঁহাদের রস্কিন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদিতে অম্লান বদনে এবং বিশদ চিত্তে বলিয়া থাকেন। এড্‌বার্ড কুক্ এম. এ. মহাশয় (Edward Cook M. A.) তাঁহার রস্কিনের শিক্ষা ও কার্য্য সমালোচন গ্রন্থে† লিখিয়াছেন—"রস্কিন বলেন, কলা বিদ্যা কেবলমাত্র অবকাশ রঞ্জিনী নহে, ইহা কেবলমাত্র আমোদ বা কৌতুক নহে, অসুস্থ হৃদয়-বৃত্তির পরিচর্য্যা করা ইহার কার্য্য নহে বা আত্মার নিদ্রা সংসাধন করা উদ্দেশ্য নহে। ইহার অর্থ নয় যে, কলা বিদ্যা আনন্দ বিধান করিবে না, বরং যাহা আনন্দ দেয় না তাহা ললিত কলাই নয়।" কিন্তু শেষোক্ত কথাটী ভক্তের টিপ্পনী—গুরুর কোন মূলগ্রন্থে উহা নয়নগোচর হয় না; এবং এই টিপ্পনীতেই ললিত কলার সর্ব্বস্ব উক্ত হইয়াছে। কলা বিদ্যার কার্য্য ও উদ্দেশ্য চিত্তরঞ্জন, রস্কিন স্পষ্টতঃ এ কথা অস্বীকার করিলেও বা আনন্দকে নিতান্ত গৌণ স্থান দিলেও, চিত্তরঞ্জন যে কলার প্রকৃত ধর্ম্ম ইহা তাঁহার সমুদয় গ্রন্থের মধ্যে অতর্কিতভাবে পুনঃ পুনঃ স্বীকৃত হইয়াছে। কারণ, ইহা অনিবার্য্য। যেমন আকাশ হইতে নীলিমা—জল হইতে তরলতা বিচ্ছিন্ন করা যায় না, সেইরূপ কলা হইতে আনন্দকে বাদ দেওয়া যায় না।

এখন এই আনন্দ আসিবে কোথা হইতে? ইহার মূল কোথায়? রস্কিন যদি বলিতেন, সৌন্দর্য্যে, তাহা হইলে সকল মিটিয়া যাইত। কিন্তু সৌন্দর্য্যের সঙ্গে তিনি সত্যের এবং অপরাপর বিষয়ের যোজনা করিয়া ললিত কলাকে পথভ্রষ্ট করিয়াছেন। এ দিকে আবার, যাহা সত্য তাহাকেই তিনি সুন্দর বলেন, কোথাও বা ইহার প্রতিবাদ করেন, এবং স্থল বিশেষে এমন উক্তিও দেখা যায় যে, সত্যের অভাব বা অপলাপ কোনরূপ উৎকর্ষের দ্বারা মিটিতে পারে না। সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে তাঁহার সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার কথা ত পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনি সৌন্দর্য্যকে মুখ্য স্থান দেন নাই—সে স্থান তিনি দিয়াছেন সত্যকে। তিনি বলেন, সত্য এবং সৌন্দর্য্য পরস্পর স্বাধীন এবং তাহাদের যোগ্যতা বা মূল্য অনুসারে তাহাদিগকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে—অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে সত্য—সৌন্দর্য্য তাহার পর। ইহা ছাড়া, রস্কিন সৌন্দর্য্যকে নীতি ও ধর্ম্মের অধীন করিয়াছেন। তিনি সৌন্দর্য্যকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈতিক উপাদান (The highest moral element) বলেন, এবং তাঁহার রচিত প্রথম পুস্তকে তিনি সৌন্দর্য্যের যে বিস্তৃত বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহাতে তিনি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন যে, সৌন্দর্য্যের অন্তর্ভূত বিভিন্ন ভাব সকল ঐশীগুণের ছায়া-মাত্র। তাঁহার ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় কুসংস্কার (গোঁড়ামি) এতদূর গড়াইয়াছিল যে, তিনি নিম্নলিখিত হাস্যজনক অসত্যকে লিপিবদ্ধ করিতে কোনরূপ সঙ্কোচ বোধ করেন নাই—"যে লোক ঈশ্বর বা তাহার নিজ সহোদরকে স্নেহ করে না, সে তাহার চরণতলে আস্তীর্ণ শ্যাম শস্পরাশিকেও ভাল বাসিতে পারে না।"*

রস্কিন এই স্থলে বিভিন্ন বিদ্যার কার্য্য এবং উদ্দেশ্য লইয়া গোলযোগ বাধাইয়াছেন। সত্য নিরূপণ বিজ্ঞানের কার্য্য—শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা তাহা সাধ্য। সৌন্দর্য্য সৃষ্টি বা উদ্ভাবন কলা বিদ্যার উদ্দেশ্য—রুচি আমাদিগকে তাহার পথ দেখাইয়া দেয়। নীতি আমাদিগকে কর্ত্তব্য বিষয় শিক্ষা দেয়—এবং ইহা বিবেকের কার্য্য। এমন হইতে পারে যে, সত্য বা নীতির অপলাপে সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বা অবিকৃত বিকাশ অসম্ভব। কিন্তু তাই বলিয়া কলা শাস্ত্র হইতে আমরা সত্যের উদ্ভাবন বা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের উপায় ঠিক করিয়া লইতে পারি না। বিজ্ঞান বা নীতির উদ্দেশ্যের সহিত যখনই কলা-বিদ্যা সঙ্গত হইয়াছে তখনই তাহার নিজ উচ্ছেদ বা বিলোপ অনিবার্য্য। সত্যেরও মর্য্যাদা আছে; কর্ত্তব্যেরও মর্য্যাদা আছে; সৌন্দর্য্যের মর্য্যাদা তাহাদের অপেক্ষা কোনরূপে ন্যূন নহে। কলা শাস্ত্রে সৌন্দর্য্যের স্থান সকলের উপর। বালক জীবনের সমস্ত মধুময় মোহ, উজ্জ্বল কল্পনা, বিচিত্র শোভা, ও অর্দ্ধ-স্ফুট-কুসুম-কোরকবৎ কোমল ও কমনীয় কবিত্বের সারাদান করিয়া অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী লেখক কেনেথ্ গ্রেহাম (Kenneth Grahame) মহোদয় যে "গোল্ড্‌ন এজ্" (Golden Age) নামক অতি সুন্দর ও মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, সেই পুস্তকের মধ্যে আমরা কল্পনা-প্রিয় বালকের এই অমূল্য আবিষ্কারের সন্ধান পাই, "সত্যের অপেক্ষাও উচ্চতর পদার্থ আছে—(There are higher things than truth) ইহার উদাহরণ কলাশাস্ত্রের প্রতিছত্রে—সে শাস্ত্রে সৌন্দর্য্য সত্যের অপেক্ষা উচ্চতর।

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সঙ্কীর্ণতার মধ্যে সৌন্দর্য্যকে আবদ্ধ রাখিয়া রস্কিন তাহাকে আংশিক ভাবেই দেখিয়াছেন। বস্তুতঃ সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে দুই বিভিন্ন জাতীয় মত দেখিতে পাওয়া যায়। এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন, যাঁহারা ভৌতিক বা শারীরিক সৌন্দর্য্য ছাড়া অপর কোন সৌন্দর্য্য দেখেন না। ভর্ণন লী (Vernon Lee) নাম্নী বিদুষী লেখিকা 'রস্কিনি' (Ruskinism) নামক তাঁহার প্রবন্ধে এই মত সমর্থন করিয়াছেন। আকৃতি-গত সৌন্দর্য্যেরই ধ্যান-ধারণায় তাঁহারা মগ্ন, তাঁহাদের নিকট এই নদ-নদী-গিরি-তরু-সঙ্কুলা সাগরাম্বরা পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ বিবিধ পশু-পক্ষী-পতঙ্গাদির বিচিত্র দেহাবয়ব ও নর-নারীর সুগঠিত আকৃতি সৌন্দর্য্যের এক মাত্র বিকাশের স্থল। এই শ্রেণীর মুখ-পাত্র হইয়া ফরাসী কবি আর্মাঁ সিলভেষ্টর (Armand Sylvestre) বলিয়াছেন:—

"রমণীসৌন্দর্য্য—একা সৌন্দর্য্য প্রকৃত।" এবং আমাদের এক জন বঙ্গীয় কবিও সেই সুরে গাহিয়াছেন:—

> রমণিরে, সৌন্দর্য্যে তোমার
> সকল সৌন্দর্য্য আছে বাঁধা।
> সৌন্দর্য্য-জগত হ'তে তোমারে রাখিলে দূরে,
> সে জগতে থাকেনাও আধা।"
>
> —অক্ষয়কুমার বড়াল।

আবার আর এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন যাঁহারা, শিশুরই হউক বা রমণীরই হউক, নগ্ন মূর্ত্তি দেখিলেই একেবারে অন্ধ হইয়া পড়েন। তাঁহাদের চক্ষে মানব দেহের কোন সৌন্দর্য্য বা গৌরব নাই। তাঁহারা সকল স্থানেই আধ্যাত্মিকতা দেখিতে চান—দেখিবার আর যে কোন সামগ্রী আছে স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে যে সৌন্দর্য্য কেবলমাত্র আমাদের ইন্দ্রিয় বর্গকে আমন্ত্রণ করে—যাহা ইন্দ্রিয় অবধি পৌঁছায়—অসীম মানবাত্মার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গভীরতা আলোড়িত করিয়া অপার্থিব ভাব-তরঙ্গ না তোলে—তাহা সৌন্দর্য্য নয়; রস্কিনের মত অনেকটা এই জাতীয়। তিনি বলেন, "তাহাই সৌন্দর্য্য, তাহাই কলা-উপভোগক্ষম বৃত্তিকে আনন্দ দেয়, যাহা কোন উন্নত উদার ব্যক্তির দ্বারা উদ্ভাবিত বা সৃষ্ট, এবং সম-ধর্ম্মা অপর ব্যক্তির দ্বারা উপভুক্ত বা দৃষ্ট"। তিনি স্থানান্তরে বলিয়াছেন, "উচ্চ অঙ্গের কলা মাত্রই স্তুতিবাদ;" "উচ্চ কলা ঐশী-নির্দ্দেশ;" এই সকল কথা শুনিতে খুব ভাল, এবং জগতে এমন কতকগুলি লোক আছেন যাঁহাদের এইরূপ শ্রুতি-মধুর কথা বিশ্বাস করিতে স্বাভাবিক ধাতুগত প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কথা তাঁহাদের এত মধুর ও শোভন বলিয়া বোধ হয় যে, সে গুলিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারিলে তাঁহাদের বাস্তবিক কষ্ট হয় এবং অশান্তি বোধ করেন—সুতরাং সত্যানুসন্ধায়ীর কঠোর পরীক্ষা দ্বারা গ্রহণ না করিয়া তাঁহারা একেবারে তাহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন; কিন্তু রস্কিনের ঐ উক্তি গুলির ভিতর যে ধর্ম্মভাব ও আস্তিকতার বীজ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহা কি সত্য? এমন ভক্ত আস্তিক কি নাই, কলা-পারদর্শিতা ত দূরের কথা, সৌন্দর্য্য জ্ঞানই যাঁহার নাই? আস্তিকতা, ভক্তি, বা ধর্ম্মভাব কলাজ্ঞান বা কলা-রচনাশক্তি উদ্বোধিত করে না। কলা রচনার পক্ষে সৌন্দর্য্য-জননী শক্তি আবশ্যক—এমন অনেক কলা-রসিক জগতে আছে এবং ছিল, সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে যাহাদের সমকক্ষ নাই কিন্তু

† Studies in Ruskin

* Modern Painters নামক পুস্তকের ২য় ভাগের ৯৭ পৃঃ। ১৮৮৩ অব্দে রস্কিন উল্লিখিত মতের ভ্রমাত্মকতা গ্রন্থ শেষে টিপ্পনীতে স্বীকার করেন।

যাহারা ঘোরতর নাস্তিক এবং নীতি সম্বন্ধে যাহাদের জীবন জঘন্য। রস্কিনের উচ্চ কলা সম্বন্ধে উপরোক্ত উক্তি চার্ল্‌স্‌ ওয়াল্‌ড্‌ষ্টিন (Charles Waldstein) নামক কোন লেখক রস্কিন বিষয়ক তাঁহার পুস্তকে সকল কলা সম্বন্ধে আরোপিত করিয়া রস্কিনের প্রতিবাদ করিয়াছেন। মিত্রামিত্র অনেকেই যে তাঁহাকে ভুল বুঝিয়াছেন ইহা তাহার দ্বিতীয় উদাহরণ। সে যাহাই হউক, এই অত্যধিক নীতি বাৎসল্য ও আধ্যাত্মিকতা সৌন্দর্য্য-সম্বন্ধে তাঁহাকে আংশিক রূপে অন্ধ করিয়াছে; কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, মতবাদ কালে তিনি যাহাই বলুন, তাঁহার অসংখ্য গ্রন্থাবলীর অনেক স্থানে প্রকৃত কলা-রসিকের সৌন্দর্য্যোপভোগে স্বাভাবিক প্রবণতা নিবন্ধন, তিনি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বাধ্য হইয়া প্রায় সকল শ্রেণীর সৌন্দর্য্য গ্রহণে তাঁহার অপূর্ব্ব ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, এবং কখন কখন তৎ তৎ বিষয়ে নিজের ভ্রান্তিও স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার অসংখ্য গ্রন্থমধ্যে প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায়ই নিসর্গের সুন্দর বা উদাত্ত (Sublime) মূর্ত্তির এমন সরস বর্ণনা আছে, যাহা বিপুল ইংরাজী সাহিত্যেও দুর্লভ। নিম্নলিখিত উদাহরণ পাঠককে রস্কিনের উদার প্রকৃতির কথঞ্চিৎ আভাস দিতে পারিবে,—রস্কিন বরাবরই বলিয়া আসিয়াছেন যে, একেবারে ধর্ম্ম-ভাব বিবর্জ্জিত কোন কলা-রচনা সম্পূর্ণ সুন্দর হইতে পারে না; কিন্তু পরে নিজ মতের প্রতিবাদ করিয়া স্বীকার করিয়াছেন যে, টিশিয়ান (Titian) নামক খ্যাতনামা চিত্রকরের চিত্র-সকলে ধর্ম্মভাবের গন্ধ পর্য্যন্ত না থাকিলেও তাহারা কলা-সৌষ্ঠবের পূর্ণ ও অদ্বিতীয় আদর্শ*। বাস্তবিক, কলা-লক্ষ্মী নীতি বা ধর্ম্মের তৌল করিয়া সৌন্দর্য্যের ওজন করেন না। মানব-জীবনে নীতি ও ধর্ম্মের মূল্য যে খুব বেশী, তাহা কেহ অস্বীকার করে না। উচ্চ দরের কলার দ্বারা যে মানবের সৌন্দর্য্যোপভোগক্ষম বৃত্তির সঙ্গে অপরাপর উচ্চতর বৃত্তিও চরিতার্থ হয়, সে কথাও কেহ অস্বীকার করে না। কিন্তু, তাই বলিয়া, যাহা নীতি বা ধর্ম্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত নয়, তাহা যে সৌন্দর্য্য নয় বা ললিত কলার বিষয়ীভূত হইতে পারে না ইহা নিতান্ত ভ্রান্ত মত।

নীতি সম্বন্ধে ললিত কলার উদাসীনতা সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক তেন্ (Taine) যাহা বলিয়াছেন, তাহা যেমন সত্য তেমনই সুন্দর—"সুসংলগ্ন বাহু ও সুদৃঢ় মাংসপেশী মানবকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলেও, প্রকৃত চিত্রকর তাহাদিগকে আনন্দ-পূর্ণ লোচনে নিরীক্ষণ করেন।" বাস্তবিক কলা শাস্ত্রে সকল শ্রেণীর সৌন্দর্য্যই আদরনীয়। সৌন্দর্য্যোপাসক কবি কীটস্ (Keats) যথার্থই বলিয়াছেন যে "ইয়াগো (Iago) সৃষ্টিতে কলাকুশলী যে আনন্দ পান, আইমোজেন (Imogen) সৃষ্টিতেও সেই আনন্দ পান।"

নীতি বা ধর্ম্মভাবে প্রণোদিত হইয়া বা তাহার ভাণ করিয়া, নগ্ন মূর্ত্তিকে চিত্র শালায় স্থান না দেওয়া কলা বিষয়ে বর্ব্বরতার লক্ষণ। সৌন্দর্য্যের অভ্যন্তরে যে পবিত্রতা জড়িত আছে, সৌন্দর্য্য-উপাসক তাহা নগ্ন মূর্ত্তিতেও দেখিতে পান। তোমার সৌন্দর্য্য দেখিবার চক্ষু নাই বলিয়াই, তুমি তাহাতে সৌন্দর্য্যও দেখনা এবং তৎসংলগ্ন পবিত্রতাও দেখনা। সৌন্দর্য্য উপভোগে, সৌন্দর্য্যের পূজায়, নগ্ন মূর্ত্তিতেও কলা-রসজ্ঞ যে বিমল তীব্র আনন্দ পান, বহুদিন পূর্ব্বে নিম্নোদ্ধৃত চতুর্দ্দশ-পদীতে তাহা প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলাম;—

বিবসনা

কিসের পূর্ণিমা আজ! কোথাকার জ্যোতি
নামিল এ ধরামাঝে—কাহার মহিমা?
মানবী?—না দেখি কোন অমর-মূরতি?
অগ্রসর-পদ কেন জড়িত-জড়িমা?
আলিঙ্গন-প্রসারিত বাহু কে নিবারে!
কি বিস্ময়ে—মন্ত্রবলে—কাহার মায়ায়
তপ্ত প্রাণ অবরুদ্ধ আঁখির মাঝারে!
কোন মহা-জাগরণে দেহ লয় পায়!
এ সুষমা-তীর্থ পাশে বিহ্বল জীবন,
হারাইয়া যায় প্রাণ রূপের উচ্ছ্বাসে—
কবি শুধু জাগে হৃদে—নির্ব্বাণ বাসনা।
কি মহান্ মুহূর্ত্তেরে—জীবনের কোন্
সুতুঙ্গ সোপানে—আজি সাক্ষাৎ প্রকাশে
সৌন্দর্য্যের দেব-মূর্ত্তি—ব্যক্ত—বিবসনা।

ললিতকলায় সুনীতি কুনীতি নাই; যদি থাকে, তবে তাহাই সুনীতি যাহা সুন্দর, যাহা অসুন্দর

* Fors Clavigera দেখুন।

তাহাই কুনীতি। সৌন্দর্য্য লইয়া তাহার কাব—তুমি তোমার প্রকৃতি ও রুচি অনুসারে তাহা হইতে সুনীতির সুধা বা কুনীতির হলাহল সঞ্চয় করিতে পার। কলাশ্রী সে বিষয়ে প্রকৃতিরই ন্যায় মূক। প্রথম শ্রেণীর কলা-প্রবীণের নিকট সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী কখন চিন্ময়ী—কখন মৃণ্ময়ী। রবীন্দ্রনাথের "রাত্রে ও প্রভাতে" নামক মধুরার্থ-পূর্ণ সুন্দর কবিতায় যেমন একই নায়িকা নিশা ও উষা ভেদে ক্রোড়-লগ্না সোহাগ-চুম্বিতা প্রেয়সী ও মঙ্গলময়ী ভক্তি-পূজিতা দেবী, তেমনই প্রকৃত কলারসজ্ঞের নিকট সৌন্দর্য্য কখন শরীরী, কখন চিন্মাত্র,—কখন রতি, কখন বিশ্বলক্ষ্মী। মূল কথা, সৌন্দর্য্য—কেবলমাত্র সৌন্দর্য্য—প্রত্যেক কলা ব্যবসায়ীর মূলমন্ত্র হওয়া চাই—তাহা হইলেই কলা বিদ্যার উৎকর্ষ সাধিত হইবে। য়িহুদীয় ঈশ্বর জিহোবার (Jehova) ন্যায় কলা লক্ষ্মীও তাঁহার উপাসককে আদেশ করেন, "আমা ব্যতিরেকে আর কোন ঈশ্বর তোমার যেন না থাকে —আমাতে একনিষ্ঠ হও, তবেই আমাকে পাইবে।"

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহার সারমর্ম্ম এই:—কলা বিদ্যার কার্য্য চিত্তরঞ্জন; সে চিত্তরঞ্জন সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির দ্বারা সাধ্য। সৌন্দর্য্য বলিলে আমরা সকলপ্রকার সৌন্দর্য্যই বুঝিব—কেবলমাত্র রস্কিনের ন্যায় নৈতিক বা আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য বুঝিব না, বা অপর সম্প্রদায়ের ন্যায় কেবলমাত্র ভৌতিক বা শারীরিক সৌন্দর্য্য বুঝিব না। কারণ, ললিত কলার অধিকারের সীমা নাই। সমস্ত মানবজীবনই ইহার ক্ষেত্র। বিশ্বসংসারে যাহা কিছু আছে, সকলই ললিতকলার বিষয়ীভূত হইতে পারে। যখনই যাহা তুমি সুন্দর করিয়া মানবের চক্ষে ধরিবে, তখনই তুমি ললিতকলার সৃষ্টি করিলে। সৌন্দর্য্যের জন্যই ললিত-কলা, ইহাই Art for Art কথার প্রকৃত অর্থ।

এই সৌন্দর্য্য-সম্ভোগ জনিত আনন্দের ন্যায় তীব্র মধুর অথচ পবিত্র আনন্দ জগতে আর নাই। যদিও কলা-বিদ্যা মুখ্যতঃ ও স্পষ্টতঃ নীতি শিক্ষা দেয় না, কিন্তু ইহার বিশুদ্ধ আনন্দোপভোগে মানব-হৃদয়ের পবিত্রতা ও উন্নতি সাধিত হয়। সৌন্দর্য্য উপদেশ দেয় না, মধুর আকর্ষণে তোমাকে সুন্দর করিয়া তোলে। এই সৌন্দর্য্য-পিপাসা মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, এবং সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে ইহা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। জাতীয় গৌরব শুধু বাহুবলে নয়, সৌন্দর্য্য-অনুশীলনেও বটে। ইংরাজ আমাদের বাহুবলে জিতিয়াছেন কি না, সে বিষয়ে তর্ক থাকিতে পারে; কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর এমন কোন লোক নাই যিনি স্বীকার করিবেন না যে, যে শ্রেণীর কলা বিদ্যায় ইংরাজ জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ কাব্যকলায়), তাহা দ্বারা ইংরাজ আমাদের প্রত্যেককে জয় করিয়াছে—কবিতার স্বর্ণবীণার মোহময় তানে আমাদিগকে মুগ্ধ ও পরাজিত করিয়াছে।

এমনও একদিন ছিল যখন ললিতকলার সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি ও বিকাশে আমাদের এই ভারতভূমি সমুদয় জগৎকে সমুজ্জ্বল করিয়াছিল। তখন প্রথম শ্রেণীর কবি, ভাস্কর, এবং স্থপতি ভারতকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। সে একদিন ছিল, যখন ভারতের কলা, দর্শন ও বিজ্ঞান, ভারতের শিল্প, সুদূর সাগরপারে—দেশ দেশান্তরে—আদরে গৃহীত হইত। এখনও বর্ত্তমান যুগের সভ্য জগৎ তাহাদের উৎকর্ষ দেখিয়া বিস্মিত। সে দিন ভারতের সকল ছিল! 'ব্রিটিশ রাজত্বে সূর্য্য কখনও অস্ত যায় না', ইংরাজের বল-দর্প এবং সাম্রাজ্য-সমৃদ্ধি সম্ভূত এই যে গর্ব্বিত বাণী আজ আমরা শুনিতেছি, তাহার বহু পূর্ব্বে—ভারতের সেই গৌরবের দিনে —ভারতের সূর্য্যবংশীয় অধীশ্বরও বলিতে পারিয়াছিলেন,—

"যাবদাবর্ত্ততে চক্রং তাবতী মে বসুন্ধরা"*

এখন ভারত ললিতকলার নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়াছে—ইংরাজী Fine Art কথার স্থলে আমরা তাহার অতি অশোভন অনুবাদ করিয়া "সূক্ষ্ম শিল্প" লিখি এবং বলি! বঙ্কিম কি সাধে করিয়া দুঃখ করিয়াছেন যে, কালিদাস যদি প্রেতাবস্থায় শুনিতে পান কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা শিল্প বিদ্যা মাত্র, তবে তিনি রাগ করিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু, "তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ"। ক্রমশঃ—

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন।

কবি রাজেন্দ্র দাস।

কবি রাজেন্দ্র দাস বঙ্গভাষায় মহাভারতরচকদিগের অন্যতম। মহাভারতের যত কবির পরিচয় আমরা এ পর্য্যন্ত পাইয়াছি, তাঁহারা সকলেই এক মহাভারতের রচনায় প্রবৃত্ত হইলেও, কেহ কাহারও পথ অনুসরণ করেন নাই। প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া রচনা আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে রাজেন্দ্র দাসের আরম্ভাংশই নূতনত্বে

* যতদুর সুর্য্যমণ্ডলের আবর্ত্তন, ততদুর আমার অধিকার।

ও চমৎকারিত্বে প্রথম আসন পাইবার যোগ্য। আমরা অদ্য পাঠকবর্গকে পুরাতন কবির এই নূতন উপক্রমণিকা উপহার দিব।

রাজেন্দ্র দাসের মহাভারত শকুন্তলার উপাখ্যান হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে আরম্ভ হইয়াছে। কবি এই উপাখ্যান আরম্ভের পূর্ব্বে এক অভিনব প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছেন। প্রস্তাবটী এই ঃ—

"অর্জ্জুনের পৌত্র রাজা পরীক্ষিত সুত।
জন্মেজয় নামে রাজা অত্যন্ত অদ্ভুত।
একদিন সভা করি বসিলা রাজন॥
দৈবযোগে আসিলেন ব্যাস তপোধন॥
কর যোড় করি রাজা করে নিবেদন।

*　　*　　*　　*

কুরু পাণ্ডবেরে কেনে না কৈলা নিষেধ॥
আপনে নিষেধ যদি করিতা সত্বরে।
তবে কেন দুই দলে যুদ্ধ করি মরে॥
মুনি বলে জন্মেজয় কহি তোমার ভেদ।
একখানি কথা তোমাকে করিবে নিষেধ॥
কালি যে প্রভাতে এথা আসিবে বিমান।
সর্ব্বথায় না রাখিবা আপনার স্থান॥
তবে যদি রাখ তাহা শুভ করি মনে।
কদাচিত সেহি রথে নহিবা আরোহণে॥
যদি আরোহণ হও ভ্রমণের তরে।
কদাচিত না যাইবা মৃগ অনুসারে॥
যদি মৃগয়াতে যায় নিজ বুদ্ধি হানে।
তিন দিকে ভ্রমিয়া না যাও দক্ষিণে॥
যদি বা দক্ষিণে যাও না মানিয়া কথা।
রাজপুরী দেখি তবে না যাইবা তথা॥
তবে যদি অন্তপুরী যায় কদাচিত।
রাজকন্যা দেখি না চাহিবা তার ভিত॥
তবে যদি কাম দৃষ্টে ত্যাগিতে না পার।
তবে জানি তারে আনি পাটেশ্বরী কর।

ব্যাসদেব এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। পরদিন প্রভাতে সত্য সত্যই এক অপূর্ব্ব রথ রাজবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রতিহারী রাজাকে রথের বৃত্তান্ত জানাইলে, ব্যাসদেবের নিষেধ তাঁহার মনে হইল। স্থির করিলেন রথে চড়িব না, কেবল যাইয়া দেখি রথখানা কেমন। কিন্তু রথ দেখিয়া জন্মেজয় প্রবৃত্তির বেগ সামলাইতে পারিলেন না। একে একে ব্যাসদেবের সমস্ত নিষেধগুলিই তিনি পদদলিত করিলেন।

জন্মেজয় কন্যার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া আপনার অভিলাষ জানাইলেন। কন্যা কহিল ঃ—

"যে করিবে পাটেশ্বরী সেহি মোর স্বামী"

জন্মেজয় তখন কিছুমাত্র বিচার বিতর্ক না করিয়া তাহাকে পাটেশ্বরী করিয়া রাজধানীতে আনিলেন। একদিন জন্মেজয় পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া নূতন পাটরাণীর সহিত সিংহাসনে বসিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা দিতেছেন, এমন সময়

"—ঋষ্যশৃঙ্গ বিভাণ্ডকসুত।
দক্ষিণা নিবার আইসে চরিত্র অদ্ভুত॥
দুইখানা শৃঙ্গ আছে মুনির কপালে।
তাহা দেখি মহাদেবী হাসে কুতূহলে॥
মহাদেবীর হাস্যে মুনি হাসিলা কটাক্ষে।
অলক্ষিতে জন্মেজয় দেখিলা তাহাকে॥

ঋষির ব্যবহারে জন্মেজয় মহা ক্রুদ্ধ হইয়া—

"—জলপানের ঝারি লৈয়া হাতে,
মুনি প্রতি ক্ষেপিয়া মারিল নরনাথে।"

ঋষ্যশৃঙ্গও অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া রাজাকে অভিশাপ দিলেন ঃ—

"বন মধ্যে বেশ্যা পেয়ে লৈয়া কর ক্রীড়া।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া তোর হৌক রোগ পীড়া॥
প্রাণে মারিলে চন্দ্রবংশ হয় নাশ।
রোগ্যা হৈয়া থাক তুমি পাপ অভিলাষ।"

মুনির শাপে জন্মেজয় মহাভীত হইয়া মুনিকে স্তব করিতে লাগিলেন। মহাজনের চিত্ত "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি। সুতরাং সহজেই ঋষ্যশৃঙ্গ প্রসন্ন হইয়া বর দিলেন—ব্যাসের প্রসাদে তোমার শাপ বিমোচন হইবে। ঋষ্যশৃঙ্গ এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলে, ব্যাসদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং নিষেধগুলি অবহেলার জন্য জন্মেজয়কে তিরস্কার করিয়া কহিলেন—

"একেশ্বর বাক্য তুমি না রাখিলা মোর।
কি মতে বুঝাইমু পঞ্চ শতেক বর্ব্বর।

এতক্ষণে জন্মেজয়ের প্রশ্নের উত্তর হইল। এতক্ষণে জন্মেজয় বুঝিতে পারিলেন, কেন ব্যাসদেব তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণকে লোকক্ষয়কর মহাবিপ্লব হইতে নিবারণ করিবার চেষ্টা করেন নাই।

অতঃপর ব্যাসদেব জন্মেজয়কে মহাভারত শুনাইবার জন্য শিষ্য বৈশম্পায়নকে রাখিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

অতঃপর শকুন্তলার উপাখ্যান হইতে বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে। রাজেন্দ্র দাসের রচনা সংক্ষিপ্ত, রসাল, বিবিধ ছন্দোবদ্ধ, ও রাগ রাগিণীযুক্ত। ইহাতে দীর্ঘচ্ছন্দ, খর্ব্ব চ্ছন্দ, পদবন্ধ (পয়ার) প্রভৃতি ছন্দ এবং ভাটিয়ালি, পট্‌মঞ্জরী প্রভৃতি রাগিণী ব্যবহৃত হইয়াছে। রাজেন্দ্র দাসের নিবাস কোথায় ছিল এবং তিনি কোন সময় গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে তদ্বিষয়ের কোন প্রমাণ নাই। গ্রন্থের ভাষা তাঁহাকে পূর্ব্ব বঙ্গবাসী একজন প্রাচীন কবি বলিয়া পরিচিত করে মাত্র।

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু।

তৃতীয় ভাগ। } শ্রাবণ, ১৩০৭। { ৮ম সংখ্যা।

জাতীয় উদ্দীপনা ও জাতীয় সাহিত্য

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

জাতীয় উদ্দীপনার সহিত যে জাতীয় সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, তাহা পূর্ব্ব প্রস্তাবে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। প্রায় সকল সভ্য জাতির ইতিবৃত্তে, বিশেষতঃ যে সকল জাতির মধ্যে নব নব ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহাদের ইতিবৃত্তে, ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। দ্বিবিধ ভাবে ইহার প্রমাণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। প্রথম, কোনও কোনও স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে জাতীয় উদ্দীপনা হইতে জাতীয় সাহিত্যের কলেবর পুষ্ট হইয়াছে; দ্বিতীয়তঃ, অনেক স্থলে দেখা যায়, জাতীয় সাহিত্য জাতীয় উদ্দীপনার অবতারণা ও ব্যাপ্তির পক্ষে সহায়তা করিয়াছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠাতে এই উভয়বিধ প্রমাণই বিদ্যমান রহিয়াছে।

প্রথম প্রমাণ বঙ্গসাহিত্যে। ইহা সকলেই অবগত আছেন যে বৈষ্ণবধর্ম্মের, বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যপ্রচারিত ভক্তি ধর্ম্মের, অভ্যুদয়ই বঙ্গ সাহিত্যে পদ্যকাব্যের অভ্যুদয় ও বিকাশের প্রধান কারণ; সেইরূপ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্মই বাঙ্গালা গদ্যের অভ্যুদয় ও উন্নতির মূল। উক্ত উভয় আন্দোলনে জাতীয় চিত্তে যে উত্তেজনা জন্মিয়াছিল তাহাই জাতীয় সাহিত্যে প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রথম প্রচারক নহেন। বঙ্গের প্রসিদ্ধ কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস তৎপূর্ব্বে সুমধুর সঙ্গীতে বৈষ্ণবধর্ম্মের অদ্ভুত প্রেমরস দেশমধ্যে ঢালিয়া গিয়াছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপ ধামে শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যাপতি উক্ত শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৪৪৬-১৪৫০ খৃঃ) মিথিলাধিপতির রাজসভাতে অধিষ্ঠিত ছিলেন; চণ্ডীদাস সেই সময়েই বীরভূমের অন্তঃপাতী নান্নুর গ্রামে বিরাজ করিতেছিলেন। যাহা হউক শ্রীচৈতন্যের সময় হইতেই বৈষ্ণবধর্ম্ম বঙ্গদেশ মধ্যে প্রভাবশালী হইয়া উঠে। যখন এক দিকে বৈষ্ণবগণ ভক্তিধর্ম্মের নিশান উত্থিত করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, তখন অপর দিকে শাক্তমতাবলম্বিগণ মাথা তুলিয়া উঠিলেন। শাক্ত বৈষ্ণবের বিবাদে দেশ পূর্ণ হইয়া গেল। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত এই বিবাদ দেশের সর্ব্বত্র প্রবল ছিল। তাহারও প্রমাণ আমরা দেশীয় সাহিত্যে প্রাপ্ত হইতেছি। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত এই তিন শত বৎসর ধরিয়া সমান্তরাল ধারাদ্বয় বঙ্গ সাহিত্যে নামিয়া আসিয়াছে। একদিকে চৈতন্য সম্প্রদায়ের সাধক ও ভাবুকগণের পদাবলী, অপর দিকে শাক্তভাবাপন্ন কবি-

গণের গীতাবলী ; এই উভয় প্রকার কাব্য বঙ্গ সাহিত্যের কলেবর পুষ্ট করিয়াছে। চৈতন্যধর্ম্মের অভ্যুদয়জনিত উদ্দীপনা না হইলে আমরা বঙ্গ সাহিত্যের এই নব বিকাশ দেখিতে পাইতাম না। সেইরূপ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় একমাত্র পরব্রহ্মের উপাসনা কর্ত্তব্য বলিয়া যে মহা আন্দোলন উপস্থিত করিলেন, তাহারই প্রভাবে বঙ্গ সাহিত্যে গদ্য সাহিত্যের বিকাশ হইল। রামমোহন রায় এদেশের চিরপ্রচলিত পণ্ডিতগণের রীতিকে লঙ্ঘন করিয়া সংস্কৃত ভাষাকে বর্জ্জনপূর্ব্বক বাঙ্গালা ভাষাতে শাস্ত্রীয় বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে এদেশে গদ্য সাহিত্য ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গদ্য কিরূপে লিখিতে ও পড়িতে হয়, তাহা উপদেশ করিয়া তবে তাঁহাকে গদ্য লিখিতে হইয়াছে। তিনি প্রচলিত ভাষাতে বিচার উপস্থিত করিলে, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিগণকেও সেই ভাষাতে অস্ত্র ধারণ করিতে হইল। এইরূপ বাদ প্রতিবাদে বঙ্গভাষার গদ্য সাহিত্যের কলেবর পুষ্ট হইয়া উঠিল। তৎপরে খ্যাতনামা অক্ষয়কুমার দত্ত ব্রাহ্মসমাজের মুখপাত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকরূপে অবতীর্ণ হইয়া বঙ্গভাষায় গদ্য সাহিত্যের এক নব যুগ প্রবর্ত্তন করিলেন। অন্ততঃ বঙ্গদেশ আর কিছুর জন্য না হউক, বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি ও কলেবর পুষ্টির জন্য ব্রাহ্মসমাজের নিকট ঋণী।

জাতীয় উদ্দীপনা হইতে জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টি হওয়ার উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত বোধ হয় পঞ্চনদ দেশে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাবা নানকের জন্ম ও শিখধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে পঞ্চনদ-দেশে কোনও জাতীয় সাহিত্য ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার খ্রীঃ পূঃ ৩২৬ সালে যখন সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইয়া পঞ্চনদে পদার্পণ করেন, তখন পুরুবংশীয় রাজগণ মহাপ্রতাপে সে দেশে রাজত্ব করিতেছিলেন। তখন পুরুরাজ পঞ্চাশৎ সহস্র পদাতিক, চারি সহস্র অশ্বারোহী, ২০০ শত গজারোহী ও ৪০০ রথারোহী সৈন্য লইয়া তাঁহার দুই লক্ষেরও অধিক সৈন্যের পথ অবরোধ করিয়াছিলেন। ইতিবৃত্তকারগণ বলিয়াছেন, পুরুরাজের সহিত সংগ্রামে আলেকজাণ্ডার অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন, কেবল সৈন্যসংখ্যা অধিক হওয়াতে এবং নিজে সমরচাতুরীতে অগ্রগণ্য হওয়াতেই সে যাত্রা কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন। পঞ্চনদবাসী হিন্দুগণ বলবিক্রমে, মনুষ্যত্ব ও তেজস্বীতাতে তাঁহাকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। বাহুবলে তাঁহারা যেরূপ অগ্রসর ছিলেন, জ্ঞান বিজ্ঞানেও তেমনিই সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন ; তক্ষশিলাতে হিন্দু যোগীদিগের সহিত গ্রীকগণের সাক্ষাৎকার হয় ; ঐ সকল জ্ঞানী পুরুষের জ্ঞানের গভীরতা ও ধর্ম্মভাব দেখিয়া গ্রীকেরা বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সে সময়ে জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য কিছুরই অপ্রতুল ছিল না। কিন্তু হায় ! মুসলমান রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পরে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সে সমুদয় অন্তর্হিত হইয়া গেল। মুসলমান অধিকার কালে কোনও প্রদেশ যদি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে, তাহা এই পঞ্চনদ দেশ। পঞ্চনদ পারস্য হইতে দিল্লী আসিবার পথে, সুতরাং এই স্থান মুসলমান রাজাদিগের প্রধান আবাসস্থান হইয়াছিল, এবং উপর্য্যুপরি অনেক নব নব জেতার আক্রমণ সহ্য করিয়াছিল। এইরূপে কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই পঞ্চনদ হইতে ব্রাহ্মণদিগের শক্তি বিলুপ্ত হইয়া গেল ; সংস্কৃতের চর্চ্চা উঠিয়া গিয়া উর্দ্দু ও পারস্য ভাষার চর্চ্চা প্রবল হইল ; জ্ঞানী ও গুণিগণ অন্তর্হিত হইলেন ; দেশের রীতি নীতি কলুষিত হইয়া গেল ; পঞ্চনদের প্রাচীন গৌরব মানুষের স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হইল ! এরূপ জাতীয় অবসাদের মধ্যে সাহিত্যের প্রসার কি সম্ভব ? সুতরাং যে কিছু সাহিত্য ছিল তাহাও চর্চ্চার অভাবে বিলীন হইল। থাকিল কেবল হিন্দুজাতির স্বভাবসুলভ ধর্ম্মভাব। তাহা ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় প্রধূমিত অবস্থাতে রহিল ; এবং তাহাই বাবা নানক ও শিখ গুরুদিগের ফুৎকারে আবার প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। শিখধর্ম্ম গীতিময় কাব্যের মধুর সুস্বর ও বীণা, রবাব প্রভৃতির ঝঙ্কারে পঞ্চনদকে পূর্ণ করিয়া তুলিল। এই ধর্ম্মের কবিগণ এতই সঙ্গীতসুধা ঢালিয়া দিয়াছেন যে তাহার রসে পঞ্চনদ প্রদেশ এখনও সিক্ত হইয়া রহিয়াছে।

জাতীয় উদ্দীপনার এমনি গুণ যে জাতির একটা ভাষা ছিল না তাহার জন্য এক স্বতন্ত্র ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ ভাষার নাম গুরুমুখী, এই ভাষা গুরুদিগের মুখে জন্মগ্রহণ করিয়া নব সাহিত্যের আকারে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

এক দিকে যেমন দেখিতেছি উদ্দীপনা হইতে সাহিত্যের সৃষ্টি, তেমনি অপর দিকে সাহিত্য হইতে উদ্দীপনার সৃষ্টি,—

ইহারও নিদর্শন ইতিবৃত্তে পাওয়া যায়। ফরাসি বিপ্লব বিগত শতাব্দীর শেষভাগের এক মহাঘটনা, তাহার আন্দোলনে সমগ্র জগৎ কম্পিত হইয়াছিল। এই ফরাসি বিপ্লব কি এক দিনে ঘটিয়াছিল ? ইহার উপাদান সকল বহুকাল হইতে সংগৃহীত হইতেছিল। সেই সকল উত্তেজক কারণের মধ্যে বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগের ফরাসি সাহিত্য একটী প্রধান। ভল্টেয়ার ও রুসো প্রভৃতির সময় হইতে ফরাসি-সাহিত্য এক নব অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছিল, এক নব আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া মানবহৃদয়কে আলোড়িত করিতেছিল। সেই অনির্দ্দেশ্য, অগ্রাহ্য, অদম্য আকাঙ্ক্ষাই ফরাসি বিপ্লবের আকারে প্রকাশ পাইয়াছিল। তদানীন্তন সাহিত্যই এই আকাঙ্ক্ষার পরিপোষণ ও সঞ্চালন কার্য্যে বিশেষরূপে সহায়তা করিয়াছিল। রুসোর “সোসিয়াল কণ্ট্রাক্ট” নামক গ্রন্থে যে মেঘের অভ্যুদয় দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাই ফরাসি বিপ্লবে প্রচণ্ড ঝটিকার আকারে আত্মশক্তিকে প্রকাশ করিয়াছিল। ফরাসি বিপ্লবের ন্যায় আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অন্তর্বিদ্রোহের ইতিবৃত্তেও আমরা জাতীয় উদ্দীপনার সৃষ্টি বিষয়ে জাতীয় সাহিত্যের কার্য্য দেখিতে পাই। যে অন্তর্বিদ্রোহে দাসত্ব প্রথাকে চির দিনের মত যুক্তরাজ্য হইতে বিদায় করিয়াছে, তাহাও এক দিনে সংঘটিত হয় নাই ; তাহারও পূর্ব্বাভাস অনেক দিন হইতে জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছিল। উইলিয়াম লায়ড গ্যারিসন, থিয়োডোর পার্কার প্রভৃতির অবিশ্রান্ত চেষ্টা ও তৎকালের সাহিত্যের অগ্নিময় প্রভাবই লোকের চিত্তকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। সাহিত্যের এমনি উন্মাদিনী শক্তি যে মিসেস ষ্টোর “অঙ্কল টমস ক্যাবিন” নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থ কামানের রঞ্জুদ্ঘরে অগ্নিসংযোগের ন্যায় বিদ্রোহাগ্নি জ্বালাইয়া তুলিল ; সমগ্র জাতিকে মহা উদ্দীপনার মধ্যে নিক্ষেপ করিল।

দূরেই বা যাই কেন, আমাদের স্মৃতিকালের মধ্যে এই বঙ্গদেশে জাতীয় সাহিত্যের সাহায্যে মহা উদ্দীপনার অবতারণা আমরা দেখিয়াছি। বঙ্গদেশে ইংরাজ নীলকরগণ কি অত্যাচার করিত, তাহা দেশের লোক এখন ভুলিয়া গিয়াছে। এখনও হতভাগ্য বেহার প্রদেশের উত্তর খণ্ডে সেই অত্যাচারের কিছু কিছু অবশিষ্ট রহিয়াছে। এককালে বঙ্গদেশের নদীয়া যশোহর প্রভৃতি স্থানের কত ধনী, কত গৃহস্থ যে নীলকরের অত্যাচারে ধনে প্রাণে সারা হইয়াছেন তাহা বলা যায় না। যত দিন বাঙ্গালির হস্তে সংবাদ পত্র ছিল না তত দিন প্রজাগণ নীরবে এই সকল অত্যাচার সহিয়াছিল। যখন সুপ্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় হিন্দু পেট্রিয়টে লেখনী ধারণ করিলেন, তখন নীলকরগণের দুর্গে গোলাগুলি বর্ষণ হইতে আরম্ভ হইল। প্রথমে লোকে ভাবিয়াছিল সে দুর্গ দুর্ভেদ্য ; একে নীলকর ইংরাজ, তাহাতে জেলার মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি ও গবর্ণমেণ্ট তাহার সহায়, কতিপয় শিক্ষিত বাঙ্গালি কেউ কেউ করিয়া কি করিবে ? কিন্তু এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তানের আঘাতে সে পাপের দুর্গ কাঁপিয়া উঠিল। হরিশের তীব্র লেখনীর আঘাতে গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত অস্থির হইলেন।

যখন মানুষের মন এইরূপে উত্তেজিত, তখন দীনবন্ধু মিত্রের সুপ্রসিদ্ধ নীলদর্পণ নাটক প্রকাশিত হইল। নাটকখানি বঙ্গ সমাজে কি মহা উদ্দীপনার আবির্ভাব করিয়াছিল তাহা আমরা কখনও ভুলিব না। আবাল বৃদ্ধ বনিতা আমরা সকলেই ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিলাম। ঘরে ঘরে সেই কথা, বাসাতে বাসাতে তাহার অভিনয়। ঐ গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া পাদরী লঙ্ কারাগারে গেলেন ; কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় তাঁহার হইয়া তাঁহার জরিমানার টাকা দিলেন। ভূমিকম্পের ন্যায় বঙ্গদেশের সীমা হইতে সীমান্ত পর্য্যন্ত কাঁপিয়া যাইতে লাগিল ! এই মহা উদ্দীপনার ফলস্বরূপ নীলকরের অত্যাচার জন্মের মত বঙ্গদেশ হইতে বিদায় হইল।

কিন্তু একটা কথা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে, জাতীয় সাহিত্য জাতীয় উদ্দীপনার পরিপোষক ও পরিচালক মাত্র, উদ্দীপনার সৃষ্টি বিশ্বাসী, ব্যাকুল, একাগ্র ও উত্তেজনাময় মানবচরিত্রের সংস্পর্শেই ঘটিয়া থাকে। বিশ্বাসী, ব্যাকুল, একাগ্র ও উত্তেজনাময় মানবচরিত্র কিরূপ তাহা যাঁহারা দেখিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে গ্যারিসন, থিওডোর পার্কার প্রভৃতির দাসপ্রথা সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। যে প্রবল উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া কাপ্তেন জন ব্রাউন বহ্নিমুখে শলভের ন্যায় প্রজ্জলিত বিদ্রোহাগ্নির ভিতর গিয়া পড়িলেন, সে উত্তেজনা যে জাতীয় সাহিত্যে অগ্নি উদ্গীরণ করিয়াছিল, তাহা কিছুই বিচিত্র নহে। ইহাও সত্য যে হরিশের অগ্নিময় সংস্পর্শ ব্যতীত বঙ্গদেশে নীলকর সম্বন্ধীয় আন্দোলন জাগিত না।

আমরা যদি চিন্তা করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিতে পাই, যে আমাদের হৃদয়কে একাগ্র ও উত্তেজনাময় করিতে পারে এমন কারণ ও সুযোগ হস্তের নিকটেই আছে। আমাদের বর্ত্তমান রাজপুরুষগণ এক বিষয়ে বিশেষ অপটুতা প্রদর্শন করিয়াছেন। দেড় শত বৎসরের অধিক কাল হইল তাঁহারা ভারতসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহারা প্রজাদিগের প্রেমকে আকর্ষণ করিতে পারিলেন না। বরং একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে জেতা ও বিজিত এই উভয় শ্রেণীর লোক বৎসরের পর বৎসর পরস্পর হইতে দূরাৎ সুদূরে যাইতেছেন। দেশীয়-গণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আত্মসম্মান বোধ জাগ্রত হওয়াতে এদেশীয় ভদ্র লোকে রাজপুরুষদের ব্যবহারে আর তাঁহাদের ছায়া মাড়াইতে চাহিতেছেন না। একদিকে যেমন তাঁহাদের দাম্ভিকতা, অপরদিকে তেমনি শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের আত্ম-সম্মান রক্ষার প্রয়াস, এই দুইটী এই উভয় দলের মধ্যে দিন দিন বিচ্ছেদ বৃদ্ধি করিতেছে। আমাদের কি ঘরে আত্মীয় স্বজন নাই? করিবার ও ভাবিবার কাজ নাই? কেন আমরা বিশেষ কারণ ব্যতীত তাঁহাদের অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইতে যাইব? সুতরাং ফল এই দাঁড়াইতেছে যে, একদিকে দেশের শাসনকর্ত্তাগণ এদেশের লোকের সুখ দুঃখ, রুচি, প্রবৃত্তি, প্রভৃতি বিষয়ে অজ্ঞ থাকিতেছেন, অপরদিকে যাহারা তাঁহাদের দ্বারস্থ হইতেছে, তাহারা স্বার্থ সাধনের মানসেই যাইতেছে। তাহাদিগকে দেখিয়া রাজপুরুষদিগের অশ্রদ্ধা আরও বাড়ি-তেছে। ইহার ফল চরমে কি দাঁড়াইবে, তাহা বলা যায় না। এই মাত্র বলা যায়, যে রাজা প্রজা কাহারো পক্ষে তাহা সুখকর হইবে না।

সে যাহা হউক, এই যে রাজা প্রজাতে একটা বিদ্বেষ চলিতেছে, ইহা এক হিসাবে জাতীয় শক্তি, চরিত্র ও জাতীয় সাহিত্যের বিকাশের পক্ষে অনুকূল। রাজারা যেন বলিতে-ছেন, আমরা তোমাদের সামাজিক জীবনের ক্ষেত্র ছাড়িয়া দূরে দাঁড়াইতেছি, তোমরা কি করিতে পার কর। কেবল তাহা নহে, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, সভা সমিতি প্রভৃতি করিবার স্বাধীনতা দিয়া, যাতায়াত ও ডাকের সুবিধা করিয়া, আমাদিগকে আত্মোন্নতিবিধানে যেন উৎসাহ দিতেছেন। এখন যদি আমরা জাতীয় উন্নতি বিধানে অপারগ হই, তবে আর একথা বলিতে পারিব না যে কেহ আমাদের পথ অবরোধ করিয়াছে। তখন রাজারা বলিতে পারিবেন, দেখ তোমরা যে অপদার্থ তাহার প্রমাণ এই, আমরা সম্পূর্ণ দূরে রহিয়াছি ও সকল সুবিধা করিয়া দিয়াছি, তথাপি তোমরা কিছু করিতে পারিলে না। এখন বুঝ যে তোমা-দের মধ্যে এই অপদার্থতা আছে বলিয়াই আমরা এখানে আসিতে পারিয়াছি ও আমাদের আসা আবশ্যক হইয়াছে। এদেশীয়গণ ইহার উত্তর কি দিবেন? আমিত ইহার উত্তর খুঁজিয়া পাই না।

এখন প্রশ্ন এই, আমরা নিজেরা কি করিতে পারি? তদুত্তরে প্রশ্ন করি, যাহাদের দেশের সকল দিকেই অভাব, সকল বিষয়েই অভাব, তাহাদের আবার করিবার কাজের অপ্রতুল কি? আমরা যদি প্রত্যেকে অকপট-চিত্ত মানুষের ন্যায় এক একটা অভাব দূর করিবার জন্য লাগি, তাহাতে মন প্রাণ নিয়োগ করি, তাহা হইলে সাহিত্য আপনাপনি জীবন্ত, সবল ও তেজোময় হইয়া উঠে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা বঙ্গ সাহিত্যের তিন জন নেতার নাম করিতে পারি। প্রথম ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বিতীয় অক্ষয় কুমার দত্ত, তৃতীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। আমরা এই তিনজনের সাহিত্য পাঠ করিয়াছি এবং এই তিনজন মানুষকেও দেখিয়াছি। ইঁহাদের প্রণীত সাহিত্যে যে এক প্রকার অপূর্ব্ব আকর্ষণ ছিল, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। পাঠ করিয়া যে কেবল আমরা প্রীতিলাভ করিতাম তাহা নহে, কিন্তু প্রাণে কিছু পাইতাম, হৃদয়ে কিছু জাগিত, চরিত্রে কিছু বাড়িত। সাহিত্যের কাজ কি কেবল রঙ্গভূমির কাজের ন্যায় কেবল লোকচিত্ত রঞ্জন করা? ইহার কাজ কি কেবল ভাঁড়ের ভাঁড়ামির ন্যায় অট্টহাস্যের উদ্দীপন করা? অথবা ইহা কি কেবল চিত্রকরের সুচিত্রের ন্যায় সৌন্দর্য্য-রসে মানব-মনকে নিমগ্ন করা? সাহিত্যেরও যে একটা কলার দিক আছে, সৌন্দর্য্যের দিক আছে, তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু তাহা আনুষঙ্গিক মাত্র। ইহার প্রধান কাজ হৃদয় হইতে হৃদয়ে ভাবের সঞ্চালনা। যে স্থলে হৃদয়ের ভাবের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, ভাবপ্রকাশকের দিকে অধিক দৃষ্টি পড়ে, সেইখানেই সাহিত্য ভাবুকতা দোষে দুষ্ট হইয়া অরুচিকর ও অস্পৃশ্য হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বোক্ত তিনজন লেখকের প্রণীত সাহিত্যে যে মনো-

মুগ্ধকারিণী শক্তি ছিল, তাহার কারণ এই লোকচিত্ত-রঞ্জন তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু অকপটে যাহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন ও স্বীয় স্বীয় হৃদয়ে অনুভব করিতেন, তাহা হৃদয়ান্তরে সংক্রান্ত করিবার ইচ্ছা ছিল। তাঁহাদের প্রণীত সাহিত্য পাঠ করিলে সেই তাজা তাজা ভাবগুলি হৃদয়ে আসিয়া লাগিত। তাই বলি, অগ্রে মানুষ তৎপরে সাহিত্য।

আমরা যদি অকপটচিত্তে আত্মোন্নতি ও স্বদেশের উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করি, তাহা হইলে সাহিত্য আপনি গড়িয়া উঠিবে। দীনেশ চন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও বঙ্গ সাহি-ত্যের ইতিবৃত্তখানি এরূপ সর্ব্বজনপ্রশংসিত গ্রন্থ কেন? এই একজন মানুষ, যিনি অকপটে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, একবার দেখিব আমাদের জাতীয় সাহিত্যে কি ছিল। তিনি যথার্থই সাহিত্যের মর্ম্মগ্রাহী। এই একখানি গ্রন্থ, যাহার জন্য আমরা গৌরব করিতে পারি, যাহা অপর জাতিরা অনু-বাদ করিয়া কিছু নূতন শিখিতে পারে। গ্রন্থের প্রণেতা মানুষটীকে দেখি নাই, তাঁহার সঙ্গে পরিচয় নাই, কিন্তু তাঁহার অকপট স্বজাতি-প্রেম স্বতঃই হৃদয়ের প্রীতি শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন এই, ইনি যেমন এক বিভাগে বহু শ্রম করিয়া, অকপটে শ্রম করিয়া, রত্ন উদ্ধার করিয়া-ছেন, তেমনি অপরাপর বিভাগে অকপটে কাজ করিবার কি অবসর নাই? কেন থাকিবে না, দেখিলেই আছে।

অগ্রে জাতীয় জীবন পরে জাতীয় সাহিত্য। যেমন সরোবরের জল বাড়িলেই তাহা বাঁধ উল্লঙ্ঘন করিয়া উছলিয়া পড়ে, তেমনি জাতীয় জীবনের পূর্ণতা হইতেই জাতীয় সাহিত্যের বিকাশ হয়। কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে পথে ঘাটে হাটে বাজারে শাক্ত বৈষ্ণবের বিবাদ চলিত, ধর্ম্মবিশ্বাসে শত শত হৃদয় আলোড়িত হইত, এই জন্যই জাতীয় সাহিত্যে শাক্ত ও বৈষ্ণব ভাবের বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল। যে সাহিত্যের জাতীয় জীবনের সহিত সংস্রব নাই, যে ভাবো-চ্ছ্বাস জীবন্ত মানব হৃদয় হইতে উঠিতেছে না অথচ সাহিত্যে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা অহিফেণ-সেবীর জাগ্রৎস্বপ্নের ন্যায়, ছিন্ন কন্থায় পড়িয়া লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখা মাত্র।

যেমন পুত্তিকাদের বল্মীক শত শত পুত্তিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রমের দ্বারা নির্ম্মিত হয়, তেমনি জাতীয় জীবনের পূর্ণতা শত শত অকপট হৃদয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেষ্টার দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। যে অভাব বোধ শত শত হৃদয়ে বাস করে, শত শত ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে কার্য্যে নিযুক্ত রাখে, তাহাই শুভ-লগ্নে ঘনীভূত আকারে প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের হৃদয়ে মহা ঝটিকার আবেগ ধারণ করে। তখনই জাতীয় উদ্দীপনার আবির্ভাব হয়। যে জন্য তুমি আমি দেখা হইলেই হায় হায় করি, তাহাই ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়ে একটা বাতিকের মত হইয়া দাঁড়ায়, আর চিত্তের একাগ্রতা উৎপন্ন করে।

সমুদয় একাগ্র লোক অল্পাধিক বাতিকগ্রস্ত। তাঁহাদের হৃদগতভাব তাঁহাদিগকে জিনিয়া বসে; সমগ্র হৃদয়কে অধিকার করিয়া অপর সকল ভাব ও চিন্তাকে বিদূরিত করে। জগতের লোক বলে ইহারা একদেশদর্শী, উৎকেন্দ্র, একঘেয়ে, সৃষ্টিছাড়া ইত্যাদি ইত্যাদি। জগতের সমা-লোচনাতে কি করে, জগৎকে জাগাইবার জন্য এই সকল অর্দ্ধ বাতুল মানুষের প্রয়োজন; যাঁহারা বলেন;—"এটা করিতেই হইবে, এটা যদি না কর তোমাদের পরিত্রাণ নাই।"

সকল দিক দেখিয়া, সকল দিক বাঁচাইয়া, স্বার্থটি আগুলিয়া, তুমি আমি, রাম শ্যাম, সকলেইত কাজ করি-তেছি, এরূপ বিজ্ঞতা জগতে অনেক আছে, এবং প্রচার না করিলেও থাকিবে, সুতরাং তাহার প্রচারের প্রয়োজন নাই। দেখিতে চাই, সেই অর্দ্ধবাতুলতা, যাহা আকাঙ্ক্ষা বিশেষের আবেশে মনকে আকুল করে, স্বার্থচিন্তাকে অপসারিত করে, অদম্য সংকল্প ও অপরাজেয় অধ্যবসায়কে উৎপন্ন করে, এবং ভাষা, কার্য্য সমুদয়কে অগ্নিময় করিয়া ফেলে। এইরূপ চরিত্র ও হৃদয়ের সংস্পর্শেই জাতীয় উদ্দীপনার আবির্ভাব হয়।

উদ্দীপনা যখন হৃদয়ে জাগে, ভাষা তখন তাহার দূতী স্বরূপ হয়। ভাষা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, টুটিয়া ফুটিয়া, গড়িয়া পিটিয়া নূতন হইয়া দাঁড়ায়। দয়ানন্দ সরস্বতী বাবা নানককে দম্ভী বলিয়াছেন; অপরাধ এই যে তিনি সংস্কৃত না জানিয়াও তাঁহার গীতাবলীতে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন; অর্থাৎ যেন দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, তিনি সংস্কৃতে বড় পণ্ডিত ছিলেন। দয়ানন্দ সরস্বতী নানককে চিনিতে পারেন নাই। আগ্নেয় গিরির অগ্নুদ্গম ও দ্রব ধাতুরাশি কি হিসাব পত্র করিয়া, নিয়ম শৃঙ্খলা রাখিয়া, বাহির হয়? যে দিকে পথ পায়, সেই দিক দিয়াই প্রবাহিত হয়। সেই-রূপ উদ্দীপনাময় হৃদয়ের ভাবরাশি ব্যাকরণ, পদবিন্যাস, অলঙ্কারাদির নিয়ম, ও পণ্ডিতদিগের রচনা প্রণালীর

অপেক্ষা করিতে পারে না; যে ভাষা হাতের কাছে আসে, যাহাতে মনোভাব কিয়ৎ পরিমাণে ব্যক্ত করে, তাহাকেই অবলম্বন করে। নানক তাহাই করিয়াছিলেন।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাতে উদ্দীপনাময় ও উত্তেজনাময় মানুষের বড়ই প্রয়োজন। পূর্ব্ব প্রস্তাবে বলিয়াছি এদেশে উদ্দীপনার উপাদান প্রস্তুত; অর্থাৎ স্বদেশ প্রেম ও স্বদেশের উন্নতির আশা এই দুই জাগিলে নব উদ্দীপনার অবতার হইতে পারে, এবং সাহিত্য সে বিষয়ে সহায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, স্বদেশ আছে কিন্তু স্বদেশ-প্রেম নাই, স্বদেশের উন্নতি সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে, উন্নতির আশা নাই! আমাদের অন্তরে আশার সঞ্চার যাঁহারা করিতে পারিবেন, তাঁহারাই নবযুগের নব উদ্দীপনার সারথি হইবেন; সাহিত্য তাঁহাদেরই হস্তে যন্ত্র স্বরূপ হইবে।

সাহিত্য যদি আমাদের অন্তরে স্বাবলম্বন প্রবৃত্তি ও স্বাবলম্বনশক্তি জাগাইতে পারে, তবেই ত আমাদিগকে তুলিয়া ধরিবে। ভারতীয় হিন্দুগণের মৌলিকতা যদি আবার আনিয়া দিতে পারে, তবে ভাষাটিও জাতীয় অভ্যুত্থানের সহায় হইবে।

হায় আমাদিগের প্রাচীন মৌলিকতা কে ফিরিয়া দিবে? আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় বিষয় এই, আমরা ভগ্নপদ ব্যক্তির ন্যায় বিদেশীয় জাতির সমক্ষে সাহস পূর্ব্বক সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছি না। প্রত্যেক পদবিক্ষেপেই ইংরাজী যষ্টি কুক্ষিতলে দিয়া পাদচারণা করিতে হইতেছে। আমরা আর নিজেরা একা একা বসিয়া কিছু করিতে পারিতেছি না; সর্ব্ব বিষয়েই প্রবল বিদেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমাদিগকে হটাইয়া দিতেছে। কিন্তু আবার ভাবি, যে জাতি এক সময়ে অপর নিরপেক্ষ হইয়া, সাহিত্য বিজ্ঞান, রাজনীতি সকলেরই বিকাশ করিতে পারিয়াছিল, তাহার সে শক্তি কি একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে? সেই দেশ, সেই মানুষ ত রহিয়াছে; ক্ষিত্যপতেজ পঞ্চভূত রহিয়াছে; চক্ষু, কর্ণাদি পঞ্চেন্দ্রিয় রহিয়াছে; হস্ত পদ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়ও রহিয়াছে, কিসের অভাব হইয়াছে যে জন্য আর কার্য্য করিবার শক্তি নাই? শিক্ষার প্রধান গুণ এই যে, ইহাতে মানুষকে স্বাবলম্বন শক্তি দেয়, মার্জ্জিত বুদ্ধির উদ্ভাবনী শক্তির প্রভাবে নব নব পন্থা আবিষ্কারের ক্ষমতা দেয়। আশা করা গিয়াছিল যে, বর্ত্তমান শিক্ষা তাহা দিবে। কৈ এখনও ত দেয় নাই; পরে যদি দেয়। কোন বিভাগেই আমরা এখনও প্রকৃত মৌলিকত্ব দেখাইতে পারি নাই; অর্থাৎ অন্যান্য জাতিরা লইতে পারে, অনুকরণ করিতে পারে, এমন কিছু করিতে পারি নাই।

রাজনীতি বিদেশীয় রাজাদের হস্তে, সে বিষয়ে কিছু করিবার চেষ্টা করা যেন রাজবাড়ীর লৌহ দ্বারে মুষ্ট্যাঘাত করার ন্যায়; মুষ্টি রক্তাক্ত হয়, অথচ দয়া করিয়া না খুলিলে প্রবেশের উপায় নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া কি মুষ্ট্যাঘাত করিতে হইবে না? হইবে বৈ কি? যে মুষ্ট্যাঘাত করে লোক জানে সে কিছু চায়, একদিন না একদিন দ্বার খুলিতে পারে? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বিদেশীয় রাজাদের লৌহ দ্বারে আঘাত করা ব্যতীত কি আমাদের আর কিছু করিবার নাই? যেখানে তাঁহাদের সঙ্গে সংঘর্ষণ নাই, জাতীয় জীবনের এমন ক্ষেত্র কি পড়িয়া নাই? সাহিত্য কি সেইরূপ ঐ একটা ক্ষেত্র নহে? সমাজ সংস্কার কি সেইরূপ একটা ক্ষেত্র নহে? দেশে শিল্প ও কলাবিদ্যাদির উন্নতি বিধান কি সেইরূপ ক্ষেত্র নহে? লোকে দেখুক আমরা নিজের চেষ্টায়, নিজের ক্ষেত্রে, নিজেরা কিছু করিতেছি, তবেত আমাদিগকে শ্রদ্ধা করিবে; নতুবা যদি দেখে বাঘের পশ্চাতে যেমন ফেউ লাগে, তেমনি রাজাদের পশ্চাতে ফেউ ফেউ করা ভিন্ন, এবং কংগ্রেস সভায় ফাঁকা আওয়াজ করা ভিন্ন, আমাদের কাজ নাই, তবেত ঘৃণার তলেই বাস করিব।

আমাদের দৃষ্টিকে স্বাবলম্বনের দিকে ফিরাইবার জন্য নব উদ্দীপনা ও নব সাহিত্যের প্রয়োজন হইয়াছে। যে বৃক্ষে পাতার বাহার অধিক তাহাতে ফল ধরে না; বর্ত্তমান সাহিত্যের যেন সেই দশা। ভাষার চটক, অলঙ্কারের ছটা, পদাবলীর নৃত্য, সকলি অতি সুন্দর, কিন্তু তাহা রঙ্গভূমির অকুশল নটের ভাষার ছটাময় শোক প্রকাশের ন্যায় শোককে উদ্দীপ্ত না করিয়া হাস্যকেই উদ্দীপ্ত করে। এ সাহিত্যের এ ভাষার চটক যাহা চায় ঠিক তাহার বিপরীতই ঘটে। চায় স্বদেশ প্রেম জাগুক, জাগায় স্বদেশহিতৈষিতায় অরুচি। চায় লোকে পরার্থতৎপর হউক, কাজে হয় অতি স্বার্থপর। এরূপ অসার উচ্ছ্বাসময়, কল্পিত উত্তেজনাময়, ভাষার ভাবে অবসন্ন হইয়া এক এক দিন ভাবি "হে হরি কত দিনে এ সাহিত্যের হস্ত হইতে নিস্তার পাইব।"

সমাজ-সংস্কারক রাস-বিহারী মুখোপাধ্যায়।

৺রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে বাল্য-বিবাহ, জাতিভেদ, বিধবা-বিবাহের রহিতা প্রভৃতি কয়েকটী প্রথাকে 'সামাজিক সমস্যা' বলা যাইতে পারে। তাহাদের প্রত্যেকেরই স্ব-পক্ষে বিপক্ষে দুই চার কথা বলিবার আছে; এমন কি যে বহু-বিবাহ প্রথা ইয়ুরোপীয় সভ্যতা ও নীতি-শাস্ত্রের চক্ষুশূল, আমাদের দেশীয় দুইজন উচ্চ শিক্ষিত পরিণত-বয়স্ক লোক সেই প্রথারও আংশিক সমর্থন করিয়াছেন। *

কিন্তু কৌলীন্য প্রথা নামক যে একটী কুৎসিত রীতি বঙ্গীয় রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কয়েক পুরুষ যাবৎ প্রচলিত আছে, যাহার ফলে পূর্ব্বে রাশি রাশি কুলীন কন্যা আজীবন অবিবাহিতা থাকিয়া 'যম-বরণ' নামে আখ্যাত হইত, বিংশতি, ত্রিংশৎ বা ততোধিক সংখ্যক রমণী একটী ভিক্ষোপজীবী বাস্তু-ভিটা পরিশূন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ করিত, অশীতিপর বৃদ্ধের গলদেশে অপরিচিতবসনা বালিকা বরমাল্য অর্পণ করিত, অথবা বর্ষীয়সী পিতামহীকল্পা স্খলিত-দশনা কামিনী তদীয়া দৌহিত্রপ্রতিম অনুদ্গতজ্ঞানদন্ত বালকের সহিত পরিণীতা হইত, এবং অদ্যাপি যাহার ফলে হিন্দুর গৃহে কদলীতলে ও বাসর ঘরে ইত্যাকার করুণ বীভৎস রসের উচ্ছ্বাস অল্পাধিক পরিমাণে

---

* বঙ্কিম বাবু তাঁহার "কৃষ্ণ চরিত্র" নামক বৃদ্ধ বয়সের গ্রন্থে 'কৃষ্ণের বহু বিবাহ' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"আমিও বিচারে কোথাও পাই নাই যে পুরুষের বহু বিবাহ সকল অবস্থাতেই অধর্ম্ম। ইহা নিশ্চিত যে সচরাচর অকারণে পুরুষের একাধিক বিবাহ অধর্ম্ম। * * * আমার বিশ্বাস আমরা যেমন বিলাতের কাছে অনেক শিখিতে পারি, বিলাতও আমাদের কাছে অনেক শিখিতে পারে। তাহার মধ্যে এই বিবাহ-তত্ত্ব একটা কথা।"

গোপাল চন্দ্র শাস্ত্রী তাঁহার Hindu Law নামক পাণ্ডিত্য-পূর্ণ গ্রন্থে তেমনি তীব্র ভাষায় লিখিয়াছেন:—

"The Hindu Law permits a man to have more wives than one at the same time, although it recommends monogamy as the best form of conjugal life. The Hindu institutions are founded on the requirements of the diversified human nature and condition, and ought not to be lightly interfered with at the instance of persons distinguished by egotistic sentimentalism and spirit of intolerance. * * * It is far better that these men of property that are impelled by inclination should take the responsibility of openly having several wives than that they should secretly contract as many left-handed marriages as they please." Hindu Law. (page 70.)

দেখিতে পাওয়া যায়, সেই কুপ্রথার স্বপক্ষে, সৌভাগ্যক্রমে, কেহই লেখনী ধারণ বা রসনা কণ্ডূয়ন করিতে সাহসী হন নাই। কিন্তু তথাপি ইহা ফল্গুনদীর প্রবাহের ন্যায় আজিও কুলীন সমাজের অন্তস্তলে প্রবাহিত আছে। এদেশের মাটীর এমনই উর্ব্বরা শক্তি যে একবার একটী প্রথা বদ্ধমূল হইতে পারিলে, উচ্চ শিক্ষা বা ন্যায় নিষ্ঠার শত বজ্রপাত ও কুঠারা-ঘাতেও তাহাকে বিনষ্ট করা যায় না। আজিও ঢাকা, ফরিদপুর ও যশোহর প্রভৃতি জেলার কুলীনপ্রধান গ্রামে অনূঢ়া, প্রৌঢ়া ও স্বামি-পরিত্যক্তা সপত্নীবর্গ দলে দলে বিচরণ করিতেছে, দেখা যায়।

এই ঘৃণিত নির্ম্মম জঘন্য কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে সর্ব্ব প্রথম রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় নামক একটী বিক্রমপুর নিবাসী ভদ্রলোক দণ্ডায়মান হন। সকল দিক দেখিতে গেলে ইঁহাকে "পূর্ব্ব বঙ্গের বিদ্যাসাগর" বলিলে বলা যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় সমগ্র ভারতের বিধবার দুঃখে কাঁদিয়াছিলেন। আর ক্ষুদ্র বঙ্গদেশের কুলীন কন্যার দুঃখে ইঁহার হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল। একজন রম-ণীর নিটোল ললাটের বিলুপ্ত সিন্দূর বিন্দুর পুনরুদ্ধার সঙ্কল্পে বদ্ধপরিকর; অপর জন, যে সব ললনার ললাটপট কখনও সিন্দূর রাগে রঞ্জিত হয় নাই এবং হইবার আশাও নাই, তাঁহাদের সীঁথীতে সিন্দূর দিতে ও যাহাদের সীঁথীর সিন্দূর বর্ত্তমান থাকিতেও স্বামীর অবজ্ঞায় নিষ্প্রভ হইয়া আছে, তাহাদের ললাটের অঙ্গরাগ করিতে সচেষ্ট! কিন্তু শেষো-ক্তের পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিলে কোন কোন বিষয়ে তাঁহাকে বিদ্যাসাগর অপেক্ষাও উচ্চতর আসন দিতে ইচ্ছা হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল অনুস্বার বিসর্গের পণ্ডিত ছিলেন না, ইংরাজী ভাষায়ও ব্যুৎপন্ন ছিলেন; বহুসংখ্যক খাঁটী ইংরেজের সহিত ও বিদেশীয় সমাজ তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের গ্রন্থের সহিত তিনি সুপরিচিত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার নয়নে বাল-বিধবার মলিন মুখশ্রী কঙ্করের ন্যায় জ্বালাকর হওয়া ও তাঁহার মনে সমাজসংস্কারের বাসনা উদিত হওয়া একান্ত অস্বাভাবিক বা অভাবিত নহে। কিন্তু রাসবিহারী আদৌ ইংরেজী জানিতেন না, সংস্কৃতও তদ্রূপ; বাঙ্গালাও অতি সামান্য জানিতেন; এরূপ স্থলে তাঁহার মনে একটা দশপুরুষব্যাপী সামাজিক প্রথার সংশোধনের ইচ্ছার উদয় হওয়া অতি আশ্চর্য্যজনক ও বিধা-তার অপার মহিমার পরিচায়ক। তাহার উপরে, বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের পদ-গৌরব ও প্রচুর বৈভব তাঁহার পথটীকে কিয়ৎ পরিমাণে নিষ্কণ্টক করিয়া দিয়াছিল; কিন্তু রাসবিহারী উক্ত দুই বিষয়েই নিতান্ত ভাগ্যহীন ছিলেন; এমন কি, এই সমাজসংস্কারে যোগ দিবার পরে, যখন ইঁহার সামান্য চাকরিটীও হস্তচ্যুত হইল, তখন নিজের পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য ইঁহাকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইয়াছিল! এতদ্ব্যতীত, বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইলে সমাজের কোন শ্রেণীর লোকই প্রত্যক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন না; কিন্তু রাসবিহারীর প্রস্তাবিত কৌলীন্য সংস্কার কার্য্যে পরিণত হইলে বিবাহব্যবসায়ী কুলীন ও চাকরীতে অনভ্যস্ত ঘটকবর্গের রোটিকা অত্যধিক পরিমাণে আহত ও নিহত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং বিধবাবিবাহের প্রচলনপ্রার্থীর বিরুদ্ধে যে স্থলে কেবল লেখনী ও লেহনীর আস্ফালন মাত্র হইয়াছে, কৌলীন্য সংস্কারপ্রার্থীর মস্তকোপরি সে স্থলে লগুড় ও কুঠারের ঘূর্ণন দেখা গিয়াছে। রাসবিহারীর সেই সব দুর্দ্দৈব কাহিনী বর্ণনা করিবার আগে সংক্ষেপে কৌলীন্য প্রথার উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক বোধ করিতেছি; কারণ 'প্রদীপে'র অনেক পাঠক পাঠিকা সে সম্বন্ধে অজ্ঞ ও কুতূহলী থাকিতে পারেন।

এক সময়ে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদিগের ক্রিয়াকর্ম্ম, উপযুক্ত শাস্ত্রজ্ঞ লোকের অভাবে লুপ্ত হওয়ার উপক্রম হইলে আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ জন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ এদেশে আনয়ন করেন। পরে বল্লাল সেন ঐ পঞ্চ বিপ্রের বংশধরদিগকে আচার, বিনয় বিদ্যা প্রভৃতি নয়টী উক্ত লক্ষণ* সমন্বিত দেখিয়া সাধারণ ভাবে কুলীন সংজ্ঞা দিয়া এদেশীয় পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণ হইতে তাঁহাদিগকে পৃথক্ করেন। তৎপরে লক্ষ্মণ সেন এই ব্যাপক কুলীন সংজ্ঞাধারী ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে গুণের তারতম্য অনুসারে শ্রোত্রীয়, বংশজ ও কুলীন (সঙ্কীর্ণার্থে) নামক তিনটী শ্রেণীর সৃষ্টি করেন। যে প্রণালীতে তিনি তাঁহাদের ঐ সকল গুণের পরীক্ষা করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে একটী কৌতুকাবহ গল্প আছে; তাহাতে যৎকিঞ্চিৎ গঞ্জিকার গন্ধ থাকিলেও তৎকালীন রাজাদের বিদূষকবৎসল স্বভাব ও রহস্যপ্রবণ খামখেয়ালীর বিষয় স্মরণ করিলে একেবারে 'প্রক্ষিপ্ত' বা কল্পনাবিজৃম্ভিত বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না। কথিত আছে, একদা রাজা লক্ষ্মণ সেন আদিশূরানীত উক্ত 'কলম্' হইতে উদ্ভূত কুলীন-দিগকে রাজসভায় আহ্বান করেন। তাহাতে কতকগুলি কুলীন রাজানুগ্রহ লাভের উৎকট অগ্রিম উত্তেজনা বশতঃ ব্রাহ্মণোচিত নিত্য ক্রিয়া সমাধা না করিয়াই এক প্রহরের মধ্যে রাজ দরবারে আসিয়া হাজির হন। আর কয়েক জন, ভূদেব ও দেবাদিদেব উভয়ের মনস্তুষ্টি

* আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাশান্তি স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥

সঙ্গত মনে করিয়া অতি ক্ষিপ্রতার সহিত সন্ধ্যাহ্নিকাদি সমাপন করিয়া দেড় প্রহর সময়ে রাজসদনে উপস্থিত হন। অপর কয়েক জন রাজ-কীয় অনুগ্রহ নিগ্রহের দিকে দৃক্পাত না করিয়া যথাবিধি ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করিয়া দ্বিতীয় প্রহরের সময়ে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগ-মন করেন। শ্রীবৎস রাজা যেমন শনি লক্ষ্মীর বিবাদে সরাসরি ভাবে বিচার করিয়াছিলেন, অথবা মুসলমান রাজত্বের সময়ে কাজীরা যেমন সময়ে সময়ে একটী বিশিষ্ট কৌশলের সাহায্যে কোন দুরূহ বিষয়ের মীমাংসা করিতেন; লক্ষ্মণ সেনও সেইরূপ অতি সহজে ব্রাহ্মণদিগের এই গুণ-পরীক্ষাব্যাপার সম্পন্ন করিলেন। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা আড়াই প্রহরের সময়ে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই প্রকৃত নিষ্ঠাবান্ ও উক্ত নবগুণসম্পন্ন স্থির করিয়া তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ কৌলীন্য মর্য্যাদাপন্ন রাখিলেন। যাঁহারা দেড় প্রহরের সময়ে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ক্রিয়াকর্ম্মবিহীন না হইলেও আংশিক পরিমাণে শান্তভাব বর্জ্জিত মনে করিয়া, ও শান্তি লক্ষণটী ব্যতীত অবশিষ্ট অষ্টগুণের অধিকারী বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে 'শ্রোত্রীয়' সংজ্ঞা দিলেন। আর আর যাঁহারা এক প্রহরের মধ্যে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা আচার প্রভৃতি নবগুণ-বর্জ্জিত অথচ সদ্বংশজাত মনে করিয়া, তাঁহাদিগকে 'বংশজ' নামে অভিহিত করিলেন।

ইহার পরে, দেবীবর ঘটক নামে একটী লোক, যিনি তদানীন্তন সমাজে অতিমাত্র প্রতিপত্তিশালী ছিলেন, তিনি, কৌলীন্য লক্ষণ জ্ঞাপক শ্লোকের 'নিষ্ঠাশক্তি' স্থলে 'নিষ্ঠাবৃত্তি' পাঠ বসাইয়া কুলীনদিগের কুল কন্যাগত করিলেন। অর্থাৎ এই সময় হইতে নিয়ম হইল যে কোন কুলীনের বংশ-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে তাঁহার প্রত্যেক কন্যাকে উচ্চ বংশে সম্প্রদান করিতে হইবে। ইহার পূর্ব্বে, কোন কুলীনের মেয়েদের মধ্যে, কাহাকে নামাইয়া, কাহাকে বা উঠাইয়া, বিবাহ দিলেও তাহাতে কুল গৌরবের হানি হইত না।

দেবীবর যদি কেবল ইহা করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, তবে কেহ বড় তাঁহার দোষ দিত না। কারণ তাঁহার প্রবর্ত্তিত এই নূতন নিয়মে কুলীন কন্যাগণের বিবাহ-ক্ষেত্র কতকটা সঙ্কুচিত হইলেও এতটা সঙ্কীর্ণ হইয়াছিল না যে তাহার ফলে এক পুরুষের বহু পত্নীর পাণিগ্রহণ করা, বা কন্যাগুলিকে যাবজ্জীবন অনূঢ়া রাখা অথবা 'স্বজন।' * বয়োজ্যেষ্ঠাকে বিবাহ করা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ তখনও যে কোন কুলীনকুমারের সঙ্গে যে কোন কুলীনকুমারীর বিবাহ হইতে বাধা ছিল না। কিন্তু পরে দেবীবর 'মেলবন্দন' নামক এমন একটী amendment প্রস্তাব করিলেন, যাহা পাশ, হওয়াতে তাঁহার পূর্ব্ব প্রস্তাবিত বিলটী দ্বারা বিবাহ সম্বন্ধীয় পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বদ্বারিকতা রহিত হইয়া গেল।

কোন গ্রামে অনেকগুলি লোক থাকিলে আজকালও যেমন সেই গ্রামের কোন ব্যক্তির কোন দোষ উপলক্ষে একটা দলাদলির সৃষ্টি হয়, এবং হয়ত কতকগুলি লোক সেই অকার্য্যকারীর সঙ্গেই মিলিত হইয়া একটা দলের সৃষ্টি করেন, সেইরূপ কুলীন সন্তানদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে, তাঁহাদের কাহারো কোন একটা দোষকে ভিত্তি করিয়া, দেবী-বরের চেষ্টায় এক একটা দলের সৃষ্টি হইতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ছত্রিশ রকমের দোষ অবলম্বন করিয়া ছত্রিশটী দল উদ্ভূত হইল। এই দলগুলিকেই কুলজী শাস্ত্রে † 'মেল' বলে; যথা ফুলিয়া মেল, খড়দহ মেল, সর্ব্বানন্দী মেল ইত্যাদি। দেবীবরের কৃত 'মেল' শব্দের সংজ্ঞা এই—"দোষাণাং মিলনং মেলঃ।" প্রথমে ইঁহাদের প্রত্যেক দল অপর দলকে জাতিভ্রষ্ট মনে করিয়া, পরস্পরের মধ্যে আহারাদি ও আদান-প্রদান রহিত করেন। কালসহকারে খাওয়ার দলাদলিটা বক্তৃতা-নিপুণা সুরসিকা রসনা দেবীর মধ্যস্থতায় উঠিয়া যায়। কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধীয় দলাদলিট পূর্ণমাত্রাতেই রহিয়াগিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এক মেলের লোক অন্য মেলের মধ্যে বিবাহ করিতে পারে না; সুতরাং বর ও কন্যা সংগ্রহের ক্ষেত্র নিতান্ত অল্প-পরিসর হইয়া পড়িয়াছে।

কালক্রমে ইহাতে আরো জটীলতা প্রবেশ করিয়াছে। কোন কুলীন নিজ মেলেরই যে কোন পাত্রের সহিত নিজ দুহিতার বিবাহ দিতে পারেন না, ঐ মেলের কোন বিশিষ্ট পরিবারের মধ্যে বিবাহ দিতে হইবে, নতুবা কুলগৌরব অক্ষত থাকে না। যথা, ফুলিয়া মেলের সীতারামের সন্তানের সহিত ঐ মেলের কেবল কেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তানের বিবাহ হইতে পারে। ইহাকে "ঘর" বলে। স্বঘরে বিবাহ না দিলে সমাজে নিন্দিত হইতে হয়।

শুদ্ধ ইহাই নহে। বিবাহ-ক্ষেত্রকে সঙ্কীর্ণতর করিবার জন্য আরো কয়েকটী সুবন্দোবস্ত রহিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত কেশব ও সীতারাম হইতে নীচের দিকে গণিলে পাত্র ও পাত্রী যদি একই সংখ্যায় উপস্থিত হয়, তবেই বিবাহ হইতে পারিবে; নতুবা 'বিপর্য্যায়' নামক একটী অপ্রায়শ্চিত্তা দোষ ঘটিবে। সুতরাং পাঠক পাঠিকাগণ দেখিতে পাইতে-ছেন যে, কোন একটী মেয়ের জন্য একটী বর খুঁজিতে হইলে মেল-ঘর-পর্য্যায় নামক কতকগুলি সঙ্কীর্ণ গলি ঘুরিয়া ফিরিয়া শেষে কেমন একটী ক্ষুদ্র প্রদেশে গিয়া উপস্থিত হইতে হয়; এবং যেখানে ভাল বর খুজিতে গিয়া শেষে যে অনেক সময়েই মেয়ের জন্য মর্কট ভিন্ন আর কিছু জোটে না, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে?

৺রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় সর্ব্বপ্রথমে এই মেলভঙ্গ ব্যাপারে কালাপাহাড়ের ন্যায় অবতীর্ণ হন। কালা পাহাড় নিজে হিন্দু হইয়াও শেষে হিন্দুর দেব দেবীর ধ্বংসে প্রবৃত্ত হন; ইনিও নিজে উচ্চ শ্রেণীর কুলীন ও বহু বিবাহ দোষে দুষ্ট হইয়াও এই মেলবন্দন ভাঙ্গিতে আরম্ভ করেন, এবং স্বীয় অভীষ্ট বিষয়ে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। আজ দুই বৎসর হইল ইঁহার মৃত্যু হই-য়াছে। যদি আর দু চারিটী লোক ইঁহার ন্যায় উদ্যোগ,

* রক্তমাংসের সংস্রব যত দূরে রাখিয়া বিবাহ করা যায়, ততই মঙ্গলকর; ইহা বর্ত্তমান সময়ের পাশ্চাত্য চিকিৎসা ব্যবসায়ীদিগেরও মত। সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রে যে স্বগোত্রে বিবাহের নিষেধ আছে, তাহা অতীব শুভকর বলিতে হইবে। কিন্তু কৌলীন্য-প্রথার ফলে, অনেক সময়ে বাধ্য হইয়া স্বগোত্রের দৌহিত্রীকে বিবাহ করিতে হয়। কেহ এইরূপ বিবাহ করিলে, কৌলীন্য-শাস্ত্রের পারিভাষিক সংজ্ঞা অনুসারে বলা হয় যে, "সে স্বজনা-দোষ গ্রহণ করিল"; এবং ঐ রূপে বিবাহিতা রমণীকে বিবাহ-কারীর "স্বজনা" বলা হয়।

† কুলজী শাস্ত্র অর্থাৎ কৌলীন্যশাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থের নাম মিশ্রগ্রন্থ"। উহাতে ঘটকদিগের অবশ্য জ্ঞাতব্য যাবতীয় বিষয় লিপি-বদ্ধ আছে। মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায়, সেকেলে তুলট কাগজের অনেক হস্ত-লিখিত বইই সীসার অক্ষরে উঠিয়াছে। কিন্তু এই প্রয়োজনীয় গ্রন্থটী আজ পর্য্যন্ত, বুঝি 'আত্মারাম' 'সীতারাম' 'রামানন্দ' 'রামজীবন' প্রভৃতি রামনামের গুণে, ছাপাখানার ভূতদিগের হাতে পড়ে নাই।

অধ্যবসায় ও ত্যাগস্বীকার লইয়া এই ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তবে সর্ব্বপ্রকার সংস্কারে সুফল ফলিতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

১২৩২ বঙ্গাব্দে বিক্রমপুরে ৺রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। বাল্যকালে কোন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন নাই; সুতরাং বাঙ্গালা শিক্ষাও ইঁহার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই। অতি শৈশবেই ইনি পিতৃহীন হন; তখন ইঁহার শিক্ষা ও রক্ষার ভার পিতৃব্যের হস্তে অর্পিত হয়। পিতৃব্য মহাশয় স্বীয় দারিদ্র্যক্লেশ নিবারণের কোন সহজতর উপায় না দেখিয়া, অতি অল্পকাল মধ্যেই ইঁহাকে, অর্থের বিনিময়ে আটটী বিবাহ করান। এসব বিবাহ তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইয়াছিল। তিনি তাঁহার আত্মজীবন-চরিতে লিখিয়াছেন, "আমি বাল্যকাল হইতেই বহু বিবাহের বিদ্বেষী ছিলাম; সুতরাং 'সম্বন্ধ' নিয়া ঘটক আসিলেই নানাস্থানে পলাইয়া থাকিতাম। বহুবিবাহে সম্মতি থাকিলে বোধ হয় আমাকে শতাধিক রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে হইত।" ইহার কিয়ৎকাল পরে সুযোগ্য অভিভাবক মহাশয়, ভ্রাতুষ্পুত্রের 'বিবাহে-অরুচি' নামক রোগটিকে দুরারোগ্য মনে করিয়া, প্রায় তিন শত টাকার ঋণভার ইঁহার স্কন্ধে অর্পণ পূর্ব্বক ইঁহাকে পৃথগন্ন করিয়া দিলেন। তখন ঋণ পরিশোধ বা পরিবার প্রতিপালনের জন্য দুই চোখে পথ দেখিতে না পাইয়া, ইনি আরো ছয়টী বিবাহ করেন।* ইহাতে অর্থাভাব কিয়ৎপরিমাণে দূরীভূত হইলে, চাকরি পাইবার অভিলাষে নিজের চেষ্টায় সাধারণরূপ বাঙ্গালা লেখা পড়া শিক্ষা করিলেন। কয়েকদিন পরে ময়মনসিংহ জেলার কোন জমিদারের আশ্রয়ে তহশীলদারী কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন।

বাল্যকাল হইতেই ইঁহার কিছু কিছু বাঙ্গালা কবিতা ও সঙ্গীত রচনার অভ্যাস ছিল। প্রথমতঃ তিনি "রমণী-রমণ" নামক একটী পদ্যগ্রন্থ রচনা করেন এবং প্রাচীনকালের ইংরেজী-সাহিত্যসেবী দরিদ্র কবিদের প্রবর্ত্তিত সেই সনাতন অবার্থ কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক স্বদেশীয় কোন জমীদারের স্তুতিবাদ পুস্তকের শিরোভাগে সংযোজিত করিয়া দেন; তাহাতে ঐ জমীদারের সাহায্যে উহা মুদ্রিত হয়। এতদ্ব্যতীত ইনি 'বিদ্যাবিধি' ও 'শৈশব জ্ঞানচন্দ্রিকা' নামক আরও দুইখানি কবিতা পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। এই দুইখানি বই তদানীন্তন শিক্ষাবিভাগ কর্ত্তৃক যথেষ্ট আদর ও উৎসাহ পাইয়াছিল। এবং এখনও কোন কোন বিদ্যালয়ে পঠিত হইয়া থাকে।

এই সময়ে একদিন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সেই চির-নবীন করুণরসাত্মক "সীতার বনবাস" নামক গ্রন্থ পাঠে উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ সংবরণে অসমর্থ হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন; এবং পাঠ সমাপ্ত হইবা মাত্র উহার সারাংশ অবলম্বন করিয়া "সীতার বনবাস" নামক একখানা কবিতা-পুস্তক রচনা করেন। জানকীর সমবেদনা হইতে বর্ষিত অশ্রুজলে যখন তাঁহার হৃদয় সুষিক্ত ও কোমল ছিল, তখন একদিন সহসা স্বীয় সমাজের কুলীন কন্যাগণের দুঃখ দূর করিবার বাসনা তাঁহার অন্তঃকরণে অঙ্কুরিত হইল। সেই হইতে হিন্দুর ঘরে ঘরে যে সব জনমদুঃখিনী জানকীরা নীরবে নির্জ্জনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে, যেমন করিয়া হউক, তাহাদের দুঃখ মোচন করা তাঁহার জীবনের লক্ষ্য স্বরূপ হইয়া উঠিল।

১২৭৫ সনে "বল্লালী সংশোধিনী" নামে কৌলীন্য সংস্কার সম্বন্ধীয় একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা পুস্তকাকারে মুদ্রিত করেন; কিন্তু এই সংস্কার ব্যাপারে মনোনিবেশ করাতে তাঁহার একমাত্র অবলম্বন তহশীলদারীর কর্ম্মটী পরিত্যাগ করিতে হইল। ঐ পুস্তক রেজিষ্টরী করিবার জন্য যখন ইনি সবরেজিষ্টরী আফিসে উপস্থিত হইলেন, তখন সেখানকার অনেকেই এই পুস্তকের মর্ম্ম অবগত হইয়া, ইঁহাকে ক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করিলেন। কারণ অনেকেই জানিতেন যে, ইনি একজন উচ্চ শ্রেণীর কুলীন এবং বহু বিবাহ নিজের ব্যবসায়। অতঃপর ইনি বিক্রমপুরের প্রধান প্রধান শ্রোত্রীয় ও বংশজ সমাজে উপস্থিত হইয়া উক্ত পুস্তক বিতরণ ও মৌখিক বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলে ইঁহার উপরে অসংস্কৃত অবিমিশ্র তিরস্কার বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। এমন কি জনরব উঠিল যে তাঁহার জ্ঞাতি ও প্রতিপক্ষেরা সুযোগ পাইলে, তাঁহাকে

* রাসবিহারীর প্রথম আট বিবাহ তাঁহার পরাধীন দশায় ও অজ্ঞানাবস্থায় সংঘটিত; সুতরাং সে সম্বন্ধে কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু তাঁহার এই শেষের ছয় বিবাহ সমর্থন করিবার সাহস বা প্রবৃত্তি আমাদের নাই। তবে বিচারকের স্মরণ রাখা উচিত যে, এই সময়ে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে দারিদ্র্যের কষাঘাত হইতেছিল, ও পুরোভাগে বিবাহলভ্য টাকার তোড়া লম্বমান ছিল।

হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। প্রথমে ইঁহাকে লোকে নব্য সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্ম্মহীন অনাচারী ম্লেচ্ছ বলিয়া মনে করিত ও অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভে চেষ্টা পাইত; কিন্তু পরে ইহারই নিষ্ঠাবান্ সাত্ত্বিক আচার ব্যবহার দর্শন করিয়া ও ইঁহার অভিপ্রায় পরিষ্কাররূপে অবগত হইয়া ক্রমেই সামাজিক লোকেরা ইঁহার মতের অনুমোদন করিতে লাগিল।

এই সময়ে ইনি কৌলিন্য-সংস্কারের প্রোগ্রামের ভিতরে কন্যাপণ নিবারণের চেষ্টাটী প্রবিষ্ট করিয়া স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্র আরও পরিসর করিলেন। অতঃপর কন্যাপণ ও বহু বিবাহ নিবারণ মানসে একখানা প্রতিজ্ঞাপত্র প্রণয়ন করিয়া তাহাতে সমাজের প্রতিষ্ঠাশালী লোকদের নাম স্বাক্ষর করাইবার জন্য নানাস্থানে ভ্রমণ, বক্তৃতা দান ও বড় বড় বিবাহসভায় উক্ত বিষয় দুটী সম্বন্ধে বাগবিতণ্ডা উপস্থিত করিতে লাগিলেন। বিরুদ্ধমতাবলম্বী কুলীন ও জীবিকা-নাশ ভীত ঘটকবর্গ তাঁহার বিরুদ্ধে তুমুল কোলাহল উপস্থিত করিল।

অবলার দুঃখে চিরব্যথিত-হৃদয় স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়, নীল-দর্পণের সেই লং সাহেব ও কলিকাতাস্থ "ভারতবর্ষীয় সনাতন-ধর্ম্ম-রক্ষণী সভা" তাঁহার মতের পৃষ্ঠপোষক হইলেন এবং এড়ুকেশন গেজেট, সোমপ্রকাশ হিন্দু-হিতৈষিণী, ঢাকা-প্রকাশ প্রভৃতি সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ তাঁহার স্বপক্ষে খরবেগে লেখনী চালনা করিতে লাগিলেন। অতঃপর বিদ্যাসাগরমহাশয় ও কলিকাতার উক্ত সভার পরামর্শানুসারে গবর্মেণ্ট সমীপে একটী আবেদন করা সঙ্গত বোধ করিয়া, আবেদন পত্রে পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের অনেকগুলি লোকের নাম স্বাক্ষর করা হইল। কিন্তু ঐ সময়ে পাপাত্মা শিয়ার আলী তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরল লর্ড মেয়োর প্রাণ সংহার করাতে সেই দেশব্যাপী বিষাদ ও অবসাদের পরোক্ষফলে ঐ আবেদন পত্র আর গবর্মেণ্ট সমীপে উপস্থিত করা হইল না।

এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে দুই খানা উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশ করিয়া রাসবিহারীর বল বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

অতঃপর ইনি ১২৮২ সনের ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখে 'পর্য্যায়' ভঙ্গ করিয়া স্বীয় কন্যার বিবাহ দিলেন। কুলীন সমাজে ইহাই সর্ব্বপ্রথম 'বিপর্য্যায়' বিবাহ।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে কুৎসিৎ কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে কয়েকটী সঙ্গীত রচনা করেন। সেই গানগুলি অন্ততঃ সাহিত্যের হিসাবেও বঙ্গ ভাষায় চিরদিন সম্মান পাইবার যোগ্য। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদের শ্যামা-সঙ্গীতগুলি যেমন অকপট নির্ভীক ভক্তির উদ্দাম উচ্ছ্বাস ও অভিনব সুরভঙ্গীর জন্য অমর হইয়া আছে, রাসবিহারীর সঙ্গীতগুলিও তাহাদের অন্তর্নিহিত বিষাক্ত বিদ্রূপ ও মৌলিকতার জন্য চিরদিন বঙ্গসাহিত্যে স্থান পাইবে। পূর্ব্ব বঙ্গের অনেক স্থানে সেই গানগুলি এখনও পরমোৎসাহে গীত হইয়া থাকে।

কিন্তু এ সব মৃদু উপায়ে আশানুরূপ ফল না হওয়াতে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া পুনরায় গবর্মেণ্ট সমীপে আবেদন করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। তদনুসারে রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক ঢাকায় উপস্থিত হইলে, তাঁহার সমীপে এক আবেদন-পত্র উপস্থিত করা হয়। ঐ সময়ে বরিশাল জেলা হইতেও আর একটী দরখাস্ত গবর্মেণ্ট সমীপে, রাসবিহারীরই উদ্যোগে প্রেরিত হইল। কিন্তু এই জটিলান্ধকার গোলোক-ধাঁধাঁর মত হিন্দুর সামাজিক ব্যাপার হইতে দূরে থাকা গবর্মেণ্ট নানা কারণে সঙ্গত বোধ করিলেন।

তখন আর রাজদ্বারের ভিখারী হওয়া নিষ্ফল বিবেচনা করিয়া, সামাজিকদিগের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় বক্তৃতা প্রদান ও সঙ্গীত গান করিতে লাগিলেন। কিন্তু মেলভঙ্গ প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য করিতে কাহাকেও অগ্রসর হইতে না দেখিয়া, ১২৮৪ সনের ২২শে শ্রাবণ নিজের পুত্র ও কন্যার বিবাহ ভিন্ন মেলে দিয়া ফেলিলেন। বঙ্গের কৌলীন্য-সংস্কারের ইতিহাসে উহা একটী চিরস্মরণীয় দিন। পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বিবাহে উপস্থিত থাকিবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। এই স্থলে বলিয়া রাখি এই কয়টী বিবাহই ভঙ্গকুলীনের মধ্যে হইয়াছিল।*

* কুলীন দুই প্রকার; নৈকষ্য ও ভঙ্গ। যে সকল কুলীনের কুলমর্য্যাদা ষোল আনায় বজায় আছে, তাহাদিগকে "নৈকষ্য কুলীন"

কিন্তু ইহার অল্প পরেই ১২ জন নৈকষ্য কুলীনও মেল-ভঙ্গ করিয়া আপনাপন কন্যার বিবাহ দিলেন ; এবং ৮ জন শ্রোত্রীয়, চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে কুলীনে কন্যা সম্প্রদান না করিয়া, শ্রোত্রীয়েরই সহিত কার্য্য করিলেন।

ইহার পর রাসবিহারীর জীবদ্দশায় তাঁহার প্রবর্ত্তিত নূতন রীতি অনুযায়ী আরো অনেকগুলি বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু দেশের লোক পরে, কি জানি কি বুঝিয়া, সহসা গুরুতর গম্ভীর সাজিয়া স্ব স্ব কৃতকর্ম্মের জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাসবিহারীর চেষ্টা একেবারে বৃথা যায় নাই; কারণ তাঁহারই পমিশ্রমের ফলে, বর্ত্তমান সময়ে কুলীন সম্প্রদায়ের মধ্যে পর্য্যায়, ঘর (ও কিয়ৎ পরিমাণে মেল) সম্বন্ধীয় বন্ধনগুলি উর্ণনাভের জালবন্ধনের ন্যায় দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে ; চিরাবিবাহিতা বা যৌথ-পরিণীতা রমণীর সংখ্যাও এখন পূর্ব্বের অপেক্ষা অনেক কম।

১৩০১ সনের ২৮শে চৈত্র বাহাত্তর বৎসর বয়সে এই মহাপুরুষের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার এই অনতিহ্রস্ব জীবনের প্রায় অর্দ্ধাংশ তিনি অবলার দুঃখমোচনে ব্যয়িত করিয়া গিয়াছেন। জীবনের শেষভাগে যখন তাঁহার উৎসাহদাতা পৃষ্টপোষকেরা একে একে রণে পৃষ্ঠভঙ্গ হইলেন, যখন ইনি ত্রিংশৎবর্ষব্যাপী নিরুৎসাহময় কঠোর পরিশ্রমের পরে, ঝটিকা নিক্ষিপ্ত ভূলুণ্ঠিত কপোতের ন্যায় লাঞ্ছিত, পীড়িত ও জীবনান্ত অবস্থায় সমাজের এক প্রান্তে পড়িয়া ছিলেন, যখন সেই দুঃসময়ে বুভুক্ষু আত্মীয়বর্গের অন্ন-সংস্থান চেষ্টায় তাম্রকূট-পাত্র-স্থলী ও জীর্ণ যষ্টি করে লইয়া, লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইলেন, তখনো ইনি হতভাগিনী কুলীন কন্যাদের কথা বিস্মৃত হন নাই ; কারণ দেখা গিয়াছে সুযোগ পাইলেই ইনি কক্ষতল হইতে একখণ্ড কীটদষ্ট "বল্লাল-সংশোধিনী" বাহির করিয়া সমবেত লোকদিগকে পড়িয়া শুনাইতেন ; আড়ম্বরশূন্য ক্ষুদ্র বক্তৃতা দ্বারা স্বীয় মতের সমর্থন করিতেন, এবং পরিশেষে স্বরচিত হাস্যরসোদ্দীপক সঙ্গীত ভগ্নকণ্ঠে গান করিয়া "মধুরেণ সমাপয়েৎ" করিতেন। আজো তাঁহার সেই তামাক পাতার পুঁটুলী, কীটদষ্ট-যষ্টি ও ভাঙ্গাগলার কৌতুকাবহ সঙ্গীত অনেকের মনে আছে।

পরিশেষে, তাঁহার রচিত কয়েকটী গান পাঠক পাঠিকা-দিগকে উপহার দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

বলে। এই নৈকষ্য কুলীনই যদি অর্থলোভে বা অন্য যে কোন কারণে বংশজের কন্যা বিবাহ করেন, তবে তিনি "ভঙ্গ-কুলীন" নামে আখ্যাত হন। এতদ্ব্যতীত এই ভঙ্গ-কুলীনের মেয়ে বিবাহ করিলেও নৈকষ্য-কুলীন 'ভঙ্গ' হয়েন। ভঙ্গ-কুলীন অপেক্ষা নৈকষ্য-কুলীনের সম্মান অনেক বেশী। সাত পুরুষ যাবৎ ভঙ্গ-কুলীন বংশজ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন। তখন, পূর্ব্বে যিনি 'বাড়ুজ্যা' ছিলেন, তিনি 'বাড়রী' হয়েন ; এইরূপ 'মুখুজ্যা'র পদ্ধতি 'মুখটী' ও 'চাটুজ্যা'র পদ্ধতি 'চাটাতি'তে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কিন্তু আজকাল, ইংরেজী শিক্ষার উত্তাপে সমাজ-বন্ধন শিথিল হওয়াতে ও অর্থবল বা পদ-গৌরবের প্রাধান্যই সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করাতে এই metamorphosis কার্য্য অনেক সময়েই হইতে দেখা যায় না।

শিশু বরের প্রতি বর্ষীয়সী কন্যার উক্তি।

(কৃষ্ণকান্ত পাঠকের সুর।)

আর আমায় কাজ কি বিয়ের সাজ পরিয়ে বৃদ্ধকালে।
শিশু বরের পাশে, কোন বা রসে ঘোমটা দিব পাকা-
চুলে।
গায়ে দিয়ে নামাবলী, গাই শিব-নামাবলী, নিয়েছি মালার-
থলি হস্তে তুলে।
ভাল ফল্‌লো ফল বল্লালীতে মিল্‌লো বর এক কচমা
ছেলে।
(হায়) লাঠী ভর করিয়ে, এ শিশু বরকে নিয়ে, কেমনে
ঘুরবো আমি কলাতলে।
বল্‌বো বা কি, বল্‌বে বা কি, বল্‌বে বা কি এয়োকুলে॥
আমার এ অন্তঃকালে, ওর শুভদৃষ্টি হ'লে ছেলেটী ডরবে
এ চাঁদ মুখ দেখিলে।
নিযে দুগ্ধের বর, কল্লে ঘর, ডাকবে সে ঠাকুর-মা ব'লে॥

বৃদ্ধ বরের প্রতি বালিকা কন্যার উক্তি।

(ঐ সুর।)

যাইলো সই অই অসুরে বরে হেরে ডরে ম'রে।
দিলে কাশটা সে আকাশটা ফাটে কাঁপে লাঠীর বাঁশটা
ধ'রে।
সাজায়ে পাটকাপড়ে আটকায়ে মুকুট শিরে, বস্‌লে মায়,
দেখিস বরে, নয়ন ভ'রে।
দেখি পাটে সে মাথাটা ঢেকে পাটে বসেছে ঠাট
ক'রে।
মোটকা সব ঘটকা এসে, শুনালে চোটকা ভাষে, বুড়োটা
ঠোঁট কাঁপায়ে হাস্য করে।
আমি অন্তরেতে ডরিলো, তার মন্ত্র কইতে দন্ত নড়ে॥

কুলীন কন্যাগণের বিবাহ দর্শনার্থিনী প্রতিবেশিনীগণের উক্তি।

("গুরু চিন্তা কর মনরে দিনতো বয়ে যায়" গানের সুর।)

আয়লো আমরা কুলীন বাড়ীর বিয়ে সবাই দেখতে যাই।
তোরা এমন বিয়ে দেখিস নাই।
শুনেছিস্ দানসাগর বিয়ে ; ওদের বিয়ের ঘটে তাই॥
নৈলে নিদেন পক্ষে বৃষোৎসর্গ একটী বৎস চা'রটী গাই।
দিবে এক বরেই চা'রটী মেয়ে লোকের মুখে শুনতে পাই।
আহা ওদের কেমন কঠিন হিয়া পিতা মাতার দয়া নাই॥

নিম্নলিখিত গানটী একটী সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিয়াছিলেন।

রাগিণী বসন্ত—তাল যৎ।

বহুদিন পরে এসেছি চিনি না শ্বশুর বাড়ী।
কোন পথে যাইব মাগো বিশ্বনাথ বাড়রীর বাড়ী
যারা ছিল ছেলে পিলে, তাদের হল ছেলে পিলে, বিয়ে
ক'রে গেলেম ফেলে, বয়ে গেল বছর কুড়ি।
বাড়ী ঘর তার নাহি চিনি, কেবল শ্বশুরের নামটী জানি ;
উত্তরেতে বাগানখানি, সুপারী সব সারি সারি॥
দ্বিজ রাসবিহারী বলে, আরত হাসি রাখতে নারি ;
তুমি যারে মা বলিলে সে বটে তোমারি নারি॥

একদা কোন শতাধিক বিবাহকারী কুলীন রাসবিহারীর আনীত প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম স্বাক্ষর করার প্রস্তাব কটুভাষায় প্রত্যাখ্যান করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী রচনা করতঃ সর্ব্বসমক্ষে গান করিয়া কুলীনপ্রবরকে নাকাল করিয়াছিলেন :—

বাউলের সুর—তাল খেমটা।

সুখ ভাল ভাই দেবীবরের ইজারায়।
বল্লালের জমিদারীর তহশীলদারী দেয় আমায়।
(দেখ) চারি কুড়ি ঘর, সতিন প্রজা আছে আমার পরগণায়,
(ভোলা মন মনরে) তাতে মাঠে পথে বাজে লোকে কত
বাজে জমা করে যায়।
(আবার) মফস্বলে কোন আমলা যদিবা মামলা বাঁধায় ;
প্রজার ভাই আসিয়ে, পায় ধরিয়ে, দিয়ে বারবরদারী নিয়ে
যায়॥

রাসবিহারী সম্বন্ধে তাঁহারই জীবদ্দশায় নিম্নলিখিত গানটী বিক্রমপুরের কুলীন কন্যারা দ্বিতীয় বিবাহ ইত্যাদি উপলক্ষে গান করিতেন ; অদ্যাপি সেই লক্ষ্ণৌ ঠুংরী গান অবলা-কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া থাকে।

যদি বেঁচে থাকে মোদের রাসবিহারী,
তবে সুখে রবে কুলীন-কুমারী।
বাড়ী ঘর ত্যজে, সমাজে সমাজে
এ কাজে ও কাজে করে দৌড়াদৌড়ি।
উপবাস রয়ে, উপহাস সয়ে,
উপদেশ দিয়ে ফিরে বাড়ী বাড়ী॥

কিন্তু হায়! কুলীন-কন্যাগণের সে আশা পূর্ণ হইল কৈ?

গম্ভীরা।

গম্ভীরা, মালদহ জেলার সর্ব্ব প্রধান পর্ব্ব। চৈত্র হইতে আষাঢ়ের শেষ পর্য্যন্ত সময়ের যে কোন তিনদিন, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই পর্ব্বের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। প্রথম দিনের পর্ব্বের নাম ছোট গম্ভীরা, দ্বিতীয় দিনের পর্ব্বের নাম বড় গম্ভীরা, তৃতীয় দিনের পর্ব্বের নাম বোলবাই। তিন দিনই শিবপূজা হইয়া থাকে, তবে উহা এই পর্ব্বের প্রধান অঙ্গ নয়, আমোদ প্রমোদই পর্ব্বের প্রধান অঙ্গ। শিবের পূজা হইল কি না হইল, কেহ তাহার দিকে বড় নজর রাখে না, আমোদের স্থান সাজাইতেই সকলের চেষ্টা থাকে, তদর্থে বিস্তর অর্থ ব্যয় করে। যাহার গম্ভীরা (এখানে গম্ভীরা শব্দে গম্ভীরা পর্ব্বের আমোদের স্থান বুঝিতে হইবে) সুন্দররূপে সজ্জিত হয়, তাহার যথেষ্ট প্রশংসা হইয়া থাকে। গম্ভীরাস্থলে বাদ্যকরেরা কতকগুলি ঢাক ঢোল লইয়া নিরন্তর উপস্থিত থাকে। গম্ভীরায়, সাজাইবার ব্যয়, বাদ্যকরের ব্যয়, আলোক দেওয়ার ব্যয় এবং তামাক দেওয়ার ব্যয় ভিন্ন অন্য ব্যয় নাই। হিন্দুর প্রায় সমুদায় পর্ব্বেই লোকজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান হইয়া থাকে, কিন্তু গম্ভীরায় তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিয়া গম্ভীরাস্থলে আনয়ন করিতে হয় না। নিজের পয়সা খরচ করিয়া, চূণ কালী মাখিয়া, লোকে গম্ভীরায় আসিয়া নৃত্য করে। বঙ্গের অন্য ভাগে যেমন দুর্গোৎসবে লোকে নূতন বস্ত্র, নূতন পাদুকা, নূতন ছত্র

ক্রয় করে ও কন্যা পিত্রালয়ে আনীত হন, মালদহ জেলায় গম্ভীরার সময় সেইরূপ হয়।

ছোট তামাসা ও বড় তামাসার দিনে রাত্রিকালে গম্ভীরাস্থলে অত্যন্ত জনতা হয়। বহুসংখ্যক নৃত্যকারী আসিয়া গম্ভীরাস্থলে নাচিয়া থাকে। বড় তামাসার দিনে সকলে সকল গম্ভীরায় নাচিবার অবকাশ পায় না, অনেকে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া ঘরে ফিরিয়া যায়। আবালবৃদ্ধ সকলেই নাচিতে পারে, তাহাতে অপমান বা দোষ বোধ করে না। কঠিন রোগে পড়িয়া অনেকে প্রার্থনা করে যে, মহাদেব! এবার রোগ মুক্ত হইতে পারিলে তোমার সম্মুখে নৃত্য করিব। প্রসূতি, সন্তানের আরোগ্য কামনায় করযোড়ে প্রার্থনা করেন, বাবা! (মহাদেবকে অনেকে বাবা বলিয়া থাকে) আমার সন্তান আরোগ্যলাভ করিলে, বড় তামাসার দিন তোমার সম্মুখে তাহাকে নাচাইব। বড় তামাসার দিন দেখা যায় যে, অনেকে তাহাদের শিশু সন্তানকে প্রতিমার চালের ন্যায় চালের ভিতর বসাইয়া নাচাইতেছেন। গম্ভীরার প্রথম দুই দিন ঢাকের বাদ্যে কর্ণ বধির হইয়া যায়, কিন্তু এই বীর বাদ্যের ভিতর এমন এক মাদকতা আছে যে, যাহার প্রভাবে মালদহের প্রকৃত অধিবাসীদের হৃদয় উন্মাদিত হইয়া উঠে এবং নৃত্যের জন্য পদদ্বয় তাল ধরিতে থাকে। গম্ভীরার নৃত্য ও বাদ্য বিস্ময়কর পদার্থ! না শিখিলে হয় না। যথেচ্ছ নৃত্য ও বাদ্যে তদ্রসে রসিক লোকদের বিরক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। নৃত্যের সঙ্গে ভাল করিয়া ঢাক বাজাইতে পারিলে, ঢাকী কখন কখন নৃত্যকারীর নিকট বক্‌সিস্ পাইয়া থাকে। আমরা দেখিয়াছি, একবার বড় তামাসার দিন একটী বালক নাচিতেছিল। ঢাকী বলিল, বালক নাচিতে শিখে নাই। বালকের পিতা বলিল, বালক সুন্দর নাচিয়াছে তুই ঢাক বাজাইতে পারিস্ নাই। উভয়ের বিলক্ষণ বচসা হইল, বালকের পিতা বলিল, আমি নাচিতেছি, তুই কেমন ঢাকী আছিস্, আমার নাচের সঙ্গে তাল দেত। এই বলিয়া উদ্দণ্ডতাণ্ডব আরম্ভ করিল, ঢাকী ত রুদ্রতাল বাজাইতে লাগিল। রঙ্গভূমি, কম্পিত হইয়া উঠিল। অনেক বলা কহার পর উভয়ের বিবাদ থামিয়া গেল। একবার একটী বালক ভাল নাচিতে পারে নাই শুনিয়া তাহার পিতা বলিয়াছিল, উহার হইবে কি? সারাদিন হাতে পুঁথি লইয়া বসে, ওরূপ করিলে কি মনুষ্যত্ব থাকে? এক বৃদ্ধের একমাত্র পুত্র যে দিন কালগ্রাসে পতিত হয়, সে দিন বড় তামাসা ছিল। বৃদ্ধ, পুত্রসৎকার সত্বরতার সহ সম্পাদন করিয়া, গম্ভীরায় আসিয়া নৃত্য করিয়াছিল! গম্ভীরা যে মালদহ বাসিগণের পক্ষে কিরূপ প্রিয় ব্যাপার, তাহা এই ঘটনাতেই বুঝিতে পারা যায়।

গম্ভীরার সময় এখানকার ভাস্করেরা কালী, দুর্গা, চামুণ্ডা, বাসুলি, নরসিংহ, ভূত, বাঘ, ভালুক প্রভৃতির মুখ নির্ম্মাণ করিয়া বিক্রয় করে। এই সকল মুখের নাসিকা ও চোখে ছিদ্র থাকে। নৃত্যকারী এই সকল মুখ নিজ মুখে লাগাইয়া নৃত্য করে। এই সকল নৃত্য অতি কঠিন ও ইহাতে বিলক্ষণ পরিশ্রম হয়। নরসিংহের নৃত্যের ভয়ানকত্ব না দেখিলে অনুভব করা যায় না। বাসুলি ও মশান নাচকে এদেশের লোকে অত্যন্ত সম্মানের চক্ষে দেখে। নৃত্য করিতে করিতে, নৃত্যকারী কখন কখন জীবিত কপোতের কণ্ঠচ্ছেদ করিয়া তদ্রক্তে আপনার পরিহিত [illegible] রঞ্জিত করে। দুই গম্ভীরা নিকটবর্ত্তী হইলে বাসুলি ও মশানকে বাজাইতে বাজাইতে অন্য গম্ভীরায় পৌঁছিয়া দিতে হয়। বাসুলি ও মশান নাচিতে নাচিতে এক গম্ভীরা হইতে অন্য গম্ভীরায় চলিয়া যায়। একজন ইতর লোককে কেহ বলিয়াছিল, "মোড়ল! তুই মরিয়া এইবার মশান হইবি।" মোড়ল আপনার অযোগ্যতা খ্যাপনার্থ বলিয়াছিল, "মুই আবার মশান হইমু, একটা কেষ্ট বিষ্টু হইমু না"। মোড়লের বিশ্বাস, মশানের উপর দেবতা নাই, কৃষ্ণ বিষ্ণু মশানের অনেক নিম্নে। রাত্রিকালে কোন অপচ্ছায়া ভ্রান্তি জন্মিলে, লোকে বলিয়া থাকে, উহা মশানের [illegible] অর্থাৎ খেলা।

প্রত্যেক নৃত্যের পৃথক্ পৃথক্ বাজনা আছে। অনেকে দূর হইতে বাজনা শুনিয়া বলিতে পারেন যে, কোন্ নৃত্য হইতেছে। নৃত্যের সংখ্যা নাই। কঠিন নৃত্য ব্যতীত অসংখ্য সামান্য নৃত্য আছে। সে সকল নৃত্যের [illegible] সাধারণ। অনেকে কল্পিত বিষয় অবলম্বন করিয়া সজ্জিত হইয়া নৃত্য করে। অশিক্ষিত সাধারণ লোকে, [illegible] বিশেষকে বা প্রাকৃতিক কোন কোন ঘটনাকে আকৃতি প্রদান করিয়া লোকের নিকট উপস্থাপিত করে। [illegible] বৎসর একজন ভূমিকম্প সাজিয়াছিল। একজন ভূমিকম্পের গলায় দড়ি বান্ধিয়া আনিয়া বলিল, "উহাকে স্বর্গে বা মর্ত্ত্যে খুঁজিয়া পাই নাই। পাতালপুর হইতে ধরিয়া আনিয়াছি।" চারিদিক্ হইতে ইতর লোকে মার মার করিয়া উঠিলে ভূমিকম্প প্রাণ ভয়ে পলাইয়া গেল। কেহ কেহ ভূমিকম্পের প্রতি বাস্তবিকই রাগিয়াছিল। নকলের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিতে দেখিলে হাস্য সংবরণ করা যায় না। এরূপ ঘটনা অসম্ভব নহে। একবার এক স্থানে রামবনবাস যাত্রা হইতেছিল। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মন্থরাকে দেখিবামাত্র, 'মার হারামজাদীকে' বলিয়া ধাবিত হইয়াছিলেন। তিনি যে যাত্রা শুনিতেছিলেন, তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। গতবার একজন প্লেগ সাজিয়াছিল। প্লেগ যেমন ভয়ঙ্কর পদার্থ, তাহার মূর্ত্তিকে তদনুরূপ ভয়ঙ্কর করিয়াছিল। বাঘ, ভালুক, শিয়াল, কুকুর, ভূত, প্রেত, সাহেব, কেরাণী প্রভৃতির নানা সাজে সজ্জিত হইয়া লোকে নাচিয়া থাকে। কেহ কেহ বা না নাচিয়া দর্শন দিয়া চলিয়া যায়। এ সকল নীরব কবি অনেকের মনে নানা কথা জাগাইয়া দিয়া যায়। আইনের শাসনকে ভয় করাত চাই? মুসলমানদের মধ্যেও অনেকে আসিয়া নাচিয়া থাকে। তবে তাহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিতেছে। মুসলমান সমাজ, দেবমূর্ত্তির সম্মুখে নৃত্য করাকে কাফেরি মনে করেন।

মুসলমানদের মহরম, বৎসরের সকল ঋতুতেই হইতে পারে। গম্ভীরার সময় মহরম উপস্থিত হইলে হিন্দু মুসলমানে বিবাদ উপস্থিত হয়। ঢাক ও শঙ্খের বাদ্য শুনিলে পীরগণ নাকি অসন্তুষ্ট হন, তাই মুসলমানেরা ঢাক ও শঙ্খবাদ্যে আপত্তি করিয়া থাকেন, এ দিকে ঢাক না বাজাইলে গম্ভীরা হয় না। হিন্দুজাতির স্বভাবসিদ্ধ সহিষ্ণুতাবশতঃ বিবাদ বর্দ্ধিত হইতে পায় না। কোন কারণে গম্ভীরার ব্যাঘাত হইলে লোকের দুঃখের পরিসীমা থাকে না। একবার মোকদমপুরের (মালদহ নগরের দক্ষিণাংশের নাম মোকদমপুর) গম্ভীরার বড় তামাসার রাত্রি দশটার সময়, মালদহের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট শার্প সাহেব ঢাক বাজাইতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। তখন গম্ভীরা দেখিবার ও গম্ভীরায় নাচিবার জন্য বহুস্থান হইতে অসংখ্য লোকের সমাগম হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের এই আদেশ শুনিয়া লোকসাধারণ এতদূর উত্তেজিত হইয়াছিল যে, কতকগুলি ভদ্রলোক মধ্যে না পড়িলে তাহারা পোলিসের সঙ্গে দাঙ্গা করিতে পশ্চাৎপদ হইত না। সহরের গম্ভীরায় মধ্যে মধ্যে এইরূপ গোলযোগের আশঙ্কা হইয়া থাকে। সাহেবেরা নূতন লোক, লোকের মনোবৃত্তি বিষয়ে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা থাকে না। সমীপবর্ত্তী আমলাকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হয় যে, ইহা অসভ্যের আমোদ, বন্ধ করিলে কোন ক্ষতি নাই। সাহেবের ইচ্ছা হইল, তিনি কালীমূর্ত্তির ফটো লইবেন; আমলার মুখে শুনিলেন, মণ্ডপ হইতে কালীমূর্ত্তি কুঠিতে আনিলে হিন্দুর কোন আপত্তি হইবে না, সাহেব তাহাই করিলেন! গম্ভীরা অসভ্যের আমোদ, এই বলিয়া তাহা বন্ধ করিতে পরামর্শ দেওয়ার অধিকার কাহারও নাই। গম্ভীরার সময় ঝড় বৃষ্টিতে বিঘ্ন ঘটাইলে লোকে বড়ই ব্যথিত হয়। এক গম্ভীরায় নাচিতে না পারিলে অন্য গম্ভীরায় নাচিয়া মনের ক্ষোভ নিবারণ করে।

গম্ভীরার তৃতীয় দিনের শেষ বেলায় আরব্ধ হইয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গান হইয়া থাকে। এই গানকে বোলবাই বলে। এই গানের স্বর ও তাল নানা প্রকার। যাহারা গান করিতে আইসে, তাহারা প্রথমেই শিবের বন্দনা করিয়া থাকে। বন্দনায় শিবের মহিমা বর্ণিত হয় বা নিজের দুঃখ কাহিনী কথিত হয়। কেহ বলে, "ওহে বুড়াশিব! তুমি বলদের উপর চড়িয়া বছর বছর আলোচাল কলা খাইতে আসিয়া থাক, এবার আমাদের পলু হয় নাই, আমরা তোমার পূজা করিতে পারিব না।" কেহ বলে "শিব! এবার আকালে (দুর্ভিক্ষে) প্রাণ যায়. গাঁজা খাইয়া তোমার বুদ্ধিলোপ পাইয়াছে। আমাদের কথা তোমার ভাবনায় আসে না।" কেহ বলে, "শিব হে তুমি কোন্ কাঙ্গালের বেটা। সবাই পরে ধুতী চাদর তুমি কেন ন্যাংটা"॥ কখন কখন কোন মুসলমান গায়ক আসিয়া শিবকে আদমচাচা বা ইভচাচা বলিয়া সেলাম করে এবং বলে চাচা! তুমি হিন্দুর ঘরে আলোচাল ও কলা খাইতে আসিয়াছ, চাচীকে সঙ্গে আন নাই কেন? বন্দনা ব্যতীত নানা বিষয়ের গান হইয়া থাকে। সহরের গম্ভীরায় পাঁচ আইনের অত্যাচার, মিউনিসিপাল্ ব্যাপার, উকীল মোক্তারের ফেরব্বাজি, বৎসরের বড় বড় ঘটনা, পারিবারিক গুপ্ত রহস্য প্রভৃতি, নবরসের কোন এক রসের গণ্ডীতে পূরিয়া শ্রোতার সম্মুখে

গীতাকারে উপস্থিত করা হইয়া থাকে। গায়কেরা অনেকেই বাদ্যযন্ত্র সঙ্গে করিয়া আনে। পূর্ব্বে বোলবাই বড়ই মনোহর ছিল। এখন অনেকে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া বুঝিয়াছে, বোলবাইর ভাষা নিতান্তই মন্দ, তজ্জন্য উহারা পুঁথিগত ভাষায় গান রচনা করিতেছে। এরূপ করাতে বোলবাইর সৌন্দর্য্য নষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় সুমিষ্ট বোলবাই আর শুনিতে পাওয়া যায় না। এখন বুড়া শিবের পরিবর্ত্তে গঙ্গাধর, ত্রিলোচন, ত্রিপুরারি, স্মরহর গানের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। কখন কখন সাবিত্রী সত্যবান, নল দময়ন্তীর যাত্রার পালা আসরে উপস্থিত হইয়া লোকের বিরক্তি উৎপাদন করে। আগেকার বোলবাইতে অশ্লীলতার ভাগ নিতান্তই অল্প ছিল, এখনকার বোলবাইতে আদিরসের ভাগ এত অধিক যে, উহা ভদ্রলোকের শ্রবণের অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে সাঙ্কেপে এদেশীয় ভাষায় দেশের অভাব, আপনার মানসিক ক্লেশ প্রভৃতি সরল প্রাণে দেবাদিদেবের নিকট প্রকাশ করা হইত, শুনিলে অন্তর পুলকিত হইত, এখন সেরূপ গান প্রায়ই শুনা যায় না। গম্ভীরার ভাল গান, অনেক দিন পর্য্যন্ত লোকের মুখে ঘুরিয়া বেড়ায়। গাড়োয়ান গাড়ী চালাইবার সময়, নাবিক নৌকা বাহনের সময় এবং মজুর বালকেরা ছাদ পিটিবার সময় গম্ভীরার গান করে। গম্ভীরার ভাল গান রচনাকারী, সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়া পড়ে। দুটী গম্ভীরার গান লিখিত হইল।

১

গণ্শার বাবা তামাসা দেখ্তে যাঁড়ে চড়্যা আস্যাছ।
বুড়া কি মন্ত্রজালে তন্ত্রজালে সাপ ধর্যা রাখ্যাছ॥
বুড়ার চোক্‌রঙ্গিনা ঠোটরঙ্গিনা গলায় হাড়ের মালা
সুতালেতালে তালবেতালে কেমন তাল বাজাচ্ছ॥
পুত্রপত্নী সঙ্গে তব্ ডোরকপ্নী ধর্যাছ,
বুড়া বুদ্ধে পূরা, সিদ্ধিজুড়া, সিদ্ধিঘুট্যা খাচ্ছ॥

২

ধান্টামার্যা নেঙ্টা কর্ল্যা পূজব তোমায় কিসে।
ন্যাঙ্টা যাওহে কৈলাসে মানে মানে যাওহে কৈলাসে॥
তুমি নিজে পাগল করোনা পাগল কোপন বাজায়ে হাসে।
অন্ন টানে শরীর টানে বেদনা হলো দু পাশে॥
রুক্ষভাবে সূক্ষ্ম শরীর চক্ষু গেল ধসে—সদা উপবাসে
ভাদোমাসে কাদা শূন্য সদা ধূলা উড়ে আকাশে।
পুকুর ডোবা শুকুয়ে গেল বোগলা কান্দে বসে মাছের হুতাশে॥
মহানন্দা বহে মন্দা চর পোলো পৌষমাসে।
মাছ বিনে মাছরাঙ্গা কান্দে মালোভাবে বসে এসব কালের বশে॥
গৃহস্থের গৃহস্থ নাস্তি ম্যালেরিয়ার ফাঁসে
ঘুর্যা ফির্যা ব্যারাম পড়ে কুইনাইনের দোষে কবিরাজ পলায় ত্রাসে॥
খাবার লোভে ঘুর্যা বেড়াও চৈত বৈশাখ জৈঠ মাসে।
খায়্যা আতপ কলা দেখাও কলা বলে তুফান দাসে ভুলাও রঙ্গরসে॥

গম্ভীরা শব্দের ব্যুৎপত্তি কি জানি না। কোন্ সময় এই পর্ব্বের প্রথম প্রচলন হইয়াছিল, তাহাও জানা যায় না। ইহা দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গের চড়কপূজার কিয়দংশে সদৃশ, কিন্তু চড়কপূজা ইহার তুলনায় আসিতে পারে না। ইহা এক প্রকাণ্ড ব্যাপার। এদেশের লোকে বলে যে ইহা বাণ রাজার উৎসব। ইহারা দিনাজপুরের জঙ্গলে বাণরাজার শোণিতপুরের অবস্থান নির্দ্দেশ করে। লোকে দিনাজপুর ও বগুড়ার পাল, শূর ও কাম্বোজরাজগণের কীর্ত্তিচিহ্ন দেখিয়া মৎস্যরাজার উত্তর গোগৃহ কীচকের বাড়ী প্রভৃতি মনে করিয়া থাকে। কাম্বোজ, শূর ও পালরাজগণের কোন মহাভারত না থাকায় লোকে তাঁহাদের নাম ভুলিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের বিলাসভূমিতে বিরাট, বাণ, সুশর্ম্মা, কীচক প্রভৃতিকে স্থাপন করিয়াছে। বাস্তবিক, বাণ এ প্রদেশের লোক নন। আর্য্যগণ, মধ্যভারত জয়ের সময় যে সকল অনার্য্যদলপতির সঙ্গে বিবাদ করিয়াছিলেন, বক, বাণ, কির্ম্মীর, হিড়িম্ব প্রভৃতি তন্মধ্যে প্রধান ছিলেন। অনুমান হয় বাণ বৃষ্ণিভোজ অন্ধক প্রভৃতির মধ্যভারত জয়ে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। উজ্জয়িনীর মহাকাল শিব, বাণ রাজার প্রতিষ্ঠিত। শুনা যায়, সাহাবাদ জেলার কোন স্থানে বাণের বাড়ী ছিল। বাণ যে, যাদবদিগের আনর্ত্তদেশের নিকটে কোন স্থানে বাস করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার কোন কোন পুরাণে দেখা যায়, বাণ ও নরক রাজার দেশ পরস্পর নিকটবর্ত্তী। নরক, প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজা ছিলেন। আসামকে পূর্ব্বে প্রাগ-

জ্যোতিষপুর বলিত, লোকের এইরূপ বিশ্বাস, কিন্তু মহাভারত পাঠ করিলে স্পষ্টই বোধ হয়, প্রাগজ্যোতিষপুর ও ত্রিগর্ত্তদেশ পরস্পর সংলগ্ন ছিল। জলন্ধরের প্রাচীন নাম ত্রিগর্ত্ত। বোধ হয় হিমালয়ের দক্ষিণদিগবর্ত্তী সুদীর্ঘ পার্ব্বত্য ভূমি প্রাচীনকালে প্রাগজ্যোতিষপুর নামে অভিহিত হইত। বাণ ও নরকের দেশ যে পাশাপাশি ছিল না, ইহা নিশ্চিত। বাণ রাজা একরূপ শিবোৎসব করিতেন, তাহা জানা যায়। পুরাণ পাঠে জানা যায়, কালজেওরের নিকটবর্ত্তী স্থানে বাণদিগের কর্ত্তৃক একরূপ উৎসব অনুষ্ঠিত হইত, ঐ উৎসবে শিব সন্নিধানে পিশাচের ন্যায় উদ্দণ্ড নৃত্য ও গীত হইত। গম্ভীরাও সেইরূপ উৎসব। এখন কথা হইতেছে, সেই উৎসব এদেশে কিরূপে আসিল? পুণ্ড্র জাতি কোন দেশ হইতে আসিয়া এ অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিলে এ বিষয়ের কতক মীমাংসা হইতে পারে। পৌণ্ড্রক বাসুদেব নামক কল্পিত ব্যক্তিকে কখনও কারুষ, কখনও পুণ্ড্রদেশের রাজা বলা হইয়াছে। সে না কি চতুর্ভুজে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণ করিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে স্পর্দ্ধা করিত। এরূপ ব্যক্তিকে বাস্তবিক ব্যক্তি মনে করার ন্যায় ঐতিহাসিক ভ্রম আর নাই; এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, পুণ্ড্রজাতি, যদুবংশীয়দের কর্ত্তৃক মধ্যভারত হইতে তাড়িত হইয়া করূষ বা কারুষদেশ দিয়া যে দেশে আসিয়া বাস করিয়াছে, তাহারই নাম পরে পুণ্ড্রদেশ হইয়াছে। হয়ত সে সময়ে এই জাতির কোন নাম ছিল না। পরে অঙ্গদেশীয় রাজকুমার পুণ্ড্রের নামানুসারে দেশের নাম পুণ্ড্র হইলে ইহারাও পুণ্ড্র নাম পাইয়াছে। বাণের অনুষ্ঠিত শিবোৎসব, পুণ্ড্র জাতির সঙ্গে মালদহ জেলায় আসিয়াছে। সকলেই জানেন পুণ্ড্র-রাজ্যের রাজধানী প্রাচীন পুণ্ড্রবর্দ্ধননগর, এখনকার পাণ্ডুয়ার জঙ্গলে লুক্কায়িত হইয়া আছে। গম্ভীরার সম্বন্ধে যে সকল ঐতিহাসিক কথা বলা হইল, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে কাহারও প্রতি আমাদের অনুরোধ নাই, কারণ ইহা অনুমান মাত্র।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

মেহের উন্নিসা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রলয়ের কল্লোলিত-উচ্ছ্বাস বুকে লইয়া, বিশালকায় দামোদর, ঘনান্ধকারের মধ্য দিয়া—উন্মাদের মত কে জানে কোথায় ছুটিয়া চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতশুভ্র ফেণ-বিমণ্ডিত আকাশপ্রমাণ তরঙ্গ রাজির ভীষণ গর্জ্জন। সেই ভীষণ গর্জ্জন শুনিয়া, দামোদরের সেই রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া—যেন সমস্ত জড় প্রকৃতি ভয়ে নিস্তব্ধ।

বারি-প্রবাহ-পরিধৌত—সৈকত-ভূমি চুম্বন করিয়া, এক ঘন পল্লবময় আম্র-কানন। রাজ্যের অন্ধকার সেই ঘনসন্নিবেশিত বিটপীরাজির পাতার নীচে, শাখার অন্তরালে, বৃক্ষাবলম্বী দুর্ভেদ্য গুল্মরাজির আশে পাশে, খদ্যোৎখচিত হইয়া জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। এই আম্র কাননের উপান্তে এক শ্বেত শুভ্র অট্টালিকা।

বিরাট প্রকৃতি শব্দ শূন্য। সব যেন গভীর নিদ্রার ঘোর মায়ায় সমাচ্ছন্ন। জাগিয়া আছে—কেবল মৃদু-প্রবাহিত নৈশসমীরণ—বিটপীশীর্ষে পুঞ্জীকৃত খদ্যোতের রাশি—অন্ধকারে আধ ফুটন্ত ফুলকলিকা—আর সেই জগতের আদি হইতে চির নিদ্রাহীন—বিচিত্র নীলাকাশের দীপ্তিময় তারকার রাশি।

নদীবক্ষে নৌকা নাই। অত রাত্রে কে পার হইবে? মুসাফের খানার বিস্তৃত দ্বার অর্গলাবদ্ধ। গৃহস্থের বাটীর ক্ষুদ্র কক্ষের দীপালোক নির্ব্বাপিত—রাজপথ পান্থ-পরিশূন্য। কেবল আশ্রয়হীন—দুই চারিটা গ্রাম্য কুক্কুর সেই অন্ধকারে মাঝে মাঝে চীৎকার করিতেছিল।

এই গভীর নিশীথে পূর্ব্বকথিত আম্রকাননান্তরালবর্ত্তী বিস্তৃত সৌধের এক ক্ষুদ্র কক্ষে দীপ জ্বলিতেছে। এক পরিচারিকা—সেই স্তিমিত দীপালোকে বসিয়া, নিজের মনের মত জিনিস পত্রে পরিপূর্ণ করিয়া কতকগুলি গাঁঠরি বাঁধিয়া সাজাইয়া রাখিতেছে। আর এক এক বার দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে।

এক দীর্ঘাঙ্গী, মলিনমুখী—গৌরবর্ণা সুন্দরী সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। চারিদিকে সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—

"মরজানা"—

"কেন বিবিসাহেবা?"

"তোর কাজ শেষ হইল কি? রাত্রি অনেক হইয়াছে—বৃথা দেরী কেন—ও সব কি?"

"কতকগুলি গাঁটরি।" সেই অনিন্দ্য সুন্দরী সে গুলির দিকে ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"এ সব কেন?"

মরজানা বলিল "যাহা লওয়া আবশ্যক বুঝিয়াছি, সব লইয়াছি।"

"এতে আছে কি?"

মণি, মুক্তা, জহরতের গহনা, সেই কয়খানা জড়োয়া কাজ করা পেশোয়াজ—সেই মতি বসান আঙ্গরাখা—থান কত রূপার বাসন"—

"তোর মাথা আর মুণ্ড! দূর করিয়া এগুলা দামোদরের জলে ফেলিয়া দে। একদিন সাধ করিয়া এসব জিনিস করিয়াছিলাম—এখন সব ফুরাইয়াছে! পোড়ারমুখী! আমি কি বাঙ্গালীর মেয়ের মত শ্বশুরঘর করিতে যাইতেছি যে, যত রাজ্যের জিনিস সঙ্গে লইয়াছিস্—"

বাঁদী তাড়া খাইয়া একটু আশ্চর্য্য হইল। বলিল—

"এ জিনিসগুলা আগরায় অনেক কাজে লাগিবে। আবশ্যক না বুঝিয়া কি বাঁধিয়াছি।"

"কে তোকে বলিল,—আমি আগরায় যাইব? আগরায় যাইব ত গোপনে যাইব কেন?"

"নৌকা রাখিতে বলিলেন কেন?"

"দামোদর পার হইব বলিয়া—"

"পার হইয়া কোথায় যাইবেন?—

"যে দিকে দুই চক্ষু যায়—" কর্ত্রী আর বলিতে পারিলেন না—চক্ষে জল আসিল।

মরজানা অনেক দিনের পূরাণ বাঁদী। একটু মাথায় চড়িয়া কথা কওয়াটা তার কেমন স্বভাবের দোষ ছিল। সে রাগত ভাবে বলিল,—"আগরাও যাইবেন না—এখানেও থাকিবেন না—এ জগতে আপনার স্থান কোথায়? মহল ছাড়িলেই নিরাশ্রয় হইবেন। পথে পেট চলাত চাই।"

কর্ত্রী বিষাদমাখা স্বরে বলিলেন,—"যাঁহার রাজ্যে একটা পিপীলিকাও উপবাস করে না—তিনিই আহার দিবেন মরজানা! কিছু না জোটে—ভিক্ষা করিতে না পারি—পথে অনাহারে মরিয়া পড়িয়া থাকিব।"

বাঁদী এবার আরও রাগিল—বলিল "আপনার সব বিপরীত। এই দুনিয়ায় আমাদের মত লোকের স্থান যথেষ্ট—আপনার হিসাবে নয়। আগরায় সোণা বসান—মতি বাঁধান সিংহাসনে বসিয়া পা দোলাইবার কল্পনা অপেক্ষা পথে অনাহারে মরা বেশ সুখের কথা!

কর্ত্রী বলিলেন—"তোর মন না সরে, এই সব ঐশ্বর্য্য তোকে দিয়া গেলাম, ভোগ করিস্। আমি যাইব।"

বাঁদা বরাবর আদরে কাটাইয়াছে। এই তিরস্কারে তাহার চোখে দুই ফোটা জল আসিয়া হাজির হইল। মরজানা রুদ্ধ স্বরে বলিল—"নিতান্ত না শুনেন চলুন। কিন্তু ফিরিতে হইবে"—

সেই কক্ষের দীপ নিভাইয়া, দুইজনে সেই অন্ধকার বেষ্টিত—প্রকাণ্ড পুরীর দরদালান অতিক্রম করিয়া, সোপানশ্রেণী অবলম্বনে বাহিরে আসিলেন।

উপরে উন্মুক্ত—সুনীল আকাশ। সুনীল আকাশে অসংখ্য উজ্জল হীরকখণ্ডের ন্যায় জ্বলন্ত নক্ষত্র। আশে পাশে পুষ্পকাননের আধ ফুটন্ত কলিকাগুলির স্বল্প সুগন্ধময় মুক্ত বাতাস। বামে, দক্ষিণে, ঊর্দ্ধে, অধেঃ ঘোর অন্ধকার। সেই অন্ধকারশ্রেণী মথিত করিয়া দুই জনে একবস্ত্রে পুরীত্যাগ করিলেন। এক মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস—সেই আকুল হৃদয়ের অন্তঃস্তল হইতে উঠিয়া শূন্যে মিশাইয়া গেল। হায়! ভাগ্য!

কর্ত্রী অগ্রে—সঙ্গিনী পশ্চাতে—উভয়েই নির্ব্বাক। বাগান ঘুরিয়া তিন চার রশি পথ গেলে নদীতীর। কর্ত্রী দেখিলেন—তাহার বস্ত্রাঞ্চলে টান পড়িয়াছে। বুঝিলেন সেই অন্ধকারে পোড়ারমুখী মরজানা ভয় পাইয়াছে। কর্ত্রী বলিলেন,—"মরজানা! আমার পার্শ্বে আয়। আর কত দূর?"

মরজানা—অস্ফুটস্বরে বলিল,—"এই বাঁকটা ঘুরিলেই নদীতীর। বড় ভয় হইতেছে—বিবি সাহেব! শুষ্ক পত্রের উপর এইমাত্র পদশব্দ শুনিলাম।"

"তোর মাথা—শিয়াল কুকুর তোর জন্য কি রাত্রে পথ চলিবে না? শীঘ্র চলিয়া আয়।"

উভয়ে আসিয়া সেই অন্ধকারে নদী সৈকতে দাঁড়াইলেন। অদূরে এক নৌকায় আলো জ্বলিতেছিল। মরজানা বলিল,—"এখনও ভাবিবার অবসর আছে। দুই জনই স্ত্রীলোক, রক্ষী মাত্র সঙ্গে লইলাম না। পথের মধ্যে আপনার রূপই যে শত্রু হইবে বিবি?

"তার উপায় করিয়াছি মরজানা! দিনে পথ চলিব না, রাত্রে চলিব। তাহাতেও বিপদ ঘটে—বিষ লইয়াছি। ভয় কি?"

চিরজন্মের মত অশ্রুপূর্ণ চোখে—একবার সেই চিরপ্রিয় বাসগৃহের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া—এক হৃদয়ভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কর্ত্রী ঠাকুরাণী বলিলেন—"আয় মরজানা—জল ভাঙ্গিয়াই নৌকায় উঠি।"

নৌকায় আর উঠা হইল না। এক অলৌকিক প্রতিবন্ধকে উভয়েরই গতিরোধ হইল। সুন্দরীর সেই রক্তোৎফুল্ল সুন্দর চরণতল দামোদর-তটভূমির কর্দ্দমমাখা হইয়া গতিশূন্য হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দুইজন সশস্ত্র সৈনিকপুরুষ মশাল হস্তে ক্ষিপ্রগতিতে নৌকা হইতে নামিয়া আসিয়া তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। দুইজনেই যুগপৎ বলিয়া উঠিল, "বাদসাহ দীর্ঘজীবি হউন। বেগম সাহেবের জয় হউক।"

বাদসাহ! বেগম! এসব কি কথা! সেই কর্দ্দম বিলিপ্ত—রক্তরাগময়—গতিশূন্য পা দুখানি সরাইয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া কর্ত্রী মেহেরউন্নিসা একবার সেই সৈনিকদের প্রতি কঠোর দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। পদতলে সহসা ভীমকায় কৃষ্ণসর্প দেখিলে, পান্থ যেমন চমকিত হয়—মেহেরউন্নিসা সেইরূপ চমকিয়া উঠিলেন। তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে সবই বুঝিলেন। বাদসাহ তাঁহাকে আগরায় লইয়া যাইবার জন্য ফৌজ পাঠাইয়াছেন—শীঘ্র তাহারা বর্দ্ধমান পৌঁছিবে এ সংবাদ পূর্ব্বে পাইয়াই মেহের পলায়নের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল।

সেই দুইজন সৈনিক পুরুষের মধ্যে একজন পক্ককেশ বৃদ্ধ—অপর জন যুবক। মেহের পরুষকণ্ঠে সেই বৃদ্ধকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"

"কে, তোমরা—আমার নৌকায় কেন?"

মশালের তীব্র আলোক সেই অনিন্দ্যসুন্দরীর মুখের উপর পড়িয়াছে। সেই উন্নত গ্রীবাভঙ্গী ও তেজোময় বাক্য-বিন্যাস শুনিয়া, বৃদ্ধ সেনাপতির বুক কাঁপিয়া উঠিল। বৃদ্ধ কিন্তু হটিল না—বলিল—"আমরা দিল্লীশ্বরের সেনাপতি—আমরাই আপনার নৌকা দখল করিয়াছি। গোস্তাখি মাপ করিবেন—আমরা আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র—

"কার হুকুমে নৌকা দখল করিলে"?

"দিল্লীশ্বরের"

"তোমাদের দিল্লীশ্বরত বেশ!! নিঃসহায় ভদ্রপরিবারের অন্দরমহলে তাহাদের নৌকা দখল করিতে পাঠাইয়া অতি উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছেন।"

তিরস্কারটা বড় তীব্র। রহমত—বৃদ্ধ, সব বুঝিয়া সে চুপ করিয়া রহিল। মেহের, রহমতকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় বলিলেন,—"পোষাক দেখিয়া, হাতিয়ার দেখিয়া, আপনাকে একজন উচ্চ পদবীর সেনাপতি বোধ হইতেছে। আপনি চোরের মত আমার অন্তঃপুরে কেন?"

"দিল্লীশ্বরের হুকুম।"

"বদবখ্ত—বে-আদব! এই কুৎসিৎ আদেশ পালন করিতে সেনাপতি হইয়া তোমার লজ্জা বোধ হইল না? ধিক্ তোমায়!" বৃদ্ধ সেনানী রহমৎ স্থিরভাবে উত্তর করিল,—"যাহা বলিবেন, বিবি সাহেবা সবই সহ্য করিব! কিন্তু আমার অপরাধ কি?"

মেহের পরুষভাবে বলিলেন,—"আদেশ পালনে কি একটা বিধি নাই—ন্যায় অন্যায় বিবেচনা নাই! বাদসাহ কি তোমায় চোরের ন্যায় আমার অন্দর মহলে আসিতে বলিয়া দিয়াছেন? খাঁ সাহেবের শতাধিক প্রহরী এখনও এই পুরীর মধ্যে নিদ্রিত। আদেশ পাইলে তাহারা তোমাদের খণ্ড খণ্ড করিবে?

রহমৎ বলিল—"মরিবার ভয় আমরা করি না। এই আম্রকাননের মধ্যেও চারি শত সৈনিক নীরবে শুইয়া আছে। আমরা মরিলে, নূতন সেনাপতি লইয়া তাঁহারা সের সাহেবের প্রহরীদের বাধা দিবে।"

মেহের উন্নিসা একবারে বুকভাঙ্গা হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহার ন্যায় সাহসী রমণীর পক্ষে এরূপ বিপদ অতি সামান্য। তিনি নিজের অবস্থা তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া লইলেন। স্থিরস্বরে বলিলেন,—"তোমার নাম কি?"

"এ অধীনের নাম রহমত খাঁ—আমিই প্রধান সেনাপতি!"

মেহের অপেক্ষাকৃত কোমলকণ্ঠে বলিলেন,—"রহমত। দিল্লীশ্বর কি আমায় বন্দিনী করিয়া লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন?"

"অসম্ভব—তিনি আপনাকে সাম্রাজ্ঞীর ন্যায় লইয়া যাইতে বলিয়াছেন।"

"তবে তোমরা আমার পুরী বেষ্টন করিলে কেন?"

"আমরা পৌঁছিবামাত্রই পথে গোয়েন্দার মুখে সংবাদ পাইলাম, আপনি আজই বর্দ্ধমান ত্যাগ করিবেন। দৈব কারণে আমাদের বিলম্ব হইয়াছে। আপনি চলিয়া গেলে আমাদের মাথা যাইত।"

মেহেরউন্নিসা স্থির চিত্তে কি ভাবিলেন। বলিলেন, "রহমৎ দূরে চল। একটা কথা বলিব।"

তিনি অগ্রে অগ্রে চলিলেন,—রহমত তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। কিছু দূরে আসিয়া সেই রুদ্ধোচ্ছ্বাসিত নদীকূলে দুইজনেই স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। মেহেরউন্নিসা গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"সেনাপতি!"

"আজ্ঞা করুন।"

"আমি যদি না যাই—"

"আমরা পুরী বেষ্টন করিয়া থাকিব। বাদসাহকে সওয়ার ডাকে খবর দিব। যেমত আদেশ আসে তাহাই করিব।"

মেহেরউন্নিসা হটিলেন না। বলিলেন,—"তুমিত প্রধান সেনাপতি—কয় হাজারী?"

"হাজারওয়ালা।"

"বেতন পাঁচশত দিনার। কেমন?

"অনুমতি করুন।"

"আমি তোমায় দশহাজার আসুরফী দিব। আমার মণি মুক্তা যা আছে—সব দিব। তোমায় আমীর করিয়া দিব। আমায় ছাড়িয়া দাও।"

এ করুণ প্রার্থনায় রহমতের হৃদয় ব্যথিত হইল। সে এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি-শালিনী রমণীর মনের অভিপ্রায় বুঝিল। বৃদ্ধ অবশেষে কহিল,—'বাদশাহকে কি বলিব?"

"বলিবে,—তাহাকে ধরিয়াছিলাম। পথে সে বিষ খাইয়াছে! তাহার শুষ্ক সেই শবদেহ দামোদরের জলে বিসর্জ্জন করিয়াছি।"

রহমত বলিল,—"মা! আপনি দিল্লীশ্বরকে জানেন না। তিনি এ কথা বিশ্বাস করিবেন না। আমার জান বাচ্ছা কুত্তার মুখে যাইবে! আর এক কথা—দিল্লীশ্বরের সেনাপতিরা এখনও বিশ্বাসঘাতক হইতে শিখে নাই। যদি আপনাকে ছাড়িতেই হয়—বীরের ন্যায়—সেনাপতির ন্যায় ছাড়িয়া দিব। আপনার জন্য নিজে মরিব। কিন্তু বাদসাহকে একবার না জানাইয়া ছাড়িতে পারিব না।"

মেহের প্রমাদ গণিলেন। দারুণ উত্তেজনায় তাঁহার কণ্ঠ শুকাইয়া আসিতেছিল। নূতন সংকল্প আঁটিয়া বলিলেন—"বাদসা তোমার কথা বিশ্বাস না করিতে পারেন—কিন্তু আমার কথা ত বিশ্বাস করিবেন। আমি গিয়া বলিব—"জাঁহাপনা! আপনার বিশ্বস্ত সেনাপতিরা পথে আমার ইজ্জত নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।"

রহমতের মুখ শুকাইল। কিন্তু সে সেনাপতিত্ব করিয়া চুল পাকাইয়াছে। হটিল না—বলিল,—"না হয় আমি মরিব। আপনি যদি অত বড় একটা মিথ্যা কথা—অত বড় একটা কলঙ্ক—আমার এই পক্ককেশের উপর চাপাইয়া দেন—না হয় আপনার সন্তোষের জন্য মরিলাম। কিন্তু—এ দুনিয়ার বাদসারও বাদসা আছেন। বিচার তাঁহার কাছে। জাহান্নামে ত যাইতে হইবে না।"

মৈত্রী, ভয়, করুণা—সবই ভাসিয়া গেল। বৃদ্ধ রহমৎ খাঁর কাছে যুবতী মেহেরউন্নিসা পরাস্ত হইলেন। হায়! আর ত উপায় নাই, কি হইবে?

অনেক ভাবিয়া—মেহের প্রভুত্বসূচক কণ্ঠে বলিলেন,—"সেনাপতি! সামান্য দীন প্রজা—বিনা পরোয়ানায় হাজির হয় না। আমি সাম্রাজ্ঞী হইতে যাইতেছি, আমার পরোয়ানা কই?"

রহমতের মুখমণ্ডল চিন্তারেখান্বিতহইল। জাঁহাগীর বাদসা মেহেরের নামে পরোয়ানা দিতে সাহসী হন নাই। ব্যাপারটা বড় রূঢ়, অপ্রেমিকের মত হইয়া পড়ে। পরোয়ানা ছিল সেনাপতির উপর। তাহাতে লেখা ছিল—"সম্মানের সহিত সের আফগানের বিধবাকে আগরায় আনিবে।" রহমত তাই ভাবিতেছিল।

রহমত পাগড়ীর ভিতর হইতে একখণ্ড বাদসাহী পাঞ্জাচিহ্নিত লাল কাগজ বাহির করিয়া মেহেরের হস্তে দিল। মেহের পড়িয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। উড়িতে উড়িতে সে খানা দামোদরের কর্দ্দমাক্ত তটের উপর পড়িল। তিনি কঠোর হাস্যের সহিত রহমতকে বলিলেন,—"এত তোমার নামে পরোয়ানা। যত দিন না আমার আহ্বানপত্র আসিতেছে, তত দিন আমি রাজধানীতে যাইতেছি না।"

রহমত বুঝিলেন কেবল প্রকারান্তরে বেগম সাহেব সময় লইতেছেন। এ যুক্তির উপর কথা নাই। এবার রহমত এই তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী রমণীর নিকট পরাজিত হইলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন,—"যাহা আজ্ঞা করিতেছেন তাহাই হইবে। এই রাত্রেই সওয়ার ডাকে করিব। আদেশ আসিলে আপনাকে লইয়া যাইব। আপনি অন্তঃপুরে যান। এ অধমের—দাসানুদাসের গোস্তাখি মাপ করিবেন। পুরী প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবেন না। আপনার মহল—স্ত্রী প্রহরী দ্বারা সুরক্ষিত করিয়াছি।"

মেহের অগত্যা ফিরিলেন। মনে ভাবিলেন—বৃদ্ধ বড় হুঁসিয়ার। বাঁদীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"মরজানা! তোর কথাই ফলিল।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পুরী প্রবেশ করিয়া—মেহেরউন্নিসা অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন। দেখিলেন সেই রাত্রে জ্বলন্ত বর্ত্তিকা লইয়া প্রহরিণীগণ তাঁহার পুরীর চারিদিক রক্ষা করিতেছে। তাহারা রমণী হইয়াও হাতিয়ার খুলিয়া পুরুষের মত বেড়াইতেছে। মেহের বুঝিলেন, দিল্লীর বাদ্সা অপেক্ষা এই বৃদ্ধ সেনাপতি খুব হুঁসিয়ার। বাদসাহ তাঁহার মন অধিকার না করিয়া আগে শরীরই দখল করিয়াছেন।

রাত্রি তখন শেষ যাম। আকাশের তারা অনেকটা ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল। শীতল প্রভাত-বায়ুতে দামোদরের চঞ্চল বক্ষ শান্তভাব ধারণ করিয়াছিল। বাগানের মধ্যে রজনীগন্ধা, যুঁথী নাগকেশর, বেলা প্রভৃতি ফুলগুলা সেই অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত অবস্থাতেও প্রভাত-বায়ুকে সুগন্ধে ভরপুর করিয়া দিতেছিল। দুই একটা পাখী জাগিয়া উঠিয়া, মিষ্ট রবে প্রভাতী আরম্ভ করিয়াছিল। মেহের শয্যা আশ্রয় করিলেন বটে, কিন্তু নিদ্রার পরিবর্ত্তে স্বপ্নময় তন্দ্রাই তাঁহার মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল।

প্রভাতে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, মেহের সর্ব্বাগ্রে মরজানাকে ডাকাইলেন। মরজানা আসিয়া ম্লানমুখে সম্মুখে দাঁড়াইল। গত রাত্রের ঘটনাটা তাহার স্বপ্নবৎ বোধ হইয়াছিল। তারপর পুরীর মধ্যে তাতারণীদের ভীমমূর্ত্তি, উন্মুক্তকৃপাণ দেখিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। সে তখন ভাবিতেছিল—পলায়নই এর অপেক্ষা ভাল ছিল। একটু আগে গেলেই এ গ্রহ ঘটিত না। সে মলিন মুখে বলিল, "কি হুকুম বিবিসাহেবা?"

"একটা কাজ করিতে হইবে। একবার পাল্কী লইয়া কাটোয়ায় যা।"

"মতিবিবির কাছে? কিন্তু তিনি এ পাহারার কড়াকড়িতে আসি-বেন কেন?"

"সে ভার আমার। এই নে দশ আস্‌রফি। তোর পাথেয় ও পুরস্কার।"

সে চলিয়া গেল। মতি—রাজা গজপতি সিংহের মহিষী। রাজা সাহেব কাটোয়ার প্রধান কিল্লাদার। মোগলের নিমকভোজী। মতিয়া মেহেরের প্রিয়সখী; এ বিপদে তাহার সহিত মন্ত্রণার বিশেষ আবশ্যক।

* * * * *

মেহের একটী ক্ষুদ্র ঘণ্টা বাজাইলেন। ঘণ্টার শব্দ শেষ হইতে না হইতে এক প্রহরিণী আসিয়া সেলাম জানাইল। বলিল—"হুকুম কি বেগমসাহেবা?"

এ রঙ্গ দেখিয়া মেহেরের মলিন মুখে একটু হাসি আসিল। মনে মনে ভাবিলেন এ এক মন্দ তামাসা নয়। মেহের প্রভুত্বসূচক স্বরে বলিলেন, "বুঝিতে পারিতেছিস্ বাঁদি! একদিন দিল্লীতে আমার খবর-দারীর ভিতর থাকিতে হইবে।"

"যো হুকুম—আপনার সেবার জন্যই ত আমরা নিযুক্ত"—

"বস্—বহুতাচ্ছা। একবার সর্দ্দার ফৌজদার রহমত খাঁকে সেলাম দাও।"

তাতারণী বলিল—"জনাব! তিনি কার্য্যান্তরে গিয়াছেন। তাঁহার নিম্ন পদস্থ রোস্তম খাঁ এখন তাঁহার কাজ করিতেছেন। দুই তিন দিন তিনি ফিরিবেন না।"

"রোস্তমকে আমার হুকুম জানাও।"

হুকুমপ্রাপ্তিমাত্রেই রোস্তম আসিল। রোস্তম সবে মাত্র যৌবনের সীমায় পদার্পণ করিয়াছে। সে সুপুরুষ—ভরা যৌবনের উদ্দাম প্রবৃত্তিতে পরিপূর্ণ।

মেহের ভাবিয়াছিলেন,—রোস্তমও বুঝি রহমতের মত এক বৃদ্ধ সৈনিক। এই যুবকের সম্মুখীন হইতে তাহার প্রথমে বড় একটা ইচ্ছা হইল না। কিন্তু দায়ে পড়িলে সবই করিতে হয়, তাই মেহের সে সুন্দর মুখে একটু ঘোমটা টানিয়া বলিলেন—

"রোস্তম আলি—"

যেন সপ্তস্বরা বীণার সুরবাঁধা সঙ্গীতপূর্ণ তারে কে যেন অঙ্গুলি আঘাত করিল। সেই সুর যেন রোস্তমের কাণের ভিতর দিয়া প্রাণের চারি ধার ঘিরিয়া বড়ই মিঠা বাজিতে লাগিল। সেই সুন্দর ঘোমটার অন্তরালে, সেই কৃষ্ণতারকাময় টানাটানা চোখ দুটী—আর চাঁদপানা মুখ-খানি রোস্তমের মাথা ঘূরাইয়া দিল। সে দিন রাত্রে, মশালের আলোকে নদীকূলে পরিদৃষ্ট—সেই অতুলনীয় সৌন্দর্য্য—যেন দিবালোকে পূর্ণ-জ্যোতিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আ মরি! মরি! রমণী এত সুন্দরও হয়? রোস্তম কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "কেন ডাকিয়াছেন?"

"তুমিই কি সে দিন রহমতের সঙ্গে নদীসৈকতে ছিলে?"

"আজ্ঞা হাঁ—"

"তোমাদের বন্দোবস্তে আমি বন্দিনী হইয়াছি। তোমাদের পাহারার বন্দোবস্তে আমার বন্ধুবান্ধবের যাতায়াতের পথ বন্ধ। ভদ্র মহিলারা কেমন করিয়া আসিবেন? আমিত দিল্লী যাইতেছি। যাইবার পূর্ব্বে ত সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা চাই?"

রোস্তমের প্রাণে, হৃদয়ের নিভৃতকন্দরে, আশে পাশে, অন্তর্জগতের সেই লুক্কায়িত অংশে মেহেরের মোহিনীরূপ ঘুরিতে ছিল। সে বিজড়িত বিকম্পিত স্বরে বলিল,—"কি করিতে হইবে বলুন।"

"বন্দোবস্ত করিয়া দাও—যেন কোন প্রহরিণী শিবিকা পরীক্ষা না করে।"

"অসম্ভব।—"

মেহের, মুখের ঘোমটা খুলিলেন। পূর্ণিমার চাঁদ যেন মেঘান্তরাল ত্যাগ করিল। রাগে তাঁহার মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত। লজ্জা সরম ভাসিয়া গেল। মেহের সরোষে বলিলেন,—"অসম্ভব—কেন দিল্লীর বাদসা এরূপ হুকুমও তোমাদের দিয়াছেন না কি?"

"না, বাদসা কিছু বলেন নাই, এটা আমাদের কার্য্যক্ষেত্রানুসারী ব্যবস্থা।—রোস্তম আর বলিতে পারিল না। তাহার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিতেছিল। সে এই বিরাট বিশ্বের সর্ব্বত্রই সেই মনোমোহিনীর সৌন্দর্য্য পরিব্যাপ্ত দেখিতেছিল।

মেহের তাহার মনের ভাব বুঝিলেন। আবার লজ্জায় অবগুণ্ঠন টানিলেন। বলিলেন—"রোস্তম কাটোয়া হইতে আমার প্রিয়সখি মতি-রাণী আসিতেছেন। হুকুম দাও তাঁহার শিবিকা যেন কেহ পরীক্ষা না ক'রে।"

"আমায় মার্জ্জনা করুন বিবি! এখন এ উত্তর দিতে পারিব না। রাণিজী ত কাল আসিবেন। আজ সন্ধ্যার মধ্যে আপনাকে উত্তর পাঠাইব। একবার খবর দিবেন।"

রোস্তম সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। সে দেখিল চারিদিকে সেই মোহিনী মূর্ত্তি! সম্মুখের উদ্যান-বাটিকার প্রস্ফুটিত মল্লিকাগুলি যেন সে মুখের কোমলতা চুরী করিয়াছে—গগনের পাপিয়া যেন তাহার কণ্ঠস্বর চুরী করিয়াছে। কি সুন্দর চক্ষু—কি সুমিষ্ট স্বর—কি উন্নত গ্রীবাভঙ্গী—কি সুন্দর রং। দিল্লীশ্বরের নবীন সেনাপতি—রূপমোহে পড়িল—বিশ্বাস ও কর্ত্তব্য হারাইল। জাহান্নমে ডুবিল—শয়তানের ক্রীতদাস হইল।

রোস্তম সন্ধ্যার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সময় যেন অতি দীর্ঘ। ঘণ্টাগুলা যেন যুগের মত হইয়া পড়িতেছে।—তাহার মনে এক অসম্ভব কল্পনার উদয় হইয়াছে! আকাশের সূর্য্যটা কেন সহসা কক্ষ-চ্যুত হয় না? সে দুরাশায় উন্মাদ হইয়াছে—কেমন করিয়া কি সাহসে মুখ ফুটিবে। না বলা হইবে না। হায়! হায়! উপায় কি! বুকের ভিতর জ্বলন্ত অগ্নি লইয়া তবে কি হতভাগা রোস্তম আলি পলে পলে ভস্মীভূত হইবে!

সন্ধ্যার সময় আহ্বান ক্রমে রোস্তম আবার অন্দরে গেল। দেখিল—এক নির্জ্জন কক্ষে, একখানি পালঙ্কের উপর বসিয়া মেহেরউন্নিসা চিন্তায় নিমগ্না। সেই অলক্ত-রাগ-রঞ্জিত সুন্দর চরণ দুইখানি—স্থিরভাবে—একখণ্ড গালিচার উপর বিন্যস্ত। মুখে অর্দ্ধাবগুণ্ঠন। অবগুণ্ঠনের অন্তরালে মন্মথের সেই তীব্র বিষময় শর। ভ্রমরকৃষ্ণ এলায়িত কেশরাশি সেই মুখের চারি ধারে পড়িয়া ধীর সমীরে চঞ্চলভাবে দুলিতেছে। রোস্তম্ অগ্রসর হইয়া সেলাম করিল।

মেহেরউন্নিসা বলিলেন—"কি স্থির করিলে রোস্তম আলি?" সে পাপিষ্ঠ উত্তর দিল না। কি ভাবিতে লাগিল, একবার কক্ষের চারি দিকে দেখিল। সেখানে আর কেহই নাই। তবুও তাহার সাহস হইল না। মনের কথা যতই জিহ্বাগ্রে আসিয়াছিল সে যেন ততই শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছিল।

মেহেরউন্নিসা তিরস্কারপূর্ণ স্বরে বলিলেন—"তুমি অত বড় দিল্লীশ্বরের সেনাপতি—একটা ছোট কথার মীমাংসায় দুই ঘণ্টা কাটাইলে।" রোস্তম বলিল,—"শেষ মীমাংসা করিয়াছি। আপনাকে মুক্তি দিব। কাল রাত্রে নদীর ধারে রহমতের সহিত আপনার সব কথাই শুনিয়াছিলাম। সে যাহা পারে নাই, আমি তাহা করিব। মেহেরউন্নিসা শিহরিয়া উঠিলেন। কথাটা বড় ভারি, তাহার বিশ্বাস হইল না। বলিলেন—"কার হুকুমে আমায় ছাড়িবে?" রস্তম ধীরে ধীরে বলিল—"আমার নিজের ইচ্ছায়।" "তোমার নিজের ইচ্ছায়? কি পণ চাও?" রোস্তম মনে মনে বলিল, যা চাই—সমগ্র বিশ্ব প্রদান করিলে তাহার তুলা হইবে

না। প্রকাশ্যে বলিল,—"এর আবার পণ কি? জীবন পণ। মেহের বলিল "আমার জন্য কেন তুমি মরিবে?"

রোস্তম কম্পিত আবেগপূর্ণ কণ্ঠে উত্তর করিল—

"আমি আর ফিরিব না। আপনার সমভিব্যাহারী হইব। আপনার অনুগ্রহের উপর এখন আমার জীবনের সুখ নির্ভর করিতেছে। আপনি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। আপনাকে না দেখিলেই আমি বোধ হয় বাঁচিতে পারিতাম।" মেহের এতক্ষণে সব বুঝিলেন। তাহার মুখ-মণ্ডল ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। ব্যাঘ্রিনীর ন্যায় ভীমমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন"পাপিষ্ঠ—সয়তান্—এত বড় স্পর্দ্ধা কে আছিস্?" মেহের ঘণ্টার রজ্জু ধরিলেন।

রোস্তম বিপদ গণিল। অবরোধ, কারাগার—মৃত্যু—তাহার সম্মুখে। পাপিষ্ঠ মরিতে ভয় পাইল। মেহেরের পায়ে ধরিয়া বলিল,—"ক্ষমা করুন। এ পাপ কথা প্রকাশ করিবেন না। দুইজনেরই তাহাতে কলঙ্ক। আমি জন্মের মত বিদায় লইতেছি। জানিবেন—মৃত্যুকে ভয় করি না। আমি উন্মাদ—না হইলে এ দুরূহ সংকল্প করিব কেন? আমার ন্যায় হতভাগাকে মারিয়া কি লাভ?" মেহের কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—"পিশাচ—দূর হও।"

রোস্তম সেলাম করিল না। ভয়ে নহে—কি করিতে হইবে সে সব ভুলিয়া গিয়াছিল। প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া, দ্রুতপদে সে শিবিরের পথ ধরিল। তখন অন্ধকার একটু ঘন হইয়াছে। রস্তম শবের ন্যায় মলিন বিশীর্ণ মুখে শিবিরে পৌছিল। দেখিল বৃদ্ধ সেনাপতি রহমৎ গম্ভীর মুখে কি ভাবিতেছেন।

রহমত পরুষকণ্ঠে বলিলেন—"রস্তম কোথায় গিয়াছিলে?" সেস্বরে রস্তমের পাপ হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। বলিল,—

"বেগম সাহেবা স্মরণ করিয়াছিলেন।"

"কেন?"

"তিনি বলেন—অন্তঃপুরের যাত্রীদের কোন শিবিকাই পরীক্ষা করা হইবে না।"

"কি উত্তর দিলে?"

"কিছুই দিই নাই।"

রহমত গর্জ্জিয়া উঠিলেন। ক্রোধে সেই বৃদ্ধের মূর্ত্তি যুবকের উদ্ধত ভাব ধারণ করিল। তিনি সরোষে বলিলেন,—"বিশ্বাসঘাতক! নিমক্-হারাম, তুমি না দিল্লীশ্বরের সেনাপতি! সবই আমি শুনিয়াছি। আজ হইতে তুমি পদচ্যুত ও বন্দী।"

রোস্তম স্থির—নিশ্চল—নির্ব্বাক। তাহার নিরুত্তর অবস্থাই তাহার অপরাধের স্পষ্ট প্রমাণ।

প্রধান সেনাপতির আদেশে রোস্তম সেখ্ তৎক্ষণাৎ শৃঙ্খলিত হইলেন। পাপ কল্পনায় তাহার পতন হইল। তাহার জন্য মহাশব্দে নরক-দ্বার উদ্ঘাটিত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

উন্মুক্ত বাতায়নপার্শ্বে দাঁড়াইয়া মেহেরউন্নিসা সান্ধ্যগগণের সৌন্দর্য্য দেখিতেছেন। গাছের পাতার উপর অস্তগামী সূর্য্যের চঞ্চল লোহিত আভা কিরূপে ক্রমে জ্যোতিহীন হইতেছে—পাখীগুলা নীলাকাশের নীচে কত দ্রুতভাবে ছুটিতেছে—অত উচ্চ আকাশ স্পর্শ করিতে পারিতেছে না—তাহারা অতি ক্ষুদ্র, তাই চীৎকার করিতেছে—মেঘের সমুদ্রে ডুবিয়া ডুবিয়া আবার ভাসিয়া উঠিতেছে—মেহের নিবিষ্ট মনে ইহাই দেখিতেছি-লেন। এমন সময়ে পিছন হইতে কে যেন ডাকিল— "মেহের জান!"

মেহের চমকিয়া উঠিলেন। "মেহেরজান!"—এযে সের সাহেবের আদরের সম্বোধন! মরা মানুষ কি কবর হইতে উঠিয়া আবার এত আদর করিয়া ডাকিতে পারে? পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন "মতি রাণী।"

বাতায়ন-পার্শ্বে।

মতি দেখিলেন, মেহেরের সেই কামমোহিনী সৌন্দর্য্যে কালি পড়িয়াছে। চূর্ণ কুন্তল অনাদৃত ভাবে মুখের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।—সেই সদা প্রফুল্ল হাস্য-রস-সিক্ত ওষ্ঠাধর—নীরস ও শুষ্ক, ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত।

মেহের উঠিয়া আসিয়া, মতিয়ার কণ্ঠলগ্ন হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বর্ষার নদীর রুদ্ধ স্রোত কে যেন খুলিয়া দিল। সে স্রোত যেন বেগ মানিতে চায় না—রুদ্ধ হইতে চায় না—ফিরিতে চায় না। মতিয়া রুদ্ধ স্বরে বলিল, "এতদূর হইয়াছে বহিন্! খবর দাও নাই কেন?"

এ কথার উত্তর নাই। আবার অশ্রুপ্রবাহ সেই কোমল গণ্ডস্থলের পথ আশ্রয় করিল। বর্ষাবারি নিষিক্ত গোলাপের ন্যায় সেই মুখের সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিল।

মতিয়া আশ্বস্ত স্বরে বলিল—"যা হইবার তা হইয়াছে—যাহা ফিরা-ইবার উপায় নাই—তার জন্য অনুতাপ কেন সখি? মেহেরউন্নিসা চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া বলিলেন,—"মতি! মতি! প্রিয়সখি। আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। আগরায় লইয়া যাইবার জন্য বাদসার ফৌজ আমায় ঘিরিয়া রহিয়াছে।"

মতিয়া ততদূর আশ্চর্য্যান্বিত হইল না। সব কথাই সে রাজা গজ-

পতি সিংহের নিকট ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিল। বলিল,—"যখন উপায় আর নাই তখন আগরায় না গেলে চলিবে কেন ?"

মেহের উন্নিসা বলিলেন—"প্রতিজ্ঞা করিয়াছি পথে পড়িয়া অনশনে মরিব, তবু সেই পাষাণ-হৃদয়ের বিলাস-দাসী হইব না।"

"বিলাস-দাসী কেন সখি! দিল্লীর মণিময় সিংহাসনে তুমি পাট-রাণী হইবে। একদিন এই হিন্দুস্থান তোমার কটাক্ষে কম্পিত হইবে।"

"না সখি! তুমিও ওকথা বলিও না। তুমিও নিষ্ঠুর হইও না। পরামর্শের জন্য তোমায় ডাকিয়াছি। সখির ন্যায়—ভগ্নীর ন্যায়—পরামর্শ দাও।"

মতিয়া বলিল,—"মেহের! আমরা হিন্দুর ঘরে জন্মিয়াছি—অদৃষ্টটা বড় বিশ্বাস করি। এই যে সব কষ্ট ঘটিল, এ সব কেবল অদৃষ্টের কার্য্য। আর এক কথা, কেবল অদৃষ্ট বলি কেন ? সেই বৃদ্ধ আকবর বাদসাহের সব দোষ। তিনিই যদি প্রতিযোগী না হইতেন—তখনইত তুমি কুমার সেলিমের অঙ্কলক্ষ্মী হইতে। তুমি দিল্লীর সিংহাসনে বসিবে—অদৃষ্টের লিপি এই—খণ্ডাইবে কে ?"

মেহের সদর্পে উত্তর করিলেন,—"আমি নিজে অদৃষ্টের কার্য্যের প্রতিবন্ধক হইব। স্বামী স্বর্গে,কিন্তু তাঁহার স্মৃতি আমার হৃদয় হইতে মুছিবে না। সেই অপ্রেমিক পাষাণের বিলাসের ক্রীড়াপুত্তলী হইব না।"

"এ প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারিবে কি ?"

"ইচ্ছা আমার—প্রতিজ্ঞা ইচ্ছার অধীন। যে পথে ইচ্ছাকে চালিত করিব সেই পথে চলিবে। তবে স্ত্রীলোকের হৃদয় অতি দুর্ব্বল।"

মতিয়া একটু বিরস হাসি হাসিয়া বলিলেন—"যিনি তোমার জন্য এতটা করিলেন, তাঁহাকে একবার দেখা দিবে না ? বাদসাহী ফৌজ যখন আসিয়াছে তখন তোমায় যাইতেই হইবে। তুমি মতিমহলে পৌঁছিলে, তিনি যখন তোমায় আদর করিয়া লইতে আসিবেন, তখন কি করিবে ? দিল্লীশ্বরের আদর কি তুমি উপেক্ষা করিবে ?

"সম্ভব হইলে তার বক্ষে পদাঘাত করিব। বলিব,—"তুমি দুনিয়ায় বাদসা হইয়াও অতি ঘৃণ্য! তুমি একটা মোহের কুহকে পড়িয়া—নিজের সুখের জন্য—এক নিরীহ অবলার সর্ব্বনাশ করিলে কেন ?"

পদাঘাতের কথাটা মতিয়ার কর্ণে বড় তীব্র লাগিল। সে মেহেরের মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"সখি! ওকথা আর মুখে আনিও না। এই দেয়ালগুলারও কাণ আছে, চারি দিকে বাদসাহের লোক। কে কোথায় শুনিয়া ফেলিবে—তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ!"

সহসা কে যেন দ্বারের পশ্চাৎ হইতে বলিয়া উঠিল—"পদাঘাতে ভয়ের কারণ কিছুই নাই। জাঁহাগীর বাদসা অনেক দিন হইতেই ওই চরণতলে বিক্রীত।"

এ কথায় মেহের ও মতিয়া উভয়েই চমকিয়া উঠিলেন। একজন স্ত্রীলোক সেই গৃহে প্রবেশ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ!

যে গৃহে প্রবেশ করিল সে,—পূর্ণ যুবতী—অতি সুন্দর। পোষাক দেখিলে বাঁদীর মত বোধ হয়, কিন্তু রূপ দেখিলে রাজরাণীরও আসন টলিয়া উঠে। মতিয়া বিস্ময়পূর্ণ চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কে তুমি ?"

"আমি বাঁদী।

"কার বাঁদী ?"

"পিয়ারি বেগমের।

"দিল্লীর পিয়ারী বেগম—যিনি ইরান হইতে নূতন আসিয়াছেন।"

"আজ্ঞা—হাঁ।"

"এখানে আসিয়াছ কেন ?"

"বেগম তাড়াইয়া দিয়াছেন। আমার এক খুড়া বাঙ্গালা দেশে থাকেন। তার কাছে আসিয়াছিলাম। সের সাহেবের পত্নী দিল্লী যাইবেন। যদি চাকরী জুটে তাই আসিয়াছি।" এ কথায় মতির সন্দেহ ও বিস্ময় কমিয়া আসিল। মতিরাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার চাকরি গেল কেন ?"

"বেগম মহলের চাকরী। পান হইতে চূণ খসিলেই সর্ব্বনাশ!"

মতি ও মেহের উভয়েই কথাটা বিশ্বাস করিলেন। মতি কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—"একটু আগে আমাদের যে কথাবার্ত্তা হইয়াছে, তাহা তুমি নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। খপর না করিয়া তুমি এখানে আসিলে কেন ? বাদসাহের রঙ্গমহলে থাক—আদব কায়দা শিখ নাই ?"

বাঁদী বলিল, "আমায় মার্জ্জনা করুন। মনে ভাবিয়াছিলাম নূতন বেগম একাকিনী আছেন। সব কথা আমরা পেটে রাখি, নচেৎ রঙ্গমহলে টিকিতে পারিব কেন ? আমাদের ত জানের ভয় আছে।"

মতিয়া একথায় একটু আশ্বস্ত হইল। নিজের বক্ষ-মধ্যস্থ এক ক্ষুদ্র থলিয়া হইতে পাঁচটী আসরফী বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, "সাবধান! বেগমের—ভাবী সুলতানার—সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করিলে তোমারই মৃত্যু! এখন আগরা যাইবার কথা কিছু স্থির নাই। সপ্তাহান্তে আসিও। তোমায় বাহাল করা যাইবে।"

বাঁদী সেলাম করিয়া বলিল,—"বেগমসাহেবার জয় হউক।" সে চলিয়া গেল। মতিয়া ও মেহের দুইজনেই এই পাপিয়সীর ছলনায় ভুলিলেন। যদি কেহ বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত—তাহার মুখমণ্ডলে একটু হাসির রেখা দেখা দিয়াছে।

সেই বাঁদী পুরী হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়া, গ্রামের পথ ধরিল। এক দীর্ঘিকার নিকট এক ক্ষুদ্র শিবিকা ছিল—তাহাতে আরোহণ করিয়া চলিয়া গেল।

বাঁদী চলিয়া গেলে মতিয়া মেহেরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"কি স্থির করিলে সখি ?"

"আগরা পৌঁছিব না। পথে বিষ খাইব। আমার মৃতদেহ আগরায় পৌঁছিবে। জাঁহাগীর বাদসা নিজের কীর্ত্তি দেখিবেন।"

মতিয়া প্রবুদ্ধ স্বরে বলিল,—"তুমি মরিলে জাহাঙ্গীর বাদসার কি হইবে ? ছি—বার বার ওকথা বলিও না। আমার পরামর্শ এই, দিল্লী যাও। সেখানে যদি আদর দেখ, সিংহাসনে বসিও—অনাদর দেখ বিষ খাইও। আমি ও রাজা শীঘ্রই সেখানে পৌঁছিব। আমি নিজ হস্তে তোমার মুখের উপর বিষপাত্র ধরিব—তখন আর বাধা দিব না।"

মেহের বুঝিলেন,মতিয়া যা বলিতেছেন তাহা ঠিক। মতিয়া আরও বলিলেন—"সখি! আমাদের শাস্ত্রে বলে মানুষ হইয়া জন্মান অনেক তপস্যার কথা। মানুষ হইয়া যারা মানুষের মত কাজ করিতে পারে তারাই ধন্য। মরিলেই ত তোমার সব ফুরাইল। মরুভূমির শুষ্ক ফুলটী কবরে মিশান বেশী আশ্চর্য্য কথা নয়। কত ফুল আপনি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে। এই হিন্দুস্থানের সাম্রাজ্ঞী হইলে তুমি লোক-হিত ব্রতে নিযুক্ত হইতে পারিবে। তোমাদের শাস্ত্রে, পুনরায় বিবাহ আছে।"

কথা এইখানেই মীমাংসা হইল। মতির যুক্তিতে মেহেরউন্নিসা কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। মেহের মনে মনে বলিলেন—"উপায় ত নিজের হাতে। না হয় মতির কথা শুনিয়া আগরায় গিয়া ব্যাপারটা কি দেখা যাউক।"

তখন বিদায়ের পালা আরম্ভ হইল। অনেক দিন পরে দেখা—আবার কবে সাক্ষাৎ হইবে কে জানে ? অশ্রুপ্রবাহ বর্ষার স্রোতের ন্যায় মেহেরের গণ্ডস্থল প্লাবিত করিল। মতি মেহেরকে অশ্রুপূর্ণ লোচনে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন,—"সখি! যতবার আসিয়াছি হাসিতে হাসিতে বিদায় দিয়াছ। আজ তোমার অবস্থা দেখিয়া বুক ফাটিতেছে। আশীর্ব্বাদ করি. তুমি চিরসুখিনী হও—" আর বলা হইল না। শোকোচ্ছ্বাসে কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

মতিয়া গিয়া পাল্কীতে উঠিল। মেহেরউন্নিসা সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া, মেহের মোগলসেনাপতি বৃদ্ধ রহমত খাঁকে বলিয়া পাঠাইলেন,—"বাদসাহের দ্বিতীয় আদেশের প্রয়োজন নাই। পরশ্ব প্রাতে আগরায় যাইবার বন্দোবস্ত কর।"

বৃদ্ধ রহমত এ সংবাদে অধিকতর আশ্চর্য্য হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আগরার রঙ্গমহলের ঐশ্বর্য্যটা বর্ণনা করিবই বা কি করিয়া ? আমার ক্ষীণ লেখনী ক্ষুদ্র ক্ষমতা—স্বল্প সীমাবদ্ধ অস্ফুট কল্পনা—শক্তিই বা আমার কই ? রঙ্গমহল কত বড়—রঙ্গমহলে কত কুবেরের ঐশ্বর্য্য—কত হীরামাণিক—কত ষোড়শী রূপসী। রঙ্গমহল চিত্রিত করিতে,—নির্ম্মাণ করিতে কত শিল্পীর জীবন কালস্রোতে ভাসিয়াছে!!

রঙ্গমহল রূপসীর মেলা। এ রূপসীদের মুখ সূর্য্য দেখিতে পান না—আকাশ দেখিতে পায় না, মুক্ত প্রকৃতি দেখিতে পায় না। চাঁদ দেখিতে পায় না। কেবল মুক্ত বাতায়নে প্রবিষ্ট—পুষ্পবাসিত মলয় বায়ু গোপনে এক আধবার আসিয়া সুন্দরীদের অলকা লইয়া খেলা করে, একটু সুগন্ধি নিশ্বাস চুরি করিয়া লইয়া বাহিরেরউদ্যানের ফুলের গন্ধের মধ্যে ছাড়িয়া দেয়। বহুমূল্য গোলাপ ইস্তাম্বুলের ভরপুর প্রাণের একাংশ চুরী করিয়া পলায়।

ঝাড়ের পাশে ঝাড়। দর্পণের পাশে দর্পণ। ফুলের মালার ঝালরের মধ্যে মধ্যে মতি-খচিত ক্ষুদ্র লাল, নীল, সবুজ, ফিরোজা গোলাপী, আসমানী রঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতাকা। তাহার কোন কোনটীতে বা হাফেজের প্রেমময় কবিতাংশ, ফর্দ্দুসীর তেজোময় কবিতা—আমীর খসরুর প্রেমময় গাথা—গুলেস্তার বহুমূল্য উপদেশের অর্দ্ধেদ্ধৃত অংশ। কোথাও পানপাত্রে নাগকেশর গুচ্ছ—কোথায় রূপার উপর সোণার কাজ করা ফুলদানীতে গন্ধরাজ ও গোলাপের রাশি, কোথায় কার্ণিসের উপর স্তম্ভ হইতে স্তম্ভান্তরে দোলায়িত—বেলা ও বনমল্লিকার হার। কোথাও মণিখচিত ফোয়ারায় বাঘের মুখ হইতে শীতল গোলাপের উৎস বহিতেছে, কোথাও মৃদঙ্গ, ভীমরাজ, পাপিয়া ময়না, সারী কাকাতুয়া দাঁড়ে বসিয়া মনের সুখে বুলি ছাড়িতেছে।

গৃহমধ্যে এক নাতিদীর্ঘ, নাতিপ্রশস্ত ক্ষুদ্র মর্ম্মর চৌবাচ্ছা। কাশ্মীর উপত্যকার অভ্রভেদী মহীধরের বক্ষচ্যুত—গলিত তুষার জলে সেই চৌবাচ্ছা পরিপূর্ণ। সেই গ্রীষ্মের দিনে চৌবাচ্ছার ধারে কয়েকজন সুন্দরী আলাপ করিতেছিলেন—কেহবা চৌবাচ্ছার শীতল মর্ম্মর কার্ণি-সের উপর অর্দ্ধ হেলায়িত দেহ যষ্টির ভার সংন্যস্ত করিয়া—কুণ্ডলিত ফণিনীর ন্যায় ঘনকৃষ্ণ কবরী হইতে গোলাপের পাপড়ি খুলিয়া পাপড়ী-গুলি সেই তুষার জলে ভাসাইয়া দিতেছিলেন। কেহ বা গল্প করিতে-ছিলেন—কেহবা মন দিয়া তাহা শুনিতেছিলেন। কেহবা একটী কাকা-তুয়াকে লইয়া রঙ্গ করিতেছিলেন।

বাস্তবিকই সে দিন রঙ্গমহলে একটা সুন্দর সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়া-ছিল। বাসন্তী পূর্ণিমা। উন্মুক্ত বাতায়ন পথপ্রবিষ্ট শ্বেত শুভ্র মর্ম্মরের চূর্ণীকৃত চাঁদের আলো, আর তার মধ্যে সেই স্বপ্নময় রাজ্যের উপস্থিত—সুন্দরীদের সেই সুন্দর মুখ। মরি! মরি! কি সুন্দরই দেখাইতেছিল। তাহারা সত্য সত্যই যেন পৃথিবীর নহে। বাসন্তী প্রভাতের মৃদুমলয়ে প্রস্ফুটিত-অর্দ্ধ উন্মেষিত পুষ্পকলিকা গুলি যেমন এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়ে—আপনা আপনি হাসির রাশি লইয়া ফুটিয়া উঠে—ইহারাও সেইরূপ আনন্দে আত্মহারা হইতেছিল।

তাহারা দিল্লীশ্বর জাঁহাগীর সাহের আদরের আদরিণী—প্রেমের ভিখারিণী! অনুগ্রহের আশাপ্রতীক্ষায় সে দিন আমোদিনী। কিন্তু আজ তাহাদের আশা পূর্ণ হইল না। বাদসাহ সে দিন রঙ্গমহলে দেখা দিলেন না।

রাত্রি অধিক হইয়াছে—বাতায়ন-পথ-প্রবিষ্ট চন্দ্রের বিমল কিরণ-মালা কি জানি কি ভাবিয়া চৌবাচ্ছায় ডুবিতেছিল! ফুলের মালার সরস গন্ধ ক্রমে বিরস হইতেছিল। স্বর্ণ পিঞ্জরের পাখী বুলি বন্ধ করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িতেছিল। কার্ণিসের উপর হইতে ফুলের মালার ফুল ঝড়িয়া পড়িতেছিল। বেগমেরা—সকলে স্ব স্ব কক্ষে নিরাশ হৃদয়ে ফিরিলেন।—রহিলেন কেবল দুইজন—সোফিয়া ও ইরাণের নূতন সুন্দরী বেগম পিয়ারি।

পিয়ারি বড়ই ক্লান্ত হইয়াছিল। বলিল—"সোফি! বহিন্ আমার একটা পিয়ালা সিরাজী দে।"

অন্য সময় হইলে সোফি উঠিতে আপত্তি করিত। কিন্তু তখন পিয়ারির নিকট তাহার কিছু কাজ ছিল। স্বর্ণপাত্র ভরিয়া সিরাজী ঢালিয়া সোফি তাহাতে গুলাব মিশাইল—একটু বরফ দিল। পিয়ারি এক নিশ্বাসে শেষ করিলেন। সোফি কোন আপত্তি করিল না।

পিয়ারির প্রাণ ক্রমে ক্রমে খুলিয়া গেল। বক্ষের উপর যে একটা পাষাণের ভার ছিল, সেটা সরিয়া গেল। প্রাণে স্ফূর্ত্তি দেখা দিল। পিয়ারি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া আপনা আপনি বলিল—"আজ আর আসিবেন না। বলিয়াছিলেন—গান শুনিবেন, বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন।"

কথাটা সোফিয়ার কাণে গেল। সোফি মনে মনে বলিল "এতদূর গড়াইয়াছে।" প্রকাশ্যে বলিল—"পিয়ারি—

"কেন সই—"

"এ চাঁদিমার রাত্রি কি অমনি কাটিবে ?"

"কেন ভাই—এস্‌রাজটা আনিয়া দে। গান গাহিয়া কাটাইয়া দিই।"

"আর গান ভাল লাগে না। জাঁহাপনা ত লুকাইয়া মেহেরের কাছে জান নাই।"

"সে পথ বন্ধ—তাহার সর্ব্বনাশ ত আমিই করিয়াছি।"

"তুমিই করিয়াছ—একি কথা সখি ? সে তোমার কাছে কি অপ-রাধ করিয়াছে ?"

সেরাজী তখন পিয়ারির মস্তিষ্কে পূর্ণ শক্তি প্রকাশ করিয়াছিল। তাহার দিল খুলিয়া গিয়াছে। সে সগর্ব্বে বলিল—সে অপরাধী নয়, তার সৌন্দর্য্য অপরাধী, সে অপরাধী নয়—জাঁহাপনার চক্ষু অপরাধী। আমি নূতন আসিয়া যে আদর পাইতেছি—সে তাহার কণ্টক হইবে, কেন তাহাকে নষ্ট করিব না ?"

"তুমি মুঙ্গের গিয়াছিলে কেন ?"

"পাহাড়ের হাওয়া খেতে—জান না আমার কঠিন পীড়া হইয়াছিল।"

সোফিয়া হাসিয়া বলিল—তা'ত বটে; কিন্তু মুঙ্গের হইতে বর্দ্ধমানে বাঁদী সাজিয়া গিয়াছিলে কেন ?"

পিয়ারি শিহরিয়া উঠিল। বলিল—"তুমি কেমন করিয়া জানিলে ?"

সোফিয়া—কপট রুষ্টভাবে বলিল—"ছি সখি! অবিশ্বাস করি-তেছ ? তুমিই ত একদিন বলিয়াছিলে।"

পিয়ারি হাসিয়া উঠিল, বলিল—"ক্ষমা কর ভাই! সব কথা মনে থাকে না। বর্দ্ধমানে না গেলে কি এত শীঘ্র কার্য্য সিদ্ধি হইত ?"

"কি কার্য্য সিদ্ধি—"

"মেহেরের সর্ব্বনাশ!"

"কিসে ?"

"পদাঘাতের কথায় জাঁহাপনা—একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন।"

"তাহাতে বিশ্বাস কি ? বাদসাহের মন সমুদ্রের বায়ু—কখন শান্ত, কখনও চঞ্চল।"

"তা নয় সখি ! ঝড় বহিয়াছে। মেহের আসিয়া অবধি যে অবস্থায় কাটাইতেছে—শুনিলে আমারও দয়া হয়। একটা বাঁদী যে মসহারা পায়, সে তাও পায় না।

সোফিয়া ভাবিল—পিয়ারি মানবী বেশে সয়তানী। এমন করিয়াও লোকের সর্ব্বনাশ করিতে হয় ! সোফি পিয়ারির কাণে কাণে বলিল—"জাঁহাপনা নাকি মেহের আসিবার পরদিন গোপনে দেখা করিতে গিয়াছিলেন !"

পিয়ারি বলিল—"হাঁ, মেহের দর্পভরে ভাল করিয়া কথা কহে নাই, উঠিয়া দাঁড়ায় নাই। পদাঘাত খাইয়াও তিনি সাধিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু মেহেরের সে অহঙ্কার সহ্য করিতে পারিলেন না। আর দেখা দিলেন না। দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিল।"

আগরায় ঘণ্টাঘর হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর ঘোষণা হইল। পিয়ারি সেইখানে ঢলিয়া পড়িল। সোফি একটা বাঁদিকে ডাকিয়া দিয়া উদ্যানের দিকে চলিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ভবিতব্য মানুষের অদৃষ্টে লুকাইয়া, অলক্ষ্য হস্তে, অস্পষ্ট অক্ষরে, কি কোথায় লিখিয়া রাখে, তাহা যদি তাহারা জানিতে পারিত তাহা হইলে কাহারও দুঃখভোগ হইত না। মানুষের কল্পনার সুখের উদ্যান, নিরাশায় উষ্ণনিশ্বাসে দগ্ধ হইয়া যাইত না। মেহের উন্নিসা যাহা ভাবিয়া মতিয়ার কথা শুনিয়া আগরায় আসিলেন, ভবিতব্য সেগুলি ওলট পালট করিয়া দিয়াছে। এখন যেন কি একটা প্রজ্ঞাবলে মেহের নিজের অদৃষ্টের সেই অস্পষ্ট অক্ষরগুলি অল্প অল্প পড়িতে পারিতেছে।

পড়িতে পারিয়া, নিজের ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারিয়া—মেহের আরও শীর্ণ হইয়াছে। পুরীর এক প্রান্তে, নির্জ্জন কক্ষে পড়িয়া সেই আদরের আদরিণী মর্ম্ম বেদনায় চিন্তাকুল হইয়া পড়িতেছে। সেই সরস, প্রফুল্ল গণ্ডে কে যেন কালিমা রেখা আঁকিয়া দিয়াছে।

দিন এক রকমে কাটে। রাত্রি কাটে না। কক্ষের পাশ দিয়া নৈশ যমুনার কলসঙ্গীত শুনিতে শুনিতে, উন্মুক্ত বাতায়ন বক্ষ প্রবৃষ্ট, নৈশ শীতল বায়ুতে শরীরের উষ্ণতা একটু কমিলেই সে তন্দ্রার কোলে লুটিয়া পড়ে। কিন্তু নিদ্রাতেও নিস্তার নাই। জাগ্রতে চিন্তা—নিদ্রায় স্বপ্ন !

মেহের উন্নিসা স্বপ্নে দেখে, যেন দামোদরের খরস্রোত চুম্বিত, তট ভূমির উপর সেই শুভ্র অট্টালিকায় অন্ধকারময় কক্ষে সে একাকিনী পড়িয়া আছে। দামোদরের গর্ভ হইতে পুঞ্জীকৃত ঘনান্ধকার যেন তাল পাকাইতে পাকাইতে তাহার সেই আলোক হীন নির্জ্জন কক্ষের ভিতর জমাট বাঁধিয়া প্রবেশ করিয়াছে। যেন প্রলয়ের কাল কাল মেঘগুলা, ক্ষণকাল বিশ্রাম করিবার জন্য তাহার কক্ষে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। সেই অন্ধকাররাশি যেন তাহার শয্যার আশে পাশে, শ্বেত শুভ্র উপাধানের উপর, লোহিত মকমলের শয্যাস্তরণের উপর, খট্টার নিম্নে, ঊর্দ্ধে, অধঃ চারি দিকে—ফুৎকার করিয়া এক দ্রুত প্রবাহী বায়ু তরঙ্গের সাহিত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কখনও বা তাহাকে গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছে। ভয়ে আতঙ্কে অভাগিনী শিহরিয়া উঠে—চীৎকার করিয়া উঠে, ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। আবার শয্যাত্যাগ করিয়া বাতায়নে বসিয়া দেখে, কৃষ্ণ সলিলা যমুনার উপর জ্যোৎস্নার রাশি—বাসন্তী সমীরে দূরশ্রুত অস্ফুট বংশীনিনাদ। জ্যোৎস্নার কোলে বিরাট নিস্তব্ধতা। আর অদূরস্থিত রঙ্গমহলের অস্ফুট আমোদ কোলাহল।

মেহের আগরা আসিবার পর, এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। জাঁহাগীর বাদসাহ একবার দেখাও দেন নাই। দেখা দেওয়া দূরে থাক্; একবার সংবাদ লন নাই। সরকার হইতে জীবনোপায়ের যাহা বৃত্তি স্বরূপ ধার্য্য হইয়াছে, তাহাতে বড় কষ্টে দিন কাটে। দুই চারিটী বাঁদী রাখিতে হইয়াছে, নিজের পেটও আছে, তাহাতে আর চলে না। ঘৃণায়, অভিমানে অভিমানিনী কাহাকেও মনের কথা প্রকাশ করিয়াও বলেন না। অনেকে বলিয়াছিল—"বাদসাকে একবার জানাও।" মেহের তাহার জবাব দেয় নাই। মনে মনে খালি বলিয়াছিল—"ছি ! মরিয়া যাই তাও স্বীকার, তবু অত ছোট হইয়া দিন গুজরাণের জন্য ভিক্ষা করিতে পারিব না।" শেষ মেহের উন্নিসা মনে মনে স্থির করিল, আর কাহারও মুখের দিকে চাহিব না ! যাহা অদৃষ্টে আছে হইবে, নিজের হাত আছে, শিল্পকলা শিখিয়াছি। যেরূপে হয় দিন কাটিবে। দিল্লীর বাদসার বৃত্তিভোগী হওয়ায় অপেক্ষা স্বোপার্জ্জিত অন্ন আরও সুখকর।

যথা প্রতিজ্ঞা তথা কার্য্য। মেহের তাহাই করিল। বাঁদী রাখিয়া লোকরাখিয়া শিল্প কার্য্য আরম্ভ করিল। সলমার কাজ, জড়োয়ার কাজ, বিচিত্র শিল্পের চরমোৎকর্ষের নিদর্শন, সেই দক্ষিণ ও বাম হস্তের চম্পাকবৎ অঙ্গুলিগুলি সৃষ্টি করিতে লাগিল। বাঁদি সেগুলি আগরার চকে বিক্রয় করিয়া আসে। প্রথম শিল্পের মূল্য মেহের যাহা আশা করিল, তাহার শত গুণ পাইল। দশ আসরফির স্থানে হাজার আসরফি পাইল। কে এই মহাপুরুষ—কে সেই শিল্পের সৌন্দর্য্যভোগী, পুরস্কার দাতা—মেহের কিছুই জানিতে পারিল না। মেহের আসরফি গুনিয়া বাক্সে রাখিল। বাঁদীগুলার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিল। পোষাক বদলাইয়া দিল। মীর মুন্সীকে ডাকিয়া বলিল—"আজ হইতে রসদ বন্ধ করিয়া দিও। আর তোমাদের ভিক্ষার উদর চালাইতে চাহি না।" মীর মুন্সী আশ্চর্য্য হইয়া চলিয়া গেল।

আগরার অন্দরমহলে—মেহেরের সকল স্থানেই অবারিত দ্বার ছিল। কিন্তু সে কখনও নিজের কক্ষদ্বার অতিক্রম করিত না। সেই পুরীর মধ্যে দুই জন তাহাকে স্নেহচক্ষে দেখিত। একজন আকবরের গর্ভধারিণী, বৃদ্ধা পক্ককেশা, মহাপুণ্যবতী, বীরপত্নী, বীরমাতা হামিদাবানু বেগম সাহেবা—দ্বিতীয়া অম্বর রাজকুমারী—জাঁহাগীরপত্নী যোধাবাই। হামিদাবানু লাহোরে গ্রীষ্মাতিশয্য জন্য চলিয়া গিয়াছেন। এখন এই বৃহৎ পুরীর মধ্যে মেহেরের একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষিণী—রাজ্ঞী যোধাবাই। যোধাবাই আজ কয়েক দিন—মেহেরের কাছে আসেন নাই। বাতায়ন পথে বসিয়া তাহার কথাই মেহের একান্তমনে ভাবিতেছিল।

বাঁদীরা আহারে গিয়াছে। মধ্যাহ্নকাল—মেহের একাকিনী বসিয়া গ্রীবাবনত করিয়া আপনার কাজ করিতেছেন। শিল্পের দিকে মন। মন নিবিষ্ট অপর দিকে দৃষ্টি নাই। সহসা সম্মুখের দ্বার খুলিয়া একজন—নিঃশব্দে গৃহ প্রবেশ করিল। সে চরণ-যুগল এত কোমল, তাহার গতি এত শব্দহীন যে কঠিন মেঝের উপর কোন শব্দমাত্রও হইল না। সে গতি এত চাঞ্চল্যবর্জ্জিত যে কেহ তাঁহার আগমন জানিতে পারিল না, সেই মরালগামিনী গৃহমধ্যে প্রবিষ্টা হইয়া ধীরে ধীরে মেহেরের চক্ষু দুইটী হস্ত দ্বারা পশ্চাৎ দিক্ হইতে আবরণ করিলেন। মেহের ইতি পূর্ব্বে মতিয়ার কথা ভাবিতেছিলেন—মনে করিলেন মতিয়া আসিয়াছে। আগ্রহে বলিয়া উঠিলেন "মতি—মতি এতদিন পরে কি মনে পড়িল সখি !"

সে মতি নয়, উত্তর দিবে কেন ? রহস্যকারিণী স্বর পরিবর্ত্তিত করিয়া বলিল—

"আমি কে বল দেখি ?"

সে স্বর লুকাইবার যো নাই—মেহের তাহা চিনিতে পারিল—বলিল "আপনি আসিয়াছেন ! ভালই হইয়াছে। এত দিন দেখা দেন নাই কেন ? আপনার মহলে যাইতে সাহস হয় না। কিন্তু আর একা থাকিতে পারি না।"

আর রহস্য করা হইল না। সুন্দরী হাত খুলিয়া লইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সে উচ্ছ্বসিত রূপের তরঙ্গ, সে উন্মুক্ত কেশকলাপ,

সেই বড় বড়—ভাসা ভাসা—মদিরাময় দুইটী আঁখি, সেই সরস সদা প্রফুল্ল নলিনীবৎ মুখকান্তি শত মাধুরী লইয়া মেহেরের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল।

অধরে ক্ষীণ হাসির রেখা লইয়া মেহের বলিল—"বন্দেগি—বাদসা বেগম ! আমার এ ক্ষুদ্র কক্ষ আজ পবিত্র হইল। সৌভাগ্যের কথা—না জানি আজ কার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম। আপনি অম্বরের-পবিত্র কুলোদ্ভূতা দিল্লীশ্বরের পাটরাণী—এ দীনার প্রতি আপনার অশেষ করুণা। সকলে ত্যাগ করিয়াছে, মতিয়াও ভুলিয়াছে, আপনি ভুলেন নাই"। অম্বর রাজকন্যা রাজ্ঞী যোধাবাই নিজ প্রশংসায় লজ্জিতা হইলেন। তিনি মতিরাণীর বাল্য সখি। মতিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিয়া দিয়াছিল—"মেহেরজান আমার "জান"—আমার কলিজা, তুমি যেমন আমায় ভালবাস, মেহের তার চেয়ে ভালবাসে। মেহেরকে যত্ন করিও।" রাজপুত কন্যা নীচ হইতে পারে না, যোধাবাই প্রায়ই মেহেরকে দেখিতে আসিতেন।

রাজরাজেশ্বরী—কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—"কেমন আছ সখি ! সে দিন রাত্রে রঙ্গমহলে আমায় খুঁজিতে গিয়াছিলে কেন ? আমি নিজের মহলেই থাকি। রঙ্গমহল পাটরাণীর জন্য নয়।"

"ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আপনার মহলে যাইতে সাহস হয় না। মতিয়াও আসিল না—আপনাকেও সপ্তাহাবধি দেখি নাই"—যোধাবাই—মেহেরের কাছে বসিলেন। একখণ্ড মখমলের উপর মেহের অতি সুন্দর হীরা মতির শিল্প কাজ করিয়াছিলেন। পেটিকার মধ্য হইতে তাহা বাহির করিয়া আনিয়া দিল্লীশ্বরীর সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন "একটী সামান্য উপহার, দীনার এ উপহার কি রাজরাণীর যোগ্য ? দয়া করিয়া স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ রাখিবেন কি ?"

মহারাণী যোধাবাই সে সুন্দর শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া মোহিত হইলেন। মেহের নিজে সুন্দরী, তার শিল্পও অতি সুন্দর। তার ভালবাসা তার চেয়ে সুন্দর। শিল্পকলায় দেখা যাইতেছে—এক মরাল মৃণালেকে উৎপাটন করিয়া দূরে ফেলিয়া দিতেছে। যোধাবাই এ কবিত্বময় শিল্পের মর্ম্ম বুঝিলেন। তাহার হৃদয় করুণায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। রমণী হইয়া রমণীর কষ্ট অতি সহজে বুঝিলেন। সেই ভাসা ভাসা চক্ষে দুইটী মুক্তাফল দেখা দিল।

মেহের উন্নিসা—মুখ নত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মতিয়ার কোন সংবাদ পাইয়াছেন কি ?"

"হাঁ—পাইয়াছি।"

"কবে আসিবে ?"

"অতি শীঘ্র—চারিদিন পরে বাদসাহের জন্মোৎসব আরম্ভ হইবে। রাজা গজপতি—বাঙ্গালায় একটী বিদ্রোহ দমনে বড় ব্যস্ত—কিন্তু সে দিনে তাহাকে আসিতেই হইবে। রাজা না আসিলে ত রাণীজি আসিবেন না।"

মেহেরউন্নিসা—এই রহস্যে একটু হাসিলেন। বলিলেন—"মাঝে মাঝে আপনি আসিয়া দেখা দিবেন। এত বড় মহলের এক কোণে বন্দীর মত একা আর থাকিতে পারি না। আমায় ছাড়িয়া দিন—যে দিকে ইচ্ছা চলিয়া যাই।"

বাদসাবেগম যোধাবাই, মেহেরের চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া বলিলেন,—"ওকি কথা সখি ! আমিত আসিব—আবার মতি আসিলে দুই জনেই আসিব। আজ তবে বিদায় হই।"

যোধাবাই কক্ষ হইতে ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। মেহেরউন্নিসা তাঁহার দিকে চাহিয়া, এক মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "রাজপুত কুললক্ষ্মী ! তোমার দয়া মেহেরজান ভুলিবে না। তোমার মিষ্ট কথা—এ অভাগিনী ভুলিবে না। এজীবনে নয়—মরিলেও নয়। আমার সব গিয়াছে। কল্যাণী তুমিই খালি আছ। পাটরাণী হইবার উপযুক্তই তুমি।—"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

লোহিত প্রস্তরময় বিচিত্র কারুকার্য্য-খোদিত, এক নিভৃত কক্ষে সুকোমল মখমল শয্যায় অঙ্গ হেলাইয়া, মহারাণী যোধাবাই সন্ধ্যার পর বিশ্রাম করিতেছিলেন। গৃহের কোন স্থানে গণেশের মূর্ত্তি—কোথাও বা কালিকার দৈত্য সংহারিণী মূর্ত্তি—কোথাও বা হিমাদ্রি-শিখরে মদন-ভস্ম, কোথাও বা রতি-বিলাপ, কোথাও বা গভীর অরণ্যানীমধ্যে উচ্ছ্বসিত চন্দ্রালোকে মহাশ্বেতার বিষাদ মাখা নৈশসঙ্গীত-চিত্র। ভিত্তি গাত্রস্থ, বীণাবাদিনী মহাশ্বেতার চিত্রখানার প্রতি মহারাণী মাঝে মাঝে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। তাঁহার প্রাণে একটা মৃদু সঙ্গীতোচ্ছ্বাস বহিতেছিল। এক একবার উন্মুক্ত বাতায়নপথে সান্ধ্য গগনের দুই একটী ফুটন্ত উজ্জ্বল তারকার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছিলেন। কখনও বা নিকটস্থ স্বর্ণময় তাম্বূলাধার হইতে এক আধটী সোনালী রঞ্জিত মৃগনাভিবাসিত তাম্বূল লইয়া সেইরক্তোৎফুল্ল ওষ্ঠাধরকে আরও রঞ্জিত করিয়া, রজত পিকাদানিতে তাহার লোহিতাক্ত রস পরিত্যাগ করিতেছিলেন। বাদসাহের সন্ধ্যার পর আসিবার কথা আছে। কাল তাঁর জন্মোৎসব। সমস্ত আগরা কাল উৎসবানন্দে ভাসিবে। বিলম্ব দেখিয়া মহারাণী অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন। ভিত্তি গাত্রাবলম্বিত একটী বীণা লইয়া, ধীরে ধীরে, সেই সুকোমল চম্পাকবৎ রক্তাভ অঙ্গুলির আঘাতে তাহাতে মধুর ঝঙ্কার তুলিলেন।

সুরটা সহজেই মিলিল। পরদায় পরদায় সেই সুন্দর অঙ্গুলিগুলি ষড়জ, গান্ধার, রেখাব, ধৈবত ও পঞ্চম লইয়া আলাপ করিতে লাগিল। রাণী তাহার সহিত নিজের কোকিলকণ্ঠ মিশাইলেন। তিনি গাহিতে লাগিলেন,—

"পিয়ারে ! সইয়া দিনওয়া বহুত গৈল বীত্
যব সে গ'য়ে মেরি, সুধহুঁ সে পিয়ারী
কৌন্ গাঁওকে রীত—
তন্ মন্ ধন্ মোরা, তোঁহিকে সে পিঁহু
ইহ কৈসে অন্‌রীত।

সুর ক্রমে ক্রমে পঞ্চমে উঠিল। বীণা বড় মিঠে বলিতে লাগিল। বাতাস সেই পঞ্চমের মাধুরী মাখা সুর লইয়া পাষাণময় কক্ষ মধ্যে ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল। সেই সুচিত্রিত ভিত্তি-গাত্রে মূর্চ্ছণামাখা সুরগুলি আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

একজন অর্দ্ধোন্মুক্ত দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছিলেন। মহারাণী বিরক্ত হইয়া বীণ্ রাখিয়াদিলেন দেখিয়া, তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন। মহারাণী পিছন ফিরিয়াছিলেন, দেখিতে পান নাই। কিন্তু সম্মুখের দর্পণে মনুষ্যের প্রতিবিম্ব দেখিয়া চিনিতে পারিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রবেশকারী আর কেহই নহে—স্বয়ং দিল্লীশ্বর।

দিল্লীশ্বর প্রেমপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন,—হৃদয়েশ্বরী ! এত দিনের পর বিরহ জাগাইয়া ভুলিলে কেন !"

মহারাণী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এ বিরহ আমার নয় জাঁহাপনা ! ধার করিয়া আনিয়াছি।"

জাঁহাগীর শাহ হাসিয়া বলিলেন—"মন্দ ব্যবসা নয়, কিন্তু তোমার ঐ মারবারী গানটা আমার বড় ভাল লাগে।"

যোধাবাইয়ের অলকাগুলি তখন উন্মুক্ত বাতায়ন-প্রবিষ্ট মৃদু বায়ুস্রোতে ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছিল। সহস্র দীপাধারের উজ্জ্বল আলোক সেই অবগুণ্ঠনচ্যুত সুন্দর মুখে পড়িয়া অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। জাঁহাগীর শাহ, সেই মৃদু-মলয়োৎক্ষিপ্ত অলকাগুলি ধীরে ধীরে গুছাইয়া দিতে লাগিলেন। সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন "অসময়ে কেন ডাকিয়াছ মহারাণী।"

"কাল আপনার জন্মোৎসব। দেশের দীন দরিদ্র আশানুরূপ

ভিক্ষা পাইবে। আমি হিন্দুস্থানের মহারাজ্ঞী, দিল্লীশ্বরের পাটরাণী হইয়া এই উৎসব উপলক্ষে আপনার কাছে কিছু ভিক্ষা করিব।"

"কি ভিক্ষা! দিল্লীশ্বরী কিসের ভিখারিণী? কি চাও?

"ক্ষমা।"

"কার জন্য?"

"আমার প্রিয় সখীর জন্য।"

"তোমার প্রিয় সখী—মতিরাণীর। সে কি অপরাধ করিল? যুগান্তর ত তাহাকে দেখি নাই।"

"মতি নয়, আর এক জন। সে মতিয়ার অপেক্ষাও আমার প্রিয়। আর কত দিন এরূপ ভাবে তাহাকে রাখিবেন? এত কষ্ট করিয়া গাছ হইতে ফুলটী ছিঁড়িয়া, তাহাকে আবার অনাদরে পদতলে ফেলিলেন কেন?"

জাঁহাগীর বুঝিলেন, মেহেরের কথা হইতেছে। প্রসঙ্গটা তাঁহার ভাল লাগিল না।—বলিলেন,—"এই জন্যই কি ডাকিয়াছিলে?"

'হাঁ—জাঁহাপনা! দাসীর প্রার্থনা কি পূর্ণ করিবেন না?"

"করিব—যে দিন সেই পদাঘাতের কষ্ট ভুলিব।"

"কে বলিল—মেহের এ কথা বলিয়াছে?"

"পিয়ারী বেগম—সে নিজে ছদ্মবেশে বর্দ্ধমান গিয়াছিল। স্বকর্ণে শুনিয়াছে।"

"তার এত মাথা ব্যথা কেন?"

"সে নিজের কাজে রাজমহলে গিয়াছিল। আমার কোন খপর পাঠাইবে বলিয়া মীরমুন্সীর সহিত বর্দ্ধমান দেখা করিতে যায়। মেহের-উন্নিসার রূপটা কেমন—তাই সে দেখিতে গিয়াছিল।"

"পিয়ারী বেগম মিথ্যাবাদিনী—সে মেহেরের শত্রু।"

"হইতে পারে—কিন্তু পদাঘাতের কথাটা সত্য। আমি বিশ্বাস করি নাই—কিন্তু গোপনে যে দিন মেহেরর সহিত দেখা করি—"

যোধাবাই উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "জাঁহাপনা! মার্জ্জনা করিবেন। রমণী, রমণীর হৃদয় যত দূর বুঝে—আর কেহ তত দূর নয়। মেহের স্বভাবতই অভিমানিনী। অভিমানে—একটু উপেক্ষা আনে। কিন্তু সেটা আন্তরিক নয়। যেরূপ অবস্থায় মেহের পুরী প্রবেশ করিয়াছিল, সে অবস্থায় আপনার দেখা করা উচিত হয় নাই। প্রেমালাপ করিতে যাওয়া ভাল হয় নাই।"

জাঁহাগীর শাহ কি ভাবিতে লাগিলেন। বলিলেন,—"এখন কি করিতে হইবে?"

"কাল আপনার জন্মোৎসব। সকল বেগমেরা আনন্দোৎসবে মাতিবে। আমীর ওমরাহের স্ত্রী কন্যা ও ভগিনীতে রঙ্গমহল পূর্ণ হইবে। এ বিশাল পুরীতে মেহের কেন—বিষাদিনী থাকিবে? তাহাকে আহ্বান করিয়া—সকলের চেয়ে বেশী আদর করুন।"

"তোমার চেয়েও বেশী আদর করিব—তোমার প্রাণে ব্যথা লাগিবে না?"

"না জাঁহাপনা। আমি আপনার পাটরাণী—আমি তার জন্য সিংহাসনের আধখানা ছাড়িয়া দিব।"

জাঁহাগীরশাহ মনে মনে ভাবিলেন—"রাজপুত মেয়ের উপযুক্ত কথাই বটে। ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন,—"যাই বল তোমার এ প্রার্থনা এখন পূর্ণ করিতে পারিব না। মহারাণি, আমায় মার্জ্জনা করিও।"

যোধাবাই অভিমান পূর্ণ স্বরে বলিলেন—ছি—ছি—জাঁহাপনা! আপনি না এত বড় হিন্দুস্থানের সম্রাট। আপনি অত নিষ্ঠুর হইলে চলিবে কেন? মেহের—রমণী রত্ন—তাহার মর্ম্ম আপনি বুঝিলেন না। এই বড় কষ্ট! আজ এক বৎসর—সে ঘৃণায় আপনার অন্ন স্পর্শ করে নাই—নিজের শিল্প দ্রব্য বিক্রয়ে দিন গুজরাণ করিতেছে। তার দাসী বাঁদিকে যে পোষাক দিয়াছে ধন রত্ন দিয়াছে, আপনার বেগমদের অনেকের তা নাই। দিল্লীশ্বরের পাটরাণী হইবার সেই ত উপযুক্ত।"

জাঁহাগীরশাহ মেহেরের এ দুরাবস্থার কথা শোনেন নাই—কেহ তাহাকে শোনায় নাই। তিনি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। আবার সেই পুরাতন অনুরাগ-স্ফুলিঙ্গ একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কোমল স্বরে বাদসাহ বলিলেন,—"তুমি কি তার মহলে যাও?"

"প্রায়ই—অভিমানে সে এখানে আসে না। আমি তাকে ভালবাসি তাই যাই—না দেখিলে থাকিতে পারি না।"

বাদসাহ একটু নরম সুরে বলিলেন,—

"কাল মীরমুন্সীকে শাসন করিয়া দিব। আমি তাহাকে রাজরাণীর মত বন্দোবস্তে রাখিতে বলিয়াছি।"

"মীরমুন্সার দোষ নাই। মেহের নিজে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। আমি একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'তোমার বাঁদীদের এত সুখে রাখিয়াছ—নিজে কেন কষ্ট পাও?' মেহের বলিল—'এরা আমার বাঁদী—আমার নিজের ইচ্ছামত ইহাদের সুখী করিয়াছি। আমি যার বাঁদী তিনি যেমন রাখিয়াছেন, তেমনি আছি।' জাঁহাগীরসাহের প্রাণে একটা তীব্র আঘাত লাগিল, সেই পদাঘাতের কল্পিত-আঘাতটা যেন একটু সরিয়া গেল। মেহেরের সেই শরতের ষোলকলা পূর্ণ শশীর ন্যায় যৌবনের পরিস্ফুট সৌন্দর্য্য—কালবৈশাখীর মেঘের ন্যায়—তাহার হৃদয়ের এক কোণে দেখা দিল। সেই মেঘমালা ফুলিয়া ফুলিয়া বড় হইল। তিনি মনে মনে বলিলেন—'এত গুণ তার! আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।" প্রকাশ্যে বলিলেন,—"মহারাণী! কাল তোমার অনুরোধ পালন করিতে পারিব না। দুই একদিন পরে বিবেচনা করিয়া দেখিব।"

"জাঁহাপনা—হৃদয়েশ্বর! এ অপমানে তাহার বুক ভাঙ্গিয়া যাইবে। সকলে আমন্ত্রিত হইয়া আনন্দে ভাসিবে, সে যখন শুনিবে, এই উৎসবক্ষেত্রে কেহ তাহাকে খোঁজে নাই, সে অভিমানে বিষ খাইবে।"

জাঁহাগীর এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। তাহার হৃদয়ে বৃশ্চিক দংশনবৎ একটা জ্বালা উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি সে জ্বালায় বড় অস্থির হইয়া পড়িলেন। তখন দিল্লীশ্বরীর সংসর্গ যেন তাহার ভাল লাগিল না। তিনি সহসা গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন,—"পরশ্ব প্রাতে ইহার উত্তর দিব। আজ অনেক কাজ।"

দ্রুতপদে—জাঁহাগীরসাহ কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। যোধাবাই বাদসাহের অবস্থা দেখিয়া বুঝিলেন, ঔষধ ধরিয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ।

আগরার অনতিদূরে এক গুল্মাচ্ছাদিত ভগ্ন মসজিদে অনেক দিন হইতেই সেলিম সা নামক এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করিতেছিলেন। লোকে জানিত, সেলিম সা সর্ব্বজ্ঞ—কিন্তু সেই স্থানটা ভীষণ জঙ্গলবেষ্টিত বলিয়া—আর ভূতপ্রেত-ঘটিত একটা অপবাদ তাহার নামের সহিত লিপ্ত থাকায়, কেহ সেখানে দিবা ভাগেও যাইতে সাহস করিত না।

সেলিম সা, আকবর সাহের সভায় মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিতেন। তাঁর মৃত্যুর পর আর কেহ তাঁহাকে রাজপুরীতে প্রবেশ করিতে দেখে নাই। মুসলমান ফকির হইলেও হিন্দু জ্যোতিষে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল।

এক স্তিমিত দীপালোকে বসিয়া বৃদ্ধ ফকির খড়ি দ্বারা নিবিষ্ট মনে অঙ্কপাত করিতেছেন। আর তাঁহার নিকটে বসিয়া এক কৃশাঙ্গী পরমা রূপসী সেই দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। সেই স্তিমিত দীপের আলোক তাহার সুন্দর মুখের উপর পড়ায় অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। বোধ হইতেছিল আলোটা যেন তাহার রূপের আভায় মলিন হইতেছে।

সন্ন্যাসী মুখ তুলিলেন। রমণী কোকিল-কণ্ঠ-নিন্দিত স্বরে প্রশ্ন করিলেন,—"কি দেখিলেন প্রভু?"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"মা! তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না।"

"দিল্লীর সিংহাসন তবে আমার নয়?"

"না—"

"কেন নয়।"

"আর এক সৌভাগ্যবতী তোমার অদৃষ্টকে অন্তরাল করিয়া আছে। তাহার তিরোভাব না হইলে—"

"তাহাকে উন্মূলিত করিব।"

"অসম্ভব—তা করিও না। নারীহত্যা মহাপাপ। সাধ্য কি তোমার মা—যে অদৃষ্ট লিপি খণ্ডন কর।"

"তবে কি হইবে প্রভু! আমার পরিণাম কি? বড় জ্বালায় জ্বলিতেছি।"

"পরিণামের কথা শুনিও না—ভয় পাইবে।"

"ভয় পাইলে এত রাত্রে, দিল্লীশ্বরের প্রিয়তমা হইয়া আপনার নিকট আসিতাম না। কি দেখিলেন খুলিয়া বলুন।"

"তোমার অদৃষ্টে অপঘাত দেখিতেছি। বিষ না হয় শাণিত ছুরিকায় তোমার জীবন নষ্ট হইবে।"

রমণী শিহরিয়া উঠিল। তাহার শরীরে বিদ্যুৎস্রোত বহিল। এক অব্যক্ত যাতনায় তাহার প্রাণ, ভূগর্ভস্থ মহোষ্ণ-দাবানলের ন্যায় জ্বালাময় হইল। ক্ষিপ্রগতিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—"চরণ বন্দনা করিতেছি বিদায় দিন।"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"একাকী যাইবে মা! রাত্রি দ্বিতীয়প্রহর উত্তীর্ণ হয়।"

"কিছুই ভয় নাই। অদূরে শিবিকা আছে।"

"আমি না হয় সঙ্গে যাই।"

"কোন প্রয়োজন নাই।"

রমণী চলিয়া গেল। সম্মুখে আঁকাবাঁকা জনসমাগম-শূন্য—অন্ধকার বেষ্টিত প্রশস্ত রাজপথ। এমন সময়ে কে যেন পশ্চাত হইতে তাহার বস্ত্রাঞ্চল স্পর্শ করিল। মৃদুস্বরে ডাকিল—"পিয়ারিবেগম!"

রমণী ফিরিয়া দাঁড়াইল—দেখিল সমুখে আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত মনুষ্য-মূর্ত্তি। কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"কে তুমি। কেন আমার পথরোধ করিলে?"

"পিয়ারি বেগম—আমি তোমার শত্রু নই। মিত্র ভাবিও—এ রাত্রে কোথায় গিয়াছিলে?"

"সে খপরে তোমার প্রয়োজন কি?"

"আছে—না হইলে জিজ্ঞাসা করিতাম না। সেলিম সা ফকির যে উপকার করিতে না পারিয়াছে, আমি তাহা করিব। তোমার কণ্টক উদ্ধার করিব।"

"পিয়ারি আশ্চর্য্য হইল। এমন বিপদে সে কখনও পড়ে নাই। সাহস অবলম্বনে বলিল—"অজানিত পান্থকে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। রাজপথ সকল কথায় উপযুক্ত নহে। আমার সঙ্গে এস।"

"আর তুমি আমায় ধরাইয়া দাও। না—পিয়ারি তা হইবে না। ঐ দেখ উপরে অনন্ত নীলিমাময় আকাশ। আর তার উপর একজন অন্তর্যামী—তাহার নামে দুইজনে শপথ করি এস—কেহ কাহারও অনিষ্ট করিব না।"

পিয়ারি ভাবিল,—এরূপ শপথে দোষ কি, বলিল—"আচ্ছা তাহাই করিলাম। এখন তুমি কি চাও।"

'মনে পড়ে পিয়ারি—তুমি যখন বর্দ্ধমানে মেহের উন্নিসাকে দেখিতে যাও—কে তোমায় বৃদ্ধ সেনাপতি রহমতের হুকুমে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল?"

"মনে আছে—সে রস্তম আলি সেনাপতি। কিন্তু সেত মরিয়াছে শুনিয়াছি।"

"রস্তম আলি মরে নাই—বেগম সাহেব। সে তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া।"

পিয়ারি শিহরিয়া উঠিল। ভগ্ন মসজিদের ভূতের কথাটা এতক্ষণের পর তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। সে মনে মনে নবীগণের পবিত্র নাম স্মরণ করিতে লাগিল।

রস্তম বলিল,—পিয়ারি! আমি মরি নাই। যাহার হৃদয়ে প্রেম আছে—সে মরে না। রহমত আমায় কারাগারে দিয়াছিল। আমি পলাইয়া ছদ্মবেশে ঘুরিতেছি। মৃত্যু সংবাদ নিজেই রটাইয়াছি। যাহার আশা আছে সে মরিবে কেন পিয়ারি?"

"তুমি কি চাও রস্তম! এখন তোমায় বিশ্বাস করিতে পারি।"

"কি চাই—যার জন্য পলে পলে দগ্ধ হইতেছি, যার জন্য মান সম্ভ্রম সব গেল—চোরের ন্যায় পথে পথে ফিরিতেছি—দিবালোকে লোকালয়ে বাহির হই না—তাহাকে চাই। যে তোমার শত্রু তাহাকে চাই।"

"কে সে—?"

"মেহের উন্নিসা।"

সর্ব্বনাশ! রোস্তম নিশ্চয়ই উন্মাদ! বলে কি! পিয়ারি এ কথার মর্ম্ম বুঝিলনা। বলিল,—"তা আমার দ্বারা কি হইবে, আমি কি করিব?"

"তুমি সহায় হও পিয়ারি। তুমি কখনও কাহাকে ভাল বাস নাই—ভালবাসার মর্ম্ম বুঝিবে কি? তুমি ধনরত্ন ভালবাস, তাই আজ এই গভীর রাত্রে এই দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছ। আমি এই রমণী রত্নকে ভালবাসি, তার জন্য আজ এক দুঃসাহসিক কাজ করিব। তুমি আমায় দুর্গমধ্যে লইয়া যাও। তাহার মহল দেখাইয়া দাও। আমি তোমার জন্য জীবন সমর্পণ করিব।"

পিয়ারি মনে মনে এক নূতন সংকল্প আঁটিল। সে সংকল্প সিদ্ধকল্পে এই দুরাচার রোস্তমকেই সহায় ভাবিল। কাল প্রাতে যদি জগতের চক্ষে যদি মেহের উন্নিসা কলঙ্কিনী হয়—তাহা হইলে তাহার পথ অতি পরিষ্কার। ভাবিয়া বলিল—"না হয় তোমার দুর্গমধ্যে প্রবেশ করাইলাম তারপর তুমি কি করিবে?"

"আমি তাহাকে একবার দেখিব। এই দেখ আমি স্বহস্ত রোপিত এক গোলাপের কোরক সংগ্রহ করিয়া তাহাকে প্রেমোপহার দিতে যাইতেছি। একবার দেখিয়া আবার ফিরিব, তারপর যে দিকে চোখ চায় সেই দিকে যাইব।"

পিয়ারি বলিল—"আমার সঙ্গে এস—কিন্তু এই ফকিরবেশেই যাইবে?"

রোস্তম বলিল—"হাঁ—আমি সেলিম সার শিষ্য—এই বলিয়া পরিচিত। যদি ধরা পড়ি—এই বেশের সহায়তায় অপরাধটা লঘু করিয়া লইব।"

পিয়ারি ভাবিল—যুক্তিটী মন্দ নহে। দুজনে সেই অন্ধকার রাশি মথিত করিয়া নিঃশব্দে অগ্রসর হইল।

নিকটেই একজন আমীর একটা মসজেদ নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন। কতকগুলা স্তূপীকৃত প্রস্তর খণ্ড রাস্তার উপর পড়িয়াছিল। সেই চতুষ্কোণ, ত্রিকোণ সমতল আকারবিশিষ্ট প্রস্তরগুলা বড় ভারি। পিয়ারি বলিল "রোস্তম একবার দাঁড়াও। তোমার বাহুতে শক্তি কত?

রোস্তম আশ্চর্য্য হইল। কথাটার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বলিল "অনেক দিন সৈনিক ব্রত ত্যাগ করিয়াছি। কার্য্যক্ষেত্রে না হইলে বলিতে পারি না।"

"এই বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সরাইয়া রাখ।" রোস্তম অবলীলাক্রমে তাই করিল।

পিয়ারি বলিল "দুর্গ প্রবেশের পূর্ব্বে একটা প্রতিজ্ঞা কর। আমি তোমার প্রত্যাবর্ত্তনের পথ পরিষ্কার করিয়া দিব। তুমি মেহেরউন্নিসাকে

লইয়া এই রাত্রেই বাহিরে আসিবে। একটা রমণীর ভার অবশ্যই প্রস্তরখানার অপেক্ষা অধিক নয়। বিশেষতঃ তুমি তাহাকে ভালবাস।”

রোস্তম বলিল—“তোমার উদ্দেশ্য বুঝিয়াছি। তুমি তাহাকে কলঙ্কিনী করিয়া নিজের পথ পরিষ্কার করিতে চাও। কিন্তু পিয়ারি, আমি তাহাকে ভালবাসি। তাহার সর্ব্বনাশ করিতে পারিব না।”

পিয়ারি ক্রোধের সহিত বলিল “তবে এইখানে থাক। দুর্গ প্রবেশ করিতে পারিবে না।”

সম্মুখেই রক্ত প্রস্তরময় প্রকাণ্ড তোরণ। আর বিবেচনার অবসর নাই। রোস্তম মনে মনে ভাবিল—একদিকে বিরহ, অপরদিকে মিলন, একদিকে বেহেস্ত, অপরদিকে জাহান্নম্। একদিকে নবীগণ, অপরদিকে শয়তান। সে শয়তানের প্রভুত্ব স্বীকার করিল। পিয়ারির কলঙ্কিত প্রস্তাবেই দুরাচার স্বীকৃত হইল।

দুর্গ প্রবেশের আর কোন বাধা ঘটিল না।

দশম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি পোহাইলেই আগরা উৎসবে মাতিবে। বেগমমহলে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। কোন্ পেশওয়াজটী পরিলে কাহাকে ভাল দেখাইবে, কোন্ অলঙ্কারখানি কোথায় পরিলে সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিবে, রূপটা কি করিয়া মাজিয়া ঘসিয়া ভাল করিতে হইবে, এই সব চিন্তায় রঙ্গমহলের রূপসীরা উদ্ভ্রান্তচিত্ত। দরিদ্রেরা ইচ্ছামত ধনঃপ্রাপ্তির আশায়, আমীর উমরাহেরা পদ গৌরব বৃদ্ধির ও খেলাৎ প্রাপ্তির আশায় উৎফুল্লচিত্ত। সে সুখের রজনী অনেকেই সুখ চিন্তায় কাটাইতেছে।

আদর নাই—আমন্ত্রণ নাই—আহ্বান নাই—অনাদরে অভিমানিনী মেহের নিজের সুখশয্যায় সুষুপ্ত। গৃহমধ্যে স্তিমিত দীপ জ্বলিতেছে। সেই দীপালোক—সেই সুন্দর অথচ বিশীর্ণ গণ্ড কি সুন্দরই দেখাইতেছে।

পাপিষ্ঠ রোস্তম গৃহের দ্বার খোলা পাইয়া ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। যাহা দেখিল—তাহাতে ভুলিল, মজিল, মরিল। সে একবার অগ্রসর হয়, দশবার পিছাইয়া আসে। দেখিয়াও আশ মেটেনা—চোখেও পলক পড়ে না—প্রাণের তৃপ্তি হয় না—অত সুন্দর! আজন্ম দেখিলে যেন তৃপ্তি হয় না।

হস্তে সেই অফুটন্ত গোলাপ গুচ্ছ—উন্মাদের দুর্দ্দম হৃদয়ের দুরাকাঙ্ক্ষাময় প্রেমোপহার। রোস্তমের ইচ্ছা হইল সে দুটা কথা কয়—কিন্তু কে যেন কণ্ঠ চাপিয়া ধরে। বলে—ছিঃ! নিদ্রা ভাঙ্গিও না। ইচ্ছা হয় সেই কোমল অঙ্গ স্পর্শ করিয়া সুখী হয়—কে যেন তাহার হস্তখানি বৈদ্যুতিক শক্তিতে ধরিয়া রাখে। সেই সদা প্রফুল্ল আজন্ম সুন্দর, বিশীর্ণ গণ্ডে একটী আকাঙ্ক্ষিত চুম্বন রেখা রাখিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছে—কে যেন তাহার কাণে কাণে বলে—ছি! পাপিষ্ঠ অগ্রসর হইও না। দেবতার ভোগ উচ্ছিষ্ট করিও না।”

সেই গোলাপগুচ্ছ লইয়া ধীরে ধীরে রোস্তম মেহেরের শয্যাপার্শ্বে রাখিল। আবার এক দৃষ্টে সেই ভুবনমোহিনী উন্মাদিনী সৌন্দর্য্য প্রাণ ভরিয়া দেখিল। পলকে পলকে তাহার হৃদিকক্ষ বাসনার তড়িৎ স্রোতে আন্দোলিত হইতে লাগিল। পিয়ারি যাহা বলিয়াছে সে তাহা করিতে পারিল না। সেই নিদ্রিত দেহ বহন করিয়া লইয়া যাওয়া দূরে থাক্—সে তাহা স্পর্শ করিতে পারিল না। তাহার চোখের সম্মুখে কে যেন নরকের যবনিকা খুলিয়া দিল। সে বীভৎস্য দৃশ্যে—পাপিষ্ঠ যেন শিহরিয়া উঠিল।

সময় নাই—আর বিলম্ব করিলে সে নিজে মরিবে। পিয়ারি বেশীক্ষণ ত অপেক্ষা করিবে না। রোস্তম—আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ—অতৃপ্ত হৃদয়ে ফিরিল। তাঁহার বুকের ভিতর পাঁজার আগুণ জ্বলিতে লাগিল। সে গৃহের বাহির হইল। অস্ফুট স্বরে বলিল—পিয়ারি! সর্ব্বনাশী তোমার অনুরোধে পদাঘাত করি। মেহেরজান অত সুন্দর—অত পবিত্র—তোমার কত ভালবাসি। তোমার সর্ব্বনাশ করিতে চাহি না। না হয় নিজে আজীবন দগ্ধ হইব—পলে পলে পুড়িয়া মরিব—তবু পিয়ারি সয়তানীর কথা শুনিব না।

রোস্তম উন্মাদের মত গৃহ হইতে বাহির হইল।

* * * *

সম্মুখেই দেখিল সেই পুরীর প্রবেশ দ্বারে কে দাঁড়াইয়া আছে। সে মনে করিল পিয়ারি। বলিল—“পিয়ারি, বিলম্ব হইয়াছে মার্জ্জনা কর—আমি তোমার সহায়তা করিতে পারিব না।”

পিয়ারিকে সম্বোধন করিয়া রোস্তম যাহা বলিল, তাহার জবাব পাইল না। সেই অন্ধকারে রোস্তম ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিল—এ পিয়ারি নয়। পিয়ারি খর্ব্বাঙ্গী—এ যে দীর্ঘকায়। সে রমণী, এ পুরুষ—সে ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল।

মেহের ও রোস্তম।

গম্ভীর স্বরে সেই কক্ষদ্বারস্থ পুরুষ প্রশ্ন করিলেন—“কে তুমি।”

রোস্তম বলিল—“আপনি কে?”

সেই দীর্ঘকায় পুরুষ উত্তর না করিয়া অগ্রসর হইলেন। দৃঢ় মুষ্টিতে রোস্তমের হাত ধরিলেন। বলিলেন—“পাপিষ্ঠ। সয়তান! এ রাত্রে মেহেরউন্নিসার কক্ষে কি করিতে গিয়াছিলে? হা—সর্ব্বনাশ! সে স্বর—সে কণ্ঠ যে হতভাগ্য

রোস্তমের পরিচিত। হতভাগ্য দেখিল, মৃত্যু শিয়রে। কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—“জাঁহাপনা! জগতের সম্রাট! সাহান সা—আমায় বধ করুন। আমি অতি পাপিষ্ঠ—বিশ্বাসঘাতক।”

সেই ছদ্মবেশী পুরুষ আর কেহই নহেন। স্বয়ং দিল্লীশ্বর। দিল্লীশ্বর সেই গভীর রাত্রে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মেহেরকে নিজে নিমন্ত্রণ করিতে গোপনে আসিতেছিলেন। গৃহ দ্বার উন্মুক্ত—একজন লোককে মেহেরউন্নিসার শয্যাপার্শ্বে দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া সেই দুঃসাহসিকের ক্রিয়া কাণ্ড দেখিতেছিলেন। সে লোক যখন কক্ষ হইতে বাহির হইল তখন তিনি পুরীর দ্বারে দাঁড়াইলেন। এই পথ ভিন্ন পুরীর বাহির হইবার অন্য উপায় নাই।

জাঁহাগীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন—রোস্তম! তুমি পাপিষ্ঠ! সয়তান অপেক্ষাও অধম। সে পুরীতে মক্ষিকার প্রবেশপথ নাই, তাহাতে তুমি কার সহায়তায় প্রবেশ করিলে? পিয়ারি বেগমের নাম করিতে ছিলে কেন?” রোস্তম উত্তর করিল না। কাঁপিতে লাগিল। বাদসাহ তাহার হস্ত পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—“রোস্তম! আমি তোমায় উপযুক্ত ভাবিয়া তোমার মৃত পিতার গুণাবলীর স্মরণার্থে অতি অল্প বয়সেই উচ্চপদ দিয়াছিলাম। তুমি তাহার যথেষ্ট অপব্যবহার করিয়াছ। যে আমার আকাঙ্ক্ষিত ধন—যাহার সহিত দেখা করিতে আমি সাহসী হই না—সেই মেহেরউন্নিসার পবিত্র কক্ষ তোমার দ্বারা কলঙ্কিত হইয়াছে। তাহার পবিত্র দেহ, তোমার জঘন্য হস্ত স্পর্শে—”

রোস্তম উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল “প্রভু!—দিল্লীশ্বর! আমার কথা বিশ্বাস করিবেন কি? মেহেরের পবিত্র দেহ স্পর্শ করা আমার ন্যায় কুক্কুরের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু চোখের দেখায় পাপ আছে কি?”

“বল কে তোমায় পুরী প্রবেশ করিতে দিল?”

রোস্তম নতজানু হইয়া ভূতলে বসিয়া পড়িল। অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিল “দুনিয়ার মালিক! যে দণ্ড হয় আমায় দিন। সে কথা বলিতে পারিব না। এখনই আপনার কটিস্থ অসি দ্বারা আমায় দ্বিধা করুন।”

“মৃত্যু তোমার পক্ষে অতি লঘু দণ্ড। আমি তোমায় জীবন্ত প্রোথিত করিয়া, কুক্কুর দিয়া খাওয়াইব।” রোস্তম শুষ্ককণ্ঠে বলিল—“সেও সহ্য করিব, জাঁহাপনা! কিন্তু বিশ্বাসহন্তা হইব না। একবার করিয়াছি বলিয়া বারবার বিশ্বাসের অপচয় করিব না।”

জাঁহাগীর সাহ গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিলেন—“কে আছিস্।”

দুইজন ভীমকায় প্রহরী আসিয়া সেলাম করিল। বাদসাহ আদেশ করিলেন—“এই হতভাগাকে শৃঙ্খলিত করিয়া ভূগর্ভস্থ কারাগারে রাখিয়া দাও। পরে বিচার করিব।”

রোস্তম—কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—“প্রভু! আনন্দের সহিত আপনার দণ্ড শিরোধার্য্য করিলাম। মৃত্যু শিয়রে—মিথ্যা কথা বলিব না। মাথার উপরে সম্রাটের সম্রাট—সবই দেখিতেছেন। মেহেরউন্নিসা নিষ্কলঙ্কিণী, তিনিই তাহার সাক্ষী—”

রোস্তম প্রহরী বেষ্টিত হইয়া কারাগারে গেল। বাদসাহ আর মেহেরের কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দিন কাহারও সুখে কাটে, কাহারও দুঃখে কাটে। যাহার সুখে কাটে, সে মনে ভাবে এমনিই বুঝি চিরকাল যাইবে। যাহার দুঃখে কাটে, সেও ভাবে, তাহার সুখের দিন আর আসিবে না। কিন্তু দিন কাহারও বাধ্য নয়।

সেই বাদসাহের জন্মোৎসবের দিন—যে দিনের প্রভাত আনন্দ লইয়া আগরার প্রাসাদে দেখা দিয়াছিল—সে দিন কাটিয়াছে। সমগ্র নগরীর বিচিত্র ধ্বজপতাকা শোভিত বিচিত্রতা এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সুখের দিনে, দুইজন কেবল নিরানন্দে কাটাইয়াছেন। যাঁহার

“এ জীবন-দীপ আজিই নিভাইব।”

জন্মোৎসবে এই আনন্দ স্বয়ং সেই দিল্লীশ্বর—আর সেই অনাদর পরিত্যক্তা নিরাশা জর্জ্জরিতা অভাগিনী মেহেরউন্নিসা।

রাত্রি এক প্রহর উত্তীর্ণ। মেহের নিজ কক্ষে বসিয়া বিষণ্ণ মনে ভাবিতেছে "এত দিনে বুঝি সব ফুরাইল। এই আনন্দের দিনে তিনি সকলকে সুখী করিলেন, আর আমি তাঁর কি করিয়াছি। এরূপ ঘৃণিত বন্দিনী অবস্থায় দিন কাটান বড়ই জ্বালাময়। আর মতি—প্রিয়সখি মতি—কৈ সেত একবার আসিয়া দেখিল না। হায় অদৃষ্ট।

"যে জীবন শূন্য—তাহা রাখিবার প্রয়োজন কি? আজীবন অনলজ্বালা হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখা অপেক্ষা কি তাহা নিভান ভাল নয়। আশা, ভরসা, প্রেম, সোহাগ, আদর, সবই গিয়াছে। এ জীবনদীপ আজিই নিভাইব। মতিয়া ত বলিয়া দিয়াছিল—অনাদর দেখিলে মরিও।"

মেহের আকুলকণ্ঠে ঊর্দ্ধনেত্রে উপরের দিকে চাহিল। তাহার বিশীর্ণ গণ্ডে বর্ষার ধারা। হৃদয়ে মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস, প্রাণে অনন্ত যাতনা—জীবনে নিরাশা, আর সম্মুখে বিষ পাত্র। মেহের ভাবিল—"আজ সকলেই শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়াছে। বাঁদীগুলাকে আনন্দ করিবার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছি। এর চেয়ে আর সুযোগ কোথায়? আজ মরিব। হে জগদীশ্বর! হে দয়াময়! হে অগতির গতি! তুমি সাক্ষী, আর অবিশ্রান্ত দুঃখ ভাল লাগে না। আর এ ঘৃণিত অবস্থা ভাল লাগে না। কোথায় তুমি হৃদয়েশ্বর! বড় আদরে হৃদয়ে রাখিতে—এক দণ্ড কাছ ছাড়া করিতে না। আজ তোমার কবরের পাশে শুইয়া সেই সুখের বর্দ্ধমানে মরিতে পারিলাম না—এই বড় দুঃখ! আর তুমি দুনিয়ার বাদসা অসীম ক্ষমতাশালী দিল্লীশ্বর! ধন্য তোমার করুণা! ধন্য তোমার প্রেম! ধন্য তোমার মনুষ্যত্ব!"

সম্মুখে বিষপাত্র—একটু গলাধঃকরণ করিলে সকল জ্বালা মিটিয়া যায়। এ প্রলোভন—মেহের ছাড়িতে পারিল না। সে ধীরে ধীরে তীব্র গরলাধার মুখে তুলিল। সেই তীব্র বিষকণা জিহ্বাগ্র স্পর্শ করিল—মুহূর্ত্ত মধ্যে মাথা ঘুরিয়া উঠিল—এ সময় সহসা কে একজন ছুটিয়া আসিয়া মেহেরের হাত হইতে সেই পাত্র লইয়া দূরে ফেলিয়া দিল।

মেহেরের তখনও চৈতন্য আছে। দেখিল—তাহার আদরের মতিরাণী। মতি, মেহেরের গলা জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"কি করিলে সখি! কেন এমন সর্ব্বনাশ করিলে! হায়! আমি অভাগিনী যদি একটু আগে আসিতাম।"

মেহের বলিল—"সখি এতদিনে বুঝি সব ফুরাইল। তোমার কোলে মাথা রাখিয়া মরিতে পারিব—এ আনন্দেও এখন উৎফুল্ল হইতেছি। তোমার কাল আসিবার কথা ছিল। একটু আগে যদি আসিতে—"

মতি বলিল—দৈব দুর্ঘটনায় আসা হয় নাই, রাজা পীড়িত। এখন উপায়—হাকিম ডাকি।"

মেহেরের বিশুষ্ক ওষ্ঠাধরে নিরাশ মুখে হাসি আসিল। বলিল—জানি না, কতটা বিষ উদরস্থ হইয়াছে! কিন্তু বড় যাতনা—হাকিম আমার কি করিবে?"

মতিয়া নিজের দাসীকে মহারাণী যোধাবাইয়ের নিকট পাঠাইল। সমস্ত ঘটনা মুখে বলিতে বলিল। দিল্লীশ্বরী সংবাদ পাইয়াই এক বৃদ্ধ হাকিমকে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

হাকিম সাহেব মেহেরের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"কিছু ভয় নাই। বিষ বেশী উদরস্থ হয় নাই। ঔষধ দিতেছি, বমন হইয়া গেলে চেতনা আবার ফিরিবে।"

মতিয়া মেহেরকে কোলে লইয়া বসিল। স্বয়ং মহারাণী ঔষধ বাটিতে বসিলেন। ঔষধ সেবন করান হইল। বমনের পর রোগিণী অনেক সুস্থা হইল। মতিয়া ও মহারাজ্ঞী যোধাবাই দুই জনে ধরাধরি করিয়া মেহেরকে শয্যায় শোয়াইলেন।

মেহেরকে নিদ্রিতা দেখিয়া মহারাণী চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন—"আবার আসিব—কিন্তু মধ্যে সংবাদ দিও"।

* * *

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। মেহের অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়াছে। তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিয়াছে দেখিয়া মতিয়ার মুখে হাসি ধরে না। মতিয়া মেহেরের কণ্ঠলগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মেহেরজান! কেমন আছ।"

"অনেকটা ভাল, কিন্তু কেন আমায় বাঁচাইলে সখি! মরিলেই ভাল হইত।"

"ছি—ও কথা আর বলিও না। মরা ত আশ্চর্য্য কথা নয়। দুই মুহূর্ত্ত পরে পৌঁছিলেই ত সব শেষ হইত। তুমি সুস্থ হও—তার পর এ পাপপুরী পরিত্যাগ করিব। এখন ঘুমাও।" মেহের চক্ষু মুদিল। মতিয়া ব্যজন করিতে লাগিল। গাঢ় সুষুপ্তি লক্ষণ দেখিয়া মতিয়া একজন বাঁদীকে ডাকিয়া বাহিরের দালানে বেড়াইতে লাগিল। মধুর চন্দ্রের ক্ষীণ রশ্মি সেই নিভৃত মহলের বিস্তৃত স্তম্ভের উপর পড়িয়াছে—দালান অস্ফুট অন্ধকারে ডুবিয়া আসিতেছে। মতি দেখিল এক জন দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেছে—সে মূর্ত্তি পুরুষের।

সেই মূর্ত্তি অগ্রসর হইয়া দেখিল—দ্বারের নিকট একজন স্ত্রীলোক। সে যেন দ্বার আগলাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মতিয়া সেই অস্ফুট জ্যোৎস্নালোকে সে মূর্ত্তি চিনিল—কিন্তু কথা কহিল না।

আগন্তুক দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া শশব্যস্তে বলিলেন—"কে তুমি দ্বার ছাড়িয়া দাও।"

মতি কঠোর হাস্যের সহিত বলিল 'আমায় চিনিতে পারিলে না জাঁহাপনা!"

জাঁহাগীর এবার চিনিলেন—আগ্রহের সহিত বলিলেন—"মতি—মতিবিবি—কখন আসিলে? তুমি এখানে কেন?

"যাহার দুনিয়ায় কেহ নাই—তাহার জন্য সেই বিধাতা আমায় এখানে পাঠাইয়াছেন। আপনি এখানে কি চান?"

"মতি! একটা জনরব শুনিলাম, মেহের বিষ খাইয়াছে—কথাটি কি সত্য?

"সম্পূর্ণ সত্য—সব ফুরাইয়াছে। আপনার কীর্ত্তি আরও গৌরবান্বিত হইয়াছে।"

বাদসাহ—অশ্রু প্লাবিত চক্ষে রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন "সব ফুরাইয়াছে—মতি—রহস্য রাখ।"

"দাসী—দিল্লীশ্বরের সহিত রহস্য করিতে পারে না।"

"পথ ছাড়িয়া দাও—একবার তাহাকে দেখিব। এতদিন দেখি নাই—আজ দেখিব। আমার পাপের যদি কিছু প্রায়শ্চিত্ত থাকে—করিব। জন্মের মত তাহার সেই সুন্দর মুখ দেখিয়া অনুতাপ জ্বালায় জ্বলিব।"

অপরাধীর ন্যায় মলিন মুখে দিল্লীশ্বর গৃহ প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। প্রাণের ভিতর কেমন করিতে লাগিল। তিনি মনে বলিলেন "মেহের! প্রিয়তমে! আমায় ক্ষমা কর। আমি চোরের ন্যায় তোমায় সাধিতে আসিয়াছি, একবার চাহিয়া দেখ।"

মেহের চক্ষু মেলিল। সে কাতর আহ্বান যেন তাহার প্রাণে প্রবেশ করিল। চারি চক্ষে আবার মিলন হইল। মেহেরউন্নিসা শয্যা হইতে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন। বাদসাহ মেহেরের কাছে বসিয়া বলিলেন—"মেহের! কেমন আছ?"

মেহের উত্তর দিল না। সেই বিস্ফারিত লোচনে কেবল অশ্রুপ্রবাহ বহিল।

বাদসাহ বলিলেন—'আমি অপরাধী—ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। ক্ষমা করিবে কি?"

মেহের এবার উঠিয়া বসিল। অনেক কষ্টে বলিল—"জাঁহাপনা!"—কথা যেন মুখ হইতে বাহির হইতে চাহে না। সেখানে কেহই নাই, তবু যেন কত লজ্জা! কে যেন কণ্ঠ চাপিয়া ধরিতেছে। বাদসাহ—মেহেরের চিবুক ধরিয়া আদরে ডাকিলেন "হৃদয়েশ্বরি"—

বাদসাহ আবার বলিলেন—"হৃদয়েশ্বরী—আমি বাদসা হইলেও মানুষ। মানুষ ভ্রমান্ধ। যে পিয়ারি বেগমের কথায় এত কাণ্ড হইল সেই পাপিষ্ঠাকে বন্দিনী করিয়াছি। আজ হইতে তুমি দিল্লীশ্বরী হইলে। কিন্তু বল তুমি আমায় ক্ষমা করিবে?"

মেহের উন্নিসা—বিনম্র স্বরে উত্তর করিলেন—"জাঁহাপনা! দাসী অতি ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রের কাছে মহতের অপরাধ সম্ভাবনা নাই। আপনি যে নিজ মুখে দোষ স্বীকার করিলেন—ইহাই আপনার উদারতা। অদৃষ্ট দোষে যাহা হইয়াছে তাহা সহজেই ভুলিতে পারি।"

জাঁহাগীর মেহের উন্নিসাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন। দুই জনের মুখে হাসির রাশি ফুটিয়া উঠিল।

মতিয়া ও যোধাবাই মহারাণী অন্তরাল হইতে রহস্য দেখিতেছিলেন। মতিয়া গৃহ প্রবেশ করিয়া নতজানু হইয়া সসম্ভ্রমে বলিল—"জাঁহাপনা! তখন অপরাধী হইয়াছিলাম—আমার ক্ষমার পালাটাও শেষ হ'ক।"

মহারাণী যোধাবাই হাসিতে হাসিতে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া জাঁহাগীর সাহের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"প্রিয়সখী মেহের—তোমায় আমার সিংহাসন ছাড়িয়া দিলাম। তুমি সুখী হও।"

মেহের উন্নিসা মহারাণীর পদযুগল ধরিতে গেলেন। মহারাণী বাধা দিয়া বলিলেন—"ছি! বহিন্ ও কি?"

মেহের উন্নিসা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিলেন—"দেবী আপনার মহত্ত্ব জীবনে ভুলিব না। সিংহাসন আমার দ্বারা কলঙ্কিত হইবে। আপনি পাটরাণী, ইহা আপনারই যোগ্য।"

সেই রাত্রে এইরূপে আনন্দে কাটিল। পরদিন প্রাতে বাদসাহ ঘোষণা করিয়া দিলেন—"মেহের উন্নিসা "নুরজাহান" উপাধি লইয়া দিল্লীশ্বরী হইলেন।"

* * * *

নুরজাহান বেগমের উদারতায় রোস্তম কারামুক্ত হইয়া পুনরায় স্বপদে অধিষ্ঠিত হইল। আর সর্ব্বনাশী পিয়ারি বেগম? সে কারাগারে বিষ খাইয়া সকল জ্বালা এড়াইল।

বনপথে।

১

সই, শোন্ শোন্, কাণপাতি শোন্, শ্যামেরি বাঁশরি বাজিছে!
কদমেরি তলে, বনমালা গলে, বনমালী পুনঃ নাচিছে!
ওই গুরু গুরু, হিয়া দুরু দুরু, সারা দেহ মোর কাঁপিছে!
এ রবে কে রবে, ঘরেতে নীরবে, রাধানাথ যবে ডাকিছে?
ত্যজিয়া ছলনা, চলনা চলনা, চলনা ললনা কুঞ্জে,
হইবে সুখিনী, লো ব্রজগোপিণি, মাধবী অমিয়া ভুঞ্জে!

২

(সবে) মুছি আঁখিজল, মুছি আঁখিজল, চল্ চল্
দিয়ে করতালি, নাচে বনমালী, যমুনা বহিছে কল!
আবেশে চঞ্চল, উড়িছে অঞ্চল, গুঞ্জরি গুঞ্জরি মধুকরদল
উড়িছে অধরে! পিককুল কল, উঠিছে কুহরি!
শিহরি শিহরি, আমি গো আজিকে বিকল বিহ্বল!
বাঁশির ধ্বনিতে, গোপিণি, কেনা আজি উন্মাদিনী?
চল্ চল্ তবে, চল্ চল্ সবে, কুঞ্জবনে চল্ চল্!

৩

দিয়ে করতালি, নাচে বনমালী!—ইন্দ্রনীল মরকত
মোর যৌবনভাণ্ডারে আছে হীরা মুক্তা শত শত!
আছে যা রতন, ধরি সে চরণ, একেবারে করি দিব খালি!
নোওাইয়া শির, চুম্বিব রুচির, চরণসরোজে;
দুঃখ দৈন্য যত, সব হবে হত, শ্যামেরে ভ'জে!
চল্লো আলি, চল্লো আলি, করিব শ্যামের আরতি!
মণ্ডলি করিয়া, মাধবে বেড়িয়া, গাহিব মঙ্গল-ভারতী!
সে চরণতলে; চল্ চল্ আলি,
পড়ি গিয়া সবে, সহাসে নীরবে,
তরুতলে, শারদ প্রভাতে, একরাশ ফুটন্ত সেফালি!

৫

কি সুখ রজনী, চললো স্বজনি, ডাকে বনমালী ওই
ঝরে সুধারাশি, বাজে ওই বাঁশি, রাধা রাধা বলি সই!
যৌবনের ফলফুলে, মুকুলে, মুকুলে,
ভরিয়া আঁচলে আর ক্ষীণকটিকোলে,
সুনীল নীচোলে আর গোপিণী দুকূলে,
পূজিব রাখালরাজে আজি এ গোকুলে!
ধূপধূনাধূমে, যৌবনগুগ্গুলে,
শ্যাম-বনভূমে (কুঞ্জমঞ্জুলে)!
ভরি দিব আজি কুসুমে কুসুমে!
ঘন হরষের রোলে, কঙ্কণ কিঙ্কিণীবোলে,
কি সুখ পাইবে সখি সে চরণ চুমে!
চল চল সবে, চল চল সবে,
কুঞ্জভূমে, কুঞ্জভূমে!

৬

ভাবিয়া শ্রীহরি, বলিয়া শ্রীহরি, চল চল সহচরি!
নাচে প্রাণহরি, ডাকিছে বাঁশরি "রাধা রাধা রাধা" করি!
তার প্রেমে সাধা, তার প্রেমে বাঁধা, আধা বাধা রাধা মানে কি?
প্রেমের ভিখারী, আজি ব্রজনারী, ভয় লাজ সেগো জানে কি?
কুলকারাগারে, পড়ি একধারে, আর কি থাকিতে পারি?
না হয় রুষিবে, না হয় দুষিবে, নিন্দা ছলময়ী নারী!

শ্যামের সোহাগ, শ্যাম অনুরাগ, প্রাণেতে, তনুতে, জড়াতে,
নিজে দিব ধরা, চল চল্ ত্বরা, আঁখির পিপাসা মিটাতে!
নিজে দিব ধরা, চল্ চল্ ত্বরা, হরির শ্রীমুখ স্মরি!
ধরিতে কুরঙ্গ, একি এ কুরঙ্গ, কুঞ্জবনে, সহচরি?
ললিত অঙ্গ, গতি ত্রিভঙ্গ, হেরিব শ্যামের অঙ্গভঙ্গ
চল্লো সবে চল্লো সবে, কুঞ্জভূমে, কুঞ্জভূমে!
চরণকমলমুকুলদল, ছাইয়ে ফেলেছে কদমতল
চললো সবে, চললো সবে, কুঞ্জভূমে, কুঞ্জভূমে!
সখি সে বরবরণ, সখি সে রাঙাচরণ,
আঘাতিব মনোসাধে কুঙ্কুমে কুঙ্কুমে!
চললো সবে, চললো সবে, কুঞ্জভূমে, কুঞ্জভূমে!

৭

সখি, একি গো সুর, একি গো সুর!
রাধা রাধা করি, কত ছল ধরি, ডাকে চতুর!
বিরহধিুরে মিলনমধুরে (অমিয়া সায়রে!) করায়ে স্নান,
মৃত সঞ্জীবনী, অধরের সুধা করাবে পান;
তাই এ গান, তাই এ তান!
(মোর) ডগমগ তনু, ডগমগ প্রাণ, নাহিক জ্ঞান!
চমকি, থমকি, থমকি, চমকি
চলিছে চরণ! চরণ-নুপূর?
ওরো প্রাণে গেছে বাঁশরির সুর!
ও ও আতুর!
এ বন-অটবী, মাধবী, করবী,
রসাল মুকুলে, সুরভি বকুলে চারিধারে ভরপুর!
সখি একি গো সুর! একি গো সুর!

৮

কি সুখ-যাতনা!
কি সুখ-যাতনা!
করি গো কামনা,
জনম জনমে,নারীর করমে,পাই গো এমনি আনন্দ-তাড়না!
চঞ্চল চরণ-গমন-কারণ
কাঞ্চন কেয়ূর, কনক কঙ্কন,
বাজিছে ভুজে!
ধরি করুণার সুর
বার বার তুমি কহিছ, স্বজনি,
"নব নব কুশাঙ্কুর
আহা লো রাধিকা!
বাজিছে তোর চরণাম্বুজে"।
অবশ অঙ্গ, শিথিল কবরী!
পথহারা পথিকের প্রায় পথ খুঁজে!
সখি, মিছে এ যাতনা, মিছে এ তাড়না;—
শ্যাম-নীড়ে গিয়া, এ বন কপোতী
ভুলে যাবে সকল গঞ্জনা!—
হয় কি লাঞ্ছনা, হরিরে পূজে?

৯

বিরহানলে তনু দহে;
প্রেম-যমুনার জল, বহে সখি কল কল,
আর কি বিলম্ব সহে?
এ তরল জলে
(সুবাসিত শতদলে,
কুবলয়ে, কুবলয়ে!)
নামিবে লো আলি,
রাধা-মরালী
শ্যাম-মরালে লয়ে!
সখি, শ্যাম চকোর, আমি চকোরী,
দুঁহে দোঁহা ধরি
ডুবি যাব, সোহাগের অতল জোছনা-জলে!
সখিরে, শ্যাম চাতক. আমি চাতকী,
উভে মিলে, সখি,
মিলনের নবজলধরে সাধিব বিরলে!
সাগর কপোত সম
ডুবি যাব, নিরুপম
আনন্দের গভীর অতলে!
ঘুচিবে নিদাঘ;
হবে অনুরাগ
চন্দন-চর্চ্চিত অঙ্গ!
ললিত অঙ্গ, গতি ত্রিভঙ্গ,
হেরিব হরির অঙ্গ ভঙ্গ!
দেবত্ব পাইব সবে সে চরণ চুমে!
চললো সবে, চললো সবে
কুঞ্জভূমে, কুঞ্জভূমে!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন, এম, এ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—'রস্কিন' ও অন্যান্য কয়েকটী প্রবন্ধ এবার স্থানাভাব বশতঃ প্রকাশিত হইল না।

তৃতীয় ভাগ, ভাদ্র, ১৩০৭। ৯ম সংখ্যা।

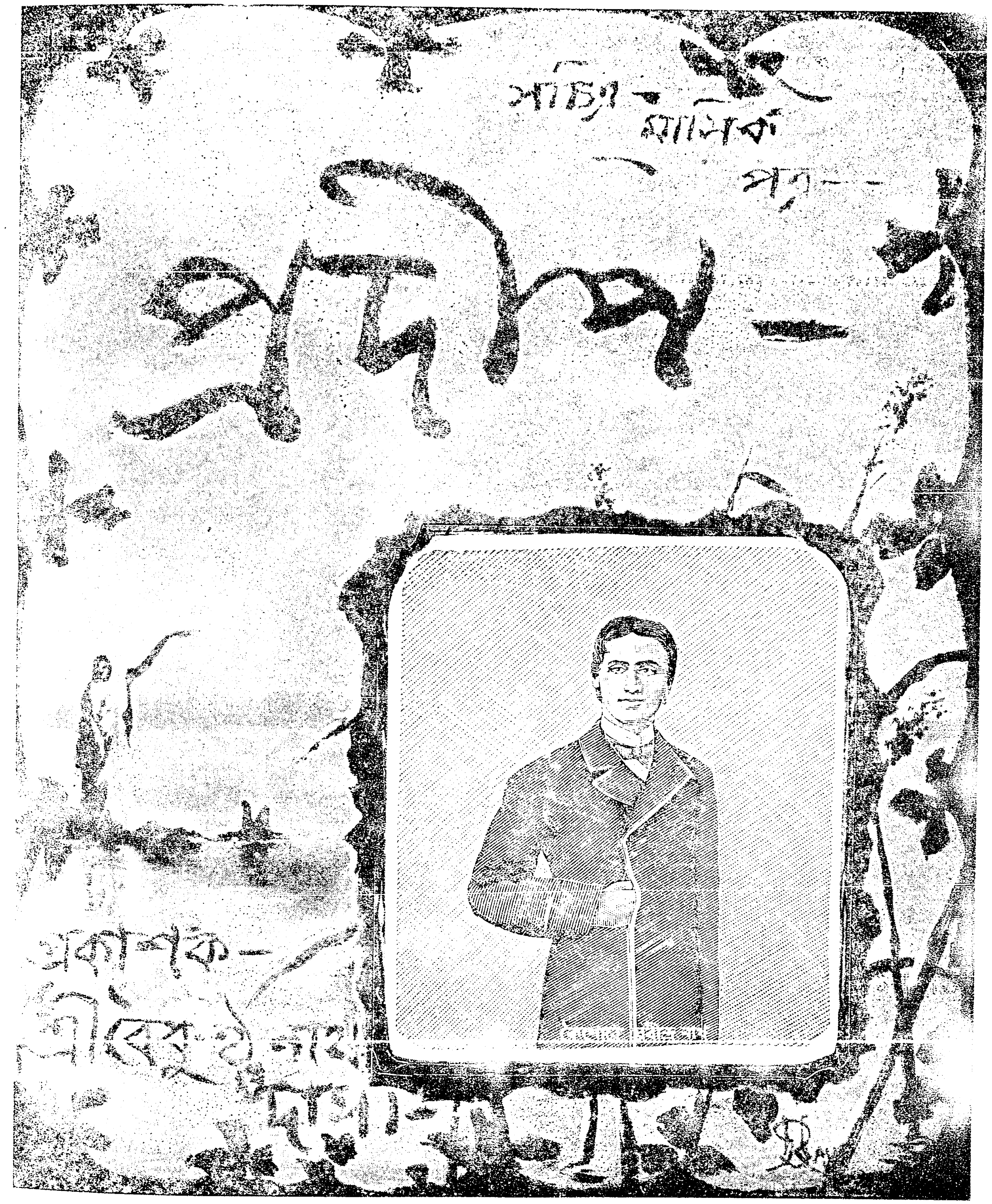

COVER PRINTED AT THE KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্ এ।

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

তৃতীয় ভাগ। } ভাদ্র, ১৩০৭। { ৯ম সংখ্যা।

সেনবংশীয় নৃপতিগণের জাতি নির্ণয়।

(প্রথম প্রস্তাব)

বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব সেনবংশীয় স্বাধীন নৃপতিগণ বৈদ্য-জাতি বলিয়া বঙ্গদেশে চিরজনশ্রুতি। এই জনশ্রুতি কেবল জনশ্রুতি নহে, বঙ্গের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের কুলশাস্ত্রেও উক্ত নৃপতিগণকে বৈদ্যজাতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আমরা বাল্যকাল হইতে আমাদের যৌবনের প্রথম পর্য্যন্তও দেখিয়াছি, একমাত্র কুলশাস্ত্রের মতানুসারেই উপরোক্ত রাজাদিগকে বঙ্গের কায়স্থ, বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলেই বৈদ্যজাতি বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। সম্প্রতি সেনবংশীয় নৃপতিগণের যে কয়েকখানি প্রস্তর ও তাম্র-ফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের অনুবাদে সেনবংশীয় রাজাদিগকে ব্রহ্মক্ষত্রিয়ের শিরোদাম, সোমবংশ-প্রদীপ, ওষধিনাথবংশ, অনুবাদিত হওয়াতে, বঙ্গের ব্রাহ্মণ, কায়স্থের পূর্ব্ব বিশ্বাস প্রায় দূরীভূত হইয়াছে। বৈদ্যেরা পূর্ব্ব বিশ্বাসে অবস্থিতি করিতেছেন বটে, কিন্তু সম্প্রতি সে বিশ্বাসও নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপবৎ। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই শেষোক্ত প্রমাণ অবলম্বন করিয়া সেনবংশীয় নৃপতিগণকে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্ধারণ ও দেবীবর, কুলরাম প্রভৃতি মহামান্য ঘটকদিগকে উক্ত বিষয়ে ভ্রান্ত মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিয়াছেন। কায়স্থদিগের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় ক্ষত্রিয় মতাবলম্বী, ক্বচিৎ কেহ কেহ, সেনরাজাদিগকে কায়স্থ জাতির অন্তর্গত করিতেও বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

মাধাই নগরে প্রাপ্ত মহারাজ লক্ষ্মণসেনের তাম্র-শাসনের আমি যে পাঠ উদ্ধার করিয়াছি, তাহাতে সেন নৃপতিগণকে অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণ বলিয়া লেখা আছে। কিন্তু পাবনার উকিল শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী মহাশয় উক্ত শাসনের অন্য প্রকার অনুবাদ করিয়াছেন। তাম্রফলকখানি আমার নিকটে তিনমাস মাত্র ছিল, তাহার পরেই শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব বাহাদুরের যোগে, আমাকে ফেরত দিবেন বলিয়া, ফলকখানি পাবনায় লইয়া চৌধুরী মহাশয় একবৎসর পর্য্যন্ত পাঠোদ্ধার করেন, কিন্তু ফলকখানি আর আমাকে দিলেন না। কালেক্টর সাহেবের নিকটে দরখাস্ত পর্য্যন্ত করিয়াছিলাম, তাহাতেও কোন ফল পাই নাই। চৌধুরী মহাশয় উক্ত ফলক এখন কোথায় যে রাখিয়াছেন তাহাও জানিনা। সুতরাং আমার অনুবাদ সত্য—কি চৌধুরী মহাশয়ের অনুবাদ সত্য, ফলকখানি দেখিয়া তাহা নির্ণয় করিবার আর উপায় নাই। এখানে অনেক দুঃখের কথা আছে, তাহা বলিয়াও কোন লাভ নাই। যাহাহউক, আমি আমার কৃত উপরোক্ত তাম্রশাসনের অনুবাদ পরিত্যাগ করিয়াই সেনবংশীয় নৃপতিগণের জাতিনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলাম,

দেখা যাউক উক্ত বিষয়ে ভগবান্ আমাকে কোথায় উপস্থিত করেন।

সেনবংশীয় নৃপতিগণ বৈদ্য নহেন—চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়—এই তর্কের সূত্রপাত রাজসাহীর প্রস্তরফলক হইতে হইয়াছে। তাহাতে আছে,—

সব্রহ্ম ক্ষত্রিয়াণামজনি কুল শিরোদাম
সামন্ত সেনঃ। ইত্যাদি ২।৫

ব্রহ্মক্ষত্রিয়কুলের শিরোমালা সামন্ত সেন জন্মগ্রহণ করেন; ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই ব্রহ্মক্ষত্রিয় হইতে সেনবংশীয় নৃপতিগণের চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়ত্বের আরম্ভ হয়, হইবার কারণ এই,—

"ব্রহ্মক্ষত্রস্য যো যোনির্ব্বংশো রাজর্ষি সৎকৃতঃ।
ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং স সংস্থাং প্রাপ্স্যতে কলৌ ॥৪॥"

২১ অধ্যায়, ৪ অংশ, বিষ্ণুপুরাণ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের যোনি অর্থাৎ কারণ (উৎপাদক) যে ক্ষত্রিয়বংশ, কলিযুগে ক্ষেমক নরপতি হইতে তাহার লোপ হইবে।

"ব্রহ্মক্ষত্রস্য বৈ যোনির্ব্বংশো দেবর্ষি সৎকৃত:।
ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং সংস্থাং প্রাপ্স্যতি বৈ কলৌ ॥২৯॥"

২২, অঃ, ৯ স্কন্ধ, শ্রীমদ্ভাগবত।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের যোনি (উৎপাদক) যে ক্ষত্রিয়বংশ, ক্ষেমক রাজা হইতে কলিতে সেই বংশের লোপ হইবে।

সেন রাজাদিগকে যাঁহারা চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলেন, উপরোক্ত 'ব্রহ্ম ক্ষত্রস্য' বাক্যের তাঁহারা চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় অর্থ করেন। তাঁহাদের মত এই যে, রাজসাহীর প্রস্তর-ফলকে সামন্ত সেনকে ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। উপরোক্ত বিষ্ণুপুরাণ আর শ্রীমদ্ভাবগতবচনেও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়দিগকে ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া উক্ত আছে। অতএব সেনরাজগণ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়। এই প্রকারে সেনবংশীয় নৃপতিগণের চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়ত্বের আরম্ভ হয়, তৎপরে লক্ষ্মণসেন, কেশব সেন প্রভৃতির তাম্র-শাসনের ওষধিনাথ বংশ, সোমবংশ-প্রদীপঃ, ইত্যাদি বাক্যের যোগ হইয়া সম্প্রতি অনেকের মতে উপরোক্ত নৃপতিগণ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া সম্পূর্ণরূপে নির্ণীত হইয়াছেন (১)।

বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার শ্রীধরস্বামী উপরোক্ত 'ব্রহ্ম-ক্ষত্রস্য' বাক্যের টীকায় বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মণঃ ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রস্য ক্ষত্রিয়স্য চ যোনিঃ
কারণং ক্ষত্রিয়ৈরেব কৈশ্চিত্তপোবিশেষাৎ ব্রাহ্মণ্যং
লব্ধংমিতি পূর্ব্বং তথোক্তত্বাৎ। সংস্থাং সমাপ্তিম্" ॥৪॥

২১ অঃ ৪ অংশ, বিষ্ণুপুরাণ।

ব্রহ্মের অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ক্ষত্রের অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের যোনি, অর্থাৎ কারণরূপ ক্ষত্রিয়বংশ; এই বংশের অনেক ক্ষত্রিয় তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়াছেন; যদ্বৃত্তান্ত বিষ্ণুপুরাণে পূর্ব্বে (১৯ অঃ ৪ অংশে) (২) উক্ত আছে। এখানে সেই হেতু এই বংশকে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের যোনি বলা হইয়াছে। সংস্থার অর্থ সমাপ্তি।

(১) ঐতিহাসিক-চিত্রের সম্পাদক মহাশয় প্রথম ভাগ ঐতিহাসিক-চিত্রের দ্বিতীয় সংখ্যার ২৯৬ পৃষ্ঠাতে সেন বংশীয় নৃপতিগণের চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়ত্ব বিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়াছেন। একজন ক্ষত্রিয় এই বিষয়ে লেখনী ধারণ করিলে, সেনরাজগণের ক্ষত্রিয়তা বিষয়ে আরও দৃঢ়তা সংস্থাপিত হইতে পারে, ভাবে তাহাও বলিয়াছেন। এ বিষয়ে বৈদ্য, কায়স্থের লেখনী ধারণ করা আর কর্ত্তব্য নহে তাহাও ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে ক্ষত্রিয়ের লেখনী ধারণ করা যে অসম্ভব, আর কায়স্থ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেকে এ বিষয়ে লেখনী ধারণ করিয়া যে সত্য উদ্ধার করিতে গিয়া সত্যকে অতল সমুদ্র জলে বিসর্জ্জন করিতেছেন, তাহা এই প্রস্তাবেই প্রদর্শিত হইবে।

প্রথম ভাগ ঐতিহাসিক-চিত্রের তৃতীয় সংখ্যার নবাবিষ্কৃত তাম্র-শাসনপ্রবন্ধে শ্রীযুক্ত প্রসন্নারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ও সেন নৃপতিগণকে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ও ব্রহ্মক্ষত্রিয় তৎসম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়াছেন; কিন্তু অনেক বিষয়ে চিরকালই এই প্রকার দেখা যায়, আজ যাহা চূড়ান্ত দুদিন পরে তাহা নিতান্তই অচূড়ান্ত; এই হেতুকে আশ্রয় করিয়াই আমরা বৈদ্যজাতি হইয়াও পুনরায় সেন রাজাদের জাতি-নির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হইলাম।

(২) অপ্রতিরথাৎকণ্বঃ তস্যাপি মেধাতিথিঃ।
যতঃ কাণ্বায়ণা দ্বিজা বভূবুঃ ॥২। ইত্যাদি ইত্যাদি।
গর্গাচ্ছিনিঃ ততোগার্গ্যাঃ শৈন্যাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ো বভূবুঃ ॥৯॥
টীকা—অতস্তাভ্যাং গার্গ্যাঃ শৈন্যাশ্চ গর্গ বংশ্যস্বাচ্ছিনি বংশ্যস্য সমাখ্যাতাঃ ক্ষত্রিয়াএব কেনচিৎ কারণেন ব্রাহ্মণাশ্চ বভূবুঃ ॥৯।
শ্রীধর স্বামী।
অজমীঢ়াৎ কণ্বঃ কণ্বাৎ মেধাতিথি: যতঃ কাণ্বায়ণা দ্বিজাঃ ॥১০॥
মুদ্গলাচ্চ মৌদ্গল্যাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ো বভূবুঃ। ইত্যাদি ॥১৬॥
টীকা—ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয় ইতি, ক্ষত্রিয়এব সন্তঃ কেনচিৎ কারণেন ব্রাহ্মণা বভূবুরিত্যর্থ: ॥১৬॥ শ্রীধর স্বামী।
১৯ অঃ ৪ অং বিষ্ণুপুরাণ।
সুমতির্ধ্রুবো প্রতিরথঃ কণ্বো প্রতিরথাত্মজঃ।
তস্য মেধাতিথিস্তস্মাৎ প্রস্কন্নাদ্যা দ্বিজাতয়ঃ। ইত্যাদি।৪।
২০ অঃ ৯ স্কঃ শ্রীমদ্ভাগবত।
গর্গাচ্ছিনি স্ততো গার্গ্যঃ ক্ষত্রাদ্ব্রহ্ম হ্যবর্ত্তত ॥১৩॥
দুরিক্ষয়ো মহাবীর্য্যাস্তস্য ত্রয্যারুণিঃ কবিঃ।
পুষ্করারুণি রিত্যত্র যে ব্রাহ্মণ গতিং গতাঃ ॥১৪॥
টীকা—ক্ষত্রবংশে ব্রাহ্মণগতিং ব্রহ্মণরূপতাং গতাস্তে।১৪।
শ্রীধর স্বামী।
মুদ্গলাদ্ব্রহ্ম নির্বৃত্তং গোত্রং মৌদ্গল্য সংজ্ঞিতং ॥২৩।
২১ অঃ ৯ স্কন্ধ, শ্রীমদ্ভাগবত।
আদিপর্ব্ব, মহাভারত। মৎস্যপুরাণ ৪৯অঃ ৮৬।৮৭।৮৮ পৃষ্ঠা।

বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার স্বামী উপরোক্ত 'ব্রহ্মক্ষত্রস্য' বাক্যের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে কি প্রকাশ পায়? না—চন্দ্র (পুরু) বংশীয় ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া অনেক ক্ষত্রিয় তপস্যা (অর্থাৎ ব্রাহ্মণাচার) দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, অবশিষ্ট ক্ষত্রিয়গণ ক্ষত্রিয়ই ছিলেন; এইজন্য চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়বংশকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় উভয়ের উৎপাদক বংশ বলা হইয়াছে। অতএব বিষ্ণুপুরাণের মতে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়কুল যে ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় কুল নহে, তাহা বলা বাহুল্য।

বাদরায়ণি রুবাচ।

'পুরোর্ব্বংশং প্রবক্ষ্যামি যত্র জাতোঽসি ভারত।
যত্র রাজর্ষয়ো বংশ্যা ব্রহ্ম বংশ্যাশ্চ জজ্ঞিরে ॥১॥'

২০ অধ্যায়, ৯ স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবত।

টীকা—ব্রহ্মবংশ্যা ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূতাশ্চ॥১॥

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

শুকদেব কহিলেন—হে ভারত! যে বংশ হইতে ক্ষত্রিয়বংশ এবং ব্রাহ্মণ বংশ উভয়ই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যে বংশে তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, অনন্তর সেই পুরুবংশ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। টীকা—ব্রহ্ম বংশ্যার অর্থ ব্রাহ্মণ বংশ।

উপরোক্ত ভাগবত বচনের পুরুবংশ আর রাজর্ষিবংশের অর্থ যে এক ক্ষত্রিয়বংশ, তাহাতে বোধ করি কাহারও আপত্তি নাই। এবং উক্ত বচনের ব্রাহ্মণবংশের অর্থ যে ক্ষত্রিয়বংশ নহে— ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন ব্রাহ্মণবংশ, তাহাও বলা বাহুল্য। শ্রীমদ্ভাগবতকার ৯ স্কন্ধের ২০ অধ্যায়ে উপরোক্ত প্রথম শ্লোকে পুরুর বংশকে ক্ষত্রিয়বংশ ও ব্রাহ্মণ-বংশের যোনি বলিয়া ২২ অঃ ২৯ শ্লোকে তাহাকে যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের যোনি বলিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। পূর্ব্বাধ্যায়ের উদ্ধৃত প্রথম শ্লোকের ব্রহ্ম-বংশ্যাশ্চ বাক্যের ব্রহ্ম শব্দের ব্রাহ্মণার্থ হইতে পরবর্ত্তী অধ্যায়ের 'ব্রহ্মক্ষত্রস্য' বাক্যের ব্রহ্ম শব্দের অর্থ যে ব্রাহ্মণ, তাহাতে আপত্তি করিবার কি আছে? পূর্ব্বে যে বংশকে ব্রাহ্মণ বংশ এবং ক্ষত্রিয়বংশের উৎপাদক ক্ষত্রিয়বংশ বলা হইয়াছে, পরে তাহাকেই ব্রহ্মক্ষত্রিয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় উভয়ই বলা হইয়াছে, ইহার কোন যুক্তি নাই। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কি পুরুবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ ক্ষত্রিয় নহেন, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় জাতি? স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতকার একটী ক্ষত্রিয়বংশকে কয়েকটী ব্রাহ্মণবংশ ও একটী ক্ষত্রিয় বংশের উৎপাদক বংশ বলিয়াছেন। উক্ত বংশকে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বংশ বলেন নাই। যদি বল, যে বংশ হইতে ব্রাহ্মণবংশ ও ক্ষত্রিয়বংশ হইয়াছে, তাহাকে ব্রহ্মক্ষত্রিয়বংশ বলায় বাধা কি? উত্তর—বাধা না থাকিলে অর্থাৎ সেই বংশ ব্রহ্মক্ষত্রিয় বংশ হইলে, সেই বংশের ক্ষত্রিয়দিগের তপস্যা করিয়া, পরে ব্রাহ্মণ হইবার কথা আছে কেন?

উপরে যে সকল প্রমাণ প্রদর্শিত হইল, তাহাতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে, বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতির 'ব্রহ্মক্ষত্রস্য' বাক্য দ্বারা পুরুবংশকে ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়বংশ (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় উভয়ই) বলা হয় নাই। পুরুর বংশকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের উৎপাদক বংশ বলা হইয়াছে। ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ হইলেও সেই হেতুতে ক্ষত্রিয়ে ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ) শব্দ যোগ করিয়া, ক্ষত্রিয়কে ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় উভয়ই) বলা যাইতে পারে না। যেহেতু গুণানুসারে অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ আচার দ্বারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি (৩) হইয়াছে।

চন্দ্রবংশ, ক্ষত্রিয়বংশ। রাজর্ষি পুরু ক্ষত্রিয়, তাঁহার বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া যে সকল ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণাচারযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইয়াছেন; যাঁহারা ব্রাহ্মণাচারযুক্ত হয়েন নাই, তাঁহারা ক্ষত্রিয়ই ছিলেন। পুরু-বংশোৎপন্ন ক্ষত্রিয়বংশ মহাভারত বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু তদুৎপন্ন ব্রাহ্মণদিগের বংশ বর্ণিত হয় নাই। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, উক্ত বংশ হইতে যাহারা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন তাঁহারা ভিন্ন অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতি এবং যাঁহারা ক্ষত্রাচারে ছিলেন তাঁহারা ক্ষত্রিয় জাতি। দুইটী ক্ষত্রিয় নন্দনের মধ্যে একটী ব্রাহ্মণাচার যুক্ত হইলে ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ শব্দ তাঁহাতেই যুক্ত হইল। যজন যাজ-নাদি ব্রাহ্মণাচার ভিন্ন ক্ষত্রিয়াচার যুক্ত অপর সন্তানে সে কারণে ব্রহ্মত্ব (ব্রাহ্মণত্ব) হয় না। যুধিষ্ঠিরাদি ও তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ক্ষত্রিয়াচারে ছিলেন, কেহ ব্রাহ্মণাচারে ছিলেন না (৪)। সুতরাং তাঁহারা ক্ষত্রিয় ব্রহ্মক্ষত্রিয় নহেন।

(৩) পরবর্ত্তী ২২ সংখ্যক টীকা দেখ।

(৪) মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ প্রভৃতির

পুরাণ শাস্ত্রে প্রমাণ পাওয়া যায়, একমাত্র বৈবস্বত মনুও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন হইয়া আচারভেদে—পূর্ব্ব-কালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি জাতি হইয়াছে (৫)। সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় হইতেও ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছে। (৬)। ইহার দ্বারা বুঝিতে পারা যায় পূর্ব্বের জাতি-ভেদ আচারগত ছিল (৩)। অর্থাৎ এক মনু হইতে আচারভেদে ব্রাহ্মণাদি জাতি হইয়াছে। চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ হইয়াছে, এই জন্য উক্ত ক্ষত্রিয় যদি ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় হন, তাহা হইলে উক্ত ক্ষত্রিয় হইতে যে শূদ্র হইয়াছে, সেইহেতু, চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়দিগকে বৈশ্যক্ষত্রিয়, শূদ্রক্ষত্রিয়ও বলিতে হয়। শাস্ত্রের অনেক স্থলে ব্রহ্ম ক্ষত্র ও ব্রহ্মক্ষত্রিয় বাক্যের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, (৭) কিন্তু তাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় জাতি অর্থ ব্যতীত, কোনস্থলেই ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট ক্ষত্রিয়ার্থ উক্ত হয় নাই।

কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না যে, সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ এবং যুধিষ্ঠির প্রভৃতি যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন প্রতিগ্রহ ও দান প্রভৃতি ব্রাহ্মণাচারযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা সেই বৈবস্বত মনু (ক্ষত্রিয়) হইতেই ক্ষত্রিয়াচারযুক্ত, ইহাই সমুদায় পুরাণে উক্ত হইয়াছে।

(৫) গৃৎস মদস্য শৌনকশ্চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রবর্ত্তয়িতাভূৎ ॥১॥

টীকা—চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রবর্ত্তয়িতা তদ্বংশে চত্বারো বর্ণা অভবন্নিত্যর্থঃ।১।

ভার্গস্য ভার্গভূমিঃ অতশ্চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রবৃত্তিঃ। ইত্যাদি ইত্যাদি ॥৯॥

টীকা—ভার্গভূমেঃ সকাশাচ্চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রবৃত্তির্জাতা ॥৯॥

শ্রীধর স্বামী। ৮ অঃ ৪ অং বিষ্ণুপুরাণ।

ততশ্চান্যে মধুচ্ছন্দ জয়কৃত দেব দেবাষ্টক কচ্ছপ হারীতাখ্যা বিশ্বামিত্র পুত্রা বভূবুঃ ॥১৭॥

তেষাঞ্চ বহুনি কৌশিক গোত্রাণি ঋষ্যন্তরেষু বৈবাহ্যানি ভবন্তীতি ॥১৮॥

৭ অ ৪ অং বিষ্ণুপুরাণ।

২ টীকাতে বিষ্ণুপুরাণ ৪ অংশের ১৯ অধ্যায়ে যে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা দেখ।

নাভাগস্য চ পুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।
করুষস্তু কারুষাঃ ক্ষত্রিয়া যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ ॥১৭॥
শূদ্রত্বঞ্চ পৃষধ্রো গাত্তি সয়িত্বা গুরোশ্চ গাম্। ইত্যাদি ॥১৮॥

২৭৩ অঃ অগ্নিপুরাণ।

কপিলশ্চ মহাত্মানং সুকেতুশ্চ সুতদ্বয়ম্।
কৌশিকশ্চ গৃৎসপতিং তথা গৃৎস পতেঃ সুতাঃ ॥১০॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ কার্শে দীর্ঘতমাঃ সুতাঃ। ইত্যাদি॥১১॥

৭৮ অঃ অগ্নিপুরাণ।

করুষাৎ ক্ষত্রিয়া জাতা কারুষাইতি বিশ্রুতাঃ ॥৪॥
দিষ্ট পুত্রস্তু না ভাগো বৈশ্যতামাগমৎস চ। ইত্যাদি ॥৫॥

১৪২ অঃ গরুড় পুরাণ।

এতে বিবস্বতঃ পুত্রাঃ কীর্ত্তিতাঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনাঃ ।৪২২
অতীতা বর্ত্তমানাশ্চ তথৈবানাগতাশ্চ যে।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা শ্চৈবান্বয়ে স্মৃতাঃ ॥৪২৩॥

৩৭ অঃ বায়ুপুরাণ।

(৬) অম্বরীষস্য মান্ধাতুস্তনয়স্য যুবনাশ্বঃপুত্রোঽভূৎ।
তস্মাৎ হরিতঃ যতোঽঙ্গিরসো হারিতাঃ ॥৫।

টীকা—অম্বরীষস্য যুবনাশ্বঃ তানস্য সনামা যতো হরিতাঙ্গারিতা আঙ্গিরস দ্বিজা হরিতগোত্র প্রবরাঃ ॥ ইত্যাদি ॥৫॥

৩ অঃ ৪ অং বিষ্ণুপুরাণ।

বিরূপাৎ পৃষদশ্বো জজ্ঞে। ততশ্চ রথীতরঃ। তত্রায়ং শ্লোকঃ।

এতে ক্ষত্র প্রসূতা বৈ পুনশ্চাঙ্গিরসঃ স্মৃতাঃ।
রথীতরাণাং প্রবরাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ ॥

টীকা—এতে ক্ষত্র প্রসূতা ইতি। এতে রথীতরস্য প্রবরা গোত্রজা ক্ষত্র প্রসূতাঃ ক্ষত্রিয়াঃ অগ্রজস্য রথীতরস্য ভার্য্যায়া অঙ্গিরসা জাতত্বাৎ। তথাপি তদ্যোগাৎ পুনরঙ্গিরস ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ অতঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ইত্যর্থঃ ॥২॥ শ্রীধর স্বামী। ২ অঃ ৪ অং বিষ্ণুপুরাণ।

মূল বচনে রথীতর গোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগকে স্পষ্টই ক্ষত্রপ্রসূতা বলা হইয়াছে। স্বামী যে রথীতরকে অগ্রজ বলিয়াছেন এবং তাঁহার ক্ষেত্রে অঙ্গিরস কর্ত্তৃক রথীতর গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি বলিয়াছেন ইহা ভাগবতের মত। মূল বচনে ক্ষত্রপ্রসূতা ও পুনরায় অঙ্গিরস ব্রাহ্মণ হওয়ার কথা আছে—এইহেতু ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন হইয়া আচার দ্বারা ব্রাহ্মণ হওয়া ঠিক কথা। ব্রাহ্মণ হইতে অনেক ক্ষত্রিয়ের ভার্য্যাতে সন্তান হইয়াছে, তাঁহারা ক্ষত্রিয়ই। তাহা না হইলে বচনে ক্ষত্র-প্রসূতা থাকিত না।

বিরূপা পৃষদশ্বোঽভূৎ তৎপুত্রস্তু রথীতরঃ ॥১॥
রথীতরস্যাপ্রজস্য ভার্য্যায়াং তন্তবেঽর্থিতঃ।
অঙ্গিরা জনয়ামাস ব্রহ্মবর্চ্চস্বিনঃ সুতান্ ॥২॥
এতে ক্ষত্র প্রসূতা বৈ পুনশ্চাঙ্গিরসাঃ স্মৃতা।
রথীতরাণাং প্রবরা ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ ॥৩॥

টীকা—যতঃ ক্ষত্রোপেতা ব্রাহ্মণা ইত্যর্থঃ।৩।

শ্রীধর স্বামী।

টীকা—ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ো বিপ্রাঃ। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

৬ অঃ ৯ স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবত।

(৩) বিবস্বতো মনুর্ম্মনোরিক্ষাকু নৃগধৃষ্ট সর্য্যাতি পরিষ্যন্ত প্রাংশু নভাগনেদিষ্ট করূষ পৃষধ্রাখ্যাঃ পুত্রা বভূবুঃ ॥৫॥—পৃষধ্রস্তু গুরু গোবধাৎ শূদ্রত্বমগমৎ ॥১৩॥ করুষাৎ কারুষা মহাবলা ক্ষত্রিয়া বভূবু।১৪। নভাগো নেদিষ্ট পুত্রস্তু বৈশ্যতা মগমৎ ॥১৫॥ ১ অঃ ৪ অংশ বিষ্ণুপুরাণ।

পৃষধ্রস্তু মনোঃ পুত্রো গোপাল গুরুণাকৃতঃ। ইত্যাদি।
তং শশাপ কুলাচার্য্যঃ কৃতা গমনকামতঃ।
নক্ষত্রবন্ধুঃ শূদ্রস্ত্বং কর্ম্মণা ভবিতা মূল। ইত্যাদি।
করুষান্মানবাদাসন্ কারুষাঃ ক্ষত্র জাতয়ঃ।
উত্তরাপথ গোপ্তারো ব্রাহ্মণা ধর্ম্মবৎসলা ॥১০॥
ধৃষ্টাদ্ধার্ষ্টমভূৎ ক্ষত্রং ব্রহ্মভূয়ং গতং ক্ষিতৌ ॥ ১১ ॥

টীকা—ব্রহ্মভূয়ং ব্রাহ্মণত্বং। শ্রীধর স্বামী।

ব্রহ্মভূয়ং ব্রাহ্মণত্বং বংশঃ পুত্রঃ। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

২ অঃ ৯ স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবত।

না ভাগোদ্দিষ্ট পুত্রোঽন্যঃ কর্ম্মনা বৈশ্যতাংগতঃ।

২ অঃ ৯ স্কঃ শ্রীমদ্ভাগবত।

(৭) জয়দ্রথস্তু ব্রহ্ম ক্ষত্রান্তরাল সম্ভূতাং পত্নাং বিজয় নাম পুত্রমজীজনৎ ॥ ৫ ॥ টীকা—প্রাতিলোম্যেন ব্রহ্ম ক্ষত্রয়োরন্তরালে সম্ভূতির্জন্ম যস্যা সুস্থাং সূতায়া মিত্যর্থঃ। ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়াৎ জাতঃ সূতইতি। ইত্যাদি ইত্যাদি। ১৮ অঃ বিষ্ণুপুরাণ ৪ অংশ। ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় বিড়্যোনি র্গর্ভা যাতি সাধুন্।৮০। টীকা—ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়োবৈশ্যাঽপি সজ্জনেষু নিন্দাং গচ্ছতি।২ অঃ মনুসংহিতা। ব্রহ্মদ্বিট্ ইত্যাদি ইত্যাদি।৩৫।

কেহ বলিবেন, সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় হইতেও ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছে কিন্তু উক্ত বংশের সমাপ্তিস্থলে উক্ত ব্রহ্মক্ষত্রিয়ের উৎপাদক বংশ বলা হয় নাই (৮)। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, চন্দ্রবংশ হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হওয়া অর্থে বচনে 'ব্রহ্মক্ষত্রস্য' বাক্যের প্রয়োগ হয় নাই, উক্ত বংশার্থেই প্রয়োগ হইয়াছে। ইহার উত্তর এই যে, সূর্য্যবংশের সমাপ্তি স্থলে যে উক্ত বচনে 'ব্রহ্মক্ষত্রস্য' বাক্য প্রযুক্ত হয় নাই, তাহাকে ত্রুটী মনে করিতে হইবে। কিন্তু যখন প্রমাণ আছে, সূর্য্যবংশ হইতেও ব্রাহ্মণ হইয়াছে, তখন উক্ত বংশও যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় উভয়ের যোনি, তাহাতে সন্দেহ কি? আমাদের বোধ হয়, চন্দ্রবংশ হইতে অনেক ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, সূর্য্যবংশে তাহা হয় নাই বলিয়াই উক্ত বংশকে সমাপ্তিস্থলে স্পষ্টত ব্রহ্মক্ষত্রিয়ের উৎপাদক বংশ বলা হয় নাই। যাহাহউক, যখন উদ্ধৃত স্বামীর টীকা ও ভাগবত বচন দ্বারা উপরোক্ত 'ব্রহ্মক্ষত্রস্য' বাক্যের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ার্থ হইতেছে, আর ব্রহ্মক্ষত্র শব্দ যেখানেই প্রয়োগ হইয়াছে সেই স্থলেই যখন তাহার ব্রাহ্মণক্ষত্রিয় অর্থ দেখা যায়, তখন অনুমানে উক্ত বাক্যের শাস্ত্রবহির্ভূত অর্থ কেহ করিতে ইচ্ছা করেন করুন, তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

এখানে পুনরায় আপত্তি হইতে পারে যে, ব্রহ্মক্ষত্রিয়ের অর্থ যদি ব্রাহ্মণক্ষত্রিয় তবে বচনে—'ব্রহ্মক্ষত্রস্য' এক-বচনান্ত হইয়াছে কেন? ইহার উত্তর এই যে এরূপ প্রয়োগ অনেক স্থলে আছে,—

না ব্রহ্মক্ষত্র মৃধ্নোতি নাক্ষত্রং ব্রহ্মবর্দ্ধতে।
ব্রহ্মক্ষত্রঞ্চ* সম্পৃক্তমিহ চা মূত্রবর্দ্ধতে ॥ ৩২২

৯ অঃ মনুসংহিতা।

ভাষ্য,—যৎ ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ রহিতং রাজং মন্ত্রিপুরোহিতাদয়ো-
যত্র ন ব্রাহ্মণাস্তত্রকুতঃ সমৃদ্ধিঃ। এবং ব্রাহ্মণা অপি
রাজোপাশ্রিতাঃ কুতঃ সম্পত্তিং লভন্তে। উভৌ যুক্তৌ-
জগজ্জয়তঃ। ব্রহ্মক্ষত্রশব্দৌ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়জাতি বচনৌ। ৩২২

মেধা তিথি।

ব্রাহ্মণ বিহীন ক্ষত্রিয় কখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। ক্ষত্রিয় ব্যতিরেকেও ব্রাহ্মণ বর্দ্ধনশীল হয়েন না। ক্ষত্রিয়ত্ব ব্রাহ্মণত্ব একত্র মিলিত হইলেই ইহলোকে ও পরলোকে উভয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

পণ্ডিতবর ভরতচন্দ্র শিরোমণির অনুবাদ।

কালে কৃত যুগেচৈব ক্ষীণে ত্রেতা যুগে পুনঃ।
বীজার্থন্তে ভবিষ্যন্তি ব্রহ্মক্ষত্রস্য বৈপুনঃ। ৪৩৭ ॥

৩৭ অধ্যায়, বায়ুপুরাণ।

কালে সত্যযুগ ক্ষয় হইলে, ত্রেতাযুগে পুনরায় সপ্তর্ষি-দিগের সহিত মনু, ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বীজার্থ জন্মগ্রহণ করিবেন।

পরস্পর যুগানাঞ্চ ব্রহ্মক্ষত্রস্য চোদ্ভবঃ। ইত্যাদি। ৪৪০।

ঐ বায়ুপুরাণ।

পরস্পর যুগের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি ইত্যাদি।

টীকা—ব্রহ্মদ্বিট্ ব্রাহ্মণানাং দ্বেষ্টা ইত্যাদি ইত্যাদি। ৩ অঃ মনুসংহিতা। ব্রহ্মচ্ছন্দং ইত্যাদি ইত্যাদি। ২। ১০০। টীকা—ব্রহ্ম ব্রাহ্মণং ইত্যাদি ইত্যাদি। ৪ অঃ মনু। ব্রহ্মঘ্নে যে স্মৃতা লোকা, ইত্যাদি ইত্যাদি। টীকা—ব্রাহ্মণহন্তু। ইত্যাদি। ৮ অঃ মনু। ব্রহ্মহাচ সুরাপশ্চ, ইত্যাদি ইত্যাদি। টীকা—ব্রহ্ম হেতি যো মনুষ্যো ব্রাহ্মণং হতবান্ ৯ অঃ ঐ। না ব্রহ্ম ক্ষত্র মৃধ্নোতি ইত্যাদি। টীকা—নেতি ব্রাহ্মণ রহিত, ইত্যাদি ইত্যাদি ঐ ঐ। ব্রহ্ম ক্ষত্র বিশামেব মন্ত্রবৎ স্নানমিষ্যতে তূষ্ণীমেবহি শূদ্রস্য সনমস্কারকং মতং ॥ স্মার্ত্তধৃত আহ্নিক তত্ত্ব। ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় বিট্ শূদ্র বর্ণাস্ত্বাদ্যাস্ত্রয়ো দ্বিজাঃ ১ অঃ যাজ্ঞবল্ক্য সং। ব্রহ্ম ক্ষত্র বিশাং কাল ঔপনায়নিকঃ পরং ॥৩৭। ঐ ঐ দুর্ব্বৃত্তা ব্রহ্মবিট্ক্ষত্র শূদ্র যোষাঃ প্রমাঃ। ৩ অঃ ঐ। ব্রহ্ম ক্ষত্র বিশাশ্চৈবমৌঞ্জী বন্ধন জন্মনি। ১ অঃ শঙ্খ সংহিতা। ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় বিট্ শূদ্রা কন্যকা উপবেশিরে। শব্দ কল্পদ্রুম। যাগস্থ ক্ষত্র বিড় ঘাতে চরেদ্ব্রহ্মহনোব্রতম্ প্রায়শ্চিত্ত বিবেক। ব্রহ্মহানভব ত্যন্তো ব্রহ্মহা বৃষলী পতিঃ। হারীত সংহিতা। ব্রহ্ম ক্ষত্রাদয়স্তস্মাদ্যানোর্জাতাস্তু মানবাঃ। ইত্যাদি ইত্যাদি। সংসৃষ্টং ব্রহ্মণা ক্ষত্রং ক্ষত্রেণ ব্রহ্ম সংহিতং। ইত্যাদি ইত্যাদি। ৬৮ অঃ আদি পর্ব্ব মহাভারত। ব্রহ্মবিটক্ষত্র শূদ্রানাং যোবলী সম্ভবেন্নৃপঃ ॥ ৩ ॥ ২ অঃ ১২ স্কঃ শ্রীমদ্ভাগবত। নৃব্রহ্ম ক্ষত্রবিট শূদ্র বর্ণান্ বক্ষেঽয়নামতঃ। ইত্যাদি ॥ ১ ॥ ৩৬৪ অঃ অগ্নিপুরাণ। জয়দ্রথস্তু রাজেন্দ্র যশো দেব্যা বাজায়ত। ১১১। ব্রহ্মক্ষত্রান্তরঃ সত্যাবিজয়ো নাম বিশ্রুত। বায়ুপুরাণ। বীজার্থং বৈ ভবিষ্যন্তি ব্রহ্মক্ষত্রস্তু বৈ পুনঃ। ২৭৪ অং মৎস্যপুরাণ। ব্রহ্মক্ষত্রময়ো বর্ণো নাম মাত্রেণ দৃশ্যতে। ২৭ অঃ প্রতিসর্গ পর্ব্ব, ভবিষ্যপুরাণ।

(৮) ইক্ষ্বাকুণা ময়ং বংশঃ সুমিত্রান্তোভবিষ্যতি।
যতস্তং প্রাপ্য রাজানং সমংস্থাং প্রাপ্স্যতে কলৌ ॥

১২ অঃ ৪ অং বিষ্ণুপুরাণ।

ইক্ষ্বাকূণা ময়ং বংশ: সুমিত্রান্তো ভবিষ্যতি।
ইত্যাদি ইত্যাদি ॥ ৮ ॥

১২ অঃ ৯ স্কন্ধ, শ্রীমদ্ভাগবত।

ইক্ষ্বাকূণাময়ং বংশঃ সুমিত্রান্তো ভবিষ্যতি।
সুমিত্রং প্রাপ্য রাজানং সংস্থাং প্রাপ্স্যতি বৈ কলৌ ॥ ১৬ ॥

৭১ অঃ মৎস্যপুরাণ।

৩৭ অঃ বায়ুপুরাণ দেখ।

উদ্ধৃত বচনে 'অয়ং বংশঃ' থাকাতে ইক্ষ্বাকু বংশও যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় উভয় জাতির উৎপাদক বংশ তাহা ভাবে বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়।

* পাণিপাদং বাক্যের ন্যায় সমাহার দ্বন্দ্বসমাসে এখানে ব্রহ্মক্ষত্রং পদ হইয়াছে।

রসগন্ধক লোহাভ্রং সমং স্বতাভিত্র হেমচ। ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাত ব্যাধি অধিকার, রসেন্দ্রসারসংগ্রহ।

রস, গন্ধক লৌহ ও অভ্র এই সকল দ্রব্য সমান ভাগ, রসের চতুর্থাংশ স্বর্ণ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

'ব্রহ্মক্ষত্রস্য' এই বাক্যের ব্রহ্ম ও ক্ষত্র উভয় শব্দই ক্লীবলিঙ্গ। অতএব সমাহার দ্বন্দ্ব সমাসে 'ব্রহ্মক্ষত্রস্য' পদ সিদ্ধ হইতেছে। উপরে যে 'রস গন্ধক লোহাভ্রং' উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহাও সমাহার দ্বন্দ্ব সমাস। 'ব্রহ্মণঃক্ষত্রস্য' এই বাক্য হইতে 'ব্রহ্মক্ষত্রস্য' পদ হয়, ইহা টীকাকার শ্রীধর স্বামীর মত, পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে।

পুরুর বংশ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের যোনি, উক্তবংশ হইতে যে সকল ব্রাহ্মণ হইয়াছে এবং উক্তবংশে যাঁহারা ক্ষত্রিয়, এই উভয়ের মধ্যে যাঁহারা ব্রাহ্মণ তাঁহারা আচার দ্বারা পরে ব্রাহ্মণ হইলেও জন্ম কালে তাঁহারা একজাতি অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ই ছিলেন। এই হেতুতে 'জাত্যাদেক বচনং' এই ব্যাকরণ সূত্র দ্বারা 'ব্রহ্মক্ষত্রস্য' পদ হইতে পারে।

ঐল ইক্ষ্বাকুবংশশ্চ সহভেদৈঃ প্রকীর্ত্তিতৌ।
ইক্ষ্বাকোস্তু স্মৃতঃ ক্ষত্রঃ সুমিত্রান্তং বিবস্বতঃ॥ ৪২৫।
ঐলক্ষত্রং ক্ষেমকান্তং সোমবংশ বিদো বিদুঃ।
এতে বিবস্বতঃ পুত্রাঃ কীর্ত্তিতাঃ কীর্ত্তি বর্দ্ধনাঃ॥ ৪২৬।
অতীতা বর্ত্তমানাশ্চ তথৈ বাণা গতাশ্চ যে।
ব্রহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈবান্বয়ে স্মৃতাঃ॥ ৪২৭।

৩৭ অধ্যায়, বায়ুপুরাণ।

ঐলবংশ ও ইক্ষ্বাকুবংশ পৃথক্ পৃথক্ কীর্ত্তিত হইল। ইক্ষ্বাকুবংশীয় ক্ষত্রিয়ের সমাপ্ত (শেষ) সুমিত্র ও ক্ষেমক নৃপতি হইতে ঐলবংশীয় ক্ষত্রিয়ের শেষ (সমাপ্ত) হইয়াছে। ঐল এবং ইক্ষ্বাকুবংশীয় কীর্ত্তি বর্দ্ধন নৃপতিগণের সকলেই বিবস্বৎ অর্থাৎ সূর্য্যের পুত্র। আর যাঁহারা অতীত হইয়াছেন, এবং যাঁহারা যাঁহারা বর্ত্তমান, যাঁহারা ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করিবেন এবম্বিধ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরা সকলেই এই বিবস্বতের সন্তান।

বায়ুপুরাণের এই শেষ প্রমাণে স্পষ্ট দেখা যায় যে, চন্দ্র সূর্য্যবংশের সমাপ্তি স্থলে ক্ষত্রিয়পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মক্ষত্রিয় পদ প্রযুক্ত হয় নাই। উক্ত বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ যদি ব্রহ্মক্ষত্রিয় হইতেন, তাহা হইলে এবচনেও ব্রহ্মক্ষত্রিয় বাক্যই প্রযুক্ত হইত। অতএব বুঝিতে হইবে পূর্ব্বোদ্ধৃত বিষ্ণুপুরাণাদির ব্রহ্ম শব্দ একান্তই ব্রাহ্মণজাতিবাচক। এবং চন্দ্রবংশের যে সকল ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণাচার দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, উক্ত ব্রহ্মশব্দে তাঁহাদিগকেই বুঝাইবে। আর যাঁহারা ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে ছিলেন তাঁহারাই শেষোক্ত বচনে ক্ষত্রিয় বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ক্ষত্রিয় আর ব্রহ্মক্ষত্রিয় এক কথা নহে। চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ ব্রহ্মক্ষত্রিয় হইলে কোন স্থলেই যে তাঁহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া উক্ত হইতে পারেন না, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। বিবস্বৎ শব্দে সূর্য্য, সূর্য্যের পুত্রই বৈবস্বৎ মনু। বায়ুপুরাণের এবচনে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সকলেই যে এই মনুর পুত্র তাহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, এক মনুপুত্র বলিয়া ব্রাহ্মণাদি সকলেই এক জাতি। 'বৃত্ত্যা জাতিঃ প্রবর্ত্ততে। চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগতঃ।' এই সকল প্রমাণে যে দেখিতে পাওয়া যায়, বৃত্তি এবং পৃথক্ পৃথক্ গুণাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি জাতি হইয়াছে। তাহাকে উপরোক্ত এক জাতির অন্তর্গত পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণী বিভাগ মাত্র মনে করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ এই মনুর পুত্র বলিয়াই কি আপনাকে মানব বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করেন না? এই অর্থেই কি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র মানব নহেন? অতএব ইঁহারা সাধারণতঃ একজাতি সুতরাং 'জাত্যাদেক বচনং এই ব্যাকরণ সূত্র দ্বারা কেবল সেই অর্থে— 'ব্রহ্মক্ষত্রস্য' পদ কেন, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রস্য পদও হইতে পারে। আর ঋষিপ্রণীত গ্রন্থে ব্যাকরণ বিরুদ্ধ (আর্ষ) প্রয়োগ অনেক আছে। অতএব 'ব্রহ্মক্ষত্রস্য' পদ ব্যাকরণবিরুদ্ধ সাব্যস্ত হইলেও সেজন্য আমাদের উপরোক্তার্থের ব্যাঘাত হইতে পারে না; যেহেতু আমরাই কেবল উক্তার্থ করিতেছি না। শ্রীমদ্ভাগবতকার এবং শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি টীকাকার মহামান্য পণ্ডিতগণ উক্ত ব্রহ্মক্ষত্রস্য বাক্যের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অর্থই করিয়াছেন। যাই হউক, ক্ষত্রিয়ে ব্রাহ্মণাচার না থাকিলে, ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ হইয়াছে, এই মাত্র হেতুতে ক্ষত্রিয়ে ব্রহ্ম শব্দ যোগ করিয়া ক্ষত্রিয়কে ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয় হইতে যে সকল ব্রাহ্মণ হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যেও ক্ষত্রিয়াচার না থাকিলে তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে না। তবে যে বচনে 'ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ' আছে তাহার অর্থ ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন মাত্র; ক্ষত্রিয় ভাব (আচার) যুক্ত নহে। পূর্ব্বে পৃথক পৃথক গুণ ও আচারকে জাতিভেদের কারণ বলা

হইয়াছে—তাহাই ঠিক্ কথা; ব্রহ্মার মুখাদি অবয়ব হইতে যে ব্রাহ্মণাদির উৎপত্তি বর্ণিতে হইয়াছে তাহাও যোনিগত নহে, গুণগত (৯)।

যে বচন অবলম্বন করিয়া চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়দিগকে ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে তদ্দ্বারা তাহা সিদ্ধ হইতেছে না। অতএব ঢাকুর গ্রন্থকার যেরূপে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়দিগকে ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়াছেন (১০) সম্প্রতি তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে। ঢাকুর নামক গ্রন্থকর্ত্তা বলেন, চন্দ্রবংশীয় ভরত রাজা নিঃসন্তান হইলে বৃহস্পতির অবৈধ পুত্র ভরদ্বাজকে রাজর্ষি ভরত দত্তক গ্রহণ করেন। তাঁহা হইতেই চন্দ্রবংশ রক্ষা পায়। ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ভরতের দত্তক পুত্র হইয়া তিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় উভয় জাতিই হইয়াছিলেন। সুতরাং চন্দ্রবংশ ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় বংশ। ভরত নৃপতি যে বৃহস্পতির অবৈধ পুত্র ভরদ্বাজকে দত্তক রাখেন, সে প্রস্তাব বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারত প্রভৃতি বহু প্রামাণ্য গ্রন্থে আছে (১১)। কিন্তু ভরতের দত্তক হইয়া ভরদ্বাজ যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় উভয়ই হইয়াছিলেন তাহা কোন গ্রন্থেই কথিত হয় নাই। ভাগবতের টীকায় বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কেবল উক্ত পুত্রকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় উভয়ই বলিয়াছেন। সে স্থলে যখন কোন প্রমাণ উদ্ধৃত হয় নাই এবং মূল বচনেও যখন উক্ত বিষয়ের আভাস পাওয়া যায় না, তখন উহাকে তাঁহার নিজের উক্তি মনে করিতে হইবে। তাঁহার নিজের উক্তি হইলেও যুক্তি থাকিলে তাহা স্বীকার করা যাইতে পারে। রাজর্ষি ভরত ক্ষত্রিয়, ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণ হইলেও তিনি যখন ক্ষত্রিয়ের দত্তক পুত্র হইয়াছিলেন তখন পুত্রেষ্টি যাগাদি দ্বারা তাঁহার বৃহস্পতির পুত্রত্ব ও ব্রাহ্মণত্বের ধ্বংস হইয়া তিনি যে ক্ষত্রিয়াচার যুক্ত অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ভরতের পুত্র ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার যে ব্রাহ্মণাচার ছিল না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আর একটী কথা এই যে, ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইলে কিম্বা ব্রাহ্মণের অবৈধ পুত্র (ব্রাহ্মণ) ক্ষত্রিয়ের দত্তক পুত্র হইলে তথাচার ক্ষত্রিয়ে ব্রহ্মভাব (ব্রাহ্মণত্ব) উৎপন্ন হয় না। ক্ষত্রিয়ে স্বার্থ ব্রহ্মভাব (ব্রাহ্মণত্ব) আছে (১২)। যে বেদাধ্যয়ন ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম

---

(৯) লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহুরু পাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥ ৩১॥

১ অঃ মনুসংহিতা।

ভাষ্য—অস্যজন্মুখবাহুরু পাদতঃ যথাক্রমং মুখাদ্ব্রাহ্মণং স্বমুখাবয়বেভ্য দৈবা শক্ত্যা নির্ম্মিতবান্ অদ্যতনানাং সর্ব্বেষাং মিথুন সংপ্রয়োগদ্বারেণ তদ্ভেদা উৎপত্তি দর্শনাৎ। পরমার্থতঃ স্তুতিরেষা বর্ণনামুৎকর্ষাপকর্ষ প্রদর্শনার্থম্। সর্ব্বেষাং ভূতানাং প্রজাপতি শ্রেষ্ঠস্তস্যাপি সর্ব্বেষা মঙ্গলাং মুখ ব্রাহ্মণোহপি সর্ব্বেষাং বর্ণানাং প্রশস্যতমঃ। এতেন পাশশ্যেন মুখাদুৎপন্ন ইত্যুচ্যতে মুখকর্ম্মাধ্যাপনাদাতিশ। শয়াদ্বা মুখত ইত্যুচ্যতে। ক্ষত্রিয়স্যাপি বাহুকর্ম্ম যুদ্ধং বৈশ্যস্যরুকর্ম্ম পশুরূপং রক্ষণে গোভিশ্চরত্নাভির্ভ্রমণং স্থলপথ বারিপথাদিষু বাণিয্যার্থে গমনম্। শূদ্রস্য পাদকর্ম্ম সুশ্রুষা॥ ৩১॥

মুখং কি বাহু কি মুরু কিমস্য পাদ উচ্যতে॥
ব্রাহ্মণস্য মুখমাসীৎ বাহুরাজন্য কৃতঃ।
উরুস্তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়তে॥

১৯ কাণ্ড ৩ সূক্ত অথর্ব্ববেদ।

১০ মণ্ডল ৯০ সূক্ত, ঋগ্বেদ দেখ।

উদ্ধৃত বেদের পুরুষ সূক্ত বচনেও ব্রাহ্মণকেও মুখ, ক্ষত্রিয়কে বাহু, বৈশ্যকে উরু বলা হইয়াছে—পদ হইতে শূদ্র—ইহার অর্থও পদগুণ হইতেই বুঝিতে হইবে।

(১০) নব্যভারত ৭ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যার ১৮৭ পৃষ্ঠায় 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' প্রবন্ধ দেখ। ২য় খণ্ড নব্যভারত ৫ম সংখ্যার ২১ পৃষ্ঠায় 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' প্রবন্ধের প্রতিবাদ ও 'সেনরাজগণ' প্রবন্ধ দেখ।

(১১) ভরতস্য পত্নীনাং যে নবপুত্রা বভূবুর্নৈতে মমানুরূপাঃ পুত্রা ইত্যভিহিতা স্তম্মাতয়ো জঘ্নুঃ পরিত্যাগ ভয়াৎ॥ ৪॥

অতোস্য পুত্র জন্মনি বিততো পুত্রার্থিণ মরুৎস্তোম যাজিনো দীর্ঘতমসো প্রার্ষ্ণ্য পাস্ত বৃহস্পতিবীর্য্যা দুতথা পত্নী মমতা সমুৎপন্নো ভরদ্বাজস্যঃ পুত্রো মরুদ্ভির্দ্দত্তঃ॥ ৫॥ ইত্যাদি।

ভরদ্বাজশ্চ তস্য বিতথে পুত্রজন্মনি মরুদ্ভির্দ্দত্তঃ ততো বিতথ সংজ্ঞামবাপ॥ ৮॥

বিতথস্য ভবমন্যুঃ পুত্রোভবৎ। ইত্যাদি। ১৯ অঃ ৪ অং বিষ্ণুপুরাণ।

ভরতস্তিসৃষুস্ত্রীষু নবপুত্রানজীজনৎ। ততস্তন্নোতরঃ ক্রুদ্ধাঃ পুত্রান্নিন্যু র্যথাক্ষয়ং॥ ৩০

ততস্তস্য নরেন্দ্রস্য বিতথ পুত্র জন্মতৎ। ততো মহদ্ভি ক্রতুভি বীজাপো ভরত সুদা॥ ৩১

লেভে পুত্রং ভরদ্বাজাদ্ভু মন্যুং নাম ভারত। ততো বিদিরথো নাম ভূমন্যো বভবৎ সুতঃ॥ ৩২

৮৮ অঃ আদিপর্ব্ব, মহাভারত।

১৯,২০।২১।২২।২৩ শ্লোক, ৮৭ অঃ ঐ।

ভরতস্য মহৎ কর্ম্ম ন পূর্ব্বে না পরে নৃপা। ইত্যাদি। ১৯।২০।২১।২২

তস্যৈব বিতথে বংশে তদর্থং যজতঃ সুতং। মরুৎ সোমেন মরুতো ভরদ্বাজমুপাদদুঃ॥ ২৩॥

অন্তর্ব্বত্ন্যাং ভ্রাতৃপত্ন্যাং মৈথুনায় বৃহস্পতি। ইত্যাদি। ২৪.২৫

মূঢ়ে ভরদ্বাজমিমং ভরদ্বাজ বৃহস্পতেঃ। ইত্যাদি। ২৬।২৭॥

২০ অঃ ৯ স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবত।

বিতথস্য সুতান মন্যোর্বৃহৎ ক্ষত্রো জয়স্ততঃ। ইত্যাদি। ১।

২১ অঃ ৯ স্কঃ ঐ।

মৎস্যপুরাণ ৪৯ অঃ ৮৬ পৃষ্ঠা।

(১২) না ব্রহ্ম ক্ষত্র মৃধ্নোতি না ক্ষত্রং ব্রহ্ম বর্দ্ধতে।
ব্রহ্মক্ষত্রঞ্চ সম্পৃক্ত মিহচামূত্র বর্দ্ধতে॥৩২২।

৯ অং মনুসংহিতা।

ক্ষাত্রং দ্বিজত্বঞ্চ পরস্পরত্বং। ভট্টিকাব্য।

ত্রয়োবর্ণা ব্রাহ্মণস্য বশেবর্ত্তেরণ তেষাং ব্রাহ্মণোধর্ম্ম যদব্রুয়া দ্দজোচাস্য তিষ্ঠেৎ। ১ অঃ বশিষ্ঠ সংহিতা।

সেই বেদাধ্যয়ন ক্ষত্রিয়েরও ধর্ম্ম। (১৩) যে ব্রহ্ম গায়ত্রী ব্রহ্মজন্ম ব্রাহ্মণের, সেই ব্রহ্মগায়ত্রী ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যের (১৪)। এক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের (১৫)। ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়ও ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে (১৬)। যাগস্থ ক্ষত্রিয়কে হত্যা করিলে পূর্ণ ব্রহ্মহত্যার পাতক হইয়া থাকে (১৭)। এমতাবস্থায় ক্ষত্রিয়ে ব্রাহ্মণত্ব নাই বলিয়া, ভরদ্বাজকে দত্তক গ্রহণের পূর্ব্বে যে ক্ষত্রিয়কুল হইতে বিস্তর ব্রাহ্মণের জন্ম হইয়াছে যে (চ) ক্ষত্রিয় কুলজাত সন্তান রাজর্ষি যযাতি ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করিয়াও আর্য্য সমাজে অসম্মানিত হন নাই (১৮)। ভরদ্বাজের মত অবৈধ পুত্র (ব্রাহ্মণ) সেই ক্ষত্রিয় কুলে দত্তক হইয়াছিলেন বলিয়া তদ্দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও ঠাকুর গ্রন্থকার যে সেই ক্ষত্রিয়কুলকে ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন ইহা হইতে আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে? প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রে এখনকার ব্রাহ্মণাদির ন্যায় পার্থক্য ছিল না। তখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ চলিত (ক)। পরস্পরে ভোজ্যান্নতা ছিল (খ)। তখনকার আর্য্য সমাজে ভরদ্বাজের মত অবৈধ ব্রাহ্মণ সন্তানের ক্ষত্রিয় হইতে যে শ্রেষ্ঠত্ব ছিল না এবং থাকিলে যে উক্ত পুত্রকে ক্ষত্রিয়ের দত্তক পুত্র হইতে হইত না তাহা বলা বাহুল্য।

শ্রীগোপীচন্দ্র সেন গুপ্ত।

দুখানি অভিধান।

বাঙ্গলা ভাষার একখানি ভাল অভিধানের বড়ই প্রয়োজন রহিয়াছে। বর্ত্তমানে যে সকল অভিধান আছে, তাহাদিগকে বাঙ্গালা অপেক্ষা সংস্কৃত ভাষার অভিধান

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
এতেষু ধর্ম্মবিহিতো ব্রাহ্মণ্য যুধিষ্ঠির॥ আনুশাসনিক পর্ব্ব, মহাভারত।

(১৩) প্রজানাং রক্ষণং দান মিজ্যাধ্যয়ণ মেবচ। বিষয়েষ্ব প্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥ ৮৯। পশুনাং রক্ষণং দান মিজ্যাধ্যয়ন মেবচ। বণিকপথ কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেবচ॥৯০॥ ১ অঃ মনুসংহিতা।

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদ মন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
সজীবন্নেব শূদ্রত্ব মন্নুগচ্ছতি সান্বয়ঃ॥১৬৮

২ অঃ মনুসংহিতা।

অব্রতাহ্যনধীয়ানা যত্র ভৈক্ষ চরাদ্বিজাঃ।
তংগ্রামং দণ্ডয়েদ্রাজা চৌরভক্ত প্রদোহি সঃ॥

৩ অঃ বশিষ্ঠসংহিতা।

(১৪) ওঁ ভূর্ভবস্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ॥ ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব বেদীয় ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সন্ধ্যা বিধি দেখ।

তত্র যদ্‌ব্রহ্ম জন্মাস্য মৌঞ্জীবন্ধন চিহ্নিতং।
তত্রাস্য মাতা সাবিত্রী পিতাত্বাচার্য্য উচ্যতে॥১৭০॥
ভাষা—তত্রৈতেষু দ্বিজন্মসু যদেতৎব্রহ্ম জন্ম উপনয়নং

মেধাতিথি।

টীকা—যদে তৎব্রহ্ম গ্রহণার্থং জন্ম উপনয়ন সংস্কাররূপং কুল্লূকভট্ট।

(১৫) ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
এতেষু ধর্ম্মবিহিতো ব্রাহ্মণস্য যুধিষ্ঠির। ইত্যাদি।

আনুশাসনিক পর্ব্ব, মহাভারত।

(১৬) টীকাধৃত নাব্রহ্ম ক্ষত্র ইত্যাদি দেখ। ২ অঃ মনুসংহিত।

(১৭) যাগস্থ ক্ষত্রবিড়্‌ঘাতে চরেৎ ব্রহ্মহনো ব্রতম্। প্রায়শ্চিত্ত বিবেক।

অকামতস্তু রাজন্যং বিনিপাত্য দ্বিজোত্তমঃ। বৃষভৈক সহস্রগো দদ্যাৎ সুচরিত ব্রতঃ॥১২৮॥ ত্র্যব্দঞ্চরেদ্বা নিয়তো জটী ব্রহ্মহণোব্রতং।

বসন্ দূরতরে গ্রামাদ্‌বৃক্ষ মূল নিকেতনঃ॥১২৯॥

১১ অঃ মনুসংহিতা।

(চ) ২।৫।১ টীকা দেখ।

(১৮) মহাভারত আদিপর্ব্ব, ৯ স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবত ৪ অংশ বিষ্ণুপুরাণ দেখ।

(ক) শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বাচ বিশঃ স্মৃতে
তেচ স্বাচৈব রাজ্ঞঃস্যাঃ তাশ্চ স্বাচাগ্রজন্মন॥১৩।

৩ অঃ মনুসংহিতা।

অন্যান্য স্মৃতি ও পুরাণীয় ব্রাহ্মণাদির বিবাহ বিধি দেখ। বিষ্ণুপুরাণ ৪ অংশ ২ অধ্যায়ে ক্ষত্রিয় মান্ধাতার কন্যাদিগের সৌরভি ব্রহ্মর্ষির সহিত বিবাহের বিষয় দেখ।

কশ্যপ দুহিতা সুমতি, বিদর্ভ রাজতনয়া চ কেশিনী দ্বেভার্য্যে সগরস্যাস্তাম্।

৪ অঃ ৪ অং বিষ্ণুপুরাণ।

গাধিশ্চ সত্যবতীং নাম কন্যামজনয়ৎ। তাঞ্চ ভার্গব ঋচিকোবব্রে।

৫.৬ শ্লোক ৭ অঃ ৪ অং বিষ্ণুপুরাণ।

যমদগ্নির্বিক্ষাকুবংশোদ্ভবস্য রেনোঃ তনয়াং রেনুকা মুপয়েমে। ঐ ঐ

যযাতিস্তু ভূভৃদভবৎ, উনশনস্য দুহিতরং দেবযানীং শর্ম্মিষ্ঠাঞ্চ বার্ষপর্ব্বনী মুপয়েমে॥১॥

১০ অঃ ৪ অং বিষ্ণুপুরাণ।

হিড়িম্বা ঘটোৎকচং ভীমসেনাৎপুত্র মরণে
অর্জ্জুনস্যাপালুপ্যাং নাগ কন্যায়া সিরাবান্ নাম পুত্রোৎভবং।

২০ অঃ ৫ অং বিষ্ণুপুরাণ।

৯ স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবত দেখ।

আদিপর্ব্ব, মহাভারত দেখ।

দাস নাপিত গোপালকুল মিত্রার্দ্ধ সিরিনঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্নং যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥

পরাশর সংহিতা।

আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপালো দাসনাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥২৫৩।

৪ অঃ মনুসংহিতা।

ত্রিষুবর্ণেষু কর্ত্তব্য পাক ভোজনমেবচ।
শুশ্রূষা মভিপন্নানাঃ শূদ্রানাস্তু বিশেষতঃ॥

তিথিতত্ত্বধৃত বরাহপুরাণ।

ত্রৈবর্ণিকেন সিদ্ধান্নেন নৈবিদ্যং শূদ্রেন দ্বিজ শুশ্রূষায় তেন চ।

তিথিতত্ত্ব ধৃত গঙ্গা বাক্যাবলী।

বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। খাঁটি সংস্কৃত শব্দ নয় এরূপ বাঙ্গালা কথা তাহাতে অনেক পাওয়া যায় না। কথাবার্ত্তায় চলিত শব্দ দূরে থাক্, যে সকল "দেশজ" শব্দ সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে, তাহাও বহুল পরিমাণে এই সকল অভিধানে পাওয়া যায় না। অনেকে বলিবেন, এরূপ কথার মানে ত আমরা সকলেই জানি; অভিধানে তাহাদের উল্লেখের প্রয়োজন কি? ইংরাজেরা ত চলিত সহজ কথার মানে সকলেই জানেন, তবে তাঁহারা ইংরাজী অভিধানে সেগুলি লিখিয়া কেন অভিধানগুলির কলেবর বৃদ্ধি করেন? বাস্তবিক আমরা সকলেই যে চলিত সকল বাঙ্গলা কথার মানে জানি তা নয়। আর, যে সকল কথা শুনিলে বুঝিতে পারি, সে সকলের অর্থ পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে পারি কি? সে সকলের ঠিক্ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে পারি কি? নিশ্চয়ই পারিনা। তদ্ভিন্ন কোন কোন কথা এক জেলায় প্রচলিত, কিন্তু অন্য জেলায় প্রচলিত নাই। প্রচলিত থাকিলেও হয়ত ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এরূপ অনেক কথা বাঙ্গলা সাহিত্যে, বিশেষতঃ আধুনিক নাটক উপন্যাসে স্থান পাইয়াছে। সকল জেলার লোক এই সকল কথার অর্থ কিরূপে বুঝিবেন? কথোপকথনের সময় এক জেলার লোক অন্য জেলার লোক কর্ত্তৃক ব্যবহৃত এরূপ কোন কথা শুনিতে পাইলে হয়ত বুঝিতে পারেন না। তাঁহাদের বুঝিবার একটা সহজ উপায় চাই।

তাহার পর প্রবাসী বাঙ্গালীর কথাও চিন্তনীয়। উত্তর পশ্চিম, বেহার, অযোধ্যা, পঞ্জাব ও মধ্যভারতে অনেক বাঙ্গালী আছেন, যাঁহাদের বাঙ্গালা দেশে ঘর বাড়ী নাই, তথায় যাতায়াতও নাই। তাঁহাদের বঙ্গভাষার সম্যক্ জ্ঞান এইরূপ অভিধান ভিন্ন হয় না। তাঁহারা অনেকে বাঙ্গলা বলেন, অদ্ভুত রকমের; যেন কোন হিন্দুস্থানী বাঙ্গলা বলিতেছেন। তাঁহাদের কথা বলিবার রীতিও বদলিয়া গিয়াছে। আমরা বলি, "তিনি বেশ ভাল লোক;" ইহারা বলেন, "তিনি বেশ ভাল লোক হ'চ্চেন।" আমার এক বন্ধু মধ্যভারতের একজন বাঙ্গালীকে জিজ্ঞাসা করেন, "মশায়ের নামটা কি?" উত্তর পাইলেন—"তারিনি সংকরটি আছে।" ভদ্র লোকটীর নাম তারিণী শঙ্কর; হিন্দুস্থানী রীতি অনুসারে তিনি কেবল নাম বলিয়াছিলেন, পদবী বলেন নাই। তাই আমার বন্ধু কিঞ্চিৎ পরিহাসচ্ছলে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কিছু আছে না?" উত্তর পাইলেন—"বোস্ ভি আছে;" অর্থাৎ বোস্‌ও আছে। ভদ্র লোকটীর পুরা নাম তারিণীশঙ্কর বসু। ইহাদের জন্য বাঙ্গলা অভিধান চাই, বাঙ্গলা ব্যাকরণ চাই, বাঙ্গলা উচ্চারণ শিখিবার পুস্তকও চাই।

এরূপ শব্দও আছে, যাহার অর্থ এক জেলায় অশ্লীল, অন্য জেলায় অশ্লীল নয়। এইজন্য কথোপকথনের সময় কখনও কখনও বিপদে পড়িতে হয়। বিস্ময় ও দুঃখের বিষয় এই যে, প্রায় ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত ইংরাজ সংকলিত বাঙ্গলা অভিধানে এইরূপ অনেক বাঙ্গলা কথা পাওয়া যায়, যাহা বাঙ্গালীর সংকলিত কোন অভিধানে পাওয়া যায় না। "প্রদীপে" দীনেশ বাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" সমালোচনা করিবার সময় আমি এরূপ কতকগুলি কথার দৃষ্টান্ত দিয়াছিলাম। প্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থে ব্যবহৃত অনেক কথা বাঙ্গলা অভিধানে পাওয়া যায় না। কোন কোনটী ইংরাজসঙ্কলিত বাঙ্গলা অভিধানে পাওয়া যায়। কোন কোনটীর অর্থ ও ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে "সাধনা" প্রভৃতি পত্রে তর্ক বিতর্কও হইয়া গিয়াছে। তৎসম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। প্রতি মাসে অনেক প্রাচীন অপ্রকাশিত পুঁথি আবিষ্কৃত হইতেছে। যাহার সাহায্যে মুদ্রিত ও অমুদ্রিত এই সকল পুস্তক বুঝিতে পারা যায়, এরূপ কোন অভিধান সংকলন কি অসম্ভব?

প্রায় সমার্থবোধক অনেক শব্দ বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে। তাহাদের পরস্পরের অর্থের মধ্যে যে সামান্য প্রভেদ আছে, তাহা নির্ণয় করিবার এ পর্য্যন্ত কোনই চেষ্টা হয় নাই। অভিধানে এরূপ চেষ্টা হইলে, ক্রমে এ বিষয়ে সাহিত্যসেবীদিগের দৃষ্টি পড়িতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গভাষার চিন্তা ও ভাবের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রভেদ প্রকাশ করিবার ক্ষমতা বাড়িতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হুকুম, আদেশ ও আজ্ঞা এই তিনটি কথা লউন; কিম্বা বল, শক্তি ক্ষমতা, সামর্থ্য ও যোগ্যতা এই কথাগুলি লউন। এই কথাগুলি ঠিক্ এক অর্থে বা ভাবে ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কি প্রভেদ, তাহা কে বলিয়া দিবে? অবশ্য যাহারা বঙ্গ সাহিত্যের মহারথী তাঁহারা এই সকল কথার অপপ্রয়োগ করিবেন না। কিন্তু সকলেইত মহারথী নয়। যাহারা মহারথী নন, তাঁহারা এই প্রভেদ কেমন করিয়া

বুঝিবেন, বা বুঝিয়া কেমন করিয়া এইরূপ শব্দগুলির যথাযথ প্রয়োগ করিবেন? ইহাদের মধ্যে যাহা প্রভেদ আছে, তাহা স্থির করিতে হইলে বিশেষ চিন্তা, বিস্তৃত অধ্যয়ন ও সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ শক্তির প্রয়োজন। ভাল অভিধান লিখিবার চেষ্টা হইলে এই বিষয়ে আমাদের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা।

আরও একটি ভাবিবার কথা আছে। বঙ্গসাহিত্যের যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, এবং হইবার আশা আছে, তাহাতে এখন যে উহা কেবল বাঙ্গালী দ্বারাই অধীত ও আলোচিত হইবে, এরূপ মনে করা উচিত নয়। বাঙ্গালী ভিন্ন অন্য অনেকেও এখন বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেছেন। তাঁহাদের জন্যও একখানি ভাল বাঙ্গলা অভিধানের প্রয়োজন। তাঁহারা বাঙ্গলা পড়িতে আরম্ভ করিলে ভালই হয়। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকদের মধ্যে সদ্ভাব নাই; বিদ্বেষ যথেষ্ট আছে। পরস্পরকে জানিতে পারিলে এই বিদ্বেষ থাকিবে না, সদ্ভাবের সঞ্চার হইবে। পরস্পরের সাহিত্য চর্চ্চা দ্বারা এই উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে সিদ্ধ হইতে পারে। ইংরাজ শাসনে আমাদের জাতীয় একতা সাধিত হইতেছে। আমাদের একত্ব বোধ যত প্রকারে জন্মে ততই মঙ্গল। পরস্পরের ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা এই একত্ব বোধ জন্মিবার অন্যতম উপায়। অনেক চলিত বাঙ্গলা কথা ও চলিত হিন্দী কথা এক এবং একার্থবোধক। সামান্য উচ্চারণের প্রভেদ মাত্র দেখা যায়। গ্রাম্য হিন্দীর সহিত গ্রাম্য বাঙ্গালার অনেক সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

বাঙ্গলা সাহিত্যে "দেশজ" শব্দের, প্রাকৃতাদি হইতে সমুদ্ভূত শব্দের কিছু অনাদর দৃষ্ট হয়। অন্ততঃ বাঙ্গলা অপেক্ষা হিন্দী সাহিত্যে কথোপকথনে প্রচলিত শব্দের অধিকতর প্রচলন দেখা যায়। বাঙ্গলা সাহিত্যে এরূপ শব্দের অনাদরের কারণ যাহাই হউক, উহাতে যে ভাষার ও সাহিত্যের ক্ষতি হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন জাতির প্রাণের কথা বলিতে পারিলে, বা তাহার প্রাণ স্পর্শ করিতে পারিলে, যে উহার সাহিত্যের বল ও উপকারিতা বাড়ে তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু কেবল পোষাকী কথা ব্যবহার করিয়া কি কেহ রৌদ্রতপ্ত কর্দ্দমাক্তদেহ কৃষকের মনের কথা বলিতে পারে? এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য আটপৌরে কথার দরকার। তা ছাড়া কতকগুলি কথাকে নাহক্ ভদ্র সমাজ হইতে তাড়াইয়া দিলে কেবল যে ভাষার ঐশ্বর্য্য কমে তাহা নয়; এই শব্দগুলির পরিবর্ত্তে কতকগুলি দুর্ব্বোধ সংস্কৃত কথার অবতারণা করিতে হয়।

ইংরাজ রাজপুরুষেরা বলেন, আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা দেশের সাধারণ লোকের প্রকৃত অবস্থা, অভাব ও ইচ্ছা জানেন না। দেশের সাধারণ লোকদের সহিত তাঁহাদের সহানুভূতি নাই। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। সাধারণ লোকে যে সকল জিনিস লইয়া, যে দৃশ্যের মধ্যে কাল কাটায়, সে সকলের জ্ঞান আমাদের কতটুকু আছে? একখানা গরুর গাড়ীর, গাড়ীর চাকার, লাঙ্গলের, ভিন্ন ভিন্ন অংশের নাম কজন শিক্ষিত লোকে জানেন? চাষের, মাছধরার, কাপড় কেনার ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ার নাম, নানাবিধ স্বভাবজ বৃক্ষ লতাদির নাম আমরা জানি কি? অথচ এ সকল নাম না জানিলে চাষাকে, জেলেকে, তাঁতিকে জানা হইল না। এ সকলের নামও সকল জেলায় এক নয়। অভিধান লিখিত হইলে এই সকল নামের জ্ঞান বিস্তৃত হইতে পারে এবং ক্রমে ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন নাম ঘুচিয়া গিয়া কোন জিনিসের একটি নাম বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রচলিত হইতে পারে। ইহাও কম লাভ নয়।

একখানি ভাল বাঙ্গলা অভিধানে কি থাকা চাই? তাহাতে প্রাচীন ও আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যে প্রচলিত সমুদয় শব্দের সমুদয় অর্থ থাকা উচিত। সাহিত্য শব্দটা আমি পুস্তক, সাময়িক পত্র ও সংবাদ পত্র সমুদয়ের সমষ্টি অর্থে ব্যবহার করিতেছি। আইন আদালতের, পুলিশের ডায়েরীর ভাষা পর্য্যন্ত এই অভিধানের সাহায্যে বুঝিতে পারা চাই। শব্দগুলির অর্থ ব্যতীত ব্যুৎপত্তিও থাকা চাই। বর্ত্তমানে কেবল খাঁটি সংস্কৃত শব্দগুলিরই প্রকৃতি প্রত্যয়াদি দৃষ্ট হয়। অপরাপর শব্দ "দেশজ" "যাবনিক" ইত্যাকার উপাধিতে অভিহিত হয় মাত্র। কিন্তু সকল শব্দেরই যথাসম্ভব ব্যুৎপত্তি দেওয়া উচিত। অনেক কথা সংস্কৃত নয়, কিন্তু কোনও প্রাকৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন। কোন্ প্রাকৃত শব্দ হইতে কোন্ শব্দটির উৎপত্তি, তাহা নির্ণীত হওয়া উচিত। হিন্দী ও মারাঠীর সহিত তুলনা করিলে এই কার্য্যটি কিয়ৎ পরিমাণে সুসাধ্য হইতে পারে। অবশ্য এই কার্য্যটি যিনি করিবেন তাঁহার পালী প্রভৃতি ভাষাও জানা চাই। বঙ্গদেশ বহুকাল মুসলমানের অধীন থাকায় অনেক ফারসী, আরবী, ও তুর্কী

কথা বাঙ্গলা ভাষায় স্থান পাইয়াছে। ইহাদেরও উৎপত্তি নির্দ্দেশ করা উচিত। অনেকগুলির বাঙ্গালা অর্থ আদিম অর্থ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে: যেমন খৎ, বরাবর। কেমন করিয়া ক্রমে ক্রমে অর্থের পরিবর্ত্তন ঘটিল, তাহা স্থির করিবার চেষ্টা করা উচিত। কতকগুলি ইংরাজী কথাও বাঙ্গলাতে স্থান পাইয়াছে। কোন কোন প্রচলিত বাঙ্গলা কথা পোর্ত্তুগীজ ভাষা হইতে উদ্ভূত বলিয়া বোধ হয়। এই সমুদয় ইউরোপীয় ভাষা সমুদ্ভূত কথার উৎপত্তিও নির্ণীত হওয়া উচিত। কোন কোন বাঙ্গলা কথা সাঁওতালী ভাষা হইতে গৃহীত। তাহারও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। ভাল ভাল ইংরাজী অভিধানে যেমন কথার ব্যুৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজীর সগোত্র অন্যান্য ভাষার সমার্থ ও তুল্যরূপ কথার উল্লেখ থাকে, বাঙ্গলা অভিধানেও তদ্রূপ করা কর্ত্তব্য।

ভাল বাঙ্গলা অভিধানে প্রায় একার্থ বোধক ভিন্ন ভিন্ন শব্দের অর্থের সূক্ষ্ম পার্থক্য উল্লিখিত হওয়া উচিত। তাহার পর শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট করিবার জন্য ভাল ভাল লেখকগণের গ্রন্থ হইতে উদাহরণ সংগৃহীত হওয়া উচিত। প্রচলিত বাঙ্গলা অভিধানে সংস্কৃত সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত উদাহরণ দৃষ্ট হয়। ইহা বড়ই হাস্যকর ব্যাপার। বাঙ্গলার কি সাহিত্য নাই? আর, বাঙ্গলা ত সংস্কৃত নয়। কোন কোন খাঁটি সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গলা ভাষায় সংস্কৃত হইতে ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়।

পরিশেষে বক্তব্য এই, ভাল বাঙ্গলা অভিধানে স্থল বিশেষে বাঙ্গলা শব্দগুলির উচ্চারণও লিখিত হওয়া উচিত। এই ফরমাইসটি অনেকের নিকট বড় অদ্ভুত ও অনাবশ্যক বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু বাস্তবিক ইহা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন নহে। সাধারণতঃ আমরা যেরূপ লিখি, উচ্চারণও তদ্রূপ করি। ইংরাজী শব্দের উচ্চারণ শিক্ষা করা অপেক্ষা বাঙ্গলার উচ্চারণ শিক্ষা করা শত গুণে সহজ। কিন্তু তথাপি অনেক বাঙ্গলা শব্দের উচ্চারণ ঠিক করিয়া লেখা আবশ্যক। আমরা দেবনাগরী হইতে কিয়ৎপরিমাণে রূপান্তরিত বর্ণমালা ব্যবহার করি। কিন্তু সংস্কৃতের উচ্চারণ বাঙ্গলা হইতে কোন কোন স্থলে পৃথক। বাঙ্গলায় তিনটি স (শ, ষ, স) কারের পৃথক্ উচ্চারণ হয় না। ন ও ণ এর উচ্চারণও স্বতন্ত্র হয় না। দুটা ব এর আকৃতি ও উচ্চারণ একই করা হয়। য ও জ এর উচ্চারণ অনেকস্থলে একই প্রকার করা হয়। বাঙ্গলাতে "অ" এর উচ্চারণ আমরা not এর o, gold এর o, বা ball এর a এর মত করি; কিন্তু হিন্দী সংস্কৃতে উহার উচ্চারণ but এর u এর মত বলিয়াই মনে হয়। ইহাতে দুটি দোষ হয়। ভিন্নজাতীয় লোকেরা এবং "প্রবাসী" বাঙ্গালীরা বাঙ্গলা অক্ষরের দেবনাগরী উচ্চারণ করিয়া হাস্যাস্পদ হন; এবং আমরা সংস্কৃত ও হিন্দী বলিবার ও পড়িবার সময় বাঙ্গলার মত উচ্চারণ করিয়া হাস্যাস্পদ হই ও ভ্রমে পড়ি।

আমরা লিখি "মধু" বলি "মোধু"; লিখি "অন্য" বলি কতকটা "ওন্নো"র মত; লিখি "কেমন" বলি "ক্যামন"। এইরূপ "দেখ," "কেন," "ব্যক্তি" প্রভৃতির উচ্চারণ হয় "দ্যাখ," "ক্যান," "বেক্তি," ইত্যাদি। লিখিবার বেলা লিখি "হঠাৎ," "গর্দ্দভ," বলি কিন্তু "হটাৎ," "গর্ধব"। "জিহ্বা" ও "আহ্বানে"র উচ্চারণ কেহ করেন, "জিও্হা" ও "আও্হান," কেহ করেন, "জিব্ভা" "আব্ভান"। কেহ ডাকেন, কেদার, কেহ ডাকেন, ক্যাদার; কেহ ডাকেন অক্ষয়, কেহবা ডাকেন, ওক্খয়। পূর্ব্ব বঙ্গে ও পশ্চিম বঙ্গে উচ্চারণের কত প্রভেদ। এই জন্য বলি বাঙ্গালা ভাষার অনেক কথার উচ্চারণ ঠিক্ করিয়া লিখিত হওয়া উচিত।

আমি যেরূপ একখানি অভিধানের বরাত করিলাম তাহা সহজ সাধ্য বা শীঘ্র সম্পাদ্য নহে, এক জনের কর্ম্ম নহে। অনেক বৎসর ধরিয়া অনেক লোকে খাটিলে তবে ইহা সম্পন্ন হইতে পারে। এক জন সাধারণ সম্পাদক থাকা চাই। তাহার পর, সংজ্ঞা বা অর্থ, ব্যুৎপত্তি, উদাহরণ, উচ্চারণ, এই সকল বিভাগের এক জন সহকারী সম্পাদক চাই। উদাহরণ সংগ্রহের জন্য বর্ণানুসারে শত শত পাঠক থাকা চাই। সংস্কৃত, পারসী, আরবী, প্রাকৃত, সাঁওতালী, প্রভৃতি ভাষা হইতে গৃহীত বা উৎপন্ন শব্দের উৎপত্তি নির্ণয়ার্থ তত্তদ্ভাষাভিজ্ঞলোকের সাহায্য প্রয়োজন। সকলকে অর্থ দিতে গেলে চলিবে না। ইংরাজ ধনীজাতি, অনেক ধনী ইংরাজ প্রকাশক আছেন। তথাপি দেখিতে পাই, মরে ও ব্র্যাড্লী সম্পাদিত নূতন ইংরাজী অভিধানের জন্য শত শত সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি অর্থ না লইয়া কত পরিশ্রম করিতেছেন! সুতরাং আমাদের

দরিদ্র দেশে যে অবৈতনিক কার্য্যকারকের একান্ত প্রয়োজন তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি?

একখানি ইংরাজী হইতে বাঙ্গালা ভাল অভিধানেরও প্রয়োজন আছে। ইংরাজী সাহিত্য বিশাল ঐশ্বর্য্যশালী, অথচ ইংরাজ যে ভাষায় ভাল পুস্তক দেখেন তাহারই ইংরাজী অনুবাদ করেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের দারিদ্র্য ঘুচাইতে হইলে অন্যান্য উপায়ের মধ্যে আমাদিগকে ঐ উপায়টিও অবলম্বন করিতে হইবে। আপাততঃ অন্যভাষার কথা ছাড়িয়া দিয়া ইংরাজী পুস্তক অনুবাদে আমাদিগকে মনোনিবেশ করিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে একখানি ইংরাজী-বাঙ্গলা অভিধানের একান্ত প্রয়োজন। বর্ত্তমানে এরূপ যত অভিধান আছে, তৎসমুদয় কিয়ৎপরিমাণে ছাত্রদের কাজে লাগে, কিন্তু লেখকগণ তাহা হইতে বড় বেশী সাহায্য পান না। বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দ লইয়া বড়ই গোলে পড়িতে হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ বাঙ্গলা পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলনের যে চেষ্টা করিতেছিলেন তাহার শেষ ফল কি হইল জানি না। যাহাই হউক, একখানি ভাল ইংরাজী বাঙ্গলা অভিধান চাই। অনুবাদ করিবার সময় নূতন শব্দের প্রয়োজন হইলে, তাহা সংস্কৃত হইতে আহরণ বা গঠন করিবার মত ক্ষমতা ও অবসর অল্প লোকেরই আছে। অনেক সময় আবার পূর্ব্বে কোন ভাষা লেখক যে শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা জানা না থাকায় লেখকগণ অন্য একটি শব্দ চালাইবার চেষ্টা করেন। ভাল শব্দ থাকিতে এরূপ করা নিষ্প্রয়োজন। প্রস্তাবিত অভিধান সংকলিত হইলে, এই সকল অসুবিধা দূর হইবার সম্ভাবনা।

শ্রাবণ, ১৩০৭। শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়।

(১)

দেশ বেড়ান অভ্যাস আমাদের নাই। আমাদের জাতীয় প্রকৃতির প্রধান উপাদান শান্তি ও সুস্থতা। জগতের কোথায় কি আছে, কোথায় কি হইতেছে, তাহার সঙ্গে আমাদের বিশেষ কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া অনুভব করি না। প্রাণ দিয়া আমরা আমাদের দেশটুকুকে, গৃহখানিকে, ভালবাসিতে জানি; আর সেখানে যদি আমাদের জীবনের ক্ষুদ্র কয়েকটী বৎসরকে নিরিবিলি কাটাইতে দাও, তবে আমরা তোমাদের সংসারের খোঁজ লইবার জন্য ব্যস্ত হই না। কিন্তু এ রাজ্যের লোকের প্রকৃতি বিভিন্নরূপ। ইঁহারা দাঁড়াইবার সুবিধা পাইলে বসিতে চান না, দৌড়াইবার সুবিধা পাইলে হাঁটিতে চান না; সর্ব্বদাই দেশের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া "আরো দূরে" "আরো দূরে" করিয়া চলিয়াছেন। গ্রীষ্মকালে দেশ, গ্রাম, নগর ভ্রমণকারীর (Tourists) দলে পরিপূর্ণ। কোথায় কোন্ প্রান্তে একটী পাহাড়ের ঢিপি আছে, কোন্ বনে একটী ঝরণা আছে, কোন্ গ্রামে একজন ক্ষুদ্র কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই দেখিবার জন্য দূর দূরান্তর হইতে সমাগত পুরুষমহিলা গাইড্ বুক্ (guide book) হাতে করিয়া ছুটিয়াছেন। এই সমুদয় ভ্রমণকারীর নিকট অক্সফোর্ড একটী প্রধান তীর্থ স্থান। ইংলণ্ডের বক্ষে পদার্পণ করিয়া অতি কম লোকই অক্সফোর্ড না দেখিয়া দেশে ফেরেন। স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন আসে, অক্সফোর্ডে কি আছে, কি দেখিতে আসেন?

অক্সফোর্ড আসিবার অনেক পূর্ব্বে সুবিখ্যাত লেখক ম্যাথ্যু আর্ণল্ডের উচ্ছ্বাসময়ী লেখনী হইতে অক্সফোর্ডের এক চিত্র আমি মনে আঁকিয়া লইয়াছিলাম। মনে করিতাম সে কি স্বপ্নের দেশ, চাঁদের আলোয় প্রাচীন ওক বৃক্ষের ছায়ায় পরীকন্যাগণ খেলা করে; মানুষের চোখে কি এক দিব্য জ্যোতি খেলে; তা না হ'লে কি বিজ্ঞ প্রাচীন সমালোচক একটী সহরকে এমন ক'রে নবপ্রণয়ীর ন্যায় ভালবাসিতে পারেন? প্রথম যখন অক্সফোর্ডে আসি তখন বড় একটা নৈরাশ্যের আঘাত পাই; এই অক্সফোর্ড! এর আর বিশেষত্ব কি? পথ ঘাট সবই সাধারণ; কেবল কতকগুলি কাল কাল প্রকাণ্ড বাড়ী! এরই এত নাম এত প্রশংসা! কিন্তু যতই দিন যাইতেছে, ততই যেন কি এক কুহেলিকা আসিয়া চক্ষু রঞ্জিত করিয়া দিয়া যাইতেছে: অক্সফোর্ড যেন আমার মানসচক্ষুতে দিন দিন দিব্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে। সেই প্রাচীন অক্সফোর্ড আর আজ এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশা। কোথায় আজ সেই মুণ্ডিতমস্তক নগ্নপদ যাজক সন্ন্যাসীগণ (monks), কোথায় আজ সেই গ্রীশের চিরসঞ্চিত গুপ্তজ্ঞানাস্বাদমত্ত পণ্ডিতগণ!

কোথায় সেই সংস্কৃত ধর্ম্মের নব উদ্দীপনায় উন্মত্ত সাধুগণ! যুগের পর যুগ চলিয়া গিয়াছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী কালের প্রবল স্রোতে সব ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, আর সেই অক্সফোর্ড ক্ষীণবক্ষ আইসিসের (Isis) তীরে তেমনি মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ইংলণ্ডের ইতিহাসের পত্রে পত্রে অক্সফোর্ডের ছাপ চিরদিনের মত রহিয়া গিয়াছে; জাতীয় জীবনের মজ্জাতে মজ্জাতে অক্সফোর্ডের স্মৃতি গ্রথিত রহিয়াছে। অক্সফোর্ডের নির্জ্জন কক্ষ হইতে নীরবে নির্গত হইয়া আন্দোলনের পর আন্দোলন ইংলণ্ড ও ইউরোপের প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত প্লাবিত করিয়াছে; তাহার সম্মুখে ধর্ম্ম সমাজ, নীতি, শাসনতন্ত্র সকলেই মস্তক অবনত করিয়াছে। ইংলণ্ডের নাম একদিন পৃথিবীর পরাক্রান্ত রাজ্যসমূহের মধ্য হইতে মুছিয়া যাইতে পারে, জাতীয় গৌরবের উচ্চ আসন হইতে অপসারিত হইতে পারে, কিন্তু জগতে যতদিন জ্ঞানের আদর থাকিবে, মহত্ত্বের সম্মান থাকিবে, ততদিন অক্সফোর্ড বিস্মৃত হইবে না। অনেকের নিকট ইহা অত্যুক্তি মনে হইতে পারে। কিন্তু আমি প্রত্যেকটী কথা সাবধানে ওজন করিয়া তবে সাধারণের সমক্ষে বাহির করিয়াছি। অক্সফোর্ডের প্রাচীন গৌরব, বর্ত্তমান উচ্চাসন, ভবিষ্যৎ আশা ইহার সাক্ষ্য। বিশ্ববিদ্যালয় বলিলে আজকাল আমাদের দেশে যাহা বুঝি, অক্সফোর্ড তাহা নয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে যদি কলিকাতা কি বোম্বাইয়ের কথা মনে আসে, তাহা হইলে সে ধারণা ভ্রান্ত হইবে। যদি দেশীয় চিত্রে অক্সফোর্ডের ধারণা করিতে চান, তাহা হইলে বরং সপ্তম শতাব্দীর নালন্দ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর নবদ্বীপের কথা মনে করুন। জন্ম, জাতি, ব্যবসায়ে অক্সফোর্ড ঠিক নালন্দ বা নবদ্বীপের ন্যায়; কিন্তু ধর্ম্ম ও সমাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নালন্দ ও নবদ্বীপ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; অক্সফোর্ডের মহত্ত্ব এই যে সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে অক্সফোর্ড আপনাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দিন দিন পরিসর লাভ করিয়াছে। রোমান কাথলিক ইংলাণ্ড প্রটেষ্টাণ্ট হইয়াছে, প্রটেষ্টাণ্ট ইংলাণ্ড সার্ব্বভৌমিক বিমল একেশ্বরবাদের দিকে অগ্রসর হইয়াছে; মানুষ গুরু ছাড়িয়া বাইবেল ও বাইবেল ছাড়িয়া বিবেক ধরিয়াছে; ঈশ্বরাংশসম্ভূত, স্বতন্ত্র এক রাজত্ব ছাড়িয়া অভিজাত শাসন ও অভিজাত শাসন হইতে উদার প্রজাতন্ত্র গৃহীত হইয়াছে; স্কলাষ্টিসিজ্‌ম্ (scholasticism) ছাড়িয়া গ্রীশের নূতন জ্ঞান (renascence) এবং তাহা হইতে বর্ত্তমানের বিজ্ঞান পরে পরে মানব মনকে অধিকার করিয়াছে; কিন্তু অক্সফোর্ড আপনার উচ্চ আসন চিরদিন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে দশ সহস্র ছাত্রগৃহ নালন্দ বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে, নবদ্বীপে আজ আর সে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলে না, অক্সফোর্ড তুমি কোন্ শক্তিতে এমন করিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী মানব মনে আধিপত্য করিতেছ? নালন্দও নবদ্বীপের ন্যায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও ধর্ম্মসমাজপ্রসূত। অক্সফোর্ডের জন্মবিবরণ অন্ধকারাবৃত। কিছুদিন পূর্ব্বে সাধারণ বিশ্বাস এই ছিল যে, আলফ্রেড্ দি গ্রেট অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু এখন আর কেহ তাহা বিশ্বাস করেন না। ১০৮৬ খৃষ্টাব্দে ইংলাণ্ডের যে জরিপ লওয়া হইয়াছিল তাহাতে অক্সফোর্ডের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আছে। তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামোল্লেখ মাত্রও নাই। কিন্তু তখনও যে ভবিষ্যৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কুর ছিল তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। ১০৮৬ সালের জরিপীচিঠায় (Domesday Book) লিখিত আছে যে, অক্সফোর্ডের ২৯৭টী বাড়ীর মধ্যে ১১৫টী ধর্ম্মযাজকদিগের সম্পত্তি। এরূপ প্রবাদ যে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সেণ্ট ফ্রিড্‌স্‌ওয়াইড্ নামক একজন খৃষ্টীয় সাধ্বী বর্ত্তমান অক্সফোর্ডে আসিয়া মঠ নির্ম্মাণ করেন। সেই প্রাচীন কালে রোমান্ কাথলিক্ মোনাষ্টারীগুলি (monastery) বৌদ্ধবিহার ও হিন্দু আশ্রমের ন্যায় জ্ঞানচর্চ্চার আকর ছিল। খৃষ্টীয় সাধুগণ নির্জ্জনে জ্ঞান ও ধর্ম্মসাধনের জন্য জনকোলাহল হইতে দূরে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন; তাঁহাদের যশোগৌরবে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে শিষ্যবৃন্দ সমবেত হইত। সেণ্ট ফ্রিড্‌স্ ওয়াইড্ এমনি একটী মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে তাঁহার মঠের পার্শ্বে আরও অনেকগুলি মঠ স্থাপিত হয়। ধর্ম্মানুরাগী পুরুষ ও রমণী এবং শাসনকর্ত্তাগণ সময়ে সময়ে ইঁহাদিগকে যথেষ্ট অর্থ ও ভূসম্পত্তি দান করিতেন। ক্রমে ক্রমে এই মঠগুলি যথেষ্ট সম্পত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। আমাদের দেশেও রাজা ও ধনিগণ পণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগকে ভূসম্পত্তি ও অর্থ দান করিতেন; কিন্তু সেগুলি এখন তাঁহাদের বংশধরগণের অলসজীবনের সচ্ছন্দতা বর্দ্ধনের জন্য নিয়োজিত

হইয়াছে। দেবতার উদ্দেশে, দেশের হিতের জন্য, যাহা প্রদত্ত হইয়াছিল, অবাধে তাহা ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থের নিকট বলি দেওয়া হইয়াছে। এমনি আমাদের দুরদৃষ্ট। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ইউরোপে এগুলির এমন অসদ্ব্যবহার হয় নাই। এই জন্যই এদেশের ধর্ম্মমণ্ডলী, বিশ্ববিদ্যালয়, ও অন্যান্য জনহিতকর ইন্‌ষ্টিটিউষনগুলির কাজ এমন সুচারুরূপে চলিতেছে। অক্সফোর্ডের মঠগুলি অল্পসময়েই প্রচুর সম্পত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। দূরদেশ হইতে জ্ঞান ও ধর্ম্ম পিপাসু ছাত্রগণ এখানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। ইহা হইতেই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তি। ঠিক কোন্ সময়ে যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না; সম্ভবতঃ একদিনে তাহা হয় নাই। নীরবে জ্ঞান বিস্তারের সাহায্য করিয়া বহুবৎসরের পর এই মঠগুলি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। কোন ও রাজার হুকুমে বা পার্লমেণ্টের ইচ্ছায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই। জগতের অধিকাংশ মহৎকার্য্যই নীরবে মানবচক্ষুর অজ্ঞাতে সাধিত হয়; তার পর যেদিন সেগুলি আপনার মহত্ত্বে আপনি মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়ায়, তখন সকলে সাধিয়া অযাচিত সম্মানে তাহাদিগকে ভূষিত করে। যদি কোনও ব্যক্তি বিশেষকে অক্সফোর্ডের জন্মদাতা বলিতে হয়, তবে তাঁহারা সেই নগ্নপাদ মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসীগণ। পরে অনেক রাজা ও ধনী লোক অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন মঠগুলি বর্ত্তমান কলেজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ধর্ম্ম নিয়মের সঙ্গে, রাজ নিয়মের সঙ্গে, সমাজ নিয়মের সঙ্গে অনেক সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বহু ঘটনাপূর্ণ; সে চিত্রে রক্তের দাগ আছে, সে চিত্রে আত্ম ত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত আছে, সে চিত্রে কলঙ্কের ছাপও আছে। কিন্তু প্রাচীন অক্সফোর্ড ছাড়িয়া আমরা এখন বর্ত্তমানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিব।

লণ্ডনের জনকোলাহলপূর্ণ রাজপথ ছাড়িয়া সেন্টপল্‌স্ কেথিড্রালে প্রবেশ করিলে যেন মনে হয় কি এক শান্তির দেশে আসিলাম। বাহিরে যে কিছু আছে তাহা যেন ভুলিয়া যাই। কর্ম্মস্রোত বিক্ষিপ্ত ইংলণ্ডে অক্সফোর্ড তেমনি একটু সেই প্রাচীনকালের শান্তভাব লুকাইয়া রাখিয়াছে। বাহিরে ষ্টীম এঞ্জিনের হুস্‌হুস্ শব্দ, কলকারখানার কৃষ্ণ ধূমরাশি, দ্বন্দ্বী প্রতিদ্বন্দ্বীর, প্রাণপণ সংগ্রাম, বিভিন্ন দেশ ও জাতির প্রবল ঘাত প্রতিঘাত; তাই জগতের শান্তি যেন এখানে আসিয়া কাল কাল বাড়ীগুলির প্রকাণ্ড কক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। বাহিরের কোলাহলে যাহাদের মন বসে না, সময়-স্রোতের উন্মাদগতিতে যাহাদের তৃপ্তি হয় না, অক্সফোর্ড তাহাদের কাছে চিরদিনই প্রিয় থাকিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ সাধ্যমত অক্সফোর্ডকে প্রাচীন সাজে সাজাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কলেজের বাড়ীগুলি মেরামত করা হয় না; কার্ণিশগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; ঘরগুলি মসীবর্ণ ধারণ করিয়াছে। এখনও কনভোকেশানে লাটিন ভাষা ব্যবহৃত হয়; লাটিনে ডিগ্রী দেওয়া হয়; ভাইস্‌চ্যান্সেলর লাটিনে কথা বলেন; যাঁহারা ডিগ্রী পান তাঁহাদিগকেও লাটিনে উত্তর দিতে হয়। ইংলণ্ডের শাসন প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম যেমন ছিল তেমনই আছে। বর্ত্তমান ইউরোপ ও আমেরিকা শিক্ষাপ্রণালী সম্পূর্ণ নূতন ভাবে গঠিত করিয়াছে; কিন্তু অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ এখনও পুরাতন ধরিয়া রহিয়াছে। ফল কি হইতেছে বা হইবে নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। অনেকে বলেন ইউরোপীয় জাতিসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইংলণ্ড পিছাইয়া পড়িবে।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের কোনও সম্বন্ধ নাই বলিলেই হয়। অক্সফোর্ড সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র; আপনার ব্যয়ভার আপনি বহন করে; আপনার নিয়ম ব্যবস্থা আপনি প্রণয়ন করে; আপনার কর্ম্মচারী আপনি নিয়োগ করে। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, অন্ততঃ কাগজে কলমে, অনেকটা এইরূপ। কিন্তু বর্ত্তমান জগতের শিক্ষাপ্রণালী অন্য পথে চলিয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রায়ই গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত। শিক্ষা, সমর ও শান্তিরক্ষার ন্যায়, গবর্ণমেণ্টের একটী কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট যেমন সেনাপতি ও শান্তিরক্ষক নিয়োগ করেন, তেমনি শিক্ষা বিভাগে কর্ম্মচারী নিয়োগ করেন ও তাঁহাদের ব্যয়ভার বহন করেন। অক্সফোর্ড আপনার কর্ম্মচারী ও অধ্যাপক নিজেই মনোনয়ন করে এবং আপনার আয়ব্যয়ের তত্ত্বাবধান করে। কেবল রিজিয়াস্ প্রফেসর নামে কতকগুলি অধ্যাপক আছেন; তাহাদের নিয়োগাধিকার ও ব্যয় ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্টের হাতে।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে না। অক্সফোর্ডের নিজেরই যথেষ্ট অর্থ আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আরম্ভ সময় হইতে এপর্য্যন্ত দেশহিতৈষী নরপতিগণ ও জনসাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অকাতরে অর্থ দান করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন কলেজের প্রচুর আয়; তদ্ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃথক আয় বাৎসরিক ৬০ লক্ষ টাকার উপর। ভারত গবর্ণমেণ্ট আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ব্যয় নির্ব্বাহ সম্বন্ধে অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের নিয়ম গ্রহণ করিয়া মহা ভুল করিয়াছেন। বহু শতাব্দীর সঞ্চিত অর্থে অক্সফোর্ড এমন ধনশালী যে গবর্ণমেণ্ট সাহায্যের কোনও প্রয়োজন হয় না। এক একটী কলেজের ভূসম্পত্তি আমাদের দেশের রাজাদের সমান। এতদ্ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় নিজে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য বৎসরে ৩৩০০ টাকা ব্যয় করিতেছে। ছাত্রদের বেতন বা পরীক্ষার ফি গ্রাহই করে না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও অধিকাংশ কলেজের একমাত্র আয়, ছাত্র প্রদত্ত অর্থ মাত্র। ফল এই হইয়াছে যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা অনেকাংশে হীন।

অক্সফোর্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ সমস্ত কলেজই অক্সফোর্ডে অবস্থিত; প্রকৃত পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলির সমষ্টি মাত্র: অথবা কলেজগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গ মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলির উদ্দেশ্য একই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন কলেজগুলির উদ্দেশ্য ও কার্য্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কলেজগুলির উদ্দেশ্য শিক্ষা দেওয়া: বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য যুবকদিগের পারদর্শিতা পরীক্ষা করা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে কলেজে আইন শিক্ষা দেওয়া হয়, বিশ্ববিদ্যালয় দেখেন যে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে আদালতে ওকালতী করিতে দেওয়া যাইতে পারে কি না। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ফেকাল্‌টী (Faculty of Law)কে বরং হাইকোর্টের প্রতিনিধি বলা ঠিক হইবে। অন্যান্য বিভাগেও ঠিক এই কথা সত্য। বিশ্ববিদ্যালয় যেন আদালত ও অন্যান্য বিভাগে প্রবেশের পথে দ্বারী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ অন্যরূপ; এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শিক্ষা দেওয়া; তজ্জন্য বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক নিযুক্ত করেন, লাইব্রেরী, মিউজিয়াম লেবরেটারী স্থাপন করিতেছেন, এবং এই সব উপায়ের মধ্যে কলেজগুলি অন্যতম। যেমন অক্সফোর্ডে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এক নাম ভিন্ন আর কিছুতে সাদৃশ্য নাই, তেমনি অক্সফোর্ডের কলেজ ও কলিকাতার কলেজ সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতি। কলিকাতার কলেজগুলি লেকচার দেওয়ার ঘর বলিলেই ঠিক হয়। আমাদের কলেজগুলি বেঞ্চ ও ডেস্কে পরিপূর্ণ; কেবল মাত্র গেটের কাছে ছোট একটা চোরকুঠুরীর মাথায় একখানি কার্ডে "আফিস" কথাটা লেখা আছে; মাসান্তে একবার সেখানে কেরাণী মহাশয়কে দক্ষিণা দিতে যাইতে হয়। অক্সফোর্ডের কলেজের সব চেয়ে ভাল ঘরটা খাওয়ার ঘর (Dining room) আর একটি ঘর ছাত্রদের বৈঠকের জন্য, আর একটা ঘর হয়ত ফেলোদের বৈঠকের জন্য; সর্ব্বোপরি চেপেল (chapel)। অক্সফোর্ড কলেজের চেপেলগুলি দেখিবার জিনিস। প্রসিদ্ধ আর্টিষ্টদের রচিত ছবি দ্বারা সেগুলিকে অতি সুন্দর করিয়া সাজাইয়া রাখা হইয়াছে: কলেজে অবস্থিতি সময়ে যে সব ছাত্রের মৃত্যু হয়, তাহাদের ও অধ্যাপকদের মৃতদেহ চেপেলে সমাধিস্থ করা হয়। সুতরাং চেপেলের সঙ্গে অনেক শ্রদ্ধা ও প্রীতির স্মৃতি জড়িত। প্রতিদিন কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ে শিক্ষক ও ছাত্রগণ মিলিত হইয়া ভগবানের নাম কীর্ত্তন করেন। অধিকাংশ ছাত্র কলেজেই বাস করেন; এক সময়ে সকলেই কলেজে থাকিতেন; কিন্তু ক্রমে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে সকলের কলেজে স্থান হইয়া উঠে না। কিন্তু যে সব ছাত্রের বাসা বাহিরে তাহাদিগকেও কলেজে ডিনার খাইতে হয়। প্রকৃত পক্ষে কলেজগুলি বাড়ীর মত; শিক্ষক ও ছাত্রগণ আপনাদিকে এক পরিবারভুক্ত মনে করেন। আহারে বিহারে, পাঠে, চিন্তায়, উপাসনায়, সর্ব্বদা তাঁহারা মিলিত হইতেছেন; এইজন্যই অক্সফোর্ড ছাত্রদের নিকট এত প্রিয়: যৌবনের প্রারম্ভে যখন হৃদয়ের মহৎ ভাবগুলি সর্ব্বাপেক্ষা সতেজ থাকে, তখন এমন মধুর সহবাস যাহাদের চিন্তা ও কল্পনা স্পর্শ করে না তাহারা বাস্তবিকই কৃপাপাত্র। ইংলণ্ডের কত যুবক যে অক্সফোর্ডে আসিয়া জীবনের লক্ষ্য খুঁজিয়া পাইয়াছেন, আদর্শ ধরিয়াছেন, চরিত্র গড়িয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। অক্সফোর্ডে যে বন্ধুতার সূত্রপাত হইয়াছিল কত জনের পক্ষে তাহা আজীবন সুখ

শান্তি ও মহত্ত্বের হেতু হইয়াছে। এইজন্যই অক্সফোর্ডের সন্তানগণ অক্সফোর্ডকে এত ভালবাসে। বহু বৎসর পরে পৃথিবীর সুদূর প্রান্ত হইতে অল্পদিনের ছুটিতে দেশে ফিরিলেও একবার অক্সফোর্ডে আসা চাই।

এতক্ষণ যাহা বলিয়া আসিলাম তাহাতে হয়ত অনেকে মনে করিবেন যে এ বেশ সুন্দর সুখ স্বচ্ছন্দতা ও বন্ধুত্বের জীবন, কিন্তু ইহাতে শিক্ষার কি হইল। লোকে অক্সফোর্ডে ছেলে পাঠায় তাহাদের শিক্ষার জন্য, খেয়ে খেলিয়ে আমোদ করে বেড়ানর জন্য নয়, বন্ধুত্ব করিবার জন্যও নয়। এ কথা ঠিক। আমাদের দেশের একজন শিক্ষিত ও সুবিখ্যাত ভদ্র লোক তাঁহার পুত্রকে এখানকার একটী বিশ্ববিদ্যালয়ে রাখিবার জন্য আসিয়াছিলেন, কিন্তু এখানকার নিয়ম ব্যবস্থার কথা শুনিয়া তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রাখিলেন না।

শিক্ষপ্রণালী সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা আছে এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল কলেজগুলি যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন তাহার তুলনায় অক্সফোর্ড একটী "আড্ডা" দেওয়ার যায়গা মনে হইবে। বৎসরের মধ্যে ২৮ সপ্তাহ ছুটী ২৪ সপ্তাহ কাজের সময়। এই চব্বিশ সপ্তাহেও তুমি পড়িতেছ কিনা, লেকচারে যাইতেছ কিনা তাহাতে কিছু যায় আসে না। অক্সফোর্ডের থাকিলে ডিনারএ উপস্থিত হইলেই হইল। সকালে ১০টা হইতে একটা পর্য্যন্তও লেকচারের সময়, অতি কম লোকেই দিনে তিন ঘণ্টা লেক্‌চার শুনে। একটার সময় কিছু জলযোগ করিয়া সকলে খেলার জন্য বাহির হন, তখন আর কাহাকে ঘরে পাইবেন না, কেহ ক্রিকেট কেহ বা ফুটবল খেলিতে, কেহ নদীতে নৌকা বাহিতে কেহ অন্য কোনওরূপ ব্যায়ামের জন্য, কেহবা বেড়াইবার জন্য বাহির হন। তার পর চারিটা ও পাঁচটার মধ্যে কোনও সময়ে বাসায় ফিরিয়া চা পান করা হয়। এই সময়ে বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করা হয়। এই এক ব্যাপার; আজ আমার ঘরে তুমি আসিলে—কাল তোমার ঘরে আমার নিমন্ত্রণ, এইরূপ ক্রমাগত চলিয়াছে; বিকালে তিন চারিটী বন্ধু চাএর টেবিলে বসিয়া নানা বিষয়ে গল্প চলিয়াছে; এক ঘণ্টায় যদি আড্ডা ভাঙ্গিল তবে সে খুব শীঘ্র বলিতে হইবে। মোটের উপর খুব কম লোকই ডিনারের পূর্ব্বে বইএ হাত দেন। সাতটার সময় ডিনার, সেখানেও আর একটা ঘণ্টা; তারপর খানিক ক্ষণ বিশ্রাম অবশ্য প্রয়োজনীয়; কেহ বা দুই একটা বন্ধুর সঙ্গে একটু বেড়াইতে বাহির হইলেন, কেহবা খানিক তাস্ কি দাবা খেলিলেন, কেহবা খানিক পিয়ানো বাজাইলেন। তারপরে যদি ইচ্ছা হইল খানিকক্ষণ পড়িলেন। এই হল সাধারণ নিয়ম। তবে এর মধ্যে আবার বিশেষ নিয়ম আছে; পরে সে বিষয়ের আলোচনা করিব। এখন আমাদের দেশের অভিভাবক যদি শুনিতে পান যে, তাঁহার ছেলে কলিকাতায় পড়িতে আসিয়া এমনি করিয়া দিন কাটাইতেছেন, তাহা হইলে মিষ্ট করিয়া পত্র লিখিবেন, "বাবা তোমাকে আর পড়িতে হইবে না, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া এস"। কিন্তু ফল দেখিয়া যদি বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে অবশ্য অক্সফোর্ডকে এত সহজে উপেক্ষা করিতে পারা যায় না। পৃথিবীর সমুদয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অক্সফোর্ডের স্থান তুলনা বিহীন। জর্ম্মনির কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় ও ফ্রান্সের পারিস বিশ্ববিদ্যালয়ও জগদ্বিখ্যাত; কিন্তু একাকী অক্সফোর্ড কি রাজনীতি ক্ষেত্রে কি সাহিত্য ক্ষেত্রে কি অন্য বিষয়ে যত অধিকসংখ্যক কৃতকার্য্য ও কৃতবিদ্য লোকের নাম করিতে পারেন, এত আর কেহ পারেন কি না সন্দেহ। ইংলণ্ডের জাতীয়জীবনে অক্সফোর্ডের স্থান অতুলনীয়। ইংলণ্ডের ইতিহাসের যে কোনও সময় লউন না কেন, দেখা যাইবে অধিকাংশ বিখ্যাত ও দক্ষ ব্যক্তিগণ অক্সফোর্ডের সন্তান। অনেকেই জানেন অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের মধ্যে চিরাগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। আমি অবশ্য তাহার মধ্যে মধ্যস্থতা করিতে যাইতেছি না। আমি এখানে যাহা বলিতেছি তাহা অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ উভয়েরই প্রতি প্রয়োজ্য; আমি শিক্ষাপ্রণালী লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলাম। প্রণালী সম্বন্ধে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। তবে সাধারণতঃ দেখা যায় যে অক্সফোর্ডের লোকেদেরই অন্ততঃ রাজনীতিক্ষেত্রে, বিশেষ আধিপত্য। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে অধিকাংশ অভিজাত বংশীয়দের পুত্রেরা অক্সফোর্ডে আসেন; ও তাঁহাদের পক্ষে রাজনীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রবেশলাভ সহজ। সে যাহা হউক, বর্ত্তমানে আমার বক্তব্য এই যে অক্সফোর্ডের শিক্ষাপ্রণালী প্রতিভাসম্পন্ন লোক উৎপাদনে কোন অংশেই হীন নয়, বরং শ্রেষ্ঠ। কেন যে এমন হয় সে এক কঠিন

প্রশ্ন।—সে সমস্যার মীমাংসা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এখনও সময়ে সময়ে কেহ কেহ অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের শিক্ষা প্রণালীকে দূষণীয় মনে করেন; কিন্তু মোটের উপর অক্সফোর্ডের সমর্থনকারীদের সংখ্যা অনেক অধিক।

যাহা হউক সে তর্কের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া আমরা অক্সফোর্ডের শিক্ষাপ্রণালী ও তাহার মূলসূত্র বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব। অক্সফোর্ডের শিক্ষাপ্রণালী বুঝিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে হইবে। অক্সফোর্ডের উদ্দেশ্য শুধু ডিগ্রী দেওয়া নয়, কিম্বা আইন, ভৈষজ্যবিদ্যা বা অন্য কোনও বিশেষ বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া নয়। অক্সফোর্ডের শিক্ষা সর্ব্বব্যাপী; বিশেষ বিশেষ বিদ্যা বিশেষভাবে অবশ্য শিক্ষা দেওয়া হয়; কিন্তু প্রধান লক্ষ্য জ্ঞানালোচনা; ছাত্রগণের হৃদয়ে জ্ঞানলিপ্সা জাগাইয়া দেওয়া ও তাহা চরিতার্থ করিবার পথ দেখাইয়া দেওয়া। আবার জ্ঞানালোচনাও অক্সফোর্ডের পূর্ণলক্ষ্যের অংশমাত্র, ইহার সমগ্র উদ্দেশ্য মানুষ তৈয়ারি করা। জ্ঞান মানবমনের অংশমাত্র; অক্সফোর্ড সমগ্র মানুষটাকে কোলে লইয়া তাহার জ্ঞান প্রেম ইচ্ছা, শরীর মন আত্মা সবগুলিকে বিকাশ করিতে চেষ্টা করে। ইংলণ্ড আপনার বিপুল সাম্রাজ্যের জন্য শুধু কেরাণী, শুধু পণ্ডিত, বা শুধু তার্কিক চায় না। ইংলণ্ড চায় মানুষ; অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ সেই অভাব পূর্ণ করিতে চেষ্টা করে। অক্সফোর্ডের দোষ আছে, অভাব আছে, ক্রটী আছে, পরে সে বিষয়ে কিছু বলিব; কিন্তু মোটের উপর অক্সফোর্ড আপনার লক্ষ্য ও সাম্রাজ্যের প্রয়োজন সুন্দররূপেই সাধিত করিতেছে। যদি কেবলমাত্র জ্ঞানালোচনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে বর্ত্তমান অক্সফোর্ড জর্ম্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিকট হারিয়া গিয়াছে। এই জন্যই বলিয়াছি অক্সফোর্ডের মহত্ত্ব বুঝিতে হইলে, তাহার লক্ষ্য স্মরণ রাখিতে হইবে। অক্সফোর্ড জাতীয় মহত্ত্বের রক্ষক ও প্রসারক। অক্সফোর্ড বিদ্বৎসমাজ এবং অক্সফোর্ড ধর্ম্মসমাজ। কোনও বিশেষ ধর্ম্ম বা বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য অক্সফোর্ড দায়ী নয়, কিন্তু অক্সফোর্ড আপন সন্তানগণের প্রকৃত মনুষ্যত্বের জন্য দায়ী। আজ যদি পৃথিবীর কোনও স্থানে একজন ভূতপূর্ব্ব অক্সফোর্ড ছাত্র কলঙ্কের কাজ করেন, অক্সফোর্ড লজ্জায় মুখ নত করিবেন; এবং তিনি, যদি আপনার ব্যবহারে জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারেন, সস্নেহে সসম্ভ্রমে তাঁহাকে কোলে লইয়া মায়ের মত মুখ চুম্বন করিবেন। লর্ড কার্জ্জন যদি সুশাসনে ভারতকে সুখী করিয়া ভারতবাসিগণের প্রীতিভাজন হইতে পারেন, অক্সফোর্ড আহ্লাদে উৎফুল্ল হইবেন। লর্ড কার্জ্জনও অক্সফোর্ডের সম্মানকে রাজপ্রদত্ত উপাধি অপেক্ষা হীন মনে করিবেন না। অক্সফোর্ডের সঙ্গে তাহার সন্তানগণের সম্বন্ধ সহজে ছিন্ন হয় না। অক্সফোর্ড উৎসাহ ও উদ্বেগের সহিত আপনার সন্তানের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, তাঁহারাও সাগ্রহে মায়ের উৎসাহ ও আদর প্রতীক্ষা করেন। যদি দুটী অক্সফোর্ডের ছাত্র কোনও দূর উপনিবেশে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে কোন পরিচয় না থাকিলেও এই সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধন, রক্তের সম্বন্ধের ন্যায় তাঁহাদিগকে একত্র করে।

শ্রীহেমচন্দ্র সরকার
এম্ এ

কবি-প্রসঙ্গ।

কবির হৃদয়-কুঞ্জে ভাব কলিগুলি
লুক্কায়িত লজ্জাবতী বালবধূবৎ;
ধীরে ধীরে দলগুলি যায় যবে খুলি
মাতায় সৌরভে রূপে আকুল জগৎ।

সে নিভৃত নিরালয়ে কত না মাধুরী
কোকিল কূজনে আর ভ্রমর গুঞ্জনে;
স্বর্গের সকল মধু বুঝি করি চুরী
রাখিয়াছে লুকাইয়া হৃদয়-নন্দনে!

ভারতীর আদরের রতন-সন্তার
কোন গুণে কবি সব করিয়াছে বশ,
তাই তার কণ্ঠে উঠি মোহন ঝঙ্কার
জীর্ণ শীর্ণ ভগ্ন প্রাণ করিছে সরস।

নারী বুঝি কবিতার প্রিয়সহচরী;
নিঠুর সংসার যবে করয়ে লাঞ্ছনা,
নারী রাখে বুকে করি যতনে আবরি
ভকত কবির সৃষ্টি কবিতা কল্পনা।

শুশ্রূষা সান্ত্বনা স্নেহ রমণী বিতরে;
তাই ফল্গুস্রোত সম বহে কবিতায়

নারীর মহিমাগাথা অক্ষরে অক্ষরে
কবির বিষাদে হর্ষে কার্য্যে কল্পনায় !

শ্রীসুরমাসুন্দরী ঘোষ।

সে কি আমারি ?

মোদেরি সংসারে থাকি ধরে অন্যরূপ
তার ভালবাসা ;
আমার মানব-কর্ণে জপে অহর্নিশ
সে আরেক ভাষা !
কোথাকার সেই ধ্বনি উন্মাদিছে প্রাণ
কিছু নাহি বুঝি :
আকুল ব্যাকুল হ'য়ে আকাশে বাতাসে
অর্থ তার খুঁজি।
বৃথা চেষ্টা !—তলহারা সাগরের মত
তাহার হৃদয় :
অসহ্য-আলোকভরা আকাশের মত
তাহার প্রণয় !
সে সিন্ধুর পারে গিয়ে সভয়ে তৃষার্ত্ত
হেরি উর্ম্মিমালা :
সে নভের শতরশ্মি ঝলসায় আঁখি
একি রূপ-জ্বালা ?
সাধিনু কাতরে তারে—আর ত এ সুর-লীলা
সহিতে না পারি !
অমনি মিলাল দেবী,—অশ্রু কলঙ্কিতা
দেখা দিল, নারী।
বিচিত্র স্বভাব তবু হ'ল না সে বিস্মরণ
থাকিয়া বন্ধনে,
হিয়া তার কথা কয় দূরে, অতি দূরে
নীলিমার সনে।
বিজলী-বালার মত আপনার সাথে
আপনি খেলায় ;
আধ-আলো আধ-ছায়া স্বপনের মত
রহস্যে বেড়ায়।
সেধে উপবাস সহি, সে সাধে সন্ন্যাস
সংসারেতে থাকি !
ফুল-চন্দনেতে ঢাকি যদি কিছু আনি
তাও নিবে না কি ?
বিশ্ব-পরিবার যার আপনার জন,
সে কি রে আমারি ?
কখনো—কখনো তারে নারিনু বুঝিতে,
দেবী, না সে নারী !

প্রমথনাথ রায় চৌধুরী

দস্যুর দান।

নানা ভাই নাথুভাই আহম্মদাবাদের বড় মহাজন, গুজরাটী বণিক, এক কাপড়ের কলের একজন প্রধান অংশীদার। তাঁহার অবস্থা প্রথমে সচ্ছল ছিল না, কেবল কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সাহায্যে তিনি আর্থিক উন্নতি সম্পাদনে সক্ষম হইয়াছিলেন, এবং বার্দ্ধক্যে তিনি প্রভূত অর্থ সম্ভ্রমের অধিকারী হইয়াছিলেন, অবশেষে বৃদ্ধকালে তাঁহার কার্য্য পরিচালনে অক্ষমতা জন্মিলে, তিনি উপযুক্ত পুত্রদ্বয়ের হস্তে সমস্ত কার্য্যভার সমর্পণপূর্ব্বক স্বয়ং ভগবানের চিন্তায় কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

পুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম জীবনরাম, কনিষ্ঠের নাম গোবিন্দরাম। পিতার বৈষয়িক দায়িত্ব গ্রহণ করিবার সময় জীবনরামের বয়স পঁচিশ বৎসর হইয়াছিল, গোবিন্দরাম তাহার দুই বৎসরের ছোট। দুই ভাই একত্র কাজ করিতে লাগিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ অল্প দিনের মধ্যেই গোবিন্দরামের কতকগুলি অসৎ সঙ্গী যুটিয়া গেল। জীবনরাম গোবিন্দকে সৎপথে আনিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, প্রতিদিন সে গভীরতর পাপে ডুবিতে লাগিল, এবং ঋণজালে বিজড়িত হইয়া পড়িল। অবশেষে কলের সহিত তাহার সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। এই ঘটনার অতি অল্পদিন পরে, পুত্রের ব্যবহারে হৃদয়ে আঘাত পাইয়া বৃদ্ধ নানা ভাই প্রাণত্যাগ করিলেন। বৃদ্ধের মৃত্যুর সহিত দুই ভ্রাতার মনোমালিন্য অপেক্ষাকৃত প্রবল ও বদ্ধমূল হইল।

একদিন রাত্রে জীবনরাম কল হইতে গৃহে ফিরিতেছেন, দ্বিতল কক্ষস্থ ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোকে রাজপথ হইতে মুক্ত বাতায়ন পথে তাঁহার শয়ন কক্ষে একজন মানুষের মাথা দেখিতে পাইলেন ; এ সময়ে তাঁহার শয়নকক্ষে অন্যের প্রবেশ সম্ভাবনা ছিল না, কোন চাকর হইবে কি ? টেবিলের কাছে সে কি করিতেছে ! কোন চোর নয়ত ? জীবনরামের শয়নকক্ষে টেবিলের ডেক্সের ভিতর অনেক টাকা ছিল, সন্দেহাকুল চিত্তে জীবনরাম অত্যন্ত ব্যস্তভাবে গৃহে প্রবেশ করিলেন। দ্বারে অল্প শব্দ হইতেই একটা লোক দ্বার প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল, জীবনরাম দেখিলেন, লোকটি আর কেহ নহে, তাঁহার ভাই গোবিন্দরাম ! জীবনরাম ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ঘরে তুমি আসিয়াছিলে কেন ?"

গোবিন্দরাম নির্ব্বিকার চিত্তে উত্তর দিল, "আমার খুসী।"

"আমার ডেক্স হইতে কিছু বাহির করিয়া লইয়াছ ? কিছু চুরীর মতলবেই বুঝি আসিয়াছিলে ?"

"সে নিকাশ তোমাকে দিতে পারি না"—বলিয়া গোবিন্দরাম সহসা গৃহ ত্যাগের উপক্রম করিল।

জীবনরাম তাঁহার সম্মুখে দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, তোমাকে পরীক্ষা না করিয়া আমি বাহিরে যাইতে দিব না : জীবনরাম একটা ধাক্কা দিয়া গোবিন্দরামকে ঘরের মধ্যে ঠেলিয়া ফেলিলেন, তাঁহার মনে ক্রোধ ও বিরক্তির সঞ্চার হইয়াছিল।

দুই ভ্রাতার যুদ্ধ উপস্থিত হইল, দুজনে জড়াজড়ি করিয়া টেবিলের উপর আসিয়া পড়িল, গুরুতর ধাক্কা লাগিয়া টেবিলটা তিন হাত সরিয়া গেল : ল্যাম্পটা নীচে পড়িয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। গোবিন্দরাম কাতর স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, ল্যাম্পের কাচে তাহার বামহস্তের মণিবন্ধের মাংস অনেক খানি কাটিয়া গিয়াছিল।

জীবনরাম তৎক্ষণাৎ ভ্রাতাকে ছাড়িয়া দিলেন, একটা বাতি জ্বালিয়া দেখিলেন, গোবিন্দরাম অন্তর্দ্ধান করিয়াছে, টেবিলের উপর কতকগুলি খাতাপত্র রক্তে ভাসিতেছে ! ডেক্স টানিয়া দেখিলেন, চাবি ভাঙ্গা, ভিতরে একখানি হাজার টাকার নোট ছিল, সেখানি অদৃশ্য হইয়াছে। জীবনরাম এ সম্বন্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না।

সেই যে গোবিন্দরাম বাড়ী ছাড়িল, দুই বৎসর ধরিয়া বিস্তর চেষ্টাতেও তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। অবশেষে জনরব উঠিল দ্বারকা যাইবার সময় সে জাহাজ ডুবিয়া মরিয়াছে, 'ওরিয়েণ্টাল ট্রেডিং' কোম্পানির 'স্টিংষ্টার' নামক জাহাজ পোরবন্দর হইতে কতকগুলি যাত্রী লইয়া দ্বারকা যাইতেছিল, আরব সাগরে একটা সাইক্লোন উঠিয়া জাহাজ খানা ডুবাইয়া দেয় ; সংসারের সহিত গোবিন্দরামের সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তথাপি এ সংবাদে জীবনরাম দুই বিন্দু অশ্রু ত্যাগ করিলেন।

জীবনরাম পূর্ব্ববৎ কলের কাজ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছিল, চঞ্চলা লক্ষ্মী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন, সহসা একদিন কল বন্ধ হইয়া গেল ; বিস্তর চেষ্টা করিয়াও জীবনরাম ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেন না ; অগত্যা সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া তাঁহাকে তাঁহার অংশের দেনা পরিশোধ করিতে হইল। অবশেষে আহম্মদাবাদে বাস করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল, যেখানে তাঁহার পিতা রাজ গৌরবে বাস করিয়া গিয়াছেন, সেখানে তিনি কিরূপে ভিখারীর ন্যায় কাল কাটাইবেন ; অনেক চিন্তার পর পিতৃভিটা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি সুরাটে আসিলেন। সুরাটে জীবনরামের মাতুলালয়।

মাণিকচাঁদ মুলচাঁদ জীবনরামের মামা, তাঁহার একমাত্র দুহিতা পার্ব্বতীর বয়স হইয়াছিল, গুজরাটী ব্যবস্থা অনুসারে অতি শৈশবেই তাহার পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন করা উচিত ছিল, কিন্তু মাতৃহীনা একমাত্র প্রিয়তমা দুহিতাকে তিনি প্রাণ ধরিয়া পরের হাতে সমর্পণ করিতে পারেন নাই, এত দিন পরে যোগ্য ভাগিনেয়কে পাইয়া সানন্দ চিত্তে তিনি তাঁহার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। পার্ব্বতীকে বিবাহ করিয়া জীবনরাম সুরাটেই বাস করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতীর বড় আনন্দ, পিতাকে

ছাড়িয়া তাহাকে শ্বশুরালয়ে যাইতে হইল না, জীবনরামের ন্যায় সচ্চরিত্র, রূপবান, গুণবান স্বামী লাভ করিয়া তাহার সুখের সীমা রহিল না। বালিকা সর্ব্বান্তঃকরণে পতিসেবা করিতে লাগিল। কিশোরী পার্ব্বতীর আদরে, যত্নে, প্রেম এবং পরিচর্য্যায় জীবনরাম অতীতের সুখ ও বর্ত্তমানের দারিদ্র্য দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। বৃদ্ধ মাণিকরাম তাঁহার গৃহ ও দোকানখানির স্বত্বাধিকার জামাতার হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক তীর্থ যাত্রা করিলেন।

তিন মাস পরে ব্রোচ হইতে এক 'সাওকর' (মহাজন) শেঠ মাণিকচাঁদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল; স্থানীয় প্রথা অনুসারে পার্ব্বতী শেঠজীর অভ্যর্থনা পূর্ব্বক গুরুর ন্যায় তাহার সেবা করিল। আহারাদির পর শেঠজী এক লম্বা দলিল বাহির করিয়া দীর্ঘ লোহার শিকে আটকানো অনুচ্চ কাঠের দোলায় বসিয়া মাথা নাড়িয়া সুর করিয়া তাহা পড়িতে লাগিল। জীবনরাম অল্পক্ষণের মধ্যে জানিতে পারিলেন, তাঁহার শ্বশুর এই মাকড়ীধারী স্থূলোদর শ্রেষ্ঠী বরের নিকট অনেক দিন পূর্ব্বে পাঁচ শত টাকা ব্যবসায় করিবার জন্য কর্জ্জ লইয়াছিলেন, সেই টাকা সুদে আসলে আট শত টাকায় পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমান 'মার্গশিষ' মাসের মধ্যে তাহা পরিশোধ না করিলে নালিশ হইবে। নালিশ করিলে শেঠজীর গ্রাস হইতে ক্ষুদ্র বাড়ী ও দোকানখানি বাঁচাইবার কোন উপায় রহিবে না; কিন্তু হাতে একটী পয়সা সম্বল নাই, শেঠজী এক মাসের 'কড়ার' দিয়া অন্য অধমর্ণ গৃহে টাকার তাগাদায় প্রস্থান করিলেন।

জীবনরাম টাকার জন্য কত দিকে কত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোথাও একটা পয়সা সংগ্রহ হইল না। তাঁহার দুশ্চিন্তার অন্ত রহিল না। স্বামীর মলিন চিন্তাপূর্ণ মুখ দেখিয়া পার্ব্বতী অত্যন্ত কাতর হইয়া উঠিল, কিন্তু নিরুপায়। সুরাটে তাপ্তী তীরে তাঁহাদের গৃহ, সন্ধ্যাকালে উভয়ে গৃহেরবারান্দায় বসিয়া দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে ডাক-হরকরা একখানা সংবাদ-পত্র দিয়া গেল। এখানি আহ-ম্মাদাবাদ হইতে প্রকাশিত গুজরাটী সাপ্তাহিক পত্রিকা, নাম "গুর্জ্জরভাস্কর"। কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় মোটা মোটা অক্ষরে এক বিজ্ঞাপন লেখা, বিজ্ঞাপনের দিকে জীবন-রামের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে :—

সরকারী জাহির নামা।

"এক হাজার কলদার (গবর্ণমেণ্ট) রূপেয়া বক্‌শিস্।

যে কেহ প্রসিদ্ধ গুজরাটী দস্যু লাল্লুভাই গোরাচাঁদকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে উক্ত টাকা পুরস্কার প্রদান করা হইবে।"

এই বিজ্ঞাপনের পর লাল্লুভায়ের "হুলিয়া"; সংবাদপত্রে প্রায়ই এরূপ বিজ্ঞাপন দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এত অধিক পুরস্কার প্রায়ই ঘোষণা করা হয় না। জীবনরাম বুঝিলেন, লাল্লু ভাই এবার কিছু বড় রকম ডাকাইতি করিয়া থাকিবে।

জীবনরাম লাল্লুভায়ের নাম অনেকবার শুনিয়াছেন, গুজরাটের কে-ই বা তাহার নাম না জানিত? সে দরিদ্রের বন্ধু ছিল, ডাকাইতি করিতে সে কখন দরিদ্রের গৃহে প্রবেশ করে নাই, তাহার দস্যুবৃত্তির অর্থে কত শত দরিদ্র প্রতিপালিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই, কত অনশন-ক্লিষ্ট ভীল লাল্লুভায়ের সহৃদয়তা ও অনুগ্রহে ক্ষুধার অন্ন পাইয়াছে, নিদারুণ শীতে গাত্রবস্ত্র লাভ করিয়াছে, রোগে ঔষধ পাইয়াছে,—তাহারা শত মুখে তাহার প্রশংসা করিত; লাল্লুভায়ের শত্রু অথবা মিত্র কোন্ দলে অধিক লোক ছিল, নিশ্চয়রূপে বলা যায় না। পুলিশ তাহাকে ধৃত করা দূরের কথা, কোন দিন তাহার ছায়াও স্পর্শ করিতে পারে নাই; যদি কেহ কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিত লাল্লুভাই কোথায়, তাহা হইলে উত্তর পাইত, দরিদ্রের হৃদয়ের মধ্যে।

জীবনরাম হাসিয়া বলিলেন, "পার্ব্বতী, হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা দেখিতেছি, এ টাকায় আমার যেমন দরকার, এমন আর কাহারও নহে, যদি পুরস্কারটা আমি পাইতাম!"

"কিসের পুরস্কার গো!"

জীবনরাম কাগজখানি পার্ব্বতীর হাতে দিলেন, পার্ব্বতী প্রথম অংশটা পড়িয়া বলিল, "লাল্লুভাই ডাকাতকে ধরিয়া পুরস্কার লইতে হইবে?"

"পুরস্কারের মুখে আগুন, ও ঝঞ্ঝাটে তোমার গিয়া কাজ নাই।" স্বামীর প্রতি কটাক্ষপাত পূর্ব্বক এই কথা বলিয়া পার্ব্বতী আবার উচ্চরবে পাঠ করিতে লাগিল :—"লাল্লু-ভায়ের দেহ হাড়ে মাসে জড়িত, দেখিতে বলবান, লম্বায়

পাঁচ ফিট দশ ইঞ্চি, মুখখানি গোল, গোঁফ পাতলা, দাড়ী নাই, চক্ষু প্রশস্ত, তারকা কিছু কটা, বাম হস্তের মণিবন্ধে পুরু ক্ষত চিহ্ন আছে।"

জীবনরাম শিহরিয়া উঠিলেন।

পার্ব্বতী তাহা লক্ষ্য করিল, কাগজ রাখিয়া বলিল, "ও রকম করিয়া উঠিলে যে।"

"জানি না, কি জন্য অনেক দিনের একটা কথা হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। একি সেই? না, না, আমি পাগল। ইহা সম্ভব নয়, স্বপ্ন বোধ হয়।" অন্যমনস্ক ভাবে জীবন-রাম এই কথা বলিলেন।

পার্ব্বতীর বিস্ময় বৃদ্ধি হইল, বলিল, "তুমি বল কি? কি স্বপ্ন? কি সম্ভব নয়?

পার্ব্বতী জীবনরামের প্রথমজীবনের সকল কথা জানিত না, পার্ব্বতী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিল।

জীবনরাম পাগড়ী আঁটিয়া বাহির হইলেন, তখন রাত্রি আট্‌টা; পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "এখন হঠাৎ কোথা যাও?"

"আসিতেছি" বলিয়া জীবনরাম অন্ধকারে অদৃশ্য হই-লেন।

পার্ব্বতী অনেক্ষণ বসিয়া ভাবিল। সে মনে করিল, "আমিত কোন দোষ করি নাই. আমার উপর তিনি কেন রাগ করিবেন? বোধ হয় কোন দরকারী কাজে গিয়াছেন. পুরস্কারের চেষ্টায় নয়ত? আমাকে কিছু ত বলিয়া যান নাই! স্ত্রীর কি সকল কথা শুনিবার অধিকার নাই? ফিরিয়া আসিলে জিজ্ঞাসা করিব!"

পার্ব্বতী একটা অঙ্গরাখা লইয়া দীপালোকে তাহা শিলাই করিতে বসিল।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে সহসা বেগে গৃহদ্বার উদ্ঘাটিত হইল। পার্ব্বতী সভয়ে দেখিল, একটি দীর্ঘদেহ, ভীমকান্তি যুবক, গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াই সে দরজা বন্ধ করিয়া তাহাতে ভর দিয়া দাঁড়াইল, যেন অত্যন্ত পরিশ্রমের পর বিশ্রাম করিতেছে; সবেগে তাহার নিশ্বাস পড়িতেছিল, তাহার দক্ষিণ হস্তে একটা পিস্তল, একটি মেরজাই দ্বারা দেহ আবৃত, বামহস্ত রক্তাক্ত, সেই রক্তে মেরজাইটার আস্তিনের কিয়দংশ রঞ্জিত।

ভয় পাইয়া পার্ব্বতী তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল; দেওয়ালে একখানি তরবারি ঝুলান ছিল, এই অপরিচিত অস্ত্রধারীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য সহসা সেখানি টানিয়া লইতে একবার তাহার ইচ্ছা হইল, কিন্তু সে তরবারিতে হস্তার্পণ করিল না। একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভাল করিয়া দেখিয়া তাহার বিশ্বাস জন্মিল, এ ব্যক্তি তাহার উৎপীড়নের জন্য আসে নাই।

পার্ব্বতী সদয়ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কেগা তুমি? তোমার হাতে ওকি হয়েছে! আহা, কত রক্ত পড়েছে, ব্যথা পাওনি কি? তোমার কেহ নেই? এসো তোমার হাতে পটি বাঁধিয়া দিই।"

পার্ব্বতী তাহার কোমল বাহু বিস্তার করিল। আগন্তুক তাহার পিস্তল পার্ব্বতীর মাথার উপর উদ্যত করিয়া বলিল, "তফাতে থাক, একচুল সরিয়া আসিলেই গুলি করিব, স্ত্রীলোকের মত অকৃতজ্ঞ, অধমজাতি আর নাই, আমি স্ত্রীলোকের কথা বিশ্বাস করি না।"

"হতভাগ্য, তোমার মাও কি স্ত্রীলোক ছিলেন না?"—বলিয়া পার্ব্বতী বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে আগন্তুককে দেখিতে লাগিল, তাহার মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না।"

আগন্তুক বলিল, "এ বাড়ীতে আর কেহ আছে?"

"না।"—পার্ব্বতীর স্বরে উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নাই।

"এ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইবার অন্য দ্বার আছে?"

"আছে—ঐ দিকে।"

"মিথ্যা কথা!"

পার্ব্বতী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিরক্তিভরে বলিল—"তবে বিশ্বাস করিও না।"

বিশ্বাস না হইলেও আগন্তুক সেই দিকে প্রস্থান করিল। পার্ব্বতী চক্ষুর নিমিষে তাহার স্বামীর তরবারি খানি কোষ-মুক্ত করিয়া আগন্তুকের অনুগমন করিবে, এমন সময়ে বাহিরে কাহার পদ শব্দ শুনা গেল। আগন্তুক তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া নিম্নস্বরে পার্ব্বতীকে বলিল, "সাবধান, দ্বার খুলিও না; উহারা আমার শত্রু আমাকে ধরিবার জন্য আসিতেছে।"

বাহির হইতে দ্বারে, করাঘাত হইল। একজন উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "এই বাড়ীতে একজন মানুষ প্রবেশ করিয়াছে?"

আগন্তুক মৃদু কণ্ঠে দৃঢ়তার সহিত পার্ব্বতীকে বলিল,

"উত্তর দিও না। কেহ আসিয়াছে স্বীকার করিলে আমি গুলি করিয়া তোমাকে পশুর মত বধ করিব।"

এবার পার্ব্বতী কথা কহিল। আগন্তুকের মুখের উপর অচঞ্চলদৃষ্টি স্থাপন করিয়া সে অনুচ্চস্বরে বলিল, "তোমার মত পাষণ্ডের আমি কোন সাহায্য করিব না, দ্বার ভাঙ্গিয়া উহারা ঘরে প্রবেশ করুক।"

"আমাকে রক্ষা কর।"—আগন্তুকের স্বর কাতরতা পূর্ণ!

"তোমার পিস্তল আমার হাতে দাও।" নিমজ্জমান ব্যক্তির শেষ অবলম্বন ত্যাগের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ভাবে সে তাহার পিস্তল পার্ব্বতীর হস্তে অর্পণ করিল।

দ্বারে ঘন ঘন আঘাত পড়িতে লাগিল।

পার্ব্বতী আর মুহূর্ত্ত মাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া আগন্তুক-কে তাহার শয়নকক্ষে শয্যার উপর বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া শয়ন করাইয়া আসিল। বলিল, "তোমার পিস্তল তুমি কাছে রাখ, তোমার আত্ম সমর্পণে আমি বিশ্বাস করিয়াছি। হঠাৎ ইহার আবশ্যক হইতে পারে।"

দ্বারের আঘাত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

পার্ব্বতী দ্বারের নিকটে আসিয়া বলিল, "কে এত রাত্রে দ্বারে ঘা দেয়, আমি স্ত্রীলোক, গৃহে একাকিনী আছি, কাহাকেও দ্বার খুলিয়া দিতে পারি না।"

"কোন ভয় নাই মা, আমরা পুলিশের লোক, একজন অপরাধী এই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে।"—বাহির হইতে এই উত্তর আসিল।

পার্ব্বতী বলিল, "বাড়ীর মধ্য হইতে আমার স্বামী বাহিরে গিয়াছেন, অন্য লোকের কথা জানি না।"

'দ্বার খোল আমরা পরীক্ষা করিব।"

পার্ব্বতী দ্বার খুলিয়া দিল, তুই জন কনেষ্টবল বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া এঘর ওঘর অনুসন্ধান করিল. অবশেষে একজন পার্ব্বতীর শয়নকক্ষে প্রবেশের উপক্রম করিল।

পার্ব্বতী ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিল, "আমি গৃহস্থ রমণী, আমার শয়ন কক্ষে একজন পলাতক অপরাধীকে এই রাত্রিকালে লুকাইয়া রাখিয়াছি কোন বুদ্ধিমান লোক একথা বিশ্বাস করিত না।"

কনেষ্টবল ব্রাহ্মণ; বয়স হইয়াছিল, কিন্তু লজ্জিত হইয়া বলিল, "এ ঘরে সে নাই তা জানি, তবে কিনা এক-বার দেখা কর্ত্তব্য।" ঘরের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া সে দ্বার হইতে উঁকি মারিয়া দেখিল, ম্লান দীপালোকে কিছু দেখা গেল না।

বৃদ্ধ হাঁকিল, "গণপৎরাও আঁধারে ভুল করিয়াছি, সে এবাড়ী আসে নাই।"

কনেষ্টবলদ্বয়ের পশ্চাতে পার্ব্বতী দ্বার রুদ্ধ করিল।

কনেষ্টবলদ্বয় গৃহত্যাগ করিবামাত্র আগন্তুক পার্ব্বতীর শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল, তাহার মুখ তখন ভীতিচিহ্নবর্জ্জিত কিন্তু দৃষ্টি অবনত, পার্ব্বতীর মুখের দিকে চাহিতেও তাহার সাহস হইতেছিল না। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে বিহ্বল দৃষ্টিতে পার্ব্বতীর দিকে চাহিয়া আগন্তুক বলিল, "দেবি, ক্ষমা কর, তোমার মত পরোপকারিণী, বুদ্ধিমতী রমণী আমি জীবনে আর দেখি নাই, কি বলিয়া তোমাকে ধন্যবাদ দিব জানি না; আমি অপদার্থ কাপুরুষ তাই প্রথমে তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি নাই, তুমি একজন সমাজ বিতাড়িত রাজদণ্ডে দণ্ডিত হতভাগ্যের জন্য তোমার প্রাণ, তোমার প্রাণাধিক মান পর্য্যন্ত বিপন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছিলে। কেন এরূপ করিলে? তুমি ত জান পুলিশের লোকেরা কখন সাধু ব্যক্তির পশ্চাতে ধাবিত হয় না।"

পার্ব্বতী হাসিয়া বলিল "পরমেশ্বর ত কখন অসাধুকে ত্যাগ করেন না। সে কথা থাক্, তুমি তোমার হাত দাও পটি বাঁধিয়া দিই, এখনো রক্ত ঝরিতেছে, দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইতেছে।"

"আমার বেদনায় পৃথিবীতে অন্য কাহারো কষ্ট হয় এ কথা আজ প্রথম শুনিলাম, কিন্তু আমার হাত তোমার স্পর্শ যোগ্য নহে।"

পার্ব্বতী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া একখানি বস্ত্র খণ্ড আনিয়া তাহা জলে ভিজাইল, তাহার পর তাহার ক্ষতস্থান মনিবন্ধ পর্য্যন্ত বাঁধিবার জন্য আগন্তুকের মেরজাইর আস্তিন উঠাইল।

হঠাৎ বিদ্যুতের মত একটা কথা পার্ব্বতীর মনে পড়িয়া গেল; আগন্তুকের হাত ছাড়িয়া সে তুই হাত হটিয়া আসিল, সবিস্ময়ে বলিল "তুমি, কে তুমি? লাল্লুভাই ডাকাইত নও?"

খবরের কাগজখানা তখনো সেই ঘরে পড়িয়াছিল. পার্ব্বতী তাহা তুলিয়া লইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিজ্ঞাপনের

হুলিয়ার বর্ণনার সহিত আগন্তুকের আকার গত সাদৃশ্য পরীক্ষা করিতে লাগিল।

আগন্তুক বলিল, "হাঁ আমি লাল্লুভাই, দেখিতেছি তোমাদের নিকট পর্য্যন্ত আমার হুলিয়া আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আমার পরিচয় পূর্ব্বে পাইলে বোধ করি আমায় আশ্রয় দান করিতে না!"

পার্ব্বতী বলিল, "তা নয়, তোমার পরিচয় পাইয়া আমার মনে অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিয়াছে; কিন্তু তুমি যে হও তোমাকে বাঁচাইবার জন্য আমি প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারিতাম। তোমার আকারে, কথায়, গমনভঙ্গিতে আমার কোন প্রিয়তম আত্মীয়ের কথা মনে হয়। লাল্লুভাই যে এ রকম লোক হইবে তাহা মনে করি নাই।"

লাল্লুভাইর ওষ্ঠ হাস্যরেখায় রঞ্জিত হইল, সে হাসি নিরাশা-ক্লিষ্ট ব্যথিত হৃদয়ের পরিতাপে পরিপূর্ণ। হাসিয়া লাল্লু বলিল, "আমি চিরদিন এ রকম ছিলাম না। একদিন আমি মানুষ ছিলাম, একদিন আমার হৃদয় পবিত্র ছিল, জীবনের উদ্দেশ্য মহৎ ছিল, কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রখর ছিল, সে কথা মনে করিতেও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়; কিন্তু আজ আমি পশু, এখন আমি অধম দস্যুর কলঙ্কিত জীবন ও ভগবানের অভিশাপ বহন করিয়া ফিরিতেছি; কেন এমন হইল জানি না, কিন্তু এ কথা জানি যে তোমার মত কোন দেবীকে যদি আমি আমার হৃদয় সিংহাসনে বসাইতে পারিতাম তাহা হইলে আমার এতদূর অধঃপতন ঘটিত না।"

তুই বিন্দু অশ্রুভারে পার্ব্বতীর চক্ষুপ্রান্ত সিক্ত হইল। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পার্ব্বতী বলিল, "তোমার বয়স অধিক হয় নাই, তোমার উৎসাহ, উদ্যম ও পরিশ্রম শক্তি আছে. এ দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাও, বহুদূর দেশে গিয়া নূতন করিয়া জীবনের কার্য্য আরম্ভ কর, সাধু অনুষ্ঠানে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর, ভগবান তোমার সহায় হউন, পবিত্রতা তোমার হৃদয়ের অলঙ্কার হউক।"

পার্ব্বতী নত মস্তকে লাল্লুভায়ের হাতের পটি বন্ধন শেষ করিল, তাহার পর বলিল, "তোমার আর অধিক্ষণ এখানে থাকা কর্ত্তব্য নয়, আমার স্বামী গৃহে ফিরিবেন, তিনি তোমাকে দেখিতে পান আমার ইহা ইচ্ছা নহে।"

লাল্লুভাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পার্ব্বতীর মুখের দিকে চাহিল, কোন প্রশ্ন করিল না।

পার্ব্বতী তাহার সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিল, বলিল, "তাঁহার বড় অর্থাভাব, তুমি যাও, তোমাকে দেখিলেই তুমি কে তাহা তিনি জানিতে পারিবেন, তখন লোভে পড়িয়া তিনি—" পার্ব্বতীর মুখ ফুটিয়া সকল কথা বাহির হইল না।

লাল্লুভাই বলিল, আর বলিতে হইবে না, "আমি বুঝিয়াছি; তোমার উপকারের জন্য যদি এ জীবন যায় তাহাতে সুখ ভিন্ন আক্ষেপ নাই কিন্তু তথাপি কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। আমি যাইব। যাইবার পূর্ব্বে আমি তোমার নিকট কিছু স্মৃতিচিহ্ন চাই, যত দিন বাঁচিব আমার হিতৈষিণী জীবনদায়িনীকে মনে রাখিব।"

পার্ব্বতী বলিল, "আমি গরীব, ঘরে ত আর কিছু নাই, বিবাহের সময়ে স্বামীর নিকট একটা স্বর্ণাঙ্গুরী পাইয়াছিলাম, তাহাই লও।" পার্ব্বতী বাক্স হইতে অঙ্গুরী বাহির করিয়া লাল্লুভায়ের হস্তে প্রদান করিল।

অঙ্গুরী হস্তে লইয়াই, দীপালোকে তাহা দেখিয়া লাল্লু ভাই শিহরিয়া উঠিল, উন্মত্তের ন্যায় পার্ব্বতীর মুখের উপর নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

অঙ্গুরীর উপর সংক্ষেপে জীবনরামের নাম খোদিত ছিল।

লাল্লুভাই বিষম ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, "শীঘ্র তোমার স্বামীর নাম বল।"

"জীবনরাম।"

"জীবনরাম নাথুভাই?"

"হাঁ।"

"এখানে তাঁহার কোন ছবি আছে?"

পার্ব্বতী একখানি পুরাতন ফটো বাহির করিয়া লাল্লুভায়ের হস্তে দিল।

কঠিন হৃদয় দস্যু মাটির উপর বসিয়া পড়িল, তুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বাষ্পগদগদ ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিল "দাদা দাদা।"

পার্ব্বতী অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বলিল, "তুমি কি লাল্লু ভাই নও, কে তোমার দাদা?"

জীবন রাম—আমি গোবিন্দ রাম।'

'গোবিন্দ রাম অনেকদিন জাহাজ ডুবিয়া মরিয়াছে শুনিয়াছি।" আশা, আশঙ্কা, বিস্ময় ও উদ্বেগভরে পার্ব্বতী এই উত্তর দিল।

'মিথ্যা কথা, সে এতদিন লাল্লু ভাই সাজিয়া ভীল

ডাকাইত দলের সর্দ্দারি করিয়াছে, দেখিতেছি মরিলেই ভাল ছিল। তোমাদের টাকার বড় অভাব, নয় ?'

'হাঁ, আমাদের বড় অভাব, টাকার অভাবে সর্ব্বস্ব বিক্রয় হইয়া যায়, কোন উপায় নাই, কিন্তু দেখিতেছি তুমিত কপদ্দক হীন, এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ?'

গোবিন্দ রাম দৃঢ়স্বরে বলিল, 'তোমাদের অভাব দূর হইবে, টাকা পাইবে।'

পার্ব্বতী গোবিন্দরামের কথা বুঝিল, 'তোমার জীবন বিপন্ন করিয়া আমরা অর্থ চাহি না, কিছু চাহি না, তুমি যেমন আসিয়াছ তেমনি চলিয়া যাও, জীবনের মধ্যে এই প্রথমে তোমাকে দেখিলাম, তুমি আমাদের পরমাত্মীয়, কিন্তু তোমাকে গৃহে রাখিবার শক্তি আমাদের নাই, অতি কষ্টে তোমাকে বিদায় দান করিতেছি।'

দ্বার ঠেলিয়া জীবন রাম গৃহ প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন পার্ব্বতী কাহার সঙ্গে আলাপ করিতেছে: সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পার্ব্বতী কে ও, কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছ ?'

পার্ব্বতী নিরুত্তর।

কৌতূহল বিস্ফারিত নেত্রে জীবন রাম অগ্রসর হইলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি বহুকালের হারাণো ভাইটিকে চিনিতে পারিলেন, কি সর্ব্বনাশ গোবিন্দ রাম! "গোবিন্দ, গোবিন্দ, ভাই তুই এতদিন কোথায় ছিলি ?" বলিয়া জীবন রাম কনিষ্ঠকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিবার জন্য আবেগভরে উভয় হস্ত প্রসারিত করিলেন।

গোবিন্দরাম পশ্চাতে সরিয়া গেল, গম্ভীর স্বরে বলিল, আমি তোমার স্নেহালিঙ্গনের যোগ্য নই, আমি আর তোমার ভাই নই, আমি পরস্বাপহারী অপবিত্র লাল্টুভাই, ঘটনাক্রমে তোমার গৃহে আসিয়া পড়িয়াছি! তুমি বড় দুরবস্থায় পড়িয়াছ শুনিলাম, কিন্তু এই দেহ ভিন্ন আমার আর দ্বিতীয় সম্পত্তি নাই, মনে আছে এক দিন তোমার হাজার টাকা চুরি করিয়াছিলাম, আজ তোমাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিব, এখন তাহাই আমার প্রধান কর্ত্তব্য।"

'ভাই টাকার কাজ নাই, অনেক কালের পর আজ তোকে পাইয়াছি, আজ এই পুনর্ম্মিলনের দিনে তুচ্ছ টাকার কথা তুলিয়া তুই কেন আমার মনে কষ্ট দিস্ ? আমি তোর সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়াছি।'—ভ্রাতৃ স্নেহে জীবন রামের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল।

'কিন্তু আমি দেবতা ও মনুষ্যের ক্ষমার উপযুক্ত নহি, আমি স্বহস্তে দণ্ড গ্রহণ করিব।'—গোবিন্দ রাম সহসা তাহার মেজায়ের পকেট হইতে পিস্তলটা বাহির করিয়া নিজের চিবুকের নীচে রাখিয়া গুলি ছুড়িল।

'কর কি, কর কি' বলিয়া পার্ব্বতী ও জীবন রাম দুই দিক হইতে গোবিন্দের কাছে ছুটিয়া আসিলেন।

গোবিন্দ রামের প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহ উভয়ের ক্রোড়ে বিলম্বিত হইল। সর্ব্বস্বান্ত দস্যু গোবিন্দরাম রাজদণ্ড ব্যর্থ করিয়া ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার ঋণ মুক্তির জন্য আত্ম জীবন বিনষ্ট করিল।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

রস্কিন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি রস্কিনের কলা বিজ্ঞান ভ্রান্তিমূলক হইলেও তাঁহার রস গ্রাহিণী শক্তি অনিন্দ্য এবং অসাধারণ। এদিকে তিনি কলা শিক্ষা দিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না. যাহাতে গৃহে গৃহে, প্রতি সংসারে, প্রত্যেক লোকের জীবনে কলা লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠিত হয়—সৌন্দর্য্যের অমরালোকে প্রত্যেক জীবন সুন্দর হইয়া উঠে—আমাদিগের দৈনিক কর্ম্মকাণ্ডের সামান্যতম ব্যাপারটীও সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হয়, সে বিষয়ে

তাঁহার আজীবন চেষ্টা ও অদম্য উৎসাহ ছিল। প্রবন্ধারম্ভেই বলিয়াছি তিনি একাধারে জ্ঞানবীর ও কর্ম্মবীর। সাহিত্যে তিনি অমর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন—কিন্তু কলা-শিক্ষা প্রচার সম্বন্ধে তাঁহার অশ্রান্ত অধ্যবসায় একনিষ্ঠ তৎপরতা, অসাধারণ আত্মোৎসর্গ যিনি নিবিষ্ট চিত্তে পর্য্যালোচনা করিবেন, তাঁহাকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, যে সকল মহাত্মারা মানবের হিতকল্পে এবং বিশুদ্ধ স্থায়ী-সুখ-সমৃদ্ধি বর্দ্ধনের জন্য জীবন পাত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে রস্কিনের স্থান অতি উচ্চ। অনেক কলা ব্যবসায়ীই সৌন্দর্য্যের স্বপ্নে মগ্ন থাকেন—কিন্তু রস্কিনের কলা শাস্ত্র কেবলমাত্র জ্ঞান এবং ধ্যানময় নয়—ইহাতে কর্ম্মের আবশ্যক—অপরিহার্য্যরূপে আবশ্যক। তাঁহার মতে প্রকৃত কলা তাহাই, যাহা সুন্দর বস্তু সৃজনে সক্ষম। এবং যেখানে সুন্দর বস্তুর অভাব, কলা শিক্ষককে সমাজ সংস্কারকের কার্য্য করিতেই হইবে—স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া নহে—অবস্থার অনিবার্য্য বিপাকে। তোমার চারি দিকের বাস্তব জগৎ যখন কুৎসিত—গ্লানি জর্জ্জরিত; তখন তোমার কল্পনা-প্রসূত ছায়া জগতের মধ্যে সৌন্দর্য্যের প্রতিষ্ঠা বিড়ম্বনা মাত্র। রস্কিন বলেন, প্রকৃত কলার কার্য্য বাস্তব জীবন লইয়া—সে জীবনে যতদিন কুৎসিত অশোভন পদার্থ থাকিবে, ততদিন কলানুরাগীকে তাহার উচ্ছেদের জন্য চেষ্টা পাইতে হইবে এবং তাহার স্থানে সৌন্দর্য্যের সমাবেশ করিতে হইবে। সে চেষ্টা—সে কার্য্য সমাজ সংস্কারকের। যে শিক্ষক নিজের কর্ম্ম দ্বারা শিক্ষা না দিয়া কেবল মুখেই উপদেশমালা আবৃত্তি করিতে থাকেন. তাহার উপর রস্কিনের কেন. কোন লোকেরই আস্থা থাকিতে পারে না; এবং সেইজন্যই রস্কিন ইংলণ্ডের যাজক সম্প্রদায়কে নিয়ত এই বলিয়া উপহাস করিয়া আসিয়াছেন, যে ইঁহারা ধনী গৃহে আহার্য্য গ্রহণ করিয়া দরিদ্র-গৃহে উপদেশ উদ্গিরণ করেন। এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন, "আমার হাতে যে এই সুন্দর শম্বুকটী রহিয়াছে, নিশ্চিন্ত হইয়া ইহার চিত্রাঙ্কন করা এবং বিবিধ বর্ণে ইহাকে বর্ণনা করা আমার অভিলাষ। আমার বন্ধুবর্গ বলেন, "হাঁ উহা আমারই কায। কেন আমি তাহা করিয়া সুখী না হই ?" হায়! বিজ্ঞ বন্ধুগণ, যে সকল বিষয়ে আমার অভিলাষ, তাহার অত্যল্পই আমার আয়ত্ত। কারণ, আমার গৃহদ্বার দিয়া এই যে হরিৎবর্ণ স্রোতস্বিনী তরঙ্গাবর্ত্তে বহিয়া যাইতেছে ইহা ভাসমান মৃতদেহে পরিপূর্ণ। তাহাদিগের গতি না করিয়া আমি কি করিয়া ভোজনে বসি এবং কোথায়ইবা আমার এই শম্বুকটী এবং যষ্টি লইয়া নির্জ্জঞ্জাল নদীতটের সন্ধানে ঘুরিব ?" তাই রস্কিনকে কলা-বিষয়িনী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নীতি শিক্ষা দিতে হইয়াছিল এবং নীতি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সংস্কার কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হইয়াছিল।

এড্‌বার্ড ডুডেন (Edward Dowden) রস্কিনের এই সংস্কার কার্য্যের দিকে লক্ষ্য করিয়াই কি বলিয়াছিলেন, যে রস্কিনের বিবিধ বিষয়িণীর শিক্ষার ভিতর এই একটী মূল তত্ত্ব সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়—যাহা এক কথায় বলা যাইতে পারে—"আমাদের স্নেহ, ভক্তি ও যত্ন মানবেই অর্পিত হওয়া চাই—মানবে, মানব-রচিত কার্য্যকলাপে নয়—মানবে, উপাদান পদার্থে নয়—যন্ত্রাদি বা স্বর্ণেও নয় এমন কি চিত্র—স্থাপত্য—বা ভাস্কর্য্যেও নয় ?"

দুই একটী কার্য্যের উল্লেখ করিলেই পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন, রস্কিন কিরূপে এই সংস্কার ব্যাপারে তাঁহার জীবন এবং সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছিলেন। চিত্র বিদ্যার উন্নতি কল্পে তাঁহার অপরিমিত পরিশ্রম ও অজস্র দান সর্ব্বপ্রথমেই উল্লেখ যোগ্য। অক্সফোর্ড (Oxford) বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার নামে যে চিত্রাঙ্কন শিক্ষার পাঠশালা আছে তাহার শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত তিনি সেখানে কেবলমাত্র রীতিমত উপদেশ দিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না—উক্ত শিক্ষাগারে বহুমূল্য অসংখ্য পট দান করিয়াছেন। কতকগুলি তাঁহার নিজ হস্ত রচিত (বহু পরিশ্রমের ফল)—কতকগুলি তাহার ব্যয় ও উপদেশে অপরের দ্বারা রচিত। এবং কতকগুলি তাঁহার স্বকীয় অর্থে ক্রীত। এই শিক্ষালয়ে তিনি তাঁহার সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন এবং ইহার তত্ত্বাবধারণে তাঁহার যত্ন ও পরিশ্রমের সীমা ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার এই অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও দানশীলতা কেবল অক্সফোর্ডেই (Oxford) বদ্ধ ছিল না। যেখানেই ললিত কলার চর্চ্চা বা তাহার অনুকূল সংস্কার কার্য্যের কোন অনুষ্ঠান হইত, সেইখানেই রস্কিন পরিশ্রমে অকাতর—দানে মুক্ত হস্ত।

কেম্‌ব্রিজ (Cambridge) বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্রিটিশ মিউজিয়ামে (British museum) তিনি এইরূপ অনেক

দান করিয়াছিলেন। অথচ অর্থ-দানেই তাহার সাহায্য পর্য্যবসিত হয় নাই। চিত্রাঙ্কন, চিত্র সকলের তালিকা করণ, এবং সকল বিষয়ে সুশৃঙ্খলা সংস্থাপন প্রভৃতি শ্রম-সাধ্য কার্য্য নিজেই করিতেন।

তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সেণ্ট জর্জ্জমণ্ডলী-(St. George's Guild) সংশ্লিষ্ট যে প্রদর্শনীশালা আছে, তাহার প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির জন্য তিনি যেরূপ ব্যয় ও শ্রম স্বীকার করিয়াছেন তাহা কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য উভয় জগতেই বিরল। তাঁহার দানশীলতার কিঞ্চিৎ পরিচয় আমরা ইহা হইতে পাই যে কেবলমাত্র অক্সফোর্ড (Oxford) এবং সেণ্ট জর্জ্জ (St. George) প্রদর্শনীশালাতে তিনি যে সকল চিত্রাদি দান করিয়াছেন, তাহার মূল্য আড়াই লক্ষ টাকার কম হইবে না।

কলা বিষয়ে সাক্ষাৎ শিক্ষাদান সম্বন্ধে উপরে যে সকল কার্য্যের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা ছাড়া রস্কিন সে বিষয়ে পরোক্ষেও অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহাদিগের বিস্তৃত বর্ণনা এ প্রবন্ধে অসম্ভব। তন্মধ্যে এক শ্রেণীর কার্য্য কলাপের কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। ইংলণ্ডের সে কালের সুন্দর সুন্দর ক্রীড়া কৌতুকের উদ্ধার কল্পে তিনি অনেক চেষ্টা ও প্রভূত ব্যয় করিয়াছেন। মাধবী—May queen—নামক সুন্দর উৎসব তাঁহারই যত্নে ও ব্যয়ে পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে। বালিকা বিদ্যালয়ে প্রতিবৎসর মে মাসে পাঠিকাদিগের মধ্যে একজন রাণী নির্ব্বাচিত হন—তিনিই মাধবী। নির্ব্বাচিতাকে রাণীরই যোগ্য বহুমূল্য কারু-কার্য্য খচিত সুন্দর অম্বর এবং স্বর্ণ মুকুটে সজ্জিত করা হয়। রস্কিনের ব্যয়ে প্রতি বৎসর, বৎসরের মাধবীকে একটী সোণার ক্রশ (Cross) অর্পিত হয়। তাহা ছাড়া রস্কিন নিজ রচিত অতি সুন্দর এবং মূল্যবান বাঁধাই চল্লিশ খানি পুস্তক দিতেন। মাধবী আবার সহপাঠিকাদিগের মধ্যে যাহাদিগকে উপযুক্ত বিবেচনা করিতেন তাহাদিগকে সেই পুস্তক উপহার স্বরূপ দিয়া থাকেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে রস্কিন প্রতিযোগী পরীক্ষার বিরোধী, সুতরাং পরীক্ষা দ্বারা মাধবীকে নির্ব্বাচিত করা হয় না। চরিত্র মাধুর্য্য বা অপর কোন গুণে মুগ্ধ হইয়া বালিকারা আপনাদিগের মধ্যে যাহাকে মনোনীত করে, তিনিই মাধবী হন। এই উৎসবে কি এক নির্ম্মল সৌন্দর্য্য ও কোমল মাধুরী বিজড়িত আছে। ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র তখন প্রকৃতির আনন্দময়ী মূর্ত্তি। ফল-ফুল-মণ্ডিত-শ্যাম-শ্রী তরুলতা। সুখস্পর্শ বায়ু। সুখস্বপ্নের ন্যায় মধুর—সুনীল আকাশ। বিদ্যালয় গৃহ নানা অলঙ্কারে সজ্জিত এবং বসন্তেরও সদ্যস্ফুট কুসুম-স্তবক অপেক্ষা দর্শনীয়া বয়ঃসন্ধিগতা কুমারী সকল। তাহাদের আবার বিচিত্র নব সাজ! প্রতিবৎসরে মাধবীরও নূতন ধরনের বেশ। চারিদিক হইতে কি সুন্দর বস্তুর সমন্বয়—সৌন্দর্য্যের কি মনোজ্ঞ বিকাশ! প্রসাধনকলা শিক্ষা দিবার কি সুন্দর সুযোগ! এই উৎসবের মাধুর্য্য ক্রমে ইংলণ্ডের অনেক স্থলেই অনুভূত হইয়াছে। অর্থশালী ব্যক্তিরা নিজ নিজ গ্রাম ও পল্লীতে ইহার প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত রস্কিনের দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়াছেন। যাঁহারা রস্কিনের সকল শিক্ষাই আসমানদারী ও আকাশ-কুসুম বলিয়া উড়াইয়া দেন, তাঁহাদেরও স্বীকার করিতে হইবে যে এই উৎসবের পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত রস্কিনের চেষ্টা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। আয়রলণ্ডে পর্য্যন্ত ইহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে।

আমরা বাঙ্গালী—অতি-বুদ্ধিমান। আমাদের মধ্যে অনেকেই বলিবেন, একটি সামান্য উৎসবের পুনঃ প্রতিষ্ঠায়, রস্কিন কি এমন কায করিয়াছেন, যে তাহার গুণগানে "প্রদীপের" এতটা পৃষ্ঠা নষ্ট হইল? কিন্তু, উৎসব আনন্দ যে জাতীয় চরিত্র গঠনে একটি প্রধান উপাদান, এবং জাতীয় প্রকৃতির সুন্দর পরিচায়ক, ইতিহাসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। ইংরাজী প্রবাদে বলে, তোমার সঙ্গ জানিলে আমি তোমার প্রকৃতি বলিয়া দিতে পারি। সেইরূপ একটি জাতির আমোদ-প্রমোদ, খেলা ধূলা জানিতে পারিলে, সে জাতির জীবনের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। এই তত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াই পাশ্চাত্য দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ ওগুস্ত কঁৎ (Auguste Comte) তৎ প্রণীত সমাজ নীতির মধ্যে জাতীয় উৎসবের বিবিধ বিধান নিরূপণ করিবার নিমিত্ত অনেক চিন্তা করিয়াছেন। পুরাকালের হিন্দুগণও ইহার মর্ম্ম বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা "বারমাসে তের পার্ব্বণের" সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাহাদের দোহাই দিয়া, সভ্য জগতে খুব বড়াই করিয়া বেড়াই, এবং স্বাভাবিক অতি-বুদ্ধি-সম্পদে ম্লেচ্ছ যবনের পদলেহন করিতে করিতে তাহাদেরই প্রতি নাসিকা

কুঞ্চিত করি। কিন্তু যে বিজ্ঞান এবং ভূয়োদর্শন হইতে সেই হিন্দুদিগের প্রবর্ত্তিত রীতি নীতি প্রসূত, তাহার কিছুই বুঝি না এবং বুঝিবার নিমিত্ত চেষ্টাও করি না। আমরা অতি বুদ্ধি-মান।

রস্কিনের এমনও বিশ্বাস ছিল, যে কলা-সম্বন্ধিনী কার্য্য-কুশলতার পক্ষে বিশুদ্ধ বায়ু—কুৎসিত ও অশোভন বিষয়াদি হইতে দূরে অবস্থান—নিষ্প্রয়োজনীয় কল-কারখানা সম্বলিত পরিশ্রমাদি হইতে মুক্তি এবং "সন্তোষামৃত-তৃপ্ত" জীবন একান্ত আবশ্যক। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে বিবিধ সংস্কার কার্য্যে হাত দিতে হইয়াছিল। তাঁহার শিক্ষা ও কার্য্যের মধ্যে এই সামঞ্জস্য তাঁহার অলৌকিক মহত্ত্বের প্রধান নিদর্শন। এবং তাঁহার প্রকৃতির এই অংশকে লক্ষ্য করিয়াই আমি প্রবন্ধারম্ভে বলিয়াছিলাম, যে তাঁহার চরিত্র-মাহাত্ম্য পর্য্যালোচনা করিলে স্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে মনে পড়ে। সেণ্টজর্জ মণ্ডলী (St. George's Guild) নামক কৃষি, শ্রম জীবন ও তদানুষঙ্গিক বিষয়িনী পরিষৎ এই সংস্কার কার্য্যের উদ্দেশ্যেই রস্কিনের দ্বারা গঠিত হয়। বহু-লোক-নিবাস নগর সমূহের বাণিজ্যব্যবসায়, কলকারখানা, ধূলি-ধূম হইতে সুদূরে অবস্থিত পল্লিগ্রামের মধ্যে এক একটি মানস-কল্পিত সুন্দর সুন্দর লোকাবাস নির্ম্মাণই এই মণ্ডলীর কার্য্য। ৮৭১ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার নিমিত্ত রস্কিন প্রথমে এক লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা (£7000) এবং বাহান্ন হাজার পাঁচ শত টাকার (£3500) মূল্যের জমি দান করেন। কুমারী অক্টেভিয়া হিল (Miss. Octavia Hill) মণ্ডলীর কার্য্যের তত্ত্বাবধারণে নিযুক্ত হন। পল্লিগ্রামের ভিতর বিস্তৃত ভূমি ক্রয় করিয়া তথায় কৃষিকর্ম্ম, উদ্যান-পালন, পূর্ব্বতন গ্রাম্যশ্রম-জীবনের পুনরুদ্ধার, এই সকল উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত, সাধারণে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছিল। যে কেহ তাঁহার বিষয় সম্পত্তি ও উপার্জ্জনের দশমাংশ দিবেন, তিনিই এই মণ্ডলীভুক্ত হইতে পারিবেন। মণ্ডলী-রচিত গ্রামাদির মধ্যে বাষ্পীয় যন্ত্রাদি থাকিবে না। জীবনকে সঙ্কটাপন্ন করিয়া রেলপথে ভ্রমণ চলিবে না। নৌযান বা পশুযানে পণ্য দ্রব্য প্রভৃতি চালান হইবে। সাধ্য হইলে পথ ঘাট সকল গ্রামবাসীদিগের স্বহস্তেই নির্ম্মিত হইবে। উদ্যান ও ক্ষেত্রাদিতে ফল ফুল ও শাকসবজীর চাস হইবে। গৃহ সকল ঘন সন্নিবিষ্ট হইবে না। তাহাদের ভিতর বিশুদ্ধ বায়ু ও প্রচুর আলোক প্রবেশের সুবন্দোবস্ত থাকিবে। কিছু কিছু কলা চর্চ্চাও হইবে। প্রাচীন গ্রীসিয়েরা যেমন ফুল গাছের জন্য মাটীর টব প্রস্তুত করিয়া তাহার চারিদিকে তাহাদের দেব-দেবীর সুন্দর চিত্র আঁকিত, সেইরূপ মাটীর টব নির্ম্মাণ চলিবে এবং তাহাতে দেবদেবীর পরিবর্ত্তে বিবিধ কীট পতঙ্গাদির ও সরীসৃপ প্রভৃতির আলেখ্য রচিত হইবে। এবং ক্রমে কল্পনা-প্রসূত উচ্চ কলারও আবির্ভাব, ও পরে বিজ্ঞান এবং ইতিহাসেরও চর্চ্চা, আশা করা যাইতে পারে। কাব্যগীত—নৃত্যকলাদিত থাকিবেই। ফলে, সুস্থ সরল প্রাচীন গ্রাম্য জীবনের পুনরুদ্ধারই মণ্ডলীর উদ্দেশ্য। দেখা যাইতেছে, তিনটি বিষয়ে শিক্ষাদান এবং তাহাদের উৎকর্ষ সাধন মণ্ডলীর লক্ষ্য—কৃষিকার্য্য, শিল্পকলা এবং ললিত-কলা। কৃষিকার্য্যে মণ্ডলী এখনও বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই, কিন্তু তৎপক্ষে তাহার অতীত এবং বর্ত্তমান চেষ্টা যে শুভফল প্রসব করিবে, এমন আশা আছে। শিল্প-কলায় কতকটা কায হইয়াছে। গোড়ায় ইহাতে অনেক বাধাবিঘ্ন ভোগ করিতে হইয়াছিল। কার্য্যারম্ভে দেখা গেল যে তাঁত ও চর্কা প্রভৃতির ব্যবহার এতকাল বিলুপ্ত হইয়াছে, যে তাহাদের গঠন প্রণালী এবং চালাইবার পদ্ধতি জানে এমন লোকই নাই। এমন কি ইহাদের সরঞ্জাম প্রস্তুত করিতে বারমিঙ্গহাম (Birmingham) ও সেফিল্ডের (Sheffield) কামারেরা পর্য্যন্ত অসমর্থ বা অনিচ্ছুক ছিল। যাহা হউক মণ্ডলীর দ্বারা বস্ত্র বয়নাদির বিশেষ সুবিধা ও উৎকর্ষ হইয়াছে। ম্যান দ্বীপে (Isle of Man) সেণ্টজর্জ ক্লথ (St. George's Cloth) নামে যে বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার পশমও যেমন খাঁটি—রংও তেমনি পাকা। কিন্তু ইহার একটি মহৎ দোষ আছে—শীঘ্র ছিঁড়ে না বা খারাপ হয় না। যে সকল সুন্দরীরা এক বৎসরে তিন চারি দফা নূতন পোষাক করিয়া লন, তাহাদের পক্ষে এই বহুকাল স্থায়ী কাপড় সামান্য অসুবিধা নয়।

রস্কিনের কার্য্যকলাপের এইরূপ বিস্তৃতভাবে সমালোচনা করিতে হইলে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার সম্ভাবনা। এ প্রবন্ধে বিস্তৃত সমালোচনারও প্রয়োজন নাই। রস্কিন কি ধাতুর লোক ছিলেন, তাহারই একটি সংক্ষিপ্ত অথচ পরিষ্কার

চিত্র পাঠকের সম্মুখে ধরিতে চাই। উপরে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ ও বর্ণনা করিয়াছি তাহা হইতে পাঠক দেখিয়াছেন যে রস্কিন কেবল কল্পা-খেয়ালি ছিলেন না, পরন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এবং কার্য্য সাধনের নিমিত্ত যাহা কিছু প্রয়োজন হইত তাহার আয়োজনে রস্কিনের চেষ্টা ও ক্ষিপ্রকারিতা আদর্শস্থানীয়। শিক্ষা, উপদেশ, চিত্রাঙ্কনেরত কথাই নাই। অর্থসাধ্য বিষয়ে অর্থদানে তিনি সকলের অগ্রে এবং সকলের উপরে। বাস্তবিক, অর্থদানে তাঁহার ন্যায় মুক্তহস্ত লোক বড়ই বিরল! কেবল যে প্রিয় এবং প্রেয় বিষয় সমূহেই তাঁহার এই মুক্ত-হস্ত বদান্যতা ছিল, তাহা নয়, তাঁহার হৃদয়ের ঔদার্য্য অসামান্য এবং সে হৃদয়ের নিরতিশয় দয়াপ্রবণতা নিতান্ত গল্পের ন্যায় শুনায়। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি উইল অনুসারে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হন। কিন্তু যে সকল আত্মীয় স্বজন বৃদ্ধ রস্কিনের নিকট অর্থপ্রাপ্তি আশায় বঞ্চিত হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের সকলকে আশাতীত অর্থ দিয়া তাঁহাদের হতাশ হৃদয়ের মর্ম্মবেদনা দূর করিয়াছিলেন। তিনি এইরূপে একলক্ষ পাঁচ হাজার টাকা (£7000) দান করিয়াছিলেন। কেবল যদি এই দানেই তাঁহার অর্থসাহায্য পর্য্যবসিত হইত! তেইশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকার (£157000) বিষয়ের মধ্যে তিনি নিজের জন্য কেবলমাত্র এক লক্ষ আশি হাজার টাকা (£12000) রাখিয়াছিলেন। বাকি সমুদয় দানে নিঃশেষিত হয়।

এই উদার প্রীতি আবার, কেবলমাত্র মানবজাতিরই মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। আদর্শ হিন্দুর ন্যায় তিনি সমুদয় জীবগ্রামকে স্নেহ-চক্ষে দেখিতেন। অক্সফোর্ডের (Oxford) পল্লী-মধ্যে অনেকেই দেখিয়াছেন রস্কিন পথের কুক্কুরকে ধরিয়া আদর করিতেছেন। ফলতঃ গ্রাম্য পশু পক্ষীদিগকে তিনি আপন জন বলিয়া জানিতেন। হিন্দুর পূজিতা গাভীকে তিনি ভগিনী (Sister cow) বলিতেন। সুতরাং, তিনি যে ক্রোধদীপ্ত জ্বালাময়ী তীব্র ভাষায় শিকার প্রভৃতি নিষ্ঠুর আমোদের ভূয়সী নিন্দা করিতেন, তাহা বিচিত্র নয়। বাস্তবিক, তাঁহার হৃদয় অনেকটা আদর্শ হিন্দুহৃদয়ের ন্যায় ছিল। হিন্দুরই ন্যায় তাঁহার বাস্তুনিষ্ঠা ছিল। এই প্রসঙ্গে আমরা সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার দুই একটি মত নিয়ে বিবৃত করিতেছি। তাঁহার গ্রন্থাবলীর বিবিধ স্থানে বাস্তু সম্বন্ধে তিনি যে সকল হৃদয়স্পর্শী মনোজ্ঞ কথা বলিয়াছেন, আমরা তাহাদের কতকগুলি এক সঙ্গে গ্রথিত করিয়া, তাহার ভাবানুবাদ পাঠককে উপহার দিতেছি। রস্কিনের মতে, নিজের জন্য একটি বিশ্রামের স্থান—এমন একটি স্থান যেখানে বেশ নিশ্চিন্ত আরামে পা ছড়াইয়া দিতে পারা যায় —ঠিক করা, আমাদের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। ইহাই আমাদের সর্ব্বপ্রথম শুভ-কৃত্য। এই বাস্তু নির্ম্মাণে সংযম ও মিতব্যয়িতার আবশ্যক। তুমি এমন করিয়া বাস্তু নির্ম্মাণ করিও না যে তাহার অভ্রভেদী উচ্চতা, বা পল্লীব্যাপিনী বিস্তৃতি, অথবা গঠনগৌরব, লইয়া লোকের কাছে গর্ব্ব করিতে পার। বাস্তুটি তোমার অবস্থানুরূপ হওয়া চাই—বরং অবস্থার একটু নীচে হইলে ভাল, ত উপরে নয়। এ জগতে বাস্তুই পুণ্যক্ষেত্র—পবিত্রভূমি ("Holy land") এবং তুমি তাহাকে এমন পবিত্র ও সুখের করিয়া তুলিবে যে, যদি দৈবক্রমে বাস্তু ত্যাগ করিতে আদিষ্ট হও, সে আদেশ পালনে যেন তোমার গভীর মর্ম্ম-বেদনা উপস্থিত হয়। বাস্তু ত কেবল ইষ্টক বা প্রস্তর রচিত আশ্রয়াবরণ নহে! ইহা তোমার অবস্থার কত পরিবর্ত্তন দেখিয়াছে, সৌভাগ্য সম্পদে তোমার হাসির সঙ্গে হাসিয়াছে—বিরহ-বিয়োগ-বিপদের অশ্রুপাতে কাঁদিয়াছে। কত সুখ দুঃখের—মান অপমানের—লজ্জাভয়ের স্মৃতি ইহাতে বিজড়িত। জীবনের প্রায় সকল অভিনয়ই এই বাস্তু-মঞ্চে। কত চিরবিলুপ্ত মুখের শ্রী—শিশুর কাকলী—যৌবনের উচ্ছ্বাস—বার্দ্ধক্যের শুভ্র উদার প্রীতি ইহার প্রতি কক্ষ অঙ্কে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এ হেন বাস্তুকে ছাড়িতে চায় কে? কোন্ পিতা ইচ্ছা করে—যে তাহার সন্তান সন্ততি এই বাস্তুর প্রতি স্নেহ শ্রদ্ধা পোষণ করিবে না বা ইহার মঙ্গলময় প্রভাব হইতে শুভ সঞ্চয় করিবে না? এবং কোন্ পিতৃ-মাতৃ বৎসল সন্তান ইহাকে সহজে বিসর্জ্জন দিতে পারে? যে জাতি কেবল এক পুরুষের জন্য বাস্তু নির্ম্মাণ করে, রস্কিন তাহাদের কিছুই ভাল দেখেন না।

আনন্দ উপভোগের বিবিধ উপকরণে গৃহ পূর্ণ থাকা চাই। জগতের আর কোন স্থান বাস্তু অপেক্ষা অধিকতর প্রীতিপ্রদ বা চিত্তাকর্ষক না হয়। সংখ্যায় অধিক না হউক সুন্দর সুন্দর পুস্তক থাকাও চাই।

এই গৃহের অধিশ্বরী বা অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইবেন স্ত্রী।

"ন তৎ গৃহং যত্র ন সহ-ধর্ম্মিণী"। যে গৃহে স্ত্রী তাঁহার ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিতে না পারেন, সেখানে স্বামী বলহীন, সন্তান সন্ততি দুর্ভাগা। সমাজের সমৃদ্ধি—স্ত্রী ও মাতার গুণে ও ধর্ম্মে। স্ত্রী হইতেই স্বামীর বল, মা হইতেই ছেলেদের আশা ভরসা। এই প্রসঙ্গে স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে রস্কিনের মতের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেন, স্ত্রীশক্তি —যুদ্ধ করিবার জন্য নয়, শাসন করিবার জন্য। স্ত্রীবুদ্ধি উদ্ভাবন-পটীয়সী বা সৃষ্টিকুশলী নয়। সে বুদ্ধির কার্য্য মধুর শাসনে, শৃঙ্খলাস্থাপনে, এবং মীমাংসা করণে। রমণী যুদ্ধদ্বন্দ্ব করেন না, কিন্তু যুদ্ধের জয়মাল্য প্রদান করেন। তিনি স্তুতি নিন্দার দ্বারা তাঁহার জগৎকে শাসন করেন। যে গৃহ তাঁহার দ্বারা সুশাসিত, সে গৃহে বিপদ আপদ, পাপ-প্রলোভন, ভুলভ্রান্তি আসিবার কথা নাই! বাস্তব গৃহের প্রকৃতিই এই। ইহা শান্তির নিকেতন। গৃহমধ্যে তুমি যে কেবল দুঃখ-কষ্ট হইতে আশ্রয় পাও, তাহা নয়, দ্বন্দ্ব, সংশয় ও ভীতি হইতেও রক্ষা পাও। এবং যেখানেই আত্মধর্ম্ম-পরায়ণা স্ত্রী—সেইখানেই এই গৃহ। যদিও তাঁহার শিরোপরে তারকা-খচিত আকাশ ভিন্ন আর কোন আবরণ না থাকে, এবং পদতলস্থ শিশির-নিসিক্ত ঘাসের উপর খদ্যোতের আলোক ভিন্ন অপর কোন প্রদীপ না জ্বলে, তাহা হইলেও সেই স্ত্রীর চারি পার্শ্বেই গৃহ। অধিকন্তু যদি তাঁহার হৃদয়ের প্রকৃত আভিজাত্য থাকে, তাহা হইলে ত সে গৃহের পরিসর নিয়তই বাড়িতে থাকিবে, এবং অনেক গৃহহীন তাহার শান্তি-পূর্ণ আলোকের নিমন্ত্রণে আকৃষ্ট হইয়া তথায় আশ্রয় লাভ করিবে।

এই গৃহের সুখ ও সুশৃঙ্খলার পক্ষে পিতা পুত্রের কর্ত্তব্যও নিরূপণ করা আবশ্যক। এ বিষয়ে রস্কিনের নিজের কিশোর জীবন এবং তদানীন্তন গৃহ তাহার আদর্শ। পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি করা, তাহাদের আদেশ পালনে অবহিত হওয়া, যে পুত্র কন্যার প্রধান কর্ত্তব্য একথা আমরা প্রথম ভাগ শিশুশিক্ষায়ও পড়িয়াছি। রস্কিনের উপদেশ—পিতা মাতার প্রতি। তিনি বলেন, সন্তান সন্ততি যে পিতা মাতার উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর স্থাপন করিবে, ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয় এবং অশেষ মঙ্গলের আকর। কিন্তু এই বিশ্বাস ও নির্ভর পিতা মাতার গুণ ও ব্যবহার সাপেক্ষ। এই অসঙ্কোচ বিশ্বাসের উপযুক্ত হওয়া বড়ই সৌভাগ্যের কথা। পিতা হইবেন পুত্রের অবলম্বন—মাতা শুভকরী পাবনী শক্তি—এবং উভয়েই সেই নবীন জীবনের দুর্ব্বলতা—অমঙ্গল—বিপদ—ও বিস্ময়ে ঈপ্সিত আশ্রয় হইবেন—ইহা কি সহজে ঘটে? রস্কিনের নিজ গৃহের শান্তি ও শৃঙ্খলা, সংযম ও শাসন মনে কর, তবে বুঝিতে পারিবে এই দেব-প্রার্থীত শুভফল আয়ত্ত করিতে হইলে তদ্বিষয়ে পিতা মাতার কিরূপ আত্মোৎসর্গ আবশ্যক। ইহার জন্য, শিশুর কথা ফুটিবার পূর্ব্বেই সচেতন হওয়া চাই। কথা কহিতে অসমর্থ হইলেও, যখন শিশু হাসি দেখিয়া হাসিতে শিখিয়াছে, রাগ দেখিয়া রাগিতে শিখিয়াছে, তুমি কি বলিতে চাও তখনও গৃহে স্নেহপ্রীতি থাকুক বা না থাকুক, পিতা মাতার মুখ শান্তির আলোকে প্রফুল্ল, বা অসন্তোষের ভ্রকুটিতে নিরত অন্ধকার হইয়া থাকুক—গৃহে শৃঙ্খলা থাকুক বা না থাকুক তাহাতে শিশুর কিছু আসিয়া যায় না? কথা ফুটিবার পূর্ব্বেই যে শিশুর নৈতিক জীবন গড়িতে থাকে, রস্কিনের এই মত গৃহস্থ মাত্রেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিবেন।

রস্কিনের নিজের পিতা মাতার উপর শ্রদ্ধা ভক্তির উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। তাহা চিরকালই অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৮৬৪ সালে, যখন রস্কিনের বয়স প্রায় ৪৪ বৎসর, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, কিন্তু মাতা বহুকাল জীবিত ছিলেন। রস্কিন নিজে বৃদ্ধ হইলেও, মাতার প্রতি কখনও কোন কারণে বিরক্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। এবং বন্ধুবান্ধব বা অপর কাহারও মুখ হইতে নিজের অভিলষিত কোন বিষয়ে বা বহুকাল পোষিত কোন ধারণা সম্বন্ধে অতি ক্ষীণ প্রতিবাদ শুনিলে যে রস্কিন সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিতেন, মাতার প্রতিবাদ তিনি অবনত মস্তকে আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতেন। এস্থলে বক্তব্য, আত্ম পক্ষ সমর্থনে রস্কিনের কঠোর নির্ব্বন্ধাতিশয় ছিল। তর্কে তাঁহার "গোঁ" ছিল। কিন্তু নিজের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিলে, তাঁহার আত্ম গ্লানির সীমা থাকিত না।

গৃহের সুখ শান্তির পক্ষে আর একটি উপাদান—ভাল ভৃত্য। রস্কিন বলেন ভাল চাকর পাইবার কেবল একটি মাত্র উপায় আছে—ভৃত্য যে তোমাকে কায়মনবাক্যে সেবা করিবে তৎপক্ষে উপযুক্ত হও। ভাল মনিবের সেবা করিতে সমস্ত প্রকৃতি এবং মানবমণ্ডলী তৎপর। অনুদার-

কঠোর-হৃদয় প্রভুর সেবা করা দূরে থাকুক, ভৃত্যবর্গ তাহার বিপক্ষে বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়ায়। রস্কিন নিজে বড় ভৃত্য-বৎসল ছিলেন। তাহাদের সুখ সচ্ছন্দতা ও প্রীতির প্রতি তাঁহার বিশেষ মনযোগ ছিল। কোন ভৃত্য কোন সামান্য বিষয়েও ক্ষুণ্ণ না হয় সে বিষয়েও দৃষ্টি ছিল। রস্কিন প্রায়ই বন্ধুবান্ধবকে ভোজ দিতেন এবং ভোজনের অতি বিস্তৃত আয়োজন করিতেন। এত ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত হইত যে নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা বা অভ্যাগত বর্গ কেহই তাহার সকলগুলির আস্বাদন লইতে পারিতেন না। ইহাতে পাছে পাচক ভাবে রন্ধনের দোষ হইয়াছে, এই জন্য রস্কিন রন্ধনের প্রশংসা করিয়া তাহাকে পুনঃ পুনঃ সংবাদ পাঠাইতেন এবং বলিয়া দিতেন "পাচককে গিয়া বল, আমি নিজে এই কথা বলিতেছি।"

নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে রস্কিনের ন্যায়পরতা, দয়া ও ভৃত্য বাৎসল্যের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার একটি পুরাতন ভৃত্য বহুকাল ধরিয়া শঠতাপূর্ব্বক তাঁহাকে অনেক টাকা ঠকাইয়া আসিতেছিল, কিন্তু তাহার চাক্‌রির প্রশংসা না করিয়া, বা সে যে বিশ্বাস যোগ্য এরূপ পত্র না লিখিয়া তাহাকে ছাড়াইলে তাহার অন্যত্র কাম জুটিবে না এবং সে ও তাহার পরিবারবর্গ খাইতে পাইবে না, এই ভাবিয়া রস্কিন বরাবর তাহাকে তাহার নির্দ্দিষ্ট বেতন দিয়াছিলেন।

অপূর্ব্ব পিতৃমাতৃভক্তি—প্রদীপ্ত বাস্তনিষ্ঠা—কল্পনাকল্প দানশীলতা—সর্ব্বজীবে প্রীতি এই সকল গুণে এই অসামান্য লোক ইংরাজ হইয়াও আদর্শ হিন্দু।

অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে রস্কিনের মতামত একেবারে প্রচলিত মতের বিরোধী, সুতরাং তাহার আলোচনা নিস্ফল এবং তর্কজালের কুটিলতায় নীরস। তবে এইমাত্র বলিব, যে তাঁহার মত সকল ভ্রান্ত হইলেও তাহাদের মূলে দয়া প্রীতি এবং ধর্ম্মভাব প্রোজ্জ্বল রহিয়াছে। যদি কখন আবার সত্যযুগ ফিরিয়া আসে, বা কবিকল্পিত Golden age জগতে আবির্ভূত হয়, তবেই সেই সকল মত চলিতে পারে। কিন্তু তাহার মধ্যে দু'একটি যে কালে চলিবে, এমন আশা করা যাইতে পারে। এখনও কেহ কেহ তাঁহার কতিপয় মতের পক্ষপাতী এবং তদনুসারে কার্য্য করিতেছে।

রস্কিন কুসীদ ব্যবহারের বড়ই বিরোধী ছিলেন। মুসলমান বা য়ীহুদী এমন কেহ নাই সুদ লইতে যাহার এমন ধর্ম্মগত মর্ম্মান্তিক আপত্তি। কিন্তু তাঁহার এই মতও চলিত অর্থ-শাস্ত্র-সম্মত নয়।

রস্কিনের অসংখ্য বন্ধুবর্গ সকলেই একবাক্যে তাঁহার অকৃত্রিম—প্রগাঢ় বন্ধুবাৎসল্যের প্রশংসা করেন। এবং পরিচিত অপরিচিত যে কেহই তাঁহার আতিথ্য উপভোগ করিয়াছেন তাঁহারাই তাঁহার অমায়িক এবং উদার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন।

সাধারণের শুভকল্পে তাঁহার বিস্ময়জনক আত্মোৎসর্গ এবং অর্থদানের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার ব্যক্তিগত দানপরতাও অদ্ভুত ছিল। সাধারণতঃ, পতিত ব্যক্তির উদ্ধারের অপেক্ষা পতনশীলের রক্ষার্থই তাঁহার যত্ন ও প্রয়াস ছিল। সে সকলের বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্যক। আমরা এইবার তাঁহার সর্ব্বজনমুগ্ধকর-অপূর্ব্ব রচনা-শিল্পের আলোচনা করিয়া এই দীর্ঘ প্রবন্ধ শেষ করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন।

প্রাচীন ভারতের স্বায়ত্ব শাসন।*

"লোক্যাল সেল্‌ফ্ গবর্মেণ্ট" বলিয়া একটা নূতন জিনিস আমরা গবর্মেণ্টের নিকট পাইয়াছি। ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি, প্রাতঃস্মরণীয়, সর্ব্বথা বরণীয়, লর্ড রিপন এই নূতন জিনিসটী আমাদের স্বদেশবাসীদের দিয়াছেন। অনেকে মনে করেন—এই জিনিসটা সম্পূর্ণ আধুনিক—কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। এই প্রথা—প্রকারান্তরে, বিভিন্নরূপে—আমাদের অতি প্রাচীন হিন্দু আমলেও প্রবর্ত্তিত ছিল। ঠিক এইরূপ না হউক, বর্ত্তমানের ও প্রাচীনের মূল উদ্দেশ্যটা একই ছিল। অনেকে বলেন, এই স্বায়ত্ব শাসন জিনিসটী দেশী নহে—বিলাতী আমাদের দেশী মাটিতে বিলাতী জিনিসটার আশানুরূপ ফল হইবে না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এটী একেবারে বিলাতী নহে—আমাদের দেশে বহুকাল পূর্ব্বে ইহার অস্তিত্ব ছিল, তবে তাহার ধরণ ধারণটা একটু বিভিন্ন রকমের। পাঠক-

বর্গের কৌতূহল বিদূরিত করণার্থ এই প্রসঙ্গটা একবার আলোচনা করা আবশ্যক।

প্রাচীন স্মৃতি-গ্রন্থসমূহে ধর্ম্মাধিকরণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কতকগুলি বিধির উল্লেখ আছে। ইহার মধ্যে "ব্যবহারাধ্যায়" বলিয়া একটা পরিচ্ছেদে কি করিয়া দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিভাগে কার্য্য করিতে হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের মধ্যে একটা অধ্যায় আছে, তাহার নাম "সংবিৎ ব্যতিক্রম।" প্রত্যেক কর্ম্মচারীর যে নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য আছে, তাহার কোনরূপ নিয়মভঙ্গ ত্রুটি হইলে যাহা করিতে হয় তাহা এই সংবিৎ ব্যতিক্রমে বিশদরূপে উল্লিখিত আছে। এই অধ্যায়ের একটা ধারায় সংবিৎকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। একটী "রাজকৃৎ" ও অপরটী "সমূহকৃৎ।" "রাজকৃৎ" ধারাগুলি রাজার প্রণোদিত—"সমূহকৃৎ" ধারাগুলি সাধারণ সমবেত সভার সভ্যগণের বিধি। প্রাচীন ভারতে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপার সংশ্লিষ্ট কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য এক ব্রাহ্মণ সংগঠিত সমিতির উপর ছিল। কতকগুলি পণ্ডিত, শাস্ত্রদর্শী ধর্ম্মাচার অনুষ্ঠান-পরায়ণ, বেদ বিহিত ক্রিয়াভিজ্ঞ ব্রাহ্মণের এক যোগে এই সমিতির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইত। এই সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত ব্রাহ্মণগণ ভূপালগণ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইতেন। রাজা তাঁহাদের ভরণ পোষণের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন, তাঁহাদের উদরান্নের সংস্থান করিয়া দিতেন। ব্রহ্মোত্তরাদি দান করিয়া তাঁহাদের পরমুখপ্রেক্ষিতা বৃত্তির মোচন করিতেন। বৃহস্পতি ও যাজ্ঞবল্ক বলিয়াছেন—

"রাজাহৃত্য পুরে স্থানং ব্রাহ্মণান্ন্যস্য তত্রতু।
ত্রৈবিদ্যান্ বৃত্তিমৎ ব্রুয়াৎ স্বধর্ম্মঃ পাল্যতামিতি।
বেদবিদ্যাবিদোবিপ্রান্ শ্রোত্রিয়ানগ্নিহোত্রিনঃ
সংকৃত্য স্থাপয়েৎ তত্রতেষাং বৃত্তি প্রকল্পয়েৎ
অনাচ্ছেদ-করাস্তেষাং প্রদদ্যাৎ গৃহ ভূময়ঃ
মুক্ত-ভাব্যাশ্চ নৃপতি লেখয়িত্বা স্বশাসনে।"

অর্থাৎ নগরের মধ্যে একটা স্থল নির্ব্বাচন করিয়া, রাজা সেখানে জন কয়েক, ত্রিবেদবিৎ ব্রাহ্মণকে প্রতিষ্ঠাপিত করিতেন। তাঁহাদিগকে—"হে বিপ্রগণ, আপনারা স্বধর্ম্মানুমোদিত—ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠানাদি করুন" এইরূপ অনুজ্ঞা করিতেন। রাজা সম্মানের সহিত, নগরের মধ্যে বেদ বিদ্যাভিজ্ঞ, শ্রোত্রিয়, অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণগণকে আশ্রয় ও গৃহবাসাদি প্রদান করিতেন। তাঁহাদের ভরণপোষণের জন্য বাসগৃহ ও নিষ্কর ভূমি প্রদান করিতেন। এই সকল ভূমির জন্য রাজাকে রাজস্ব দিতে হইত না। দানকালে দেশাধিপতি এক দানপত্র লিখিয়া দিতেন।

রাজার অভিপ্রায়ানুযায়ী এই ব্রাহ্মণসমিতি—"রাজকৃৎ সমুদায়" এই নামে অভিহিত হইতেন। ইহাদের যে নির্দ্ধারিত কার্য্য করিতে হইত তাহা "রাজকৃৎ সংবিৎ" বলিয়া উল্লিখিত হইত।

যদিও রাজাদেশে নিযুক্ত এই সমস্ত বিপ্রমণ্ডলী সাধারণের প্রকৃত, ধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়াকলাপ ও নৈতিক উন্নতির জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তত্রাচ—তাঁহাদের সময়ে সময়ে সাংসারিক ও রাজনৈতিক বিষয়েও তত্ত্বাবধারণ করিতে হইত, নগরবাসীরা দৈনিক, সাময়িক, ইচ্ছাপালনীয় ধর্ম্ম কাণ্ডাদির ও ক্রিয়াকলাপাদির অনুষ্ঠান করিত কিনা, এ বিষয়েও তাঁহাদের মাঝে মাঝে দেখিতে হইত। রাজনৈতিক বিষয়েও মাঝে মাঝে হস্তক্ষেপ করিতে হইত। দৈবদুর্ব্বিপাক নিবারণার্থে যে সমস্ত যাগ যজ্ঞ হোমাদির অনুষ্ঠান হইত, বর্ষণাভাব, মহামারী প্রভৃতি দৈবদুর্নিমিত্তের প্রতিকার জন্য যে সমস্ত দৈবকর্ম্ম করিতে হইত, তাহাতেও এই ব্রাহ্মণসমিতি যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে, আচার সম্বন্ধে, অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সম্বন্ধে কোন কূট সমস্যা উপস্থিত হইলে, বা কোন বিধান ব্যবস্থার প্রয়োজন হইলে, সাধারণের হিতার্থে তাহাও তাঁহাদের করিতে হইত।

নিত্য নৈমিত্তিকং কার্য্যং শান্তিকং পৌষ্টিকন্তথা
পৌরাণাং কর্ম্ম কুর্য্যুস্তে সন্দিগ্ধে নির্ণয়ন্তথা।

বীর মিত্রোদয়ে উদ্ধৃত বৃহস্পতির এই দুইটা শ্লোক হইতে উল্লিখিত কথার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত, রাজ কর্ত্তৃক নিয়োগ সময়ে অনুজ্ঞাপত্রে তাহাদের যে যে নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত থাকিত, প্রয়োজন হইলে, রাজাদেশানুসারে তাঁহাদের সময়ে সময়ে তদতিরিক্ত অন্যান্য কর্ত্তব্যেও ব্রতী হইতে হইত। তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যগুলি সমাপনান্তে তাঁহারা এই অতিরিক্ত কার্য্যভার গ্রহণ করিতেন। গৃহপালিত গো মহিষাদি চারণভূমি, সাধারণ পয়ঃপ্রণালীর বিশৃঙ্খলা নিবারণে, সাধারণের ব্যবহার্য্য দেবমন্দিরাদির পবিত্রতা রক্ষণে ও শৃঙ্খলা সাধনেও তাঁহাদের মাঝে মাঝে ব্রতী হইতে হইত। এখানে এ

* শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্ এ মহাশয় Buddhist Journalএ বর্ত্তমান Municipal Bill পাশ হওয়ার পর Municipal Institutions in Ancient India নামে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইহা তাহারই মর্ম্মানুবাদ।

কথাটি পরিস্ফুট করিয়া বলা উচিত যে, আজ কাল-কার বৈজ্ঞানিক দিনে স্যানিটেশন বা স্বাস্থ্যসম্বন্ধে, পশু-চারণ ভূমি ও পয়ঃপ্রণালী, নদী খাল প্রভৃতির পানীয়ের বিশুদ্ধতা রক্ষার দিকে কর্তৃপক্ষদের যেরূপ খরদৃষ্টি ও তদুপযোগী আইন কানুন বিধি ব্যবস্থা আছে, সে অতি পুরাকালে—হিন্দুরাজত্বেও এই প্রকার অনেক বিধি ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। রাজা ঐ সভার সদস্যগণের স্কন্ধে কি প্রকারের অতিরিক্ত কার্য্যভার চাপাইতেন, মূল গ্রন্থাবলীতে তাহা বিশেষ ভাবে উল্লিখিত নাই। তবে এই মূল গ্রন্থগুলির সংকলন কর্ত্তারা মধ্যে মধ্যে এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।

যাবৎ-পথিকং ভোজন দেয়ং, অস্মদরাতি
মণ্ডলে তুরগাদয়ো ন স্থাপনীয়া, ইত্যেবরূপঃ।

এই উদ্ধৃত বাক্যাংশ হইতে প্রমাণ হয় অপরিচিত পান্থকে অন্ন দান, শত্রু রাজ্যে তুরগাদির রপ্তানি নিবারণ প্রভৃতি কার্য্যও তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই অংশটা একটু বিশদ করিয়া বুঝিতে গেলে, এই দাঁড়ায় "অপরিচিত, পথপরিত্যক্ত, নিরাশ্রয় আগন্তুকগণকে অন্নদান, রাজ্যের নিরাপদতার জন্য, বিদেশে বা শত্রুরাজ্যে আমদানী রপ্তানীর দ্রব্য সমূহের পর্য্যবেক্ষণ, প্রভৃতি কার্য্যও মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের দেখিতে হইত। তাঁহারা প্রজাদের বৈষয়িক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি সকল বিষয়ই দেখিতেন। রাজা তাঁহাদের নিযুক্ত করিতেন, কাজেই সাধারণের তাঁহাদের নিয়োগ ও বিদায় সম্বন্ধে কোন অধিকারই ছিল না। তবে এই সমিতি সংগঠন সময়ে রাজাকে কেবল দেখিতে হইত যে নির্ব্বাচিত বিপ্র সকলেই সুবিদ্বান, এবং প্রজাবর্গের বৈষয়িক ব্যাপার, রাজ্যের অন্যান্য কার্য্যে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যের কোনরূপ অঙ্গহীন হইতেছে কি না?

এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি সাধারণ সমিতি ছিল। ইহাদের সাধারণ আখ্যা ছিল "সমুদয়" এগুলির প্রকৃতিও একটু আলোচনা করা যাক্। বৃহস্পতি ও যাজ্ঞবল্কের মতে,—গ্রামের অধিবাসীরা—নগরের অধিবাসীরা বণিক সম্প্রদায়, শিল্পী সম্প্রদায় অন্যান্য ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাগণ আবশ্যকমত, সমিতি সংগঠন করিয়া আপনাদের স্বার্থ, দেশের হিত ও রাজার স্বত্ব রক্ষা করিত। যখন তাহাদের বাণিজ্য ব্যবসায়গত স্বার্থে কোন রূপ আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা হইত, বা অন্য কোন প্রকার স্বার্থ হানিকর সংঘর্ষ উপস্থিত হইত, তখন তাহারা রাজাকে এক অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দিয়া স্ব স্ব শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার্থে রাজাকে রাজ কার্য্যে সাহায্য করণার্থে "সমুদয়" গঠন করিত।

রাজাকে তাহারা যে অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দিত, তাহাতে রাজা তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেন। এই অঙ্গীকার পত্র মত কার্য্য করিতে "সমুদয়ের" সভ্যগণ ধর্ম্মতঃ বাধ্য থাকিতেন। সাধারণ সভাগৃহ—"প্রপা",* নগর মধ্যস্থ দেব মন্দির, পুষ্করিণী ও সাধারণ উদ্যান সমূহের তত্ত্বাবধারণ করিতে হইত। এতদ্ব্যতীত কোন দরিদ্র বা অনাথের বা পথ মধ্যে মৃত ব্যক্তির সৎকার কার্য্যের বন্দোবস্ত করিতে হইত। যদি কোন নাগরিক ধর্ম্মানুষ্ঠান বা ক্রিয়া কাণ্ড করিতে ইচ্ছুক হইত, কিন্তু অর্থাভাব জন্য তাহা করিতে না পারিত, এই সকল "সমুদয়" তাহাদের দানাদি দ্বারা সাহায্য করিতেন। দুর্ভিক্ষ ও অন্ন কষ্টে—ইঁহারা প্রজা সাধারণকে সাহায্য করিতে বাধ্য থাকিতেন। এই কর্ত্তব্যগুলিকে "সমূহকৃৎ সংবিৎ" আখ্যা দেওয়া হইত। এ সম্বন্ধে বৃহস্পতির বচন এই—

সভা প্রপাদেব গৃহতড়াগারাম সংস্কৃতিঃ
তথানাথ দরিদ্রাণাং সংস্কারো যজনক্রিয়া
কুলায়ন নিরোধশ্চ কার্য্যমস্মাভিরংশত
যত্রৈতল্লিখিতং পত্রে ধর্ম্ম্যাসময়-ক্রিয়া†

বীর মিত্রোদয় ও বিবাদ রত্নাকর উপরি উদ্ধৃত শ্লোকের "কুলায়ন" কথাটি লইয়া একটু গোলমাল করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ "কুলায়ন" এই পাঠের পরিবর্ত্তে "কুল্যায়ন" পাঠ করেন। কুল্যায়ন শব্দের অর্থ জল প্রণালী বা পয়ঃপ্রণালী খনন বা বন্ধ করণ।

"কুল্যায়ন নিরোধশ্চেতি কল্পতরৌ পাঠঃ
কুল্যায়ন-নিরোধঃ কুল্যায়াঃ প্রবর্ত্তন প্রতিবন্ধৌ
(বীর মিত্রোদয়)

বিবাদ রত্নাকর ও বীর মিত্রোদয়োদ্ধৃত কুলায়ন শব্দের

* প্রপা—যেখানে তৃষ্ণার্ত্ত পান্থকে জল প্রদান করা হয়। কূপ চৌবাচ্ছা প্রভৃতি ইহার অন্তর্ভুক্ত।

† "যত্রৈতল্লিখিতং পত্রে ধর্ম্ম্যাসা সময় ক্রিয়া" এই উদ্ধৃত পাঠ বিচার করুন।

অর্থ এই—দুর্ভিক্ষাদি সময়ে—অন্নাভাবকালে প্রজাপুঞ্জের সাহায্য করণ। এই সাহায্য কেবল স্বল্পদিনের জন্য আবদ্ধ থাকিত না—যতদিন পর্য্যন্ত না দুর্ভিক্ষাদি একবারে নির্ম্মূল হইত, ততদিন প্রকৃতিপুঞ্জ সাহায্য পাইতেন।

"কুলায়ন নিরোধোদুর্ভিদ্যগম পর্য্যন্তস্য ধারণম—এই বাক্যাংশই ইহার প্রমাণ। আজকাল এই প্রকৃতির অনেক কার্য্য মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তব্য সীমা ভুক্ত। তবে দুর্ভিক্ষ্যাদি কার্য্যে রাজা আজকাল সাহায্যের ভার স্বহস্তে লইয়া থাকেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—নাগরিকগণ, গ্রামবাসিগণ নগরের ও গ্রামের উন্নতির জন্য এক এক সমিতি গঠন করিয়া রাজার সহিত অঙ্গীকার সূত্রে বদ্ধ হইতেন। এতদ্ব্যতীত ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও শিল্পী সম্প্রদায়ও এরূপ প্রতিজ্ঞা পত্রে আবদ্ধ হইয়া আপনাদের স্বার্থ রক্ষার্থ কার্য্য করিতেন। উভয় শ্রেণীর অঙ্গীকার পত্র বিভিন্নরূপে ও স্বতন্ত্রভাবে সম্পাদিত হইত। স্বার্থানুসারে তাঁহাদের কার্য্য বিভাগও স্বতন্ত্র ছিল।

পাষণ্ড নৈগম শ্রেণি পূগব্রাতগণাদিষু
সং রক্ষেৎ সময়ং রাজা দুর্গে জনপদেতথা।

এইস্থলে "পাষণ্ড" অর্থে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী অর্থাৎ বৌদ্ধাদি সম্প্রদায়কে বুঝাইত। তাহাদিগের আচার ব্যবহার ক্রিয়াকাণ্ড হিন্দুদিগের অনুষ্ঠিত আচার ব্যবহারের বিরোধী ছিল। এই সকল সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণ রাজার সহিত স্বতন্ত্র অঙ্গীকার পত্রে আবদ্ধ হইয়া নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বদ্ধ পরিকর হইত।

এই সকল "সমূহের" যে সমস্ত নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য ছিল তাহার সবিস্তার বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না। যাজ্ঞবল্ক প্রভৃতির যে বচন পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা হইতে প্রমাণ হয়—এই সমূহের—সদস্যগণের নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্য ব্যতীত আরও কতিপয় কার্য্য ছিল। নিম্নোদ্ধৃত বচন আমাদের কথার অনুমোদন করিবে।

নিজধর্ম্মা য বিরোধেন যস্তু সাময়িকো ভবেৎ
সোহপি যত্নেন সংরক্ষ্যো ধর্ম্মোরাজর্ণো কৃতশ্চ যঃ।

অর্থাৎ যে সমস্ত কর্ত্তব্য—তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যের বিপরীত পথগামী ছিল—রাজা কর্ত্তৃক যে সমস্ত কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইত—সকলই তাঁহারা সাবধানতার সহিত করিতেন।"

অঙ্গীকার পত্রে যে সমস্ত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইত তাহা কার্য্যে পরিণত করা—"সমূহ" সমুদয়ের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য ছিল। এইজন্য সর্ব্বাগ্রে তাহারা "কার্য্যচিন্তক" বা Executive দল নির্ব্বাচিত করিতেন। দুই হইতে সাত জন পর্য্যন্ত কার্য্যচিন্তক এক এক "সমূহে" নির্ব্বাচিত হইতেন।

দ্বৌত্রয়ঃ পঞ্চ বা কার্য্যাঃ সমূহ-হিতবাদিনঃ
কর্ত্তব্যং বচনং তেষাং গ্রামশ্রেণী গণাদিভিঃ।
(বৃহস্পতি)

দুই, তিন, বা পাঁচজন নাগরিক নগরের ও গ্রামের মঙ্গলার্থে, বণিক ব্যবসায়ী ও শিল্পীদের হিতার্থে কার্য্যচিন্তকরূপে নিযুক্ত হইতেন।

তখনকার গ্রাম ও নগরের সীমা অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল না। সীমাব্যাপ্তির সহিত তুলনায় এইরূপ কার্য্যচিন্তকের সংখ্যা যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। রাজা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ নগরের বা গ্রামের যে পরিমাণে কর্ম্মচারী বা কমিশনার নিয়োগ করিতেন, তাহার উপর নাগরিকগণ নিজ পক্ষ হইতে সেই পরিমাণ কর্ম্মচারি নির্ব্বাচিত করিত। রাজা ও প্রজার নির্ব্বাচিত 'কার্য্যচিন্তক'গণ এক জোটে কাজ করিতেন। কত জন কার্য্যচিন্তক নির্ব্বাচিত হইবে—তাহার একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা ছিল না। আবার অন্য পক্ষে তাহাদের একাংশের নির্ব্বাচন ভার নাগরিকগণের বিবেচনাধীন ছিল। আজ কাল যে প্রকারে নির্ব্বাচন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়—আমরা অনুমান ও যুক্তির দ্বারা নির্ণয় করিতে পারি সেকালে নাগরিকেরা প্রায় সেই যুক্তি পথেই কমিশনার বা কার্য্যচিন্তক নির্ব্বাচিত করিত।

ব্রাহ্মণ সংগঠিত "পরিষদে" তিন হইতে ২১ জন ব্রাহ্মণ সদস্য থাকিতেন। যখন ইঁহাদের মধ্যে কোনরূপ মত বিভিন্নতা ঘটিত, তখন ভোট লইয়া প্রধান দলের অভিমতেই কার্য্য হইত। আজ কালকার কমিশনার যেমন নির্ব্বাচন সময়েই নাগরিকদের ক্ষমতার অধীন থাকেন, তৎকালে তদ্রূপ ছিল না। যতদিন কমিশনারগণ স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন, নাগরিকেরা তাঁহাদের উপর ক্ষমতা চালনা করিতেন। তাঁহারা বিধিবিরুদ্ধ কোন অন্যায় কার্য্য করিলে, নাগরিকেরা তাঁহাদের বরখাস্ত করিতেন, জরিমানা করিতেন, অথবা তাঁহাদের ক্ষমতাধীন স্থানের সীমা হইতে তাঁহাদের বহিষ্কৃত করিয়া দিতেন। এই প্রকার সংঘর্ষণ স্থলে নাগরিকেরা তাহাদের মতামত কেবল রাজাকে জানাইত। রাজাই এ সম্বন্ধে নাগরিকদের অভিপ্রায়ানুসারে আদেশাদি প্রচার করিতেন। কাত্যায়ন ও বৃহস্পতি এ সম্বন্ধে বেশ পরিষ্কার করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—

সাহসী ভেদকারী চ গণ দ্রব্য বিনাশকঃ
উচ্ছেদ্যা সর্ব্বএ'বৈতে বিখ্যাপৈব নৃপেভৃগুঃ।

অর্থাৎ ভৃগুর মতে যে সকল "মুখ্য" বা প্রধান কার্য্যকারক দুষ্কৃতি সম্পন্ন হইবেন, বা নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিবেন, সাধারণের সুখ-শান্তিনাশের চেষ্টা করিবেন, বা তাঁহার সহযোগী বর্গের মধ্যে বিবাদ ও অশান্তি আনয়ন করিবেন, সাধারণ সম্পত্তির বিনাশ করিবেন, তাঁহাদের সম্প্রদায় হইতে রাজার সম্মতি অনুসারে বিদূরিত হইবেন।

এই উদ্ধৃত শ্লোকাংশের ও বৃহস্পতির বচনের উপর মন্তব্য করিয়া মিত্র মিশ্র বলিয়াছেন—"গণ সমূহ" (Public bodies) এই সমস্ত ভ্রষ্টাচারী কর্ত্তব্যহীন কার্য্যকারকগণকে নিজেরা ইচ্ছা করিলেই কর্ম্মচ্যুত করিতে পারিতেন।

যখন তাঁহাদের ক্ষমতায় কুলাইত না তখন অগত্যা তাঁহারা রাজশক্তির আশ্রয় প্রার্থী হইতেন।

"সমূহাশক্তৌ তস্য দণ্ডো রাজ্ঞাবিধেয়ঃ॥" "মিত্র মিশ্র"

অর্থাৎ গণসমূহ অশক্ত হইলে রাজা তাঁহাদের দণ্ড দিবেন।

পূগশ্রেণী গণাধ্যক্ষা পুর দুর্গ নিবাসিনঃ।
বাক্‌দিগ্‌ দণ্ড পরিত্যাগং প্রকুর্য্যুঃ পাপকারিণাম্॥
তৈঃ কৃতং যৎ স্বধর্ম্মেন নিগ্রহানুগ্রহং নৃণাম্
তদ্রাজ্ঞা অনুমন্তব্যং নিসৃষ্টার্থা হিতে স্মৃতাঃ।

—পূগ (বণিক সম্প্রদায়) শ্রেণী (সমব্যবসায়ী)* গণ (ব্রাহ্মণ ও সাধারণ নাগরিক সম্প্রদায়)† প্রভৃতির প্রধানগণ (কমিশনার) কিম্বা দুর্গ ও পুরবাসিগণ অকৃতকর্ম্মা ও অন্যায়াচারী ধর্ম্মবিরুদ্ধকর্ম্মিগণকে, তিরস্কার, নির্ব্বাসন বা কোন প্রকার সামাজিক দণ্ডে দণ্ডিত করিতেন। এই ধর্ম্ম বিরুদ্ধ ও নীতি বিরুদ্ধ কার্য্যকারিগণকে যখন কোন শাস্তি বা কৃতকর্ম্মের পুরস্কার দেওয়া হইত, তৎসম্বন্ধে রাজার অনুমতি লওয়া হইত। সাধারণ কর্ম্মাদি সম্বন্ধে ইঁহারা যাহা করিতেন তাহাই বলবৎ হইত। এ সম্বন্ধে রাজ সম্মতি পূর্ব্বেই দেওয়া থাকিত। এস্থলে—"অধ্যক্ষা" শব্দে যে সকল লোক—একই সম্প্রদায়ের প্রধান কার্য্যকারক ও "পুর দুর্গ নিবাসিনঃ" শব্দ—নগর ও দুর্গবাসিগণ এই অর্থই আমরা বিশদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। বীরমিত্রোদয়ের উক্তির সহিত ইহার সঙ্গতি রক্ষা করা হইয়াছে।

এই সকল উদ্ধৃতাংশের আলোচনায় প্রমাণ হয়, প্রাচীন ভারতের মিউনিসিপালিটি ও সাধারণ সমিতি সমূহ, তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে যথেষ্ট ক্ষমতা উপভোগ করিতেন—সাধারণ নাগরিকগণ দ্বারা তাঁহাদের কার্য্যকারকগণ নির্ব্বাচিত হইতেন ও সাধারণের সমবেত শক্তিতে সমস্ত কার্য্যই সম্পাদিত হইত। আজ কালকার মিউনিসিপালিটির কর্ত্তব্য যেরূপ বহু বিষয়িণী ও দায়িত্ব পরিপূর্ণ—সেই প্রাচীনকালেও সেইরূপ ছিল। তাঁহারা স্ব স্ব সীমার মধ্যে দেওয়ানী ও ফৌজদারি উভয়বিধ ক্ষমতায় বলীয়ান ছিলেন। তাঁহাদের নির্ব্বাচিত কমিশনারগণ কোনরূপ দুষ্ক্রিয়া ও কর্ত্তব্য হীন হইলে নাগরিকেরা তাঁহাদের শাসন করিতে পারিতেন। কখনও বা কমিশনারদের তাঁহারা নির্ব্বাসিত করিয়া দিতেন। রাজা তাঁহাদের মতামত গ্রাহ্য করিতেন। এ বিষয়ে কোন অসামঞ্জস্য ও বিশৃঙ্খলা দেখিলে তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। যে সময়ে সাধারণগণ ও তাহাদের কার্য্যকারকগণের মধ্যে মত বিভিন্নতা হইত—

মুখৈঃ সহ সমূহানাং বিসংবাদো যদা ভবেৎ॥
তদা বিচারয়েৎ রাজা স্বধর্ম্মে স্থাপয়ে চ্ছতান্॥
(বৃহস্পতি)॥

অর্থাৎ যে সমস্ত নির্ব্বাচক ও নির্ব্বাচিতগণের মধ্যে মতভেদ হইত তখন রাজা তাহাদের মীমাংসা করিয়া দিতেন। যখন সাধারণ প্রজাগণ সাধারণের অনিষ্টকর কোনরূপ দল সংগঠন করিত—বিনা কারণে অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিত—আত্ম বিবাদ করিত, সাধারণ অর্থের অপব্যবহার করিত, ধর্ম্ম ও নীতি বিগর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিত, তখন রাজা অতিরিক্ত ক্ষমতা পরিচালনে ইহাদের দমন করিতেন।

মিথঃ সংঘাত করণং অহেতৌ শস্ত্র ধারণম্।
পরস্পরোপঘাতঞ্চ তেষাং রাজা নমর্ষয়েৎ॥
প্রতিকূলঞ্চ যৎরাজ্ঞঃ প্রকৃতবমতঞ্চ যৎ।
বাধকঞ্চ যদর্থানাং তভেভ্যো বিনিবর্ত্তয়েৎ॥
দোষবৎ করণং যৎস্যাৎ অনাম্নায় প্রকল্পিতম্।
প্রবৃত্তমপিতৎ রাজা শ্রেয়স্কামো নিবর্ত্তয়েৎ॥
(নারদ)।

এই সমস্ত উদ্ধৃত প্রমাণাদি হইতে বোধ হয় আমাদের এই ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকালেও আত্ম শাসন প্রণালী প্রকারান্তরে প্রবর্ত্তিত ছিল। রাজধর্ম্ম ও প্রজা পালনের নীতি সূত্রগুলি দেখিলে, তাহার আলোচনা করিলে, এখনকার অনেক রাজনৈতিকগণকে অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে হয় যাহা এই লোক শিক্ষার কেন্দ্র ভূমি জম্বুদ্বীপে ছিল না—তাহা আর কোথাও ছিল না।

বঙ্গ সাহিত্যে বঙ্কিম।*

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণে এই পুস্তকখানি আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; ইহা এবার বেশ পরিচ্ছন্ন মুদ্রাঙ্কণ ও অনতিবৃহৎ আয়তনে লাইব্রেরীতে সাজাইয়া রাখিবার উপযোগী বেশে উপস্থিত হইয়াছে। হারাণ বাবুর ভাষাটি বেশ সহজ, সুন্দর কবিত্বপূর্ণ, মধ্যে মধ্যে আর একটুকু সংযত হইলে ভাল হইত। আশা করি তৃতীয় সংস্করণে উহা সম্যক্ শোধরাইয়া যাইবে। পূর্ব্ব সংস্করণের অবান্তর বিষয়ে কতকগুলি মন্তব্য আমাদের অপ্রীতিকর ছিল, এবার সেগুলির অধিকাংশ গ্রন্থকার নিজেই তুলিয়া দিয়াছেন কিন্তু তিনি এই দোষ সম্যক্‌রূপে পরিহার করিতে পারেন নাই। কয়েকটি মত এবারও এরূপ পাইলাম যাহাদের অদ্ভুত স্বপ্রবণত্ব পাঠকবর্গকে চমৎকৃত করিয়া তুলিতে পারে, সে সম্বন্ধে গ্রন্থকার নিজেই আশঙ্কা করিয়া লিখিয়াছেন—

"অনেক স্থলে যে অনেকের সহিত মতান্তর হইবে তাহা বুঝিতেছি, পরন্তু এই মতান্তর উপলক্ষ কাহারও সহিত মনান্তর না ঘটিলে সৌভাগ্য বোধ করিব।"

* "শ্রেণি"—"সমান জাতয়ৈক বৃত্তিকায় সমূহঃ।"
† "গণ"—কুলানাংহি সমূহস্ত গণঃ সম্পরি কীর্ত্তিতঃ।

* কলিকাতা কালিকা যন্ত্রে শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১৮নং শিবনারায়ণ দাসের লেন হইতে শ্রীআশুতোষ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ১৷০ মাত্র।

আমরা সাহিত্যে আলোচনার পক্ষপাতী, বিরোধের ইচ্ছা করি না; হারাণ বাবু উক্ত মতগুলি যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন নাই। আমরা মনে করি কয়েকটি অবান্তর প্রসঙ্গ একবারে তুলিয়া দিলে মূল বিষয়ের কোন হানি হইবে না, অথচ সকলেই দ্বিধাশূন্য হৃদয়ে এই সুন্দর পুস্তক খানি পড়িয়া সুখী হইবেন।

মতভেদ সত্ত্বেও আমরা বলিতে বাধ্য "বঙ্গ সাহিত্যে বঙ্কিম" একখানি উপাদেয় গ্রন্থ হইয়াছে। এত অল্প পরিসরে হারাণ বাবু মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলিকে বিশদভাবে ফুটাইতে সক্ষম হইয়াছেন ও বঙ্কিমের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার বিশ্লেষণ-কৌশলযুক্ত একটি পরিচয় দিয়াছেন, ইহা তাঁহার লিপিদক্ষতা প্রমাণ করিতেছে। ভূমিকায় বঙ্কিম বাবুর জীবনী বর্ণিত হইয়াছে, উহা সংক্ষিপ্ত ও সহজ হইলেও নীতি উদ্ধারের চেষ্টায় সরস হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে বঙ্কিমের পূর্ব্বে গদ্য সাহিত্যের কিরূপ অবস্থা ছিল তাহা অনাড়ম্বরে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, গবেষণার উৎকট চেষ্টায় এই সমস্ত বিষয় প্রায়শই বিরক্তিকর হয় কিন্তু হারাণ বাবু কয়েকটি শ্রেষ্ঠ লেখকের প্রসঙ্গে সাহিত্যের দশ নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন, মোটের উপর সন্দর্ভটী বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায় হইতে বঙ্কিম বাবুর প্রতিভা সম্পূর্ণরূপে অবলম্বনীয় বিষয় হইয়াছে; "তৎপূর্ব্বে সাহিত্যে রসিকতার উপলক্ষে অশ্লীলতার কলুষ স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল, কিন্তু "ভাঁড় যতই 'তুখোড়' হউক না কেন সে চিরদিনই ভাড়"* কথাটি গুপ্তকবিকে লক্ষ্য করিতেছে কি না জানি না, তবে বঙ্কিম বাবু সাহিত্যে প্রথম "নির্ম্মল শুভ্র সংযত হাস্য" আনয়ন করেন—রবি বাবুর এই উক্তিটী গ্রন্থকার বিশেষ করিয়া বুঝাইয়াছেন, মুনি ঋষির ন্যায় প্রশান্ত পুরুষেরাও হাসিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের গম্ভীর শ্রী আরও উজ্জল হইয়া উঠে; নবরসের মধ্যে যে হাস্যরস স্থান পাইয়াছে, তাহার অর্থ করুন বৃষ্টি নহে, বঙ্কিম বাবুই বোধ হয় বঙ্গ সাহিত্যে প্রথম প্রমাণ করিয়া থাকিবেন। গ্রন্থকার বলিতেছেন বঙ্কিম বাবু স্বীয় উপন্যাসে শুধু সমাজের প্রতিবিম্ব দান করেন নাই, তিনি সৌন্দর্য্যের অমর আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছেন, এই হিসাবে তিনি কপাল কুণ্ডলাকে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন, এই চিত্র যেন রমণীয়তার স্বপ্ন বা প্রহেলিকার স্বরূপ, মনুষ্য সমাজ হইতে পবিত্র ব্যবধানে বনবিহারিণী স্বভাবের ফুল পল্লবের পার্শ্বে কাপালিকের ন্যায় এক উৎকট দর্শন কল্পনার ছায়ায় জগৎমোহিনী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, এই চিত্র যেন সৌন্দর্য্যের স্বীয় অবয়ব স্বপ্নের এক সুকোমল ভঙ্গপ্রবণ কুহক। বঙ্কিম বাবু যেস্থানে সৌন্দর্য্য কল্পনার বিশালতা ভুলিয়া নীতি শাসিত ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আসিয়া পড়িয়াছেন, সে সব স্থলে তিনি ইচ্ছা করিয়া খাটো হইয়াছেন। হারাণ বাবু বলেন—

"শাস্ত্র কথা এবং নীতি উপদেশ আমরা মাথার মণি বলিয়া জানি।† কিন্তু তুমি কবি, তুমি যে সকলের কঠোর শাসনে চরিত্রগুলিকে খর্ব্ব কর কেন? যদি সে সকল জানিতে হয় "মূল শাস্ত্র ছাড়িয়া তোমার ঐ "উদ্ধৃত" ও "সংক্ষিপ্ত" নীতিই বা আমি পড়িব কেন? তুমি কবি, তুমি শাস্ত্র ও নীতিকে লক্ষ্য করিবে বটে কিন্তু একমাত্র লক্ষ্য করিলে চলিবে না। সংসার, সমাজ ও দেশ সংযত এবং উন্নত করিবার জন্য মহাগ্রন্থ "মনুসংহিতা" রহিয়াছে, "স্মৃতি" রহিয়াছে "দায়ভাগ" রহিয়াছে, আরও কতশত গ্রন্থআছে, আমি সেই আসল ছাড়িয়া তোমার নিকট নকল শাস্ত্র শুনিব কেন? ত্রিকালজ্ঞ ঋষি ছাড়িয়া তোমার নিকট সে সব তত্ত্ব জানিতে আমার প্রবৃত্তি হইবে কেন? তুমি কবি তুমি এমন জিনিষ দেও যাহা আমার মনে ধরে।"‡

দেবীচৌধুরাণী প্রভৃতি পুস্তকে বঙ্কিম বাবুর প্রতিভার অবনতির কথা উল্লেখ করিয়া লেখক বলিতেছেন ঃ—

"তাঁহার মানস সৌন্দর্য্যের হাট তখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ফড়ে ও দালালগণ সেই ভাঙ্গা হাট নিজেদের বলিয়া সাব্যস্ত করিতে লাগিল এবং তাহারই দু একটা ভাঙ্গা দোকান ঘর লইয়া একটু আধটু মেরামত করিয়া নানা ছাঁদে নানা ফাঁদে "সাহিত্য বেসাতে" প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের মূলধন নাই, পুঁজিপাটা নাই কেবল বঙ্কিমের উচ্ছিষ্ট ধর্ম্মকর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা লইয়া "পুরাতন বোতলে নূতন মদ আমদানীর ন্যায়" তাহারা মহা সোরগোল আরম্ভ করিয়াদিল।"¶

গ্রন্থকার ভ্রমরের চরিত্রে হিন্দু রমণীর আদর্শ রক্ষিত হয় নাই, ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভ্রমর পরিপূর্ণ মানময়ী, তাঁহার সম্যক অভিব্যক্ত পাতিব্রত্যের অন্তরালে এই মানের অভিনয় ভালবাসার অন্তপ্রবাহিত গূঢ় তেজ বিজ্ঞাপন করিতেছে বলিয়া আমরা মনে করি। হারাণ বাবু এই মানের অর্থ ভিন্ন রূপ বুঝিয়াছেন। কিন্তু এদিকে তিনি প্রতাপ সম্বন্ধীয় "সুপ্তসিংহ যেন গর্জ্জিয়া উঠিল" প্রভৃতি অংশ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, "এরূপ জিতেন্দ্রিয় সংযমী পরার্থপর বীরচরিত্র হিন্দুকবি ভিন্ন কে আঁকিতে পারে" গল্প হিন্দু শাস্ত্রে লিখিত আছে "পরস্ত্রী মাতৃবৎ"। "কি বুঝিবে সন্ন্যাসি, যোড়স বর্ষ আমি শৈবলিনীকে কত ভালবাসিয়াছি" বলিয়া যে পরস্ত্রীপরায়ণতার দর্প করিতে পারে, সে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে আদর্শ বীর বলিয়া গণ্য হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। প্রতাপ শৈবলিনীকে জননী কি ভগিনী বুঝিয়া ভালবাসে নাই, একটা সৌন্দর্য্যের লিপ্সা, যাহা নিমগ্ন হইলে ইন্দ্রিয়দোষদুষ্ট হয় এবং একান্ত উদ্বেগ হইলেও নৈতিকব্রতের ওজন রাখিতে পারে না—পরস্ত্রীর প্রতি এই বৃত্তি শাস্ত্র অনুমোদন করিবেন কিনা সন্দেহ স্থল, অন্ততঃ আমরা সামাজিক হিসাবে এই বৃত্তির প্রশ্রয় দিতে পারি না, কবিত্ব বলিয়া সাহিত্যে মর্যাদা দেখাইতে পারি।

* বঙ্গ সাহিত্যে বঙ্কিম ১৫ পৃঃ।

* ১৩১ পৃঃ।
† ১৩২ পৃঃ।
‡ ১২৮ পৃঃ।
¶ ১৭৭ পৃঃ

বঙ্কিম বাবুর ভাষা সম্বন্ধে হারাণ বাবু যাহা বলিয়াছেন, আমরা সে সকল বিশেষ যৌক্তিক মনে করি। শুধু ব্যাকরণের খাতিরে 'গুরো' 'প্রভো' প্রভৃতি উচ্চারণ করিয়া গণ্ড স্ফীত ও মুখ বিকৃত করিতে আমরা স্বীকৃত নহি। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা নিকট সম্বন্ধযুক্ত হইলেও ভাগিরথীকে ফিরিয়া গোমুখীতে লইয়া যাওয়া এবং বঙ্গভাষাকে সংস্কৃতের বিভক্তি বিধান শিখিতে উপদেশ দেওয়া তুল্যরূপ বাতুলতা মনে করি। কিন্তু বৈয়াকরণবর্গের ভয় যে আমরা একবারে ছাড়িতে পারিয়াছি তাহা নহে। মধ্যে মধ্যে মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধ পড়িয়া ছেলেদের জুজুর ভয়ের ন্যায় আমাদেরও রচনায় ভুল পড়িবার একটা আশঙ্কার উদয় হয়, তাহা না হইলে হারাণ বাবুর ন্যায় প্রতিষ্ঠাপন্ন লেখকও "তেজস্বিণী উক্তি" "মর্ম্মস্পর্শিণী ভাষা" প্রভৃতি কথার প্রয়োগ করিতে কষ্ট স্বীকার করিবেন কেন? আমরা সূত্র অগ্রাহ্য করিয়াছি কিন্তু সম্যকরূপে ব্যায়াকরণ-ভীতি-বিরহিত জীব হইয়া দাঁড়াইতে পারি নাই। এ রোগের উপায় কি? বঙ্কিম বাবুকেও দুর্গেশ নন্দিনীর "নরহস্ত খাদিত" পদ পরিবর্ত্তিত করিতে হইয়াছিল।

হারাণ বাবু কবিগণের বাহ্য জীবনের ততটা মূল্য দিতে যেন ইচ্ছুক নহেন, কাব্য খুজিলেই কবিকে পাওয়া যায়, এ কথা কতক পরিমাণে ঠিক—কিন্তু কাব্য অপেক্ষাও জীবনেই বেশী জীবন্ত ক্রীড়া করিয়া থাকেন। সেই জীবনের কেহ একখানি পূর্ণ প্রতিকৃতি দিতে পারিলে তাহা কত সুন্দর হয়। দীনবন্ধু বাবু মরিবার পূর্ব্বে পায়ের ব্রণের দিকে তাকাইয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিয়াছিলেন "ফোঁড়া এখন আমার পায়ে ধরিয়াছে।" এই কথায় তাঁহার স্বভাবদত্ত প্রকৃত রহস্য শক্তির উপর কেমন এক করুণ সৌন্দর্য্য পড়িয়াছে! একখানি গবেষণাসংকুল উৎকট বৃহদায়তন পুস্তকের উপর বঙ্কিম বাবু এক বিন্দু সরবৎ ফেলিয়া বলিয়াছিলেন "এক ফোঁটা পড়িল, এখন পিপড়ে জুটিবে।* এই রহস্য বঙ্গদর্শন সম্পাদকেরই যোগ্য। হারাণ বাবু বঙ্কিম বাবুর চাকুরীর প্রতি ঘৃণার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন "তিনি প্রায়ই বলিতেন কোন উপায়ে গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী আয় হইলে চাকুরী ছাড়িয়া দিব।" শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই প্রবন্ধ লেখককে বলিয়াছেন একদিন সত্য সত্যই বঙ্কিম চাকুরী ছাড়িতে স্থির করিয়া দারিদ্র্যে অভ্যস্থ হইবার জন্য অতি অল্প দরের জুতা কিনিতে এক দেকানে গিয়াছিলেন, চিরদিন গোরার হাতের জুতা ব্যবহার করিয়া অভ্যাস, অল্প মূল্যের জুতা হাতে লইয়া বঙ্কিম বাবুর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। দূর, আত্মাকে কষ্ট দেওয়া ঠিক নহে।" বলিয়া বঙ্কিম বাবু চাকুরী ছাড়ার অভিপ্রায় ত্যাগ করিলেন।" জীবনে অনেক কথা ও ঘটনা আছে যাহা পড়িলে কবিকে ভাল করিয়া চেনা যায় ও কাব্য কথার স্বাদ ভাল করিয়া পাওয়া যায়। ইহা লেখাই বাহুল্য।

ভূমিকায় হারাণ বাবু লিখিয়াছেন "এই জীবনীর শেষ ভাগে বঙ্কিমের জন্ম-পত্রিকার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম। জ্যোতিষ শাস্ত্রজ্ঞ পাঠক তাহা হইতে বঙ্কিমের ভাগ্যফল মিলাইয়া লইবেন।

আমরা কিন্তু পুস্তক খুঁজিয়া উহা পাইলাম না, মুদ্রাযন্ত্রের ভূতগণ বঙ্কিমের জন্মপত্রিকা আত্মসাৎ করিয়াছে কি?

উপসংহারে বক্তব্য—"বঙ্গ সাহিত্যে বঙ্কিম" আমরা সাগ্রহে আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছি। গ্রন্থকার বঙ্কিম বাবুর প্রতি ভক্তিতে গদ্গদকণ্ঠ, কিন্তু তাঁহার দোষ দেখাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। এই পুস্তক একখানি মূল্যবান সমালোচনা গ্রন্থ। ইহা নব্য বঙ্গ সাহিত্যের ক্ষুদ্র আলমারাটির এক কোণ উজ্জ্বল করিবে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

* এই গল্পটি শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি।
প্রঃ লেঃ।

গান।

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালী।

অয়ি মম হৃদয়কুঞ্জঅভিসারিকা
আজি রজনী-তিমির অবগুণ্ঠিতা
ত্রাসে নিখিল পৌরবধূকুণ্ঠিতা
এস ত্রস্ত বিশদবাস-লুণ্ঠিতা
মম তৃষিত হৃদয়মনোহারিকা।

এস চকিতচরণ মণি-চঞ্চলা
এস ত্বরিত শিথিল-চারু অঞ্চলা
এস প্রণয়রিক্তপুরপ্রাঞ্চলা
মম আকুল-হৃদয়ব্যথা-হারিকা।

এস বিলাসভূষণভূষারিক্তা
এস পুলকশিহর-স্বেদসিক্তা
এস চিত্ত-কমল-অভিষিক্তা
মম সর্ব্বসার্থক-কারিকা।
মম হৃদয়কুঞ্জ অভিসারিকা॥

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

২৬ নং স্কট্‌স্ লেন্, ভারতমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাসপ্রণীত
বালকবালিকাদের উপযোগী চমৎকার নূতন ছবির বই।

হাসিমুখ

সম্পূর্ণ নূতন ধরণে লেখা। বালকবালিকারা পাইলে আনন্দে উৎফুল্ল হইবে। কুন্তলীন প্রেসে উৎকৃষ্ট বিলাতী কাগজে বিভিন্ন রঙের কালীতে সুচারুরূপে মুদ্রিত।

মূল্য ।৵০ ছয় আনা। ডাক মাসুলাদি স্বতন্ত্র।

কলিকাতা,

২০৮।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট প্রদীপ কার্য্যালয়ে গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীমতী গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী।

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

তৃতীয় ভাগ। } আশ্বিন, ১৩০৭। {১০ম সংখ্যা।

কবির প্রতি কবি-প্রিয়া।

হে কবি,
একা এ বিজন ঘরে,
এ বাদল ঝরঝরে,
না জানি সে কি তোমারে
দিতে সাধ যায়,
তোমার অতৃপ্ত ক্ষুধা,
মিটাতে সে কোন্ সুধা,
আনিয়া আহরি প্রিয়,
পিয়াব তোমায়?
ঘন ঘনচ্ছায়ে ঘোর,
আকুল অন্তর মোর,
নবরূপে চাহে বঁধূ,
সঁপিতে আপনা;
বিলসে বিদ্যুৎ শিখা,
ত্যজহ অলস লিখা,
দূর—দূর কর কল্পনা।
ওই যে প্রান্তর ভূমে,
আকাশ পড়েছে নুয়ে,
মিশেও মেশেনি দুটী
তৃষার্ত্ত অধর,
হে আমার প্রিয়পাখী,
ওই লাজ বাধা মাখি,
মোরে কি নবীন করি
করিব গোচর?
কিবা ঐ, ঘনশ্যামনীপকুঞ্জে,
নবশ্যামতৃণপুঞ্জে,
ডুবাইয়া শ্যামল অঞ্চল,
মাজিয়া এ শ্যাম কায়
শাঙ্গন দিবার প্রায়
ক'রে দিব তোমারে বিহ্বল।
নিঃশেষে করিয়া পান—
ধরিবে নবীন গান;
—গুরুগুরু গম্ভীর মেঘের!
চকিত জগৎবাসী
চমকি, চাহিবে আসি,
বিসরি অলস হাসি
বিলাস বধূর।
কিম্বা, ওই বাতায়নে পশি,
এই কৃষ্ণ কেশরাশি,
খুলে তরঙ্গিয়া দিব
তিমির নিঝর।

তাহা হ'তে ল'য়ে মসী,
তুমিগো লিখিবে বসি,
বরষা মঙ্গলগীতি
ঘন—ঘনতর।
নীরদ সোপানাবলী
অতিক্রমি যাবে চলি
অভিমানে, গরবিনী
সপত্নী কল্পনা!
আমি মোর রাজ্য মাঝে
প্রবেশি নবীন সাজে,
রচিব নবীন উৎস,
নবীন জল্পনা,
রহি অন্ত অন্তরাল,
দিব সঁপি রুদ্র তাল,
বাজিবে গো মৃদঙ্গ গভীর!
হয়ে সে আরাবাক্রান্ত
টুটে যাবে বাহুবন্ধ;—
—দূরিবে অধর দ্বন্দ্ব
লাজে দম্পতীর।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

কাব্য ও কবিত্ব।

যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করেন, কাব্য ত অনেক পড়ি, প্রকৃত কবি কে তাহা কিরূপে নির্ণয় করিব? তদুত্তরে আমি বলি,—কোনও কবির কাব্যের কোনও অংশ পাঠ কর, পাঠ করার পরেও যদি মনে প্রশ্ন হয়—ইহাতে কবিত্ব আছে কি না? তবে খুব সম্ভব তাহার মধ্যে প্রকৃত কবিত্ব নাই। প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ বলিয়াছেন—

"অবিদিতগুণাপি সৎকবিভণিতিঃ কর্ণেষু বমতি মধুধারাং।"

অর্থ—সৎকবির কাব্যের কোথায় কি গুণ আছে জানিবার পূর্ব্বেই শ্রুতিমাত্র তাহা যেন কর্ণে মধুধারা বমন করে।

কথাটা ত ঠিক। কোনও সুগৃহিণীর পরিপক্ক ব্যঞ্জন যখন আস্বাদন কর, তখন তাহাতে কোন্ কোন্ মসলা আছে, এবং কোন্ মসলাখানি কি মাত্রায় দিয়াছে, তাহা জানিবার পূর্ব্বে কি মন আনন্দ রসে মগ্ন হয় না? ব্যঞ্জনের যেমন স্বাদ কাব্যের তেমন কবিত্ব,—কিসে আছে তাহা জানি না, কিন্তু আছে এইমাত্র জানি। শরীরের যেমন একটা রসনা আছে যাহা বস্তুর স্বাদ চাখে, আত্মারও তেমনি যেন একটা রসনা আছে—যাহা সৌন্দর্য্য চাখে।

স্থূল বুদ্ধি লোকে মনে করে কাব্যের কবিত্ব বুঝি ছন্দে। সৌন্দর্য্যের সঙ্গে ও ছন্দের সঙ্গে একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে তাহা স্বীকার করি। শিশুরা মাঠে খেলিতেছে, ছুটাছুটী করিতেছে, হাসিতেছে, নাচিতেছে, তাহার এক প্রকার সৌন্দর্য্য আছে যাহাতে মন মুগ্ধ হয়; কিন্তু তাহারা গান গাইয়া, করতালি দিয়া, তালে তালে নাচুক, দেখিবে সে নৃত্য আরও কত সুন্দর দেখায়! সায়াহ্নিক আকাশে কত পাখী উড়িতেছে, গান গাইয়া গৃহাভিমুখে যাইতেছে, তাহাতে কি সৌন্দর্য্য নাই? আছে বৈকি; কিন্তু গগনের এক পার্শ্বে দেখ বলাকা মালা গাঁথিয়া তালে তালে উড়িতেছে, আহা! তাহা কি সুন্দর। এইরূপে সর্ব্বত্রই দেখা যাইবে ছন্দ ও তালের সঙ্গে সৌন্দর্য্যের, সুতরাং কবিত্বের একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে।

কবিত্বের সঙ্গে ছন্দের চির সম্বন্ধ আছে, কিন্তু তাহা বলিয়া ছন্দই কবিত্ব নয়। তাহা যদি হইত ছন্দো-বন্ধন নিপুণ শ্রুতিজীবী কবি মাত্রেই সুকবি বলিয়া পরিচিত হইতে পারিত, এবং ইংরাজ কবি Browningএর ন্যায় ভাবজীবী অথচ প্রকাশে অপটু কবিগণ কবিত্ব-প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন না। মানব জীবনের সকল বিভাগের ন্যায় কবিত্ব বিভাগেও অভ্যাসজনিত একটা বিপদ আছে। যেমন লৌকিক সদাচারে প্রতিদিন দেখিতেছি মানুষের কতকগুলি সৌজন্য ও সদাচারের ভাষা অভ্যস্ত ও মুখস্থ হইয়া যাইতেছে, যাহার অন্তরালে প্রাণ থাকিতেছে না; প্রকৃত সদাশয়তা থাকিতেছে না; তেমনি কাব্য-জগতেও কতকগুলি ছন্দোবন্ধ বাণী শুনিয়া শুনিয়া ললিত পদাবলী লোকের কর্ণে লাগিয়া থাকিতেছে, ছন্দ রচনা করিতে বসিলেই সেগুলি অজ্ঞাতসারে আসিয়া পড়িতেছে। এই ললিত পদাবলী সংযুক্ত ছন্দোবন্ধ বাণী কবিতার মত দেখাইলেও কবিতা নয়। ইহা ভ্রমর গুঞ্জনের ন্যায় কর্ণেই গুণ্ গুণ্ করে, প্রাণকে কিছুই দেয় না, হৃদয়ে কিছুই জাগায় না। প্রকৃত কবির পক্ষে এই একটা বিঘ্ন, যাহা সরাইয়া তবে তাঁহাকে কাব্য রচনা করিতে হয়।

কবিত্বের সহিত ছন্দ আছে, অথচ ছন্দ যেমন কবিতা নয়, সেইরূপ কবিতার সঙ্গে অলঙ্কার থাকে—অথচ অলঙ্কার কবিত্ব নয়। কবির ভাবাবেশে আবিষ্ট চক্ষু ব্রহ্মাণ্ডকে স্বীয় হৃদয়ের ভাবময় দেখে; সুতরাং উপমা রূপক প্রভৃতি স্বভাবতঃই প্রসূত হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া ছন্দে অলঙ্কার বিন্যাস করিতে পারিলেই কাব্য হয় না। সৃষ্টির পদার্থ সকলের মধ্যে অনেক স্থলে পরস্পরের সহিত যে সাদৃশ্য আছে তাহা কোন কোনও মানুষের চক্ষে অধিক পড়ে। তাহা তাহাদের ভাষাতে স্বভাবতঃ প্রকাশ পায়। সেগুলি ছন্দোবদ্ধ করিলেই যে কবিত্ব হয় তাহা নহে। বরং প্রকৃত কবিকে অনেক সময়ে প্রকৃতির এই স্বাভাবিক গতিকে বাধা দিয়া কার্য্য করিতে হয়।

তবে কাব্যের কবিত্ব কোথায়? ইহা অতি কঠিন ও অতি পুরাতন প্রশ্ন। সাহিত্য দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ এই প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছেন—

বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং।

অর্থাৎ রসাত্মক বাক্যই কাব্য। কোনও ইংরাজ দার্শনিক বলিয়াছেন—Poetry is impassioned language. উভয় যেন একই কথা বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু রস কাহাকে বলে? তাহার উত্তরে বিশ্বনাথ কবিরাজ বলিয়াছেন—চিত্ত দ্রবকারী অলৌকিক চমৎকারিত্বময় আনন্দ বিশেষই রস। ইহাতে কিছুই পরিষ্কার হইল না। যাহা পরিষ্কার হইবার নহে, তাহাকে পরিষ্কার করিবার প্রয়াস পাওয়াই বৃথা। সাহিত্য দর্পণকার তাহা বুঝিয়াই বলিলেন—

ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ।

অর্থাৎ রস এমন একটা জিনিস ঠিক যেন ব্রহ্মাস্বাদের ন্যায়। ইহাও যেন অন্ধের নিকট চন্দ্রের বিবরণের ন্যায় হইল। অন্ধ জিজ্ঞাসা করিল—চাঁদ কেমন? উত্তর—থালের মত। কিছুই অন্ধ দেখে নাই। কিন্তু ব্রহ্মাস্বাদের ন্যায় একথা বলিবার একটু গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। ব্রহ্মাস্বাদ যেমন বুঝিতেই পারা যায় কিন্তু ভাঙ্গিয়া বলিতে পারা যায় না, তেমনি কাব্যের রসও আস্বাদন করা যায়, কিন্তু বর্ণন করা যায় না। সেই ব্যঞ্জনের দৃষ্টান্ত।

তবে কি কাব্য পড়িয়া কবিত্ব নির্দ্ধারণের কোনও উপায় নাই? আছে। সেই উপায় নির্দ্দেশ করিবার পূর্ব্বে কবির প্রধান লক্ষণ যে তন্ময়তা, তাহার একটু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। তন্ময়তার অর্থ বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত একীভূত হওয়া, তাহার মধ্যে ডুবিয়া যাওয়া এবং তাহার মধ্যেই বাস করা। কোন কোনও মানুষের এ বিষয়ে একটা স্বাভাবিক শক্তি থাকে। জনসমাজের লোকের সহিত মিশিবার সময় আমরা এই তন্ময়তা-শক্তির তারতম্য প্রতিদিন লক্ষ্য করি। একজন একটি মাতালের গল্প করিতেছেন—আপনাকে সেই মাতালের অবস্থাতে ফেলিয়া তাহার প্রত্যেক গতিবিধি তাহার বাক্য ও তাহার সুর, সমুদয় যথাযথ দেখাইতেছেন। আর এক জনের মুখে সে গল্প সেরূপ শুনায় না, কারণ তিনি তন্ময়তা-শক্তিতে হীন। এই তন্ময়তা-শক্তির অল্পতা হইলে লোকে ভাল অভিনেতা বা অভিনেত্রী হইতে পারে না। এই তন্ময়তা ভিন্ন কেহ সুনিপুণ পুরাবৃত্তবিৎ হইতে পারে না। ভূতকালের ঘটনা সকলের অস্থিকঙ্কাল যোজনার নাম ইতিবৃত্ত লেখা নহে, যে লেখক তন্ময়তা গুণে আপনাকে সেই সকল ঘটনার মধ্যে ফেলিয়া তাহাদের গূঢ় সম্বন্ধ ও অন্তর্নিহিত ভাব ধরিতে পারেন না, তিনি ইতিবৃত্ত লিখিবার মানুষ নহেন। কেবল সাহিত্য, অভিনয় বা ইতিবৃত্ত রচনাদির জন্যই যে তন্ময়তার প্রয়োজন তাহা নহে। তন্ময়তার তারতম্য অনুসারে মানব চরিত্রেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। দীন জনের দুর্ভিক্ষ ক্লেশের কথা শুনিয়া তুমি কাঁদিলে, আর একজন কাঁদিলেন না, ভিতরের কথা এই, তুমি তন্ময়তা শক্তির গুণে সেই দরিদ্রদিগের অবস্থাতে আপনাকে ফেলিয়া তাহাদের সমুদয় ক্লেশ যেন নিজে পাইলে—ইহাকেই বলে সমদুঃখসুখতা; অপর ব্যক্তি তাহাদের অবস্থাতে আপনাকে ফেলিতে পারিলেন না, এইমাত্র প্রভেদ। মহাত্মা যীশুর একটী প্রধান উপদেশ এই—"অপরের নিকট যেরূপ ব্যবহারের প্রত্যাশা কর, অপরের প্রতি সেরূপ ব্যবহার কর।" এই উপদেশের ভিত্তিও তন্ময়তার উপরে স্থাপিত। অপরের অবস্থাতে আপনাকে ফেলিতে না পারিলে আমার কোন্ ব্যবহার কাহার কিরূপ লাগে তাহা ত ধরিতে পারি না। অতএব জগতের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূলে তন্ময়তা।

এই তন্ময়তা শক্তি কবি হৃদয়ে দুই ভাবে কার্য্য করে। প্রথম সৌন্দর্য্য চিত্রণে, দ্বিতীয় সৌন্দর্য্য গঠনে। কবির এই টুকু বিশেষত্ব যে তিনি সৃষ্টির গূঢ় সৌন্দর্য্যের মধ্যে প্রবেশ করেন। মধুকর যেরূপ পুষ্পোপরি বসিয়া তাহার

অসার ভাগ বর্জ্জন পূর্ব্বক একেবারে তাহার মধুতে গিয়া উপনীত হয়, তেমনি কবিচিত্ত সৃষ্টির উপরে পড়িয়া তাহার অস্থি মজ্জাস্থিত সৌন্দর্য্যে গিয়া উপনীত হয়। তুমি আমি কবিত্ব বিহীন চক্ষে যেখানে গাছ পাথর, ছাই মাটী দেখিতেছি, সেখানে তিনি পদার্থ সকলের মধ্যে অপূর্ব্ব যোগ, অপূর্ব্ব মিলন দেখিতে পান; এবং সেই সৌন্দর্য্যের প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হৃদয়ে ধারণা করেন। এই যে সৌন্দর্য্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ধারণা ইহা হইল তন্ময়তায় চিত্রণ শক্তি। গঠন শক্তি ইহা অপেক্ষাও বিস্ময়জনক। তন্ময়তায় গঠন শক্তির প্রভাবে, কবি চিত্ত ভিন্ন ভিন্ন সৌন্দর্য্যের অঙ্গ একত্র সন্নিবিষ্ট করিয়া অপূর্ব্ব নূতন চিত্র সৃষ্টি করে। ইহা সুনিপুণ চিত্রকরের নব সৃষ্টির ন্যায়! কবির প্রতিভা বলে সংমিশ্রণ কার্য্যটী এমন স্বাভাবিক ভাবে সম্পন্ন হয়, যে তাহার মধ্যে আর দুই বা ততোধিক পদার্থের গন্ধও পাওয়া যায় না; নূতন চিত্রটা নূতন সৃষ্টি বলিয়াই মনে হয়। এই জন্যই তন্ময়তার এই শক্তিকে গঠন শক্তি বলা হইয়াছে।

কিন্তু কবিদের তন্ময়তা কেবল মাত্র বর্ণনীয় বিষয়ে আপনাকে ফেলা নহে, কেবলমাত্র সৌন্দর্য্য চিত্রণ ও গঠন নহে। তাহার মধ্যে একটা প্রেমের আবেশ আছে। কুমার সম্ভবের পঞ্চম সর্গে যেখানে পার্ব্বতী ছদ্মবেশধারী হরের মুখে হরনিন্দা শুনিয়া কোপাবেশে সেখান হইতে চলিয়া যাইতে চাহিতেছেন, কিন্তু তৎপরক্ষণেই নিজ মূর্ত্তিধারী হরের সহিত চারি চক্ষে মিলন হইয়া আর যাইতে পারিতেছেন না, সেখানে কালিদাস বলিতেছেন—

শৈলাধিরাজ তনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ,

অর্থ—"গিরীশ-নন্দিনী হায়! পড়িয়া বিপাকে,
যাইতে ভুলিয়া পদ না যায় না থাকে।"

কেন হরের সহিত চক্ষে চক্ষে মিলন হইয়া গৌরী আর যাইতে পারিতেছেন না? সে দৃষ্টির মধ্যে কি আছে তাহা কবি তৃতীয় সর্গে পূর্ব্বে বলিয়াছেন ঃ—

হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্ত ধৈর্য্যঃ
চন্দ্রোদয়াবন্ত ইবাম্বুরাশিঃ
উমা-মুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে
ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি।

ভাবটা এই—

উথলে জলধি যথা পূর্ণ চন্দ্রোদয়ে
উথলিল কি তরঙ্গ হরের হৃদয়ে!
ধৈর্য্য সেতু লঙ্ঘি যেন ছুটিল সে বারি,
উমা মুখে বিম্বাধরে চাহিলা নেহারি,
কি দৃষ্টি সে দৃষ্টি তাহা কে করে বর্ণন!
ডুবিল মজিল যেন হরের লোচন।

পাঠক দেখিতেছেন এত কথা বলিয়াও কালিদাসের অদ্ভুত ব্যাপারয়ামাস শব্দটার গূঢ়ার্থ প্রকাশ করিতে পারিলাম না। সেই গূঢ়ার্থের মধ্যেই সেই বিপাক টুকু আছে, যাহাতে পড়িয়া গৌরী গমনোন্মুখ পা খানি তুলিয়াও যাইতে পারিলেন না। এখানে আমরা কি দেখিতেছি? প্রণয়ি-যুগলের হৃদয়ে যখন প্রেমের জন্ম হয়, তখনকার অবস্থা কবি যথাযথরূপে চিত্রিত করিয়াছেন, তন্ময়তার প্রভাবে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। কেবল কি এই মাত্র? এ কথা কি সত্য নহে যে পূর্ব্বোক্ত কয়েক পংক্তিতে কেবলমাত্র তন্ময়তার একটা খেলা নাই; কিন্তু অপূর্ব্ব সরসতাও আছে। কবি মানব-হৃদয়ের তাজা তাজা ভাবের নিকটে আমাদিগকে উপস্থিত করিতেছেন; নিজে সেই রসে রসিয়া আমাদিগকে তাহার আস্বাদন দিতেছেন। মানব প্রকৃতিকে প্রেমের চক্ষে না দেখিলে কি তন্ময়তার মধ্যে এই অদ্ভুত রস প্রবেশ করে? তাই বলিতেছি কবির যে তন্ময়তা তাহা ভাবাবেশ ও প্রেমাবেশ।

ইহাকে আবেশ বলিবার অভিপ্রায় এই, ইহা যেন এক প্রকার নেশা। ইহা সর্ব্বেন্দ্রিয়কে গ্রাস করে, চিন্তাকে পথ ভ্রান্ত করে, হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে, ভাবরাশিকে আন্দোলিত করে। এই আবেশে যাহাকে না ধরে, তাহার হাত দিয়া প্রকৃত কবিতা বাহির হয় না। ইহা যেন কাঁচপোকার তেলা পোকা ধরার ন্যায়। আবেশে ঘাড়ে ধরিয়া লেখায়, না লিখিয়া নিস্তার নাই। এই আবেশটা যেন ভিয়ানের পাক, ইহার ভিতর দিয়া যে শব্দটা আসে সেটা মিষ্ট, যে অলঙ্কারটা আসে সেটা মিষ্ট, যে ছন্দটা ফুটিয়া উঠে সেটা মধুর। আর এই আবেশে না ধরিলে কবিতা লিখিবার প্রয়াস পাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

এই আবেশের আর একটা স্বভাব এই যে ইহা কবিকে একাকী করে, পাঠকের কথা আর মনে থাকে না। যাহাতে পাঠকের কথা মনে থাকে, তাহা কবিতা নহে, তাহা বক্তৃতা।

এই খানেই জগতের কবিনামখ্যাত ব্যক্তিগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইতেছেন। কবিনাম খ্যাত এই জন্য বলিতেছি যে

কবি নামে পরিচিত সকল ব্যক্তিই প্রকৃত কবি নহেন। উক্ত দুই দলের আভাস অগ্রেই কিঞ্চিৎ দিয়াছি। এক দলকে বলিয়াছি, শ্রুতিজীবী; অপর দলকে বলিয়াছি ভাবজীবী। শ্রুতিজীবী অর্থাৎ যাহারা পাঠকের ও নিজের শ্রুতি বা শ্রবণেন্দ্রিয়কে অবলম্বন করিয়াই কাব্য রচনা করেন। প্রত্যেক শব্দটী ব্যবহার করিবার সময় ভাবেন না, হৃদয়ের ভাবরাশি বাহিরে আসিল কি না, কিন্তু কেবল এই ভাবেন এ শব্দটা লোকের কাণে কেমন লাগিবে, লোকে পছন্দ করিবে কি না? রঙ্গ ভূমির অভিনেতা যেমন নির্জ্জন ঘরে বসিয়া অভিনেয় বিষয় শিখিবার সময়েও দর্শকের মুখ ভুলিতে পারে না, তেমনি এই শ্রুতিজীবী কবিরাও নির্জ্জনে বসিয়া লিখিবার সময় পাঠকের কর্ণ ভুলিতে পারেন না।

ভাবজীবী কবিগণ অন্য প্রকার। তাঁহারা নিজ হৃদয়ের উদ্বেলিত ভাবসিন্ধুর জলে নিমগ্ন থাকেন। যে শব্দটী ব্যবহার করেন তাহাতে কেবল এই দেখেন, অন্তরের উদ্বেলিত ভাবটা ঠিক ভাষাতে প্রকাশ হইল কি না? নিজ প্রকৃতির পূর্ণতা ও পরিণতিতেই তাঁহাদের প্রধান সুখ, অপরের স্তুতি নিন্দা মনেই আসে না।

পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইল তাহা হইতে কাব্য পাঠ করিয়া প্রকৃত কবিত্ব ধরিবার একটী সংকেত পাওয়া যাইতেছে। সেটী এই,—উক্ত কবিতা তোমার চিত্তকে তন্ময়তার আবেশে আবিষ্ট করিতেছে কি না, অর্থাৎ তুমি কবির বর্ণিত বিষয়ে অবগাহন করিয়া আপনাকে হারাইতেছ কি না?

একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। স্কটলণ্ড দেশীয় কবি Robert Burns সুকবি বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ। গীতি কাব্য বিষয়ে Burns অদ্বিতীয়। To Marry in Heaven বলিয়া তাঁহার একটী কবিতা আছে, অনেকে বলিয়া থাকেন, উক্ত কবিতাটী তাঁহার গীতিকাব্যের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এ জন্য তাহা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। কবি প্রণয়িনীর সহিত বিদায় ও বিচ্ছেদের দিনের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন ঃ—

That sacred hour can I forget?
Can I forget the hallowed grove
Where by the winding Ayr we met,
To live one day of parting love!
Eternity will not efface
Those records dear of transports past!
Thy image at our last embrace,
Ah little thought we 'twas our last!
Ayr, gurgling kissed his pebbled shore,
O'er hung with wild wood's thikening green;
The fraguant birch; and hawthorn hoar
Twined amorous round the rapturous scene;
The flowers sprung wanton to be pressed,
The birds sung love on every spray,
Till too, too soon, the glowing west,
Proclaimed the speed of winged day.

ভাবার্থ

সেই শুভক্ষণ আমি ভুলিব কেমনে?
কিসে ভুলি সে নিকুঞ্জ, সে পবিত্র ভূমি?
যথা আয়ারের তীরে মিলিনু দুজনে,
যথা সে বিদায় দিনে সঙ্গে ছিলে তুমি!
হায় সে সুখের স্মৃতি এ হৃদয় হতে,
মুছিবে না মুছিবে না অনন্ত জীবনে,
কি দেখিনু মুখ তব অতুল জগতে!
বাঁধিনু তোমারে যবে প্রেম আলিঙ্গনে।
হায়রে নরের ভাগ্য! জানি নাই তবে,
সেই শেষ আলিঙ্গন দোঁহার এ ভবে।

আয়ার সুকলনাদে উপলে চুম্বিয়া,
কেমন বহিতেছিল ঘন কুঞ্জ মাঝে.
সুরভি সে বার্চ্চতরু ছিল আলিঙ্গিয়া
শ্বেতকান্তি হথরণে কি মোহন সাজে!
কিবা সে অগণ্য ফুল ফুটিয়া সোহাগে
ঢল ঢল ছিল যেন আলিঙ্গন আশে!
শাখে শাখে পাখী কিবা মিলি অনুরাগে,
ঢালিল সুস্বরধারা নিকুঞ্জ বাতাসে!
ক্ষণেক ক্ষণেক মাত্রে মিলাল সে সুখ,
গেল দিন, ঢাকে তম ধরণীর মুখ।

পূর্ব্বোক্ত কয়েক পংক্তি কেন সর্ব্বজনের নিকট প্রকৃত কবিতা বলিয়া আদৃত হইয়াছে? নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিতে করিতে কি চিত্তের মধ্যে এক প্রকার তন্ময়তার আবেশ আসে না? দৃশ্য স্পৃশ্য, ভোগ্য জগতকে ভুলিয়া চিত্ত কি আয়ারের তীরে নিকুঞ্জ মধ্যে যেখানে প্রণয়িযুগল পরস্পরকে আলিঙ্গনে বাঁধিতেছে সেখানে উপস্থিত হয় না? মার্কিন ঋষি এমারসন এক স্থানে বলিয়াছেন,—All mankind love a lover—সমস্ত মানবজাতি প্রণয়ীকে ভালবাসে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কয়েক পংক্তিতে কবি তদপেক্ষা অধিক কিছু বলিতেছেন—সমগ্র প্রকৃতি প্রণয় ও প্রণয়ীকে ভালবাসে। আয়ার নদ তীর চুম্বিয়া চলিয়াছে; বৃক্ষলতা পরস্পরকে প্রেমালিঙ্গনে বাঁধিতেছে; ফুল প্রেমে ঢল ঢল করিতেছে;

পক্ষী প্রেমালাপ করিতেছে; সমুদয় প্রকৃতি যেন সে দিনকার প্রণয়িযুগলের প্রেমের সুরা পান করিয়া মত্ত প্রায়। মানবে ও প্রকৃতিতে কি অপূর্ব্ব যোগ! কি তন্ময়তার অপূর্ব্ব সৃষ্টি! বার্চ্চতরুর সৌরভ যেন ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে লাগিতেছে, পক্ষীর প্রেম সংগীত যেন কর্ণে আসিতেছে। যে কাব্যে চিত্তে এই তন্ময়তা বিস্তার করিতে পারে তাহাতেই কবিত্ব আছে। এদেশে একটী আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে, যে সুপ্রসিদ্ধ গায়কগুরু তানসেন, যদি রাত্রি দ্বিপ্রহরে উষা-কালের রাগিণী ধরিতেন, তাহা হইলে কাক কোকিল ডাকিয়া উঠিত। ইহার অর্থ এই,—তিনি প্রাভাতিক সুরে প্রভাত বর্ণনা আরম্ভ করিলে শ্রোতৃগণ এমন তন্ময়তার মধ্যে পড়িয়া যাইত যে, যেন কর্ণে কাক কোকিলের ডাক শুনিতে পাইত। বাস্তবিক প্রতিভাশালী কবির কাব্যে এরূপ এক প্রকার ভেল্কী থাকে, যাহাতে ক্ষণেকের মধ্যে যেন লাগ্ লাগ্ বলিয়া এমন এক প্রকার কুহক ছড়াইয়া দেয়, যে পাঠক সে সময়ের জন্য আত্মহারা হইয়া তাঁহার বর্ণিত বিষয়ের মধ্যেই বাস করিতে থাকে। এই তন্ময়তা সৃষ্টি প্রকৃত কাব্যের প্রথম লক্ষণ।

দ্বিতীয় সংকেত উদ্দীপনা। প্রকৃত কবির কাব্যে একটা রসের অবতরণা হয়, পাঠকের হৃদয়ে একটি অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য ও প্রেমের ভাব জাগিয়া উঠে। মহানদীর আবর্ত্তের মুখে কাঠখানা পড়িলে তাহা যেমন ঘুরিয়া ফিরিয়া আবর্ত্তের অভিমুখেই যায়, তেমনি কবি এমন একটা ভাবের আবর্ত্ত সৃষ্টি করেন, যাহার মুখে পড়িয়া আমাদের চিত্তও তদভিমুখে গমন করে। যে ভাব কবির হৃদয়ে উথলিয়া কাব্যটীকে সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার কিয়দংশ আমাদের হৃদয়ে উথলিতে থাকে।

সৌন্দর্য্য বোধ ও প্রেমের শক্তি মানব মাত্রেরই হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন আছে। একটী ছয় মাসের শিশুরও সমক্ষে গোলাপটী ধরিলে, তাহার চক্ষু দুটী আনন্দে ফুটিয়া উঠে, এবং ফুলটী ধরিবার জন্য সে ক্ষুদ্র হস্তখানি প্রসারিত করে। এই যে মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বোধ, ইহা প্রস্ফুটিত হইবার জন্য উদ্দীপনার অপেক্ষা করে। সৌন্দর্য্যের সাক্ষাৎকারই সৌন্দর্য্য বোধের উদ্দীপনা। একটী শিশুকে শৈশব হইতে সুন্দর পদার্থ দর্শনে অভ্যস্ত কর, সুন্দর চিত্র-পূর্ণ চিত্রশালিকাতে বার বার লইয়া যাও, সৌন্দর্য্যের প্রকার ও প্রণালী অবধারণে অভ্যস্ত কর, দেখিবে কালে সে সুচিত্রকর বা সৌন্দর্য্যের বিচারক হইয়া উঠিবে। আর তদভাবে সে সৌন্দর্য্য বোধে অপারগ থাকিবে। কলিকাতার একজন সুপ্রসিদ্ধ ধনীর বিষয়ে এরূপ উক্ত আছে, যে তাঁহার নিজের ভবনে বা অপর কুত্রাপি গীতবাদ্যের বৈঠক হইলে, লোকে যখন তান লয় সম্বলিত সঙ্গীত রসে মগ্ন হইয়া আহা আহা করিত, তখন তিনি বলিতেন—"সব যোগ সাজোষ" অর্থাৎ গায়ক ও বাদক প্রভৃতি সকলে গৃহ হইতে পরামর্শ করিয়া আসিয়াছে, যে এইরূপ করিবে। সংগীত বিদ্যা বলিয়া যে একটা বিদ্যা আছে, সুস্বরের যে একটা মোহিনী শক্তি আছে, তান্ লয় প্রভৃতি যে আছে তাহা তিনি অনুভব করিতে পারিতেন না; কারণ শৈশবাবধি তাঁহার সুস্বর গ্রহণ শক্তি ফুটাইবার চেষ্টা করা হয় নাই। এইরূপে মানব হৃদয়ের সৌন্দর্য্য বোধও প্রসুপ্ত থাকিয়া যাইতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর আমাদিগকে অসহায় রাখেন না। তিনি যেমন আমাদের আধ্যাত্মিকতাকে ফুটাইবার জন্য সাধুহৃদয়ে ও সাধু জীবনে আপনাকে অভিব্যক্ত করেন, তেমনি কবি হৃদয়ের দ্বারা আপনাকে সুন্দররূপে অভিব্যক্ত করিয়া থাকেন। কবির হৃদয় দ্বারা জগতে যে সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি হয়, তাহাই আমাদের সৌন্দর্য্য বোধকে ফুটাইবার শ্রেষ্ঠ উপায়। এই সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তিকে উদ্দীপনা বলিয়াছি।

সৌন্দর্য্যবোধের ন্যায় প্রেমের শক্তিও মানব-হৃদয়ে, মানব-হৃদয়ে কেন জীব হৃদয়ে স্বাভাবিক। আমরা পরস্পরের সহিত বাঁধা আছি, পরস্পরের সুখের জন্য পরস্পরকে চাই। প্রেমটা জীবের পক্ষে এমনি স্বাভাবিক যে, যে সকল জীবের মধ্যে স্বাভাবিক বৈরভাব আছে, তাহাদিগকেও যদি দীর্ঘকাল একত্র রাখা যায়, তদন্তে বিচ্ছেদ ঘটাইলে তাহারাও বিচ্ছেদের ক্লেশ অনুভব করে। একটী বানর ও একটা কুকুরকে ছয়মাসকাল এক গৃহে রাখিলে পরস্পরের সহিত এমন আবদ্ধ হয় যে তদন্তে তাহাদিকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে বিচ্ছেদ যন্ত্রণা প্রকাশ করিতে থাকে। কিন্তু এই স্বাভাবিক প্রীতির ভাবও প্রস্ফুটিত হইবার জন্য উদ্দীপনার অপেক্ষা করে। প্রথম উদ্দীপনা প্রেমাস্পদের সাহচর্য্য, দ্বিতীয় উদ্দীপনা সাধুহৃদয়ে ও কবিহৃদয়ে প্রেমের অভিব্যক্তি। একজন প্রকৃত কবির হৃদয়ে আমরা প্রেমের যেরূপ অভিব্যক্তি দেখিতে পাই, এরূপ প্রায় অন্য কোথাও

দেখি না। প্রকৃতির প্রতি প্রেম, মানবের প্রতি প্রেম, ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, সমুদয় প্রেম যেন তিনি আমাদের হৃদয়ে ঢালিয়া দেন। তাঁহার প্রতিভা-পৃষ্ট সৌন্দর্য্যময় কাব্যের ভিতর দিয়া আমরা যে প্রেমের সংস্পর্শ পাই, তাহাতে আমাদের হৃদয়ের প্রেম জাগিয়া উঠে। অতএব দ্বিতীয় সঙ্কেত এই যে কাব্যে প্রাণে প্রেম জাগায় না, হৃদয়কে উন্মত্ত করিয়া তোলে না, জগতকে, মানুষকে মিষ্ট করিয়া দেয় না, মনকে প্রীতিরস-সম্বলিত সৌন্দর্য্য সাগরে নিমগ্ন করে না, তাহা প্রকৃত কাব্য নহে।

উদ্দীপনারও একটী দৃষ্টান্ত দি। মহাকবি মিল্টনের Paradise Lost নামক গ্রন্থ যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একটী ছবি দেখিয়া বিশেষ মুগ্ধ হইয়া থাকিবেন। সেটি পঞ্চম সর্গের প্রারম্ভে যেখানে সুপ্তোত্থিত আডাম নিদ্রিতা ইভকে জাগাইতেছেন সেখানে পাওয়া যায়। কবি বলিতেছেন—

Now Morn, her rosy steps in the eastern clime
Advancing, sowed the earth with orient pearl,
When Adam waked, so customed, for his sleep
Was very light, from pure digestion bred,
And temperate vapours bland, which the only sound
Of leaves and fuming rills, Aurora's fan,
Lightly dispersed, and the shrill matin song
Of birds on every bough ; so much the more
His wonder was to find unwakened Eve,
With tresses discomposed and glowing cheek,
As through unquiet rest. He, on his side
Leaning half-raised, with looks of cordial love
Hung over her enamoured, and beheld
Beauty, which, whether waking or asleep,
Shot forth peculiar graces ; then, with voice
Mild as when Zephyrus on Flora breathes,
Her hand soft touching, whispered thus : "Awake,
My fairest, my espoused. my latest found,
Heaven's last best gift, my ever-new delight !
Awake, the morning shines, and the fresh fielfl
Calls us ; we lose the prime to mark how spring
Our tended plants, how blows the citron grove,
What drops the myrrh, and what the balmy reed,
How Nature paints her colours, how the bee
Sits on the bloom extracting liquid sweet."

পূর্ব্বোক্ত অংশের অনুবাদের প্রয়াস পাওয়া বৃথা। সে প্রয়াস না পাইয়া বঙ্গের অমর কবি শ্রীমধুসূদন তাঁহার প্রণীত মেঘনাদবধ কাব্যে ইহারই অনুকরণে যে একটী চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। মেঘনাদ প্রাতে প্রবুদ্ধ হইয়া নিদ্রাগতা প্রমীলাকে জাগাইতেছেন:—

কুসুম-শয়নে যথা সুবর্ণ মন্দিরে
বিরাজে বীরেন্দ্র বলী ইন্দ্রজিৎ, তথা
পশিল কুজনধ্বনি সে সুখ সদনে
জাগিলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জবন-গীতে।
প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র মধুর স্বরে, হায় রে, যেমতি
নলিনীর কাণে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য কথা। কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি) "ডাকিছে কূজনে
হৈমবতী উষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখীকুল, মিলে প্রিয়ে কমল-লোচন,
উঠ, চিরানন্দ মোর, সূর্য্যকান্ত মণি
সম এ পরাণ কান্তে তুমি রবিচ্ছবি;
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন,
ভাগ্যবৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
আমার! নয়ন-তারা, মহার্ঘ রতন,
উঠ দেখ শশিমুখি, কেমন ফুটিছে
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম! চমকি বামা উঠিল সত্বরে,
গোপিনী কামিনী যথা বেণুর সুরবে।

পূর্ব্বোক্ত উভয় চিত্রে চিত্তে দাম্পত্য প্রেমের কি উদ্দীপনাই আনিয়া দেয়! দাম্পত্য প্রেমের মানব হৃদয়কে সুস্থ, সুখী ও উন্নত করিবার যে একটা শক্তি আছে তাহার কতকটা যেন অনুভব করি।

এই উদ্দীপনা হৃদয়ে এক প্রকার কোমলতা, সরসতা, স্নিগ্ধতা সঞ্চারিত করে, যাহা মানব জীবনের একটা প্রধান সুখ। গিরিশৃঙ্গে অনেকে ওকজাতীয় এক প্রকার বৃক্ষ দেখিয়া থাকিবেন। বৃক্ষগুলি দীর্ঘাকৃতি, রুক্ষদেহ ও শ্রী সৌন্দর্য্যহীন। তাহাদের দীর্ঘাকৃতিতে এক প্রকার গাম্ভীর্য্য আছে বটে কিন্তু রমণীয়তা নাই। ঐ সকল তরুদেহে সচরাচর নানাজাতীয় ঘননিবিষ্ট শৈবাল দেখিতে পাওয়া যায়। শৈবালগুলি রুক্ষ, শুষ্ক, কদাকার তরুদেহকে যেন মকমলের দ্বারা আবৃত করিয়া এক অপূর্ব্ব কোমল কান্তি বিস্তার করে। শৈবালগুলি সরাইয়া লও কদাকার বৃক্ষদেহ দৃষ্টিগোচর হইবে। সেইরূপ আমাদের জীবন হইতে এই ভাবময় উদ্দীপনা সরাইয়া লও, জীবন ক্ষেত্রে স্বার্থ, বিষয়াসক্তি ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার গোহাড় পড়িয়া থাকিবে। হয়ত কেহ বলিবেন যে এই উদ্দীপনা মানুষকে জীবনের প্রতি অধিক আসক্ত করে—যাহা বেদান্ত ধর্ম্মের চক্ষে অতি নিন্দনীয়! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি জীবনে বসিয়া বসিয়া জীবনকে কুৎসিত ভাবা অপেক্ষা কি জীবনের প্রতি আসক্ত হইয়া তাহাকে মিষ্ট ভাবা কি ভাল নয়? প্রকৃতিকে ভাল বাসিলে,

মানুষকে ভাল বাসিলে, জীবনকে ভাল বাসিলে সকল প্রেমের উৎস যিনি তাঁহার কাছে কাছে কি থাকা যায় না? জগদীশ্বরত এ সকলি ভাল বাসিবার জন্য দিয়াছেন। ফুলটাকে এই জন্য মধুতে পূর্ণ করিয়াছেন যে মধুকর তাহাতে বসিবে ও প্রাণ ভরিয়া মধু পান করিবে। সে যখন ফুলটার উপরে বসিতেছে তখন করতালি দিয়া তাহাকে তাড়ন যেমন, জগতও মানুষকে ভাল বাসিয়া মানুষ যখন সুখী হইতেছে তখন তাহার পশ্চাতে বেদান্ত ধর্ম্মের তালি লাগাইয়া "ওই আসক্তি ওই আসক্তি" বলিয়া তাহার সুখ টুকু ভাঙ্গিয়া দেওয়াও তেমনি। দুই নির্দ্দয়তার কার্য্য।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

শুভদৃষ্টি।

কান্তিচন্দ্রের বয়স অল্প, তথাপি স্ত্রীবিয়োগের পর দ্বিতীয় স্ত্রীর অনুসন্ধানে ক্ষান্ত থাকিয়া পশুপক্ষী শিকারেই মনোনিবেশ করিয়াছেন। দীর্ঘ কৃশ কঠিন লঘু শরীর, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, অব্যর্থ লক্ষ্য, সাজসজ্জায় পশ্চিমদেশীর মত; সঙ্গে সঙ্গে কুস্তিগির হীরা সিং, ছক্কন লাল, এবং গাইয়ে বাজিয়ে খাঁ সাহেব, মিঞা সাহেব অনেক ফিরিয়া থাকে; অকর্ম্মণ্য অনুচর পরিচরেরও অভাব নাই।

দুই চারিজন শিকারী বন্ধুবান্ধব পাইয়া অগ্রাণের মাঝা-মাঝি কান্তিচন্দ্র নৈদিঘির বিলের ধারে শিকার করিতে গিয়াছেন। নদীতে দুইটি বড় বোটে তাঁহাদের বাস, আরো গোটা তিনচার নৌকায় চাকর বাকরের দল গ্রামের ঘাট ঘিরিয়া বসিয়া আছে। গ্রামবধূদের জল তোলা স্নান করা প্রায় বন্ধ। সমস্ত দিন বন্দুকের আওয়াজে জলস্থল কম্পমান, সন্ধ্যাবেলায় ওস্তাদীগলার তান কর্ত্তবে পল্লীর নিদ্রাতন্দ্রা তিরোহিত।

একদিন সকালে কান্তিচন্দ্র বোটে বসিয়া বন্দুকের চোঙ সযত্নে স্বহস্তে পরিষ্কার করিতেছেন এমন সময় অনতিদূরে হাঁসের ডাক শুনিয়া চাহিয়া দেখিলেন, একটি বালিকা দুই হাতে দুইটি তরুণ হাঁস বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া ঘাটে আনি-য়াছে। নদীটি ছোট, প্রায় স্রোতহীন, নানা জাতীয় শৈবালে ভরা। বালিকা হাঁস দুইটিকে জলে ছাড়িয়া দিয়া একবারে আয়ত্তের বাহিরে না যায় এইভাবে ত্রস্ত সতর্ক স্নেহে তাহাদের আগ্‌লাইবার চেষ্টা করিতেছে। এটুকু বোঝা গেল, অন্য দিন সে তাহার হাঁস জলে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইত, কিন্তু সম্প্রতি শিকারীর ভয়ে নিশ্চিন্ত চিত্তে রাখিয়া যাইতে পারিতেছে না।

মেয়েটির সৌন্দর্য্য নিরতিশয় নবীন,—যেন বিশ্বকর্ম্মা তাহাকে সদ্য নির্ম্মাণ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। বয়স ঠিক করা শক্ত। শরীরটি বিকশিত কিন্তু মুখটি এমন কাঁচা যে সংসার কোথাও যেন তাহাকে লেশমাত্র স্পর্শ করে নাই। সে যে যৌবনে পা ফেলিয়াছে এখনো নিজের কাছে সে খবরটি তাহার পৌঁছে নাই।

কান্তিচন্দ্র ক্ষণকালের জন্য বন্দুক সাফ করায় ঢিল দিলেন। তাঁহার চমক লাগিয়া গেল। এমন জায়গায় এমন মুখ দেখিবেন বলিয়া কখনো আশা করেন নাই। অথচ রাজার অন্তঃপুরের চেয়ে এই জায়গাতেই এই মুখ-খানি মানাইয়াছিল। সোনার ফুলদানীর চেয়ে গাছেই ফুলকে সাজে। সে দিন শরতের শিশিরে এবং প্রভাতের রৌদ্রে নদী তীরের বিকশিত কাশবনটি ঝল ঝল করিতেছিল। তাহারি মধ্যে সেই সরল নবীন মুখখানি কান্তিচন্দ্রের মুগ্ধ চক্ষে আশ্বিনের আসন্ন আগমনীর একটি আনন্দচ্ছবি আঁকিয়া দিল। মন্দাকিনী তীরে তরুণ পার্ব্বতী কখনও কখনও এমন হংসশিশু বক্ষে লইয়া আসিতেন কালিদাস সে কথা লিখিতে ভুলিয়াছেন।

এমন সময় হঠাৎ মেয়েটি ভীত ত্রস্ত হইয়া কাঁদ কাঁদ মুখে তাড়াতাড়ি হাঁস দুটিকে বুকে তুলিয়া লইয়া অব্যক্ত আর্ত্তস্বরে ঘাট ত্যাগ করিয়া চলিল। কান্তিচন্দ্র কারণ সন্ধানে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার একটি রসিক পারিষদ কৌতুক করিয়া বালিকাকে ভয় দেখাইবার জন্য হাঁসের দিকে ফাঁকা বন্দুক লক্ষ্য করিতেছে। কান্তিচন্দ্র পশ্চাৎ হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইয়া হঠাৎ তাহার গালে সশব্দে প্রকাণ্ড একটি চপেটাঘাত করিলেন, অকস্মাৎ রস-ভঙ্গ হইয়া লোকটা সেইখানে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। কান্তি পুনরায় কামরায় আসিয়া বন্দুক সাফ করিতে লাগিলেন।

সেই দিন বেলা প্রহর তিনেকের সময় গ্রাম পথের ঘনচ্ছায়ার মধ্য দিয়া শিকারীর দল শস্যক্ষেত্রের দিকে চলিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন বন্দুকের আওয়াজ

বালিকা হাঁস দুটিকে জলে ছাড়িয়া দিয়া ত্রস্ত সতর্ক স্নেহে তাহাদের আগ্‌লাইবার চেষ্টা করিতেছে।

৩১৬ পৃষ্ঠা।

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

নবীন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, সুধাকে ?—উত্তরে শুনিলেন, হাঁ।

নবীন দ্বিধাভরে কহিলেন, তা দেখা শোনা—

কান্তি, যেন দেখেন নাই, ভাণ করিয়া কহিলেন, সেই একেবারে শুভদৃষ্টির সময়।

নবীন গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিলেন, আমার সুধা বড় সুশীলা মেয়ে, রাঁধাবাড়া ঘরকন্নার কাজে অদ্বিতীয়। তুমি যেমন না দেখিয়াই তাহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ, তেমনি আশীর্ব্বাদ করি আমার সুধা পতিব্রতা সতী লক্ষ্মী হইয়া চিরকাল তোমার মঙ্গল করুক! কখন মুহূর্ত্তের জন্য তোমার পরিতাপের কারণ না ঘটুক!

কান্তি আর বিলম্ব করিতে চাহিলেন না, মাঘ মাসেই বিবাহ স্থির হইয়া গেল।

পাড়ার মজুমদারদের পুরাতন কোঠা বাড়িতে বিবাহের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বর হাতি চড়িয়া মশাল জ্বালাইয়া বাজনা বাজাইয়া যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত।

শুভদৃষ্টির সময় বর কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন। নতশির টোপরপরা চন্দন চর্চ্চিত সুধাকে ভাল করিয়া যেন দেখিতে পাইলেন না। উদ্বেলিত হৃদয়ের আনন্দে চোখে যেন ধাঁধাঁ লাগিল।

বাসর ঘরে পাড়ার সরকারী ঠান্‌দিদি যখন বরকে দিয়া জোর করিয়া মেয়ের ঘোম্‌টা খোলাইয়া দিলেন তখন কান্তি হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন।

এ ত সেই মেয়ে নয়! হঠাৎ বুকের কাছ হইতে একটা কালো বজ্র উঠিয়া তাহার মস্তিষ্ককে যেন আঘাত করিল—মুহূর্ত্তে বাসরঘরের সমস্ত প্রদীপ যেন অন্ধকার হইয়া গেল এবং সেই অন্ধকার প্লাবনে নববধূর মুখখানিকেও যেন কালিমা লিপ্ত করিয়া দিল।

কান্তিচন্দ্র দ্বিতীয় বার বিবাহ করিবেন না বলিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; সেই প্রতিজ্ঞা কি এমনি একটা অদ্ভুত পরিহাসে অদৃষ্ট তুড়ি দিয়া ভাঙ্গিয়া দিল! কত ভাল ভাল বিবাহের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন, কত আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের সানুনয় অনুরোধ অবহেলা করিয়াছেন; উচ্চ কুটুম্বিতার আকর্ষণ, অর্থের প্রলোভন, রূপ খ্যাতির মোহ সমস্ত কাটাইয়া অবশেষে কোন্ এক অখ্যাত পল্লীগ্রামে বিলের ধারে এক অজ্ঞাত দরিদ্রের ঘরে এত বড় বিড়ম্বনা, লোকের কাছে মুখ দেখাইবেন কি করিয়া?

শ্বশুরের উপরে প্রথমটা রাগ হইল। প্রতারক এক মেয়ে দেখাইয়া আর এক মেয়ের সহিত আমার বিবাহ দিল! কিন্তু ভাবিয়া দেখিলেন, নবীন ত তাঁহাকে বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা দেখান নাই—তিনি নিজেই দেখিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। বুদ্ধির দোষে যে এত বড় ঠকাটা ঠকিয়াছেন, সে লজ্জার কথাটা কাহারও কাছে প্রকাশ না করাই শ্রেয় বিবেচনা করিলেন।

ঔষধ যেন গিলিলেন কিন্তু মুখের তারটা বিগড়িয়া গেল। বাসরঘরের ঠাট্টা আমোদ কিছুই তাঁহার কাছে রুচিল না। নিজের এবং সর্ব্বসাধারণের প্রতি রাগে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল।

এমন সময় হঠাৎ তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী বধূ অব্যক্ত ভীত স্বরে চমকিয়া উঠিল। সহসা তাহার কোলের কাছ দিয়া একটা খরগোষের বাচ্ছা ছুটিয়া গেল। পরক্ষণেই সে দিনকার সেই মেয়েটি শশকশিশুর অনুসরণ পূর্ব্বক তাহাকে ধরিয়া গালের কাছে রাখিয়া একান্ত স্নেহে আদর করিতে লাগিল। "ঐরে পাগ্‌লী আসিয়াছে" বলিয়া সকলে তাহাকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল। সে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ঠিক বরকন্যার সম্মুখে বসিয়া শিশুর মত কৌতূহলে কি হইতেছে দেখিতে লাগিল। বাড়ির কোন দাসী তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইবার চেষ্টা করিলে বর ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, আহা থাক্ না বসুক্!

মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি?

সে উত্তর না দিয়া দুলিতে লাগিল। ঘরসুদ্ধ রমণী হাসিয়া উঠিল।

কান্তি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার হাঁস দুটি কত বড় হইল?

অসঙ্কোচ মেয়েটি নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

হতবুদ্ধি কান্তি সাহসপূর্ব্বক আবার জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার সেই খুবু আরাম হইয়াছে ত?

কোন ফল পাইলেন না। মেয়েরা এমন ভাবে হাসিতে লাগিল যেন বর ভারি ঠকিয়াছেন।

অবশেষে প্রশ্ন করিয়া বর খবর পাইলেন—মেয়েটি

কালা এবং বোবা, পাড়ার যত পশুপক্ষীর প্রিয় সঙ্গিনী। সে দিন সে যে সুধা ডাক শুনিয়া উঠিয়া ঘরে গিয়াছিল সে তাঁহার অনুমান মাত্র, তাহার আর কোনও কারণ ছিল।

কান্তি তখন মনে মনে চমকিয়া উঠিলেন। যাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া পৃথিবীতে তাঁহার কোন সুখ ছিল না, শুভদৈবক্রমে তাহার নিকট হইতে পরিত্রাণ পাইয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। মনে করিলেন যদি এই মেয়েটির বাপের কাছেই যাইতাম এবং সে ব্যক্তি আমার প্রার্থনা অনুসারে কন্যাটিকে কোনমতে আমার হাতে সমর্পণ করিয়া নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করিত!

যতক্ষণ আয়ত্ত চ্যুত এই মেয়েটির মোহ তাঁহার মনটিকে আলোড়িত করিতেছিল, ততক্ষণ নিজের বধূটি সম্বন্ধে একেবারে অন্ধ হইয়াছিলেন। নিকটেই আর কোথাও কিছু সান্ত্বনার কারণ ছিল কি না তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তিও ছিল না। যেই শুনিলেন মেয়েটি বোবা ও কালা অমনি সমস্ত জগতের উপর হইতে একটা কালো পর্দ্দা ছিন্ন হইয়া পড়িয়া গেল দূরের আশা দূর হইয়া নিকটের জিনিসগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। সুগভীর পরিত্রাণের নিশ্বাস ফেলিয়া কান্তি লজ্জাবনত বধূর মুখের দিকে কোন এক সুযোগে চাহিয়া দেখিলেন। এতক্ষণে যথার্থ শুভদৃষ্টি হইল। চর্ম্মচক্ষুর অন্তরালবর্ত্তী মনোনেত্রের উপর হইতে সমস্ত বাধা খসিয়া পড়িল। হৃদয় হইতে এবং প্রদীপ হইতে সমস্ত আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া একটি মাত্র কোমল সুকুমার মুখের উপরে প্রতিফলিত হইল। কান্তি দেখিলেন, একটি স্নিগ্ধ শ্রী একটি শান্তলাবণ্যে মুখখানি মণ্ডিত। বুঝিলেন নবীনের আশীর্ব্বাদ সার্থক হইবে।

ঐতিহাসিক চরিত্রোদ্ধার।

জেব্‌উন্নিসা বেগম।

বাঙ্গলার অমর ঔপন্যাসিক, স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহে, পাঠক জেব্‌উন্নিসার পরিচয় পাইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহই জেব্‌উন্নিসা সম্বন্ধে কেহ কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই—তাহার কারণ সাহজাদী জেব্‌উন্নিসা সম্বন্ধে ধারাবাহিক বিবরণ সাধারণ ইতিহাসে লিখিত হয় নাই। জেহানারা, রোসেনারার অনেক কথা সাধারণ ইতিহাসে পাওয়া যায় বটে—কিন্তু জেব্‌উন্নিসার উল্লেখমাত্র পাওয়া যায় না।

বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অসীম ক্ষমতা। বাঙ্গালী পাঠকের মনেও বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্রিত চরিত্রগুলির শক্তি অপরিসীম। তিনি যেরূপে জেব্‌উন্নিসাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যেরূপ বর্ণসমাবেশে তাঁহার কলাময় তুলিকা দ্বারা জেব্‌উন্নিসার চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, পাঠকসমাজ তাহাকে সেই চক্ষেই দেখিয়াছেন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভাসম্ভূত জেব্‌উন্নিসা, ঐতিহাসিক প্রকৃত জেব্‌উন্নিসার সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র। স্বর্গে ও নরকে, পবিত্রতায় ও কলঙ্কে—জ্যোৎস্নায় ও অন্ধকারে—শুভ্রতায় কৃষ্ণতায় যত প্রভেদ, বঙ্কিমচন্দ্রের কলা কৌশলময়ী লেখনী প্রসূত জেব্‌উন্নিসা ও ইতিহাসের প্রকৃত জেব্‌ উন্নিসায় সেইরূপ পার্থক্য। আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধের যে নামকরণ করিয়াছি তাহার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া দেখাইব, ইতিহাসের হিসাবে ধরিতে গেলে—বঙ্কিমবাবুর জেব্‌উন্নিসা প্রকৃত নহেন। ইহা তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তির, সামান্য প্রয়াসোদ্ভূত ক্রীড়ন মাত্র।

বঙ্কিমচন্দ্র আমার গুরু স্থানীয়। যখন "প্রচার" ছিল, যখন আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু বঙ্কিমের জামাতা স্বর্গীয় রাখালচন্দ্র ছিলেন, যখন স্বয়ং সাহিত্য-সিংহ বঙ্কিম জীবিত ছিলেন—যখন তাঁহার সহিত ইতিহাস প্রসঙ্গ লইয়া নানা কথা হইত, তখন রাজসিংহের নূতন সংস্করণও হয় নাই এবং এ সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবুকে কোন প্রশ্ন করিবার কোন প্রয়োজনও বোধ করি নাই। এবং এতৎ সম্বন্ধে কোন তথ্যও আমার সংগ্রহের মধ্যে ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের জেব্‌উন্নিসা পাঠের পর—ষ্টার রঙ্গমঞ্চে "রাজসিংহ" অভিনয় দেখিবার পর সাহজাদী জেব্‌উন্নিসা সম্বন্ধে আমার অনুসন্ধান প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে। তাহার পর হইতে এই কয়েক বৎসর ধরিয়া জেব্‌উন্নিসার ঐতিহাসিক চরিত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছি।* রাজসিংহের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"ঔরঙ্গ জেব্‌ রাজসিংহ, জেব্‌উন্নিসা, উদিপুরী ইহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইহাদের চরিত্র যেরূপ

---

* ময়মনসিংহের ধনবাড়ীর বিদ্যোৎসাহী ভুম্যাধিকারী আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক শ্রীযুক্ত নবাব আলি চৌধুরী, ও তাঁহার প্রসিদ্ধ মৌলবী আবু মনসুর মহম্মদ আবদুল হক্ সাহেব আমায় জেব্‌উন্নিসার কয়েকটী মনোহর কবিতা ও আনুসঙ্গিক ঘটনাবলী মূল পারসী গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া দিয়া কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

ইতিহাসে আছে সেইরূপ রাখা গিয়াছে। তবে তাঁহাদের সম্বন্ধে যে সকল ঘটনা লিখিত হইয়াছে সকলই ঐতিহাসিক নহে। উপন্যাসে সকল কথা ঐতিহাসিক হইবার প্রয়োজন নাই।" আমার দুর্ব্বল লেখনী প্রমাণ করিবে—বঙ্কিমচন্দ্রের জেবউন্নিসা ইতিহাসে যেরূপ আছে—তাহা ঠিক হয় নাই। যে ইতিহাস তাঁহার অবলম্বনীয় তাহা ভ্রম প্রমাদপূর্ণ এবং সেই ইতিহাস ব্যতীত আরও অনেক উপকরণ আছে যাহা তাঁহার হস্তগত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র একখানি গ্রন্থকেই প্রামাণ্য বলিয়া গিয়াছেন। সে গ্রন্থখানি, মেনুসীর। কিন্তু মেনুসী ব্যতীত আরও ইংরাজী গ্রন্থ আছে যাহাতে জেব্‌উন্নিসার সম্বন্ধে অনেক কথা আছে এবং তাহাই প্রকৃত। এতদ্ব্যতীত, "মা-সিরি আলমগিরি" প্রভৃতি কয়েকখানি পারসী গ্রন্থে জেব্‌ উন্নিসার বৃত্তান্ত বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এ সব গ্রন্থের আজও অনুবাদ হয় নাই, এবং হইবারও সম্ভাবনা নাই। এবং এই ইতিহাস গ্রন্থগুলি সম্রাট ঔরঙ্গ জেবের রাজত্ব কালেই লিখিত। বঙ্কিম বাবু উপন্যাস লিখিতে বসিয়া ছিলেন, এবং আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে অনুভব করিতে পারি হয়ত চরিত্রটা পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক করা তাঁহার ইচ্ছাধীন ছিলনা কিম্বা এ সমস্ত গ্রন্থ তাঁহার হস্তগত হয় নাই। বঙ্কিম বাবুর কথা তুলিলাম কেন—তাহার কারণ এই—বঙ্গ সাহিত্যে তাঁহার রাজরাজেশ্বরত্ব। তাঁহার চিত্র পাঠকের মনে একবার যে শক্তি বিকাশ করিয়াছে তাহার বিলোপ সাধন কল্পে আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির শক্তি অতি সামান্য। তাহা না হইলে হয়তঃ এ ভূমিকার প্রয়োজন ছিল না। যাঁহারা মনে করিবেন, আমি বঙ্কিমচিত্রিত চরিত্রের কোনরূপ প্রতিবাদ করিতেছি, তাঁহারা এ অধমের প্রবন্ধ পাঠ এইখানেই বন্ধ রাখিবেন।

জেব্‌উন্নিসা মহাপ্রতাপান্বিত দুর্দ্দান্ত সম্রাট ঔরঙ্গ জেবের কন্যা। নিম্নে ঔরঙ্গ জেবের পুত্র কন্যাদের একটী তালিকা প্রদত্ত হইল। ঔরঙ্গজেবের পাঁচ পুত্র ও পাঁচ কন্যা।

ঔরঙ্গ জেব্‌ (আলমগীর বাদ্‌শা)
(পুত্রগণ)

১	২	৩	৪	৫
সাহজাদা	সাহজাদা	সাহজাদা	সাহজাদা	সাহজাদা
মহম্মদ সুলতান (মাতৃনাম—নবাববাই) (জন্মদিন ১০৪৯ হিঃ) রমজান্ (ইং ১৪ই নবেম্বর ১৬৩৯ খৃঃ)।	মহম্মদ মোয়াজিম সাহ-আলম বাহাদুর (মাতা—নবাব বাই বেগম, রজব—১০৫৩ হিঃ (ইং ১৬৪৩ সেপ্টেম্বর)।	মহম্মদ আজম (মাতা—দিল্‌রাস্‌ বানু বেগম (হিঃ ১২ শাবন ১০৬৩ হিঃ) (২৮ জুন—১৬৫৩)	আকবর (মাতৃনাম মূল পারসী গ্রন্থে নাই) ১২ জেলহেজ্জা ১০৬৭ হিঃ (১৬৫৬খৃঃ ১২ সেপ্টেম্বর)	মহম্মদ কামবক্স (১০ রমজান ১০৭৭ হিঃ) (২৬ ফেব্রুয়ারি ১৬৬৭) মাতার নাম—(উদিপুরী বেগম)।

উল্লিখিত তালিকা হইতে প্রমাণ হয়—ঔরঙ্গ জেবের শেষ পুত্র হিন্দু বেগমের গর্ভজাত। তাঁহার কন্যাগণের বিবরণ এইরূপ ঃ—

ঔরঙ্গ জেব্‌ (আলমগীর বাদ্‌শা)
(কন্যাগণ)

সাহাজাদী	সাহাজাদী	সাহাজাদী	সাহাজাদী	সাহাজাদী
জেবউন্নিসা বেগম (মাতৃনাম মূল পারসীক গ্রন্থে অনুল্লিখিত) ১০ সওয়াল ১০৪৮ হিঃ ১৬৩৯ ৫ই ফেব্রুয়ারি)।	জিন্নত উন্নিসা বেগম্ ১লা শাবন, ১০৫৩ হিঃ ১৬৪৩ ৯ই অক্টোবর [মাতৃনাম নাই)।	বদ্‌রে ন্নিসা বেগম ২৯ শওয়াল ১০৫৭ হিঃ (মাতৃনাম নবাববাই)। ইং ১৭নবেম্বর ১৬৪৭।	জুব্‌দাত উন্নিসা বেগম ২৬ রমজান ১০৫৭, ১৭ নবেম্বর ১৬৪৭।	মেহের উন্নিসা বেগম ৩ সাফর ১০৭২, (১৩ সেপ্টেম্বর ১৬৬১ ।)

"মাসির" গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, জেবউন্নিসা আজীবন অবিবাহিতা ছিলেন। কেন ছিলেন—সে রহস্য উদ্‌ঘাটন পরে হইবে। ঔরঙ্গজেবের দ্বিতীয় ও তৃতীয় কন্যা যৌবনবিকাশের পূর্ব্বেই পরলোকগামিনী হন। চতুর্থ সাহজাদী জুবদৎ-উন্নিসার সহিত দারার পুত্র সিপ্‌হির সেকোর বিবাহ হয়। চতুর্থ—মেহের উন্নিসার সহিত মুরাদবক্‌সের পুত্র সাহজাদা ইজাদবক্‌সের সহিত দাম্পত্য জীবনে আবদ্ধ হন। ঔরঙ্গজেবের অনেক মহিষী ছিলেন—তাঁহাদের মধ্যে প্রধানা

ছিলেন, নবাব বাই, দিল্‌রাস্‌বান, উদিপুরী বাই, যোধপুরী বাই, আর আফ্‌গানছুরাণী বেগম।

জেবউন্নিসা রূপবতী ও গুণবতী ছিলেন। হারেমের মধ্যে তাঁহার বিশেষ সম্মান ছিল। সে সম্মান রূপের নহে গুণের। ঔরঙ্গজেব নিজ কন্যাকে বিশেষরূপে সুশিক্ষিতা করেন। জেবউন্নিসা কোরাণে অতিশয় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। পিতার নিকট বসিয়া অনেক সময় তিনি প্রাতে ও সন্ধ্যায় ধর্ম্মশাস্ত্রের কূটাংশের ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহার চিত্ত বিনোদন করিতেন। এই পাণ্ডিত্য নিবন্ধন ঔরঙ্গজেব জেবউন্নিসাকে ৩০ হাজার আসরফি পুরস্কার দেন। তিনি আরবী ও পারস্য ভাষায় সুশিক্ষিতা ছিলেন। অনেক বিদ্বান মৌলবী ও পণ্ডিতগণ তাঁহার বেতনভোগী ছিল। তিনি নিজে পারসী ও আরবী ভাষায় সুন্দর সুন্দর কবিতা ও গদ্য প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। "তফ্‌সিরি-কবীর" "জেব্‌উৎ তফসির" প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর কবিতা গ্রন্থ তাঁহারই প্রতিভাপ্রসূত। আজও জেব উন্নিসার প্রণীত অনেক ভাবোচ্ছাস পূর্ণ কবিতা, দিল্লী, আগরা, দাক্ষিণাত্যের দৌলতাবাদে, বেগমপুরে ও আহম্মদ নগরে দেওয়ানা ও পথভিখারীদের মুখে গীত হইতে শুনা যায়। জিন্নত উন্নিসা সম্বন্ধে "মাসির" গ্রন্থকার বলিতেছেন—"এই সাহাজাদীদানশৌণ্ডতা ও ধর্ম্মময় জীবনের জন্য গৌরবান্বিত ছিলেন। বদরোন্নিসা সম্বন্ধে আলমগীরনামায় আছে—এই রাজকুমারী কোরাণের আদ্যোপান্ত অভ্যস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শ জীবন ধর্ম্ম ও পবিত্রতায় পূর্ণ ছিল। ঔরঙ্গ জেবের রাজত্বের একাদশ বর্ষে ইনি পরলোকগামিনী হন। জুব্‌দাৎ উন্নিসা সম্বন্ধে মাহসির এ আলমগিরির গ্রন্থকার বলেন—"জুব্‌দাৎ উন্নিসা কেবল শাস্ত্রালোচনা ধর্ম্ম কর্ম্মে জীবন অতিবাহিত করিতেন। ঔরঙ্গজেব যে বৎসর ইহলোক ত্যাগ করেন সেই বৎসরেই ইঁহার মৃত্যু হয়। সম্রাট্‌কে ইঁহার মৃত্যু সংবাদ শুনিতে হয় নাই—অর্থাৎ সম্রাট কন্যার পরলোক প্রাপ্তির পূর্ব্বেই গতাসু হন।" মাসির গ্রন্থে ঔরঙ্গজেবের পাঁচটী কন্যারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। এই গ্রন্থসমসাময়িক। ইহাতে ঔরঙ্গজেবের কন্যাদের বিরুদ্ধে কোন কথাই নাই।*

বঙ্কিম বাবুর প্রধান অবলম্বনীয় গ্রন্থ মেনুসীর (মনুশী) মোগল রাজত্বের ইতিহাস। এই মেনুসা ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথমাংশে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি দারার বিশেষ বন্ধু, জাতিতে বিনিসিয়—ব্যবসায়ে চিকিৎসক। রাজপরিবারের বাহিক ঘটনা অনেকটা তিনি জানিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে জেব্‌ উন্নিসার সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। আমার নিকট মেনুসীর যে সংস্করণ আছে তাহাতে ত কিছুই পাই নাই। তাহা ছাড়া মেনুসী গ্রন্থে তারিখের ও ঘটনা সমাবেশের নামের এত গোলমাল, যে তাহার উপর বিশ্বাস করিতে বড় একটা প্রবৃত্তি হয় না। এই মেনুসী দারার মৃত্যুর পর ঔরঙ্গজেবের ভয়ে সুরাটে পলাইয়া আসেন। ঔরঙ্গজেবের উপর তাহার একটা প্রীতি যে আদৌ ছিল না, ইহা সম্পূর্ণ সত্য। তিনি দারার বন্ধু, কাজেই ঔরঙ্গজেবের শত্রু। মেনুসীর পুস্তক প্রথমে ইটালিয়ান ভাষায় পরে ফরাসী ভাষায় অনুবাদিত হয়। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহার অনুবাদ শেষ হয় নাই। এই সময়টা এ দেশে ওয়ারেন হেষ্টিংসের আমল। Mr. Anquitel du Perron নামক প্রত্নতত্ত্ববিৎ ফরাসী স্বচক্ষে মেনুসীর এই হস্তলিখিত পুস্তক জেসুট মূসোঁ পাদরীর পুস্তকালয়ে দেখিয়াছিলেন। ইহার পর কাট্রু (ক্রতু) নামক এক পাদরী ফরাসী ভাষার এই গ্রন্থ অনুবাদিত করেন। সর্ব্বশেষে বিলাতের ওরিএন্টেল ট্রানসেমান্ সোসাইটী ইহার ইংরাজী অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল। অনুবাদকের এই পুস্তক সম্বন্ধে মত এই—"His (Cartou's) style is elegant, but his chronological arrangements, dates &c are erroneous,"

মেনুসীর গ্রন্থের অনুবাদে তৈমুরলঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া ঔরঙ্গজেব পর্য্যন্ত অনেক ঘটনার অবতারণা করা হইয়াছে। কিন্তু জেব উন্নিসা সম্বন্ধে কোন আবশ্যকীয় কথা ইহাতে নাই। জেব উন্নিসা জীবনের অধিকাংশ সময় দাক্ষিণাত্যে কাটাইয়া ছিলেন। দৌলতাবাদে তাঁহার প্রকাণ্ড মহল ছিল, ইহার সান্নিধ্যে তাহার সমুন্নত সমাধি। আমরা বহু চেষ্টা ও সংগ্রহ করিয়া "প্রদীপে" তাঁহার মহলের চিত্র প্রকাশ করিলাম।

* রাজসিংহ—চতুর্থ সংস্করণ পুনর্মুদিত (১৮৯৩) বিজ্ঞাপন—।৶০।

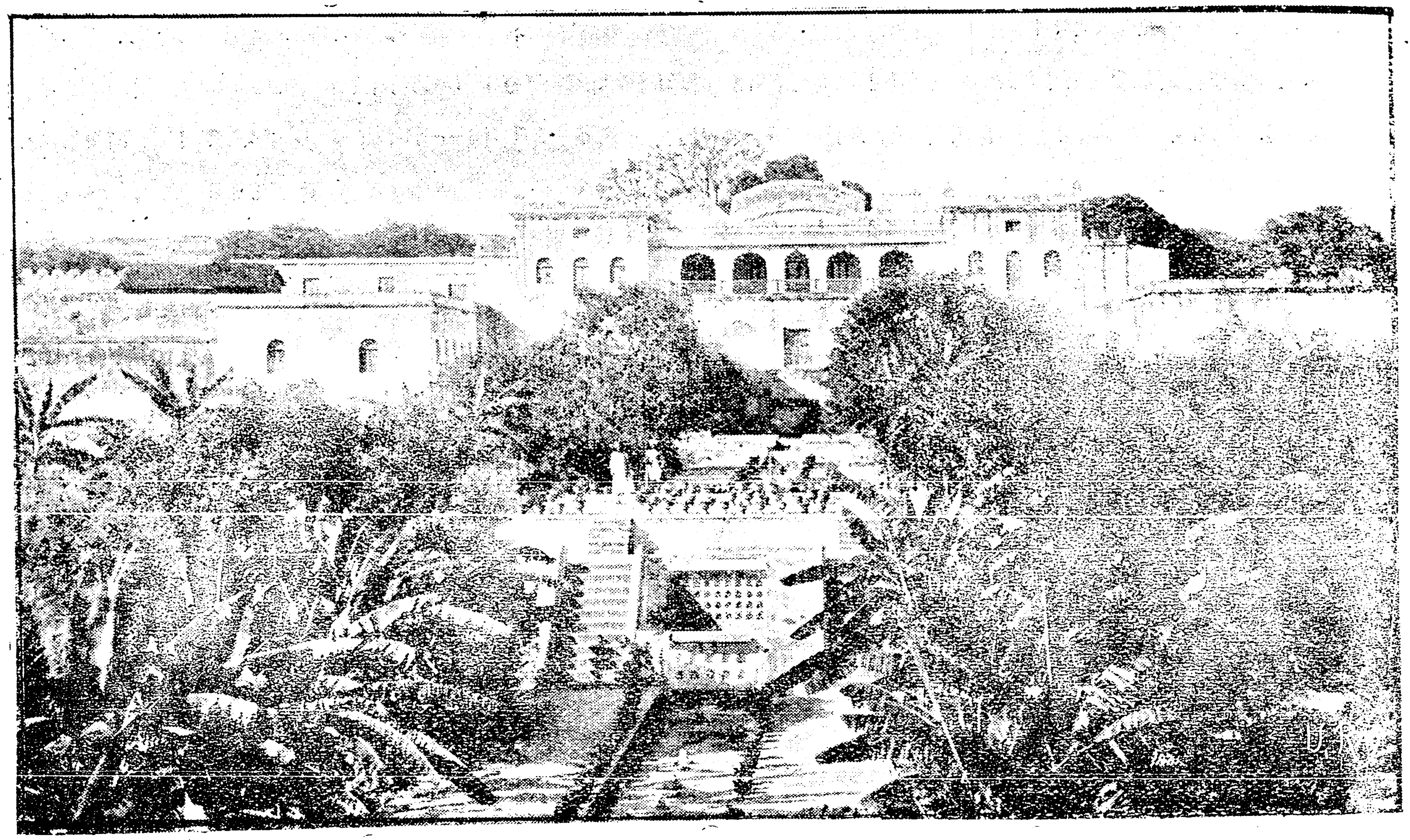

জেবউন্নিসার মহল (আরঙ্গাবাদ)

জেব উন্নিসার জীবনের কথা এখন আরম্ভ করা যাক। ঔরঙ্গজেব যখন মহারাষ্ট্ররবি শিবাজির নূতন অভ্যুদয়ে নিত্য নূতন উৎপাতে, নিত্য নূতন বিগ্রহে বড়ই জ্বালাতন—তাঁহার একচ্ছত্রা প্রতাপান্বিত রাজত্বের মধ্যে সমস্ত বীরজাতিই নীরব—কেবল শিবাজি পরিচালিত মারাঠাগণই সুদূর দাক্ষিণাত্যে যে সময় তাঁহার ক্ষমতার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী—সেই সময় হইতেই শিবাজীর ব্যাপারে ঔরঙ্গজেব সমস্ত মনোযোগ অর্পণ করেন। রাজা জয়সিংহ ও পাঠান দিলার খাঁ শিবাজীকে দমনের জন্য প্রেরিত হন। শিবাজী ও জয়সিংহের যুদ্ধ ব্যাপারের এবং তদানুষঙ্গিক ঘটনার অবতারণার কোন প্রয়োজন এখানে দেখি না। মোট কথা এই—শিবাজীর পক্ষে অম্বরেস্বর জয়সিংহ ও দিলার খাঁর বেগ বড়ই অসহ্য হইয়া উঠিল। শিবাজীর তখন পড়তা মন্দ। অদৃষ্টচক্রনেমি যেন একটু একটু করিয়া মন্দের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইতেছে। শিবাজীর প্রিয় ছিল—মাতৃভূমি, আর নিজের পরিবারবর্গ। মহারাজ জয়সিংহ ও সেনাপতি দিলার খাঁ শিবাজীর পরিবারবর্গকে সিংহগড়ে আবদ্ধ করিলে, শিবাজী পরিবারবর্গের উদ্ধারের অন্য উপায় না দেখিয়া দিল্লীশ্বরের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন।

"পুরন্দরের সন্ধি" বলিয়া যাহা ইতিহাসে প্রখ্যাত, শিবাজী সেই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। দশ বারটী দুর্ভেদ্য দুর্গ তাঁহার হস্তচ্যুত হইল। জয়সিংহের পরামর্শে মহারাষ্ট্র পতি শিবাজী দিল্লী যাত্রা করিলেন।*

তখন রাজধানীতে শিবাজীর কথাটাই কিছু বেশী আলোচিত হইতেছিল। ঔরঙ্গজেবের রাজত্ব ইতিহাসের স্বর্ণ যুগ। রাজকোষ পূর্ণ। দিল্লী আগরা বৈজয়ন্তের ঐশ্বর্য্য ভূমিত। সমগ্র ভারতবর্ষে শান্তি। প্রজার রাজস্ব নিয়মিতরূপে আদায় হইতেছে—দেশ সুজলা সুফলা। আর তার উপর ঔরঙ্গজেবের সার্ব্বভৌমিকত্ব! সার্ব্বভৌমিকত্বের সেই তীক্ষ্ণ শাসন দৃষ্টির সম্মুখে, সমস্ত বীর জাতিই বশীভূত। এই সার্ব্ব ভৌমিকত্বের বিরুদ্ধে শিবাজী একক দাঁড়াইয়াছিলেন—কাজেই সকলের মুখে শিবাজির কথা। ঔরঙ্গজেবের আসরফীপূর্ণ রাজকোষ যুদ্ধ ব্যয়ে ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে লাগিল। লোকে মুখে না হউক মনে মনে শিবাজীর গৌরব গাথার আলোচনা করিতে লাগিল। কারণ ঔরঙ্গজেব অত বড় প্রতাপান্বিত দিল্লীর বাদসা—আর শিবাজি—দাক্ষিণাত্যের দরিদ্র দুর্গাধিপতি।

এ আলোচনার স্রোতটা দিল্লীর অন্দর মহলেও পৌছিয়াছিল। শিবাজীর গৌরব গাথাটা রঙ্গ মহলের মোতিময় পরদার অন্তরালেও মৃদু উচ্ছ্বাসে গীত হইতেছিল। তাহার কারণ আছে। সায়েস্তাখাঁর পত্নী এই সময়ে দিল্লী গিয়াছিলেন, শিবাজীর হস্তে তাঁহার স্বামী কিরূপে লাঞ্ছিত হন—তাঁহার একমাত্র পুত্র কিরূপে নিহত হয়—কিরূপে স্বচক্ষে তিনি শিবাজীর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ দেখিয়াছিলেন, এই সব আখ্যায়িকাও অন্তঃপুরিকাদের অবসর সময়কে অতিবাহিত করাইয়া দিত। সায়েস্তা খাঁর পত্নী দিল্লীরাজ পরিবারের নিতান্ত নিকট সম্পর্কীয়*। শিবাজীর কথা সকলেই শুনিতেন, কেহ বা শিবাজীকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। কারণ শিবাজী মোগলের শত্রু! কেহবা শিবাজীকে জ্বলন্ত অগ্নিরাশির মধ্যে লম্ফ প্রদানোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় তুলনা করিয়া তাঁহার দিন গুণিতেন; কিন্তু একজন তাঁহার গৌরব কাহিনী শুনিয়া মনে মনে প্রশংসা করিতেন। অত বড় ঔরঙ্গজেবের সহিত অত ক্ষুদ্র শিবাজী কিরূপ যুঝিতেছেন তাহাই ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতেন—সরল হৃদয়ে বীরের সম্মান করিতেন। তিনি আর কেহই নন—স্বয়ং শাহজাদী জেব উন্নিসা।

শিবাজীকে মুসলমান ইতিহাস লেখক কাফি খাঁ যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিশেষণগুলি বিশেষ শ্রুতিকটুর। শিবাজীকে তিনি "কাফের" "জাহান্নম্ রাফৎ" (নরকস্থজীব) ইত্যাদি অভদ্রোচিত বিশেষণে অভিহিত করিয়াছেন। কাফি খাঁ শিবাজীর সমসাময়িক। কিন্তু স্বয়ং ঔরঙ্গজেব শিবাজীকে "পার্ব্বত্য মূষিক" বলিয়া সম্বোধন করিলেও তিনি তাঁহাকে মনে মনে কতদূর শ্রদ্ধা করিতেন তাহা নিয়োদ্ধৃত কয়েকটা ছত্র হইতেই প্রমাণিত হয়। ঔরঙ্গজেব নিজে বলিতেছেন—"He was a great captain and the only one who had the magnanimity to raise a new kingdom. While I have been destroying the ancient Sovereignities of India, my armies have been employed against him for 19 years and nevertheless his state had been always increasing" অর্থাৎ সেনাপতিত্বে শিবাজী অদ্বিতীয়। নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠায় শিবাজীর ন্যায় লোকই সক্ষম। আমি প্রাচীন হিন্দুরাজগণকে অধঃপতিত করিতেছি। উনিশ বৎসর ধরিয়া আমি শিবাজীর বিরুদ্ধে আমার অগণিত সৈন্য চালনা করিয়াছি—কিন্তু এখনও তাহার রাজ্য বাড়িতেছে।" শিবাজীর প্রধান শত্রু—স্বয়ং বাদসাহ ঔরঙ্গজেব তাঁহার সম্বন্ধে যেরূপ মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাহাকে ধন্যবাদ দিতে হয়।*

যাহা হউক রাজা জয়সিংহের প্ররোচনায়, আনুগত্যে ও মরামর্শে ভুলিয়া শিবাজী দিল্লী পৌছিলেন। দিল্লী পৌছিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমদরবারে হাজির হইলেন। ঔরঙ্গজেব বাদসাহের দরবার—শত সহস্র রাজপুত, মোগল পাঠান, রাজা উজীর আমির ওমরায় সে সভা পরিপূর্ণ। সে দিন দরবার যেন আরও জাঁকিয়া উঠিয়াছে। মণিময় ময়ূর তক্তে বসিয়া দিল্লীশ্বর--শিবাজী দরবারে উপস্থিত হইয়া প্রথামত তিনবার কুর্ণীস করিলেন। সেই তেজোবিস্ফারিত মুখমণ্ডল, তীক্ষ্ণদৃষ্টি পরিপূর্ণ চক্ষু ও অসম্ভব দাম্ভিকতা দেখিয়া সভাশুদ্ধ লোক স্তম্ভিত হইল। মারবার, বিকানীর, যোধপুর সর্শল্মির কোটা বুঁদি--সকল স্থানের রাজপুত সামন্তগণ সে সভায় উপস্থিত। ঔরঙ্গজেবের দর্পিত মোগল সেনাপতি ও সহস্র

* "মাসিরই আলমগিরি" ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের অসম্পূর্ণ ইতিহাস। ইহাতে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যান্ত সমস্ত ঘটনা সরলভাবে সংক্ষেপে বিবৃত। ঔরঙ্গজেব একটা আদেশ প্রদান করেন--কেহ তাঁহার রাজত্বের কোন ঘটনা পুস্তকাকারে লিখিতে পারিবে না। এ নিষেধ সত্ত্বেও মহম্মদ শফি মোস্তায়রিখাঁ এই গ্রন্থ গোপনে রচনা করেন। ইহাতে ঔরঙ্গজেবের জীবনের অনেক ঘটনা ও সাংসারিক কথা আছে। ইহার লিখিত ঘটনাবলী পক্ষপাত বর্জ্জিত। ষ্টুয়ার্ট সাহেব তাঁহার Descriptive Catalogue এ এই গ্রন্থকার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"who shows a discrimination rarely to be met with in Indian critics." কাজেই মাসির গ্রন্থের উপর অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই। Col. Lees—J. R. A. S. London vol. II P. 414

* শিবাজীর দিল্লীযাত্রা ও ঔরঙ্গজেবের তাঁহার সহিত ব্যবহার ও তৎসাময়িক সমস্ত ঘটনা, আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ভবিষ্যতে ইহা একটা স্বতন্ত্র প্রবন্ধের অঙ্গীভূত হইবে।

* আকতিমাদ উদ্দৌলা (যমুনায় অপর পারেই ইহার একটী কারুকার্য্যময় সুন্দর সমাধি) আক্তিমাদ বা খাজা আহয়াস—নুরজাহানের পিতা! আকতিমাদের কন্যা—নুর-জাহান ও পুত্র আসফ্ খাঁ। এই আসফ্ পুত্র সায়েস্তা খাঁ ও নওয়াবেজ খাঁ। নওয়াবেজ খাঁর এক কন্যার সহিত বাদসা ঔরঙ্গজেবের পরিণয় হয়। আসফের কন্যা মমতাজ—সাহজাহানের পত্নী—তাজমহল। ইহারই গৌরব কীর্ত্তি।

সহস্র দর্শকবৃন্দে সেই সভামণ্ডপ পূর্ণ। ঔরঙ্গজেব প্রথমে শিবাজীকে সাদর সম্ভাষণই করিয়াছিলেন—কিন্তু পর ক্ষণেই তাহার মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইল। তাহার কারণ আছে।

He was received by Auranzeb with much courtesy which continued until the ladies of the seraglio incited by the wife of Shaista Khan in revenge for the death of her son and the disgrace of her husband solicited Aurangzeb, not unwilling to destroy him. But the high Omrans said that they have no other security for their own lives than the word of the king and the Hindu Rajas would revolt at such a breach of faith to one of their own conditions. Sivaji at the public audience upbraided Aurangzeb * * Aurangzeb condescended to soothe him and repeated his first assurance of safety and requested his service against expedition preparing against Candahar. Historical Fragments of the Moghal Empire vol. 1. Sec I.

রোজ নামা অনুবাদিত অংশ। ৩৭ পৃষ্ঠা।

রাজ সভার অনতিদূরে যবনিকার অন্তরালে হারেম সুন্দরীগণ নিভৃতে বসিয়া শিবাজীর সহিত ঔরঙ্গজেবের কথোপকথন শুনিতেছিলেন। তাহার মধ্যে জেহানারা রোশোনারা, সায়েস্তা খাঁয়ের পত্নী, সাহজাদী জেবউন্নিসা প্রভৃতি সকলেই ছিলেন। সকলেই বিশেষতঃ সায়েস্তা খাঁর পত্নী শিবাজীর অবমাননায় বিশেষ আনন্দিত হইতেছিলেন। তিনি ঔরঙ্গজেবকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন—যেন শিবাজীকে তৎক্ষণাৎ কারাগারে প্রেরণ করা হয়। কথাটা তৎক্ষণাৎ ঔরঙ্গজেবের কর্ণে পৌঁছিল কিন্তু আমীর ওমরাহেরা আপত্তি করায় সে সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন। শিবাজী তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। হারেম সুন্দরীদের মধ্যে কেবল এক জনের হৃদয় শিবাজীর বীরত্বে মুগ্ধ হইল। তিনি আর কেহই নহেন সাহজাদী জেবউন্নিসা।*

ঔরঙ্গজেব সন্তুষ্ট চিত্তে অন্তঃপুরে গেলেন। শাহজাদী জেব উন্নিসা আসিয়া অশ্রুপ্লুত চক্ষে পিতার নিকট দাঁড়াইলেন। তাঁহার যেন কিছু বলিবার আছে—অথচ বলিতে লজ্জা হইতেছে। ঔরঙ্গজবে কন্যার এই অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। কোমল স্বরে বলিলেন—"জেব্ তুমি কাঁদিতেছ কেন?" জেব উন্নিসা শিবাজী ঘটিত সমস্ত কথার ধীরে অবতারণা করিয়া বলিলেন—"পিতঃ—আপনার নিকট শিক্ষা পাইয়াই বীরের মর্য্যাদা করিতে শিখিয়াছি। বীরত্ব দেখাইতে পারিলে দিল্লীর বাদসা উপযুক্ত পুরস্কার দানে কখনও পশ্চাৎপদ হন না। এই দুর্দ্দান্ত মারাঠা রাজ আপনার তুলনায় কত ক্ষুদ্র। আপনি ন্যায় পরায়ণ, ধর্ম্ম-পরায়ণ—এই হিন্দুস্থানের বিচারক। তাঁহাকে এরূপে অপমান করা কি উচিত কার্য্য হইয়াছে। সভার মধ্যে কত বড় বীর ছিল, বড় বড় রাজা ছিল কিন্তু কেহ কি মোগলের বাদসাহের আম্ দরবারে দাঁড়াইয়া এত সাহসের সহিত এত তেজের সহিত এত কথা বলিতে পারিয়াছে? শিবাজীকে যে পরাজয় করিবে তাহার জন্য আপনার ভাণ্ডার উন্মুক্ত—তবে কেন আপনি এই বীরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন না?"

ঔরঙ্গজেব শত্রুর প্রশংসায় জলিয়া উঠিলেন। যে শিবাজী তাঁহার অধিকারে প্রবেশ করিয়া তাঁহার বন্দর ও নগরসমূহ লুঠ করিয়াছে, তাঁহার প্রজাগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে, তাঁহার প্রধান প্রধান সেনাপতিগণকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে—যাহার শৌর্য্য বীর্য্য ও মোগল সেনাদের লাঞ্ছনা পরাজয় সমগ্র হিন্দুস্থান উৎকীর্ণ নেত্রে দেখিতেছে—তাহার সেই চির শত্রুর জন্য তাঁহারই প্রিয়তমা কন্যা এরূপ অনুরোধ করিতেছে—একল্পনা আরঙ্গেবকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। যখন তিনি কথায় কথায় জানিলেন তাঁহার কন্যা শিবাজীর বীরত্বে শৌর্য্যে মনে মনে তাঁহার অনুরাগিণী, তখন তিনি দৃঢ়তা ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন—"জেব উন্নিসা! শিবাজীকে আমি মার্জ্জনা করিতে পারি যদি সে মুসলমান ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া তোমায় বিবাহ করে।"

ঔরঙ্গজেব কন্যার মনের অবস্থা বুঝিলেন না, পবিত্র প্রেমের মর্ম্ম বুঝিলেন না, যে জেবউন্নিসা তাঁহার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, যাহার সকল আবদারই তিনি সহ্য করিতেন, যাহার জন্য তিনি পারসী আরবী অভিজ্ঞ জ্ঞানবৃদ্ধ মৌলবীগণকে নিযুক্ত করিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেন, সেই প্রিয়তমা কন্যার প্রস্তাবে, বাদসাহ যে কর্ণপাত করিলেন না তাহার কারণ আর কিছুই নয় শিবাজী তাঁহার প্রধান শত্রু। শত্রুর সহিত— বিধর্ম্মীর সহিত, ঔরঙ্গজেব বাদসা কন্যার বিবাহ দিতে পারেন না।

যাহাই হউক না কেন, শিবাজী প্রাসাদময়ী অবরোধ মধ্যে যাহাতে একটু সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন, তাহার বন্দোবস্ত জেবউন্নিসা করিয়াছিলেন। তিনি যে শিবাজীকে মনে মনে স্নেহ করিতেন, হৃদয়ের একাংশে তাঁহার জন্য স্থান রাখিয়া ছিলেন, শিবাজী তাহা জানিতে পারেন নাই। জানিতে পারিলে মহারাষ্ট্রপতি ঔরঙ্গজেবের চির বশ্যতা স্বীকার করিতেন কি না তাহা ভবিষ্যতের কুক্ষিনিহিত তথ্য। জেবউন্নিসা আজীবন এই প্রেমস্মৃতি হৃদয়ে লইয়া অবিবাহিত অবস্থায় কাটাইয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে কারাগারে শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করেতে পারিতেন, মনের কথা বলিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা করেন নাই। করেন নাই—পিতার ভয়ে নহে— তাঁহার গৌরব রক্ষার্থে। অনেক স্থান হইতে তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব আসিতেছিল। এই সময়ে জেবউন্নিসার বয়স সপ্তদশ বর্ষ। শিবাজীর বয়স একত্রিংশ। যৌবনের পূর্ণ বিকাশে, পূর্ণ সৌন্দর্য্য লইয়া সাহজাদী জেবউন্নিসা—অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতে লাগিলেন—পবিত্র হৃদয়া সেণ্টক্যাথ্যারিণের ন্যায় অবিবাহিত অবস্থায় জীবন কাটাইতে লাগিলেন—কিন্তু মনের কথা ফুটিয়া বলিতে পারিলেন না। হায়! তাঁহার দুঃখ কেহই বুঝিল না।*

শিবাজী দিল্লী হইতে, যে কৌশলে পলায়ন করেন, ইতিহাস পাঠকের নিকট তাহা অবিদিত নাই। পল যেরূপে দামাস্কস্ হইতে, মহাকৌশলে পলায়ন করিয়াছিলেন—শিবাজীর ব্যাপার তাহার তুলনায় আরও বিপজ্জনক। ঔরঙ্গঞ্জেব—শিবাজীর পলায়নে ক্রোধান্ধ হইয়া যথেচ্ছাচার আরম্ভ করিলেন। কতকগুলা প্রহরী ও সেনানীকে ধরিয়া প্রাণদণ্ড করিলেন—শিবাজীকে ধরিবার জন্য পরাক্রান্ত মোগল সৈন্যগণ চারিদিকে ধাবিত হইল। ঔরঙ্গজেব প্রতিক্ষণেই আশা করিতে লাগিলেন—এতক্ষণে হয়ত তাঁহার চিরশত্রু ধরা পড়িয়াছে। সৈনিকের অস্ত্র ঝঞ্ঝনা, অশ্বের হ্রেষারব, কোন প্রহরীকে ব্যস্ত হইয়া সম্মুখে আসিতে দেখিলেই ঔরঙ্গজেব ভাবেন—শিবাজী পুনরায় শৃঙ্খলিত হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু হায়! সবই দুরাশা, সব আশাই অলীক কল্পনা। ভ্রান্ত ঔরঙ্গজেব যে পথে শিবাজীকে ধরিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন—সে পথে শিবাজী যান নাই।

ঔরঙ্গজেবের হৃদয়ে শোণিত পিপাসা জাগিয়া উঠিল। ক্ষুধিত ব্যাঘ্র শিকার পলাইলে যেমন অস্থির ও কাণ্ডজ্ঞান বিহীন হইয়া রোষে ও ক্ষোভে ফুলিতে থাকে, বাদসাহ ঔরঙ্গজেব—তাঁহার সেনানীদের নিষ্ফলতা দেখিয়া সেইরূপ জ্বলিয়া উঠিলেন। বিরাটবাহিনী লইয়া তিনি দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। জয়সিংহ, দেলার খাঁ, সায়েস্তা খাঁ—সবই অপদার্থ। তাঁহাদের উপর তাঁহার আর বিশ্বাসমাত্র নাই। দিল্লীশ্বর স্বয়ং সমর সজ্জায় সাজিলেন।

ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে—এবার অগণিত সৈন্য, উষ্ট্র, হস্তী, অসংখ্য ভারবাহী ও অন্তঃপুরিকাগণও চলিলেন। তাঁহার রাজ্ঞীগণও সমরাঙ্গনের ভীষণ ক্রীড়া দেখিবার জন্য দিল্লীর অন্তঃপুর ত্যাগ করিলেন। জেবউন্নিসা ইচ্ছা করিলে কাশ্মীরে, লাহোরে, বা অন্য কোন স্থানে যাইতে পারিতেন—কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। পিতার সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে গেলেন।

সপ্তদশ বর্ষব্যাপী ভীষণ যুদ্ধের পর মহারাষ্ট্ররাজ্য শিবাজী শূন্য হইল। শিবাজী ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে ইহলোকত্যাগ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে মহারাষ্ট্র সৌভাগ্যরবি চির অস্তমিত হইল। ঔরঙ্গজেব শিবাজীর দেহান্তে দাক্ষিণাত্যে স্বীয় বহু কষ্টলব্ধ অধিকার নিষ্কণ্টকভাবে বিস্তৃত করিতে লাগিলেন। রণপিপাসু প্রতিহিংসাপরায়ণ ঔরঙ্গজেব অদম্য গতিতে—কখনও বা আহম্মদাবাদে, কখনও বা আগ্রায়, কখনও বা পুনায়, কখনও সেতারায়, কখনও বিজাপুরে—সমর ক্রীড়ায় সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন। ১৬৮৯ খৃঃ অব্দে শিবাজীর পুত্র শম্ভোজি—তাঁহার হস্তে পড়েন। ঔরঙ্গজেব তাঁহার প্রাণদণ্ড করিয়া শান্তি লাভ করিলেন। শিবাজীর মৃত্যুতে জেবউন্নিসার হৃদয়ে নিশ্চয়ই একটা আঘাত লাগিয়াছিল, কিন্তু নিয়তির উপর হস্তক্ষেপে তাঁহার অধিকার কি? শক্তি কোথায়?

১৬৯০ খৃঃ অব্দে ঔরঙ্গজেব রায়গড় অবরোধ এবং

---

* প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক কর্ণেল ডাউ বলেন—The daughter of Aurangzeb was struck with handsomeness of his(sivaji's) person, admired his pride and haughty deportment and interceded at the feet of her father who had ordered Sivaji to be carried as an offender out of sight জেব উন্নিসার হৃদয় কবিত্বে ও কোমলতায় পরিপূর্ণ ছিল। তিনি, সুন্দরী বিদুষী, গুণগ্রাহিণী। ঈশ্বর তাঁহার হৃদয় অনেক উন্নত করিয়া ছিলেন—তাহা না হইলে—তিনি, পিতার শত্রু, রাজ্যের শত্রু, শিবাজীর গুণাবলীতে আকৃষ্ট হইবেন কেন? প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী Thevonor বলেন, জেব উন্নিসা পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—"ধিক্—ধিক—সেই রাজ—সাহানসা, যেখানে বীরের অপমান ঘটে। বীরত্বেই এই হিন্দুস্থানে আপনার পূর্ব্ব পুরুষেরা মোগল রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

*She, like St. Catherine, would not marry though I dare say she had many offers.
Scenes from Western Presidencies—P. 242 Vol. II. 1832 Edition.

সমস্তদিন ব্যাপী যুদ্ধের পর রায়গড় তাঁহার হস্তগত হয়। লুণ্ঠনলব্ধ এক ক্ষুদ্র শিশু ঔরঙ্গজেবের শিবিরে পৌঁছিল। এই শিশু শিবাজীর বংশধর—শাহুজী। জেবউন্নিসা—শিশুকে তাঁহার প্রেমময় ক্রোড়ে লইলেন। মাতৃস্নেহ বিগলিত হৃদয়ে শিশুর লালন পালন করিতে লাগিলেন। এই অপহৃত শিশু জেবউন্নিসার আদরে রাজভোগে কাটাইতে লাগিল। দিন দিন শশীকলার ন্যায় শিশু বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। জেবউন্নিসা যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন এই শিশুকে মাতৃনির্ব্বিশেষে লালন পালন করিয়াছিলেন। শিবাজীর বংশধর বলিয়াই—সেই আশ্রয়হীন রাজশিশু জেবউন্নিসার—স্নেহময় অঙ্কে স্থান পাইয়াছিল। ঔরঙ্গজেবও এ সম্বন্ধে কোন বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। সহৃদয় পাঠক দেখিবেন—এই দেবী হৃদয়া—উদারপ্রাণা সাহজাদী জেবউন্নিসা—বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস চিত্রিতা—কলঙ্কিনী—বিলাসিনী জেবউন্নিসা হইতে কত বিভিন্ন!

ঔরঙ্গজেবকেও যেমন আর দিল্লী ফিরিতে হয় নাই, জেবউন্নিসার অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিয়াছিল। ভীমা নদী তীরে—শীতল সমাধি গর্ভে এই পবিত্র হৃদয়া সাহজাদীর নশ্বর দেহ—চিরদিনের জন্য রক্ষিত হয়। সেই দেহ মাটীতে মিশাইয়াছে—সে আজ তিনশত বৎসরের কথা—তাঁহার সহজাত সুকোমল নারী প্রবৃত্তি—কোথায় পঞ্চভূতে বিলীন হইয়াছে—যাহা নশ্বর তাহা গিয়াছে—যাহা অবিনশ্বর তাহা আছে। আজও ভীমার মৃদু কল্লোলিত সৈকত ভূমির উপর তৃণ গুল্মাচ্ছাদিত অতীতের প্রেম কাহিনী জড়িত—করুণ স্মৃতিময়—জেব উন্নিসার নির্জ্জন ভগ্নপ্রায় সমাধি—পান্থের নেত্র পথে পতিত হয়।*

বাদসাহ ঔরঙ্গজেব—নিজব্যয়ে কন্যার এই স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।† তাঁহার জীবন সময়ে এই সমাধির উপর আর কেহই সযত্ন দৃষ্টিক্ষেপ করিত না। সাহজাহানের একটা প্রথা ছিল, তাঁহার জীবিত অবস্থায়—তাঁহার বিবাহের শুভ মুহূর্ত্তের—পবিত্র প্রেমের স্মরণার্থে—এক স্বর্ণ রৌপ্য খচিত—মতি মণ্ডিত আস্তরণ বর্ষে বর্ষে—তাঁহার প্রণয়িণী মমতাজমহলের সমাধির উপর বিছাইয়া দিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতেন। জেব্‌উন্নিসার মৃত্যুর পর বাদসাহ ঔরঙ্গজেবও—সযত্নে প্রিয়তমা কন্যার সমাধির উপর প্রতিবর্ষে পবিত্র-স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিতেন। পুষ্পপত্রাদিতে, ইস্তাম্বুল অগুরুর সুগন্ধে সেই সমাধি কক্ষ এক এক সময় স্বর্গীয় ভাবাপন্ন হইত। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে—সে যত্ন গিয়াছে—সে আদর গিয়াছে। লোক সমাগমবিহীন এক ক্ষুদ্র গ্রামের তীরবর্ত্তী নির্জ্জন সমাধি এখন দুর্ভেদ্য গুল্মলতাচ্ছাদিত হইয়া জেব উন্নিসার পবিত্র স্মৃতি জীর্ণ ভাবে রক্ষা করিতেছে।

জেব উন্নিসার সম্বন্ধে ধারাবাহিক বিবরণ সংগ্রহ করা বড় কঠিন। নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া আমরা যাহা কিছু পাইয়াছি—ইতিহাসপ্রিয় প্রদীপের পাঠকগণকে তাহা উপহার দিলাম। জেব্‌উন্নিসার কবিতাগুলি বড় মর্ম্মস্পর্শী। সেগুলির উপর নির্ভর করিয়া একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। এ সম্বন্ধে দুই একখানি মূল পারসী গ্রন্থ আমরা বহু কষ্টে সংগ্রহ করিয়াছি। ভবিষ্যতে তাহা হইতে অনুবাদ করিয়া পাঠককে জেব্‌উন্নিসার প্রাণস্পর্শী আক্ষেপময় কবিতার সহিত পরিচয় করাইয়া তাঁহার হৃদয়ের পবিত্র অবস্থার আভাস দিবার ইচ্ছা রহিল। এ কবিতাগুলির আজও, মুসলমান পণ্ডিতগণের মুখে শত সহস্রবার আবৃত্তি হইয়া থাকে। হাফেজ, ওমার, ফের্দ্দৌসী, আমীর খসরু। কায়জী প্রভৃতির পাণ্ডিত্যপূর্ণ—গভীর ভাবময় কবিতার সহিত তুলনায়—সাহজাদী জেব্‌উন্নিসার কবিত্ব কোন অংশেই ন্যূন নহে। ইহা আমার নিজের কথা নহে—অনেক প্রবীণ মৌলবীর কথা—অনেক পণ্ডিতের কথা। একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজপুরুষ এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন।*

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

* Aurangzeb left Delhi with his wives and his army, an exceeding great multitude camels, elephants, bullocks, horses and his ewe lamb Nisa on that long and dreary series of campaigns for 27 years, from which he never returned again Nisa I say went with her fatter. She could have gone to kashmire on the wings of the wind to blessed Balkh to Shiraj or Samarkand where was the tomb of her great ancester Tamercane.

Auranzeb, campaiegn in Deccan P. 299.

† এই সমাধি মন্দিরের প্রাঙ্গণটী ১৫০ ফিট। বর্গাকার প্রাঙ্গণের মধ্যে সমাধি। চারিধারে দালান। দালানের বাহিরে চারিদিকে সমুন্নত প্রাচীর। প্রাচীরের চারি কোণে চারিটী মিনার। সার জেমস্ মেকিন্টাস্ ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে যখন বিজাপুরে ছিলেন—তখন তিনি এই প্রণয়কাহিনী শুনিয়া উৎসুক চিত্তে জেব্‌ উন্নিসার সমাধি দেখিতে যান। তাঁহার যত্নে সমাধি গৃহটী সংস্কৃত হয়। মেকিন্টস্ তৎকালে বোম্বের গবর্ণর। তিনি এই সমাধি দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"There is no inscription, but Love, Truth, and Duty are imperishable and need no other record."

* She (Zieb-Un-nisa) attained no mean fame as a talented poet under the name of "Makhfi" and her hymns are the purest and sweetest compositions in the Indo-persian literature.

P. Whalley C. S. Azimgurh.

কুসুমে কণ্টক।

অনেকে লিখিল পদ্য নানাবিধ—নব্য সদ্য
শিশু হ'তে অশীতিবর্ষীয়
প্রেমের বিষয়ে ;—কিন্তু প্রেমতত্ত্ব এক বিন্দু
বোঝে নাই কেউ, দেখে নিও
দেখো, যা'রা নব্য দুগ্ধ পোষ্য সম, তা'রা মুগ্ধ
তারা শুদ্ধ নারীজাতি খোঁজে
হইলে প্রবীণ শান্ত, প্রণয়ের আদ্যোপান্ত,
গাঁজাখুড়ী, সেটা বেশ বোঝে
অবশ্য অনেকে বিশ্বময় আছে প্রেম শিখা
শেলি কিম্বা টেনিসনে ভোলে
ভাবিয়া দেখিলে চিত্তে প্রণয়ের ইতিবৃত্তে
পড়ে কিন্তু ভয়ঙ্কর গোলে।

রমণীর মধুরাস্য রমণীর কলহাস্য
রমণীর মুক্তাদন্ত পাতি,
পীযূষ ভাণ্ডার রক্ত অধরের নীচে ; ব্যক্ত
দুটি গণ্ডে কমলের ভাতি—
সুবঙ্কিম ভ্রূ আকর্ণ, দুটি চক্ষু পদ্মপর্ণ
ভ্রমর সুকৃষ্ণ তারা দুটি,
তাহাতে বৈদ্যুত দৃষ্টি তাহাতে অমিয়া বৃষ্টি
সৃষ্টিতে অতুল ; পড়ে লুটি
বিলম্বিত বেণী পৃষ্ঠে, সর্পভ্রম হয় দৃষ্টে
কবিদের যাহে, আমি জানি
মরাল গ্রীবাটি, বক্ষ পীন ; আলিঙ্গন দক্ষ
মৃণাল সুবাহু দুইখানি ;
আমি জানি তার মর্ম্ম, আমি জানি—হা অদৃষ্ট
বলিতে সঙ্কোচ হয় মনে—
আমি জানি তার সূক্ষ্ম অর্থ, কিন্তু হায় তবু
সেই নিন্দা উচ্চারি কেমনে?
হোথা বসি' কবি বর্গ নিজ মনে রচে স্বর্গ,
গড়িছে আকাশে হর্ম্ম্য সবে,—
বাহিবে ধরিয়া যষ্টি ;—তা যা করেন মা ষষ্ঠী—
আজি তাহা বলিতেই হবে।

এই প্রেম, এই ঈর্ষা—শুধু, কাম শুধু, লিপ্সা—
এ শুদ্ধ বিধির বিধি, ভবে
রাখিতে তাঁহার সৃষ্টি ; আর এই রূপবৃষ্টি—
প্রলোভনে বাঁধিতে মানবে।
মনুষ্যের আশা উচ্চ, বৈধ বিধি করি' তুচ্ছ
আকাশে উঠিতে চায় যদি—
সেই গদ্যময় মধ্যে আকর্ষণ করি' বাধ্য
স্ববলে তাহারে নিরবধি।
সব দম্ভ করি খর্ব্ব, করি চূর্ণ সব গর্ব্ব
টেনে আনে ধূলায় সবলে
স্বর্গ আশা থাকি' মর্ত্তে!—অমৃতের পরিবর্ত্তে
তাই পাই তিক্ত হলাহলে।
সেই স্বপ্ন গড়ি হর্ষে—ঘটনা কঠিন স্পর্শে
টুটে যায় সেই স্বপ্নখানি—
দুপৃষ্ঠায়, হায় সর্ব্ব ফুরায় প্রেমের পর্ব্ব,
না হ'তে অস্ফুট দুটো বাণী—
তাই এ হতাশা নিত্য বিস্ময় ; তাই চিত্ত
সুগভীর নিরাশায় কাঁদে ;
নীরস মলিন ছিন্নমূল লতাসম খিন্ন
নুয়ে পড়ে শীর্ণ অবসাদে।
আজি যাহা অতিরিক্ত মিষ্ট, কল্য তাহা তিক্ত,
কল্য তাহা কালকূটে ভরা ;
বুঝি শেষে, এ সুবর্ণ ধাতু, নহে খাটি স্বর্ণ
এ পিত্তল শুদ্ধ গিল্টি করা!
যাহা বক্ষে এইমাত্র পুষিয়াছি দিবারাত্র
গোপনে আদরে রাখিয়াছি—
বুঝি শেষে তার মূল্য ;—গর্দ্দভের ভার তুল্য
ফেলিতে পারিলে তাহা বাঁচি।

প্রেম পরিণয়ে দ্বন্দ্ব ;—প্রকোষ্ঠে অর্গল বন্ধ
থাকিতে চাহে না প্রেম ;—সুখে
তুলি পক্ষ নিরুদ্বিগ্ন, টুটি সর্ব্ব বাধা বিঘ্ন
চলে' যায় শূন্য অভিমুখে।

হায় মূর্খ হায় অন্ধ চরণ শৃঙ্খলে বন্ধ—
ধূলায় নিলীন মর্ত্ত্যবাসী—
ভেবেছিলে লতাপুঞ্জে রচিবে প্রণয় কুঞ্জে
ধরাতলে ; পুষ্প রাশি রাশি
ফুটিবে মধুর গন্ধ ; কোকিলের গীতচ্ছন্দ
উঠিবে ঝঙ্কারি ;—শ্যামঘন
পল্লবিত অতি স্তব্ধ নিভৃতে আয়াসলব্ধ
বিশ্রামে ভুলিবে তীক্ষ্ণ ব্রণ
বিষম যন্ত্রণা, মজ্জা নিহিত দারিদ্র্য লজ্জা,
কুসুম শয্যায় ; মাথা রাখি—
মদিরা বিভোর বক্ষে, একটি কোমল চক্ষে—
হা বিধাতা ! শেষে সব ফাঁকি !
রমণীর মুখকান্তি দেবীসম হয় ভ্রান্তি—
উদ্যম সঙ্গীত জেগে উঠে—
চঞ্চল চরণ ভঙ্গে ; বিলাস শ্রী অঙ্গে অঙ্গে—
তরঙ্গে তরঙ্গে তার ছুটে ;
চুম্বন চাহনি, হাস্য বিচিত্র বিভ্রম লাস্য,
দেহবল্লী অনুরাগ শ্লথ—
—ভিতরে মনুষ্যমাত্র ; ও বক্ষেও দিবারাত্র
ঈর্ষা দ্বেষ মানুষেরই মত।

ভূধর দূরধিগম্য, দূর হতে অতি রম্য
ধূম্র শ্যাম তুষার কিরীটী—
নিকটে বিকট শীর্ণ বন্ধুর কঙ্কর কীর্ণ
শুষ্ক—যেন উকিলের চিঠী !

গীতিকা।*

নবীন কবি প্রমথনাথের "গীতিকা" নামক নূতন কবিতা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই রচনা পারিপাট্যের অনুরূপ সুন্দর ও সুকোমল হইয়াছে ;—যে দুই চারিটি ছাপার ভুল আছে, তাহা না থাকিলে গ্রন্থখানি মুদ্রাকরের গৌরবের সামগ্রী হইত। কবির তরুণ জীবনে বঙ্গভাষা 'পূজিবার আশা' জাগিয়া উঠিয়াছে ; 'পদ্মা' নামক কবিতা পুস্তকে তাহার পরিচয় পাইয়া সাহিত্য সমাজ কবিকে সমাদর প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করে নাই। কবি তথাপি দৈন্য জ্ঞাপনের জন্য 'গীতিকার' প্রথম কবিতায় লিখিয়াছেন :—

তবু যদি চাহ সেবা, দিব আনি পদে
আমার সকল ;
ভগ্নমনোরথ মাঝে মণিমুক্তা নাহি সাজে
ভিখারীর ক্ষুধা সম, দাসের গীতিকা
দৈন্যের সম্বল,
শুধু অশ্রুজল।

এরূপ অশ্রুর প্রয়োজন আছে,—এরূপ সেবারও প্রয়োজন আছে। বঙ্গভাষার অধিকাংশ সেবক পুত্রকলত্র ভারনিপীড়িত স্কন্ধে সংসারের বোঝা বহিয়া নিয়ত গলদ্‌ঘর্ম্ম কলেবর ;—তাহাদের উদ্যম অল্প দিনেই অবসন্ন হইয়া পড়ে। যাঁহারা লক্ষ্মীর কৃপায় অভাবের তীব্র কশাঘাত হইতে দূরে রহিয়া নিয়ত মাতৃভাষার সেবা করিতে পারেন, প্রমথনাথ তাঁহাদের একজন ; সুতরাং তাঁহার সেবা কে না চাহিবে ?

'গীতিকা' একখানি সুখপাঠ্য কবিতা পুস্তক বলিয়া সমাদর লাভ করিবার যোগ্য হইয়াছে। ভাষা ভাল,—যেন সরল সুন্দর অবিরাম গতিতে অনাবিল জলস্রোতের ন্যায় কল কল ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহাতে আবেগ আছে, আবর্ত্ত নাই ; কল্লোল আছে, কোলাহল নাই ; মাধুর্য্য আছে অথচ গাম্ভীর্য্যের অভাব ঘটে নাই। এরূপ ভাষা সহজেই পাঠক-চিত্ত আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়।

ভাববিকাশ সময়ে নবীন লেখকের মর্ম্মব্যাকুলতায় তাঁহার অন্তরাভ্যন্তরে যে উৎস ধারা ফুটন্ত প্রস্রবনের ন্যায় উদ্বেলিত হইয়া উঠে, লেখনী তাহাকে সম্যক্ ভাষানিবদ্ধ করিতে অক্ষম হইয়া সময়ে সময়ে অজ্ঞাতসারে ভাবগুলিকে প্রহেলিকার ন্যায় জটিল করিয়া দেয়। পুরাণে এই শ্রেণীর জটিলতা আছে, তাহার নাম ব্যাসকূট—দোষের মধ্যেই পরিগণিত, বঙ্গসাহিত্যে এই শ্রেণীর দোষ ভক্তপাঠকের নিকট সৌন্দর্য্য বলিয়া পরিচিত !

"গীতিকায়" এই শ্রেণীর কাব্য-সৌন্দর্য্য যে একেবারে নাই তাহা নয়,—তবে নাই বলিলেও চলে।

'গীতিকায়' একটি মাত্র গীত আছে, তাহা আদ্যন্ত উদ্ধৃত করিবার যোগ্য। সে গীতে নবীন কবি বঙ্গভূমির বন্দনা গাহিয়াছেন :—

নমঃ বঙ্গভূমি শ্যামাঙ্গিনি,
যুগে যুগে জননী, লোক পালিনি !
নমঃ বঙ্গভূমি শ্যামাঙ্গিনী,
যুগে যুগে জননী, লোকপালিনী !
সুদূর নীলাম্বর-প্রান্ত সঙ্গে নীলিমা তব মিশিছে রঙ্গে,
রূপসী. শ্রেয়সী, হিতকারিণী ;
তব তটরাজি চুম্বিয়া হর্ষে বহে তটিনী কত বর্ষে বর্ষে ;
তুমি ক্ষুধা-তৃষা- শ্রমহারিণী।
কোন ইতিবৃত্ত আবরিয়া বক্ষে, অশ্রুকলঙ্ক ধরিয়া চক্ষে
আছ ধূলি-শয়নে, মলিনা যোগিনী।
তাল-তমালদল নীরবে বন্দে, বিহঙ্গ স্তুতি করে ললিত সুছন্দে ;
আনন্দে জাগ, অয়ি কাঙ্গালিনি !
ফল-ফুল-শোভিত মোদিত কুঞ্জে, মৃদুমধুরস্তবে অলিকুল গুঞ্জে,
আনন্দে জাগ, অয়ি উদাসিনি !
কিসের দুখ, মাগো, কেন এ দৈন্য, শূন্য শিল্প তব বিচূর্ণ পণ্য
হা অন্ন, হা অন্ন,—কাঁদে পুত্রগণ ?
চাহ প্রসন্ন অভয়-নেত্রে ফলিবে সুবর্ণ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে,
চির-উর্ব্বরা তুমি অন্নদায়িনী।

* শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত। কলিকাতা কুন্তলীন প্রেস হইতে প্রকাশিত।

আনহ বচন মৌন মুখচন্দ্রে. আহ্বান-শ্লোক গাহ মেঘমন্দ্রে ;
যাবে দুখ, ওগো সন্তানশালিনি !

এই গীতের সঙ্গে যে করুণ স্বর মিশিয়া আছে, তাহাতে মোহ আছে, অবসাদ নাই ; চেতনা আছে, উল্লম্ফন নাই। মাতাকে "বহুবলধারিণী" "রিপুদলবারিণী" বলিলে শুনিতে মন্দ শুনায় না, কিন্তু আমাদের মা বলিয়া চিনিয়া লইতে কিছু ইতস্ততের মধ্যে পড়িতে হয়। সত্য যতই নির্ম্মম ও কঠোর হউক, তাহার মধ্যে গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে মাধুর্য্য মিশিয়া রহে—তাহা কাব্য সৌন্দর্য্যের অনুপযুক্ত উপাদান নহে। প্রমথনাথের 'বঙ্গবন্দনায়' মাতা 'মলিনা যোগিনীর ন্যায়' নিয়ত ধূলি শয়নে শায়িতা ; তথাপি সে নিরভিমানিনী কাঙ্গালিনী নিসর্গসম্পদে সুসম্পন্না—'তাল-তমালদল বন্দিতা', ফুলফলশোভিতা, অলিকুলগুঞ্জিতা ! এ কীর্ত্তনে আবেগ আছে, আড়ম্বর নাই ; পদবিন্যাসকৌশল আছে, অসংযত লিপি-কণ্ডূয়ন নাই ! ইহা কবিতার হিসাবেও সুন্দর, সঙ্গীতের হিসাবেও সুমধুর।

এই মাতৃবন্দনার পর কবি স্বদেশ ও স্বজাতিকে লক্ষ্য করিয়া ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমানের ছায়া অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের 'যুগযুগ ব্যাপী ইতিহাস' স্মরণ করিয়া মাতা রোরুদ্যমানা ;—সুতরাং অতীত বড় উজ্জ্বল ছিল না ! আমরা এখনও দৃঢ়পদে উচ্চ লক্ষ্যের দিকে ছুটিতে শিখি নাই ;—সুতরাং বর্ত্তমান সবিশেষ আশাপ্রদ নহে ! তথাপি কবি গাহিয়াছেন :—

"আজ হেরিতেছি, যেন মূর্চ্ছাহত প্রাণ
গৃহে গৃহে, পলে পলে লভিছে উত্থান ;
মেলিতেছে মহালস-নিমীলিত আঁখি ;
ডাকিতেছে দুএকটি প্রভাতের পাখী।"

সুতরাং আমাদের অতীত ও বর্ত্তমান যাহাই হউক, ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। এ কবিকল্পনা নিতান্ত অলীক হইলেও মর্ম্মস্পর্শী। শত বর্ষের মধ্যে আমরা যাহা কিছু ধরিতে চাহিয়াছি, সমস্তই যেন মুঠার ভিতর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অকাতরে পাণ্ডিত্য বিতরণ করিয়াছে, মুক্তহস্তে চরিত্রবল বিতরণ করিতে পারে নাই ; সমাজনীতি ও ধর্ম্মসংস্কারের উদ্যমের অভাব ঘটে নাই, অথচ একপদ অগ্রসর না হইতে পাঁচপদ পিছাইয়া পড়িতে হইয়াছে ; আবেদন নিবেদন করুণ ক্রন্দন অরণ্য-রোদনে পর্য্যবসিত হইয়াছে, রাজনৈতিক অধিকার লাভে এখনও সফলকাম হই নাই। যাহা কিছু সাফল্য, সে কেবল সাহিত্যক্ষেত্রেই দেদীপ্যমান। ভাষা পরিস্ফুট হইয়াছে, সাহিত্য সুমার্জ্জিত হইয়াছে, সাহিত্য সেবকের দল শক্তিলাভ করিয়াছে। কেহ কেহ বাঙ্গালীর স্বভাবসুলভ দলাদলির পঙ্কিল পল্বলে পরিব্যাপ্ত হইলেও, অনেকে তাহার বাহিরে থাকিয়া নীরবে সাহিত্যসেবায় জীবন উৎসর্গ করিতেছে। ইহারাই কি কবিকথিত 'প্রভাতের পাখী' ? তাহা হইলে এই পাখীর দলের প্রভাতসঙ্গীতের তাল লয়ের উপর একটু দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ইহারাই ভবিষ্যতের ভাল মন্দের ভাগ্য বিধাতা ! ইহাদের মধ্যে কবিকুল যাত্রাপথের ভেরীবাদক ;—তাহারা যেখানে লইয়া যায়, মন্ত্রমুগ্ধ পাঠকসমাজ সহজেই সেই দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। টপ্পায় টপ্পায় বঙ্গসঙ্গীতসমাজের আসর আচ্ছন্ন হইয়া আছে। এ সময়ে বীণাপাণির বরপুত্রগণ বীণা বাঁধিতে বসিয়া একটু সাবধান না হইলে, কবির এ আশা, এ প্রভাতের পাখী ডাকা, এ মহালসনিমীলিত আঁখিমেলা, এ মূর্চ্ছাহত প্রাণের নবোত্থানের ভরসা, সকলই বুঝি বৃথা হইয়া পড়িবে !

'গীতিকার' কবি যে সুরে বীণা বাঁধিয়াছেন, তাহা গুরু গম্ভীর নহে—মৃদু মধুর ; কিন্তু মাধুর্য্যে গাম্ভীর্য্যে সুসংযত বলিয়াই বোধ হইতেছে। সাহিত্যসেবার আকাঙ্ক্ষা সকলের উপর ঝঙ্কার দিয়া বাজিতেছে :—

"কোন্ ধ্বনি তব কণ্ঠে শুনাইবে ভাল
আমি কি তা জানি ?
নাহি বুঝি ভালবেসে কোন্ গান নিবে শেষে ;
আমি কি যোগাতে পারি ওই সুধামুখে
সুধাময়ী বাণী
অয়ি বীণাপাণি !"

ইহার মধ্যে আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আগ্রহ আছে ;—যাহা ভাল তাহাই গাহিব, এইরূপ একটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞার আভাস আছে, সুতরাং সরলভাবে সমালোচকের মতামতে কর্ণপাত করিবার সম্ভাবনা আছে।

বঙ্গসাহিত্যের পাঠক নাই বলিয়া অভিযোগ উঠিয়াছে ;—এ অভিযোগ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। রবি গাহিয়াছেন :—

"ওরে আমার গান,
কোন্ খানে তোর স্থান ?

এবং চারিদিক চাহিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তাঁহার সাধের গান সিন্দুর আঁকা কাজল মাখা বালিশ ঢাকা হইবার জন্যই যেন লোভে কম্পমান ! প্রমথনাথও এইরূপ একটা অভিযোগ চাপিয়া রাখিয়া, অন্তঃপুরে কবিতা শুনাইবার ভরসাকেই "রচনার তৃপ্তি" বলিয়া "সুখের লাজে" কল্পনাভরে মর্ম্মে মরিয়া গাহিয়াছেন :—

"কে তোমরা স্নেহময়ী, বসি দূর অন্তঃপুরে,
পড়িতেছ আমার কবিতা !
কবি সে কল্পনা ভরে, এই লাজে সুখে মরে,—
লক্ষ্মী হেরিছেন তার বাসনার চিতা !"

বঙ্গকুললক্ষ্মীদের কবিতারসমাধুর্য্য সম্ভোগের শক্তি বড় বেশী বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে ;—সত্য হইলে সুখের হইত। কিন্তু সে আশা যে দুরাশা মাত্র, কবি তাহা না জানেন এমন নয় ; তাই গাইয়াছেন :—

"হে তৃষা ফুটিছে গানে, কি অর্থ কি তত্ত্ব তার—
এই নিয়ে মোদের বিচার ;
তব মর্ম্মে রন্ধ্রে রন্ধ্রে, সে গীতের রসে গন্ধে
হইতেছে পলে পলে পুলক সঞ্চার !"

না বুঝিয়া কেবল পুলকে শিহরিয়া কবিতার সমাদর করিলে "রচনার তৃপ্তি" হয় হউক। কিন্তু "মোদের বিচার" হইতে পলায়ন করিয়া করিয়া একেবারে নীলাম্বরাঞ্চলের আশ্রয় লইবার প্রয়োজন ছিল না। তাহা হয় ত সুখময় স্থান, কিন্তু সর্ব্বথা নিরাপদ নহে। আমরা গানের তৃষা লইয়া অর্থ খুঁজিয়া তত্ত্ব বাছিয়া বিচার করিতে চাহি ;—তাহা সত্য হইলেও, অসঙ্গত নহে। এখনও নবযুগের অভ্যুদয় হয় নাই, যে যুগে "তাঁহারা" চালাইবেন, "আমরা" চালিত হইব, "তাহারা" বুঝাইয়া দিবেন আর "আমরা" মাথা পাতিয়া বুঝিয়া লইব, তাহা এখনও দূর হইতে সুদূরে লুক্কায়িত। এখনও "আমরা" না বুঝিলে "রচনার তৃপ্তি" নাই ! সুতরাং আমাদের বিচারের উপর কবির এই অন্যায় অভিযোগের মীমাংসা হওয়া উচিত। কবি তাঁহার পক্ষপাত শূন্য মীমাংসা করিবার চেষ্টা করেন নাই ; কারণ কবির পথ নিষ্কণ্টক। তিনি গাহিয়াছেন :—

"ওহে জ্ঞানবৃদ্ধ, ছাড় পরিহাস-ছল ;
কেন কহ প্রেম তুচ্ছ, বাসনা বিফল ?
যখনি কবির সৃষ্টি
প্রেয়সীরে করে দৃষ্টি,
তুমি কেন অভিমানে কর, হায় হায় ;
নিবার অর্পিতে অর্ঘ্য সুন্দরের পায় ?"

সুন্দরের পায় অর্ঘ্য দান করা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা,—কেহ তাহাতে বাধা দিতে পারে না। কিন্তু সুন্দর কি, তাহা লইয়া মতভেদ থাকা অসম্ভব নয়। সুন্দরীর পাদপদ্মে জীবনের দিনগুলি একটি একটি করিয়া গণিয়া গণিয়া অর্ঘ্যদান করিলে, কবিজীবনের একাংশের তৃপ্তি ঘটিতে পারে অপরাংশ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িবে। সংসার সৌন্দর্য্যের সঙ্গে গাম্ভীর্য্যকে মিশাইয়া আদরের সঙ্গে সম্ভ্রমকে সংযুক্ত করিতে বলে।

প্রিয়া কাহার নিকট না প্রিয়তমা, মধু কাহার নিকট না মধুময় ;— কিন্তু সে কথাটা হাটে দাঁড়াইয়া হট্টগোলের মধ্যে গলা ভাঙ্গিয়া নিশিদিন চেঁচাইয়া না বলিলেও না চলে এমন নহে ! সে কথা বলিবার সময়ে কবি ভক্তিবিগলিত প্রাণে ভাবগদ্গদ কণ্ঠে সরমে সম্ভ্রমে প্রিয়ার সমাদর রক্ষার্থ যত্ন না করিয়া, তাঁহাকে নিতান্ত অসংবৃতা সাজাইয়া তনুলতার হাড় মাংস চামড়ার মোহে মরিয়া থাকিলে, দেখিতে বড় সুন্দর হয় না ; —তাহার উপর যবনিকা ফেলিবার প্রয়োজন হয় ! সৌন্দর্য্যের বিকার লইয়া যে কাব্যসৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইতে পারে না, কবিমাত্রেরই তাহা বুঝিয়া চলা আবশ্যক। সুখের বিষয় "গীতিকার কবি" শারীরিক সৌন্দর্য্যের মোহ অপেক্ষা মানসসৌন্দর্য্যের দিকেই অধিক আকৃষ্ট। তাঁহার "অর্জ্জুনোর্ব্বশী" নামক ক্ষুদ্র কবিতায় ইহা সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে।

"চিত্রসেন মুখে শুনি আপনার বাঞ্ছিত বারতা,
মদভরে তরঙ্গিয়া সুকুমার ক্ষীণ তনুলতা
প্রসাধনে রত, স্বর্গে, স্বর্গপুরে অতুল্যা রূপসী,
ঝলকিত পুলকিত পূর্ণিমার পরিপূর্ণ শশী
অলক্ষ্যে করিতেছিল, কক্ষ মাঝে কটাক্ষক্ষেপণ,
অসম্বৃতা উর্ব্বশী যখন !
মাণিক্যকিঙ্কিণী রঙ্গে কটিতট নিল আলিঙ্গিয়া ;
মুক্তিকার কণ্ঠমালা স্তনমূলে পড়িল মূর্চ্ছিয়া !
অদৃশ্য অম্বরপথে একাকিনী পার্থের সদনে
উন্মত্তা উর্ব্বশী চলে অভিসারে, আকুল গমনে !
ফুলশরে বিমোহিল আচম্বিতে ত্রিলোক অজ্ঞাতে
সেই দিন পূর্ণিমার রাতে !"

একে মদাকুলা উর্ব্বশী, তাহাতে স্বয়ং যাচমানা ; একে তরঙ্গিত তনুলতা, তাহাতে মণিমাণিক্যে বিভূষিতা ; একে রজনী, তাহাতে পূর্ণিমা ;—একমাত্র দ্বারী পার্থদ্বারে দণ্ডায়মান ছিল, সে বেচারাও সভয়ে বিস্ময়ে দ্বার ছাড়িয়া দূরে সরিয়া গেল ! এমন সময়ে এমন স্থানে এই অনিন্দ্য সুন্দরীর পাদপদ্মে মর্ত্ত্যবীর ধনঞ্জয় ব্রহ্মচর্য্যকে বলিদান করিলে নিতান্ত অসাজন্ত হইত না,—নরশক্তি দেবেন্দ্রশক্তির নিকট পরাস্ত হইল বলিয়া বিশেষ ব্যথা পাইবারও স্থল থাকিত না। কিন্তু অর্জ্জুন স্বর্গ হইতে বিদায় লইতেও প্রস্তুত ;—ব্রহ্মচর্য্য বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইলেন না ! এই চিত্র দর্শন করিলে উর্ব্বশীর তনুলতা অর্জ্জুনের মানস সৌন্দর্য্যের ক্ষণপ্রভায় মলিন হইয়া পড়ে ; অর্জ্জুনে ভক্তি ও উর্ব্বশীতে ঘৃণার উদ্রেক হয়। ইহা মানুষকে রূপের মোহ হইতে চরিত্রবলের সৌন্দর্য্যের দিকে আকর্ষণ করে। এই পৌরাণিক চিত্র যথার্থই সুন্দর। বাছিয়া বাছিয়া অর্জ্জুনের এই চিত্রটি প্রদর্শন করায়, কবি কোন্ শ্রেণীর সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী, তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। অর্জ্জুন যেখানে যেখানে পদস্খলন করিয়াছিলেন, সেই সকল চিত্র উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর বর্ণে চিত্রিত করিয়া দেখাইলে বুঝি এত সুন্দর হইত না। পদস্খলনের ইতিহাস সাজাইয়া গুছাইয়া লালে লাল করিয়া দেখাইয়া ফল কি? তাহা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক হইলেও সুন্দর নহে। আমরা যখনই আত্মজয়ে কৃতকার্য্য হই, তখনই জীবনের সৌন্দর্য্য উপভোগ করি ; পরাজয়ের কাহিনী কলঙ্কলিপ্ত ;—তাহার স্মৃতিও সুখকর নহে। তাহার জন্য নিজের ও পরের কাছে চিত্তদৌর্ব্বল্যের দোহাই দিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে পারি, ক্ষমার যোগ্য বলিয়া বেকসুর খালাস পাইবারও ভরসা রাখিতে পারি, কিন্তু, আমি যেদিন শিক্ষা দীক্ষা ভুলিয়া আমার ব্রহ্মচর্য্য নারীপদতলে বিসর্জ্জন করিয়াছিলাম, সেদিনের সেই চিত্রপট সুন্দর বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য তোমার গৃহে ঝুলাইয়া দিবার দাবি করিতে পারি না, তাহাকে নিতান্ত অসঙ্গত আবদার ভিন্ন আর কি বলিব?

বঙ্গসাহিত্যসেবকবর্গের শ্রম যত্ন উদ্যম অনুষ্ঠানে দেশের মধ্যে যে সকল ভাববিদ্যালয়ে অন্তঃপুরে রঙ্গমঞ্চে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমে রক্তমাংসের সঙ্গে মিশ্রিত হইবার উপক্রম হইতেছে, তাহার মধ্যে কাব্যরোগ প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বালক কথায় কথায় বালিকার অর্থহীন ভালবাসায় আপনাকে উপেক্ষিত ভাবিয়া গলায় ফাঁসি দিতে চায় ; বালিকাবধূ বর্ত্তমানের সৌভাগ্যমধু হাতের কাছে পাইয়াও, যাহা পায় নাই বা পাইবে না, তাহারই জন্য হায় হায় করিয়া দিবস কাটাইয়া দেয় ! এ রোগের ঔষধ নাই ;—যাঁহারা রোগের মূল, সেই কবিকুল দয়া করিয়া আবার শান্তি পাঠ না করিলে, বঙ্গসংসার হাহাকার করিতে বিরত হইবে না। প্রমথনাথ "পল্লীবাসিনীর" চিত্রাঙ্কন করিবার ছলে সুকৌশলে নাগরিকার ছবিও অঙ্কিত করিয়া তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন। এরূপ সমালোচনা সর্ব্বদা প্রার্থনীয়। ভাবে ভাষায় সম্ভ্রমে সরলতায় "পল্লীবাসিনীর" প্রতি নবীন কবির এই সাদর সান্ত্বনা পূজার ন্যায় পবিত্র। দেবীকে তাঁহার সিংহাসন হইতে নামাইয়া আমাদের ক্রীড়াসহচরী করিয়া আমরা যে অপরাধ করিয়াছি, তাহাকে কাব্যসৌন্দর্য্যের উপাদান বলিয়া আস্ফালন করা শোভা পায় না। তাজমহলকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহার অলৌকিক উপাদানে আর একটি অতুল মন্দির গঠন করিলে, শিল্পীর শিল্পকৌশলের প্রশংসা করিতে পারে ; রুচির প্রশংসা করিতে সাহস পাইবে না। বঙ্গ রমণীর পুরাতন সৌন্দর্য্যের আদর্শ সম্ভ্রমে সরলতায় মধুর হইতে মধুরতর ছিল ; আমরা তাহাকে চুরমার করিয়া গাউন বনেটের সঙ্গে অনেক বিলাতী ভাবভঙ্গী আনিয়া ফেলিয়াছি ; তাহাতে সৌন্দর্য্য বাড়িয়াছে কি নষ্ট হইয়া গিয়াছে এখনও তাহা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবার অবসর ঘটে নাই ! যাহার কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব আছে, সে ব্যক্তিগত বিশেষত্ব বিসর্জ্জন দিতে চাহে না ;—যে যাহা সে তাহাই থাকিবার জন্য প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে যথাসাধ্য সংগ্রাম করে। আমাদের মনুষ্যত্বের সঙ্গে জাতিগত বিশেষত্ব চলিয়া গিয়াছে, সুতরাং আমাদের কবি ও কাব্য স্বভাবসুলভ সরল সৌন্দর্য্যে পরিতৃপ্ত না হইয়া, কাল্পনিক সৌন্দর্য্যের জন্য পাগল। এ দুর্দ্দিনে "পল্লীবাসিনীর" ন্যায় কবিতা সমাদর লাভ করে ত কবির পুণ্যবল বলিতে হইবে !

কবির "চিতাভিষিক্তা" ও "অনলোত্থিতা" ও "আত্মবিস্মৃতা" সীতা দেবীর অগ্নিপরীক্ষার চিত্র,—সে চিত্র সৌন্দর্য্যে ও গাম্ভীর্য্যে সুসংযত এবং পতিভক্তির শান্তশীল বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত। এই চিত্রে কবি যে বীরনারীর আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক তুলিকা বিন্যাসে যে ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য দেদীপ্যমান, 'নারীপর্ব্ব' নামক কবিতায়ও কুরুক্ষেত্রসমরক্ষেত্রশায়িনী বীররমণীগণের চিত্রে তাহার একাংশও পরিস্ফুট হয় নাই ;—তাঁহারা ক্ষোভে রোষে অট্টহাস্যে উন্মত্তাবৎ কখনও রোরুদ্যমানা, কখন বা হাস্যপরায়ণা ! তাহাতে মহাভারতোক্ত নারীপর্ব্বের বর্ণনার সহিত সামঞ্জস্য থাকিলেও, বীররমণীর উপযুক্ত শোকপ্রকাশের গাম্ভীর্য্য নাই,—যাত্রাওয়ালার গান্ধারী যেমন অশিক্ষিতা শোকাকুলা বঙ্গপল্লী রমণীর ন্যায় নিরন্তর রোরুদ্যমানা, ইহাও তাহাই এবং সেই শ্রেণীর শোককাহিনী ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহাতে ক্ষত্রিয় বীররমণীর ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের আদর্শ নিতান্ত হীন হইয়া পড়িয়াছে ঃ—

"ছুটিল শোকের বন্যা, কে কারে নিবারে?
পূর্ণ হ'ল কুরুক্ষেত্র হায়—হাহাকারে।"

কুরুবধূ শবালিঙ্গন করিয়া সারি সারি মূর্চ্ছাহত পড়িয়া রহিয়াছেন, যদিবা কখন ক্ষণকালের জন্য চেতনালাভ করিতেছেন, তখন দেবতার নাম ভুলিয়া প্রিয়জনের নাম ধরিয়া উচ্চৈস্বরে ডাকিয়া রোদন করিতেছেন, বুঝিবা সংগ্রাম মৃত্যুলাভ ও স্বর্গবাসের উচ্চাশাকে ক্ষত্রিয়জীবনের একমাত্র ধ্যান জ্ঞান বলিয়া সুপরিচিত, তাহাকেও ধিক্কার দিয়া কাতরকণ্ঠে সে কালসমরের কত না নিন্দা করিতেছেন ! ইহার তুলনায় কবি "ভারতপ্রসঙ্গ" নামক কবিতায় মহাভারতরচয়িতা "ঋষি দ্বৈপায়নের" যে

চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অধিকমাত্রায় কাব্যসৌন্দর্য্যের উপযোগী হইয়াছে। কবি হইয়া কবিপ্রতিভার সমাদর রক্ষার্থ যত্নশীল হইলে, সোণায় সোহাগা হয় ; প্রমথনাথ তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তাঁহার "দ্রৌপদী" কুরুসভামাঝে একবস্ত্রা হইয়া দুঃশাসনতাড়িতা পদাহতা ফণিনীর ন্যায় রোষে ক্ষোভে সাধ্বীগর্ব্বে তেজস্বিনী মূর্ত্তিতে যেরূপভাবে দাঁড়াইয়া আছেন, তাহা বড়ই সুন্দর হইয়াছে। এ অবস্থায় দ্রৌপদীর মুখে একটীমাত্রও কথা কহাইলে, সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইত ;—দ্রৌপদী তখন কথা কহিলে, গাম্ভীর্য্য একেবারেই বিলুপ্ত হইত ! কবি কেবল দেখাইয়াছেন ;—

"লাজে ক্ষোভে নারীবক্ষ করিয়া বিদার
দিকে দিকে ধেয়ে গেল দারুণ ধিক্কার।"

এই চিত্র সুন্দর অথচ স্বাভাবিক ; ইহাতে ক্ষত্রিয় ললনার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয় নাই, কবির সৌন্দর্য্যবিন্যাস শক্তিরও যথেষ্ট পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে।

প্রমথনাথের মাতৃভাষার সেবানুরাগ বর্দ্ধিত হউক, তাঁহার কাব্যসৌন্দর্য্যের আদর্শ দিন দিন সমুন্নত হউক ; যিনি তরুণ জীবনে 'পদ্য' ও 'গীতিকা' রচনা করিয়া এরূপ সাহিত্যশক্তির আভাস প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার লেখনী ভবিষ্যতে বঙ্গভাষার পাদপদ্মে বহুরত্ন উপহার প্রদান করিতে পারিবে।

রঙ্গলাল যে ফুলে বঙ্গভাষার পূজা করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, সে ফুল শুকাইবার উপক্রম হইয়াছে। তিনি যে সুরে বীণা বাঁধিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালী বিস্মৃতপ্রায় হইয়াছে,—সে কবিতা এখন অনাদৃতা ; এখন কেবল বিরহব্যথা, প্রিয়তমার মর্ম্মব্যাকুলতা, প্রিয়তমের হৃদয়হীনতা অথবা এরূপ কোন কিছু অসারতাই কবিতার প্রাণ ও কবিজনের ধ্যান জ্ঞান হইয়া উঠিতেছে। তাঁহাদের মানসসুন্দরী অলৌকিক রূপমাধুরী বিস্তার করিয়া তাঁহাদের মানসনেত্রে কি অন্ধতা আনিয়া দেয়, তাহা বাহিরের লোকের পক্ষে বুঝিয়া উঠিবার সম্ভাবনা নাই ; তাহারা কেবল কতকগুলি 'অর্থহারা ভাবে ভরা' চমৎকার কথামালা লইয়া তাহার মৃদু মধুর ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া আহা আহা করিয়া রসজ্ঞ নামে পরিচিত হইতে চাহে ! আদর্শরমণী বাস্তব বাঙ্গালী পুরুষকে ভালবাসিতে পারে না, কেননা বাঙ্গালী পুরুষে পুরুষোচিত মানস সৌন্দর্য্যের অভাব। আদর্শ মানসপুরুষ বঙ্গরমণীর জন্য হায় হায় করিয়া মরিতে চাহে না, কেননা বঙ্গরমণী স্রোতস্বিনীর ন্যায় মধুরগামিনী বা কলবিহঙ্গের ন্যায় মধুরভাষিনী হইলেও মানস সৌন্দর্য্যে এখনও নিরভিমানিনী। বাঙ্গালীর মেয়ে পুতুলখেলা খেলিতে বসিয়া যেরূপ অযোগ্যের সঙ্গে অযোগ্যের সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়া হাসি ক্রন্দনে আত্ম বিস্মৃতা হইয়া পড়ে, বাঙ্গালীর কবিকুলও সেইরূপ ছেলেখেলা লইয়া বিভোর ! লিখিবার শক্তি বিকসিত হইয়াছে, লিখিবার প্রণালীও সমুন্নত হইয়াছে, কিন্তু কি লিখিতে হইবে এবং কেমন করিয়া লিখিতে হইবে, সে কথা এখনও বুঝি ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবার অবসর ঘটে নাই। জনসাধারণের রুচির অনুবর্ত্তন করা, তাহাদের আদর্শের অনুরূপ সৌন্দর্য্যসৃষ্টির আয়োজন করা এবং তাহাদের মুখের নিতান্ত সুলভ যশ ও তদপেক্ষা অকিঞ্চিৎকর অর্থসংগ্রহ করা যাঁহাদের সাহিত্যসেবার লক্ষ্য, তাঁহারা নানা কারণে অভ্যস্ত সুখ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। প্রমথনাথ সে শ্রেণীর সাধক নহেন। তিনি যশের আশা, অর্থের প্রত্যাশা, দূরে রাখিলেও যশ ও অর্থ আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবে। সুতরাং তাঁহার নিকট বঙ্গভাষা অকৃত্রিম সেবা পাইবার আশা রাখে। তিনি যে কাব্যশক্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা বঙ্গরমণীর নিকট নারীজীবনের মহত্ত্বের আদর্শ ও নরজীবনের বিশেষত্বের ছবি অঙ্কিত করিতে না পারিলে সে শক্তির অপব্যবহার হইবে। কবি তাহা বুঝিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় মধুরে গম্ভীরে বীণা বাঁধিয়া আসরে অগ্রসর হইয়াছেন ;—সে বীণা, নূতন আদর্শের নূতন সঙ্গীত ঘোষণা করিবার যোগ্যতা পাইয়াও যেন পুরাতনের মোহে অবসন্ন হইয়া না পড়ে।

শ্রী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

বিচিত্র-সংগ্রহ।

(১)

সুদীর্ঘ নখ।

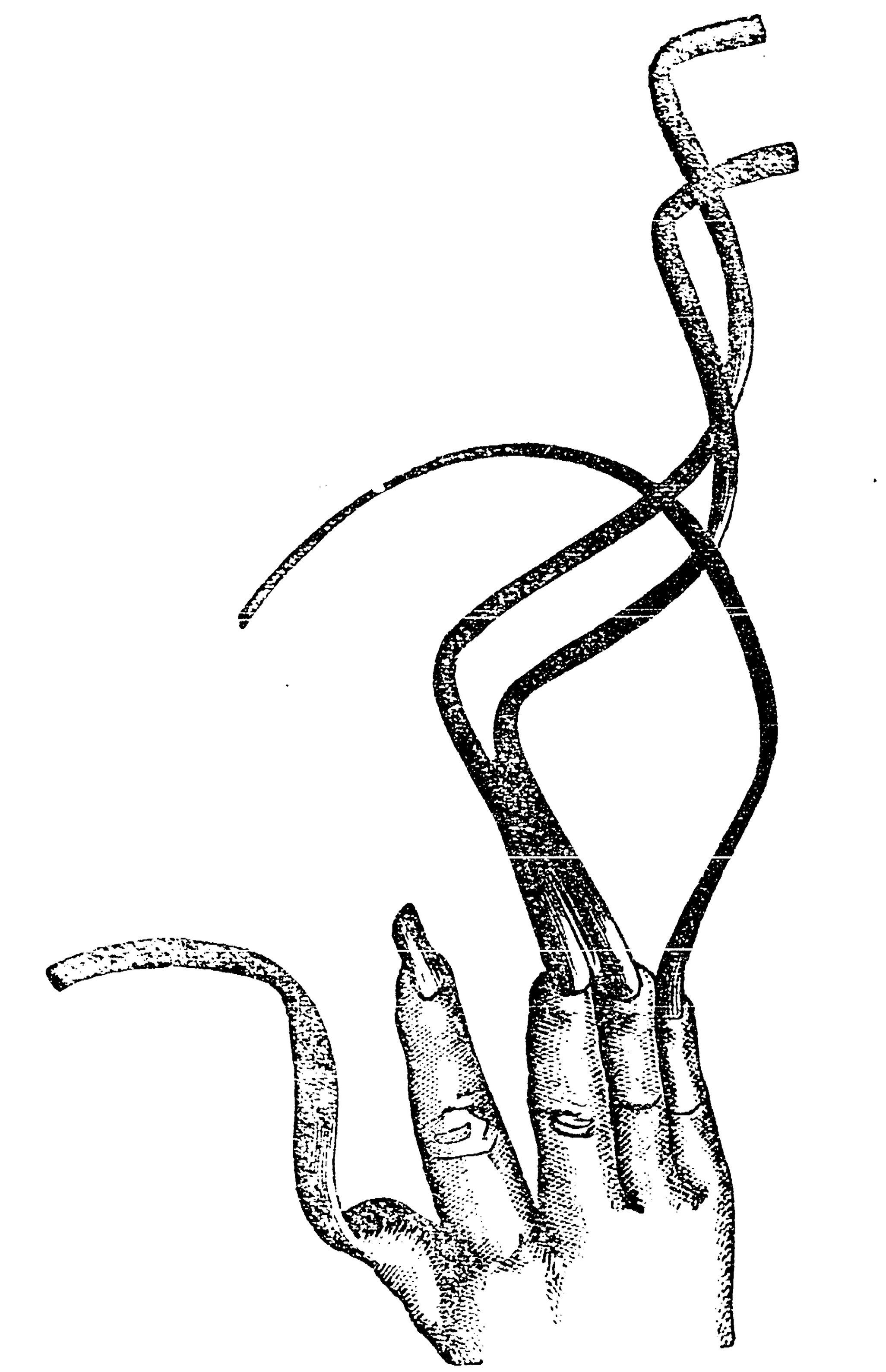

চীন দেশের পুরুষেরা মুণ্ডিত মস্তকে একটি সুদীর্ঘ বেণী ঝুলাইয়া রাখে এবং স্ত্রীলোকেরা বহু কষ্ট সহ্য করিয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য পা ক্ষুদ্র করিয়া থাকে, এ কথা প্রায় সকলেই জানেন। কিন্তু চীনের প্রদেশবিশেষে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য বহু যত্ন ও আয়াস স্বীকার করিয়া যে হস্তের নখ অকর্ত্তিত অবস্থায় সুদীর্ঘ রূপে রাখে, তাহা বোধ হয় অনেকে জানেন না। একজন ইয়ুরোপীয় পরিব্রাজক বলেন, চীনের প্রদেশ বিশেষের অধিবাসীরা লম্বা লম্বা নখ অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিয়া থাকে। কাহারও কাহারও নখ এক ফুট কি দেড় ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। যাহার নখ

যত লম্বা, সে তত প্রশংসার্হ। দৈবাৎ কাহারও একটি নখ ভাঙিয়া গেলে, সে মর্ম্মান্তিক যাতনা বোধ করে।

নখগুলি বিবর্ণ হইবার ভয়ে সকলেই এক একটি রৌপ্য নির্ম্মিত নখাধার রাখিয়া থাকে। বলা বাহুল্য এত কষ্ট,

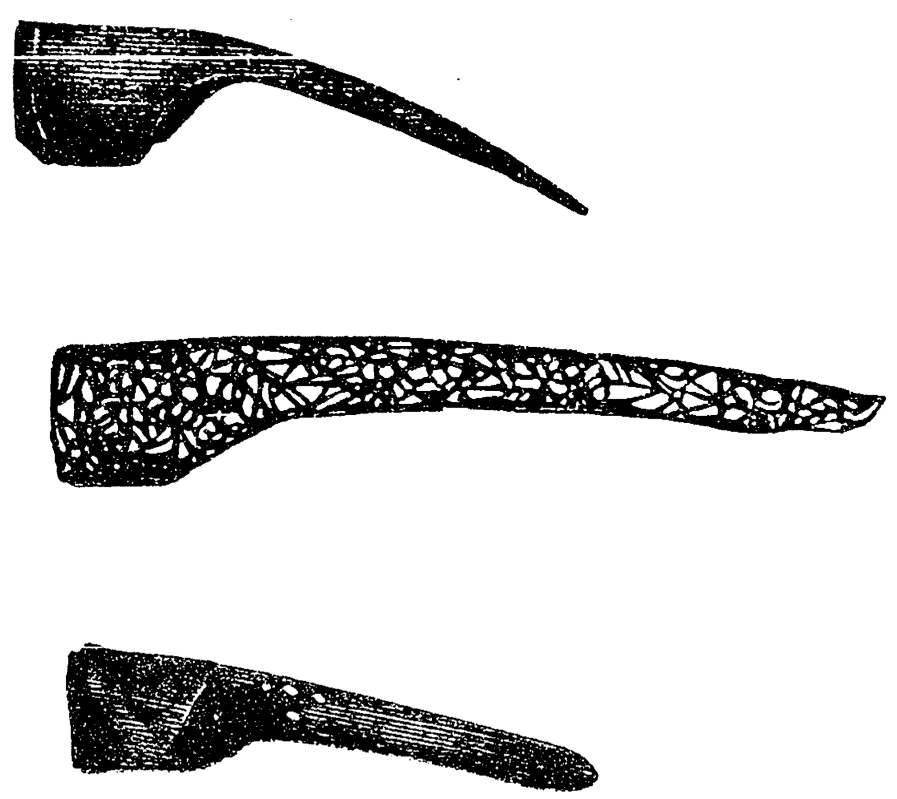

এত আয়োজন, কেবল সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিরই জন্য। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় কিনা কে বলিতে পারে?

(২)

স্থূল-দেহী

কুমারী সিন্‌ক্লেয়ার।

অনেক প্রকারের স্থূল-দেহী দেখা গিয়াছে কিন্তু ইয়র্কশায়ার নিবাসিনী কুমারী ফ্রান্সেস্ সিন্‌ক্লেয়ারের ন্যায় স্থূল কলেবর মানব, দেখা ত দূরের কথা, কখন শুনাও যায় নাই। এই ত মোটে তাহার ৩৩ বৎসর বয়স, এই বয়সে তাহার স্কন্ধের পরিধি ছয় ফুট, বাহুর পরিধি ৩০ ইঞ্চি, বক্ষের পরিধি পাঁচ ফুট, এবং তাহার বর্ত্তমান ওজন সাত মন। তাহার বসিবার আসন বাজারে পাওয়া যায় না; বিশেষ ভাবে ফরমাইস দিয়া প্রস্তুত করাইতে হয়। তাহার আসন আবার এত শক্ত, এত বৃহৎ ও ভারী যে, একবার স্থানান্তরিত করিতে হইলেই ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইতে হয়।

নিম্নস্থ চিত্রে আর এক স্থূল-দেহী যুগলমূর্ত্তি দেখুন।

ইহারা আমেরিকার দুই বিভিন্ন সার্কাসে অভিনয় করিত। পরে কোন স্থানে উভয়ের সাক্ষাৎ হওয়ায় মনে মনে মিলিয়া যায় এবং ১৮৯২ সালের নবেম্বর মাসে নিউইয়র্ক নগরে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়। ইহাদের বিবাহ-বাসর লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। এবং তাহারা কত উপহারই যে পাইয়াছিল, অন্ত নাই। স্বামীর নাম মোরলান্, পত্নীর নাম এনিবেল। মোরলান্ দৈর্ঘ্যে ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি, আর এনি বেল ৬ ফুট ২ ইঞ্চি। উভয়কে একত্রে ওজন করা হইয়াছিল! শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, দুজনের ওজন চৌদ্দ মণ আটাশ সের হইয়াছিল। মোরলান্ ও এনিবেল বিবাহ বাসরে যেরূপ পোষাক পরিধান পরিয়াছিল, সেই বেশেই প্রদীপের পাঠকদিগের নিকট তাহাদিগকে উপস্থিত করা হইল।

(৩)

সুবৃহৎ বেগুণ।

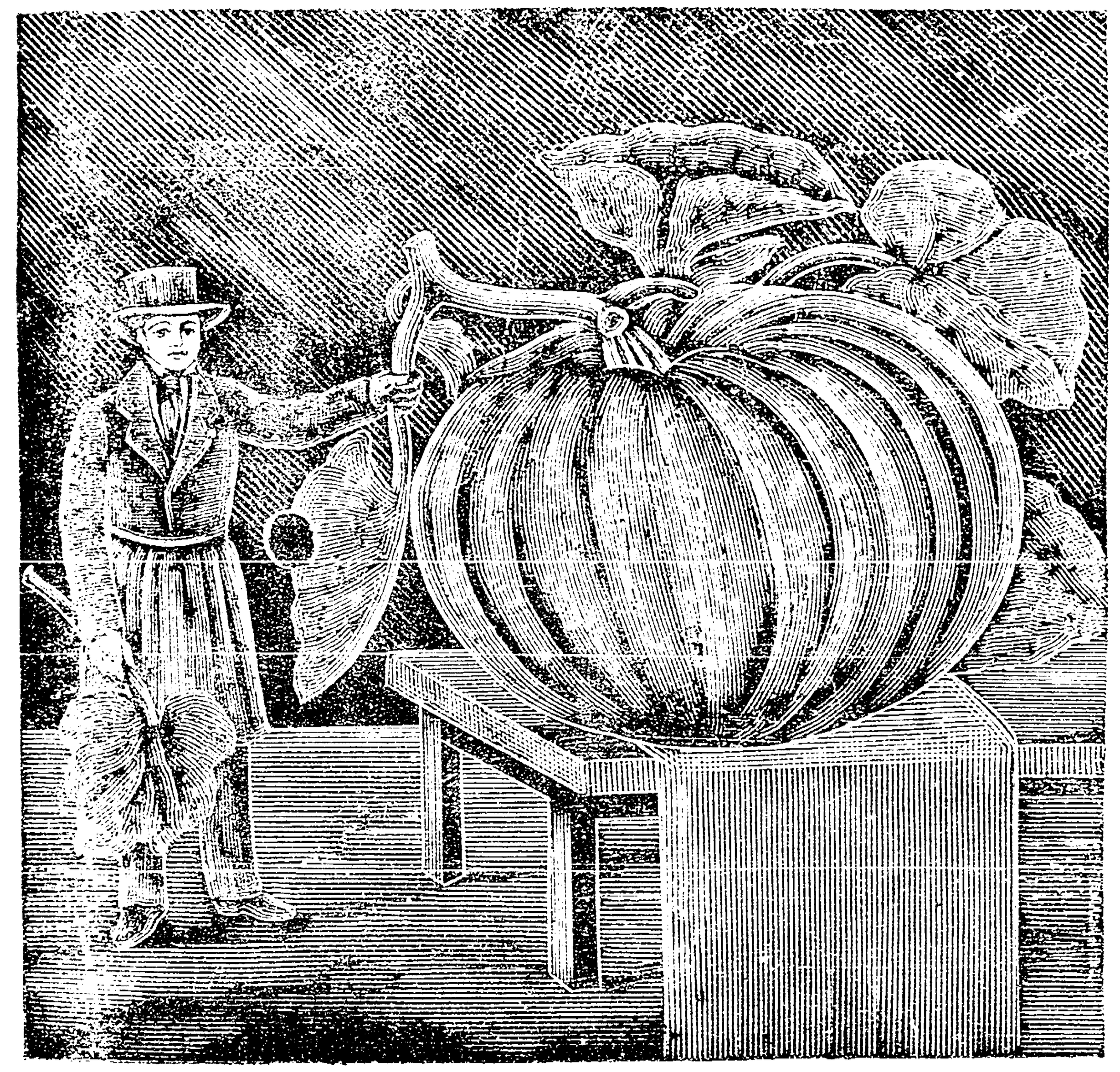

মানুষের ন্যায় ফল মূলও অস্বাভাবিক রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। ইংলণ্ডের কোন স্থানে জন্ টমাস লিথ্ নামক জনৈক সাহেবের উদ্যানে দুই মণ ছত্রিশ সের ওজনের একটি বিলাতী বেগুণ উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহার পরিধি ৭ ফুট ৩ ইঞ্চি।

(৪)

অদ্ভুত বাজীকর।

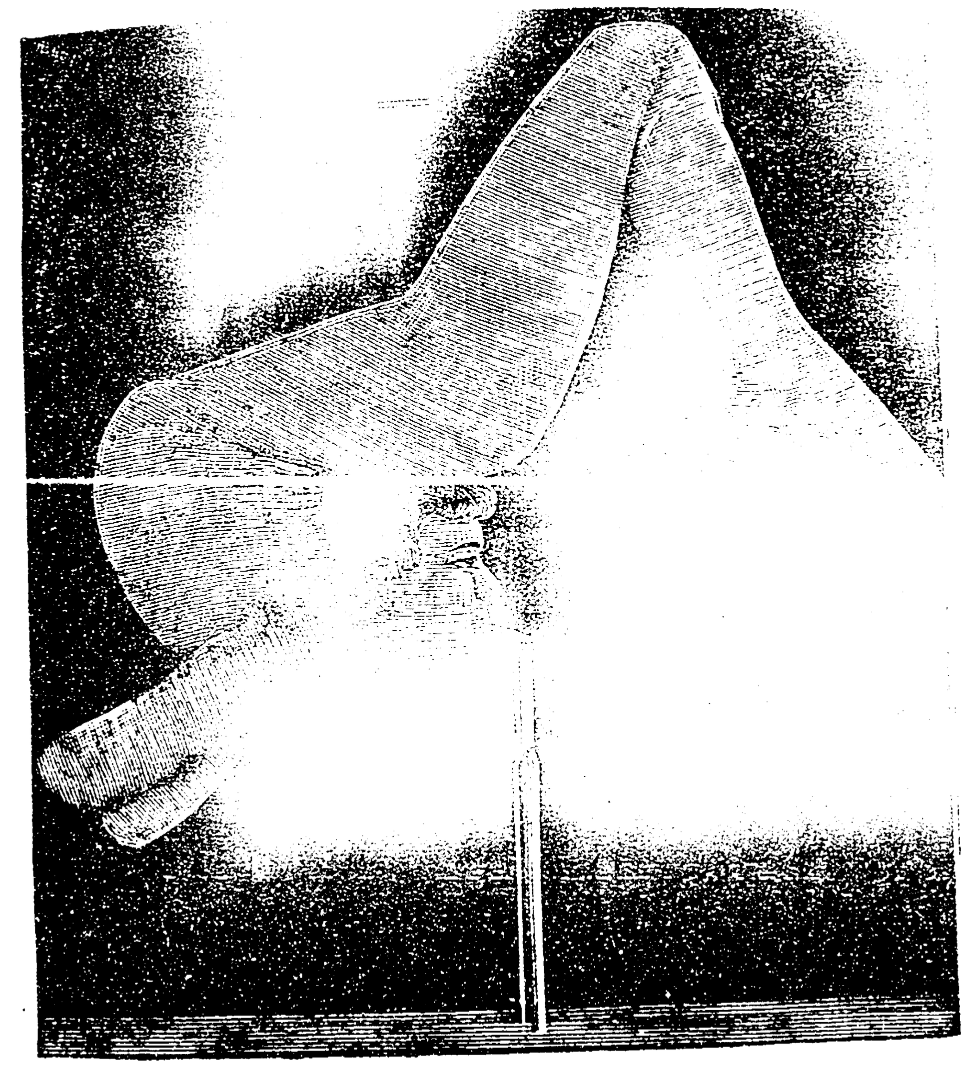

প্রদীপের পাঠক পাঠিকারা ইতিমধ্যেই বোধ হয় সেই বিলাতপ্রবাসী বাজীকর বাবা লছমন দাসের কথা ভুলিয়া যান নাই। এমি নামে এক বাজীকর আছে, তাহার ক্ষমতা লছমন দাস অপেক্ষা বড় কম নয়। অধিক ব্যাখ্যা করা অনাবশ্যক। পার্শ্বস্থ চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বিস্মিত হইবেন। যৎসামান্য একটি যষ্টির উপর দাঁত রাখিয়া এই প্রকার অঙ্গ সঞ্চালন করা কি সামান্য কৌশল ও ক্ষমতার কাজ? চিত্রটি দেখিলেই যেন মনে হয় এ ব্যক্তির শরীরে একখানিও হাড় নাই! এই ব্যক্তি সার্কাসে সার্কাসে ঘুরিয়া বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে।

পিপীলিকার যুদ্ধ।

প্রবন্ধের শিরোনাম দৃষ্টে পাঠকগণ মনে করিবেন না যে কোনরূপ উপমা বা অতিশয়োক্তির আশ্রয় লইয়া এই নামকরণ হইয়াছে। বর্ত্তমান কালের তথা কথিত ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও অনেক আশ্চর্য্য বিবরণ প্রভৃতির ন্যায় ইহা অতিরঞ্জিত নহে, প্রত্যক্ষ দৃষ্ট সত্য ঘটনা। লেখকের একজন সুশিক্ষিত সত্যনিষ্ঠ বন্ধু স্বীয় বাল্যকালে এই ঘটনা নিজে অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া আহার নিদ্রায় অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক দেখিয়াছেন এবং অবিকল সেই বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন এখনও সেই বাল্যকালদৃষ্ট এই অদ্ভুত ঘটনার স্মৃতি অতি সুস্পষ্টভাবে তাঁহার হৃদয়ে বর্ত্তমান আছে এবং চির-জীবন থাকিবে। লেখক নিজেও ইহা শ্রবণ করিয়া এত বিস্মিত ও প্রীত হইয়াছিলেন যে, ইহা পাঠকগণকে উপহার দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ঘটনাটি পিপীলিকার যুদ্ধ। বাস্তবিকই পিপীলিকার যুদ্ধ, ইহাতে যে অতিরঞ্জন কিছুমাত্র নাই, তাহা পাঠকগণ ঘটনাটি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

আম, নিম্ব, প্রভৃতি বৃক্ষে এক জাতীয় পিপীলিকা দেখা যায় তাহাদের গায়ের রং লাল ও কাল এই উভয় প্রকার। কতক অংশ কাল আবার কতক লাল, আবার একটু কাল। এগুলির দংশন যন্ত্রণা ভয়ানক! ইহারা হুল ফুটাইয়া কামড়ায়।

আর একরূপ বড় বড় কাল কাল পিপীলিকা আছে, ইহাদিগকে 'ডেয়ে পিঁপড়ে' বা "মাসকাটা ডেয়ে" বলে। ইহারাই বোধ হয় এদেশীয় পিপীলিকার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা

বৃহৎ। ইহারা অবাধগতি! গাছেও থাকে, ঘরেও থাকে, মাটীর তলে বাসা করিয়াও থাকে। ইহাদের অগম্য কোন স্থান আছে বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক পিপীলিকার বংশ নির্ণয় ও জাতি বিভাগ দ্বারা কুলজি স্থির করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং তাহাদের অন্যান্য জাতীয় জাতির পরিচয় ও ব্যবহারাদি বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিব না। যে যুদ্ধের কথা বলিতেছি তাহা প্রথম ও শেষোক্ত প্রকার পিপীলিকাদিগের মধ্যে মধ্যে ঘটিয়াছিল। আমরা এখন সেই বৃত্তান্তই আমাদের বন্ধুর কথায় বিবৃত করিতেছি।

"আমার বয়স যখন ১৩।১৪ বৎসর, সেই সময় আমি কোন কার্য্যোপলক্ষে আমাদের বাটীর নিকটস্থ একটি পলাশ বৃক্ষের অনতিদূরে উপবেশন করিয়াছিলাম। পলাশ বৃক্ষে তখন বসন্ত সমাগমে পুষ্পোদ্গম হইয়া তাহাকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় শোভিত করিয়াছে। বোধ হইতেছে পলাশ শাখাবলী বসন্ত লক্ষ্মীকে অভ্যর্থনার জন্য উৎসুকা হইয়া পত্ররূপ অঙ্গাবরণ উন্মোচন করিয়া নগ্ন-দেহ-সুষমা-ভার পুষ্প সজ্জায় দ্বিগুণিত করিয়া তুলিয়াছে। আমি অনিমেষে সেই দিকে তাকাইয়া দেখিতেছি, ইতোমধ্যে হঠাৎ বৃক্ষের প্রকাণ্ডদেশে আমার দৃষ্টি পড়িল। তথায় দেখিলাম যে কি যেন একটা কপিশ রঙ্গে বৃক্ষত্বকের কিয়দংশ রঞ্জিত হইয়াছে!

বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিবার জন্য বৃক্ষের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইলাম। বৃক্ষের নিকটেই একটা প্রকাণ্ড শাল কাষ্ঠ পড়িয়াছিল, তদুপরি দণ্ডায়মান হইয়া বৃক্ষের সেই অংশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম যে এক প্রকাণ্ড লাল পিঁপড়ের ঝাঁকে সেই স্থানে পুঞ্জীকৃত হইয়াছে। তাহারা এত ঘন সন্নিবিষ্ট যে বৃক্ষের কাণ্ডের এক হস্ত পরিমিত স্থান সুগোলভাবে সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পূর্ণ আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। এই পিপীলিকাগণ মধ্যে মধ্যে ঐরূপ পুঞ্জীকৃত হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাতে আমি প্রথমতঃ বিশেষ বিস্মিত হই নাই, কিন্তু অধোদেশে নয়ন সঞ্চালন পূর্ব্বক আর এক ব্যাপার দেখিয়া কিছু বিশেষ কৌতূহলী হইয়া পড়িলাম। দেখিলাম, নিম্ন দিক হইতে বড় বড় মাস কাটা কাল পিপড়ের ঝাঁক বৃক্ষের প্রকাণ্ডাবলম্বনে উর্দ্ধগামী হইতেছে। তাহাদের দল উল্লিখিত দল অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। ইহারা ক্রমে ক্রমে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত দল হইতে এক কি দেড় হস্ত দূরে উপস্থিত হইল এবং সেইখানেই 'ডেরা দাণ্ডা' ফেলিবার মতলব স্থির করিল। কারণ তথা হইতে আর তাহারা এক পদও অগ্রসর হইল না বা শীঘ্র যে হইবে এমন কোন লক্ষণও দেখা গেল না। আমি কয়েক দিন পূর্ব্বেই ইংরাজি পাঠ্য পুস্তকে কি একটা যুদ্ধ বিবরণ পড়িয়াছিলাম। সে স্মৃতি আমার মনে তখনও বেশ জাগরূক ছিল, সুতরাং স্বতঃই আমার মনে হইল যে, এরা ইহারাও যুদ্ধের আয়োজন করিতেছে। কৌতূহল বাড়িতে লাগিল। বেলা ১০টার সময় ফাল্গুনের সূর্য্যোত্তাপ অনাবৃত মস্তকে সহ্য করিয়া বা তাহা গণনা না করিয়া এক মনে আমি পলকহীন নেত্রে ঐদিকে তাকাইয়া রহিলাম। ক্রমে কৌতূহল উৎকণ্ঠায় পরিণত হইল। কতক্ষণ ইহারা এইভাবে থাকিবে, কখন ইহাদের অবস্থান্তর হইবে, এইরূপ চিন্তায় আমি নিমগ্ন থাকিলাম। বাটী হইতে স্নান আহার করিবার জন্য কয়েকবার ডাকাডাকি করিয়াছে, তাহাতে যাই নাই। পরে যখন স্নেহের আহ্বান ভীতি প্রদর্শনে পরিণত হইল, পিতৃদেবের মধুর স্বর যখন গম্ভীর কর্কশ তিরস্কারে পরিবর্ত্তিত হইল তখন ভীতি আসিয়া এক ফুৎকারে কৌতূহল দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া দিল; আমি এক ছুটে বাটীতে পৌঁছিয়া পিতৃআজ্ঞা পালনে উদ্যুক্ত হইলাম। এবং ১০।১২ মিনিটের মধ্যেই স্নানাহার সমাপন পূর্ব্বক পুনরায় পলাশ বৃক্ষতলে সমাসীন হইলাম। এবার একটি ছাতা লইয়া গিয়াছিলাম। আমি যাইয়া দেখিলাম যে অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, সুতরাং এই ১০।১২ মিনিটের অনুপস্থিতি আমার পক্ষে কোন ক্ষতিকর হয় নাই।

যাহা হউক, তারপর আমি দেখিতে লাগিলাম যে, কাল পিপড়ের দলের মধ্য হইতে ৩।৪টি মণ্ডল মত পিপড়ে বাহির হইয়া উভয় দলের মধ্যবর্ত্তী অনাবৃত স্থানে গিয়া দাঁড়াইল এবং একজন লাল পিপড়ের দলের দিকে চলিয়া গেল। সে বুঝি দূত। সে লাল লাল পিঁপড়ের দলের নিকট গিয়া মুখে মুখ লাগাইয়া কিছুক্ষণ কি কথাবার্ত্তা বলিল— আমারযেন মনে হয় যে বালসুলভ সরলতা বশতঃ উহারা কি বলে তাহা শুনিবার জন্য আমি কাণ পাতিয়াছিলাম। যাহা হউক, এইরূপ কথাবার্ত্তা হইবার পর লাল পিঁপড়ের দলের দুই চারি জন মণ্ডল কাল মাতব্বরের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসিল এবং যেখানে কাল মণ্ডল মশায়েরা মস্তক উচ্চ করিয়া শুঁড় নাড়িতেছেন বা গোঁপ চোপড়াইতেছেন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা সুন্দর লাল জাতীয়, তাহারাই বা পশ্চাদপদ হইবে কেন, তাহারাও 'গোঁপে তা' দিয়া নিজেদের প্রাধান্য দেখাইতে পশ্চাৎপদ হইল না। যাহা হউক, এই সব মণ্ডলগণ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নানারূপ কথাবার্ত্তা পায়চারি প্রভৃতি করিলেন এবং নানারূপ বিচিত্র গতিশীলতার পরিচয় দিতে ত্রুটি করিলেন না। দুই পক্ষেরই অন্যান্য পিপীলিকাগণ কেহই স্বস্থান পরিত্যাগ করে নাই।

যাহা হউক এইরূপে কিছু কালপর তাহাদের কথাবার্ত্তা deplomacy, negotiation সব শেষ হইয়া গেল। প্রত্যেকে নিজ নিজ দলে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আবার দুই দল নীরব নিস্তব্ধ। আমি এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া এতদূর কৌতূহলাবিষ্ট হইয়াছিলাম যে, প্রগাঢ় মনোযোগের সহিত তাহাদের প্রত্যেক কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম।

আরও কয়েক মিনিট গেল। এই মিনিটগুলি আমার কাছে এক একটা যুগস্বরূপ বোধ হইতে ছিল। কিছুক্ষণ পর লাল পিঁপড়ের দলে সজীবতা দেখা গেল। তাহারা তখন ৪।৫টা ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইবার উদ্যোগ করিতেছে এইরূপই তাহাদের ভাব ভঙ্গী দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল। এমন সময় পিতৃদেবের উচ্চারিত মদীয় নাম বজ্র নির্ঘোষের ন্যায় আমার কর্ণে ধ্বনিত হইল। আমার মনে তখন এমন একটা অশান্তি বা অসন্তুষ্টি আসিয়া উপস্থিত হইল যে তাহা আর কি বলিব। নিরুপায় হইয়া পিতৃদেবের আহ্বানের অনুগামী হইলাম। পিপীলিকাগণ পড়িয়া থাকিল।

তারপর প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিক্রান্ত হইলে পিতৃদেব বিশেষ কোন কার্য্যে আহূত হইয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন। তিনি দৃষ্টির বহির্ভূত হইবামাত্রই আমি আবার সানন্দে পলাশমূলে গমন করিলাম। গিয়া দেখিলাম লাল পিপীলিকাগুলি পাঁচটি ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া আশ্চর্য্য কৌশলে ব্যূহ রচনা করিয়াছে। সম্মুখের দল সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, তাহারা ঠিক অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। ঠিক যেন একটি বক্র কপিশ রেখা অর্দ্ধ বৃত্তের ন্যায় বৃক্ষের ত্বকে চিত্রিত। তাহার দুই পার্শ্বে আর দুই দল পিপিলিকা তির্য্যক্ সরল রেখা ভাবে দুইটী স্থূল কোণ উৎপাদন করিয়া সজ্জিত আছে। তাহাদের পশ্চাতে আর একদল ক্রমে ২য় ও ৩য় দলকে যোগ করিয়া প্রায় সোজা আড়াআড়ি ভাবে অবস্থিত। পঞ্চম দলটি তৎপশ্চাৎ অর্থাৎ সর্ব্ব শেষ স্থানে ঘাটি করিয়াছে।

কাল পিপীলিকার দলও ক্রমে ক্রমে তাহাদের দলগঠিত করিতে লাগিল এবং প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে সেই দল হইতে একটি বৃক্ষের কাণ্ডর আকারে একটা বৃহৎ দল ঋজু ভাবে অনাবৃত স্থলের অর্দ্ধাংশ পরিমিত স্থান উঠিয়া তিন শাখায় বিভক্ত হইয়া মধ্য ও দুই পার্শ্বে ছড়াইয়া পড়িল। এই তিন শাখার মধ্যে যে ফাঁকা স্থান থাকিল সেই সব স্থানে কয়েকটা করিয়া সেনাপতি (?) পিপড়া থাকিল এবং তাহারা অনবরত ছুটাছুটি করিয়া এদিক ওদিক করিতে লাগিল। আমার কৌতূহল শেষ সীমায় গিয়া উঠিল। পাছে নিশ্বাস পতনে দেখিবার অসুবিধা ঘটে ভাবিয়া এমন কি মধ্যে মধ্যে নিশ্বাস বন্ধ করিয়াও এই আশ্চর্য্য প্রাকৃতিক লীলা দেখিতে লাগিলাম।

এদিকে আমার যোদ্ধৃদলের ব্যূহরচনা শেষ হইল। যুদ্ধের সঙ্কেত বুঝি প্রদত্ত হইল: অমনি তিন শাখায় বিভক্ত কাল নিগাঢ় সেনাদল বেগে রূপ-যৌবন-গর্ব্বিত কপিশ পিপীলিকাকে যুগপৎ আক্রমণ করিল। আক্রমণটা কিরূপ জানেন? ইহারা দৃঢ় দংষ্ট্রা সাহায্যে পাটলদিগের শুঁড় ধরিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, কাহারও বা পদ ধরিতে চেষ্টা করিতে লাগিল! উহারাও যথাসম্ভব আত্মরক্ষা করিয়া ইহাদের প্রতি ঐরূপ করিতে লাগিল। এইকার্য্যে প্রত্যেক দলেই যেরূপ ক্ষিপ্রকারিতা, আত্মরক্ষা, কৌশল প্রভৃতি প্রদর্শন করিতে লাগিল তাহা বস্তুতঃই বড়ই প্রশংসার যোগ্য। একটা লাল পিপীলিকা পাদদেশে শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে দেখিয়া আর একটি আসিয়া সুযোগ মত শত্রুকে আক্রমণের চেষ্টা যেরূপে করিতে লাগিল তাহা বিশেষ বুদ্ধির পরিচায়ক। আক্রান্ত সৈন্য অনুপায় হইলে সেই আক্রান্ত অঙ্গ ছিন্ন করিয়াই পলায়ন করিতে লাগিল। একবার দেখিলাম একটা লাল পিপড়ের পিঠে কাল পিঁপড়ে কামড়াইয়া ধরিয়াছে। ৩।৪টা লাল পিঁপড়া আক্রান্ত পিপীলিকার নানা অঙ্গ ধরিয়া টানাটানি

করিতেছে, আর দুইটি সুযোগক্রমে কাল শত্রুর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাহার চক্ষে ও গলদেশে এমন কামড়াইতেছে যে তাহার কি সাধ্য আর আক্রমণ করে। সে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল এবং নিজের পৃষ্ঠদেশে দুই শত্রু বহন করিয়া দলের দিকে ছুটিয়া গেল। বলা বাহুল্য এই দুইটি 'পরার্থে উৎসৃষ্ট প্রাণ' পিপীলিকা আর দলে ফিরিতে পারে নাই। শত্রু হস্তে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া আত্মোৎসর্গের চরম দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে।

যাহা হউক, এইরূপে চলিতে লাগিল। লাল পিপ্ড়ের দলেই বেশী হত ও আহত হইতে লাগিল। কিন্তু যেমন এক সারির কতকগুলি হত বা আহত হইয়া স্থানচ্যুত হইল, অমনিই পশ্চাত হইতে নূতন পিপীলিকা আসিয়া সেস্থান পূরণ করিতে লাগিল। সুতরাং প্রথম সারির অর্দ্ধচন্দ্রাকার ব্যূহ অটুট থাকিল। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘোর হইয়া পলাশ বৃক্ষ ও তৎপার্শ্বস্থ অন্যান্য স্থান ঘিরিয়া ফেলিল। যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ আমি বিশেষ চেষ্টা করিয়াও ক্ষুদ্র পিপীলিকার এই অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব্ব রণরঙ্গ দেখিতে লাগিলাম কিন্তু আর একটু পরে আর কিছুই দেখা গেল না।

আমার আর দাঁড়াইয়া থাকা অনাবশ্যক মনে করিয়া ক্ষুণ্ণ মনে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তনকরিলাম। সে রাত্রিতে পড়াশুনা ত দূরের কথা, ভাল ঘুম পর্য্যন্ত হইল না প্রভাত হইবা মাত্রই আমি পলাশ মূলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম গাছের ডালে ও গুঁড়িতে কালপিপ্ড়াগুলি বীরদর্পে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, বৃক্ষের পাদমূলে দেখিলাম অগণিত লাল পিপ্ড়ার হস্ত, পদ, ছিন্ন মুণ্ড, কবন্ধ দেহ প্রভৃতি পতিত আছে। দুই চারিটা জীবিত লাল পিঁপ্ড়ে ক্ষুণ্ণ হৃদয়ে সেই শ্মশান ক্ষেত্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং কেহ কেহ বা মৃতকল্প দুই একটি বীরের দেহ শব রাশি হইতে বাহির করিয়া কষ্টে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে!

আমি বুঝিলাম লাল দল পরাজিত হইয়াছে। এইরূপে পিপীলিকার যুদ্ধ শেষ হইল। লাল পিঁপ্ড়া পলাশ বৃক্ষরাজ্যে রাজত্ব করিতেছিল, কাল পিঁপ্ড়েরা এই রাজ্য দখল করিতে আসিয়াছিল, লাল দল স্বীয় সম্পত্তি রক্ষা করিতে যাইয়া এইরূপ বিপন্ন হইয়াছে—কালর হস্তে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে!

আমি দেখিলাম যে আমরা যাহাদিগকে সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করি, বুদ্ধি জ্ঞান ও বল হীন বলিয়া সর্ব্বদা যাহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে নিরীক্ষণ করি, তাহারা বাস্তবিকই তত দূর উপেক্ষার যোগ্য নহে। এই সব ক্ষুদ্র পিপীলিকা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যেরূপ বুদ্ধিমত্তা, কৌশল ও সম বেদনার পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে কে বলিবে যে ইহাদের জ্ঞান শক্তি নাই, বুদ্ধি পরিচালনীয় ক্ষমতা নাই?

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

বেহালা।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

আজ কাল বেহালা যন্ত্রের এত আদর, কিন্তু এক সময়ে বিলাতের (অন্ততঃ ইংলণ্ডের) ভদ্র সমাজে ইহার প্রতি অত্যন্ত অবজ্ঞা ছিল। বড় বড় বেহালাগুলিকে লোকে বরং অনেকটা সহ্য করিয়া লইত, কিন্তু ছোট বেহালা—অর্থাৎ সচরাচর যে বেহালা বাজান হয় সেই বেহালা—বাজানকে তাহারা নিতান্তই অভদ্রোচিত মনে করিত।

এই সময়ে বিলাতের কোন পল্লীসমাজে একজন নূতন পাদ্রী আসিলেন। সকলেই দেখিল, পাদ্রী অতিশয় শ্রদ্ধাস্পদ লোক; সুতরাং সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিতে লাগিল। ইহার মধ্যে একদিন কে কাহার কাণে কাণে বলিল "শুনিয়াছ? পাদ্রী নাকি বেহালা বাজায়!" "বল কি? পাদ্রী বেহালা বাজায়?" দেখিতে দেখিতে এই সংবাদ তুষের আগুনের ন্যায় নিঃশব্দে সমাজময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। রক্ষা আর থাকেন না! পাদ্রী নাকি বেহালা বাজায়!

বৃদ্ধেরা দ্বারে অর্গল দিয়া বলিলেন—"এখন উপায়?" উপায় আর কি হইবে? এ পাদ্রীকে তাড়াইতে না পারিলে আর চলিতেছে না। অথচ সকলেই তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করেন। সুতরাং এমন গুরুতর ব্যবস্থা তাঁহার প্রতি কিরূপে প্রযুজ্য হয়? শেষে স্থির হইল যে প্রাচীনগণ দল বাঁধিয়া এ সম্বন্ধে পাদ্রী মহাশয়কে তিরস্কার করিয়া আসিবেন। তাহাতে যদি তাহার সংশোধন না হয়, তবে দেখা যাইবে।

অচিরেই একদিন প্রাতঃকালে দেখা গেল যে গ্রামের মুরব্বিগণ দলবদ্ধ হইয়া পাদ্রী সাহেবের ভবনে সমবেত!

পাদ্রীর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাবশতঃ, বিশেষতঃ উপস্থিত তাহার সৌজন্যে, সকলেই কেমন একটু অপ্রতিভ; সুতরাং মূল বিষয়ের অবতারণা কিঞ্চিৎ জটিল হইয়া উঠিয়াছে। শেষে তাহাদের মধ্যে একজন সাহসী এবং সুবক্তা পুরুষ, অনেক কষ্টে গলাটাকে পরিষ্কার করিয়া লইয়া, বেহালা বাদ্যের সম্বন্ধে পাদ্রী সহেবকে আপন অভিমত জ্ঞাপন করিলেন।

পাদ্রী সাহেবও অনেক কষ্টে হাসি থামাইয়া উত্তর করিলেন যে "মহাশয় আমি ত বেহালা বাজাই না! আমি যে চেলো বাজাই!" এই বলিয়া তিনি নিজের চেলোখানি আনিয়া তাঁহাদিগকে দেখাইলেন। তারপর তাহা বাজাইয়া দুটি ভজন গাহিলেন!

ভক্তের মুখে ভজন চেলো সংযোগে সেই সরল বৃদ্ধদের কাণে না জানি কতই মিষ্ট লাগিয়াছিল! বেহালা সম্বন্ধে তাঁহাদের সকল কুসংস্কার দূর হইয়া গেল। তাঁহারা কৃত অপরাধের জন্য পাদ্রীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

সকলেই জানেন, আজ কাল ইউরোপে এই কুসংস্কারের লেশ মাত্রও নাই। এখন বেহালা বাজান তথায় লজ্জাকর হওয়া দূরে থাকুক, ভাল বেহালা বাজাইতে পারা একটা গৌরবের বিষয়ই মনে করা হয়।

আমাদের দেশে এই যন্ত্র বোধ হয় পর্ত্তুগীজেরাই প্রথমে আনিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ প্রাচীনবৎসল দেশ। নূতন জিনিস এখানে সহসা আদর পায় না। ইহার মধ্যে বেহালা যে এদেশে এতটা প্রচলিত হইয়া গেল, তাহা ঐ যন্ত্রের পক্ষে একটা বিশেষ প্রশংসার কথা বলিতে হইবে। আদরটা বোধ হয় যাত্রাওয়ালা আর ভিখারী বৈষ্ণবদের মধ্যেই প্রথমে হইয়াছিল। ইহার কারণ কতকটা এই, যে, ঐ সকল লোকের হাতে বেহালার অনুরূপ যন্ত্র পূর্ব্ব হইতেই ছিল।

যন্ত্রটি আমরা ইউরোপীয়দিগের নিকটেই পাইয়াছি; কিন্তু ইহার ব্যবহার আমরা তাঁহাদের নিকটে শিখিয়াছিলাম কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে। বেহালা বাদ্যের ইউরোপীয় এবং দেশীয় কায়দার পার্থক্য এই সন্দেহের একটি কারণ। দেখা যাইতেছে যে এই পার্থক্য যন্ত্রের দোষ গুণের দিকে চাহিয়া হয় নাই। এই পার্থক্যের কারণ কতকটা অজ্ঞতা, কতকটা আমাদের সঙ্গীতের অনুরোধ।

দেশীয় বাদকদের অনেকে ছড়িখানিকে লগুড়ের ন্যায় ধারণ করেন—যাত্রার দলের পরিচালকগণ অনেক সময় তাহা ঐ ভাবে ব্যবহারও করেন। দেশে যে সকল যন্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহাতে ছড়ি এক কায়দায় ধরা হইত; সে কায়দা বেহালার ছড়ির উপর খাটান সহজ বোধ হইল না। অথচ প্রকৃত কায়দাটির পরিষ্কার জ্ঞান নাই। সুতরাং প্রথম বাদক যেমন সুবিধা বোধ করিলেন তেমনি করিয়াই ধরিলেন। শিষ্য পরম্পরাগত হইয়া আবার তাহাই আমাদের দেশীয় সঙ্গীতের পক্ষে ছড়ি ধরিবার পদ্ধতি হইয়া দাঁড়াইল।

ছড়ি ধারণ সম্বন্ধে যেরূপ, বেহালা ধারণ সম্বন্ধেও কতক পরিমাণে সেইরূপ। তবে এ বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। কারণ, দেখা যায় যে বেহালা ধরিবার কায়দা ইউরোপেই বারম্বার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আজ কাল ইউরোপীয় রীতি অনুসারে বেহালার বাম দিকে চিবুক স্থাপন করিতে হয়। কিন্তু ঐ দেশীয় বহুতর শ্মশ্রুবিশিষ্ট প্রাচীন বাদক পুরাতন বেহালাগুলির দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁহাদের শ্মশ্রুর চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বাজাইবার সময় ঐ সকল যন্ত্রের ডাইনেই চাপিয়া ধরিতেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

যন্ত্রের গলা ঠিক কতখানি লম্বা হইলে ভাল, আগেকার বাদকদের মধ্যে হয়ত সে বিষয়ে মত ভেদ ছিল। অনেক সময় দেখা যায় যে, একটা প্রাচীন যন্ত্রের গলা পূর্ব্বে লম্বা ছিল, মধ্যে কোন সময়ে তাহাকে কাটিয়া ছোট করা হইয়াছে।

আমাদের দেশীয় কায়দার কতকটা আমাদের সঙ্গীতের প্রকৃতির অনুরোধে ওরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এস্থলে একটা কথা বিবেচ্য। দেখা যায় যে, বিলাতী কায়দার মধ্যে যতটুকু পরিবর্ত্তন করিলে আমাদের দেশীয় সঙ্গীতের কাজ চলে, পরিবর্ত্তন তদপেক্ষা অনেক বেশী করা হইয়াছে। আর এই পরিবর্ত্তনে কোন কোন স্থলে নাহক কাজের অসুবিধা হইয়াছে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাদের গিটকারির কায়দার উল্লেখ করা যাইতে পারে। উচ্চ সুরের উপর গিটকারি পড়িলে বাঙ্গলা রীতিতে তথায় ঘষিটের ব্যবস্থা হয়। ইউরোপীয় বাদক ঐ স্থলে হস্ত প্রসারিত (shift) করিয়া, অতি সহজে বেশ পরিষ্কার গিটকারি দিতে পারেন।

তবে ইউরোপীয় বেহালা বাদ্যে গিটকারি নাই কেন? ইহার কারণ দুটি। ১—ইউরোপীয়েরা অধিক গিটকারি পছন্দ করেন না। ২—যন্ত্রের আওয়াজের হিসাবে ধরিলে এই অলঙ্কারটি বেহালা যন্ত্রের পক্ষে তত উপযোগী নহে।

বেহালার আওয়াজেতেই তাহার মূল্য। এই আওয়াজের পক্ষে যাহা ক্ষতিকর, তাহাকে বেহালার উপযোগী বলা যায় না। অথচ দেখা যায় যে বাঙ্গালা বাদক বেহালায় গৎ বাজাইতে আরম্ভ করিলেই ক্রমাগত গিটকারি দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক মনে করেন। ইহার একটা কারণ আছে। দেশী কায়দায় বেহালার আওয়াজের (অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে বেহালার tone বলিতে যাহাকে বুঝায় তাহার) দিকে তত লক্ষ্য থাকে না; সুতরাং যন্ত্রের টোন্ হইল কি না, তাহাতে অল্পই ক্ষতি বৃদ্ধি। পক্ষান্তরে দেখা যায় যে টোন্ ভাল হউক আর মন্দ হউক, গিটকারিটি বাজে অতি পরিষ্কার। সুতরাং আওয়াজের ক্ষতিটুকু ধরা পড়িলেও তাহা সহ্য হইয়া যায়।

বাস্তবিক গিটকারির মাত্রা কমাইয়া অন্যান্য বিষয়ে বেহালার পক্ষে অধিকতর উপযোগী সঙ্গীত বাজাইবার পক্ষে যত্ন হইলে এই যন্ত্রের বাঙ্গালা বাদ্যের আরও উন্নতি হইতে পারে।

এই কথার প্রসঙ্গে একবার একজন আমাকে বলিয়াছিলেন যে 'গিটকারি যদি যায়, তবে আর থাকে কি?' একথা যদি যুক্তিযুক্ত হয়, তবে ইহাও মানিতে হয় যে বীণা সেতার ইত্যাদি যন্ত্রে বাজাইবার কিছুই নাই, কারণ তাহাতে গিটকারি ভালরূপ আদায় হয় না। কিন্তু একথা কি কেহ বলিতে সাহস রাখেন।

বীণ্ সেতার ইত্যাদির পক্ষে যাহা উপযোগী, এই সকল যন্ত্রে তাহাই বাজান হয়। আর, তাহা যে কত মিষ্ট একথা সকলেই জানেন। বেহার পক্ষে যাহা উপযোগী, তাহাই যদি তাহাতে বাজাইবার চেষ্টা হয়, তবে দেখা যাইবে যে, বেহালা ততোধিক মিষ্ট।

প্রত্যেক যন্ত্রেরই দোষ গুণ আছে। যন্ত্র বিশেষের পক্ষে তাহাই উপযোগী হয়, যাহাতে তাহার দোষ যথাসম্ভব ঢাকিয়া গুণগুলিকে প্রকাশ করে। এইজন্যই বীণা যন্ত্রে মিড়ের ভাগ বেশী আর গিটকারির ভাগ কম। এই জন্যই সারঙ্গ এসরাজ ইত্যাদি যন্ত্রে মিড় এবং গিটকারি উভয়েরই এতদূর প্রাবল্য। এইজন্যই হারমোনিয়ম যন্ত্রে মিড় বিশিষ্ট রাগ ব্যবহার হয় না।

যন্ত্রের আওয়াজ মিষ্ট এবং জোরালো হওয়া চাই। ইহাতে সুর সকল শুদ্ধরূপে বাহির হওয়া এবং রাগাদির সূক্ষ্ম কারিকুরি পরিষ্কার আদায় হওয়ার ব্যবস্থা চাই। উচ্চারণের স্পষ্টতা এবং যন্ত্রের ধ্বনির নমনীয়তা চাই।

সেতার ইত্যাদির আওয়াজ মিষ্ট, এবং তাহার সুর শুদ্ধ। মিড় উহাতে অতি পরিষ্কার হয়। ছোট ছোট গিটকারিও মন্দ বাজে না। উচ্চারণ স্পষ্ট বটে; কিন্তু আওয়াজ অধিক নমনীয় নহে।

ধ্বনির নমনীয়তা বলিতে আমি ইহাই প্রকাশ করিতে চাহিতেছি, যে সেই ধ্বনিকে ইচ্ছা মতন প্রবল অথবা মৃদু, স্ফীত অথবা কম্পিত করিতে পারা চাহি। সেতার ইত্যাদি যন্ত্রে এ কার্য্য হয় না, তাহা নহে, কিন্তু যাহা হয়, তাহাতে উচ্চতম সঙ্গীতের সকল অভাব পূর্ণ হয় না।

মৃদু আওয়াজকে ক্রমশঃ জোরালো করা, প্রবল আওয়াজকে ক্রমে মৃদু করা, মৃদুকে প্রবল করিয়া আবার মৃদু করা, প্রবলকে মৃদু করিয়া আবার প্রবল করা—এ সকল কার্য্যের দ্বারা সঙ্গীতে ভাবাবেশের এতদূর সহায়তা হয়, যে, ইহাদিগকে ছাড়িয়া উচ্চতম শ্রেণীর সঙ্গীত হওয়া এক প্রকার অসম্ভব।

আমার এই কথায় যিনি বিরক্ত হইবেন, তাঁহার সকল প্রকারের তিরস্কার আমি শিরোধার্য্য করিতেছি। কারণ আমি জানি যে অনেক কৃতবিদ্য দেশীয় সঙ্গীতবেত্তা আমার এই মতে সায় দিবেন না। কিন্তু আমি এ কথাও জানি যে, আমি যাহা বলিতেছি তাহা ঠিক। সঙ্গীতের ভাবব্যক্তির (expression) দিকে যাঁহাদের মনোযোগ বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা আমার কথায় নিশ্চয় সায় দিবেন।

এই স্থানেই বেহালার অন্য সকল যন্ত্রের উপরে শ্রেষ্ঠতা। এই যন্ত্রে ভাব প্রকাশের যেরূপ ব্যবস্থা আছে, অন্য কোন যন্ত্রে সেরূপ নাই। অবশ্য বেহালার আওয়াজও অন্যান্য সকল যন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু এ কথা মূল্যবান্ বেহালার সম্বন্ধেই সম্পূর্ণরূপে খাটে।

মিষ্ট আওয়াজ, শুদ্ধ সুর, স্পষ্ট উচ্চারণ, সূক্ষ্ম কাজ এবং ভাব প্রকাশের সুবিধা, সকলই বেহালাতে আছে।

সুতরাং মোটামুটি প্রায় সকল জিনিসই ইহাতে এক প্রকার বাজে। কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ উপযোগী হইতে হইলে বাদিতব্য বিষয়ে কয়েকটি গুণ থাকা চাহি।

প্রথমতঃ, উহা যন্ত্রের মিষ্টতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবে এবং ভাব প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী হইবে। নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী সুর এই দুই বিষয়েরই অনুপযোগী। সুতরাং জটিল গিটকারী অত্যধিক ব্যবহার না হওয়াই সঙ্গত বোধ হয়। মিড় গমক যথেচ্ছা ব্যবহার করুন। তবে, সেতার ইত্যাদিতে মিড় যেমন সহজ সাধ্য বেহালাতে ঠিক তেমন নহে। বেহালায় ঘর্ষণের পথে বাধা (friction) বেশী পড়ে, সুতরাং মিড় আয়াসসাধ্য হইয়া উঠে। কম্পন স্ফীতন প্রভৃতি কার্য্য বেহালার শ্রেষ্ঠতম অলঙ্কার। এই সকল অলঙ্কার ভাব প্রকাশের পক্ষেও অতিশয় উপযোগী। এই জন্য ভাল বেহালা বাদ্যে সচরাচর এই সকল অলঙ্কারের বাহুল্য দেখা যায়।

আর এক কথা। দেশী কায়দার অনুরোধে বেহালা যন্ত্রের সুরও অনেক খাদে বাঁধা আমাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। তারটি ঢিলা হইলে তাহাতে গিটকারী সহজে উঠে, মিড় দিবার সময়ও আঙ্গুলে লাগে কম। সুতরাং তারকে ঢিলা করা হয়। যন্ত্রের আওয়াজের দিকে যদি আমাদের কিঞ্চিৎ নজর থাকিত, তবে কখনই এই বদ অভ্যাসটা আমাদের হইত না। ইউরোপীয় ওজনের চাইতে অধিক খাদ করিলেই যন্ত্রের আওয়াজ নাকি হইয়া আইসে। ওজনটি ঠিক রাখা আমাদের সর্ব্বাগ্রে উচিত ছিল। উহাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যাহা ভাল বাজিবে, তাহাই বেহালার উপযোগী সঙ্গীত। কিন্তু আমাদের অবস্থা ঠিক ইহার বিপরীত। বেহালার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পূর্ব্বে আমাদের যে সঙ্গীত ছিল, তাহাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আমরা বেহালায় বাজাইতে চেষ্টা করিয়াছি। ইহার ফল কতকটা নৌকায় ঘোড়া দৌড়ার ন্যায় হইয়াছে।

বেহালার বিজ্ঞান সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দুটি কথা বলিয়া শেষ করি।

বেহালার কোন্ অংশটা যে মূল যন্ত্র তাহা বলা কঠিন। ধরিতে গেলে উহাতে দুটি যন্ত্রই আছে বলিয়া বোধ হয়। কেবল মাত্র সুরের দিক হইতে অবশ্য উহার তার কটিই মুখ্য। কিন্তু এইখানে শেষ করিলে যন্ত্রের আওয়াজ কিছুই থাকে না; অথচ এই আওয়াজ লইয়াই বেহালার জীবন। সুতরাং যন্ত্রের খোলটির প্রাধান্য অস্বীকার হইতে পারে না।

ফলে দুটি যন্ত্রই দাঁড়াইতেছে। তারগুলি ধ্বনি উৎপাদক যন্ত্র; খোলটি ধ্বনি বিবর্দ্ধক যন্ত্র। এই উভয় যন্ত্রের যোগ না হইলে পরস্পরের সহায়তা হয় না। এই যোগ রক্ষার জন্যই বেহালার ব্রিজের সৃষ্টি। ব্রিজ্, কিনা, সেতু—অতি সুসঙ্গত নাম। এই সেতু পার হইয়া তারের কম্পন খোলে সংক্রামিত হয়। তৎপর খোল কম্পিত হইয়া তন্মধ্যস্থিত বায়ুর সহযোগে আপনার শ্রবণবিবরের জন্য অমৃতের অবতারণা করে।

বেহালার ভিতরকার বায়ু খেলিতে না পাইলে খোলের দ্বারা তারের ভালরূপ সহায়তা হইবে না। এই জন্যই বেহালার উদরে ঐ গুম্ফাকৃতি রন্ধ্রের ব্যবস্থা। ঐ রন্ধ্রের ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে ডাইনে একটি খুঁটি দেখিতে পাওয়া যায়। ডান দিকের তারের সুর চড়া। এই চড়া সুরের কম্পনগুলি ঐ খুঁটির সাহায্যে বেহালার পৃষ্ঠদেশের অপেক্ষাকৃত কঠিন কাষ্ঠ খণ্ডে সংক্রামিত হয়। বেহালার সামনের কাঠখানি কোমল। খাদ সুরের পক্ষে উহা বেশ উপযোগী; কিন্তু চড়া সুরের জন্য আরো কঠিন কাঠ চাই। এই জন্যই পিঠের কাঠখানি কঠিন এবং তাহার সহিত চড়া সুরের তারটির সংযোগের জন্য ঐ খুঁটির ব্যবহার।

বেহালার কণ্ঠ সংলগ্ন কাঠখানির উপরে তারকে টিপিয়া ধরিলে উহার ধ্বনি যথেচ্ছা উচ্চ নীচ করা যায়।

বেহালার সম্বন্ধে জনৈক চিন্তাশীল লেখকের উক্তি স্মরণ করিয়া আমি 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করিতেছি। বেহালার তার এবং খোল, ইহারা যেন দুটি প্রেমিক; ব্রিজ্খানি তাহাদের প্রেমবন্ধন। ছড়ি আর আঙ্গুলের টিপ, সংসারের ঘাত প্রতিঘাত। তারটি তাহাতে জ্বালাতন হইয়া খোলের নিকট সহানুভূতি চাহিতেছে। খোলটি যথার্থ প্রেমিক! তাহার বুকে দুটি ছিদ্র—সে তাহার হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া রাখিয়াছে। ভিতরের ঐ খুঁটিটি তাহার আন্তরিক সহানুভূতির নিদর্শন।

সংসারের যেখানে এইরূপ মিলন ঘটিয়াছে, সেইখানে যথার্থ সঙ্গীত। যেখানে তাহা হয় নাই, সেইখানে খালি কাণ মলা, ছড়ির ঘষা, আর প্যাঁচ খ্যাঁচ মাত্র সার।

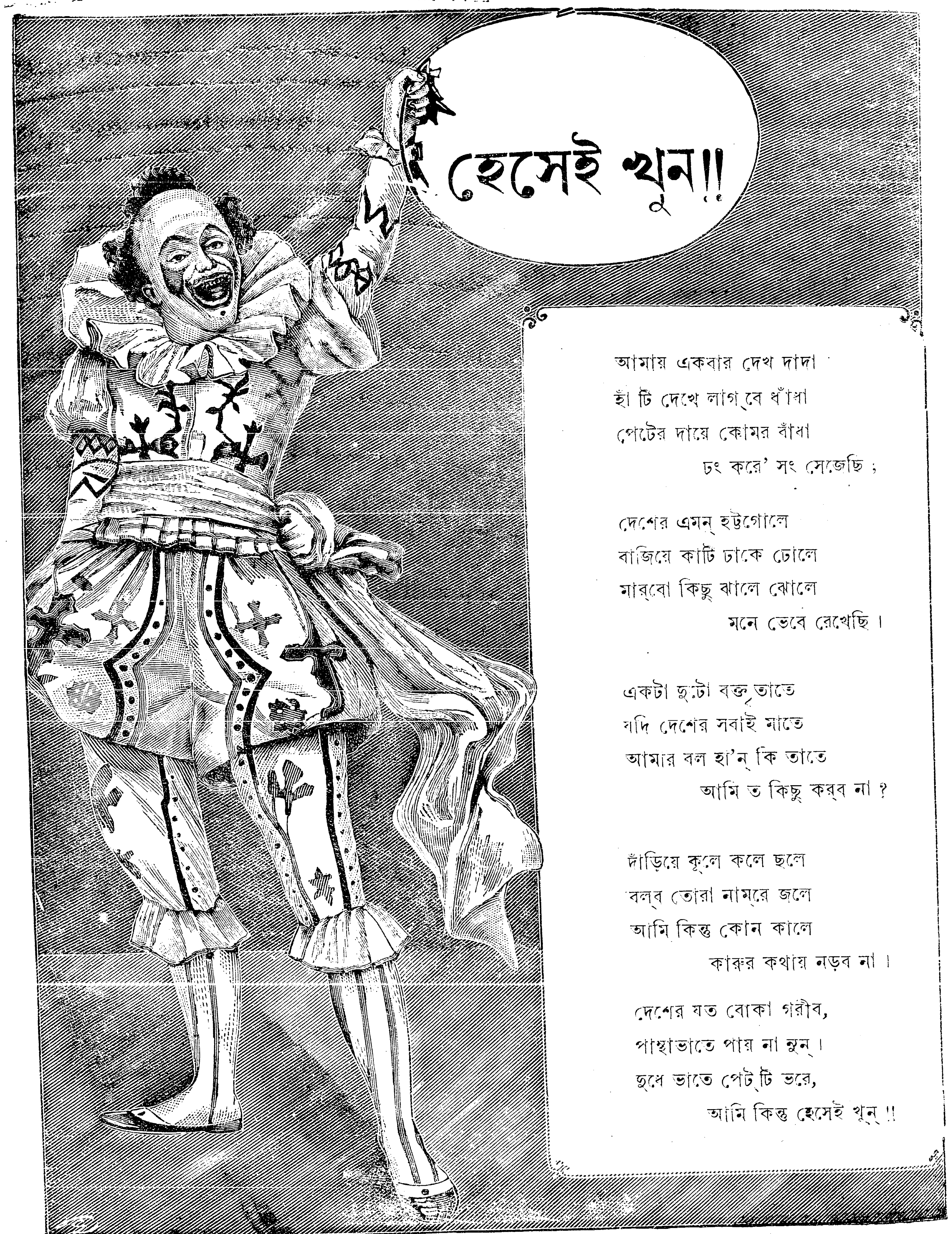

আমায় একবার দেখ দাদা
হাঁ টি দেখে লাগ্‌বে ধাঁধা
পেটের দায়ে কোমর বাঁধা
ঢং করে’ সং সেজেছি ;

দেশের এমন্ হট্টগোলে
বাজিয়ে কাটি ঢাকে ঢোলে
মার্‌বো কিছু ঝালে ঝোলে
মনে ভেবে রেখেছি ।

একটা জুটা বক্তৃতাতে
যদি দেশের সবাই মাতে
আমার বল হা’ন্ কি তাতে
আমি ত কিছু কর্‌ব না ?

দাঁড়িয়ে কূলে কলে ছলে
বল্‌ব তোরা নাম্‌রে জলে
আমি কিন্তু কোন কালে
কারুর কথায় নড়ব না ।

দেশের যত বোকা গরীব,
পান্থাভাতে পায় না নুন্ ।
দুধে ভাতে পেট্‌টি ভরে,
আমি কিন্তু হেসেই খুন্ !!

২৬ নং স্কট্‌স্ লেন্, ভারতমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত ও ২০৮।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস দ্বারা প্রকাশিত।

স্বর্গীয় দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়।

KUNTALINE PRESS.

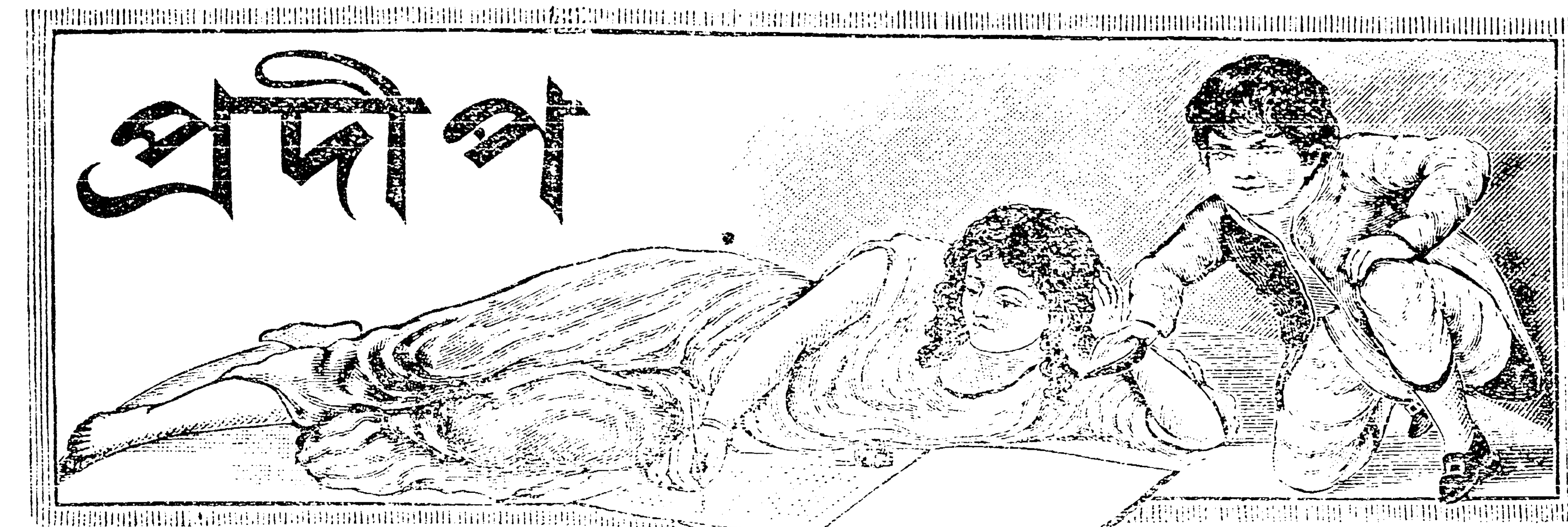

তৃতীয় ভাগ। } কার্ত্তিক, ১৩০৭। { ১১শ সংখ্যা।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়।

(২)

অক্সফোর্ডের প্রথম শিক্ষা মহত্বে বিশ্বাস ও তাহার উপায় স্বরূপ প্রেমের যোগ। একটী জীবন্ত মহৎ জাতি বা মহৎ সম্প্রদায়ের সঙ্গে জীবন্ত যোগ বড় সৌভাগ্যের কথা। সে যোগ দৈব শক্তির ন্যায় দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে আমাদিগকে রক্ষা করে, প্রাণে নূতন শক্তির সঞ্চার করে, মহৎ আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত করে। সৈনিক যেমন আপন রেজিমেণ্টের গৌরবের জন্য অকাতরে কামানের মুখে বুক পাতিয়া দেয়, তুমি আমি আমাদেরও যদি তেমনি একটা দল থাকে, ভালবাসিবার বস্তু থাকে, সম্মান ও ভক্তির পাত্র থাকে, তাহা হইলে তেমনি করিয়া আপনাকে ভুলিয়া তাহার জন্য প্রাণ দিতে পারি। "ইংলণ্ড আশা করেন যে তাঁহার সন্তানগণ আপনাদের কর্ত্তব্য করিবেন"—এই কথা শুনিলে প্রত্যেক ইংরাজ কোনও বিপদের মুখ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবে না। মহত্বের জন্য, জাতীয় সম্মান রক্ষার জন্য যে প্রাণ দেয়, ইংলণ্ডে সে দেবসম্মান লাভ করে। পক্ষান্তরে যদি কেহ স্বার্থের জন্য বা অন্য কোনও নীচ প্রলোভনে পড়িয়া জাতীয় সম্মানকে বিসর্জ্জন করে, ইংলণ্ড সে অধম সন্তানের নাম মুখে আনিবেন না। অবশ্য কোনও বিশেষ কাজে জাতীয় সম্মান বাড়ে কি কমে সে বিষয়ে বিভিন্ন মত থাকিতে পারে ও আছে। সেই জন্যই ভিন্ন ভিন্ন দলও আছে। কিন্তু জাতীয় সম্মান যে রক্ষা করিতেই হইবে—সে সম্বন্ধে মত ভেদ নাই। মহান্ আদর্শ আমাদিগকে আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থের উপরে লইয়া যায়, অতএব আমাদের মনুষ্যত্ব বিশ্বাসের জন্য ইহা অবশ্যই প্রয়োজনীয়। ভিন্ন ভিন্ন হৃদয়ে ইহা ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে—কোথাও সত্যনিষ্ঠা—কোথাও ভক্তি—কোথাও জাতীয় সম্মান—কোথাও সম্প্রদায়ের গৌরব—কোথাও বা পরিবারের সুনাম—নানাভাবে ইহা আমাদিগকে মহত্বের দিকেই লইয়া যায়। এই মহত্বের প্রতি বিশ্বস্ততা ইহা চরিত্রগঠনের—"শিক্ষার" একটা প্রধান অঙ্গ ও উপায়। সকল হৃদয়েই এমনি একটা উত্তোলনী যন্ত্র (lever) আছে: ঐ যে লোকটা তোমার নিকট নীচ বলিয়া মনে হইতেছে,—কেবল ক্ষুদ্র স্বার্থ, নীচ সুখ লইয়া আছে, উহার প্রাণেও এমন একটী যায়গা আছে যেখানে টিপিলে সে লাফাইয়া উঠিবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য সেটীকে পরিমার্জ্জিত করা, ও মহৎ আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত করা। মহত্বের আকর্ষণ সকলে সমান ভাবে অনুভব করে না; কিন্তু অন্যান্য গুণের ন্যায় ইহাকেও বৃদ্ধি করা যায়, অঙ্ক কসিতে কসিতে যেমন অঙ্কশাস্ত্রে পারদর্শিতা জন্মে তেমনি নীচ ছাড়িয়া মহৎ বিষয়ে অনুধাবন করিতে

করিতে মহত্ত্বে প্রীতি জন্মে ও আদর্শের উৎকর্ষ লাভ হয়। জাতীয় সম্মানের আস্বাদন পাইলে আর পারিবারিক ক্ষুদ্রতায় মানুষ বদ্ধ থাকিবে না: আবার যখন সমগ্রমানব-প্রেম হৃদয়ে প্রতিভাত হইবে, তখন জাতি বিচার ঘুচিয়া যাইবে। কিন্তু এ বিষয়ে শিক্ষা প্রয়োজন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রয়োজন অনুভব করিয়াছে; ও নানা উপায়ে আদর্শের বিস্তার ও তৎপ্রতি অনুরাগ বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে। নিরবচ্ছিন্ন সত্যের প্রতি বিশ্বস্ততা—বা উদার মানবপ্রেম বড় কঠিন কথা; এক দিনে এক লাফে তাহা লাভ করা যায় না; পাঁচ বছরের ছেলেটাকে তাহা শেখান যায় না; তখন তাহাকে শিখাইতে হইবে যে ভাইবোন চেয়ে সে যেন আপনার স্বার্থ বেশী ভাল না বাসে; ক্রমে তাহার কার্য্যক্ষেত্র যত বাড়িবে ততই তাহার আদর্শকে বিস্তৃত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। দশ বছরের ছেলেটা আপনার স্কুলের গৌরবে মাতিয়া উঠিতে পারে, সে যখন মানুষ হইবে, জাতীয় গৌরবের রক্ষক হইব, তখন তাহার নিকট স্বার্থত্যাগ আশা করিতে পারা যায়। অক্সফোর্ডের সন্তানগণ অক্সফোর্ডের প্রতি একান্ত অনুরক্ত: ভিন্ন ভিন্ন কলেজের ছাত্রগণ আপনাদের কলেজের প্রতি প্রগাঢ় আস্থাবান; কি করিয়া তাহাদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে হয় অক্সফোর্ড তাহা জানে। ইউনিয়ানের ডিবেটে যারা আপনাদের কলেজের সম্মান রক্ষার জন্য তৎপর, ক্রিকেট ম্যাচে যারা আপনাদের কলেজের নাম রাখিতে জানে, বোটরেসে যাহারা আপন বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবের জন্য প্রাণ দিতে পারে তাহারা যখন কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে তখন তাহাদের হাতে যে কোন ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায়। কেম্ব্রিজ অক্সফোর্ড বোটরেসে কখনও কখনও এমন ঘটিয়াছে যে যেই নৌকা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়াছে, অমনি বাহকদিগের মধ্যে কেহ হয়ত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, আর সে মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল না; কিন্তু যতক্ষণ 'রাইচ' (race) শেষ না হয় ততক্ষণ কিছুতেই থামিবে না। এই সব লোককে যদি যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাও, কি অন্য কোন গুরুতর কার্য্যভার দাও, প্রাণ দিয়া তাহা সাধন করা তাহাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ ও স্বাভাবিক হইবে। অক্সফোর্ডের প্রধান লক্ষ্য এমনি মানুষ তৈয়ারি করা। অক্সফোর্ড চায় তাহার সন্তানগণ সবল ও সুস্থ দেহ হইবে, অক্সফোর্ড চায় তাহার সন্তানগণ বিভিন্ন ভাষা সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শনে ব্যুৎপন্ন হইবে, অক্সফোর্ড চায় তাহার সন্তানগণ বাগ্মী ও সুলেখক হইবে, কিন্তু সর্ব্বোপরি অক্সফোর্ড আশা করে তাহার সন্তানগণ প্রকৃত মানুষ হইবে। প্রত্যেক অক্সফোর্ড সন্তান মনে করেন যে অক্সফোর্ডের সুনাম সর্ব্বোপায়ে রক্ষা করিতে হইবে, "esprit de corps," বজায় রাখিতে হইবে। সকল শিক্ষার মূল শিক্ষা এই আত্মসম্মান জ্ঞান। সকল শিক্ষার মধ্যে এই আদর্শ অক্সফোর্ডের মূলমন্ত্র।

এই মনুষ্যত্ব লাভের জন্য অক্সফোর্ডের যে সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়াছেন এখন আমরা সংক্ষেপে তাহার কিছু আলোচনা করিব। অবশ্য সর্ব্বপ্রথমও সর্ব্ব প্রধান উপায় সাহিত্যচর্চ্চা। প্রাচীন ও বর্ত্তমান কালের জ্ঞানিগণ আপনাদের প্রতিভা ও ভূয়োদর্শনের ফলস্বরূপ যে অগাধ জ্ঞান ভাণ্ডার সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন কোন শিক্ষা প্রণালীই তাহা অবহেলা করিতে পারে না। কিন্তু সর্ব্বদা মনে রাখা প্রয়োজন সেগুলি উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য নয়: এবং সেগুলি নানা উপায়ের মধ্যে অন্যতম, একমাত্র উপায় নয়। কিন্তু সাহিত্যচর্চ্চাকে যদিও অন্যান্য উপায়ের মধ্যে একটী উপায় বলিয়া ধরা হইয়াছে, তাই বলিয়া তাহা কিঞ্চিন্মাত্রও উপেক্ষিত হয় নাই। সাহিত্য আলোচনায় কি তাহার পুষ্টিসাধনে অক্সফোর্ড কি কোনও বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা হীন? ফল দেখিয়া কেহ কি বলিতে পারেন যে অক্সফোর্ডে জ্ঞানালোচনায় গভীরতা বা প্রবল আগ্রহ নাই? বরং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বজনীনতা ও গভীরতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়। কোনও বিশেষ বিষয়ে হয়ত অন্য কোনও স্থানে অক্সফোর্ড অপেক্ষা উন্নততর শিক্ষা দেওয়া হইতে পারে; কিন্তু সকল বিষয়েই এত উন্নত আদর্শ বোধ হয় কম স্থানে পাওয়া যাইবে। এই ক্ষুদ্র সহরটীতে পৃথিবীর সকল সাহিত্যসম্পন্ন ভাষা (literary language) শিক্ষা দেওয়া হয়; এবং পূর্ণতার আদর্শে অক্সফোর্ড সাহিত্যজগতের শীর্ষস্থানীয়। ক্যালডিয়ান, সীরিয়াক্, হিব্রু, আরবী, ইজিপ্টের হাইয়ারোগ্লিফিক, সংস্কৃত, আভেস্তিক গ্রীক, রোমান, চাইনীজ, জাপানিজ, তিব্বতীয়, বর্ত্তমান ইউরোপের প্রত্যেক ভাষা, অসভ্য জাতিগণের ভাষা, ধর্ম্মতত্ত্ব, দর্শন, জ্যোতিষ, অঙ্কশাস্ত্র সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞান, এই সমুদয় বিদ্যাই অক্সফোর্ডে অতি প্রকৃষ্টরূপে শিক্ষা দেওয়া হয়। জগতের সকল দেশের পুরাতন ও বর্ত্তমান সাহিত্য ভাণ্ডার হইতে সর্ব্ববিধরত্ন সঞ্চয় করিয়া অক্সফোর্ড আপনার গৃহ এমনি সুন্দর করিয়া সাজাইয়াছেন ও সাজাইতেছেন যে যাদের নিকট হইতে অক্সফোর্ড জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তাদেরই অচিরে অক্সফোর্ডের দ্বারে শিক্ষার্থী হইয়া দাঁড়াইতে হবে।

এখন প্রশ্ন এই যদি অক্সফোর্ডের ছাত্রেরা খেলা করিয়া সামাজিকতা করিয়া অধিকাংশ সময় কাটান তবে তাঁহারা কোথা হইতে এমন গভীর জ্ঞান লাভ করেন? এই প্রশ্নের উত্তরে অনেক কথা বলিতে হয়। প্রথমতঃ মনে রাখিতে হবে যে অক্সফোর্ডে কেম্ব্রিজে যে সব ছাত্র আসেন তাঁহারা ইংলণ্ডের শীর্ষস্থানীয়। অন্যান্য স্থানের স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহারা বিশেষ পারদর্শিতা দেখান, তাহাদিগকেই অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজে পাঠান হয়। আমাদের দেশের মত এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ই সংসার ক্ষেত্রের একমাত্র দ্বার নয়। বাস্তবিক পক্ষে বর্ত্তমান ইংলণ্ডের জীবননদীর প্রধান স্রোতের সহিত অক্সফোর্ড সম্বন্ধ হারাইয়াছে; ইংলণ্ডের জাতীয়গৌরব অন্ততঃ জাতীয় ঐশ্বর্য্য বাণিজ্য ও শিল্পের উপর নির্ভর করে; কিন্তু অক্সফোর্ড সাক্ষাৎভাবে ইহার জন্য কিছুই করিতেছেন না। নিশ্চয়ই অক্সফোর্ডের এই এক মহা ত্রুটি; জর্ম্মান ও আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী: সুতরাং সেখানে আজকাল যেমন শিল্প ও বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি দেখা যাইতেছে ইংলণ্ডে তাহার অভাব। ইংলণ্ডের যুবকগণের মধ্যে অতি কম অংশই অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজে আসেন। কিন্তু তবুও যে অক্সফোর্ড ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনে এমন উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহার কারণ এই যে সমুদয় উচ্চ পদগুলি তাহাদের হাতে। অক্সফোর্ড ইংলণ্ডের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের প্রসবিতা; ইংলণ্ডের ধর্ম্মযাজক, রাজপুরুষ, সংবাদপত্র পরিচালক, আইনব্যবসায়ী এবং শিক্ষকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। যে সকল বালক বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারে, অভিভাবকগণ কেবল তাহাদিগকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান। অক্সফোর্ডের এত নাম, কিন্তু ইহার ছাত্রসংখ্যা মাত্র তিন হাজার। কিন্তু প্রায়ই ইহারা ইংলণ্ডের তীক্ষ্ণবুদ্ধি যুবকবৃন্দ। জীবনযাত্রার নানা উপায় থাকাতে কঠিন পরীক্ষারূপ দ্বাররক্ষক বিনা ও কেবলমাত্র বিশিষ্টগুণসম্পন্ন যুবকেরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হন। কিন্তু যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশলাভ করেন, তাঁহাদের জন্য সকল প্রকার সুযোগ ও নানা সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন কলেজে গড় বাৎসরিক ১২০০ শত টাকার প্রায় ৭০০ শতের উপর বৃত্তি আছে; এতদ্ভিন্ন অনেক রকম প্রাইজের ব্যবস্থা আছে। ছাত্রসংখ্যার অল্পতাহেতু প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয়; কলেজ হইতে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য টিউটার দেওয়া হয়; ছাত্রদিগকে তজ্জন্য অপেক্ষাকৃত খুব সামান্য অর্থব্যয় করিতে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এতদ্ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যেক ছাত্রের জন্য গড়ে ৩৩০০, শত টাকা ব্যয় করেন। লাইব্রেরী, মিউজিয়াম, লেবরেটারী, যে কোন উপায়ে ছাত্রদের সুবিধা হইতে পারে কিছুরই ত্রুটি নাই।

সাধারণ ছাত্রদের অবস্থা ও সুবিধা এইরূপ কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয় আশা করেন না যে সকল ছাত্রই মহা পণ্ডিত হইবেন। ইহার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দল আছে। কাহারও উদ্দেশ্য পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করিয়া বা অন্য প্রকারে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কাজ করা; তাঁহারা সেই অনুরূপ শিক্ষায় মন দেন; হয়ত বিশেষভাবে বক্তৃতা শক্তি লাভের চেষ্টা করেন। সেইজন্য ইঁহারা ডিবেটিং ক্লাবেই বেশী সময় কাটান। কাহারও উদ্দেশ্য সংবাদপত্র পরিচালনা; তিনি তদনুরূপ শিক্ষায় মন দেন; কাহারও বা ইচ্ছা কোন ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করা। বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাদের সবগুলিকে এক জাঁতায় ফেলিয়া পিষিতে চেষ্টা করে না; প্রত্যেককে আপন আপন উদ্দেশ্যানুযায়ী শিক্ষার সাহায্য করা হয়। পরীক্ষা সঙ্কট অক্সফোর্ডে নাই বলিলেই হয়; সাধারণের জন্য যে সমুদায় পরীক্ষা তাহা অপেক্ষাকৃত সহজ; সেই জন্যই যে সব ছাত্র দিনে দুঘণ্টাও পড়ে না তাহাদের পক্ষে পাশ করা সম্ভব হয়। প্রথম শ্রেণীতে পাশ করা ও চতুর্থ শ্রেণীতে পাশ করার অথবা অনার ও শুধু পাশের ষ্ট্যাণ্ডার্ডে (standard) এ অনেক প্রভেদ। তিন বৎসর একটু একটু পড়িয়া ক্রমে পাশ করিতে পারা যায়; সব বিষয়গুলি একেবারে লইতে হয় না; এবং পরীক্ষাতে ছাত্রদের সাধারণ জ্ঞানমাত্র দেখা হয়; মোটের উপর পরীক্ষাগুলি যতদূর সম্ভব সহজ করা হইয়াছে, ও ক্র্যামিংএর প্রশ্রয় বা সুবিধা একেবারেই নাই। পরীক্ষাপ্রসঙ্গে আর একটী কথা বলা

নিতান্ত প্রয়োজন মনে হইতেছে। এখানে পরীক্ষা দিয়া ফল জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া অনিদ্রায় দিন কাটাইতে হয় না। দুই তিন দিনের মধ্যেই ফল বাহির হয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয় ভাবিলে মনে হয় যেন সেগুলি এক একটা হৃদয়হীন প্রকাণ্ড দৈত্য, নীরবে আমাদের যুবকগণের বুকের রক্ত শুষিয়া পান করিতেছে। কঠোর পরিশ্রমের পর যে সুদীর্ঘ তিনমাসকাল ফলের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় আমার মনে হয় যেন তাহার প্রত্যেক দিন এক ছটাক করিয়া হৃদয়ের রক্ত শুকাইয়া যায়। সেই তিনমাস ছাত্রেরা কোনও বিষয়ে মন দিতে পারে না; না পুরাতন কাজে মন লাগে, না নূতন কাজ আরম্ভ হয়। সর্ব্বপ্রকারে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জাতীয় জীবনের শক্তি হ্রাস করিয়া দিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকগণ যেন লোহার কল চালাইতেছেন; ছাত্রদের যে মর্ম্মবন্ধন ছিঁড়িয়া যাইতেছে সে দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি আছে বলিয়া মনে হয় না। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় আছে ছাত্রদের জন্য, ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নহে। যাহাতে ছাত্রদের সুবিধা হইবে সর্ব্বদা সেই দিকে দৃষ্টি। পরীক্ষার দিনে যদি একটী ছাত্রের অসুখ হইল, তাহার বাড়ীতে প্রশ্নের কাগজ পাঠাইয়া সেখানে তাহার পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে ও তাহার অসুস্থাবস্থা স্মরণ রাখিয়া পরীক্ষকগণ মার্ক দিবেন। বৎসরের মধ্যে তিন চারিবার পরীক্ষা লওয়া হয়; সুতরাং একেবারে অনেক পরীক্ষার্থী হয় না; এবং শীঘ্রই কাগজ দেখা শেষ হইয়া যায়। একবার অকৃতকার্য্য হইলে এক বৎসর অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না; ২।৩ মাস পরেই আবার পরীক্ষা গৃহীত হইবে। ছাত্রের জীবন সময় ও শক্তির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সর্ব্বদা রহিয়াছে।

এই পরীক্ষা সৌকর্য্য নিবন্ধন পাঠের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে যেদিন পরীক্ষার খবর আসে, সে দিন মনে হয় উদ্ধার পাওয়া গেল; আজ বই গুলা পুড়াইয়া আনন্দ করা যাক। বাস্তবিকই অনেক স্থলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য যিনি যে বিষয় লন তাঁর তাহাতে তত অধিক বিতৃষ্ণা। এখানে পরীক্ষার জন্য রাশি রাশি বই মুখস্থ করিতে হয় না। তাহার কারণ পরীক্ষকগণ দেখিতে চান ছাত্রেরা সেই বিষয়টা বুঝিয়াছেন কিনা। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষকগণের পারদর্শিতা। অবশ্য আমি মনে করি না আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ অপেক্ষাকৃত অল্প বুদ্ধিমান্, কিন্তু তাঁহাদের সুযোগ সুবিধা এত কম যে কোনরূপেই তাঁহাদিগকে অক্সফোর্ডের অধ্যাপকদের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। অক্সফোর্ডের অধ্যাপকগণ আপন আপন বিষয়ে বাস্তবিকই অধিকারী (master)। আমাদের অধ্যাপকদিগকে অনেক স্থলেই দুইটি বা ততোধিক বিষয়ে শিক্ষা দিতে হয়। আবার তাঁহাদের সময় এত কম যে বক্তৃতার জন্য বিশেষরূপে প্রস্তুত হইতে খুব কম সময়ই পান। অক্সফোর্ডের বিখ্যাত অধ্যাপকগণও আপনাদের বক্তৃতার বিষয় সম্পূর্ণরূপে না লিখিয়া ক্লাশে আসেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বৎসরের মধ্যে মাত্র ২৪ সপ্তাহ কাজ হয়; এবং কোনও অধ্যাপক সপ্তাহে তিনটা কি চারিটার বেশী বক্তৃতা দেন না। সুতরাং সে বক্তৃতাগুলি যে অতি সারগর্ভ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অক্সফোর্ড যে এত চিন্তাশীল লেখক প্রসব করিয়াছেন এই তাহার এক কারণ। লোকে অভিযোগ করেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মৌলিক লেখক বাহির হইল না; কিন্তু মৌলিক লেখক কি গাছে ফলে? অক্সফোর্ডের অধ্যাপকদিগকে যদি আমাদের অধ্যাপকগণের ন্যায় ৮ মাস ধরিয়া সপ্তাহে ১৮, ২০, কি স্থল বিশেষে ৩০টি করিয়া বক্তৃতা দিতে হইত, তাহা হইলে জান্‌সেটও হইত না, মার্টিনোও হইত না, কেয়ার্ডও হইত না। অক্সফোর্ডের কথা যত ভাবি তত মনে হয় আমাদের দেশের শিক্ষা প্রণালী গলদে পরিপূর্ণ। ডালে বসিয়া আমরা তাহার মূল কাটিতেছি; আর যখন পড়িয়া যাই তখন অদৃষ্টের দোষ দিই।

আবার এখানকার শিক্ষা শুধু লেকচার শুনাতেই আবদ্ধ নয়; অক্সফোর্ডে একটা শিক্ষার হাওয়া আছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এতগুলি জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ও জ্ঞান পিপাসু যেখানে একত্রে বাস করেন সেখানে যে একটা জ্ঞানের আগুন জ্বলবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! অক্সফোর্ড যেন ইংলণ্ডের নৈমিষারণ্য; ঋষিগণ শিষ্যবৃন্দের সহিত সর্ব্বদাই জ্ঞানালোচনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। আহারে বিহারে শ্রমে বিশ্রামে সর্ব্বদাই একটা শিক্ষার স্রোত বহিতেছে। এই হাওয়ার মধ্যে বাস করিলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু না কিছু শিখিতে হয়। এই জন্যই কেবলমাত্র অক্সফোর্ডে বাস করিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে ডিগ্রী পাইবার যোগ্যতা লাভ করা যায়। অধ্যাপক ও ছাত্রদিগের মধ্যে কোনও ব্যবধান নাই, যখন ইচ্ছা তাঁহাদিগের নিকট যাইয়া আপনাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারা যায়; অবাধে তাহাদের সঙ্গে তর্ক কর, অসঙ্কোচে তাহাদের সহিত তোমাদের মতপার্থক্য জানাও, তাঁহারা অতিশয় প্রীত হইবেন। ছাত্রদের ন্যায় তাহারাও শিক্ষার্থী। কলেজের প্রিন্সিপাল পরিবারের পিতৃস্থানীয় ও ফেলোগণ অগ্রজস্বরূপ, প্রিন্সিপাল সপরিবারে কলেজে বাস করেন; প্রিন্সিপাল ও ফেলোগণ ছাত্রদের সঙ্গে একত্রে আহার করেন; আহারের পর তাঁহাদের সঙ্গে বন্ধুর ন্যায় মিশিয়া আলাপ হয়। বিশেষ কোনও ঘটনা থাকিলে তাঁহাদের পরিবারেরাও আসিয়া যোগ দেন। বাস্তবিকই অক্সফোর্ডে ছাত্রজীবন অতি মধুর।

এইভাবে তিন বৎসর কাটাইয়া ডিগ্রী পাওয়া যায়; ডিগ্রীলাভ করা কাহারও পক্ষে কঠিন নয়; শতকরা ৮০ জন পরীক্ষায় পাশ হয়। কিন্তু সেখানেই শিক্ষার শেষ নয়। এখানকার এই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব। আমার মনে হয় যে পরীক্ষার দিনে বা অব্যবহিত পরে একজন কলিকাতার গ্রাজুয়েট অক্সফোর্ডের গ্রাজুয়েট অপেক্ষা বেশী জানিতে পারেন। কিন্তু সে জ্ঞান স্থায়ী হয় না। অক্সফোর্ডের গ্রাজুয়েটদের প্রাণে একটা জ্ঞান স্পৃহা জন্মে; ডিগ্রী পাওয়ার পর হইতে তাহাদের প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হয় বলিলেও হয়। ডিগ্রী পাওয়ার পরে ও অনেকে অক্সফোর্ডেই থাকেন; সকলেই পাঠের অভ্যাস রক্ষা করেন। বিশেষতঃ যাহারা জ্ঞানচর্চ্চার দিকে মন দেন, সাহিত্য সেবা, শিক্ষা দান, বা ধর্ম্মযাজনেচ্ছু হন, তাহারা এক মনে স্ব স্ব প্রিয় বিষয় আলোচনা আরম্ভ করেন; ইহাদের জন্য নানা প্রকার বৃত্তি রহিয়াছে; এই বৃত্তি লইয়া কেহ বা অক্সফোর্ডে কেহ বা জর্ম্মাণী বা অন্য কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানপূর্ব্বক তত্ত্বান্বেষণে নিমগ্ন হন; তার পরে দশ বৎসর মধ্যে তিনি সেই শাস্ত্রে একজন মহাপণ্ডিত হইয়া বাহির হইলেন; হয়ত কোন অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কার করিলেন, পুরাতন সত্যের নূতন ব্যাখ্যা করিলেন, নূতন নূতন পুস্তক প্রণয়ন করিলেন। তাঁহারাই অক্সফোর্ডের জ্ঞানগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, নাম উজ্জ্বল করিয়াছেন।

এই গেল এক শ্রেণীর লোক। কিন্তু যাঁরা মোটামুটী কিছু শিখিয়া কর্ম্ম স্রোতে ভাসিতে চান তারা অন্য পথ গ্রহণ করেন। এক শ্রেণীর ছাত্রদের ব্যায়ামের দিকে বড় ঝোঁক। ব্যায়াম বলিলে যেন ঠিক হয় না, এথ্লেটিক্‌স্ অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান জীবন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখানে সিনিয়র র‍্যাংলার (Senior wrangler) ও প্রথম শ্রেণীর অনার অপেক্ষা একজন ব্লু (Blue) এর সম্মান বেশী। যারা উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাচে স্থান পান তাঁহাদিগকে ব্লু বলে। কোন কলেজ হইতে যদি একজন ব্লু বাহির হয় তারা সিনিয়র র‍্যাংলার হইতে অধিক সম্মান হইল মনে করে। যে সব ছাত্রেরা এথ্লেটিক্‌সে বিশেষ দক্ষ নয় তাহাদিগকে যেন অবজ্ঞার চক্ষুতে দেখা হয়। এথ্লেটিক্‌সের জন্য ব্যয়ও যথেষ্ট; প্রত্যেক কলেজের প্রকাণ্ড পরিপাটী খেলার মাঠ; অতি সুন্দর সুসজ্জিত বজরা, সেখানে বসিবার স্থান, লিখিবার সরঞ্জাম, আহারের বন্দোবস্ত। খেলা শিখাইবার জন্য শিক্ষক, বাইচ দিবার জন্য নৌকা। এথ্লেটিক্‌স্ শুধু শরীরের উন্নতির জন্য নয়; ইহা উচ্চ শিক্ষার একটা অঙ্গ। গত বৎসরের "প্রদীপে" বিলাতে ক্রিকেট খেলা বিষয়ক প্রবন্ধে সে কথার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একটা প্রধান অঙ্গ বিতর্ক সভা। প্রত্যেক কলেজে পৃথক্ বিতর্ক সভা, সেখানে তর্ক শক্তি লাভের আরম্ভ। যখন একটু ভয় ভাঙ্গিয়া যায় ও বলিবার শক্তি জন্মে, তখন ইউনিয়নের অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ক্ষেত্রে শক্তি পরীক্ষা আরম্ভ হয়। ইউনিয়নের তর্কসভায় কেবলমাত্র ছাত্রেরাই নয় পরন্তু প্রত্যেক অক্সফোর্ডবাসী ও আগন্তুকেরাও আগ্রহের সহিত উপস্থিত হন। হাউস অব কমন্সের গ্যালারি অপেক্ষা অক্সফোর্ড ইউনিয়নের গ্যালারি অধিক জনতাপূর্ণ দেখিয়াছি। এই সব ভিন্ন ভিন্ন ইনষ্টিটিউশন সম্পূর্ণরূপে ছাত্রদিগের দ্বারা পরিচালিত, এবং এগুলির কাজও অতি পরিপাটীরূপে সম্পন্ন হয়। সেই এক মহাশিক্ষা। পাঁচ শত কি হাজার জন ছাত্রের সভা পরিপাটীরূপে চালান বড় সহজ কথা নয়; সর্ব্বদাই উভয় পক্ষে তুমুল বাদ প্রতিবাদ সম্ভাবনা; সকলকে সন্তুষ্ট রাখিয়া কাজ চালাইতে বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন হয়।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয় বলিতে গেলে অনেক

কথা মনে পড়ে ; শতমুখী ইহার চেষ্টা, আপনাতে আপনাকে রাখিতে না পারিয়া যেন শতধারে বহিয়া যাইতেছে। বর্ত্তমানে কেবলমাত্র অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচার বিভাগের উল্লেখমাত্র করিয়া নিরস্ত হইব। আমাদের দেশে অক্সফোর্ড মিশনের কার্য্য সম্বন্ধে পাঠকগণের অভিজ্ঞতা থাকিতে পারে। ভারতে খ্রীষ্টধর্ম্মের সম্যক্ বিস্তার হয় নাই—হইবেও না, কিন্তু ইঁহাদের উদ্যম নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। ইংলণ্ডে ইঁহাদের চেষ্টা অপেক্ষাকৃত অনেক পরিমাণে ফলবতী হইয়াছে। লণ্ডন ও অন্যান্য সহরের দরিদ্র লোকদিগের ধর্ম্ম ও জ্ঞানোন্নতির জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। আমার মনে হয় এ বিভাগে মুক্তিফৌজের (Salvation Army) নিম্নেই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান।

অক্সফোর্ডের পক্ষে অনেক কথা বলিলাম ; অক্সফোর্ডের শিক্ষা প্রণালীর ত্রুটিও আছে ; এ পর্য্যন্ত জগতে কোনও বিভাগে এমন কোনও প্রণালী আবিষ্কৃত হয় নাই যাহা সম্পূর্ণ দোষশূন্য। অক্সফোর্ডের দোষের বিষয় আলোচনা করিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমেই মনে হয় যে এতগুলি অগঠিত চরিত্র যুবককে একত্র করিলে তার ফল কি অনেক সময় ঘোর অনর্থজনক হইবে না ! একদিকে যেমন প্রভূত উপকারের সুযোগ তেমনি আবার ঘোর অকল্যাণেরও সম্ভাবনা রহিয়াছে। যৌবনের প্রথমাবস্থায় পিতামাতা ও আত্মীয়গণের সজাগ দৃষ্টি হইতে, ভাইভগ্নীদের প্রীতি-পবিত্র স্বর্গরূপী গৃহ হইতে যুবগণকে বিচ্ছিন্ন করায় অনেক বিপদ ও অমঙ্গলের সম্ভাবনা। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অথবা অন্য কোনও সময়ে এরূপ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে না। আবার অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় যে পিতামাতা সন্তানগণের শিক্ষা পরিদর্শনের উপযুক্ত পাত্র নন। এরূপস্থলে সন্তানগণকে গৃহ হইতে দূরে পাঠান একপ্রকার অবশ্যম্ভাবী। তৎপরে প্রশ্ন এই যে আমাদের দেশের মত ভিন্ন ভিন্ন সহরে কলেজ স্থাপন করা ভাল, না ইংলণ্ডের ন্যায় কোনও বিশেষ স্থানে শিক্ষাক্ষেত্র স্থাপন করা উচিত। ব্যয় সংক্ষেপের হিসাবে ইংলণ্ডের প্রণালী নিশ্চয়ই প্রকৃষ্টতর। প্রাদেশিক কলেজসমূহে ছাত্রসংখ্যা নিতান্ত কম অথচ অধ্যাপকের সংখ্যা কমাইবার উপায় নাই। যেখানে একজন অধ্যাপকে কাজ চালাইতে পারা যাইত, সেখানে বিশ জন প্রয়োজন হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ লণ্ডন, ম্যাঞ্চেষ্টর, পারিশ, কলিকাতা, বোম্বাইয়ের ন্যায় সহর যুবকগণের শিক্ষার পক্ষে কোনও মতেই অনুকূল স্থান বলিয়া মনে হয় না। এগুলিতে এত কোলাহল, উত্তেজনা ও প্রলোভন যে ছাত্রজীবনের পক্ষে তাহারা বিষস্বরূপ। আবার অপরদিকে ইহাও ভাবিবার বিষয় যে ভবিষ্যতে ইহাই তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র হইবে ; ইহার সঙ্গেও পরিচয় হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এই সব বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যে সমুদয় উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন, বড় বড় সহরে তাহা অসম্ভব। কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীটের কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় সংস্কারসাধন করিবার চেষ্টা বারবার ব্যর্থ হইয়াছে ; কিন্তু অক্সফোর্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ের শক্তি অপ্রতিহত। অক্সফোর্ডের একজন অধ্যাপক আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন যে তিনহাজার যুবক এখানে বাস করে ; কিন্তু এখানে অপবিত্রতা নাই বলিলেই হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের সন্দেহ হইলে এক মুহূর্ত্তে যে কোনও স্ত্রীলোককে অক্সফোর্ড হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারেন। তাঁহাদের বিনা অনুমতিতে থিয়েটারে কোনও নাটক অভিনীত হইতে পারে না। দোকানদারেরা ছাত্রদের টিউটারদিগকে না জানাইয়া পাঁচ পাউণ্ডের অধিক ঋণ দিলে আইনানুসারে তাহা অগ্রাহ্য হইবে। তিন হাজার ছাত্রকে একত্র করায় বিপদ আছে—দায়িত্ব আছে ; বিশ্ববিদ্যালয় তজ্জন্য অতিশয় চিন্তিত। গবর্ণমেণ্টও তজ্জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে যথেষ্ট ক্ষমতা দিতে পশ্চাৎপদ নন। বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন উচ্চ কর্ম্মচারী দিনরাত পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ান ; বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ পুলিস আছে। ছাত্রগণ সন্ধ্যার পর ইউনিফর্ম না পরিয়া বাহির হইতে পারেন না। তথাপি আমি স্বীকার করি যে এতগুলি যুবককে একত্র করা বিপজ্জনক ; কিন্তু ইহা অপেক্ষা অল্প নিরাপদ উপায় ত আর কিছু দেখি না।

অক্সফোর্ডের দ্বিতীয় ত্রুটী অতিমাত্র মৃতভাষা চর্চ্চা। লাটিন গ্রীক অক্সফোর্ডের প্রধান পাঠ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত পাঠ্যের মধ্যে ইংরাজী সাহিত্যের স্থান নাই বলিলেই হয় ; বিজ্ঞান ও শিল্পবিদ্যার দিকে অক্সফোর্ড এখনও যথেষ্ট মনোযোগ দেন নাই। এই জন্য অক্সফোর্ড বর্ত্তমান

যুগের জাতীয় জীবনের সহিত তেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রাখিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু আশা করা যায় শীঘ্রই এবিষয়ে সংস্কার আরম্ভ হইবে।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরের নিয়ম ব্যবস্থা, কলকারখানা সেগুলি এখন আমাদের দেশে বড় অজ্ঞাত নাই। সুতরাং সে বিষয়ে কিছু লেখা প্রয়োজন মনে করিতেছি না। অক্সফোর্ডের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও কেন্দ্র-শক্তির যৎকিঞ্চিৎ আভাস দিতে চেষ্টা করিলাম।

(সমাপ্ত)

কুষ্মাণ্ড-চিন্তা।

ওড়িশায় বর্ষাকালে ঘরের চালের শোভা কুমড়া লতা। ইহাতে চালের অবশ্য ক্ষতি হয়। এক বর্ষার পরেই উহা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু এদেশে ঘরের কোন চালই এক বর্ষার অধিক প্রায় থাকে না। চাল ছাউনীর দোষে প্রথম বর্ষার জল ঘরের ভিতরে না পড়িলেই সৌভাগ্য মনে করিতে হয়। ফার্গুসন সাহেব ডাঃ রাজেন্দ্রলালের সহিত বিস্তর কলমযুদ্ধ করিয়াছিলেন। সাহেব বলিতে চান, এদেশে—এই ভারতখণ্ডে—প্রথমে কাঠের ঘর নির্ম্মিত হইত, এবং তাহারই অনুকরণে পরে পাথরের ও ইটের ঘর নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইতিহাসলেখক হুইলার সাহেব রামরাজধানী অযোধ্যায় কেবল কাঠের ও বাঁশের বেড়া, কুঁড়ে ঘর প্রভৃতি দেখিতে পাইয়াছেন। প্রাসাদগুলা কাঠের বাঁশের বড় বড় ঘর ! সে যাহা হউক, ওড়িশার মন্দিরগুলি যেমন কাটা কাটা, ঘরের খড়ের চালগুলিও তেমনই কাটা কাটা, যেন মটকায় উঠিবার এক এক ধাপ। কুষ্মাণ্ড লতার বিতান না থাকিলেও আরোহণে বড় একটা বিঘ্ন হইত না।

বস্তুতঃ ওড়িশা দেশটাকে এক একবার কুষ্মাণ্ডের দেশ বলিয়া মনে হয়। এত সহজে এখানে কুমড়া জন্মে যে দেখিলে বাস্তবিক বিস্মিত হইতে হয়। আকারে কিন্তু ওড়িশার কুমড়া বঙ্গদেশের কুমড়াকে হারাইতে পারে নাই ! নাই পারুক, ফলে খুব।

কোন্ কুমড়ার কথা বলিতেছি, তাহা এখনও বলা হয় নাই। এখন একটু নামরহস্য উদ্ভেদ করা আবশ্যক। এই কুষ্মাণ্ড এক ; বহুলোকে বহুনাম দিয়া আভিধানিকগণের কার্য্য বাহুল্য ঘটাইয়াছে। কিংবা মানবের স্বভাবই এই, প্রিয় বস্তুর একটি নামে তৃপ্ত হয় না। যাহাই হউক, বঙ্গদেশের মধ্যেই ইহা কোথাও বিলাতী কুমড়া, কোথাও মিঠে বা গুড় কুমড়া, কোথাও সকরী কুমড়া, কোথাও ডিঙ্গলী বা ডিঙ্গলী কুমড়া, কোথাও বৈতল,—ইত্যাদি নামে খ্যাত। পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে এই কুষ্মাণ্ড “কুমর” নামে পরিচিত। শাব্দিক পণ্ডিতগণ এই বিবিধ নামতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া এই বিদেশীয় কুষ্মাণ্ডের ইতিহাস প্রকটন করিতে পারেন।

বঙ্গদেশের অনেকে জানেন না যে, পুরীর জগন্নাথদেবের ভোগের নিমিত্ত কোন বিলাতী ফলমূল চলে না। সুখাদ্য সর্ব্বজন পরিচিত বিলাতী আলু পুরীর মন্দিরে অদ্যাপি প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই। তাহার স্থান ওড়িয়া সারু, বাঙ্গালা কচু অধিকার করিয়া আছে। বিলাতী আলুর দোষ বিলাতীত্ব। বোধ করি, কালে বিলাতীত্ব ঘুচিয়া যায়। বিলাতী কুমড়া হইলেও ভোগে চলে। এমন কি, বিলাতী কুমড়া না থাকিলে দৈনন্দিন বহুভোগের ব্যঞ্জন কি হইত, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তির চিন্তার যোগ্য। বিলাতী বলিয়া আলু নিষিদ্ধ ; কিন্তু হায়, বিলাতী বলিয়া কাপড় নিষিদ্ধ হয় নাই। তথাপি আমাদের ওড়িয়া ভায়াগণ দেশীয়ত্ব অনেকটা রক্ষা করিয়া চলেন। বঙ্গদেশ ক্রমশঃ বিলাতী হইয়া পড়িতেছে।

ভোজনবিলাসী কুমড়ার ছক্কার* প্রশংসা করিয়া থাকেন। কিন্তু ওড়িয়া ভায়ারাই কুমড়ার যথার্থ আদর জানেন।

বৈতু কখারু, মজা কাহিঁকি পচারু। অর্থাৎ বৈতু কখারু বা বিলাতী কুমড়ার মজা পচারিবার বা সন্দেহ করিবার যোগ্য আদৌ নহে।

কুমড়ার নামগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায়, ‘মিঠে’ ও ‘গুড়,’ বিশেষণদ্বয় এই কুমড়ার ‘মজার’ নিদান। বিদেশীয় বলিয়া বিলাতী ; তবে বিলাতী বলিয়া ইংলণ্ড বা য়ুরোপের অন্য কোন দেশ হইতে ইহার আমদানী হয় নাই। ইহার আদিবাস আমেরিকার গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। উদ্ভিদ্ বিদ্যার ভাষায় ইহাকে রাণী বলা যায়। সুদূর আমেরিকা হইতে আসিবার সময় কুমড়াটি জাহাজে চড়িয়া

* ছক্কা শব্দটার ব্যুৎপত্তি কি ? ছয়টা বস্তুর যোগ কি ?

আসিয়াছিল। সফরে আসিয়াছিল বলিয়া সফরী কুমড়া; জাহাজে বা বড় নৌকায় আসিয়াছিল বলিয়া ডিঙ্গি কুমড়া, জাহাজী কুমড়া নাম হইয়াছে। মেদিনীপুর অঞ্চলে ইহার নাম বৈতন; মেদিনীপুরের সংলগ্ন উড়িষ্যাদেশে নাম বৈতাল বা বৈতকখারু।

কখারু শব্দটি সংস্কৃত কর্কারু শব্দের অপভ্রংশ। কর্কারু শব্দের অর্থ কুষ্মাণ্ড। আমরা সংস্কৃত কুষ্মাণ্ড শব্দটি বিকৃত করিয়া কুমড়া করিয়াছি। কুষ্মাণ্ডের 'ষ' ও 'ণ' লোপ পাইয়াছে; 'ম'এর আকার পরবর্তী 'ড'এ যুক্ত হইয়াছে। এইরূপ, অনেক সংস্কৃত শব্দের মধ্যবর্তী আকার দেশভাষায় শেষে গিয়া পড়িয়াছে। বরিশালের 'কুম্মার লতা' পশ্চিমবঙ্গের 'কুমড়া গাছ'। প্রাকৃতিক বিধানে 'ড' এর পরিবর্তে 'র' হইয়াছে, 'ষ' ও 'ণ' লোপ পাইয়াছে, কিন্তু আশ্চর্য্য 'ম'এর আকার 'ম'তেই আছে।

মানুষ অলস; ইহার প্রমাণ বিলাতী কুমড়া নামে প্রকাশ পাইতেছে। সংস্কৃতে যে ফলের নাম কুষ্মাণ্ড, সেটা ছাঁচি কুমড়া, উড়িষ্যার পানি কখারু। যখন বিলাতী কুমড়া এদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহার একটা নূতন নাম না দিয়া বিলাতী বা বৈতন বা জাহাজী প্রভৃতি বিশেষণ যোগ করিয়া পুরাতন কুমড়া নামেই কাজ সমাধা হইল। বিলাতী আম, বিলাতী কাপড়, বিলাতী দিয়াশলাই প্রভৃতি নামে মানুষের স্বাভাবিক আলস্য প্রকাশ পাইয়াছে।

বৈত, বৈতাল নাম লইয়া বড় গোলযোগে পড়িয়াছিলাম। শেষে সাব্যস্ত হইয়াছে, উড়িয়া বৈত শব্দের চলিত অর্থ বড় নৌকা বা জাহাজ। শব্দটা সংস্কৃত বহিত্র শব্দের অপভ্রংশ। বৈত কখারু অর্থে জাহাজী কুমড়া, যে কুমড়া এ দেশে ছিল না, যাহা বিদেশ হইতে জাহাজে চড়িয়া এ দেশে আসিয়াছে। কিন্তু শব্দবিৎ পণ্ডিতেরা কোন শব্দের একটি অর্থে তৃপ্ত হয়েন না। বিলাতী কুমড়া লম্বালম্বি কাটিলে এক এক-খানাকে নৌকার মত দেখায়। ডিঙ্গা কুমড়া ওরফে বৈত কখারু নামের কারণ উহাও বলা যাইতে পারে। বৈতাল শব্দের এই অর্থ অন্যত্র পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ ভুবনেশ্বরের মন্দিরের নিকট বৈতাল নামে একটি মন্দির আছে। দেউল-টির উপরিভাগ দেখিতে নৌকার তলদেশের মত। তবেই বৈতাল দেউল অর্থে নৌকাকার দেউল। তেমনই বৈতাল কুমড়া অর্থে নৌকাকার কুমড়া করা যাইতে পারে।

আলস্য চিন্তা করিতে দেয় না। নতুবা ছাঁচি ও বিলাতী কুমড়ার মধ্যে বিস্তর বৈসাদৃশ্য দৃষ্ট হইত। দেশী ও বিলাতী কাপড়ের দেশী ও বিলাতী দিয়াশলাইর, দেশী ও বিলাতী বেগুনের মধ্যের প্রভেদ এক প্রকার নহে। অজ্ঞানের চক্ষু ও বিজ্ঞানের চক্ষু একই বস্তুকে ভিন্নভাবে দেখে। অজ্ঞানের চক্ষু বস্তুদ্বয়ের মধ্যে সাদৃশ্য দেখিয়া বেড়ায়, বিজ্ঞানের চক্ষু বৈসাদৃশ্য পরিমাণ করে। দুইটি রেখা দৈর্ঘ্যে সমান কি না, অজ্ঞান তাহাই বিচার করে; সেই দুই রেখা কতখানি অসমান, বিজ্ঞান তাহার অনুসন্ধান করে। সত্য নিরূপণের দুই পন্থা; সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নিরূপণ। অবলম্বিত পন্থার গুণে অজ্ঞানে ও বিজ্ঞানে প্রভেদ দাঁড়াইয়াছে। শিশু এক নামে বহু বস্তুর উল্লেখ করে, প্রৌঢ় জ্ঞানী আত্মা পরমাত্মা জীবাত্মার প্রভেদ করেন। সাদৃশ্য দেখা আপাততঃ সহজ মনে হয়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। সর্ব্বজ্ঞ হইলে দুইটি বস্তু এক বা সদৃশ কি না, বলিতে পারা যাইত।

পরস্পর সাদৃশ্য তুলনা করিলে দেখা যায়, লাউ কুমড়া শশা কাঁকুড় ফুটী তরমুজ উচ্ছে ঝিঙ্গে প্রভৃতির মধ্যে একটা জ্ঞাতিত্ব আছে। কেবল যে অঙ্গে উপাঙ্গে সাদৃশ্য, তাহা নহে। আমাদের শরীরের পক্ষে এই সকল লতার ফলের গুণ অল্পাধিক রেচকতা। এই রেচকতা গুণ বীজেই অধিক দেখা যায়। ইহাদের বীজে তৈলাংশ আছে। সেই তৈল বশতঃ রেচকতা, না বীজের অন্য কোন অংশ বশতঃ এই গুণ, তাহা নির্ণয় সাপেক্ষ।

অনেক বিষয়ই নির্ণয় সাপেক্ষ। কুমড়ার জীবনের কয়টা কথাই জানা আছে। চাল জুড়িয়া কুমড়া গাছ, তাই দেখি। সবুজ পাতার মাঝে মাঝে হলদে ফুলগুলি কুটীর পর্ণময় বলিয়া প্রাতঃকালে পরিচয় দেয়। কিন্তু এ দেশের লোকগুলা এই নয়নানন্দকর শোভা সন্দর্শন করিতে দেয় না। তাহাদের বিশ্বাস, কুমড়ার পাতা ছিঁড়িয়া পথে ছড়াইয়া দিলে কুমড়া অনেক ফলে। এ বিশ্বাসটা বিজ্ঞান সম্মত কি?

গাছের পাতার সহিত তাহার জীবনের,—বৃদ্ধির পুষ্টির ফলোৎপাদনের সম্বন্ধ কি? অবশ্য সবুজ পাতাই গাছগুলার রান্নাঘর। সেই খানেই সূর্য্যের আগুনে গাছগুলা চাউল ডাইল চিনি ঘি সমুদায় রাঁধিয়া থাকে। রাঁধা

শব্দটা ঠিক হইল না। চাউল দাইল পাইলে আমরা রাঁধি; গাছগুলা চাউল দাইলই তৈয়ারি করে। এই হিসাবে আমাদের অপেক্ষা গাছগুলার ক্ষমতা অধিক।

কিন্তু সবুজ নূতন পাতাগুলার এই ক্ষমতা; হলদে পাকা পাতাগুলার এই ক্ষমতা নাই। সে গুলা ছিঁড়িয়া ফেলিলে তাহাদের অন্ন সংস্থান আবশ্যক হয় না। মাটী হইতে যত রস উপরে উঠে, সবটুকু নূতন পাতার, নূতন ডগার, নূতন ফলের কাজে লাগে। ফলে, গাছটা বড় হইতে থাকে। ইহাতে আমাদের লাভ কি? লতাটা লম্বা হইলে পাতার সংখ্যা বৃদ্ধি, পাতার সংখ্যা অধিক হইলে ফুলের সংখ্যা, এবং ফুলের সংখ্যাধিক্যে ফলের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। ডাঁটা ও প্রত্যেক পাতার কোণে ফুল, এবং ৪টি বাঁঝা ফুলের পর প্রায়ই একটি ফলধারী ফুল। লতা লম্বা হইলে এই হিসাবে আমাদের লাভ বটে। কিন্তু লাভের পথ আরও একটি ছিল। গাছের প্রথম পাতাটি হইতেই যদি ফুল ধরিত, কিংবা বাঁঝা ফুলগুলা না হইয়া সকল ফুলই যদি ফলকর হইত! উত্তরটা কৃষি-সাপেক্ষ; উহা অসম্ভব নহে।

বাঁঝা ফুল! কথাটা শুনিতে কেমন কেমন লাগে। ফল হয় না, বন্ধ্যা বই আর কি? ফলটা কি? বীজাধার! বীজ কি? শিশু সন্তান বা ভ্রূণ। যে স্ত্রীর সন্তান না হয় সেই বন্ধ্যা।

কিন্তু পুরুষের ত ছেলে হয় না। পুরুষকে বন্ধ্য বলা যাইতে পারে কি? বাঁঝা পুরুষ আছে। তাহার অর্থ ভিন্ন। আমাদের দেশের লোকেরা বাঁঝা পুরুষ দেখে না, কেবল বাঁঝা স্ত্রী দেখে। ফলে, অনপত্য দোষ খণ্ডনের নিমিত্ত বাঁঝা পুরুষ স্ত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির হেতু পায়। পুরুষ বন্ধ্য, কিন্তু স্ত্রী অবন্ধ্যা—ইহাতেও সন্তান হয় না। পুরুষ ক্লীব হইলেই বাঁঝা হয় না। বাঁঝা হইবার অনেক কারণ আছে।

কিন্তু কুমড়ার বাঁঝা ফুল কি রকমে বাঁঝা? নেবু ধুতুরা প্রভৃতি অধিকাংশ গাছের প্রত্যেক ফুলে স্ত্রীত্ব ও পুংস্ত্ব উভয়ই থাকে। কাজেই প্রত্যেক ফুল হইতে ফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু কুমড়ার বাঁঝা ফুলে স্ত্রীর ভাগ থাকে না, কেবল পুরুষের ভাগ থাকে। বলা বাহুল্য, পরাগ কেশর গুলাই পুরুষ। কিন্তু কেশর থাকিলেই পুংস্ত্ব থাকে না। কেশরে পরাগ না থাকিলে পুংস্ত্ব থাকে না। কুমড়ায় বাঁঝা ফুলে পরাগপূর্ণ কেশর থাকে, অ-বাঁঝা বা ফলধারী ফুলে স্ত্রীত্ব থাকেই, কেশরও থাকে; কিন্তু কেশরে পরাগ থাকে না।

কুমড়ার ফুল তবে এক লিঙ্গ; হয় পুং, না হয় স্ত্রী। নেবু ফুল দ্বিলিঙ্গ; প্রত্যেক ফুল পুং ও স্ত্রী। কুমড়ার জ্ঞাতি তেলাকুঁচা এবিষয়ে আরও স্বতন্ত্র। কুমড়ার প্রতি গাছেই পুং ও স্ত্রী ফুল থাকে, তেলাকুঁচার কোন গাছে কেবল পুংফুল, কোন গাছে কেবল স্ত্রীফুল। কুমড়ার ফুল এক লিঙ্গ, গাছ দ্বিলিঙ্গ; তেলাকুঁচার ফুল এক লিঙ্গ, গাছও এক লিঙ্গ। পেঁপে গাছও এক লিঙ্গ, কোন গাছ কেবল পুং, কোন গাছ বা কেবল স্ত্রী। কিন্তু পেঁপের কোন্ বীজে পুং বৃক্ষ, কোন্ বীজে বা স্ত্রীবৃক্ষ জন্মিবে, তাহা বলিতে পারা যায় কি? এবিষয়টা দুরূহ, এখন এ আলোচনা থাক।

পাতার সংখ্যার সহিত গাছের সম্বন্ধ কি? ঋতুপর্ণরাজ নলের সারথ্যে বিদর্ভ নগরে যাইবার পথে গণিত বিদ্যায় তাঁহার ক্ষমতা দেখাইয়াছিলেন। এক ফলিত বিভীতক বৃক্ষ দেখিয়া বলিয়াছিলেন, এই বৃক্ষে পত্র ও ফল যত আছে, তদপেক্ষা এক শত এক অধিক পত্র এবং এক শত এক অধিক ফল বৃক্ষতলে পতিত রহিয়াছে এবং ইহার দুই শাখায় পঞ্চ কোটি পত্র ও দুই সহস্র পঞ্চ নবতি ফল আছে। নল শুনিয়া অবশ্য বৃক্ষটি ছেদন করিলেন, এবং গণিয়া দেখিলেন রাজার গণনা ঠিক! ঋতুপর্ণ রাজা উদ্ভিদ বিদ্যায় কি গণিতে পারদর্শী ছিলেন? রাজার নামটি স্মরণ করিলে তাঁহাকে উদ্ভিদ বেত্তা বলিয়া মনে হয়। সে যাহা হউক, পাতার পরিমাণের সহিত গাছের দৈর্ঘ্য বা ভারের কোন সম্বন্ধ আছে কি? কদলী পাতার পরিমাণ অধিক, কাণ্ড অল্প; মানের কচুর পাতার তুলনায় কাণ্ড অল্প। কিন্তু কুমড়ার? পাতার তুলনায় কাণ্ড অল্প। এইরূপ, যাবতীয় শাকের পাতা অধিক, কাণ্ড অল্প। বাবলা তেঁতুল প্রভৃতির পাতা ছোট, গাছের তুলনায় পাতার সংখ্যাও অল্প। দেখা যায়, শক্ত গাছের পাতা বড় প্রায় হয় না, গাছও শীঘ্র বড় হয় না। সাল সেগুণের পাতা বড়, কাঠও অল্প শক্ত নয়। কিন্তু গাছগুলা তেঁতুল গাছ অপেক্ষা শীঘ্র বড় হয়। মোটামুটি দেখা যায়, যে গাছগুলা শীঘ্র বড় হইয়া উঠে, সে গুলার

পাতা বড়, কিম্বা যে গুলার পাতা বড় সে গুলা তত শক্ত গাছ নহে। কুমড়ার পাতা বড়, জল পূর্ণ; ডাঁটাও বড়, জল পূর্ণ। ফলও জল পূর্ণ। এত জল যাহাকে চাই, তাহা গ্রীষ্মকালে জন্মিতে পারে না। বর্ষাকালই কুমড়ার দিন। রসা মাটিই কুমড়ার মাটি বলা যাইতে পারে।

কুমড়ার পাতাগুলা সব সমান হইয়া যেন রোদ পোহাইতে বসে। পাতার বোঁটা যে দিকেই বাহির হউক, উহা বাঁকিয়া এমন উঠে যে সমুদয় পাতাটা আকাশের দিকে বিস্তৃত থাকিতে পারে। তাই ঘরের চাল পাইলে কুমড়া গাছের যেন আনন্দ হয়। শুধু তাই নয়, পাতাগুলা যাহাতে বেশ রোদ পাইতে পারে, এজন্য কুমড়া লতার বিতান বা কর্ষণী আছে।

গাছের পাতাগুলা উপরদিকে থাকে, যেন সকলে রোদ পোহাইতে বসে! উদ্ভিদ জীবনে পাতার রোদ পোহান অতীব আবশ্যক। জীবন অর্থে শক্তির ক্ষয়। আমার শরীরে যে শক্তি আছে, তদ্দ্বারা ফুস্‌ফুস্, হৃৎপিণ্ড, পাকাশয় প্রভৃতির গতি ও ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে। দেহের তাপ, হস্তপদাদির সঞ্চালনের মূলে সেই শক্তি। এই শক্তির মূল আবার ভুক্ত অন্নাদি। তবে, অন্নাদিতে যে শক্তি ছিল, তাহাই আমি ব্যয় করিতেছি। প্রকৃতির কঠোর নিয়মে কেহ কোন যন্ত্র দ্বারা শক্তি সৃষ্টি করিতে পারে না, যাহা আছে, তাহারই ব্যয় করিতে পারে। গাছের জীবন এরূপ নহে। উহা প্রস্তুত অন্ন ভোজন না করিয়া স্বয়ং অন্ন প্রস্তুত করে, পরে সেই অন্ন ভোজন করে। সুতরাং উহা অন্ন হইতে আমাদের মত শক্তি পায় না। অথচ শক্তি ভিন্ন জীবিত থাকিতে পারে না। সেই শক্তি সূর্য্যের রোদ হইতে পায়। রৌদ্রের কতখানি তাপ, কতখানি আলোক তাহা ভাগ করা এখন আবশ্যক নাই। ফলে রৌদ্রই গাছের জীবনী শক্তির মূল।

তা যেন হলো, রোদ যেন গাছকে চাই, তা বলিয়া পাতাগুলা উপর দিকে থাকিবে কেন? ডাঁটার গায়ে পাতার বোঁটাগুলা উপর দিকে না বাঁকিলে পাতাগুলা উপর দিকে থাকিতে পারে না। কিসে বোঁটাগুলাকে উপর দিকে বাঁকায়? বোঁটা বাঁকাইবার কারণও সূর্য্য। বোঁটার যে পাশটা সূর্য্যের দিকে থাকে, সে পাশটা তত বাড়ে না, বিপরীত পাশটা তদপেক্ষা বেশী বাড়ে। ফলে বোঁটাটি উপর দিকে বাঁকিয়া উঠে। সকল পাতারই এই নিয়ম। যে গাছগুলার ডাল পাশের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, সে গুলারও বোঁটা এমন বাঁকে যে, পাতাগুলার উপরটা আকাশের দিকে থাকে। কুঁদ গাছের জোড়া জোড়া পাতা হয়। ডাল কিন্তু পাশে বা নীচের দিকে হেলিয়া পড়ে। বোঁটাগুলাও তেমনই পাক খাইয়া পাতাগুলাকে উপর দিকে মেলিয়া রাখে।

অন্যের আশ্রয় না পাইলে দুর্ব্বল বাচে না, কর্ষণীগুলা গাছের যেন হাত; কোন কিছু শক্ত জিনিস ধরিয়া তাহাতে ভর দিয়া দাঁড়াইতে গাছের হাত। প্রথমে কর্ষণী লম্বা ও সোজা থাকে, কিন্তু উহার কোন জায়গায় খড় কুটা ঠেকিলে সেইখানটা বাঁকিয়া সেটাকে ধরিতে চেষ্টা করে। তখন মনে হয় যেন কর্ষণীর কোন প্রকার চৈতন্য আছে। এইরূপ, অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর কোন কোন কাজ দেখিলে তাহাদের চৈতন্যের কাজ মনে হয়। অথচ দেখা গিয়াছে, সেগুলা চৈতন্যের কাজ নহে। কোন কোন জীব আলোর দিকে চলিতে থাকে। আলো নির্ব্বাচন কিন্তু চৈতন্যের কাজ নহে। বিষয়টি দুরূহ, এখন থাক।

কুমড়ার ডগাটা উপর দিকে থাকে, কিন্তু সবটা থাকে না। শেষের খানিকটা নীচের দিকে থাকে, তার পরের অংশটা উপর দিকে থাকে। কেন এরূপ থাকে? আলোর গুণে, না পৃথিবীর আকর্ষণে? বর্দ্ধিষ্ণু লতার প্রতি উভয়েরই ক্রিয়া আছে। কিন্তু যাহারই ক্রিয়া হউক, এমন পাশে পাশে দুইটি অংশের প্রতি ঠিক বিপরীত ক্রিয়া সহজে বুঝিতে পারা যায় না।

গাছের মূল সব নীচের দিকে যায় যেন মাটিতে প্রবেশ করিতে চায়। সকল গাছেরই মূল নীচের দিকে মাটির ভিতরে যাইতে চায়, কাণ্ড উপর দিকে উঠে। অবশ্য কোন কারণ থাকিবে। একটা কারণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ। এই শক্তি মূলকে অধিক টানে, ডগাকে তত নয়। ফলে মূলগুলা মাটিতে প্রবেশ করে। কিন্তু শিকড়ের ও ডগার এমন প্রভেদ ঘটে কেন?

বীজটা কতটুকু! ঐ লম্বা চালজোড়া গাছের তুলনায় কতটুকু! সেই ছোট বীজটাই বাহিরের জিনিস ভিতরে পুরিয়া বড় হইয়াছে। আশ্চর্য্যের কথা বটে। কিন্তু আরও আশ্চর্য্য আছে। থলিতে খোলা পুরিলে খোলা টাকা হয় না। খোলার বদলে অন্য কিছু পুরিলে সেগুলাও টাকা হয় না। থলির ভিতরে টাকা না দিলে টাকা পাওয়া যায় না। কিন্তু গাছটা মাটির রস ও বাহিরের বায়ু ভিতরে টানিয়া নিজের শরীরের উপাদান গড়িতেছে। কোথায় মাটি জল বায়ু, আর কোথায় পাতা ডাঁটা ফুল ফল বীজ! আবার, যেখানে যেমনটি হইয়া থাকে, সেখানে ঠিক তেমনটি। ফলের জায়গায় ভুলিয়া মূল হয় না, কিংবা নিজের পাতার বদলে উচ্ছে পাতা হয় না। এ সকলের কারণ কি?

কয়টা কারণ জানা গিয়াছে? পাতার রঙ্গ সবুজ, ফুলের রঙ্গ হল্‌দে। ফলের রঙ্গ প্রথমে সবুজ, ক্রমশঃ হল্‌দে, শেষে মেটে। পাতাতেই বা কেন সবুজ রঙ্গটা, ফুলেতেই বা কেন হল্‌দে রঙ্গ? লাল নীল বেগুনে হল্‌দে শাদা প্রভৃতি সকল রকম রঙ্গের ফুল দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কাল রঙ্গের ফুল কই, কিংবা সবুজ রঙ্গের ফুল কই?

কুমড়া পাতায় শক্ত শক্ত লোম আছে। লাউ ও কুমড়া শাকে কত প্রভেদ। লাউশাকেও লোম আছে, লোমগুলা তুলর মত কোমল, কুমড়া শাকের লোমগুলা কঠিন। এপ্রকার পার্থক্যের উদ্দেশ্য কি? গরু বাছুর হইতে আত্মরক্ষা করা উদ্দেশ্য কি? তাহা হইলে লাউশাক লোম সত্বেও অস্ত্রহীন, কুমড়াশাক তদপেক্ষা কিছু ভাল।

শৈশবাবস্থায় কেহই আত্মরক্ষায় সমর্থ নহে। শাবক অবস্থায় মৃত্যুসংখ্যা অধিক। অত্যল্প শিশু যুবক হইতে থাকে। তাই কুমড়ার বীজ এত অধিক। দশটা মরিলেও আর দশটা বাচিবে। এই আশা।

তা যেন হলো, কিন্তু ফলের ভিতরে বীজগুলা থাকে, কুমড়া পাকিয়া মাটিতে পড়ে। সেখানে ফলের খোলাটা পচিয়া যায়, বীজগুলা মাটি দেখিতে পায়। কিন্তু বীজগুলা একই জায়গায় পুঞ্জীকৃত হইয়া থাকে। ইহাতে লাভ কি? আমরা না কি বড় গৃহপ্রিয়; যেখানে জন্মি পুরুষানুক্রমে সেইখানেই ঘরকন্না করি, পরিজন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্যত্র গিয়া বাস করিতে চাই না। ফলে এই হয় যে, এক হাত ভূপৃষ্ঠের নিমিত্ত মামলা মোকদ্দমা মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরি। কুমড়া চারাগুলারও সেই দশা হয়। যেটি তেজি সেইটাই অপর সকলকে হারাইয়া নিজে বড় হইতে থাকে, শেষে নিজের তেজী সন্তান রাখিয়া ইহধাম ত্যাগ করে। তবে ইহাদের মধ্যে ভ্রাতৃপ্রণয় নাই। কাহারই বা আছে? মুখে বলি মানুষমাত্রেই ভাই ভাই। কিন্তু কাজে? মানুষের তুল্য হিংস্র শত্রু মানুষের আর নাই।

কুমড়া অপেক্ষা শিমুল ফুল দূরদর্শী। ফল পাকিলে ফাটিয়া গাছেই থাকে, আর বীজগুলা লোম (তুল) রূপ পাখা দ্বারা বাতাসে উড়িয়া দেশ দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়ে। ফলে ভাইতে ভাইতে ঝগড়া করিতে হয় না। এইরূপ, আরও অনেক ফলের দেখা যায়। যাহাদের সন্তান নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়ে, তাহাদের সবংশে ধ্বংস হবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু তৎসঙ্গে আত্ম রক্ষার উপযুক্ত গুণ থাকা চাই। দুর্ব্বল জীবের একত্র বাস করাই শ্রেয়ঃ; সবলের পক্ষে কোন নিয়ম নাই। ইতি

শ্রীযোগেশ চন্দ্র রায়।

বায়ুনভো-বিদ্যা।

প্রকৃতির ছোট বড় নানা কার্য্যের মধ্যে বায়ু ও আকাশের উচ্ছৃঙ্খল পরিবর্ত্তন, আমাদের দৈনন্দিন সুখ দুঃখের সহিত যেরূপ সম্বন্ধ, বোধ হয় অপর কোন প্রাকৃতিক ব্যাপারই তদ্রূপ নয়। কিন্তু চিরনিয়মিত বিশ্বের কার্য্যের এই বিশৃঙ্খলতার কারণ কি? দুই বৎসর পূর্ব্বে বর্ষাকালে, ভারতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়াছিল, পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে দুইবার পূর্ণাবর্ত্তন করিয়া, আজ আবার কক্ষার (Orbit) ঠিক সেই স্থানে উপস্থিত,—তবে কেন এ বৎসর প্রচুর বর্ষণাভাবে লোকে দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা দেখিতেছে? শারদীয়া পঞ্চমী তিথি আসৃষ্টি নীরবে ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিতেছে, গ্রহ নক্ষত্র পর্ব্বত সাগরাদির অবস্থানের ত কোন বৈলক্ষণ্য হয় নাই,—তবে কেন সেই স্মরণীয় শারদীয়া পঞ্চমীতে প্রলয় সহচর ঝঞ্ঝাবাতের ভীম হুহুঙ্কারে বঙ্গদেশ স্তম্ভিত হইয়াছিল? কিছুকাল পূর্ব্বে বিজ্ঞানবিদ্‌গণ এই সকল সরল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেন না। এই সকল স্বাভাবিক উচ্ছৃঙ্খলতার কোন নিয়মই আবিষ্কার করিতে না পারিয়া, এই সকল ঘটনা রহস্যময়ী বিরাট প্রকৃতির কোন একটা অতি গূঢ় অসংযত শক্তির বিকাশ বলিয়া প্রাচীন পণ্ডিতগণ নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু আধুনিক দার্শনিকগণ, মানব সুখ দুঃখের মূলীভূত

এই প্রত্যক্ষ ঘটনাগুলিকে প্রাচীনদের ন্যায় চাপা দিয়া রাখিতে পারেন নাই এবং আধুনিক উন্নত বিজ্ঞান সাহায্যে জাগতিক কার্য্যমাত্রেরই মূলে এক একটা শৃঙ্খলা দেখিয়া, বায়ুনভো ব্যাপারের ন্যায় একটা বৃহৎ ঘটনায়, যে সেই বহু পরীক্ষিত নিয়মের ব্যভিচার হইবে এ কথাও তাঁহারা সহজে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তাই আজ কয়েক বৎসর হইতে নানা দেশীয় পণ্ডিতগণ জগতের সর্ব্বাংশের প্রাকৃতিক উৎপাতের তালিকা সংগ্রহ করিয়া, তৎসাহায্যে সেগুলির সংঘটনকাল ও কারণাদি আবিষ্কার করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন এবং অল্পকাল মধ্যে এতদ্‌সম্বন্ধীয় কয়েকটী জ্ঞাতব্য তথ্য আবিষ্কার করিয়া আমাদের জ্ঞানের প্রসার অনেকটা বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বায়ুনভো-বিদ্যার (meteorology) বোধ হয় অদ্যাপি শৈশবকাল উত্তীর্ণ হয় নাই কিন্তু গত চল্লিশ বা পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে দার্শনিকগণ কঠোর অধ্যবসায়-সাপেক্ষ নানা পরীক্ষাদি দ্বারা, কিশোর বিদ্যাকে যে প্রকার স্ফূর্ত্তিসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে আশা করা যায় তাঁহারা শীঘ্রই এটীকে একটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শাস্ত্র করিয়া গড়িতে পারিবেন।

অতি প্রাচীনকাল হইতে সকল দেশের লোকেরই একটা বিশ্বাস আছে,—মনোজগৎ ও ভৌতিকজগৎ উভয়েই কুহকী চন্দ্রের একটা গূঢ় প্রভাব নিয়তই কার্য্য করিতেছে। নির্ম্মল শারদীয়া রজনীতে পূর্ণচন্দ্রের আবির্ভাবে বাতব্যাধি ক্লিষ্টের বেদনা বৃদ্ধি এবং কান্তাবিরহিত দুর্ভাগার বিরহব্যথার উপচয় কেন হয়, তাহার মীমাংসা করা অক্ষম লেখকের ক্ষমতা বহির্ভূত—এখন জড়জগতে চন্দ্রের প্রভাব কতদূর দেখা যাউক! পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় জানেন আমাদের মধ্যে একটা লৌকিক বিশ্বাস প্রচলিত আছে,—অমাবস্যা বা পূর্ণিমার নিকটবর্ত্তী তিথিতে আকাশে মেঘের সঞ্চার বা বারিপাত আরম্ভ হইলে, শীঘ্র আকাশ নির্ম্মল হওয়ার আশা থাকে না, এবং এইজন্য কৃষিজীবিগণের লৌকিক আচারে তৎকালে হলচালন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বায়ুনভোবিদ্‌গণ সর্ব্বদেশবিখ্যাত এই জনপ্রবাদটীর সত্যতা জানিবার জন্য অনেক পরিদর্শনাদি করিয়াছিলেন—এবং শেষে এটী যে কেবল অন্ধবিশ্বাসমূলক ভ্রান্তসংস্কার নয়, তাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইঁহারা বলেন,—চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে আকাশের অবস্থা পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কথাটি যদিও সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার বিরুদ্ধে অনেক বাধা দেখা যায় বটে,—কিন্তু স্থানীয় জলবায়ুর উপর শশধরের যে একটা মহান্ প্রভাব সময়ে সময়ে দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা অস্বীকার করিবার আর উপায় নাই। ইঁহাদের মতে, চন্দ্রদেব যে সময় রবিমার্গে (Ecliptic) অবস্থিত থাকেন, আকাশস্থ ভাসমানজলীয় বাষ্পের উপর চান্দ্র-প্রভাব কেবল সেই সময়েই স্পষ্ট লক্ষিত হয়,—সূর্য্য ও পৃথিবীর সহিত চন্দ্রের অবস্থানভেদই এই প্রভাবের হ্রাস বৃদ্ধির কারণ। ক্রান্তিপাতসময় (Equinox) চান্দ্র-প্রভাব বৃদ্ধির আর একটা প্রকৃষ্ট-কাল, এই সময়ে চন্দ্রদেব রবিমার্গস্থ হইলেই, আকাশের অবস্থা পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। জোয়ার-ভাঁটা উৎপাদন প্রসঙ্গে চন্দ্রের অতুলনীয় শক্তির কথা মনে করিলে,—বায়ুরাশি ও তৎসংলগ্ন অতি ক্ষুদ্র জলকণা ও জলীয় বাষ্পের উপর যে ইহার প্রভাব আরও সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! জলবায়ুহীন ও প্রাণীচিহ্ন রহিত চন্দ্রদেব বহুদিন মৃত হইয়াও,—লক্ষক্রোশ ব্যবহিত স্থান হইতে ধরাপৃষ্ঠস্থ সজীব ও নির্জীব পদার্থের উপর অপ্রতিহততেজে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতেছেন।

গ্রহরাজ সূর্য্য পার্থিব শক্তি মাত্রেরই মূলাধার,—জগতের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্য্যই সেই সূর্য্য প্রসূত রূপান্তরিত শক্তির দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। বায়ুনভোদিগ্‌গণ পরিদর্শন করিয়া স্থির করিয়াছেন,—বায়ু আকাশের পরিবর্ত্তনেও সেই বৈচিত্রসাধক একটা সৌরশক্তি বর্ত্তমান। এখন পাঠকপাঠিকাগণ প্রশ্ন করিতে পারেন,—জগৎ-সবিতা সূর্য্যদেব ত চির উজ্জ্বল, তাঁহার কিরণ অজস্রধারে অমিত তেজে ধরাভিমুখে প্রতিদিনইত পতিত হইতেছে,—তবে কেন সেই একই শক্তি একবার সমুদ্র শোষণ করিয়া মেঘোৎপত্তি ও বারিপাত করাইতেছে, আবার পর বৎসর ঠিক সেই সময়েই প্রচণ্ড তাপাকার ধারণ করিয়া ধরাতল দগ্ধীভূত করিতেছে? এতদুত্তরে বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলেন,—আমরা স্থূলদৃষ্টিতে, সূর্য্য চিরদিনই সমতেজে কিরণ বর্ষণ করিতেছেন বলিয়া যে মনে করি, তাহা ভুল। পরীক্ষা করিলে, সূর্য্যমণ্ডল হইতে দুই জাতীয় তেজঃ রশ্মির বহির্গমন স্পষ্ট অনুভূত হয়। এই তেজঃরশ্মিদ্বয় আলোক রশ্মির সহিত সর্ব্বদাই ধরাপতিত হইতেছে,—কিন্তু এই বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত তেজঃদ্বয়ের পরিমাণ সকল সময় সৌর কিরণে সমভাবে বর্ত্তমান থাকে না বলিয়া,

যত বিপত্তি। অমিততেজা অপারশক্তিমান্ সবিতাদেবের কিরণ বর্ষণের এই হ্রাস বৃদ্ধির কথা, প্রথম শুনিলে যেন অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু একটী দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা সৌরমণ্ডল পরীক্ষা করিলে পূর্ব্বোক্ত উক্তির সত্যতা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতে পারে। জ্যোতিষ্ক পরিদর্শনোপযোগী যন্ত্র সাহায্যে সৌরগোলক পরিদর্শন করিলে গোলকপৃষ্ঠে কতকগুলি কৃষ্ণ চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে; চিহ্নগুলি সৌরাম্বরের কোনও এক নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিককাল অধিকার করিয়া থাকে না, এবং ইহাদের সংখ্যাও কোন সময়ে নির্দ্দিষ্ট দেখা যায় না। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ এই সৌর কলঙ্কের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বলেন, কোনও অজ্ঞাত কারণে সময়ে সময়ে সৌরাকাশে মহাঝটিকাবর্ত্ত উপস্থিত হইয়া, সূর্য্যের জ্যোতির্ম্ময় বাষ্পাবরণ স্থানে স্থানে উন্মুক্ত করিয়া ফেলে, এবং সেই উন্মুক্ত স্থানই আমাদের নিকট কৃষ্ণ চিহ্ন বা সৌর কলঙ্করূপে প্রতিভাত হইয়া পড়ে। প্রতি একাদশ বর্ষান্তে সৌরমণ্ডলে কলঙ্কাধিক্য লক্ষিত হইয়া থাকে—নিষ্কলঙ্ক প্রভাকরকে কয়েক মাসের জন্য কলঙ্কিত করিয়া সেগুলি আবার আপনিই অন্তর্হিত হইয়া যায়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে,—সূর্য্যমণ্ডলে অধিক কৃষ্ণচিহ্ন উদয় হইলেই, পূর্ব্বোক্ত তেজোরশ্মিদ্বয়ের মধ্যে কেবল এক জাতীয় রশ্মি সৌরালোকের সহিত ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হইয়া কতকগুলি প্রাকৃতিক উৎপাতের সূচনা করে,—তা'র পর সৌরকলঙ্ক অদৃশ্য হইতে আরম্ভ করিলে, বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত অপর রশ্মিগুলির প্রাচুর্য্য নিবন্ধন পৃথিবী শান্তভাব ধারণ করে।

সৌরকর দ্বারা সাধারণতঃ কি প্রকারে মেঘ ও বায়ু প্রবাহের উৎপত্তি হয়, পাঠকপাঠিকাগণ তাহা অবশ্যই অবগত আছেন। স্থূল ব্যাপারটী এই যে, বিষুব প্রদেশস্থ সমুদ্র-বলয়ে সূর্য্যের তাপ-রশ্মি লম্বভাবে পতিত হয় বলিয়া তথা হইতে প্রভূত বাষ্প উৎপন্ন হইয়া থাকে। তা'র পর এই বাষ্পরাশি উত্তপ্ত ও লঘু বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া ঊর্দ্ধোত্থিত হইতে আরম্ভ করিলে, দক্ষিণ ও উত্তর প্রদেশস্থ শীতল বায়ুরাশি আসিয়া শূন্যস্থান অধিকার করিবার চেষ্টা করায়,—স্থানীয় বায়ুরাশির এই উর্দ্ধোত্থান ও মেরুপ্রদেশাগত বায়ুর শূন্যস্থান পূরণ প্রয়াসজনিত, বিষুবপ্রদেশে দুইটী বৃহৎ বায়ু প্রবাহ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে। উল্লিখিত ঊর্দ্ধোত্থিত বায়ু ও বাষ্পরাশি ইহার পর আর পূর্ব্বাধিকৃত স্থানে নামিবার অবসর পায় না, প্রায় তিন হাজার ফিট্ ঊর্দ্ধে এক সমঘন বায়ুস্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, তথায় এক প্রকার সাম্যাবস্থায় থাকিয়া যায়। এখন মনে হইতে পারে, উর্দ্ধোত্থিত বাষ্পপূর্ণ বায়ুরাশি ঊর্দ্ধতম শীতল প্রদেশে উপস্থিত হইলেই, তন্নিহিত বাষ্পরাশি মেঘাকার পরিগ্রহ করিয়া, বিষুবপ্রদেশের উপরিভাগে নিশ্চয়ই এক মেঘবলয় রচনা করিয়া অবস্থিত হইবে। কথাটা ঠিক্ বটে—অপর কোনও প্রতিবন্ধক না থাকিলে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মেঘের উৎপত্তি হইয়া, বিষুব প্রদেশ নিশ্চয়ই এক জলকণাময় চন্দ্রাতপ দ্বারা নিয়তই সমাচ্ছন্ন থাকিত,—কিন্তু একটা বাধা আসিয়া অনুমিত কার্য্যসিদ্ধির অন্তরায় হয়। জলকণা সকল আকাশের ঊর্দ্ধাংশে উপনীত হইলেই পরস্পর বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া বিসদৃশ চৌম্বক মেরুর বিপ্রকর্ষণের ন্যায় তাহার কতক বাষ্প অবশিষ্টাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার চেষ্টা করিতে থাকে,—ইহার ফলে বিষুবপ্রদেশের উপরে আর জলকণা সঞ্চিত থাকিতে পারে না, তন্মধ্যে কতকগুলি উত্তরাভিমুখী এবং কতক দক্ষিণাস্য হইয়া মেরুদেশাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করে। বিষুবাকাশ-সঞ্চিত জলকণা রাশির, এই প্রকারে দুইটী প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া পড়ে।

কলঙ্কাধিক্যকালে সূর্য্যমণ্ডল হইতে যে বিশেষ তেজঃ রশ্মি বর্ষিত হয়, তাহার একটা প্রধান ধর্ম্ম এই যে, ইহারা আকাশে ভাসমান জলকণার ব্যবধান ভেদ করিয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে পারে না,—এজন্য যে সকল মেঘ পূর্ব্বে অপর রশ্মির অবাধ বহির্গমন জনিত আমাদের দৃষ্টিগোচর হইত না, কলঙ্ক প্রাচুর্য্যকালে আমরা তাহাদিগকেই অস্বচ্ছাবস্থায় আকাশ পরিব্যাপ্ত করিতে দেখিয়া থাকি। এই প্রকারে পূর্ব্বোক্ত উত্তর ও দক্ষিণদিগ্‌গামী বাষ্পপ্রবাহ দ্বারা মেরু প্রদেশে মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে এবং তৎপ্রদেশে প্রচুর বৃষ্টি পতিত হয়। কিন্তু এই বর্ষণ সকল সময়ে একই অক্ষাংশস্থ প্রদেশ বিশেষে আবদ্ধ থাকে না,—উর্দ্ধাকাশের বায়ুস্তর সকলের চাপের পার্থক্য অধিক হইলে উল্লিখিত মেঘপ্রবাহের গতি অত্যন্ত দ্রুত হইতে দেখা যায়, কাজেই সেস্থলে মেরুসন্নিহিত স্থানে অধিক বর্ষণ হইয়া পড়ে, কিন্তু উক্ত চাপের বৈষম্য অল্প হইলেই প্রবাহের মন্থরগমনজনিত বিষুব প্রদেশের নিকটবর্ত্তী উত্তর ও দক্ষিণপ্রদেশেই বারিপাত হয়। সুতরাং

দেখা যাইতেছে, বায়ুপ্রবাহের উৎপত্তি ও বর্ষণাদি ব্যাপার বায়ুচাপদ্বারাও কতকটা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

এখন দেখা যাউক, এই চাপ বৈষম্যের কারণ কি। পাঠকপাঠিকাগণ অবশ্যই দেখিয়াছেন চুম্বকশলাকা কোন প্রকার বাধা প্রাপ্ত না হইলে, সাধারণতঃ উত্তরদক্ষিণাভিমুখী হইয়া অবস্থান করে—কিন্তু খুব সূক্ষ্ম যন্ত্রদ্বারা নানা সময়ে চুম্বকশলাকার অবস্থান পরীক্ষা করিলে, ইহার দিক্ অপরিবর্ত্তনীয় দেখা যায় না। সময় সময়, এমন কি একই দিনের সময় বিশেষে চুম্বকশলাকার দিক্ অল্লাধিক পরিমাণে উত্তর-দক্ষিণ চ্যুত হইতে দেখা গিয়া থাকে। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ পরিদর্শন দ্বারা স্থির করিয়াছেন—চুম্বকশলাকা পূর্ব্বোক্তপ্রকারে বিচলিত হইলেই বায়ুচাপের বৈষম্য আসিয়া উপস্থিত হয়! প্রাচীন পণ্ডিতগণ চৌম্বকশক্তির এই উচ্ছৃঙ্খলতার সহিত পরিচিত থাকিয়াও, ইহার প্রকৃত কারণ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ সূক্ষ্মপরিদর্শন দ্বারা স্থির করিয়াছেন,—সূর্য্যমণ্ডলের অগ্নিময় বাষ্পাকাশে কোন এক অজ্ঞাত শক্তির দ্বারা প্রবল ঝটিকাবর্ত্ত উপস্থিত হইয়া অধিক কলঙ্ক চিহ্নের বিকাশ করিলেই,—সমগ্র সৌরজগৎ এক নূতন শক্তিতরঙ্গে প্লাবিত হইয়া যায়। এই অভিনব শক্তি, সাধারণ সৌরশক্তির ন্যায় সুনিয়ন্ত্রিত ও শান্ত নয়,—মঙ্গল ও শুক্রাদি গ্রহগণ তাহার প্রভাবে হটাৎ দীপ্তিশালী হইয়া জগতকে স্তম্ভিত করে, এবং পৃথিবীর চৌম্বক ও তাড়িৎ শক্তি অকস্মাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া সুনিয়ন্ত্রিত প্রকৃতির রাজ্যে একটা অকল্যাণকর অরাজকতার সূচনা করে। কাযেই দেখা যাইতেছে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈবী উৎপাত, সৌরউত্তেজনা জাত বিপর্য্যস্ত চৌম্বকশক্তিদ্বারাই সংঘটিত হয় বলিয়া—এ সকল ঘটনার মূলে যে সেই বিকৃত সৌরশক্তি বর্ত্তমান তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

অনিয়মিত প্রবল ঝটিকা ও আকস্মিক ঘূর্ণাবর্ত্তের উৎপত্তি তত্ত্বও স্থিরীকৃত হইয়াছে। বায়ুমণ্ডলবিদ্ পণ্ডিতগণ বহু পরিদর্শনাদি করিয়া দেখিয়াছেন,—এই জাতীয় প্রাকৃতিক উৎপাতগুলিও ঠিক্ সূর্য্যের কলঙ্কাধিক্যকালে অধিক পরিমাণে সংঘটিত হয়, এবং ঘূর্ণাবর্ত্তের কিছু পূর্ব্বে স্থানীয় বৈদ্যুতিক শক্তিও অকস্মাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে এই সকল দেখিয়া ইঁহারা বলেন—ঝটিকাদি কত বিভ্রাটও সেই উচ্ছৃঙ্খল সৌরশক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্থানীয় চৌম্বকশক্তির সহিত ঘূর্ণাবর্ত্তের ব্যাস ও গতির ঐক্য এই মতবাদপোষক একটা প্রধান যুক্তি।

কলঙ্কপ্রাচুর্য্যকালের চৌম্বকবিভ্রাটের সহিত বায়ু ও আকাশের এই ঘনিষ্ঠতার ব্যাপার এখন আর অনুমানমূলক নয়। এতদ্‌সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা ও পরিদর্শনাদি করিয়া বিখ্যাত পণ্ডিতগণ এই অনুমানের সত্যতা অন্যান্যরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এক কলঙ্কাধিক্যকাল হইতে পরবর্ত্তী কলঙ্কপ্রাচুর্য্যকালের ব্যবধান, কয়েকটী সমানভাবে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক কাল বিভাগে কি পরিমাণ সৌরকলঙ্ক থাকিতে পারে, এবং তদ্দ্বারা আকাশের তৎকালিক অবস্থাই বা কি হইতে পারে, দার্শনিকগণ আজকাল বহু অনেক পূর্ব্বে হইতে গণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং ঘটনার তুলনায় অতীত গণনার ফল প্রায় সকল স্থলেই অভ্রান্ত দেখা যাইতেছে। ভারত-গবর্ণমেণ্টও আমাদের কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের মঙ্গলার্থে কয়েকজন পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া, যাহাতে আকাশের ভবিষ্যাবস্থা, উল্লিখিত পদ্ধতি ক্রমে পূর্ব্বেই স্থিরীকৃত হইয়া সাধারণে প্রচারিত হয় তাহার সুব্যবস্থা রাখিয়াছেন।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

দৈববাণী।

(গল্প)

১

উপেন্দ্রনাথ দেখিয়া শুনিয়া বিভাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন; কিন্তু বিবাহের রাত্রে নূতন করিয়া শুভ দৃষ্টির সময়ে বিধাতার মনে কি ছিল বলা যায় না, এই নব দম্পতির হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি প্রেমের অভাব না থাকিলেও তাহাদের মিলন নিরবচ্ছিন্ন সুখময় হয় নাই।

বিভাবতী পল্লী-গ্রামের গৃহস্থের মেয়ে, কেমন করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে হয় তাহা সে জানিত, কেমন করিয়া সংসারের সকল কাজ শৃঙ্খলাক্রমে সম্পন্ন করিতে হয় বাল্যকাল হইতে তাহাও সে শিখিয়াছিল। কিন্তু একটি বিষয়ে উপেন্দ্রনাথের চক্ষে তাহার শিক্ষার বিশেষ অভাব লক্ষিত হইত। মুখে সে প্রেম প্রকাশ করিতে জানিত না, এবং উপেন্দ্রনাথ সেই অভাবটি অত্যন্ত কঠিনভাবে অনুভব করিতেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত শিক্ষিত যুবক। সেক্ষপিয়র হইতে বঙ্কিমচন্দ্র পর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠ কবি ও উপন্যাসিকগণের স্ত্রীচরিত্র তাঁহার হৃদয়ের উপর এমন একটা মোহ বিস্তার করিয়াছিল যে, স্ত্রীর হৃদয়ের সুগভীর নীরবপ্রেম তিনি কখন আপনার হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতেন না। তিনি ভাবিতেন যে প্রেমে আবেগ নাই, চঞ্চলতা নাই, যে প্রেম উন্মাদনাবর্জ্জিত, যাহা সুমধুর রূপের উপর সুকোমল কান্তির ন্যায় সহজে অনুভব যোগ্য নহে, তাহা নিতান্তই নিরর্থক, কে জানে তাহার অস্তিত্ব আছে কি না! তাই উপেন্দ্রনাথ সঙ্কল্প করিলেন, তিনিও বাক্যে কোন প্রেম লক্ষণ প্রকাশ করিবেন না, হৃদয়ের প্রেম হৃদয়ে আবদ্ধ রাখিয়া বাহিক উপেক্ষা দ্বারা পত্নীর নীরবতার প্রতিদান করিবেন।

কিন্তু তথাপি যেন একটা নিরাশার অন্ধকারে উভয়ের অন্তর আচ্ছন্ন। বিভাবতী প্রাণপণে স্বামীর সেবা করিত; বাড়ীতে ঝি ছিল, কিন্তু স্বামীর জন্য স্নানের জলটুকু সে নিজে রাখিত, তেলটুকু, তোয়ালেখানা, সাবানটি নিজের হাতে গোছাইয়া না দিলে তাহার মনঃপুত হইত না, স্বামীর জন্য অতি যত্নে স্বহস্তে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিত এবং স্বামীর আহারের পর তাঁহার পাতে প্রসাদ পাইত। বিভাবতী মনে করিত এইরূপে পতিসেবা করাই প্রকৃত সতীধর্ম্ম। কিন্তু তাহার অন্য ক্রটির জন্য সত্যই তাহার কোন দোষ দেওয়া যায় না, কারণ অন্য প্রকারে পতির মনে যে আনন্দ সঞ্চার করা যাইতে পারে তাহা তাহার জানা ছিল না। তাহাদের ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের যে অর্দ্ধ-শিক্ষিত সমাজে সে প্রতিপালিত হইয়াছিল, সেখানে অত শত তাহারা জানিত না।

এমন সমাজে প্রতিপালিত হইয়া বিভাবতীর যে সকল ত্রুটা ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল তাহা উপেন্দ্রনাথের সতর্কতাতেই ঘটিতে পারে নাই, কিন্তু উপেন্দ্রনাথ পত্নীর নিকট যতখানি কাব্যময় ভাবের প্রত্যাশা করিতেন তাহা তিনি লাভ করিতে পারেন নাই, তাহার কারণ যে সমাজের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন সে সমাজের রমণী সম্প্রদায়ের সহিত বিভাবতীর কখন সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত হয় নাই। উপেন্দ্রনাথ এজন্য স্ত্রীকে শুনাইয়া অনেক সময় আক্ষেপ করিতেন। বিভাবতী ভাবিত, "কেন আমি উঁহার যোগ্য হইলাম না, এমন দেবতার মত স্বামী পাইলামত তাঁহাকে সুখী করিবার ক্ষমতা পাইলাম না কেন?" বিভাবতী নীরবে অশ্রুপাত করিত। উপেন্দ্রনাথ ভাবিতেন—"কি বিপদেই পড়িয়াছি, শুধু রূপ দেখিয়া কেন ভুলিয়াছিলাম, মোহে ভুলিয়া এমন অযোগ্য স্ত্রী বিবাহ করিয়া কি কুকর্ম্মই করিয়াছি! কেবল, অভিমান আর অশ্রু, জীবনের ভার ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠিতেছে।"—তথাপি দিন পড়িয়া রহিল না।

---

(২)

কিছুদিন পরে দূরদেশে উপেন্দ্রনাথের একটি চাকরী হইল। তিনি স্ত্রীকে বাড়ীতে রাখিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন, একেত সম্পূর্ণ অপরিচিত বিদেশ, তাহার উপর গৃহে পরিবারের সংখ্যা অল্প নহে, সেখানে স্বামী স্ত্রীতে বাস করিলে সংসারের ব্যয় বহিয়া উঠা কঠিন হইবে, সুতরাং তিনি সকলের মুখের দিকে চাহিয়া, গৃহসুখ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক নির্জ্জন নির্ব্বাসন দণ্ড গ্রহণ করিলেন। পৃথিবীতে কত হতভাগ্য যুবক এমনভাবে পরার্থে নীরবে আত্মবিসর্জ্জন করিতেছে, তাহাদের দীর্ঘ নিশ্বাসের নির্ব্বাক ইতিহাস কয়জন জানিতে পারে?

গৃহত্যাগের দিন উপেন্দ্রনাথ ঘোরতর অন্যমনস্ক ছিলেন। এই সবে মাত্র তিনি সংসার পথে পদক্ষেপণ করিতেছেন, নূতন দেশ, নূতন জীবন, স্ত্রীর সহিত আসন্নবিরহ সম্ভাবনায় তিনি কাতর হইলেন, বিবাহের পর দীর্ঘকাল স্বামীস্ত্রীতে একত্র বাস প্রায় ঘটিয়া উঠিত না, কার্য্যোপলক্ষে উপেন্দ্রনাথকে কখন কখন স্থানান্তরে যাইতে হইত; কিন্তু এরূপ বহুদূর প্রবাসে তিনি আর কখন যাত্রা করেন নাই, তাঁহার বুকের মধ্যে এক একবার কাঁপিয়া উঠিতেছিল, নির্জ্জন গৃহকক্ষে একাকী বসিয়া তিনি আপনার অদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। অবশেষে ভাবিলেন, আর চিন্তা করিয়া ফল কি? অদৃষ্ট স্রোত যে দিকে লইয়া যায়, ভাসিয়া চলি। গৃহে বসিয়া সকলের শুষ্ক মুখ দেখিয়া কোন সুখ নাই, তারপর সুখে দুঃখে যাহাকে জীবনের চিরসঙ্গিনী করিয়াছিলাম, সে ভালবাসার মর্ম্ম অবগত নহে, অরণ্য ও গৃহ আমার পক্ষে সমান, বিদেশ অরণ্য অপেক্ষা ভাল।

কিন্তু আজ বিভাবতীর যেন কি হইয়াছে! সে নির্ব্বাক! চক্ষু দুটা ছল ছল করিতেছে, কিন্তু তাই বলিয়া নিয়মিত গৃহ কর্ম্মে তাহার কোন ত্রুটী হইতেছে না, তবে মাছ ভাজিতে

গিয়া আজ সে মাছ পুড়াইয়া ফেলিয়াছে, ডালে তুইবার করিয়া লবণ দিয়াছে, পানে খয়ের দিতে ভুলিয়াছে ; শেষে উপেন্দ্রনাথের বাক্সে যখন সে জিনিষ পত্র সাজাইতে বসিল, তখন মনের ভুলে নিজের তুখানা কাপড় তাহার মধ্যে রাখিয়া দিল।

মায়ের নিকট বিদায় লইয়া উপেন্দ্রনাথ নিজ কক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, পানের ডিবাটা হাতে লইয়া অবগুণ্ঠনবতী বিভাবতী দ্বার প্রান্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, ডিবাটা নীরবে স্বামীর হাতে দিয়া বিভা একবার তাঁহার মুখের পানে চাহিল ; উপেন্দ্রনাথ তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণপূর্ব্বক বলিলেন, "তবে এখন আসি।" বিভা স্বামীর পদপ্রান্তে মস্তক স্পর্শ করিয়া আর একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু ভাল করিয়া চাহিতে পারিল না, তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল, তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। অদূরবর্ত্তী ষ্টেসনে টিকিটের ঘণ্টা পড়িল, মুটে পোর্টম্যাণ্ট মাথার উপর তুলিয়া ষ্টেসনের দিকে অগ্রসর হইল, বিভাবতী অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বাতায়ন পাশে বসিয়া এক দৃষ্টে পথের দিকে চাহিয়া রহিল,—তাহাদের বাড়ীর সমুখ দিয়াই রেল পথ, গাড়ী এই পথে পশ্চিমে যাত্রা করিবে।

---

(৩)

মীরটে আসিয়া উপেন্দ্রনাথ দেখিলেন, যেমন স্বচ্ছন্দ মনে তিনি দিন কাটাইবেন ভাবিয়া ছিলেন, দিন তেমনভাবে কাটে না। গ্রীষ্মের দীর্ঘ দিন আফিসে খাটিয়া যখন তিনি ক্লান্তদেহে অবসন্ন হৃদয়ে বাসায় ফিরিয়া আসেন তখন জীবনের নিঃসঙ্গভাব দশগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, তিনি দেখিতে পান সযত্নে তাম্বূল রচনা করিয়া কেহ তাঁহার জন্য দ্বার প্রান্তে অপেক্ষা করিয়া নাই। নির্জ্জন বাসগৃহ—গৃহ প্রান্তে একটা অশ্বথ গাছের দীর্ঘ ছায়া দীর্ঘতর করিয়া লোহিত সূর্য্য পশ্চিম গগনে অস্ত যায়, তাহার পত্র বিরল শাখায় বসিয়া একটা ঘুঘু মধুর কণ্ঠে তাহার প্রিয়তমাকে সপ্রেম সম্ভাষণ করে, অপরাহ্লের উষ্ণ বাতাসে সদ্যোবিকশিত নিম ফুলের একটা উগ্র গন্ধ শূন্যে মিশাইয়া যায়, এবং সন্ধ্যা-কালে অঞ্চলাবৃতদীপহস্তে কেহ তাঁহার গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক হাস্যতরল, প্রেমপূর্ণ নেত্রে তাঁহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। প্রিয়জনসমাগমবঞ্চিত অভিশপ্ত যক্ষের মত তিনি নির্ব্বাসিত জীবন বহন করিয়া দিনে দিনে ক্ষীণ, সুখশান্তিহীন ও পরিতপ্ত হইতে লাগিলেন।—বাড়ী হইতে আসিবার সময় মনে করিয়াছিলেন, অরসিকা, অপ্রেমিকা, পত্নীকে আর কোন দিন পত্র লিখিবেন না, ভাবিয়াছিলেন, কেমন করিয়া উপেক্ষা প্রকাশ করিতে হয় তাহা আমি জানি, বিভার হৃদয়ে আঘাত দিয়া দেখাইব তাহার উপেক্ষায় আমার হৃদয়ে কত বেদনা বাজিয়াছে।

কিন্তু পারিলেন না। বিদেশে আসিয়া বিভার যত্ন, বিনা বাক্যব্যয়ে প্রাণপণে সেবা, আত্ম সুখ বিরতা, নিত্য উপেক্ষিতা নারীর সুগভীর প্রেম তিনি প্রতি পদক্ষেপে বুঝিতে পারিলেন। তাই ভাবিয়া ভাবি একদিন তিনি বিভাকে অনুতপ্ত হৃদয়ে পত্র লিখিলেন, "বিভা, তোমার কাছে ছিলাম বলিয়া এতদিন তোমাকে বুঝিতে পারি নাই. তোমার প্রতি শত অত্যাচার করিয়াছি তাহা মার্জ্জনা করিও।"—হৃদয়াবেগে আরো অনেক কথা লিখিলেন, সেই হৃদয়োচ্ছ্বাস যৎপরোনাস্তি কবিত্ব পূর্ণ।

বিভা উত্তরে লিখিল, "সেখানে তোমার যত্ন করিবার কেহ নাই, তোমার বড় কষ্ট হইতেছে, শীঘ্র ফিরিয়া এস। শরীর থাকিলে দেশে অন্নের অভাব হইবে না।"—পত্রে বিন্দুমাত্র কবিত্ব ছিল না।

---

(৪)

তিন বৎসর পরে উপেন্দ্র নাথ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। বিদেশে একাকী, দেখিবার শুনিবার, যত্ন করি-বার কেহ নাই, নিজের শরীরেও উপর তাঁহারও তেমন যত্ন ছিল না, আফিসে গাধার মত খাটুনী. মনে উৎসাহ উদ্যমের অভাব, যথাসময়ে আহার হইত না, এবং সে আহারও যে তৃপ্তিকর হইত এমন বলা যায় না ; দেহের উপর মনের প্রভাব অত্যন্ত অধিক ; তাই পশ্চিমের জল বাতাস ভাল হইলেও দীর্ঘ প্রবাসের পর পশ্চিমাঞ্চল হইতে ভগ্নদেহ লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, এমন হতভাগ্য বাঙ্গালীর সংখ্যা সপ্তকোটীর মধ্যে নিতান্ত বিরল নহে।

বহুদিন পরে স্বামী সন্দর্শনে বিভাবতীর হৃদয় আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিল, তাহার প্রফুল্লতা তাহার চক্ষে, তাহার প্রতি পদক্ষেপে এমন কি প্রত্যেক কার্য্যে লক্ষিত হইত, কিন্তু উপেন্দ্র নাথের বিরহে তাহার হৃদয় কেমন হইয়া গিয়াছিল, এতকাল পরে তাঁহাকে নিকটে পাইয়া সে কি পরিমাণে আনন্দ অনুভব করিতেছে তাহা কোন দিন সে কথায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করে নাই। স্বভাব সহজে কেহ পরিবর্ত্তন করিতে পারে না, উপেন্দ্র নাথের চক্ষে এ দৃশ্য পূর্ব্ববৎ অস্বাভাবিক বোধ হইত।

একদিন পূর্ণিমার রাত্রে উপেন্দ্র নাথ কোন বন্ধু গৃহে ভোজনান্তে গৃহ প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, তত রাত্রেও বিভা তাঁহার পথ চাহিয়া শয্যাপ্রান্তে বসিয়া আছে, তাহার পরিধানে একখানি সূক্ষ্ম গোলাপীরঙ্গের সাড়ী, সুগোল হাত তুখানি বেড়িয়া তুগাছি সুবর্ণবলয়, এবং কবরীতে একটি বেলফুলের মালা। বাতায়ন পথে পূর্ণচন্দ্রের পরি-স্ফুট স্নিগ্ধালোক তাহার শুভ্র শয্যার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, ধীরে ধীরে নৈশবায়ু নিদ্রামগ্ন ধরণীর দীর্ঘশ্বাসের মত ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে, এবং দূরে দূরে সঙ্গীহীন দীর্ঘ গাছগুলি সেই জ্যোৎস্নালোকিত অনন্ত আকাশের নীচে নীরবে দাঁড়াইয়া সবিস্ময়ে যেন বিশ্ব রচনার বিশালতার কথা চিন্তা করিতেছে। উপেন্দ্র নাথ বহির্দ্বার উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক বারান্দার উপর মুক্ত আকাশতলে দণ্ডায়মান হইলেন, বিভাবতী সঙ্গে সঙ্গে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। এমন শোভন, সুন্দর স্তব্ধ রাত্রির অনন্ত প্রশান্তির মধ্যে তাহার সুকোমল নারী হৃদয়ের নির্ম্মল প্রেম কুসুম-সৌরভের ন্যায় ঊর্দ্ধে প্রসারিত হইতে লাগিল, সে স্বামীর স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া নির্ব্বাক ভাবে দূর কাননের দিকে চাহিয়া রহিল, এই আলোকম্বরা ধরিত্রীর নগ্ন বক্ষে স্তব্ধ রাত্রির মাঝখানে চতুর্দ্দিকের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য ও মহান বিশ্ব ছবি দেখিয়া উপেন্দ্র নাথের হৃদয় সহস্রদল পদ্মের ন্যায় ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিল, তিনি কতক্ষণ ঊর্দ্ধে, অতি ঊর্দ্ধে, নক্ষত্র বিরল অকাশের অসীমতার দিকে চাহিয়া চাহিয়া অবশেষে তাঁহার সুদূরগামী শ্রান্তদৃষ্টি পত্নীর ভাষাহীন মুখের উপর স্থির ভাবে স্থাপন করিলেন, দেখিলেন সেখানে প্রেম, সরলতা ও পবিত্রতা ফুটিয়া রহিয়াছে। তিনি গাঢ় স্নেহে ধীরে ধীরে পত্নীর ওষ্ঠ চুম্বন করিলেন, বিভা এই প্রেমচুম্বন স্পর্শে প্রভাত বায়ু বিকম্পিত পদ্মিনীর ন্যায় স্পন্দমান হৃদয়ে স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইল। এই চুম্বনের প্রতিদানে উপেন্দ্র নাথ একটি অযাচিত চুম্বনের প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা তিনি না পাইয়া কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেন ; বলিলেন, "তোমার এ কি স্বভাব বিভা ?"

বিভা চকিত ভাবে ক্ষণেকের জন্য মাথা তুলিয়া স্বামীর মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল, বলিল, "কি স্বভাব ?"

"চিরকাল এক রকম থাকিবে ? চিরকাল তোমার প্রেম দস্যুর মত লুটিয়া কাড়িয়া লইতে হইবে, স্বেচ্ছায় কখন দিবে না ? ছিঃ এত কৃপণ তুমি !"

বিভা লজ্জিত হইয়া তুই হস্তে স্বামীর কণ্ঠ ধরিয়া. মৃদু-হাস্যে তাহার তাম্বূলরাগ রঞ্জিত পুষ্পপুট তুল্য সুকোমল অধরোষ্ঠ স্বামীর মুখের দিকে অল্প অগ্রসর করিয়া আবার তাঁহার বক্ষে মুখ লুকাইল।

উপেন্দ্র নাথ বলিলেন, "সত্যই যদি ভালবাসিতে তবে কি এমন সাধিতে হইত, আমায় তুমি ভালবাস না ?"

বিভা মুখ নত করিয়া রহিল ; সে কোন কথা বলিল না, কি উত্তর দিতে হইবে তাহা সে জানিত না।

এতদিন পরে বাড়ী আসিয়াছি, তোমার এক বিন্দু ভালবাসা পাইলাম না, জীবনে হয় ত আর পাইব না, একবার মরিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয় তুমি আমায় ভালবাস কি না।"

এবার মুখ তুলিয়া বিভা অঞ্চলে চোখের জল মুছিল, তাহার সেই সিক্ত নয়ন পল্লবে চন্দ্রালোক আসিয়া পড়িল। অভিমানিনী যুবতী স্বামীর স্কন্ধ হইতে মাথা তুলিয়া লইয়া নিঃশব্দে শয্যায় আসিয়া শয়ন করিল। কতক্ষণ পরে উপেন্দ্র নাথ গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং মেঝেতে একখানা মাতুর বিছাইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তাহার উপর দেহভার বিস্তীর্ণ করিলেন। অনেক রাত্রে হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গে তিনি দেখিলেন, বিভা তাঁহার কণ্ঠালিঙ্গনপূর্ব্বক নিরুদ্বেগে তাঁহার পার্শ্বে নিদ্রা যাইতেছে এবং পশ্চিমের বাতায়ন পথে গৃহ প্রবিষ্ট চন্দ্রালোক তাহার মুদ্রিত নেত্রদ্বয় স্পর্শ করিতেছে। পূর্ণিমার চন্দ্র তখন পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছিল।

---

(৫)

তিনটি মাস জলস্রোতের মত চলিয়া গেল। আজ শেষ রাত্রে উপেন্দ্র নাথ মীরটে যাত্রা করিবেন। এই তিন মাস গৃহবাসের মধ্যে কত খুঁটিনাটী কথা, কত তুচ্ছ ঘটনা, কত মিথ্যা ছল ধরিয়া উপেন্দ্র নাথ পত্নীর প্রাণে কত ব্যথা

দিয়াছেন, আজ সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তাহাই তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। শয্যায় পড়িয়া সমস্ত রাত্রি তিনি এ পাশ ওপাশ করিয়া কাটাইলেন; গীর্জ্জার ঘড়িতে চারিটা বাজিয়া গেল। উপেন্দ্র নাথ মৃদুস্বরে ডাকিলেন, "বিভা!"

কোন উত্তর পাইলেন না।—"কি আশ্চর্য্য! এখনই আমি যাইব, এই বিদায়ের সময়ও এই ঘুম, সমস্ত রাত্রি বৃথা শয্যাকণ্টক ভোগ করিয়াছি।"—অনেকে মনে করে প্রতিদান না পাইলে প্রেম নিরর্থক!

গৃহে আলো জ্বলিতেছিল; উপেন্দ্রনাথ উঠিয়া বসিলেন, অবনত মস্তকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিভার মুখের দিকে চাহিলেন। অশ্রু গণ্ড বহিয়া ব্যথিতা যুবতীর উপাধান সিক্ত করিতেছিল।

উপেন্দ্রনাথ কাতর স্বরে বলিলেন, "বিভা কাঁদিতেছ কেন? আমি যতদিন বাড়ী ছিলাম একদিনও তোমায় সুখী করিতে পারি নাই, এজন্য তোমার দুঃখ হইতে পারে, আজত আমি যাইতেছি, আর বোধ হয় বেশী দুঃখ পাইবে না, বেশ আরামে থাকিবে।"

বিভার অশ্রু দ্বিগুণ বেগে বহিল। কিন্তু এবার সে কথা কহিল, বলিল, "কেন কাঁদিতেছি জানিয়া কি হইবে, তুমি আজ যাইতেছ, যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিলে কেন কাঁদিতেছি, আজ তাহা বলিব। জীবনে একদিনও তুমি আমাকে লইয়া সুখী হইতে পারিলে না, তোমাকে কোন দিন সুখী করিতে পারিলাম না, এই দুঃখে কাঁদিতেছি।"

উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "চেষ্টা করিলে পারিতে বিভা, কোন দিন সে চেষ্টা করিয়াছ কি? বড় কষ্টে আজ বিদায় লইতেছি, কিন্তু ইহাও ভাল, তোমার কাছে থাকিয়া ভালবাসা না পাওয়া অপেক্ষা দূরে যাওয়া অনেক ভাল।"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বিভা জিজ্ঞাসা করিল, তবে আসিয়াছিলে কেন? শুধু কষ্টভোগ করিতে কার সাধ?"

"ভুল করিয়াছি বিভা, বুঝিলাম আমি না আসিলেই ভাল থাকিতে। সে দিন তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম আমার সঙ্গে যাইবে? তুমি তাহাতে সম্মত হও নাই, মনে আছে?"

"শুধু সুখের কথাটাই বড় বলিয়া বুঝিয়াছিলে! আমার মন্দভাগ্য, আমি অধিক কথা জানি না!"—আজ বিভার কথা ফুটিয়াছিল।

উপেন্দ্রনাথের কর্ণে বিভার কথা কয়টি বিদ্রূপপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "শোন বিভা, তুমি সযত্নে চিরদিন তোমার হৃদয় আমার নিকট হইতে গোপন করিয়া আসিয়াছ, কেন তাহা বলিতে পারি না, হয়ত তুমি আমাকে অযোগ্য বলিয়া মনে কর। সংসারে অনেক সুখের আশা করিয়াছিলাম, শীত-কালের গাছের পাতার মত সব আশা ঝরিয়া পড়িয়াছে, এখন শুধু মরিতে বাকি। তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি, আর দিব না, আজ বিদায়, ইহা আমার শেষ বিদায় বলিয়া মনে করিয়ো, আর কখন দেশে ফিরিয়া আসিব না। ভগবান তোমাকে সুখী করুন।"—স্তম্ভিত হৃদয়ে বিভা কথাগুলি শুনিল, স্বামীস্ত্রীর অলক্ষ্যে থাকিয়া আর একজন তাহা শুনিলেন, তিনি অন্তর্য্যামী।

উপেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন। সেই নিশি শেষে রুদ্ধ গৃহে একাকিনী শয্যাবলুণ্ঠিতা আহতা যুবতী বালিসে মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। হায় প্রেম!

---

(৬)

দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে। বিভার শরীরে আর বল নাই, মুখে হাসি নাই, মনের উৎসাহ চলিয়া গিয়াছে দেহের কান্তি ম্লান হইয়াছে। উপেন্দ্রনাথ বিভাকে আর পত্র লেখেন না; বিভাও নিরুত্তর। সে কাহারো কাছে প্রাণ খুলিয়া কথা বলে না, সখীদের সহিত কোন প্রকার আমোদে যোগ দেয় না। তাহার মনের দুঃখ কি কেহই তাহা জানিতে পারে না। অনেকের স্বামীই প্রবাসী, বিরহ রমণী জীবনের অনন্ত দুঃখ নহে।

দুই বৎসর পরে উপেন্দ্র বিভাকে পত্র লিখিলেন, "বিভা, আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছি, নিরপরাধিনী তুমি, তোমার মনে দারুণ কষ্ট দিয়াছি, আর মার্জ্জনা চাহিতেও সাহস হয় না, কিন্তু আমি জানি মার্জ্জনা চাহিবার পূর্ব্বেই তুমি মার্জ্জনা করিয়াছ, তাই আজ পত্র লিখিতেছি। তোমাকে বুঝিতে না পারিয়া আমি তোমা হইতে এতদিন দূরে দূরে বাস করিলাম, কিন্তু কৈ তাহাতেত এক মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি পাইলাম না। যে তরঙ্গ আমাকে তোমা হইতে দূরে লইয়া ফেলিয়াছে, তাহাই আবার আমাকে তোমার নিকটে লইয়া যাইবে, তাহার পর আর তোমাকে

ছাড়িয়া থাকিব না। তোমাকে আনিবার জন্য আমি সাতদিনের ছুটী লইয়া বাড়ী যাইতেছি, আজ হইতে সাত দিনের দিন সন্ধ্যার পর তোমার সঙ্গে আমার দেখা হইবে।"

অপরাহ্নের সূর্য্যালোকে ছাদের উপর বসিয়া বিভা পত্রখানি পড়িয়া পড়িয়া অবশেষে তাহা অঞ্চলে বাঁধিল: দেখিল সূর্য্যের লাল আলো অদূরবর্ত্তী গাব গাছের একটা ভগ্ন শাখায় পড়িয়া শুষ্ক পত্রগুলিকে নব পল্লবের মত সুরঞ্জিত করিয়াছে। বিভা হাসিল।

বিভা দিন গণিতে লাগিল। যে দিন সন্ধ্যার সময় উপেন্দ্রনাথের আসিবার কথা, সে দিন বিভা অনেক কালের পর একবার আয়নাখানা খুলিয়া বসিল, ভাবিল আমার আর সাজসজ্জা করিবার সখ নাই, কিন্তু অনেক দিন পরে তিনি আসিতেছেন, ম্লান মুখে মলিন বেশে কি করিয়া তাহার নিকট গিয়া দাঁড়াইব?—বসন্ত যখন আসে তখন ধরণী ফুলে ফলে লতাপল্লবে রূপসী তরুণীর মত সাজিয়া বসে।

বিভা রুক্ষ চুলগুলি তৈলনিসিক্ত করিয়া আঁচড়াইয়া পরিপাটী করিয়া একটি বেণী বাঁধিল, কপালে একটি ছোট টিপ কাটিল। অনেক কাল পরে নাপতিনীকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল, সে আসিয়া সযত্নে বিভার কোমল পা দুখানিতে আলতা পরাইয়া দিল। বাক্সের মধ্যে শিশিতে একটু গোলাপী আতর পড়িয়াছিল, এ দু'বৎসর সে তাহা স্পর্শও করে নাই। আজ শিশি হইতে একটু আতর বাহির করিয়া তাহাতে সিন্দূর গুলিল এবং পরম যত্নে সেই সীমন্তে পরিল। তাহার পর দিঘীর ঘাট হইতে সাবান দিয়া গা ধুইয়া আসিয়া গৃহাগমনোন্মুখ পথশ্রান্ত স্বামীর জন্য সযত্নে শয্যা রচনায় মনোনিবেশ করিল। বৈশাখ মাস, অপরাহ্ন কালে পশ্চিম আকাশে একটু মেঘ উঠিয়াছিল, সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে মেঘখানি দিগন্তে বিস্তৃত হইয়া প্রতি-মুহূর্ত্তে ভীষণ ঝটিকার সম্ভাবনা ব্যক্ত করিতে লাগিল। সমস্ত প্রকৃতি যেন রুদ্ধ নিশ্বাসে দাঁড়াইয়া আছে! বিভা আকাশের দিকে চাহিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল, 'দেবতা, খানিকক্ষণ ঝড়জল বন্ধ রাখ, তিনি আগে বাড়ী আসুন।'

ডাকপিয়ন্ একখানি পত্র আনিয়া দ্বারে ডাকাডাকি করিতেছিল। ঝি পত্রখানি লইয়া বিভার হস্তে দিল, হঠাৎ তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। মৃৎপ্রদীপের নিকটে অগ্রসর হইয়া বিভা দেখিল তাহার শাশুড়ীর নামের পত্র, রমেন্দ্র বাবুর হস্তাক্ষর, রমেন্দ্র উপেন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু; মীরটে তিনি চাকরী করেন, তিনিই উপেন্দ্রকে তথায় লইয়া যান।

বিভা কম্পিত হস্তে পত্রখানি খুলিল। প্রদীপের শলিতাটা বাম হস্তে উজ্জ্বলিত করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পত্রখানা পড়িতে আরম্ভ করিল, তাহার হাত তাহার সর্ব্বশরীর বাতা-হত কদলীপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল, তাহার চক্ষুর দৃষ্টি বিলুপ্ত হইল, অবশেষে সে আশ্রয়হীনা লতার মত মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।—পত্রে কলেরায় উপেন্দ্রনাথের মৃত্যুসংবাদ লিখিত ছিল।

সহসা একটা প্রবল ঝটিকাবর্ত্তে সেই রুদ্ধ গৃহের দরজা জানালাগুলা ঝনাৎ করিয়া খুলিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে গৃহের দীপালোক নির্ব্বাপিত হইল। জগৎ অন্ধকার!

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

নিষ্কাম ধর্ম্ম।

কিছু দিন হইতে দেশের সর্ব্বত্র নিষ্কামধর্ম্মের কথা উঠিয়াছে। অনেকেই নিষ্কাম ধর্ম্মের কথা বলেন; নিষ্কাম ধর্ম্মের বিষয় আলোচনা করেন। অনেকেই নিষ্কাম ধর্ম্ম বুঝিবার জন্য গীতা পাঠ করেন। বাস্তবিক নিষ্কাম ধর্ম্ম কি? ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া,—ফলপ্রত্যাশা না করিয়া ধর্ম্মসাধন করাই নিষ্কাম ধর্ম্ম। নিষ্কাম ধর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম। কেহ কেহ বলেন, ইহা কি সম্ভব? মানুষ যাহা কিছু করে, সুখের জন্যই করে। সুখই উদ্দেশ্য। নিষ্কাম ধর্ম্ম একটা কথার কথা।

নিষ্কাম ধর্ম্ম কি অসম্ভব? যিনি অসম্ভব বলেন, তিনি মানব প্রকৃতির গূঢ় তত্ত্ব কিছুই বুঝেন না। সচরাচর মানুষ নরকের ভয়ে পাপ ত্যাগ করে, স্বর্গের লোভে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে। কিন্তু উহা প্রকৃত ধর্ম্ম নহে।

আত্মার স্বাভাবিক অবস্থায় পাপের প্রতি ঘৃণা থাকে। পাপকে পাপ বলিয়াই ঘৃণা; অন্য কোন কারণে নহে। ময়লাকে আমরা ঘৃণা করি কেন? ময়লা বলিয়াই ঘৃণা করি। অন্য কোন কারণে নহে। ময়লাতে যাঁহার ঘৃণা হয় না, তাঁহার অবস্থা অস্বাভাবিক। যাহার মলিনতা বোধ নাই, তাহাকে হাজার বল "উহা ময়লা, ময়লা",

তাহাতে তাহার কোন কষ্ট হইবে না। মলিনতাবোধ থাকিলে, মলিন পদার্থের সংশ্রবে স্বভাবতঃ কষ্ট হয়। ঘ্রাণ শক্তি যাহার আছে, দুর্গন্ধের সংস্রবে আসিলেই স্বভাবতঃ কষ্ট হয়।

পাপ সম্বন্ধেও সেইরূপ। আত্মার স্বাভাবিক অবস্থায় পাপের প্রতি ঘৃণা স্বাভাবিক। পাপকে পাপ বলিয়াই ঘৃণা হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষ পাপকে পাপ বলিয়াই ঘৃণা করে। অন্য কোন কারণে নহে।

মানুষের মন যে পরিমাণে মলিন হয়, পাপের প্রতি ঘৃণা সেই পরিমাণে হ্রাস হইয়া যায়। নিজের দিক্ হইতে পাপ করিতে তাদৃশ আপত্তি থাকে না। তখন কেবল এই মনে হয়. পাছে লোকে দেখে। আমার দুষ্কার্য্যের কথা প্রকাশ হইলে, লোকসমাজে কেমন করিয়া মুখ দেখাইব?

মানুষের দুর্গতি অত্যন্ত অধিক হইলে লোকলজ্জাও অতিশয় কমিয়া যায়। তখন কেবল ভয়। দুষ্কার্য্য করিলে পাছে লোকে প্রহার করে, পাছে কারাদণ্ড হয়, পাছে প্রাণ যায়, এইরূপ ভয়ে লোকে অনেক দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয়।

পাপকে পাপ বলিয়া পরিত্যাগ করাই প্রকৃত ধর্ম্মের অবস্থা। লজ্জা বা ভয়ে পাপ ত্যাগ করা প্রকৃত ধর্ম্ম নহে। যে ব্যক্তি লোকলজ্জা বা লোকভয়ে পাপ কার্য্য হইতে বিরত হয়, সে লোকলজ্জা বা লোকভয় না থাকিলে নিশ্চয়ই পাপ করিত। তাহাকে লোকে যদি কিছু না বলিত, তাহা হইলে অক্লেশে পাপকার্য্য সম্পন্ন করিত। মনের সুখে পাপ করিত। সুতরাং উহা প্রকৃত সাধুতা নহে। পাপকে পাপ বলিয়া পরিত্যাগ করাই প্রকৃত ধর্ম্ম, প্রকৃত সাধুতা।

পাপ সম্বন্ধে যেমন, পুণ্য সম্বন্ধেও সেইরূপ। সুন্দর পদার্থ যেমন স্বভাবতঃ মনকে মোহিত করে, সেইরূপ, আত্মার স্বাভাবিক অবস্থায়, পুণ্য তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে মনুষ্যকে বিমুগ্ধ করে। ঐ গোলাব ফুলটিকে দেখিয়া মোহিত হইতেছি কেন? উহা সুন্দর বলিয়া, অন্য কোন কারণে নহে। উহার সুগন্ধে প্রাণ উৎফুল্ল হইতেছে কেন? সুগন্ধের জন্য, অন্য কোন কারণে নহে। সেইরূপ. পুণ্যের সৌন্দর্য্যে ও সুগন্ধে মানবের প্রাণ মন স্বভাবতঃ বিমুগ্ধ হয়।

লোকের জন্য পাপ ত্যাগ করা যেমন. লোকের জন্য পুণ্য করাও সেইরূপ। কোনটাই প্রকৃত ধর্ম্ম নহে। পাপ পুণ্য লোকের মুখে নহে; উহা অন্তরের অবস্থা।

ইহলোক সম্বন্ধে যেমন, পরলোক সম্বন্ধেও সেইরূপ। লোকভয় ও নরকভয়ে বাস্তবিক প্রভেদ কি? যদি মিথ্যাবাদীকে বলা যায়, তুমি মিথ্যা বলিলে তোমাকে পঁচিশ বেত মারিব, আর সেই ভয়ে সে মিথ্যা কথা না বলে. (ভয় না থাকিলে বলিত) তাহা হইলে সে কি সত্যবাদীর সম্মান লাভ করিবার যোগ্য? যদি চোরকে বলি, চুরি করিও না; চুরি করিলে তোমাকে জেলে দিব। সে যদি জেলে যাইবার ভয়ে চুরি না করে, তাহাকে কি সাধু বলিব? সেইরূপ, যদি কোন ব্যক্তিকে বলি, "চুরি করিও না; চুরি করিলে নরকে যাইতে হইবে" সে ব্যক্তি যদি নরক-যন্ত্রণার ভয়ে চুরি না করে, তাহাকে কি প্রকৃত সাধু বলিব?

কাহাকেও যদি বলা যায়, পুণ্য কার্য্য কর, করিলে টাকা পাইবে, ভাল চাকুরি পাইবে, বা যশঃ পাইবে, এবং সে ব্যক্তি যদি টাকা. চাকুরি বা যশের লোভে পুণ্যকার্য্য করে, তাহাকে কি সাধু বলিব?

সেইরূপ, যদি কাহাকেও বলা যায়, সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে মৃত্যুর পরে, স্বর্গলোকে গিয়া সুখসম্ভোগ করিতে পারিবে, আর সে ব্যক্তি যদি স্বর্গসুখভোগের লোভে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে কি সাধু বলিব?

ভয় ও লোভ নিকৃষ্ট ভাব। ঐ দুটি ভাবকে পরলোক পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া গেলেই কি উহারা উচ্চ ভাব হয়? হে মূঢ় মানব! এখানকার মলিন ইন্দ্রিয়সুখ, এখানকার ময়লা, স্বর্গে লইয়া যাও কেন?

স্বর্গ বা ইন্দ্রালয় অতি চমৎকার স্থান! মানবের কল্পনা যত দূর সুন্দর ও মনোহর স্থান রচনা করিতে পারে. ইন্দ্রালয় তত দূরই সুন্দর স্থান;—তদপেক্ষা কিছুই অল্প নহে।

অতি মনোহর ইন্দ্রসভায় তানলয় বিশুদ্ধ সঙ্গীতসহ পরম রূপবতী স্বর্গ-বেশ্যাগণ আনন্দে নৃত্য করিতেছে। সভামণ্ডপে সমবেত দেবমণ্ডলী দর্শন ও শ্রবণ করিয়া একান্ত প্রীত হইতেছেন।

মুসলমানদিগের কোরানে স্বর্গের কিরূপ বর্ণনা আছে? স্বর্গে, সুন্দর, সুচ্ছায়, হৃদয়তৃপ্তিকর উদ্যান সকল বর্ত্তমান

তথায় সুনির্ম্মলা নদী সকল প্রবাহিতা। পরমা সুন্দরী অপ্সরাগণ স্বর্গীয় পুরুষদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে।

পৃথিবীতে মনুষ্য যে সকল অভাব অনুভব করে, আশা করে, তাহা স্বর্গে পূর্ণ হইবে। আরব দেশ মরুভূমিময়, সেখানে জলকষ্ট, সেই জন্য কোরানে কল্পিত হইয়াছে যে, স্বর্গে সুনির্ম্মলা নদী সকল প্রবাহিত, সুচ্ছায় উদ্যান সকল শোভমান। ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু জ্ঞানী মুসলমানেরা বলেন যে, কোরাণের ঐ সকল বর্ণনা আধ্যাত্মিক রূপক মাত্র।

এ সকল কথা ছাড়িয়া দিয়া এখন দেখা যাউক, প্রকৃত ধর্ম্ম কি ও কি নয়। স্বার্থবুদ্ধি. সুখের ইচ্ছা, যশঃ মান গৌরবের ইচ্ছায় যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা প্রকৃত ধর্ম্ম নহে। রাজাবাহাদুর হইবার জন্য কোন ধনী লোক দুর্ভিক্ষে বিংশতি সহস্র মুদ্রা দান করিলেন। দান করিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, গবর্ণমেণ্ট কত দিনে তাঁহাকে সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করিবেন। সংবাদপত্রে তাঁহার দানের প্রশংসা প্রকাশ হইল কি না, দেখিবার জন্য তিনি অতিশয় ব্যাকুল। সংবাদপত্র আসিবামাত্র তিনি তাঁহার প্রশংসা সাত বার পাঠ করিলেন। আর বন্ধু বান্ধবকে যে কতবার পড়িয়া শুনাইলেন, তাহার সংখ্যা নাই। তাহার পর সংবাদ পত্রের ঐ স্থানটুকু কাটি দিয়া কাটিয়া অতি যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিলেন। 'রাজাবাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হইলে তিনি মনে করিলেন যে, তাঁহার দান সার্থক হইল। না পাইলে মনে করিতেন যে, উহা এক প্রকার বৃথা হইল।

পার্থিব সুখলালসায় যেমন ধর্ম্ম হয় না, স্বর্গসুখের ইচ্ছাতেও, সেইরূপ ধর্ম্ম হয় না। এখানে সুরাপান ত্যাগ করিলে স্বর্গে উৎকৃষ্ট স্যাম্পেন পাইব, এখানে জিতেন্দ্রিয় হইলে, স্বর্গে পরমা সুন্দরী অপ্সরা পাইব, এরূপ অভিসন্ধিতে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তাহা কখনই প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অনেকের স্বর্গ যেন কোন ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র নবাবের বাগান। যাহা যথার্থই মন্দ, স্বর্গে লইয়া গেলেই কি তাহা ভাল হয়? পৃথিবীর ময়লা স্বর্গে লইয়া গেলেই কি তাহার দুর্গন্ধ যায়?

অনেকে বলেন, নিষ্কাম ধর্ম্ম একটা কথার কথা। সাংসারিক কার্য্য বা ধর্ম্মকার্য্য, মানুষ যাহা কিছু করে; সকলেরই উদ্দেশ্য সুখ। সুখলালসা চরিতার্থ করাই, কি পার্থিব, কি অপার্থিব, সকল কার্য্যের একমাত্র লক্ষ্য। নিষ্কামধর্ম্ম একটা অমূলক কথা।

এ কথার সদুত্তর কি? সদুত্তর অবশ্যই আছে। প্রথমতঃ যাঁহাদের এইরূপ মত. তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি. ধর্ম্মবুদ্ধি বা কর্ত্তব্যজ্ঞান, এবং সুখলালসা কি এক পদার্থ? সুখভোগের বাসনা এবং কর্ত্তব্যজ্ঞান যে, এক পদার্থ নহে. ইহা নিজ নিজ অন্তরে একবার দৃষ্টিপাত করিলেই সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়।

সুখেচ্ছা ও কর্ত্তব্যজ্ঞান, একই পদার্থ হওয়া দূরে থাকুক, মনুষ্যের জীবনে এই উভয়ের মধ্যে বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে। সুখেচ্ছা বলে, পরিতোষপূর্ব্বক অন্নব্যঞ্জন ভোজন কর, কর্ত্তব্যজ্ঞান বলে, ঐ দুর্ভিক্ষপীড়িত দরিদ্রকে ভাগ দিয়া তবে উহা গ্রহণ কর। সুখেচ্ছা বলিতেছে, ক্ষীরসরনবনী দ্বারা রসনার তৃপ্তিসাধন কর; কর্ত্তব্যজ্ঞান বলিতেছে, ঐ তোমার দরিদ্র প্রতিবাসীর শিশুসন্তান দুগ্ধাভাবে শীর্ণ হইয়া যাইতেছে, অগ্রে তাহার দুগ্ধের ব্যবস্থা করিয়া দেও। সুখেচ্ছা বলিতেছে, মূল্যবান শাল রুমালে আপনার সুপুষ্ট দেহের আরাম সম্পাদন কর; কর্ত্তব্যজ্ঞান বলিতেছে, ঐ শীতবাতেকম্পিত রুগ্ন অনাথকে অগ্রে একখানি শীতবস্ত্র দেও; সুখেচ্ছা বলিতেছে, মনের সুখে তাসক্রীড়া করিয়া সময়াতিপাত কর. কর্ত্তব্যজ্ঞান বলিতেছে. এখনই উঠিয়া গিয়া তোমার পীড়িত আত্মীয়ের সেবায় নিযুক্ত হও। সুখেচ্ছা বলিতেছে. দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া সুনিদ্রায় রজনী যাপন কর, কর্ত্তব্যজ্ঞান বলিতেছে, তোমার অমুক উপকারী বন্ধু রোগশয্যায় যাতনায় অস্থির হইয়াছেন, এখনই তাঁহার নিকটে যাও, তাঁহার সেবা করিবার লোক নাই, সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া তাঁহার শুশ্রূষা কর ও ঔষধ সেবন করাও। সুখলালসা বলিতেছে, দক্ষিণে যাও, কর্ত্তব্যজ্ঞান বলিতেছে, উত্তরে যাও। উভয়ের মধ্যে এইরূপ বিরোধ। সুখলালসা ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের মধ্যে এই প্রকার যুদ্ধ মানবহৃদয়ে নিরন্তর চলিতেছে। ইহাই প্রকৃত দেবাসুরের যুদ্ধ। সুখেচ্ছা ও কর্ত্তব্যজ্ঞান অভিন্ন হইলে, পেটুক, চোর ও লম্পটের কর্ত্তব্যজ্ঞান বড়ই উজ্জ্বল! কেননা, তাহাদের সুখলালসা যার পর নাই প্রবল।

দ্বিতীয়তঃ কেহ কেহ বলেন যে, নিষ্কামধর্ম্ম, অযুক্ত

কথা, কেননা, দেখা যাইতেছে যে, সৎকার্য্য করিলে অন্য কোন সুখ হউক, আর নাই হউক, মনের সুখ হয়। সৎকার্য্যের সঙ্গে, সুখের সঙ্গে, যোগ রহিয়াছে। সুতরাং ইহাই প্রকৃত কথা বলিতে হইবে যে, মানুষ সুখের জন্যই সৎকার্য্য করে।

সৎকার্য্য করিলেই সুখ হয়, সুতরাং মানুষ সুখের জন্যই সৎকার্য্য করে;—সৎকার্য্য করিবার উদ্দেশ্যই সুখ,—নিষ্কামভাবে সৎকার্য্য সম্ভব নহে, একথা যুক্তিসিদ্ধ নহে। যুক্তিসিদ্ধ নহে কেন? সৎকার্য্য করিলে তাহার ফলস্বরূপ মনুষ্য সুখানুভব করে। এ স্থলে সৎকার্য্য কারণ, সুখানুভূতি কার্য্য। সৎকার্য্য পূর্ব্ববর্ত্তী, সুখানুভূতি পরবর্ত্তী। সুতরাং জিজ্ঞাস্য এই যে, সৎকার্য্য করিবার পূর্ব্বে, মানুষ কেমন করিয়া জানিবে যে, সৎকার্য্য করিলে সুখোৎপত্তি হয়? যাহারা বলেন, মানুষ সুখের জন্যই সৎকার্য্য করে, নিষ্কামধর্ম্ম সম্ভব নহে, তাঁহাদের এই ভুল হয় যে, তাঁহারা কারণকে কার্য্য মনে করেন, পরবর্ত্তীকে, পূর্ব্ববর্ত্তী মনে করেন।

মনোবৃত্তির চরিতার্থতাতে সুখ। মনোবৃত্তি চরিতার্থ হইলে পর, সুখানুভূতি হয়। তখন জানিতে পারি উহার চরিতার্থতাতে সুখ আছে। সুখ কার্য্য, কারণ নহে। সৎপ্রবৃত্তি বা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, উভয় প্রকার প্রবৃত্তিই স্বতঃই কার্য্য করে।

একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। একটি শিশু অগ্নিকুণ্ডে পতিত হইয়াছে। একজন দয়ালু ব্যক্তি উহা দেখিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অগ্নি হইতে রক্ষা করিলেন। দয়ালু ব্যক্তি শিশুটিকে রক্ষা করিলেন কেন? স্বর্গের লোভে, না, সৎকার্য্য করিয়া যে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, তাহার লোভে? কোন লোভে নহে। এস্থলে সুখের লোভ, একেবারেই নাই! দয়ালুর দয়া উদ্বেলিত হইল; তিনি না করিয়া থাকিতে পারিলেন না, সেই জন্যই করিলেন! কার্য্যটি স্বতঃই হইল।

মানুষ যখন জানিতে পারে যে, সৎকার্য্য করিলে সুখ হয়, তখন সুখলালসায় সৎকার্য্য করিতে পারে। কিন্তু যে সকল মনোবৃত্তির ফল সৎকার্য্য, সে সকলের ক্রিয়া স্বভাবতঃ ও স্বতঃই হয়। সুতরাং নিষ্কামধর্ম্মের সম্ভাবনা চিরদিনই রহিয়াছে। সাধুজন চিরদিনই নিষ্কামধর্ম্ম সাধন করিতেছেন

তৃতীয়তঃ ধর্ম্মবুদ্ধি ও সুখেচ্ছা, এক হওয়া দূরে থাকুক, উহারা পরস্পর পরস্পরকে খণ্ডন করে। যে পরিমাণে ধর্ম্মবুদ্ধির উন্নতি হয়, সেই পরিমাণে সুখেচ্ছা হ্রাস হইয়া যায়। আবার যে পরিমাণে সুখেচ্ছা প্রবল হয়, সেই পরিমাণে ধর্ম্মবুদ্ধি ক্ষীণ হইয়া পড়ে। ইহা নিশ্চিত সত্য যে, মানুষ যত উন্নত হয়, পবিত্র হয়, প্রেমিক হয়, তত তাহার সুখলালসা হ্রাস হইয়া যায়। যত সহানুভূতি ও প্রেমের উন্নতি,—মানুষ যত পরসুখে সুখী হইতে পারে, ততই তাহার আত্মসুখলালসা হ্রাস হইয়া যায়। সহানুভূতি ও প্রেমে, মানুষ অন্যকে সুখী করিবার জন্যই ব্যতিব্যস্ত হয়;—আত্মবিস্মৃত হইয়া পরসুখে সুখী হয়।

হার্বার্ট স্পেন্সর তাঁহার Data of Ethics নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে, মানবপ্রকৃতির উন্নতি সহকারে, এমন অবস্থা আসিবে, যখন পরসুখেচ্ছার সহিত আত্মসুখেচ্ছার বিরোধ থাকিবেনা। যখন পরসুখেচ্ছা আত্মসুখেচ্ছার সহিত একীভূত হইয়া যাইবে। আমরা নিম্নে স্পেন্সরের উক্ত গ্রন্থ হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

"Not only must we infer that, the future of man and of society will have modifications as great as the past has shown us, but that it will have much greater. That is to say, the transformation of altruistic gratifications into egoistic ones, will be carried very much further; and an average larger share in the happiness of each individual, will depend on conciousness of the wellbeing of other individuals.

* * * * *

The altruism which has to arise, therefore, in future, is not an altruism which is in conflict with egoism, but is an altruism which comes eventually to coincide with egoism in respect of a large range of life; and it becomes instrumental in exalting satisfactions that are egoistic, in so far as they are pleasures enjoyed by the individual, though they are altruistic, in respect of the origin of these pleasures.*

* স্পেন্সরের রচিত 'Data of Ethics' নামক গ্রন্থের ২৯৭ পৃঃ হইতে ২৯৯ পৃঃ দেখ।

জন ষ্টুয়ার্ট মিলের স্বলিখিত আত্মচরিত পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায়, তাঁহার জীবনে এমন এক সময় আসিয়াছিল, যখন অর্থব্যবহারশাস্ত্র ও তর্কশাস্ত্রের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুশীলনদ্বারা তাঁহার হৃদয় যারপর নাই নীরস হইয়া গিয়াছিল। কোন বিষয়েই তাঁহার হৃদয়ে ভাবের উদ্রেক হইত না। তিনি কিছুতেই সুখ পাইতেন না। এমন কি, সময়ে সময়ে তাঁহার আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হইত। এই শোচনীয় অবস্থা হইতে তিনি কেমন করিয়া পরিত্রাণ পাইলেন? এক দিবস তিনি একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। সেই পুস্তকখানিতে এইরূপ একটি বর্ণনা ছিল যে, কোন পরিবারের কর্ত্তার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতৃবিয়োগে, এবং সমস্ত পরিবারের ভার তাঁহার স্কন্ধে পতিত হইল দেখিয়া একান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। পরিবারগণ সকলেই অতিশয় বিষন্ন। এই শোকাবহ ব্যাপারের বর্ণনা পাঠ করিয়া মিলের হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। তাহার নীরস অন্তঃকরণে ভাবোচ্ছ্বাস উপস্থিত হইল। তিনি অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না। এই ঘটনায় তিনি আরাম পাইলেন। তিনি জীবনে নূতন ভাব অনুভব করিলেন। শুষ্কতা চলিয়া গিয়া প্রাণ সরস হইল।

এই ঘটনায় তাঁহার জীবনে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। নীরসতা অন্তর্হিত হওয়াতে তিনি সুখী হইলেন। কেবল তাহা নহে। তিনি এমন নৈতিক তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন, যাহা তর্কশাস্ত্রের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচারে পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই। তিনি ইহাই বুঝিলেন যে, যাঁহারা সুখকে লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করেন, সুখী হইবার জন্যই কার্য্য করেন, তাঁহারা সুখী হইতে পারেন না। কিন্তু যাঁহারা সুখ দুঃখ নিরপেক্ষ হইয়া কার্য্য করেন, নিজের সুখ অন্বেষণ না করিয়া পরকে সুখী করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারাই সুখী হইতে পারেন। এ বিষয়ে তিনি নিজে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

"Those only are happy (I thought) who have their minds fixed on some object other than their own happiness, on the happiness of others, on the improvement of mankind, even on some art or pursuit, followed not as a means, but as itself an ideal end. Aiming thus at something else, they find happiness by the way. The enjoyments of life (such was now my theory) are sufficient to make it a pleasant thing, when they are taken *en passant*, without being made a principal object. Once make them so, and they are immediately felt to be insufficient. They will not bear a scrutinizing amination. Ask yourself whether you are happy, and you cease to be so."*

ভারতের শিরোভূষণ, জগতের গৌরব, শাক্যসিংহ তাঁহার শিষ্যগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, আপনার সুখ বা দুঃখের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিবে না। কেবল কর্ত্তব্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে;—মৈত্রী, অর্থাৎ বিশ্বজনীন প্রেমের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া জীবন পথে চলিবে।

এই সত্যটি বুঝাইয়া দিবার জন্য বুদ্ধদেবের একটি গল্প আছে। গল্পটি এই;—কোন ব্রাহ্মণ তাঁহার গৃহদ্বারে বসিয়া আছেন। এমন সময় হঠাৎ দেখিলেন, একটী পরমা সুন্দরী নারী আপনার সৌন্দর্য্যে চারিদিক্ আলো করিয়া তাহার গৃহাভিমুখে আসিতেছেন। স্ত্রীলোকটি নিকটবর্ত্তী হইলেন। তখন ব্রাহ্মণ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে মা! স্ত্রীলোকটি উত্তর করিলেন, "আমি যে হই না কেন, আমি আপনার গৃহে থাকিব। ব্রাহ্মণ সমাদরে তাঁহাকে আপনার গৃহে স্থান দিলেন। ঐ নারীর আগমনে ব্রাহ্মণের গৃহে আনন্দোৎসব হইতে লাগিল।

কয়েক দিন পরে, ব্রাহ্মণ তাঁহার বহির্দ্বারে সেইরূপ বসিয়া আছেন, এমন সময় দেখেন, আবার কে আসিতেছে। এবার সেরূপ সুন্দরী নারী নয়। এক অতি কদর্য্য, ভীষণ, রাক্ষসী তুল্য মূর্ত্তি। কোটরচক্ষে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ, এবং সমস্ত দেহে রুধির ধারা। ঐ ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি নিকটবর্ত্তী হইলে ব্রাহ্মণ ভয়ে অস্থির হইলেন। তাঁহার সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? এখানে কেন আসিয়াছ?" সেই ভয়ঙ্করী নারী তখন বলিল, "আমি যে হই না কেন, আমি তোমার বাটীতে থাকিব বলিয়া আসিয়াছি।" ব্রাহ্মণের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন, "না, আমার বাটীতে স্থান হইবে না। তুমি অন্য কোথাও

* Antobiography of J. S. Mill. P. 299.

যাও।" নারী বলিল, "আমি আর কোথাও যাইব না। তোমার বাটীতেই থাকিব। তুমি যখন আমার ভগিনীকে স্থান দিয়াছ, তখন আমাকেও স্থান দিতে হইবে।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "কে তোমার ভগিনী?" ঐ নারী বলিল, "কেন? কয়েক দিন পূর্ব্বে যে তোমার বাটীতে আসিয়াছে, সেই আমার ভগিনী। সে যেখানে যায়, আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাই। আমি তাহাকে বড় ভালবাসি, সেই জন্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া বেড়াই।" ব্রাহ্মণ তখন সেই সুন্দরী নারীকে ডাকাইলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন," এই স্ত্রীলোক বলিতেছে, ও আপনার ভগিনী। ইহা কি সত্য?" সুন্দরী নারী উত্তর করিলেন, "ইহা সম্পূর্ণ সত্য। ও আমার ভগিনী। ও আমাকে বড় ভালবাসে। আমি যেখানে যাই, আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়।" ব্রাহ্মণ এই সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন। ঐ সুন্দরী নারীকে বলিলেন, "স্পষ্ট করিয়া বল দেখি, তোমরা কে?" তখন সুন্দরী নারী বলিলেন, ব্রাহ্মণ ঠাকুর! বুঝিতে পারিতেছ না? আমার নাম **সুখ,** আর উহার নাম **দুঃখ,** আমি যেখানে যাই, ও আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়। ও আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। যে ব্যক্তি আমাকে গৃহে স্থান দিবেন, তাঁহার জানা উচিত, আমার ভগিনী আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে।"

এই গল্পটির তাৎপর্য্য কি? সুখ দুঃখ চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সুখের পর দুঃখ আসে, আবার দুঃখের পর সুখ, আবার সুখের পর দুঃখ, এইরূপ পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। গল্পটির এই একটি অভিপ্রায়। আর একটি অভিপ্রায় এই যে, যে ব্যক্তি কেবলই সুখ চায়, সুখ যাহার একমাত্র লক্ষ্য তাহার আশা পূর্ণ হয় না" সুখভোগ করিতে গিয়া সে দেখিতে পায় যে, দুঃখ আসিয়া পড়ে। দুঃখ আসিবেই আসিবে। সুখপিপাসু সুখী হইতে পারে না। যিনি সুখ দুঃখ উভয়ের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া,—সুখ দুঃখ এই উভয়ের মধ্যে কোনটারই প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কেবল কর্ত্তব্যের প্রতি, ধর্ম্মের প্রতি, বিশ্বজনীন হিতৈষণার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করেন, তিনি প্রকৃত অবস্থা, প্রকৃত শান্তি বা নির্ব্বাণ লাভ করেন।

পাপকে পাপ বলিয়াই ত্যাগ করিতে হইবে। ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়াই আলিঙ্গন করিতে হইবে। ছাত্রের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুণ। যে ছাত্র ধনোপার্জ্জনের জন্য বিদ্যা শিক্ষা করে, সে বিদ্যার প্রকৃত তাৎপর্য্য জ্ঞাত নহে। আবার যে ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সম্মান ও উপাধি লাভের জন্য অধ্যয়ন করিতেছে, সেও বিদ্যার প্রকৃত মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। কিন্তু যে ছাত্র অন্য কোন প্রকার লোভে বিদ্যা শিক্ষা করেন না, বিদ্যার জন্যই বিদ্যার্জ্জন করেন, বিদ্যার প্রকৃত মাধুর্য্য ও মাহাত্ম্য সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিয়া বিদ্যানুরাগী হন, তিনিই প্রকৃত ভাবে বিদ্যা-চর্চ্চা করেন।

পাপের তুল্য ঘৃণিত, ভয়ঙ্কর, আর কি আছে। সেই জন্য প্রকৃত সাধু ব্যক্তি পাপ বলিয়াই পাপের সংস্পর্শ ত্যাগ করেন। ধর্ম্মের অপেক্ষা ভাল আর কি আছে? এমন কি আছে, যাহা লাভ করিবার উপায় ধর্ম্ম। ধর্ম্মের অপেক্ষা ভাল এমন কি আছে, যাহা ধর্ম্মের পুরস্কার হইতে পারে? ধর্ম্মের অপেক্ষা মধুর আর কি আছে? পূজ্যপাদ প্রাচীন মহর্ষি বলিতেছেন, "ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু।"

পবিত্রতা, ভক্তি প্রেম, এ সকল চাই কেন? অন্য কিছুর জন্য নহে। পার্থিব বা স্বর্গীয় কোন প্রকার সুখসম্ভোগের জন্য নহে। কোটি ইন্দ্রালয় তুচ্ছ। ভক্ত কবি রাম প্রসাদ বলিতেছেন,—

"সকলের সার ভক্তি, মুক্তি তার দাসী।"

শ্রীমদ্ভাগবতে ঈশ্বরোক্তিরূপে আছে, "আমার নিকট যে যাহা চায়, আমি তাহাকে তাহাই দিতে পারি, কিন্তু আমার নিকট যে অন্য কিছু চাহে না, আমি তাহাকে আপনাকে দান করি।"

ধর্ম্মকে ধর্ম্মের জন্যই আলিঙ্গন করিতে হইবে. এই সত্যটি যিনি সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তিনি ধন্য। নিষ্কাম ভাবে ধর্ম্মসাধনের তত্ত্ব যিনি প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন, তিনিই ধন্য।

কিন্তু প্রেম ভিন্ন প্রকৃত নিষ্কাম ধর্ম্ম সম্ভব নহে। প্রেমে পুণ্যবোধ পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যায়। আমাদের আধ্যাত্ম শাস্ত্র সকলের উপদেশ এই যে, যিনি প্রকৃত সাধু বা সিদ্ধ পুরুষ, তিনি পাপ পুণ্যের অতীত অবস্থায় উপনীত হন। ইহা কি সম্ভব? প্রেমেতে সম্ভব।

গর্ভধারিণী মাতা কি প্রশংসার লোভে বা স্বর্গসুখের

লোভে সন্তানের সেবা করেন? মাতৃস্নেহ সম্পূর্ণ নিষ্কাম। সাক্ষাৎ যমস্বরূপ ভীষণ বিষধর একটি শিশুকে দংশন করিবার জন্য ধাবমান হইয়াছে। তাহার মাতা ইহা দেখিয়া শিশুকে রক্ষা করিবার জন্য দৌড়িয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। সর্প মাতাকে দংশন করিল। মাতা মৃত্যুকালে এই বলিয়া মরিলেন;—"আমি মরি, তাহাতে দুঃখ নাই; আমার বাছা তো বাঁচিল।" কি আশ্চর্য্য নিষ্কাম স্নেহ!! প্রকৃত সাধুগণ নিষ্কাম প্রেম লাভ করেন। তাহারা নিষ্কাম প্রেমে জগতের সেবা করেন।

কেহ কেহ মনে করেন, অত্যন্ত উন্নত অবস্থায় কর্ম্ম করিতে হয় না। এ কথা স্বীকার করি না। জীবের সুখদুঃখে উদাসীন হইয়া কেবল ধ্যানে মগ্ন থাকাই কি মহাত্মার লক্ষণ? প্রকৃত বিশ্বাস ও প্রকৃত প্রেমের অবশ্যম্ভাবী ফল প্রকৃত কর্ম্ম। জ্ঞানশাস্ত্রে যাহাকে কর্ম্ম বলে, ভক্তিশাস্ত্রে তাহাই সেবারূপে পরিণত হইয়াছে।

নিষ্কাম ধর্ম্ম তিন প্রকার। প্রথমতঃ আমরা স্বভাবতঃ স্বতঃই যাহা করিয়া থাকি, তাহা এক প্রকার নিষ্কাম ধর্ম্ম। পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি যে, একটি বালক জলমগ্ন হইল, দয়ালু ব্যক্তি উহা দেখিবামাত্র ব্যস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে উদ্ধার করিলেন। ইহা নিষ্কামধর্ম্ম বা নিষ্কাম কর্ম্ম। এরূপ স্থলে কর্ত্তব্যজ্ঞানের ক্রিয়া থাকে না। "ইহা আমার কর্ত্তব্য, অতএব করি," এমন বিবেচনা থাকে না। ঘটনাটি দেখিবামাত্র, দয়ালু ব্যক্তি উহা না করিয়া থাকিতে পারেন না, সেই জন্য করেন। প্রাণের আবেগে করেন।

দ্বিতীয়তঃ বিশুদ্ধ কর্ত্তব্যজ্ঞানে যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাও নিষ্কাম ধর্ম্ম। সাংসারিক সুখ বা স্বর্গ ভোগ, কোন প্রকার সুখ কামনা না করিয়া, কেবল উচিত বোধ করিয়া যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা নিশ্চয়ই নিষ্কাম কর্ম্ম বা ধর্ম্ম। যে কার্য্যে কোন প্রকার ফল প্রত্যাশা নাই. কেবল কর্ত্তব্যবোধে যাহা করা হয়, তাহা অবশ্য নিষ্কাম কর্ম্ম। প্রথম প্রকার কর্ম্ম হইতে এই দ্বিতীয় প্রকার কর্ম্ম, অবশ্য শ্রেষ্ঠ।

কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্ম ফল হেতু র্ভূ মা তেসঙ্গোঽস্ত কর্ম্মণি

গীতা। ২।৪৭

কর্ম্মেই তোমার অধিকার হউক, কর্ম্মফলে যেন কামনা না হয়; কর্ম্মফল যেন তোমার প্রবৃত্তির হেতু না হয়, এবং কর্ম্ম পরিত্যাগে তোমার আসক্তি না হয়।

তৃতীয়তঃ ফলপ্রত্যাশা না করিয়া যে কর্ম্ম পরমেশ্বরে সমর্পিত হয়, তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিষ্কাম কর্ম্ম।

ব্রহ্ম নিষ্ঠোগৃহস্থঃস্যাৎ তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণঃ।
যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।

মহানির্ব্বাণতন্ত্র। ৮।২৩।

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণ হইবেন। যে কোন কর্ম্ম করুন, তাহা পরব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন।

পরমেশ্বরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার জন্য সকল কর্ম্ম করিতে হইবে। নিজের জন্য নহে। ঐ যে মাঠের চাষা হল চালনা করিতেছে, ও যদি কেবল সাংসারিক উদ্দেশ্যে উহা করে, তবে উহা সকাম কর্ম্ম হইল। কিন্তু যদি এই মনে করিয়া হলচালনা করে যে, তাহার গৃহে অক্ষম বৃদ্ধ মাতা পিতা আছেন, তাহার স্ত্রী পুত্র কন্যা রহিয়াছে, সে পরমেশ্বরের আদেশে তাহাদের প্রতিপালনের জন্য হলচালনা করেতেছে, যদি এরূপ মনে করিয়া হলচালনা করে, তাহা হইলে তাহার হলচালনাই পরম ধর্ম্ম,—পবিত্র নিষ্কাম ধর্ম্ম হইল।

রাজা যদি কেবল আত্ম সুখের জন্য রাজ্য করেন, তবে তাঁহার রাজকার্য্য করা অতি হীন কার্য্য হইল। কিন্তু যদি তিনি বিশ্বরাজ পরমেশ্বরের রাজ্যে, আপনাকে তাঁহার দাসানুদাস জানিয়া তাঁহার সন্তানদের সেবার জন্য রাজকর্ম্ম করেন, তাহা হইলে তাঁহার রাজকার্য্যই তাঁহাকে মুক্তি পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। বিদ্যালয়ের অধ্যাপক যদি সেই জ্ঞানস্বরূপের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অধ্যাপনা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, যদি তিনি মনে করেন যে, সেই পরম পুরুষের সন্তানগণের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করিয়া তিনি কৃতার্থ হইতেছেন, তাহা হইলে সেই অধ্যাপনা কার্য্যই তাঁহার পক্ষে মুক্তিপ্রদ ধর্ম্ম হয়। বিচারাসনে বিচারক যদি সেই পরম ন্যায়বান পরমেশ্বরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, আপনাকে তাঁহারই ভৃত্য জানিয়া তাঁহারই কার্য্য মনে করিয়া বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তাহা হইলে উহাই তাঁহার উপাসনা, উহাই তাঁহার পরিত্রাণপ্রদ পরম ধর্ম্ম হয়। বাজারের মুটে

যদি ঈশ্বর ভক্ত হয়, আর পরমেশ্বরের কার্য্য মনে করিয়া মোট বহন করে, তাহা হইলে উহাই তাহার পক্ষে নিষ্কাম ধর্ম্ম, পরম ধর্ম্ম। যদি ঐ পথপরিষ্কারক দুঃখী ব্যক্তি পরমেশ্বরের কার্য্য মনে করিয়া পথ পরিষ্কার করে, তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করে, তাহা হইলে সংসারের চক্ষে উহা হীন কার্য্য হইলেও, বাস্তবিক, উহা অনেক রাজার রাজ্য করা অপেক্ষাও অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ ও মহৎ কার্য্য।

জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, ধর্ম্মের এই তিনটি প্রধান অঙ্গ। সংসারে এই তিনটিরই সাধন হয়। সুতরাং ষোল আনা ধর্ম্ম সংসারে। সংসার ধর্ম্মসাধনের ক্ষেত্র।

প্রকৃতভাবে কর্ম্মসাধন করিলে বড় কর্ম্ম, ছোট কর্ম্ম থাকে না। কেন না, সকল কর্ম্মের লক্ষ্য এক হইয়া যায়। পার্থিব চক্ষু, ছোট, বড় দেখে। আধ্যাত্মিক চক্ষু, এক দেখে। আধ্যাত্মিক চক্ষু, আবার, অনেক স্থলে ছোটকে বড় দেখে, বড়কে ছোট দেখে। পার্থিব চক্ষুতে যে বড়, আধ্যাত্মিক চক্ষুতে সে ছোট। আবার পার্থিব চক্ষুতে যে ছোট, আধ্যাত্মিক চক্ষুতে সে বড়। অনেক জমিদারের অপেক্ষা অনেক কৃষক বড়। অনেক সম্ভ্রান্ত লোক অপেক্ষা অনেক বাজারের মুটিয়া বড়। স্ত্রীলোকেরা যে গৃহমার্জ্জনা প্রভৃতি কার্য্য করেন, তাহা কি ক্ষুদ্র কার্য্য? পরমেশ্বরের সংসারে, পরমেশ্বরের কার্য্য মনে করিয়া যাহা করা যায়, তাহাই মহৎ কার্য্য, তাহাই পবিত্র কার্য্য।

বৃত্তের মধ্যবিন্দু হইতে পরিধি পর্য্যন্ত যত রেখা টানিবে, সকলই সমান হইবে। সেইরূপ যদি পরমেশ্বরকে মানব জীবনরূপ বৃত্তের মধ্যবিন্দু করা হয়, তাহা হইলে সেই জীবনপরিধির সকল স্থান তাহা হইতে নিশ্চয়ই সমান দূর হইবে। অর্থাৎ ঈশ্বরনিষ্ঠ হইয়া যদি মানবজীবনের সকল কর্ত্তব্য সম্পন্ন করা হয়, কি ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য, কি পারিবারিক কর্ত্তব্য, কি সামাজিক কর্ত্তব্য সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্যই যদি তাঁহার কার্য্য মনে করিয়া করা হয়, তাহা হইলে সকল কার্য্য, সকল কর্ত্তব্যই সমান পবিত্র, সমান মহৎ হইয়া যায়। সকল কার্য্যই জীবনবৃত্তের মধ্যবিন্দুস্বরূপ; পরমেশ্বর হইতে সমান দূরে। যদি আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকিত যে, জীবনের প্রয়োজনীয় কার্য্যমাত্রই ঈশ্বরাদিষ্ট কার্য্য, সকল কার্য্যই তাঁহার কার্য্য, যদি সকল কার্য্য সমান বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত আমরা সম্পন্ন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে, বাস্তবিক সকল কার্য্য সমভাবে পবিত্র ও মহৎ হইত। কার্য্যের মধ্যে বড় ছোট থাকিত না।

প্রত্যেক কাজ করিবার সময় মনে করিতে হইবে যে, পরমেশ্বরের কার্য্য করিতেছি। এই প্রকারে কর্ম্ম করিলে, কর্ম্মবন্ধন কাটিয়া যায়। যত ভাবিবে, আমি করিতেছি আমার কার্য্য, তত মায়ার শৃঙ্খলে দৃঢ়বদ্ধ হইবে। আর যত ভাবিবে, আমি দাস, প্রভুর কার্য্য করিতেছি, তত বন্ধন কাটিয়া যাইবে। ভৃত্য যেমন মনে করে, আমি প্রভুর কার্য্য করিতেছি, সেইরূপ জীবনের সর্ব্বপ্রকার কার্য্য সম্বন্ধেই মনে করিতে হইবে, আমি প্রভুর কার্য্যই করিতেছি। শাস্ত্রের সার উপদেশ এই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জ্ঞানশাস্ত্রে যাহাকে কর্ম্ম বলা হয়, ভক্তিশাস্ত্রে তাহাই সেবারূপে পরিণত হইয়াছে। প্রভুর সেবা মনে করিয়া সংসারের সকল কার্য্য করিতে হইবে। তিনি সংসারের কর্ত্তা। সকলেই তাঁহার পুত্র কন্যা। প্রভুর পুত্র কন্যাদের সেবা মনে করিয়া কার্য্য করিলে তাঁহারই সেবা করা হয়। প্রভুর কোন অভাব নাই; সুতরাং তাঁহার সেবার প্রয়োজন নাই। প্রভুর সেবার অর্থ, তাঁহার সন্তানদের সেবা। এক পলা তৈল পড়িয়া গেলে, সংসারাসক্ত ব্যক্তির প্রাণে আঘাত লাগে। তিনি আসক্তির সহিত উহা তুলিয়া রাখেন। যিনি ভগবদ্ভক্ত, তিনিও এক পলা তৈল পড়িয়া গেলে যত্নের সহিত তুলিয়া রাখেন। কিন্তু তাঁহার ভাব ভিন্ন। তিনি এই মনে করিয়া তুলিয়া রাখেন যে, উহা ভগবানের সন্তানের সেবায় লাগিবে। এইরূপ দাস্যভাবে কর্ম্মসাধন কর, ইহাই পরম ধর্ম্ম। ইহাতেই পরিত্রাণ।

পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তির অবশ্যম্ভাবী ফল, জীবের প্রতি প্রেম। আবার জীবের প্রতি প্রেমের অবশ্যম্ভাবী ফল, জীবের সেবা। ভগবদ্ভক্তি, জীবের প্রতি প্রেম ও জীবের সেবা, এই তিনটির মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ। ভক্ত হরিদাস উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতেন বলিয়া গ্রামের জমিদার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরিদাস! তুমি উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কর কেন? মনে মনে করিলে কি হয় না?" হরিদাস উত্তর করিলেন, "মনে মনে হরিনাম করিলে হইবে না কেন? তবে যে আমি উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করি, তাহার কারণ এই যে, উহাদ্বারা আমি নিজে কৃতার্থ হইব

এবং যাহারা শুনিবে তাহারাও কৃতার্থ হইবে।"

প্রেমোন্মত্ত নিত্যানন্দ জগাই মাধাইয়ের উদ্ধারের জন্য ব্যাকুল হইলেন। তিনি তাহাদিগকে হরিনাম শুনাইতে গেলেন। তাহারা তাঁহার মুখে কলসের কাণা দ্বারা আঘাত করিল। দর দর ধারায় শোণিত প্রবাহ প্রবাহিত হইতে লাগিল। নিত্যানন্দ তাহাদের প্রতি ক্রোধ করিলেন না। প্রেমের সহিত বলিলেন,—

"মার্‌লি তুই কলসির কাণা, তাই ব'লে কি প্রেম দিব না?"

যতকাল সংসার থাকিবে, ততকাল এই মহাবাক্যের আদর থাকিবে। জীবের নিষ্কাম সেবার এক মহা দৃষ্টান্ত প্রেমিক নিত্যানন্দ। প্রেমোন্মত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ কুষ্ঠ রোগীকে আলিঙ্গন করিলেন!! কি অদ্ভুত প্রেম! জীবের দুর্দ্দশা দেখিয়া দেশে দেশে হরিনাম প্রচার করিলেন। নামের গুণে কত মহাপাপী উদ্ধার হইয়া গেল। কেমন আশ্চর্য্য জীবের সেবা! ইহাই প্রকৃত নিষ্কাম ধর্ম্ম, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।

কবিতা গুচ্ছ।

শারদী।

অয়ি পৌর্ণমাসী,
সুধাই গো আমি ধরাবাসী;—
স্বর্গ তব কত কাছে কি আদর্শ ধরি' আছে,
শুনিছ না কিন্নরীর বাঁশী?
অপ্সরার ওষ্ঠ চুমে কি উল্লাস আছে ঘুমে
যার লাগি ত্রিলোক উদাসী,
মাধুর্য্য-ভাণ্ডার মর্ত্ত্যে দিবে কি লুটায়ে
তুমি পৌর্ণমাসী,
তুমি সুধরাশি!

অয়ি পৌর্ণমাসী,
তুমি যার চরণের দাসী,
গ্রহ-পাত্রমিত্র সনে বসি রাজসিংহাসনে
সেই তব হৃদয়-বিলাসী;
তারা-সঙ্গিনীরা ঘিরে মণি-ছত্র ধরে শিরে,
বায়ু করে ব্যজন উচ্ছাসি;
সোহাগের লাজাঞ্জলী বর্ষিছ সঘনে
তুমি পৌর্ণমাসী,
তুমি প্রীতিরাশি!

অয়ি পৌর্ণমাসী,
গাহনে নামিছ হাসি হাসি।
সাগরের উর্ম্মিগুলি অনুরাগে ফুলি ফুলি
তোমারে লইল বুকে গ্রাসি;
গভীর অতল হ'তে মাতিয়া প্রমোদ-স্রোতে
কলহাস্য তুলিছে বিকাশি;
ছাড়িতে না চায় তোমা ওই পাগলেরা;
তুমি পৌর্ণমাসী,
তুমি হাসিরাশি!

অয়ি পৌর্ণমাসী,
দেখা দিলে কানন উদ্ভাসি;
লতা-গহনের মাঝে খুলি তনু আধ-লাজে,
শুক্লবাস শুকাইছ আসি;
এলোকেশে—মরি, মরি, মুক্তাধারা পড়ে ঝরি,
বনভূমি গেল—গেল ভাসি;
লীলারঙ্গে জলে স্থলে করিছ বিহার,
তুমি পৌর্ণমাসী;
তুমি শোভারাশি!

অয়ি পৌর্ণমাসী,
আমি বড় রূপ ভালবাসি!
একা শরতের রাতে, তোমার রূপের সাথে
তাই ত বেড়াই উপবাসী;
নাশ' তৃষা, নাশ' ক্ষুধা, ঢাল সুধা ঢাল সুধা,
আমি বড় সুধার পিয়াসী;
হেথা হ'তে কেড়ে লও আমারে ও বুকে
তুমি পৌর্ণমাসী;
তুমি সুধারাশি!

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

চক্ষুলাভ।

আজ টুটিয়াছে মোর মোহের বন্ধন,
গেছে শঙ্কা, গেছে লাজ, জেগেছে ক্রন্দন—
বহিছে জীবন-স্রোত দ্রুতবেগভরে,
সহসা লাগিবে ভাটা উচ্ছল সাগরে!
অতীতের খেলা-ধূলা মিশাবে ধূলায়,
আমি বসে থাকি তবে কার প্রতীক্ষায়?
কৈশোরে ঘোমটা ঢাকা এই দুটি চোক,
দেখে নাই জগতের অক্ষয় আলোক!
আজ বুঝিয়াছি আছে আমারও কাজ
কেহ বৃথা জন্মে নাই ধরণীর মাঝ!
মুক্ত রহিয়াছে মোর স্মৃতির দুয়ার,
পশিবে না মৃত প্রাণে সুরভি সম্ভার?
কল্পনা কবিতা গীতি উথলি নিমেষে,
নিবে মোরে উড়াইয়া অমৃতের দেশে!

শ্রীসুরমাসুন্দরী ঘোষ।

যৌবন-জীবন-নদী।

যৌবন জীবন নদী, মধুরে বহিয়া যায়,
তীরে কত উপবন, সুশ্যামল ছায়াময়।
দুর হ'তে পাখী আনে, কত গীত কত স্বর,
তীরে করে তরুগুলি, স্বপ্নভরে মর্ মর্।
কূলে কূলে ঢেউগুলি বলে যায় কত কথা,
আকুল সৈকত ভূমি শুনি সে মোহন গাথা।
উজল দিবসালোকে হাসে সদা দুই তীর,
আশার চুম্বন ভরে আবেশে উথলে নীর।
বায়ু আসি মোহ স্বরে বাসনার গীত গায়,
দুধার প্রান্তরে সদা হরিত যৌবন ভায়।
মধুর স্বপন ছায়া অধীর তরঙ্গে ভাসে,
কনক বসন্ত রেখা সুদূর দিগন্তে হাসে।
আলোক ছায়ার কভু বিচিত্র স্বপন খেলা,
টুটিয়া লুঠিয়া পড়ে চুম্বিয়া অধীর বেলা।
কি এক অজ্ঞাত ভাবে কল্লোলিত জলরাশি,
কল্পনার কলোচ্ছ্বাস সদা উথলয়ে আসি।
উষা আসি প্রতিদিন প্রভাতের গান গায়,
সন্ধ্যা আসি স্নাত করে রক্তিম চুম্বন ছায়।
দুকূল ভরিয়া সদা প্লাবন সঙ্গীত গাহি,
যৌবন জীবন নদী মধুরে যায়গো বহি!

শ্রীলজ্জাবতী বসু।

প্রতিবাদ।

মান্যবর

শ্রীযুক্ত প্রদীপ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়

প্রদীপের তৃতীয় ভাগ ৯ম সংখ্যার ২৭৪ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত গোপীচন্দ্র সেন মহাশয় "সেন বংশীয় নৃপতিগণের জাতি নির্ণয়" নামক প্রস্তাবে মাধাই নগরের তাম্রশাসন সম্বন্ধে আমাকে উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন—

"তাম্রফলকখানি আমার নিকট তিনমাস মাত্র ছিল, তাহার পরেই শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব বাহাদুরের যোগে, আমাকে ফেরত দিবেন বলিয়া, ফলকখানি পাবনায় লইয়া চৌধুরী মহাশয় এক বৎসর পর্যন্ত পাঠোদ্ধার করেন, কিন্তু ফলকখানি আর আমাকে দিলেন না।"

তাঁহার প্রবন্ধের এই অংশে সত্যের বিপরীত অনেক কথা লিখিয়াছেন। আমি সেন মহাশয়কে তাম্র ফলকখানি ফেরত দিব বলিয়া পাবনার কলেক্টর বাহাদুরের যোগে উহা তাঁহার নিকট হইতে আনি নাই এবং উহা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করার জন্য আমি কোনরূপ দায়ী নহি।

যে অবস্থায় ঐ তাম্রফলক আমার হস্তগত হয় তাহা ঐতিহাসিক চিত্রের ১ম খণ্ডের ৯৩ ও ৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। এবং তাহাই প্রকৃত কথা। বাস্তবিক পাবনার কালেক্টর শ্রীযুক্ত রাডিচে সাহেব আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ তাম্রফলক পাঠ উদ্ধারের জন্য দিয়াছিলেন।

সেন মহাশয় তাঁহার উদ্ধৃত তাম্রশাসনের যে অনুলিপি একখণ্ড ছাপাইয়া নানাস্থানে বিতরণ করেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন:—

"প্রকাশ থাকে যে তাম্রশাসনখানি গত ৫ই আশ্বিন উপরোক্ত শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব বাহাদুরকে তাঁহার আদেশ অনুসারে প্রদান করিয়াছি।" তারিখ ৭ই আশ্বিন (১৩০৫ সাল)।

সেন মহাশয় সেরাগঞ্জের সবডিভিজন্যাল আফিসার মহোদয়কে ১৮৯৮ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে যে পত্র লেখেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

Sir,

In obedience to the orders of the District Magistrate I have the honour to send the Copper plate found at Madhainagar. A copy of the old Sangskrit writings engraved upon it together with a Bengalee translation is also submitted. As the old Sangskrit throws a light on the ancient history, *it was my prayer to the Magistrate to keep it in the Asiatic Museum or in any place which he thinks fit*, and moreover as I had to labour much in reading the old Sanskrit, I would be very much glad if I could know the final order of the Magistrate passed with regard to it.

An acknowledgment of the plate is solicited.

I have &c. &c,
Sd. GOPI CHANDRA SEN.

N. B. The italics are mine

ইহাতে সেন মহাশয় তাম্রফলকখানি ম্যাজিষ্ট্রেটকে অর্পণ ও উহা এসিয়াটিক মিউজিয়মে অথবা ম্যাজিষ্ট্রেট্ যে কোন স্থানে তাঁহার ইচ্ছামত রাখিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ত্তমান উক্তি অর্থাৎ আমি তাঁহাকে ফেরত দিব বলিয়া পাবনার কালেক্টর সাহেব বাহাদুরের যোগে উহা হস্তগত করার উক্তি, তাঁহার পূর্ব্বের উক্তির ও সত্যের বিপরীত।

সেন মহাশয় লিখিয়াছেন যে আমি এক বৎসর পর্য্যন্ত পাঠোদ্ধার করি। সেন মহাশয়ের এ সংবাদটি মনঃকল্পিত। কিন্তু এ উক্তির সবিশেষ প্রতিবাদ প্রয়োজন নাই।

ভারেঙ্গা
১৭ই আশ্বিন
১৩০৭

শ্রীপ্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী
গবর্ণমেণ্ট প্লীডার
পাবনা।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। **পীর খাঁ নাজির।** ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তিকা। বগুড়া জেলায় পূর্ব্বকালে পীর খাঁ নাজির নামক কোন ব্যক্তির অত্যাচার বৃত্তান্ত ছন্দে বিবৃত হইয়াছে। লেখকের নাম পুস্তকে নাই, কিন্তু আমরা মুসলমানের রচনা অনুমান করিতেছি। বাঙ্গালী মুসলমানের লিখিত বাঙ্গালা পুস্তকের সমালোচনা করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই, কারণ এ কার্য্যে তাঁহারা নূতন ব্রতী। এক দেশ, এক ভাষা, স্মরণ করিয়া এ দেশের মুসলমানেরা যদি বঙ্গ-সাহিত্য সেবায় নিযুক্ত হন, তাহা হইলে দেশের এবং জাতির বড় উপকার হয়। এ জন্য মুসলমান লেখক মাত্রেই আমাদিগের ধন্যবাদের পাত্র।

২। **নীহার-বিন্দু।** শ্রীনিতাইসুন্দর সরকার প্রণীত। সরকার মহাশয় স্বয়ং কালিদাস, স্বয়ং মল্লিনাথ। তাহার এই সটীক কাব্যগ্রন্থ তাহার প্রমাণ। ভবিষ্যতে কেহ তাঁহার গ্রন্থের টীকা করিবে তাহার সম্ভাবনা নাই, কারণ তিনি নিজেই তাহা করিয়া রাখিয়াছেন। সটীক একটা শ্লোক উদ্ধৃত করি:—

কে জানেরে এক মুঠো পোড়ামাটী ভস্ম-কাছে,
তটিণীর কূলে ঘুমে সমগ্র জগৎ আছে।

"একমণ ত্রিশ সের ওজনের একটী মনুষ্য দেহ পুড়িয়া দশ সের মাত্র ভস্মে পরিণত হয়।" হায়, হায়! মানুষ তোমার সাধের দেহের কি এই পরিণাম?

টীকা করিবার সময় সরকার মহাশয় অভিধানের উপর কিছু ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই।—

কঞ্চুকী—রাজান্তঃপুরের রক্ষক। কৌষিক ধ্বজ—রেশমী নিশান শতগ্রন্থি-বাস—শত গাইটযুক্ত ছিন্ন বস্ত্র। সরিত্তীরে—(শরিৎ+তীরে) নদীর তীরে।

নিম্নে যে শ্লোক কয়টি উদ্ধৃত করিতেছি তাহার মুক্ত আবৃত্তি করিতে পাঠককে পরামর্শ দিই না।—

মত্তহস্তী-সম শত বাহু-বীর্য্য-বলে,
যাহার ভীষণ দংষ্ট্রে চূর্ণ পলে পলে;
গোলাপ-গঞ্জিত কম, ইন্দু-ত্রপাকর—
বরারোহা গরবিনী—সহাস্য অধর।

এমন দংষ্ট্রা চূর্ণকারী শব্দবিন্যাস বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না!

৩। **পাণ্ডব-নির্ব্বাসন কাব্য।** শ্রীকামিনী কুমার সরকার প্রণীত।

এই কবি 'কল্পনা সখির সহায়তায় কবিতা সুন্দরী গড়িয়া বহুদিন হতে তুষিতে বঙ্গজ মন মনে মনে বাঞ্ছা রাখেন।' সে বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে কি না সে বিষয়ে আমাদের সংশয় আছে। রচনা মধুসূদনের ক্ষীণ অনুকরণ।

৪। **সুর সঙ্গীত।** প্রণেতার নাম অপ্রকাশিত

লেখকের নিঃসন্দেহ কবিত্ব শক্তি আছে। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। যদি ইহাই কবির প্রথম উদ্যম হয় তাহা হইলে বিশেষ প্রশংসনীয়। গ্রন্থ প্রারম্ভেই রচনা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়ঃ—

নির্জ্জিত নিহত সুর-রিপুগণ,
বৈজয়ন্ত এবে শান্তি-নিকেতন,
অনন্ত-পুলক-প্রবাহে মগন,
অসুর-বিজয়ী দেবতা আজ;
উল্লাস-উৎফুল্ল অনুপম জোতি,
শোভে সুর মুখে সুষমা সংহতি,
নিশা অবসানে নব-ত্বিষাম্পতি
ধরেন যেমতি নবীন সাজ।

প্রথম নর নারীর উৎপত্তি বর্ণনা এই কাব্যের উদ্দেশ্য। পুরুষ নর সৃজন করিলেন, প্রকৃতি নারী গঠন করিলেন। প্রথমে নরের তৎপর নারীর উৎপত্তি। নারী সৃষ্ট হইয়াই নরের সন্নিধানে গমন করিলেন।—

ভুবনের ভাবী নরের জননী
পুরুষে ভেটিতে আসেন আপনি,
অঙ্গে অঙ্গে যেন হাসে নিশামণি
সঙ্গে সঙ্গে শোভা ছুটিয়া যায়!
প্রকৃতির ছায়ে রমনী গঠিতা,
পুরুষ বিহনে আশ্রয় রহিতা,
স্বত: সে অভাব পূরণে চেষ্টিতা,
কিন্তু নাহি জানে প্রাণে কি চায়!

গ্রন্থখানি উৎকৃষ্ট; কিন্তু সার্টিফিকেট দাতাদিগের উৎপাত হাতেও রহিয়াছে এবং তাহাদিগের পত্রগুলি উৎকট। প্রথম পত্র পড়িতে শ্বাসরোধ হয়। সার্টিফিকেটের ভাষা দেখুন ঃ—

আর গায়ক! আপনি ধন্য!—ধন্য আপনার গাথা রচনা, লোকাতিসা গীতিশক্তি, অলোক-সামান্য ছন্দোবৈচিত্র! এরূপ ষড়জশালী কণ্ঠে, উদাত্তানুদাত্ত স্বরিতময়-স্বরে, হৃদয়োন্মাদক তানে, মর্ম্মস্পর্শীলয়ে, দীপক-রাগে ও প্রস্পষ্ট ভাষায় ত্রিগুণাতীত কারণরূপ চিন্ময়ের লীলাগান মন্দার—সুরভিত নন্দন কানন মধ্যে ইন্দ্রাদি সুরগণের সন্নিধানেই শোভা পায়, হীনবুদ্ধি নরলোক ইহার অর্থ কি বুঝিবে?

হীনবুদ্ধি নরলোক মূল কাব্য বুঝুক আর না বুঝুক, এই অদ্ভুত প্রশংসাবাদ বুঝিতে যথার্থই অক্ষম হইবে।

৫। **টুকটুকে বই।** শ্রীমতী চারুবালা দেবী প্রণীত। বালক বালিকাদের উপযোগী ছবির বই। পুস্তকের ছাপা, কাগজ ও ছবিগুলি উৎকৃষ্ট এবং মূল্যও অল্প হইয়াছে; বালক বালিকারা পুস্তকখানি পাইলে আনন্দে উৎফুল্ল হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু পুস্তকের রচনা ভাল হয় নাই।

৬। **ত্রিবেণী।** উপন্যাস। বাণীব্রত অধর চন্দ্র দাস প্রণীত। মূল্য ১॥০ টাকা। লেখক উপন্যাসচ্ছলে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের ছবি পাঠকের মনে মুদ্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। যতদূর পড়িয়াছি, তাহাতে এই বুঝিয়াছি, পুস্তকখানি বাঙ্গালীর সেণ্টিম্যাণ্টালিজ্‌মের একটী বিশেষ ফল।

স্বর্গীয় দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়।

AN HONEST MAN IS THE NOBLEST WORK OF GOD.

"সাহিত্যে" পূজ্যপাদ পিতৃদেবের আত্মজীবনচরিত বাহির হইয়াছে। এই আত্মজীবনচরিত পূজনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং প্রকাশ করিবেন, এক দিন আশা ছিল। কিন্তু কতক সময় তাহার শরীর অসুস্থ থাকায় এবং পরে তিনি ইহলোক ত্যাগ করায় তাহা ঘটিল না। তাঁহার সাহিত্যানুরাগী দৌহিত্র যে তাহার মাসিক পত্রে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন এক্ষণে ইহাই আহ্লাদের বিষয়। আত্মজীবনচরিতের যে অংশ সাহিত্যে প্রকাশিত হইয়াছে এবং যে অংশ অদ্যাপি অপ্রকাশিত আছে, আমার নিজের যাহা জানা আছে তাহা অবলম্বন করিয়া আমি এই প্রবন্ধ লিখিতেছি।

জগতে এমন কতকগুলি লোক আবির্ভূত হন, যাঁহারা যুদ্ধও করেন নাই, বক্তৃতাও করেন নাই, কোন একটা দলও সংস্থাপন করেন নাই, কোন একটা আবিষ্কারও করেন নাই—তথাপি তাঁহাদিগের জীবন জাতীয় কলঙ্ক অপনয়ন করে, তথাপি তাঁহাদিগের জন্ম মনুষ্যজাতির গৌরব বৃদ্ধি করে, তাঁহাদিগের জীবন সত্যনিষ্ঠার প্রতিভা প্রকাশ করে, এবং তাঁহাদিগের অস্তিত্ব সাধুতার ও ধর্ম্মের প্রতাপ প্রশান্ত ভাবে প্রচার করে। এই জন্যই এই সকল লোকের জীবনচরিত আলোচ্য, এবং দৃষ্টান্ত শুভপ্রদ।

আমি বিষয় কার্য্যের ভিতর প্রবেশ করিয়া চতুর্দ্দিকে এত মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, তোষামোদ ও অত্যাচার দেখিতে পাই, যাঁহারা শিক্ষিত এমন কি সচ্চরিত্র বলিয়া সম্মানিত—তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেক লোককে ধনলাভের জন্য এমন কপট এবং বক্র ব্যবহার করিতে দেখিতে পাই যে, যদি আমি আমার পিতৃদেবকে না দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে বিষয়কার্য্যের কেন্দ্রস্থানে থাকিয়া মানুষ যে সত্যনিষ্ঠা ও সততা অধিক দিন রক্ষা করিতে পারে, তাহা আমি সহজে বিশ্বাস করিতে পারিতাম না।

স্বর্গীয় কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় নবদ্বীপের রাজাদিগের দেওয়ান বংশে ১২২৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ভবানন্দ মজুমদার অর্থাৎ সম্রাট আকবরের সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত, অল্পকাল ব্যতীত এই বংশ ঐ রাজাদিগের দেওয়ানি করিয়া আসিয়াছেন। এবং ইঁহারা রাজাদিগেরকর্ত্তৃক জ্ঞাতি কুটুম্বের ন্যায় সমাদৃত ও সম্ভাষিত হইতেন এবং অদ্যাপি হইয়া থাকেন।

সাহিত্য সম্পাদক লিখিয়াছেন—"নবদ্বীপ রাজবংশের সহিত দেওয়ানজী মহাশয়ের বংশানুক্রমিক সম্বন্ধ; সুতরাং জীবন কাহিনীর সহিত নবদ্বীপ রাজবংশের ইতিবৃত্ত স্বভাবতঃ আসিয়া পড়িয়াছে।" স্বর্গীয় কার্ত্তিকেয়চন্দ্র এই রাজাদিগের তিন পুরুষ দেওয়ানি করিয়াছিলেন। এবং তাঁহাদিগের পরিবারস্থ ব্যক্তির ন্যায় ঘনিষ্ঠ ভাবে সংসৃষ্ট ছিলেন। রাণী বলিতেন "দেওয়ান, তুমি আমার প্রথম পুত্র।" দেওয়ানজীর আত্মজীবনচরিত্রে এই রাজবংশের ভাগ্যবিপ্লব, রাজাদিগের সুমতি কুমতি, সম্পদ ও বিপদ, রাজপরিষদগণের ষড়যন্ত্র, রাজাদিগের অন্তঃপুরের প্রতিবিম্ব, রাণীদিগের ব্যবহার, রাজসংসারের নৈতিক বায়ু, প্রলোভন ও সঙ্কট—এই সমুদয়ের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এবং ইহার মধ্যে, সমুদ্রস্থিত উচ্চ শৈলশিখরের ন্যায়, দেওয়ানজীকে দেখিতে পাওয়া যায়—মহামহিম চরিত্র বলে দৃঢ়, অটল, জয়ী ও প্রশান্ত। রাজা অনুকূল হউন আর প্রতিকূলই হউন, রাণী সস্নেহ সম্ভাষণ করুন আর কর্কশ বচনই বলুন, রাজার স্বজনগণ যথার্থই অনুগত হউন অথবা তলে তলে শত্রুতাই করুন, পাপের মোহিনীমূর্ত্তি স্মিতবদনে কলকণ্ঠে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করুক অথবা অশ্রুসিক্ত নয়নে কৃপার ভিখারিণী হইয়া পদতলে লুণ্ঠিত হউক, রাজসভায় সুন্দরীগণের মদিরামধুর নৃত্যগীতের স্রোত তাঁহার চারিদিকে বহিয়া যাউক, রাজা ও তাঁহার অনুচরগণ শোণিত মাংসের দেহ যথার্থই জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে কি না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য কৌশলে কোন উর্ব্বশীকে নিশীথিনীতে দেওয়ানের শয়ন মন্দিরে প্রেরণ করুন—সকল অগ্নিপরীক্ষাতেই এই মহাপুরুষের বিশুদ্ধ চরিত্র নির্ম্মল তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় আরও উজ্জ্বলভাবে দীপ্তি পাইত। আবার অন্য দিকে চন্দ্রশেখরে অঙ্কিত প্রতাপের প্রিয়তমা বাল্যসখী পরনারী শৈবলিনীর প্রণয় উদ্বেল হইল। প্রতাপ অটল। যাঁহার আত্মজীবন চরিতে এই সকল ঘটনা বর্ণিত আছে, তিনি নিজের মুখে তাহা কখন উল্লেখ করিতেন না। কেননা বিনয় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। তাঁহার একজন মনস্বী বন্ধু আমাকে বলিয়াছিলেন—"your father combined in his character the deepest humlity with the loftiest dignity." যাঁহারা বাহিরে আত্মগরিমা করেন না, তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকেই নিজের পরিবারের সাক্ষাৎ আত্মপ্রশংসা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি কখন আমার পিতাকে নিজের পরিবারের মধ্যেও আপনার প্রশংসা করিতে শুনি নাই। আমাদিগের শিক্ষার জন্য, তিনি যেরূপে সফলতা লাভ করিয়াছেন তাহাই কখন কখন প্রয়োজন মতে বলিতেন। কিন্তু নিজের গুণের কথা বলা দূরে থাকুক, তিনি আমাদিগকে নিজে গুণের অভাবের কথাই বলিতেন। তিনি এক দিন, তাঁহার ভাল স্মরণ শক্তি নাই বলাতে, আমি বলিলাম "যদি আপনার ভাল স্মরণশক্তি না থাকে তাহা হইলে আপনি চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা মেডিকাল কালেজে পড়িয়াছিলেন, এবং যাহা পরে আর আলোচনা করেননাই—তথাপি তাহা আপনার ঠিক বেশ মনে আছে কেমন করিয়া? আমরা দুই তিন বৎসর এম, এ, পরীক্ষা দিবার সময় যাহা পড়িয়াছিলাম, তাহা ইহার মধ্যেই ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছি।" তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন—"তোমাদিগকে পরীক্ষার জন্য এক্ষণে অনেক পুস্তক পড়িতে হয় তাই তোমাদিগের মনে থাকে না। আমাদিগের সময় অল্প পুস্তক পড়িতে হইত। তাই আমার অদ্যাপি পঠিত বিষয় স্মরণ আছে।" তাহাতে আমি বলিলাম "আপনি ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে যে সব পারস্য পুস্তক পড়িয়াছেন তাহার কোন কোন স্থান এখনও আপনি অনর্গল আবৃত্তি করিতে পারেন। স্মরণশক্তি ভাল না

হইলে তাহা পারা যায় না।” তাহাতে তিনি বলিলেন, “তবে বোধ হয় অধিক বয়স হওয়াতে এক্ষণে স্মরণশক্তি কমিয়া গিয়াছে।” তাহার আত্ম জীবন চরিতে বিনয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। এক দিকে যেমন বিনয় ছিল অপর দিকে তেমনি তেজস্বিতাও ছিল। রাজা কোন অন্যায় কথা বলিলে তিনি তাহা সরলভাবে প্রতিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। একদিন রাজা শ্রীশচন্দ্র বিরক্ত হইয়া তাঁহার কথায় অসঙ্গত উত্তর দেওয়ায় দেওয়ানজী রাজাকে পারস্য কবি সেখ সাদীর একটী বচন বলিয়াছিলেন। তাহার মর্ম্ম—“হে রাজন্ আপনি ভাল উপদেশ শুনিলে তাহাতে শিক্ষা লাভ করিবেন না” ইত্যাদি। রাজা পারস্য ভাষা জানিতেন। সুতরাং কবিতার অর্থ বুঝিয়া ক্রোধ নয়নে গম্ভীর ভাবে থাকিলেন। দেওয়ানজী সেই স্থান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। রাজসভার অন্য সকলই স্তম্ভিত হইলেন। সে দিন রাজসভায় গীত বাদ্যের আয়োজন ছিল। তাহা কিছু আর হইল না। রাজা দেওয়ানের বিরক্তি ভাব দূর করিবার জন্য দুই এক ঘণ্টা পরে তাহাকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন। কিন্তু পর দিবস দেওয়ান তাহার কার্য্যে এস্তফা দিলেন। এবং তৎসঙ্গে তাঁহার বন্ধুগণ রাজার সংসর্গ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। এই ঘটনার পরে দেওয়ানের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হওয়ার পরই রাজা দেওয়ানকে একটি গান গাইতে সাগ্রহ অনুরোধ করিলেন। দেওয়ান রাজার নির্ব্বন্ধ উল্লঘন করিতে না পারিয়া একটী গান গাইলেন। তিনি তাহার অসাধারণ মধুরস্বরে, তাহার এবং রাজার মধ্যে এক্ষণে যে প্রেম বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় এই মর্ম্মে একটী গান করিলেন। রাজা কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন “না না তাহা কখন হইবে না বন্ধুত্ব চিরকালই থাকিবে।” দেওয়ান তথাপি রাজবাটীতে যাইতে অনিচ্ছুক। রাজা তখন বলিলেন “তোমার কার্য্য ত্যাগে রাণী অত্যন্ত অস্থিরা হইয়াছেন, অতএব এ বেলা তোমার রাজবাটী গিয়া আমার সহিত আহার করিতে হইবে।” রাজা এইরূপে তাহাকে সাধ্য সাধন করিয়া আবার কার্য্যে প্রবৃত্ত করিলেন। কয়েক বৎসর পরে পুনর্ব্বার রাজা একটী অন্যায় কার্য্য করিলেন। দেওয়ান প্রতিবাদ করিলেন, রাজা তাহার উপদেশ না লইয়া তাহার উপর বিরক্ত হওয়ায় দেওয়ান রাজবাটী ত্যাগ করিলেন। এই সময় রাজ পুত্রের বিয়োগ হইল। রাজা শোকাকুল, তাহার উপর পরম আত্মীয় দেওয়ানের সহিত বিচ্ছেদ। দেওয়ান নিজ বাটীতে কয়েকজন আত্মীয়ের সহিত বসিয়া আছেন, এমত সময় মহারাজা হঠাৎ তথায় আগমন করিলেন। এবং নানাবিধ সস্নেহ কথা বলিয়া তাঁহাকে রাজবাটীতে যাইতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন।

রাজা শ্রীশচন্দ্রের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্রের সময় কার্ত্তিকেয় চন্দ্র দেওয়ান হইলেন। এই রাজা তাহাকে ঠিক পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। কিন্তু অনাবৃত সত্য ও হিত কথা ধনী লোক সকল সময় শুনিয়া উঠিতে পারেন না। তজ্জন্য ইঁহার সময়ও দেওয়ান একবার পদত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু “prodigal son” যেরূপ পিতার নিকট আসিয়াছিলেন, রাজা সতীশ চন্দ্র তাঁহার দেওয়ানের নিকট সেইরূপ আসিয়াছিলেন, ও অনুতপ্ত ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। দেওয়ানও তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় ভাল বাসিতেন। কিন্তু মহারাজা বারম্বার আত্ম সংশোধনের অঙ্গীকার করিয়াও তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই। রাজা সতীশচন্দ্রের মৃত্যু হইলে যখন বিষয় কোর্ট অব ওয়ার্ডসে (court of wards) যায়, তখন দেওয়ান স্বাধীন সত্যবাদিতা হেতু একজন কমিশনারের অপ্রিয় হইয়াছিলেন। ঐ ষ্টেট সম্পর্কে কমিশনর সাহেবের ভুল হয়। ম্যানেজার (দেওয়ান) ঐ ভুল অনুমোদন না করিয়া দৃঢ়ভাবে তাহার প্রতিবাদ করেন, তাহাতে কমিশনর সাহেব অসন্তুষ্ট হন। বার্ষিক রিপোর্টে কমিশনর সাহেব এই জন্য ম্যানেজারের সমুচিত প্রশংসা না করিয়া রাজ কুমারের অভিভাবকের অমূলক প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু সুখের বিষয় স্থানীয় কালেক্টর বিজ্ঞ ষ্টীভেন্স সাহেব (যিনি পরে ছোট লাট হন) এবং বোর্ড অব রেভিনিউ (Board of Revenue) তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়ায় কমিশনরের অন্যায় প্রশংসা নিমজ্জিত হইয়া গেল। তাঁহার জীবনের কোন সত্যবাদিতায় তিনি বিপন্ন হইয়াছিলেন। প্রতি বৎসর বার্ষিক রিপোর্টে তিনি লিখিতেন যে, প্রজা ও জমিদারদিগের মধ্যে দিন দিনই পূর্ব্বের সদ্ভাব কমিয়া যাইতেছে। তিনি যখন প্রথমে এইরূপ লেখেন তখন আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম—যে তিনি এইরূপ লিখিলে গবর্ণমেণ্ট কখনই মনে করিবেন না যে তাঁহাদিগের

নিজের শাসন প্রণালী ও আইনের ফলে এই দোষ ঘটিতেছে; বরঞ্চ এই কথাই বিশ্বাস করিবেন যে তাঁহার ম্যানেজমেণ্টের দোষে এই অসদ্ভাব ঘটিতেছে। তাহাতে তিনি বলিলেন—“আমি তাহা জানি। তবে তাই বলিয়া সত্যের অপলাপ করিতে পারিব না”। তিনি অসদ্ভাবের কথা লিখিলেন। এই উক্তির প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়িল। ছোটলাট গেজেটে মন্তব্য লিখিলেন যে “প্রজা ও জমিদারের মধ্যে যে অসদ্ভাব উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে সম্ভবতঃ ম্যানেজারের দোষ আছে”। ম্যানেজার পরবর্ত্তী বার্ষিক রিপোর্টে এই কথার প্রতিবাদ করিলেন। আমি তাহার পূর্ব্বেই তাঁহাকে আবার বলিলাম, গবর্ণমেণ্ট এইরূপ প্রতিবাদে অতিশয় কুণ্ঠিত হইবেন এবং তাহাতে আপনাকে বিশেষ মনোকষ্ট পাইতে হইবে। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন “কি করি, বৃদ্ধ বয়সে যদি গবর্ণমেণ্ট আমাকে লাঞ্ছিত করেন, উপায় নাই, তবে যাহা সত্য তাহা লিখিতেই হইবে।” ছোট লাট টমসন সাহেব এইবার আরও কুণ্ঠিত হইলেন, এইবার লিখিলেন “ম্যানেজার নিজের পক্ষ সমর্থন করিতে চাহেন কিন্তু তিনি রাজবংশের নিত্য হিতাকাঙ্ক্ষী স্বীকার করিয়াও এ কথা অবশ্য বলিতে হইবে যে প্রজাদিগের অসদ্ভাব ম্যানেজারের অপটুতার জন্য ঘটিয়াছে।” একথাও ম্যানেজার নতশিরে গ্রহণ করিলেন না। একজন ডেপুটী কালেক্টরের উপর তদন্ত করিবার ভার অর্পিত হইল। শ্রদ্ধেয় ডেপুটী কালেক্টার ও দার্শনিক শ্রীযুক্ত গঙ্গানারায়ণের তদন্তে প্রকাশ পাইল যে তদন্তে প্রজাদিগের প্রতি এই জমিদারিতে যেরূপ সদয় ব্যবহার হয় তাহা অন্যত্র প্রায়ই দেখা যায় না। ছোট লাট টমসন ধর্ম্মভীরু লোক। তিনি বোধ হয় অনুভব করিলেন কাজটী অন্যায় হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট আত্মবাক্য প্রতিসংহার করিলে তাহার সম্মান রক্ষা হয় না। সেই জন্য বোধ হয় গেজেটে এই ফল উল্লেখ করা হইল না। কিন্তু ছোট লাট তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উদারতা বশতঃ প্রকারান্তরে তাঁহার ভ্রম স্বীকার করিয়া দেওয়ানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষে ছোট লাট কৃষ্ণনগরে আসিলেন। কৃষ্ণনগরের প্রধান প্রধান ভদ্র লোকগণ তাহার দরবারে উপস্থিত হন। তিনি শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায় বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন “দেওয়ান কোথায়?” রায় বাহাদুর বলিলেন “তিনি পীড়িত, তজ্জন্য আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে পারেন নাই।” ছোটলাট বলিলেন “আমি সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার নিকট যাইব, তিনি কোথায় আছেন?” পীড়িত অবস্থায় নিজের বাটীতে ছোটলাটকে সমুচিত অভ্যর্থনা করা বড়ই দুঃসাধ্য হইত। বিজ্ঞ রায় বাহাদুর বলিলেন “তিনি বাটীতে আছেন, কিন্তু—তাঁহার বাটী রাজবাটীর অতি নিকট। কল্য রাজবাটীতে তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হইবেন।” দেওয়ানজীকে আসিয়া তাহাই বলিলেন। তাহার পর দিন দেওয়ানজী রাজবাটীর একটী প্রকোষ্ঠে পীড়িত শরীরে একখানি সোফার উপর শয়ন করিয়া আছেন। ছোটলাট একজন মাত্র এডিকং সঙ্গে করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। ইহা কম সম্মানের বিষয় নহে। দেওয়ান তাঁহাকে দেখিয়া কষ্টে উত্থান করিলেন। ছোটলাট “বসুন” বলিয়া হাত ধরিয়া তাঁহাকে বসাইলেন। রাজকুমার এবং শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায় বাহাদুর উপস্থিত ছিলেন। দেওয়ানকে নানাবিধ আত্মীয়তাসূচক কথা বলার পর রাজকুমারকে ছোটলাট বলিলেন “দেখ, তোমার জমিদারি এই দেওয়ানের হস্তে আছে, ইহা তোমার পরম সৌভাগ্য জানিবে। আমি ভরসা করি ইনি যতদিন জীবিত থাকিবেন, তুমি তোমার পিতা এবং পিতামহের ন্যায় ইঁহাকে সম্মান করিবে।” এই ঘটনার কয়েক দিবস পরেই দেওয়ান ইহ লোক পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে কৃষ্ণনগরবাসী প্রধান লোকের মধ্যে যাঁহারা সংবাদ পাইয়াছিলেন প্রায় সকলেই তাঁহার বাটীতে উপস্থিত ছিলেন। মৃত্যুর অন্ধকারময় ছায়া যখন সেই গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, তখন তিনি বুঝিয়াছেন জীবনের আর আশা নাই, তখন তাঁহার একজন বন্ধু তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলেন—“দেওয়ানজী ভয় কি!” তিনি প্রশান্তভাবে ঈষৎ হাস্যবদনে উত্তর দিলেন “ভয় কিসের? এইত মৃত্যুর উপযুক্ত সময়” এই কথা বলিবার দশ মিনিট পরে তিনি স্বর্গারোহণ করিলেন। মৃত্যু সময়েও সাধু ব্যক্তির কেমন প্রশান্ত নির্ভীক ভাব!

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

বিচিত্র সংগ্রহ।

(১)

সাপ।

ময়মনসিংহ জেলার—নেত্রকোণা সবডিবিসনের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে একবার এক অপরূপ দৃশ্য ঘটিয়াছিল। এক যুবতী নারী একদিন মধ্যাহ্নে আপন গৃহে অন্যমনস্ক হইয়া রন্ধন করিতেছিল,—হঠাৎ একটা সাপ আসিয়া তাহাকে বন্ধন করিয়া ফেলিল। এত অল্প সময়ের মধ্যে তাহার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাঁধিয়া ফেলিল যে, বেচারী চীৎকার করিবারও সময় পাইল না। তাহার

হাত পা সমস্ত অসার হইয়া গেল; সর্প ফণা ধরিয়া তাহাকে দংশন করিবার জন্য বারংবার জিভ্ বাহির করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর তাহার জননী আসিয়া এ দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে চীৎকার করিয়া পাড়ার লোকজন জড় করিল, কিন্তু সাপ কিছুতেই তাহার বন্ধন খুলিয়া দিল না। কেবল পূর্ব্ববৎ জিভ বাহির করিতে লাগিল। উপস্থিত নরনারী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পর যখন অধিকাংশ লোক চলিয়া গেল—তখন সাপটা আস্তে আস্তে সমস্ত পাশ খুলিয়া দিয়া একদিকে ছুটিয়া পলায়ন করিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের নিকটবর্ত্তী কোন সাবডিবিসনে একবার এই প্রকার এক অপরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। তথাকার এণ্ট্রান্স স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় সেখানে সপরিবারে বাস করিতেন। একদিন শিক্ষক-পত্নী আপনার শিশু পুত্রটীকে ঘরের মেঝেয় শুয়াইয়া রাখিয়া কার্য্যান্তরে গিয়াছিলেন। আসিয়া দেখেন একটা কেউটে সাপ

খোকাকে বেষ্টন করিয়া ফণা ধরিয়া রহিয়াছে। তিনি এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলেন। চীৎকার শুনিয়া সকলে ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু কেহই সাহস করিয়া কিছু করিতে পারিলেন না। সাপটাকে মারিতে গেলে—শিশু যায়! কাজেই সকলে ভয় বিহ্বল চিত্তে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পর সাপটা উল্লিখিত ঘটনার ন্যায় তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। শিশুর কোন অনিষ্ট হয় নাই।

(২)

পোষা চিতা।

দাক্ষিণাত্যের কোন রাজার একটি পোষা চিতা বাঘের প্রশংসা করিয়া শ্রীমতী পোলার্ড কোন বিলাতী কাগজে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইনি কোথাকার রাজা, তাহা তিনি বলেন নাই; তবে তাঁহার নাম রাজা ব্যোমদেব ভেঙ্কটা নরসুম্ব নাইডু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পোষা চিতাটা নাকি রাজার একান্ত আজ্ঞাকারী। প্রভুর ইঙ্গিত পাইলেই সে অনায়াসে হরিণ, শূকর ও অন্যান্য জানোয়ার ধরিয়া আনিতে পারে। চিতাটী দেখিতে অতি ভয়ানক, কিন্তু তাহার প্রভুর সহিত নিরীহ মেষশাবকের ন্যায় ব্যবহার করে!

(৩)

গণৎকার দস্যু।

প্রাচীনকালে আমাদের দেশের দস্যুরা কালীপূজা না করিয়া এবং শুভাশুভ গণনা না করিয়া কোথাও দস্যুবৃত্তি করিতে যাইত না। সম্প্রতি শুনিতে পাই, সুমাত্রা-দ্বীপেও নাকি আজ কাল এই শ্রেণীর এক প্রকার দস্যু আছে, তাহারাও শুভাশুভ গণনা না করিয়া কোথাও দস্যুবৃত্তি করিতে যায় না। ইহারা একখানি কাষ্ঠ ফলকের উপর খড়ি দিয়া শুভাশুভ গণনা করে। পাঠক পাঠিকার কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য তাহার একখানি প্রতিলিপি এই স্থানে প্রকাশিত হইল।

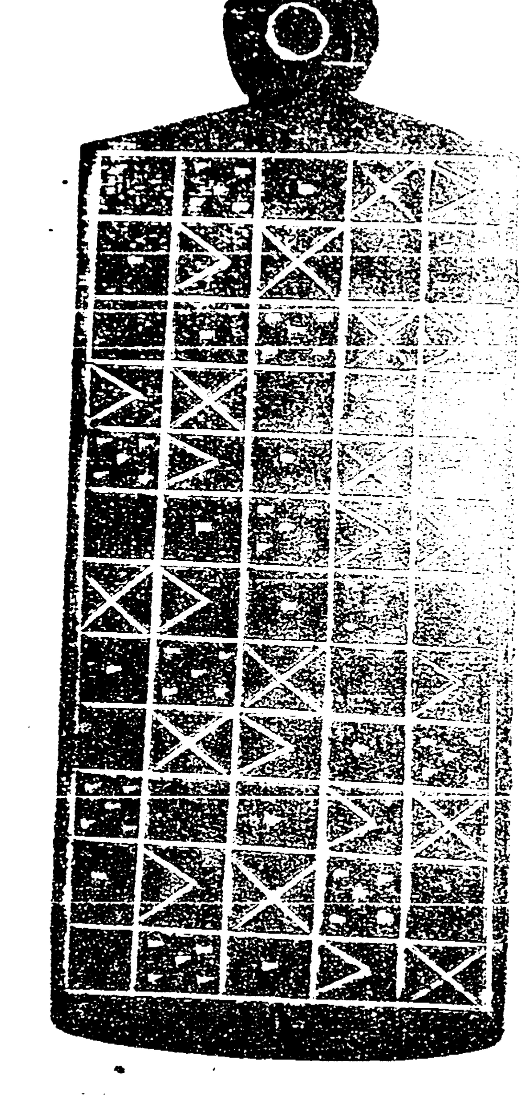

(৪)

অদ্ভুত বৌদ্ধ মন্দির।

ব্রহ্মদেশে একটি অদ্ভুত বৌদ্ধ মন্দির আছে। হঠাৎ দেখিলে মনে হইবে বিধাতা আপন হস্তে একটি বৃক্ষকে

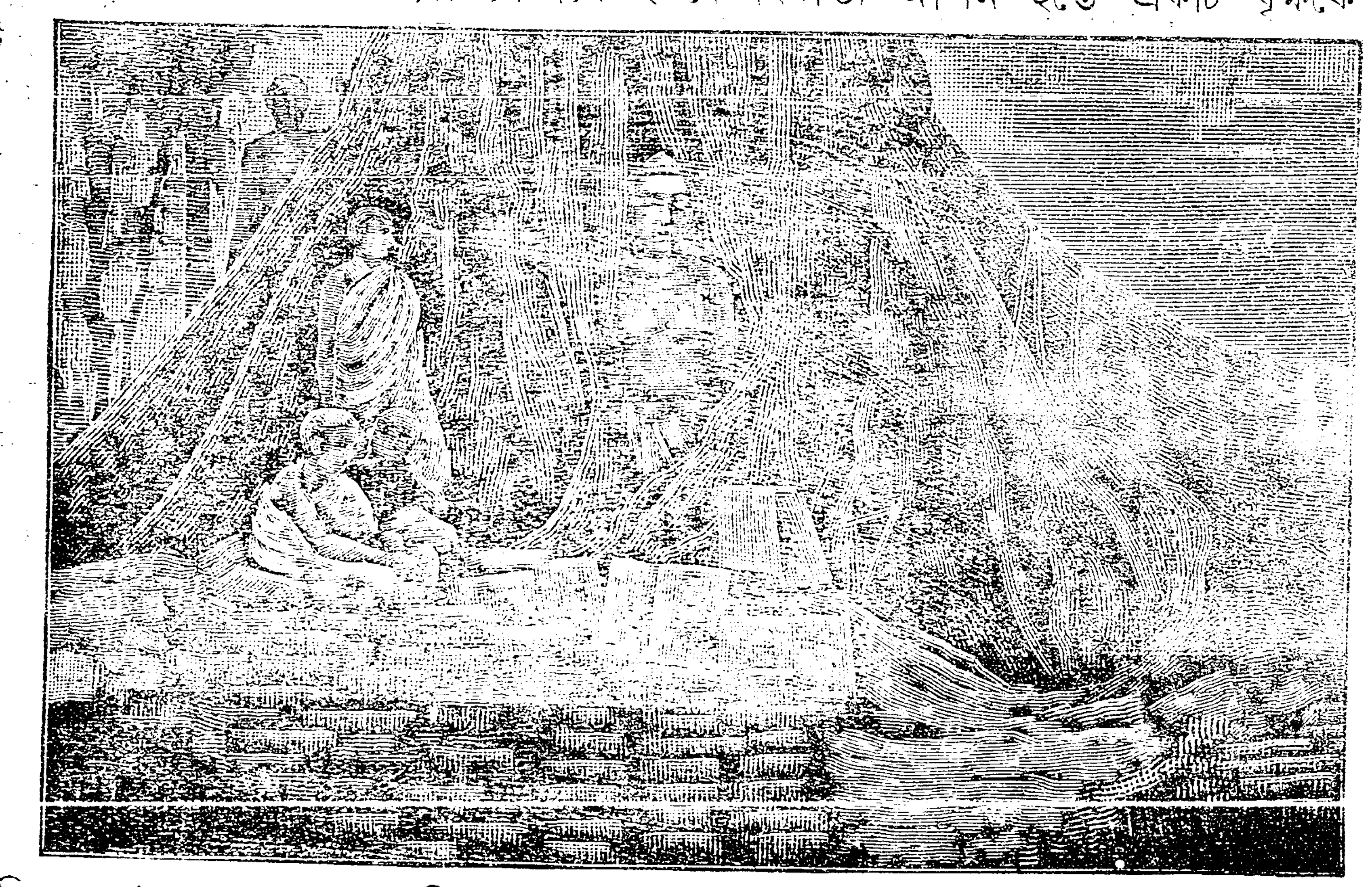

মন্দিররূপে সৃজন করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস জানিলে বিস্মিত হইবার কোন কারণই থাকে না। পূর্ব্বে এই স্থানে একটি ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীন মন্দির ছিল। কিছু কাল পর মন্দিরের উপরিভাগে এই গাছটি জন্মে এবং ক্রমে ক্রমে ইষ্টক রাশিকে গ্রাস করিয়া স্বয়ং মন্দিরের স্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এখন একখানিও পুরাতন ইষ্টক আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

শব্দ চরিত্র ।

ইত্যাদি ও প্রভৃতি ।

জানি না বাঙ্গালী লেখক ও বক্তাদের কি দুর্দ্দশা ঘটিত, যদি বাঙ্গালা শব্দ সমাজে "ইত্যাদি ও প্রভৃতি" আমরা দু ভাই না থাকিতাম।

কলিকাতায় বরের সজ্জা ভাড়ায় মিলে, সেই ভাড়াটিয়া পোষাক পরিয়া গেলে বরকে রাস্তার লোকে গরিব বলিয়া বুঝিতে পারে না, আমরা দু ভাই ভাড়াটিয়া পোষাকের মতন লেখক ও বক্তার দরিদ্রতা সহজে দেখিতে দেই না। বাগ্মীপ্রবর বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়াইয়াছেন, সকল শাস্ত্র সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিদ্যা প্রকাশ করিতে হইবে, কিন্তু কোন শাস্ত্রেরই কিছু জানা নাই। আমরা আসিয়া বলিলাম "তোমার ভয় কি? আমরা দু ভাই তোমার সহায় আছি, তুমি যাহা কিছু বলিতে চাও কিছুতেই আটকাইবে না।" তখন ভরসা পাইয়া বক্তা আপনার বিদ্যা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বলিলেন;—"মহোদয়গণ, মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রভৃতি পুরাণ প্রণেতাগণ, কপিল প্রভৃতি দার্শনিকগণ, যে সকল গভীর গবেষণাপূর্ণ তত্ত্বরত্ন ভারত ভাণ্ডারে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, কর্ম্মবাদ, পুনর্জ্জন্মবাদ ইত্যাদি সুগভীর তত্ত্বের যে সকল যুক্তিযুক্ত সরল মিমাংসা করিয়াছেন, মোক্ষমূলর প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহা সন্দর্শন করিয়া মোহিত ও স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন। এদেশীয় লোকেরা যে ঐতিহাসিক চর্চ্চায় অপারক বা অমনোযোগী ছিলেন, রাজ তরঙ্গিণী প্রভৃতি গ্রন্থ সে কলঙ্কও অপনোদন করিয়াছে। ইত্যাদি ইত্যাদি।"

বলা বাহুল্য যে বক্তা ধর্ম্মশাস্ত্রকারের মধ্যে মনু, পুরাণকারের মধ্যে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, দার্শনিকের মধ্যে কপিল এবং ইতিহাসের মধ্যে কেবল রাজ তরঙ্গিণীর নামই জানিতেন, তিনি কর্ম্মবাদ এবং পুনর্জ্জন্মবাদের কথাই শুনিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা দু ভাই তাহার সমস্ত দারিদ্র্য ঘুচাইয়া তাহাকে কেমন সুন্দর পোষাকে সাজাইলাম, এই জরিখচিত কিংখাপের অঙ্গাবরণের অভ্যন্তরে যে ছিন্ন জীর্ণ মলিন বসন আছে তাহা কাহাকেও দেখিতে দিলাম না। কোনও গ্রন্থের সমালোচনা করিতে হইবে, গ্রন্থকারের সহিত সমালোচকের বহুদিন হইতে মনোমালিন্য আছে—কিন্তু গ্রন্থখানি খুঁজিয়া সমালোচক বিশেষ দোষ কিছু পাইতেছেন না, মক্ষিকা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া দু একটী সামান্য ব্রণ বাহির করিলেন, কিন্তু ততটুকু দেখাইলে ত মনের তৃপ্তি হয় না, কাজেই তিনি আমাদের আশ্রয় লইলেন; লিখিলেন—"গ্রন্থখানি দোষের আকর বলিলেই হয়, ইহার দোষরাশি উদ্ধৃত করিয়া আমরা আমাদের পত্রকে কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করি না, তবে পাঠকগণের প্রত্যয়ের জন্য কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম, * * ইত্যাদি ইত্যাদি।"

যে গ্রন্থের গুণ ব্যাখ্যা করিতে হইবে, তাহার ত গুণ মেলাই ভার, কষ্টে সৃষ্টে অনেক খুঁজিয়া একটী কবিতার কোন অংশ ভালই পাওয়া গিয়াছে, সেটুকুই উদ্ধৃত করিয়া সমালোচক লিখিলেন,—"ইত্যাদি কবিতা যে কি মধুর তাহা সমগ্র গ্রন্থখানি পাঠ না করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন না!

কোনও ব্যক্তিকে জনসমাজে নিন্দনীয় করিতে হইবে, তাহার ত একটি বই দোষ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, আমরা বলিলাম ভয় কি? আমরা একেও বহু করিতে পারি, আমাদের আশ্রয় গ্রহণ কর। লেখক লিখিলেন, অমুক ব্যক্তি যশ লিপ্সা ইত্যাদি দোষে সাধারণের ঘৃণার পাত্র হইয়াছেন।

দেখ আমরা মিথ্যাকথা বলি না, কিন্তু দিনকে রাত করি। আমরা মূর্খকে পণ্ডিত করি, অনভিজ্ঞকে বিজ্ঞ করি। আমরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িয়া উড়িয়া ভাষা পুষ্পোদ্যানের যেখানে সেখানে বসি, আমাদিগকে বাধা দিতে বা তাড়াইতে কাহারও সাধ্য নাই। বক্তার যখন ভাষা জোটে না, আমরা তখন ভাষা যোগাই, লেখকের যখন দৃষ্টান্ত জোটে না আমরা তখন উপমা জুটাই। আমাদিগকে কিছু বলিতে হয় না, আমরা একবার আসন গ্রহণ করিলেই অপূর্ণ ভাব পূর্ণ হইয়া যায়, আয়াসের কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন হয়। অনেক কাজ আমরা অল্পে করি। আমরা পদ্মাবিহারী কুমীরের মত মাথা একটু খানি উচ্চ করিয়া দেখা দেই বটে, কিন্তু আমাদের পুচ্ছ গভীর জলের ভিতর অনেক দূরে থাকে। তুমি ইচ্ছা করিলে আমাদের পেটে চারি বেদ চতুর্দ্দশ পুরাণ পুরিয়া রাখিতে পার। আমাদের দোহাই দিয়া তুমি অনেক প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইতে পার। এই পূজার বাজারে প্রোষিত ভর্তিকা যুবতীগণ চাকুরীয়া স্বামীর নিকট জিনিসের ফর্দ্দ পাঠাইতে সহস্র জিনিসের নাম লিখিয়া আর কি লিখিবে ভাবিয়া যখন কূল কিনারা না পায়, তখন আমাদেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ইত্যাদি কি প্রভৃতি লিখিয়া হাঁপ ছাড়িয়া রক্ষা পায়! গরিব কেরাণী স্বামী বেচারি প্রণয়িণীর পত্রের প্রত্যুত্তরে দু চারি দফা জিনিসের নাম করিয়া ইত্যাদি কি প্রভৃতি আনিতে চেষ্টা করিব বলিয়া খালাস পায়। কোনও বক্তৃতা মঞ্চে, কি সাহিত্য সভায় বিপক্ষগণ তোমার বক্তৃতার কি প্রবন্ধের দোষ গুণের সমালোচনা করিয়া যখন তোমাকে কৈফিয়তের গারদে ফেলে, তখন তোমাকে জামিনে খালাস করিতে আমরা বই আর বান্ধব আছে কি? আমরা লেখক ও বক্তার চিরসঙ্গী, কেবল সঙ্গী নহে পরম বান্ধব। ধর্ম্মে অধর্ম্মে, সদ্ভাবে অসদ্ভাবে, নিন্দা যশে, স্বার্থে পরার্থে, সুখে দুঃখে, সভা সমাজে, গৃহে আফিসে, যেখানে যে ভাবে তুমি থাকিবে সর্ব্বত্র সকল অবস্থায়ই আমরা তোমার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। আমরা নির্লিপ্ত। তোমরা ভোঁদর দেখিয়াছ? তাহারা অগাধ জলে ডুবিয়া মৎস্য ধরে, কিন্তু তাহাদের গায়ের লোমগুলি এমনি চিক্কণ যে তাহাতে জল বাধে না, আমরাও অগাধ ভাব সাগরে ডুবিয়া যাই কিন্তু কোনও ভাবই গায়ে মাখি না। একটি কাজ আমাদের কাছে পাইবে না। আমরা কখনও ষোল আনা কথা প্রাণ খুলে বলি না। আমাদের এক আনা মুখে, আর পনর আনা পেটে। বাঙ্গালার কোনও প্রসিদ্ধ লেখক "সাধনা ও সিদ্ধি" লিখিতে গিয়া মন্ত্র গুপ্তিকেই সিদ্ধিলাভের প্রধান সহায় বলিয়াছেন, আমরাও মন্ত্রগুপ্তি বলেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছি। আমরা পরিশ্রান্ত ভাষা রাণীর বিশ্রাম বেদী। আমরা যখন চুপ করি তখনই আমাদের কথা আরম্ভ হয়, তুমি চৌদ্দ বৎসর ভাবিয়াও আমাদের নীরব ভাবার আদি অন্ত পাইবে না। আমরা ভাষা ফলাহারে পাঁপর ভাজা; যখন খাও, যে জিনিসের সঙ্গে খাও, রস ভঙ্গ হইবে না। আত্ম প্রশংসা বেশী করা ভাল নয়, বস্তুতঃ আমাদের নিজের গুণের আমরাই পার পাই না, অন্যে কি বুঝিবে? আমাদের গুণ বলিতে গেলে বলিতে হয় প্রভৃতি প্রভৃতি, প্রভৃতি ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।"

আমরা দুটি ভাই কিন্তু আমাদের আকৃতি প্রকৃতি ঠিক এক রকম নয়। আমি ইত্যাদি কাহাকেও ভয় করি না, কাহারও ধার ধারি না। আমি কথা বলিতে এমনি দৃঢ় করিয়া বলি যে তাহাতে সংশয়ের লেশ থাকে না, আমি ভীমের মতন গদা তুলিয়া ভাষা কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করি, কখনও পিছু হাঁটি না, আমি কাহারও বুকে বুক ঠেকাইয়া চলিতে ভয় করি না। আমার কনিষ্ঠ "প্রভৃতি" কিন্তু নরম মেজাজের লোক, সে একটু লাজুক, সে একটু পাশ কাটিয়া চলে। ভাষা পুষ্পোদ্যানে আমাকে যদি কেতকী বল, তাহাকে তবে জুঁই বলিবে, ভাষা কুরুক্ষেত্রে আমাকে যদি ভীম বল—তাহাকে তবে সহদেব বলিবে। আমরা সর্ব্বদা এই গান গাহিয়া বেড়াই—

ভাষা পুষ্পবনে আমরা দু ভাই
যে বনে কেউ চরে না সেই গহনে আমরা বেড়াই
আমাদের কে পায় অন্ত, কেবা পায় আদি
দুটী ভাই "প্রভৃতি" আর "ইত্যাদি"।
আমরা কূলে কূলে বিহার করি অতল জলে ডুবে যাই।

২৬ নং স্কট্স্ লেন্, ভারতমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত ও ২০৮।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস দ্বারা প্রকাশিত।

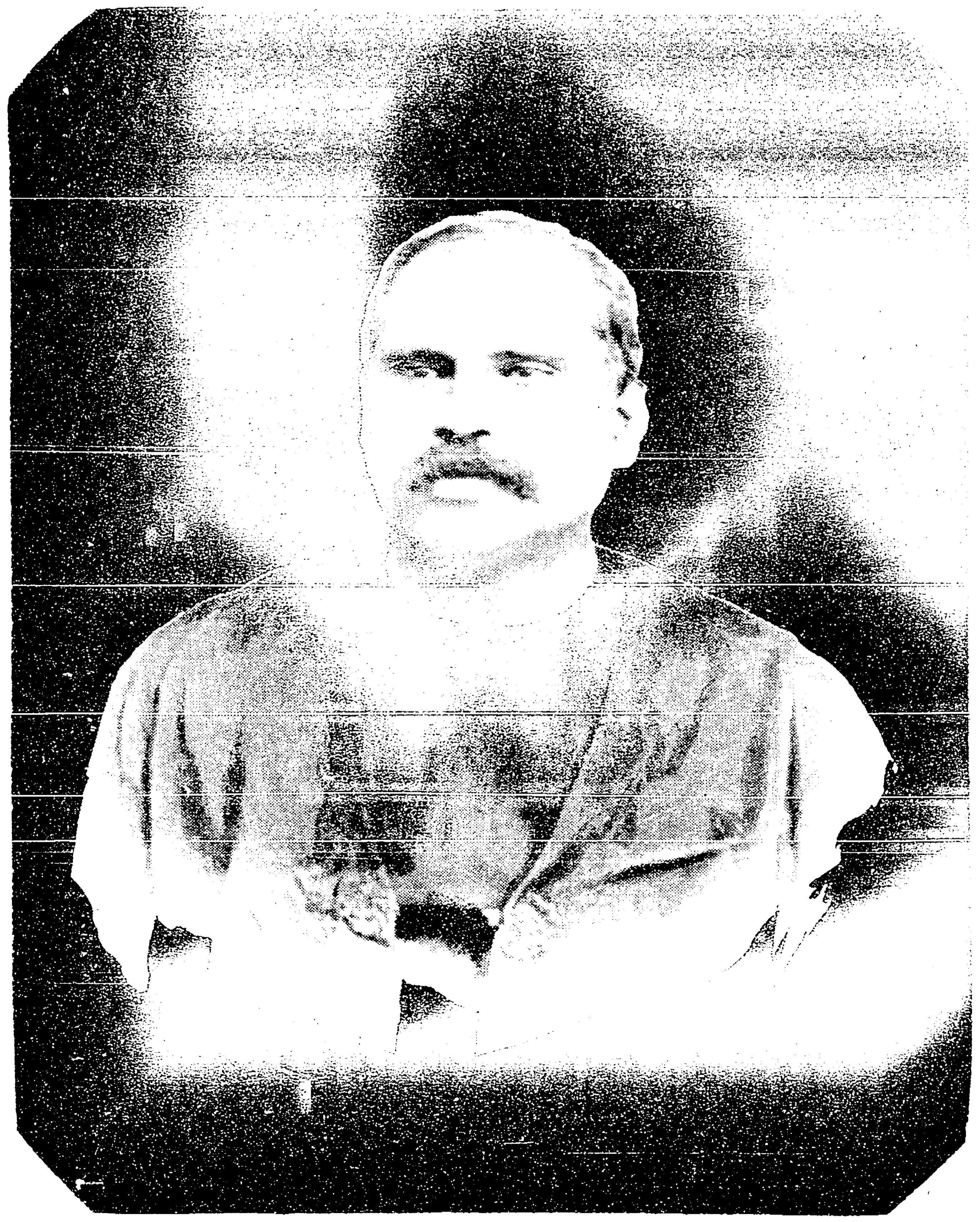

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম্‌. এ. বি এল্‌।

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

তৃতীয় ভাগ। } অগ্রহায়ণ, ১৩০৭। {১২শ সংখ্যা।

৺নিত্যকৃষ্ণ বসু।

(২৯শে আষাঢ়, ১৩০৭)

হে নিত্য, অনিত্য সব—সকলি দুদিন !
সেই প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-করুণ অন্তর,
দারিদ্র্যের মৃদুগর্ব্বে চরিত্র সুন্দর,
সারল্যে সরল অতি, কর্ত্তব্যে প্রবীণ।
ধীর ভাষা, স্থির আশা, জ্ঞান সর্ব্বাঙ্গীন,
সংসারের সুখে দুঃখে সদা অকাতর,
জীবন-পাবন-যোগে মগ্ন নিরন্তর,
হৃদয়ে অজেয় বীর, বিশ্বে উদাসীন।

হে সুহৃদ, গেলে কোন্‌ মানসের তীরে
নবীন প্রভাতে ল'য়ে নব জাগরণ !
মাথায়ে দুখানি পাখা পরাগে শিশিরে
বাঁধিয়া নয়নে স্বপ্ন, মুখে গুঞ্জরণ।
বাণীর চরণ-পদ্ম ঘিরে ঘিরে ঘিরে
করিতে জীবন-গীত পূর্ণ সমাপন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

স্বপন্‌।

এক দিন হেমন্তের কনক উষায়,
বিজন হৃদয়ে মোর স্বপনের গীতি ;
দোলেরে হৃদয় দোলে, স্বপন্‌ আশায়
মনে পড়ে মোর পূর্ব্ব জনমের স্মৃতি !

কত প্রেম, কত সুখ, কত আকুলতা,
জন্ম জন্মান্তের কত অভিমান লাজ,
কত জনমের কত মরম বারতা,—
মধুর স্বপন্‌রূপে দেখা দিল আজ !

তুমি কি এসেছ আজি বাঁধিতে আমায়,
আনত আঁখির তলে আঁচলের ছায় ?
সে আসেনি,—আসিয়াছে মৃণাল আসনা,
সে এলনা,—এল তার মধুর স্বপন্‌।

যুগ যুগান্তের কত বিস্মৃত বাসনা,
স্বপনের মাঝে এই মধুর মিলন।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মজুমদার।

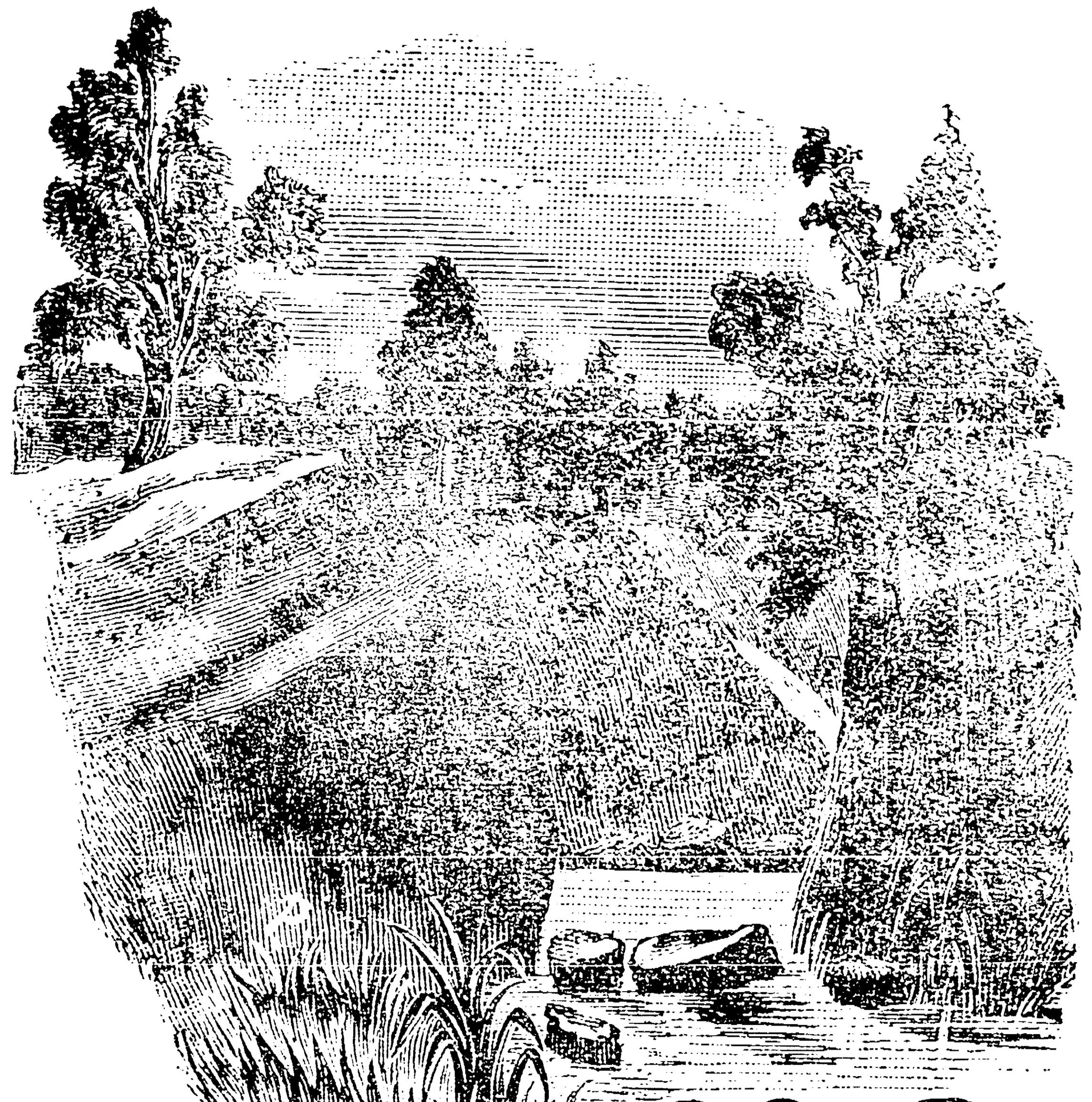

গিরিনদী

গিরিমূলে অন্ধকার শাল বনচ্ছায়,
বহিয়া আসিছ ধীরে দিবস যামিনী ;
কে তুমি গো কল ভাষে চলেছ কোথায়
পাষাণ বুকের মাঝে করুণা বাহিণী !
বেদনা ব্যথিত প্রাণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
গৃহ ত্যজি আসিয়াছ অভিমান করে ;
চারি দিকে প্রিয়জন পথ আগুলিয়া
নিফলে তোমারে সাধে ফিরে যেতে ঘরে।
ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে কোথা আছাড়ি পড়িছ,
ক্ষুব্ধ ব্যাকুলিত বন কাতর ক্রন্দনে ;
কোথাও বা সমতলে নিঃশব্দে বহিছ,
নিষণ্ণ জীবন যেন মূর্চ্ছিত পুলিনে।
তুমি গো কবির কোন করুণ কাহিনী,
পাষাণ গলিয়া কত এসেছ না জানি !

শ্রীপঙ্কজিনী দত্ত।

নর্স্ জাতির পুরাবৃত্ত।*

রোম সাম্রাজ্যের অধঃপতনকালে যে সকল বর্ব্বর জাতির অভ্যুত্থানে ইউরোপে এক অভিনব যুগ উপস্থিত হইয়াছিল, সুদূর উত্তর দেশবাসী ডেন্‌স বা নর্থমেন তাহাদিগের অন্যতম। ইহাদিগের আদি নিবাস মেরুদেশ সন্নিবর্ত্তী স্কাণ্ডিনেভিয়া ও ডেনমার্ক। প্রকৃতির দারুণ ও ভীষণ ভাবনিচয় যেন এই স্থানে একত্র সন্নিবিষ্ট। বৎসরের অর্দ্ধভাগ তপনদেব আকাশের অধোভাগে অবস্থিতি করেন ; কয়েক মাস উদিত হইয়া থাকেন বটে, কিন্তু তখনও দিঙ্‌মণ্ডল পাংশুবর্ণ কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন থাকে। গ্রীষ্মেও সূর্য্যালোক তাপবিহীন ; উপত্যকাসমূহে সমাহৃত তুষারস্তূপসমূহ কথঞ্চিৎ অপসারিত হয় মাত্র। দুই দিকে প্রচণ্ড সমুদ্রের অবিরল তটাভিঘাতে উপকূলসমূহ প্রতিক্ষণে চূর্ণিত হইয়া সমুদ্রগর্ভে বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে। স্থানে স্থানে দুই একটী কঠিন গিরিশৃঙ্গ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধ্বংসস্তূপবক্ষে প্রবহমানা ফেনসঙ্কুলা কল্লোলিনীর মধ্যে অর্দ্ধ নিমগ্ন হইয়া ক্লিষ্ট শরীরে এখনও প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিতেছে। প্রায়শঃ বেলাভূমি খণ্ডিত হইয়া দীর্ঘ দীর্ঘ শৈল সমাকুল অন্তরীপমালায় পরিণত হইয়াছে। এই জনপদ সমূহের অভ্যন্তরভাগও জনহীন বিস্তীর্ণ অরণ্যানীতে পরিপূর্ণ। এই সকল উত্তরদেশীয় অরণ্যে পাইন, সিডার প্রভৃতি বিশাল পার্ব্বত্য তরু, এবং সাইপ্রেসাদি অবনতশাখ বিষাদপ্রতিম বৃক্ষরাজিই অধিক। পাঠক একজন বিদেশীয় লেখকের “Pine Forests on the Jura” পড়িয়া থাকিবেন। সেই অপূর্ব্ব চিত্র একবার কল্পনায় আনয়ন করুন, এই উত্তরদেশীয় অরণ্যের সহিত অনেক মিলিবে। এই সকল নির্জন বনভূমি আবার বৃহদাকার শ্বেত ঋক্ষ প্রভৃতি ভয়াবহ হিংস্র-শ্বাপদসঙ্কুল।

ডোভরফিল্ড্ পর্ব্বতমালার বিস্তৃত সানুদেশ প্রায় এই জাতীয় অরণ্যেই পরিপূর্ণ। কেবল সুদূর উত্তরে ল্যাপ্‌লাণ্ড ও ফিন্‌লাণ্ড প্রদেশে বৃক্ষাবলী একেবারে বিরল ; শুধু দিগন্ত প্রসারী উজ্জ্বল তুষাররাশি উত্তরাকাশে উদিত অপূর্ব্ব আলোকাবলীর (Aurora Borealis) শুভ্র জ্যোতিতে দীপ্তি পাইতেছে এবং তাহার উপর বল্‌গা হরিণ শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে স্বচ্ছন্দে ধাবিত হইতেছে। প্রকৃতই এই ভূখণ্ডের প্রাকৃতিক দৃশ্য নিচয় সর্ব্বথা কঠোর গাম্ভীর্য্যপূর্ণ এবং অপূর্ব্ব বিস্ময়োৎপাদক।

---

* প্রকৃত পক্ষে এই জাতির ভাষাই ‘নর্স্’ নামে পরিচিত। কিন্তু আমরা নামটীর ক্ষুদ্রত্ব এবং উপযোগিতা দেখিয়া এই জাতিকেও উক্ত নামে অভিহিত করিলাম।

* Ruskin.

জাতীয় চরিত্র সর্ব্বদা স্বদেশীয় প্রাকৃতিক এবং ভৌগোলিক অবস্থা অনুসারে গঠিত হইয়া থাকে।

সমাজ, ধর্ম্ম অথবা অন্য কোন শাসন অভাবে আদিম মনুষ্যের যে সমস্ত উদ্ধমনীয় বৃত্তি বিকাশ পাইয়া থাকে, আলোচ্য ঐতিহাসিক নর্সজাতি সেই সকলের পূর্ণ স্ফূর্ত্তির চিত্র। কিন্তু তথাপি রুষোঁ কল্পিত আদিম মনুষ্যের (man in the state of nature) ন্যায় এক দিকে ইহারা সুসভ্য সামাজিক মানব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যদিও ইহারা এক পক্ষে অনিবার্য্য প্রতিহিংসা-পরায়ণতা, অতৃপ্ত পানপ্রিয়তা, কঠোর শত্রু-শোণিত-লিপ্সা প্রভৃতি বৃত্তির দৃষ্টান্ত স্থল বটে, তথাপি নৈসর্গিক সরলতা এবং তাহার আনুষঙ্গিক সত্যপ্রিয়তা, প্রভৃতি কয়েকটী গুণ ইহাদের উৎকর্ষের পরিচায়ক। ইউরোপে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে বর্ব্বর জাতিগণের (Anglo-Saxons, Franks and Goths প্রভৃতি) চরিত্র সচরাচর যেরূপ দোষগুণসম্বলিত ছিল, ইহাদেরও তদ্রূপ ছিল ; কিন্তু পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্বদেশীয় প্রাকৃতিক অবস্থা ইহাদিগের চরিত্রে নূতনত্ব সম্পাদন করিয়াছিল। সূর্য্যালোক বিরহিত ব্যাত্যাসঙ্কুল মেরু সন্নিহিত পার্ব্বত্য প্রদেশবাসীর যে সমস্ত মনোবৃত্তি এবং তদ্ব্যঞ্জক বিশ্বাস হইয়া থাকে, বহুলভাবে ইহারা তাহার পরিচয় স্থল। স্বর্গ, নরক এবং পরলোক সম্বন্ধে ইহাদের বিশ্বাস অবলম্বন করিয়া আমরা দেখাইব, যে ইহাদের চরিত্র অনেকটা ইহাদের স্বদেশানুযায়ী। তাহাদের সকল বিশ্বাসেই কেমন একটা অজ্ঞাত (mystical) কুসংস্কারের ছায়া আছে, যে তাহাদের চক্ষে সকল জিনিসই যেন সন্ধ্যার অস্ফুট আলোকে দৃষ্ট হয় ; সকল কথাতেই যেন স্মরণ হয় যে আমরা গভীর নিশীথে, মলিন চন্দ্রালোকে কোন এক দেব বা ভূতযোনির (fairies, elves witches &c.) স্বপ্নময় রাজ্যে বিচরণ করিতেছি ! এই রাজ্য যেন আরব্যোপন্যাসের কল্পনাময় পৃষ্ঠায় বর্ণিত ইন্দ্রজালের অপূর্ব্ব প্রভাব, মন্ত্রপূত ওষধি-প্রক্ষেপে বিভিন্ন যোনিতে অলৌকিক পরিবর্ত্তন প্রভৃতি এবং ভূতযোনি-সমাশ্রিত যাবতীয় কুসংস্কারের আবাস ভূমি। ইহাদের কথা স্মরণ হইলেই যেন মিল্টনের সেই চিরপরিচিত উক্তি মনে পড়ে——

——————“To dance
With Lapland witches while the labouring moon
Eclipses at their charms——————”

ইহাদের কোন লিখিত ইতিহাস নাই, কেবল প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ কিম্বা প্রচলিত আখ্যায়িকাবলী ভিন্ন ইহাদের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের আর উপায় নাই। ইহাদের বংশধর Icelandic জাতির ভাষায় রক্ষিত “এডা” (Edda) নামক একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ হইতেই আমরা প্রধানতঃ ইহাদের আচার ব্যবহার ও পৌরাণিক বিশ্বাস প্রভৃতি জানিতে পারি। “সাগা” নামে অভিহিত ইহাদের উপকথাগুলিও আমাদের অপর প্রমাণ-স্থল। আধুনিক ইংরাজ কবি William Morris ইহার কতকগুলি তাঁহার Volsunga Saga নামক গ্রন্থে অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু উচ্চতর কবি ম্যাথিউ আরন্‌লড্ ইহাদিগের সরল অপরিমার্জ্জিত আখ্যানাবলী অবলম্বনে রচিত ইংরাজী কাব্যে বিশেষ কৃতিত্বলাভ করিয়াছেন। মহাকাব্যের উপাদানে বিরচিত তাঁহার Balder Dead নামক ক্ষুদ্র কবিতা তৎসাময়িক কবিবৃন্দের দৃষ্টি বিশেষরূপে আকর্ষণ করিয়াছিল। এই কবিতা ইহাদের একটী পৌরাণিক ইতিবৃত্ত মূলক ; সুতরাং উহা হইতে আমাদিগের এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ের বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

গ্রীক জাতীয় পৌরাণিক কল্পনা নূতন নূতন সৌন্দর্য্য সৃষ্টির অপূর্ব্ব চিত্রের ন্যায় ; কাব্যকাননে ইউফ্রোজনি (Euphrosyne) প্রমুখ সুকুমার কলাগণ (Graces) নব কুসুম দাম সজ্জিত ঋতুগণ (Hours) সমন্বিত সুষমা দেবীর, (Venus) বিচিত্র বেশ অথবা বিকসিত আরণ্য পুষ্প সম্ভার হস্তে বন বালক ও বনবালা পরিবৃত বনদেবতার (Pan or Sylvames) অসাধারণ কল্পনার ন্যায় কিছু ইহাদিগের পৌরাণিক চিত্রাবলীতে প্রত্যাশা করিলে পাঠক নিরাশ হইবেন না। এখানে সিসিলিয় উদ্যানে মোহিনী প্রোসার্পিনার (Proserpina) পুষ্প আহরণের চিত্র নাই, কৌমুদী বিধৌত ল্যাট্‌মস্ (Latmos) গিরিশিখরে অনন্ত নিদ্রায় মগ্ন রূপবান্ যুবক এণ্ডিমিয়নের (Endymion) কল্পনা নাই ; এখানে আছে অন্ধকারময় কুজ্ঝটিকা, বাত্যাসঙ্কুল উর্ম্মিরাশি, তপনের ক্ষীণ মৃদু জ্যোতিঃ ও তন্মধ্যে অস্পষ্ট কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেবযোনি প্রভৃতির উন্মত্ত বিভ্রম। গ্রীক দেশীয় পৌরাণিক কল্পনা সর্ব্বদা হাস্যময়ী, প্রসন্না। ইহাদের কল্পনা সদাই ম্লান ও বিষণ্ণ। ইহাদের সৌন্দর্য্য-দেবীর (Freya) সহিত গ্রীক

ভিনাসের একবার তুলনা করিয়া দেখিলেই এই বিষয় পরিস্ফুট হইবে। ভিনাস্ সর্ব্বদা স্মিতমুখী, প্রফুল্লবদনা। হোমর তাঁহাকে হাস্যপ্রিয়া দেবী নামে অভিহিত করিয়াছেন। আর অন্য দিকে ফ্রেয়ার চিত্র উন্মোচন করুন, দেখিবেন এক বিরহ বিধুরা বিষণ্ণমুখী দেবী নিরুদ্দিষ্ট প্রিয়তমের জন্য অবিরল স্বর্ণ রেণুর ন্যায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। এই স্থানে ম্যাথিউ আরনল্ড কৃত তচ্চিত্র উদ্ধৃত করিলাম :—

"And *Freya* next came nigh with golden tears,
The novelist goddess she in Heaven by all
Most honored after *Frea* Odins wife.
Her, long ago the wandering *Oder* took
To mate, but left her to roam distant lands ;
Since then she seeks him, and weeps tears of gold."

ভিনাসের সহিত এডনিসের (Adonis) বিচ্ছেদ ভিন্ন অন্য কোন দুঃখময় ঘটনা বোধ হয় সংশ্লিষ্ট নাই, কিন্তু এই দেবী হিন্দু বিধবার ন্যায় চিরকাল শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে পূর্ব্বসুখস্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া বিষাদময় জীবন যাপন করিবার জন্যই যেন জন্মিয়াছেন।

পুনরায় গ্রীক কবিগণের উল্লিখিত বনদেবতা বনদেবীগণের শুভ কল্পনার সহিত ইহাদিগের ভীতি উদ্রেজক Norvics Valkyries প্রভৃতির পরুষ কল্পনা তুলনা করিয়া দেখুন। এই তুষারাবৃত কুজ্ঝটিকাময় রাজ্যে চিন্তার স্বাভাবিক গতি ঘোর অদৃষ্টবাদিত্বে পরিণত হয়। একারণ, ইহারা স্বতঃই ভবিষ্যৎ বাণীতে বিশ্বাস করিত এবং প্রথমোক্ত নর্নিগণকে সেই অজ্ঞাত ভবিতব্যের অদৃশ্য আবরণ উন্মোচন করিতে সক্ষম মনে করিত। Mr, F. Cay উভয়রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে ইহারাই ম্যাক্‌বেথের ডাকিনীগণের কল্পনার মূল। ইহাদেরই প্রতি "If you can look into the seeds of time and say Which grain will grow and which will not." ব্যাঙ্কোর এই বাক্য প্রকৃত পক্ষে প্রযুজ্য। ইহারা তিনটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, বৃদ্ধা দেবরাজ্ঞী (Frea) ফ্রিয়ার* সমুদ্র তীরস্থ আবাসে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া ভবিষ্যৎ বাণী করিতেছেন। কতকাংশে গ্রীক অদৃষ্ট দেবীগণের (Fates) সহিত ইহাদের তুলনা হয় বটে ; কিন্তু তাহারা বোধ হয় অপেক্ষাকৃত সুখকর কল্পনা প্রসূত। Valkyey গণের চিত্রও ইহাদের কঠোর যুদ্ধপ্রিয়তা প্রভৃতি পরুষ প্রকৃতির পরিচায়ক। এই অপূর্ব্ব স্ত্রীমূর্ত্তিগণ যুদ্ধস্থলে আসিয়া যুদ্ধের ফলাফল নির্ণয়, হতাহতের সংখ্যা পর্য্যবেক্ষণ এবং অবশেষে যুদ্ধাবসানে জেতৃগণকে লইয়া স্বর্গে প্রস্থান করে। সম্মুখ সমরে যাহারা প্রাণ বিসর্জ্জন করে তাহাদের জন্য স্বর্গের (Asgard) এক বিশেষ প্রাসাদ রক্ষিত। সেখানে পরলোকগত জেতৃগণ অহর্নিশ আহার ও পানে রত থাকেন। Scrimner নামে একটি বৃহৎকায় বরাহ আছে, তাহার মাংস অক্ষয়। ভোজনান্তে পুনর্ব্বার স্বতঃ উৎপন্ন হয়। বীরেন্দ্রগণ আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া সেই মাংস আহার করিয়া, ভোজনস্পৃহা পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে। Valkyryগণ তাঁহাদিগের সুরাপাত্র পূর্ণ করিয়া দেয়। তুষারময় কষ্ট-লভ্যাহার দেশের অধিবাসিগণ ইহা অপেক্ষা উচ্চতর স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে না। এডা গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে——

"All night they ate the boar Scrimmer's flesh
And mead out of skulls with golden rims."

শেষোক্ত চিত্র কি ভয়ানক ! প্রতিহিংসা বৃত্তির কি বিকট চরিতার্থতা ! কেবল জীবিতাবস্থায় বৈরনির্য্যাতনে ক্ষান্তি নাই, মৃত শত্রুর কপালও পানকালীন খর্পররূপে ব্যবহৃত হইবে !

এইত গেল উহাদের স্বর্গের কল্পনা। নরক সম্বন্ধেও উহাদের বিশ্বাস তদনুযায়ী : এক দিকে সেই নিষ্ঠুর যুদ্ধস্পৃহা এবং শোণিত পিপাসার পরিচায়ক, অন্য দিকে বিষাদের ঘোর অন্ধকার-বিজৃম্ভিত এবং অসীম নৈরাশ্য-পরিব্যঞ্জক ! সম্মুখ সমরে যাহারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছে, কিম্বা প্রতিহিংসাচরণে যাহারা বিরত, অথবা যুদ্ধক্ষেত্রের বাহিরে যাহারা স্বাভাবিক রোগাদি হেতু প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহারাই এই নরকের অধিবাসী। এই নরক পৃথিবী বেষ্টনকারী সমুদ্রের পরপারে তুষাররাশি অতিক্রম করিয়া নয়টী অন্ধকারময় রাজ্য ব্যাপিয়া অবস্থিত। নরকের রাজ্ঞী হিলা (Hela) অহঙ্কৃতা, অধোবদনা, নিশ্চলা, নির্বচনা,

* সৌন্দর্য্য দেবী পূর্ব্বোক্ত Freya হইতে বিভিন্ন। ইনি দেবরাজ ওডিনের মহিষী।

ও কতকটা প্লুটো (Pluto) মহিষী প্রোসারপিনার মত বটে, কিন্তু ইঁহার মানব প্রকৃতির সহিত কোন সংস্রব নাই ; ইনি অবিচলিত হস্তে মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগ করেন। দেব এবং মানবজাতির উচ্ছেদই ইঁহার অভিলষিত ; ইঁহার পিতা লক্ বা লকি হিব্রু কল্পনার মহদ্বিদ্বেষীভূত সয়তানের সহিত তুলনীয়। যাহা কিছু সৎ বা দেবতাদিগের অনুগৃহীত, ইহারা উভয়েই তাহার প্রবল শত্রু এবং নানা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও তাহার সহিত নিরত সংগ্রামে প্রবৃত্ত। ইঁহারা আশা করেন যে সুদূর ভবিষ্যতে দেবতার রাজ্য বিনষ্ট হইয়া কিছু দিনের জন্য সয়তানের রাজ্য সংস্থাপিত হইবে। এইরূপ বিশ্বাস পূর্ব্বকথিত তদ্দেশসুলভ নৈতিক নৈরাশ্যের পরিচায়ক। মানবজীবনে কতবার আমরা দেখিতে পাই, মনুষ্যের পশুভাব কর্ত্তৃক দেবভাব বিজিত হইতেছে। এই সয়তান (Loki) এবং মৃত্যু (Hela) কর্ত্তৃক দেবতার রাজ্য উচ্ছেদ হওয়ার চিত্র আর কিছুই নহে, সেই চিরপরিচিত নৈতিক রাজ্যের সঙ্ঘর্ষ পরিজ্ঞাপক রূপকমাত্র, মিল্‌টনের পাপ ও মৃত্যুর কল্পনাতেও আমরা উহা দেখিতে পাই। এই সুদূরভাবী মহাপ্রলয়, যাহাতে ভবিষ্যতে দেবতাদিগের রাজ্য ছারখারে যাইবে, উহাদের ভাষায় gotterdammerung এই বিকট নামে অভিহিত। যেমন সমুদ্র হইতে দূরদেশবাসী হিন্দু ও ইহুদি জাতির নিকট মহাপ্রলয় জলপ্লাবনরূপে গৃহীত হইয়াছিল, ইহা সহজেই উপলব্ধি হইবে তদ্রূপ যে এই শীতপ্রধান দেশবাসী জাতির কল্পনায় তাহাদের পরিচিত প্রকৃতির বিপরীত অর্থাৎ অগ্নিময়ী দাহিকা শক্তি হইতে উদ্ভাবী বলিয়া তাহা বিবেচিত হইবে। ইহাদের পৌরাণিক ভবিষ্যদ্বাণী মতে অগ্নিময় দক্ষিণ দেশের অধিপতি মাস্‌পেলের বংশধরগণ রাইমার নামক জনৈক দৈত্য কর্ত্তৃক মৃতদেহের পরিত্যক্ত নখবিনির্ম্মিত এক বীভৎস অর্ণবযানে আগমন পূর্ব্বক লকি ও হিলাকে ত্রৈলোক্যরাজ্যে অভিষেক করাইবে। কিন্তু ইহাদের সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী হইবে না. অথবা নৈতিক অবনতি চিরন্তন হইতে পারে না ; এই ক্ষণিক বিপ্লবের পর পুনরায় নূতন দেবতাদিগের রাজত্ব হইবে।

যেরূপ খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস মতে আদিম মনুষ্যের অধঃপতন ও তজ্জনিত অবনতির পরিমিত কাল অবসানে পুনরায় নূতন ধর্ম্মসাম্রাজ্য গঠিত হইবে, ইহাদিগেরও এই সম্বন্ধে বিশ্বাস অনেকটা তদ্রূপ। প্রলয়ের পর কেবল দুইটীমাত্র মনুষ্য (Lif and Lifdrasir.) বাঁচিবে, তাহাদের দ্বারা পুনরায় সংসারে মানব সৃষ্ট হইবে।

অতএব দূরদেশবাসী অসভ্য বর্ব্বরজাতি হইলেও পৌরাণিক বিশ্বাসাদি সম্বন্ধে সুসভ্য গ্রীক এবং এমন কি পৃথিবীর অপর প্রান্তবাসী হিন্দুজাতি হইতেও ইহারা নিতান্ত বিভিন্ন নহে। আরও কয়েকটী তুলনা দ্বারা আমরা এ বিষয়ের সমর্থন করিব। ইহাদিগের দেবমাতা ফ্রিয়ার সহিত গ্রীক দেবজননী (Rhea) এবং হিন্দুদেবমাতৃকা কশ্যপপত্নী অদিতি অনেক অংশে তুলনীয়া। সেইরূপ ইহাদের কল্পিত তপনদেব প্রভামণ্ডলোজ্জ্বল-মুকুটশোভিত সৌম্য মূর্ত্তি বলডারের সহিত গ্রীক কবির নিরুপম কল্পনা এপলো দেবের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। অবশেষে আমরা ভারতীয় আচার, ব্যবহার, কল্পনা ও বিশ্বাসাদির সহিত ইহাদের কয়েকটী বিষয়ের ঐক্য দেখাইব। উহাদিগের পৌরাণিক উপকথাসমূহের মধ্যে, আমাদের দেশের সতীদাহের ন্যায় একটী প্রথার উল্লেখ আছে। ঐ কবিতার নায়ক বলডারের মৃত্যুর পরে তাঁহার জীবিত পত্নী নান্না (Nanna) এবং তদীয় জীবিত কালে ব্যবহৃত যাবতীয় সামগ্রী (প্রধানতঃ অর্ণবযানাদি) অন্ত্যেষ্টিকালে তাহার চিতায় ভস্মীভূত করিবার কথা আছে। আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সৃষ্টি সম্বন্ধে আমাদের একটী পৌরাণিক উপাখ্যানের সহিত উহাদের এডা গ্রন্থের বিশেষ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। আমাদের শাস্ত্রে যেমন বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত মধুকৈটভ দৈত্যদ্বয়ের মেদ হইতে মেদিনীর উৎপত্তি হইয়াছে, উহাদের পৌরাণিক আখ্যান অনুসারেও দেবরাজ ওডিন নিসূদিত ইমার (Ymir) নামক দৈত্যের দেহ হইতে ভূমি, রক্ত হইতে সমুদ্র, অস্থি হইতে পর্ব্বত শ্রেণী, কেশ হইতে বৃক্ষাবলী, শীর্ষদেশ হইতে আকাশ এবং মস্তিষ্ক হইতে অভ্র মালার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া কথিত আছে।*

* মনুষ্য সৃষ্টি সম্বন্ধে ইহাদিগের বিশ্বাস বড়ই অদ্ভুত। দেবতারা সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে কয়েক খণ্ড কাষ্ঠ প্রাপ্ত হইলেন, সেই কাষ্ঠ হইতে দেবরাজ ওডিনের ইচ্ছায় মানুষ সৃষ্ট হইল। এই বৃক্ষহীন তুষারময় দেশবাসী জাতির নিকট কাষ্ঠ খণ্ডেরও সমধিক গৌরব হইবে, এবং তদনুসারে প্রাণীশ্রেষ্ঠ মানবজাতির উৎপত্তি তন্মূলক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে তাহারা সঙ্কুচিত হইবে না—ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এখনও গ্রীণলণ্ড প্রভৃতি শীত-প্রধান দেশে কাষ্ঠ মহামূল্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

আর একটী বিষয়ে হিন্দুপৌরাণিক কথার সহিত ইহাদের পুরাবৃত্তের সাদৃশ্য আছে। হিন্দু পৌরাণিকগণ কোন কল্পিত চিত্র বর্ণনা করিতে গেলে অনেকটা ইহাদের মত প্রায় অতি রঞ্জিত করিয়া ফেলেন। বাল্মীকি চিত্রিত দশমুণ্ড বিংশতিহস্ত রাবণ বিভীষণাদির কথা ছাড়িয়া দিন, হনুমানের গন্ধমাদন পর্ব্বত বহন করিয়া আনার কথা অথবা ভীম হিড়িম্বাদির অলৌকিক বলবীর্য্যাদির কথা, স্মরণ করুন, এ বিষয় পরিষ্কার হইবে। সেইরূপ ইহাদেরও কল্পনায় দেবরাজ ওডিনের বাহন (Sleipner) অষ্টপদী তুরঙ্গম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

উপসংহার কালে এই অদ্ভুত, বিচিত্র কুসংস্কারময় কল্পনা কিরূপে ইংরাজী সাহিত্যের অন্তরে অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া মধ্যযুগের কাব্যের গতি নির্ণয় করিয়াছিল, এস্থানে সে বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাস দিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই জাতির সহিত ইংরাজদিগের ভাষা এবং জাতিতে বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। অধ্যাপক গ্রিম্ নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীবিভাগ অনুসারে টিউটনিক ভাষার অন্যান্য শ্রেণী অপেক্ষা স্কাণ্ডিনেভিয়ান বিভাগের সহিত নিম্ন জর্ম্মান বিভাগের অধিকতর ঐক্য আছে। এবং ইংরাজী এই নিম্ন জর্ম্মান শ্রেণীর অন্তর্ভূত হওয়ায় স্কাণ্ডিনেভিয়ান ভাষাসমূহ উহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধি বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। বর্ণগত সাদৃশ্যানুসারেও উহারা জ্ঞাতি ভ্রাতা বলিয়া জ্ঞান হয়। এক জাতীয়ত্ব ব্যতীত এই সাদৃশ্যের বিশেষ ঐতিহাসিক কারণও নির্দ্দেশ করা যায়। ২।৩ শতাব্দী পর্য্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ নর্থমেন জাতীয় নৌদস্যুগণের আক্রমণ এবং তদ্দেশীয় ভূপতি ক্যানিউটের অধীনে ইংরাজ রাজ্যে উহাদের উপনিবেশ স্থাপন প্রভৃতি দ্বারা তাহাদের ভাষা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চিন্তাপ্রণালী বিশ্বাস এবং প্রচলিত উপাখ্যানাবলী ইংরাজের মনে চির দিনের জন্য অজ্ঞাতসারে প্রবেশ করিয়াছে। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই নর্ম্মানরাজ্যাধিকারের পূর্ব্বকালীন বিউলফ্, কিডমন্ প্রভৃতি ইংরাজী সাহিত্যসেবকগণ অস্মদ্দেশীয় রাজপুতচারণদিগের ন্যায় কেবল প্রকৃতির গম্ভীর, ভয়াবহ এবং বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি চিত্রিত করিতেই সমধিক ভাল বাসিতেন। আমরা নিম্নে প্রথমোক্ত কবির কবিতা হইতে কয়েকটী অনূদিত ছত্র উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে কবি গ্রেণ্ডেল নামক নরখাদক এক রাক্ষসের বনমধ্যস্থ আবাসভূমি নির্দ্দেশ করিতেছেন ঃ—

"A lonely land———-wolf-cavens
Wind travesednesses priloves fenpatty
Where the mountain flood under the mists of the ness
Downwards is moved."

এ দৃশ্যের মনোমুগ্ধকর গাম্ভীর্য্য, ভীতিউৎপাদক বন্যভাব, সুদূর উত্তরের নির্জন অরণ্যের মিশ্রিত স্মৃতি সম্ভূত না হইয়া আর যায় না। ইহার মধ্যে যেন ভূত, প্রেত, ডাকিণীর কল্পনাময় দেশের কথা অন্তর্নিহিত হইয়া রহিয়াছে। একমাত্র এই কাব্যই বিশিষ্ট প্রমাণ যে নর্স জাতীয় কঠোরতর উপাদান তৎকালেই ইংরাজ চিত্তের ভিত্তি মধ্যে মিশিয়াছিল।

এইরূপ অজ্ঞাতসারে প্রবিষ্ট নর্স দেশীয় রুদ্রগম্ভীর ভাবনিচয় অনেকটা ইংরাজজাতির কল্পনার সহিত অবিশ্লিষ্টভাবে মিশিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এখনও বিশ্লেষণক্ষম অনেকগুলি ইংরাজী উপাখ্যান ও বিশ্বাসাদি এই নর্সজাতির নিকট হইতে সংগৃহীত বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায়। যেমন Ragner Lodbrogএর উপাখ্যান। এই প্রাচীন ঐতিহাসিক ব্যক্তি একজন নর্সদেশীয় চারণ—ইনি নর্দাম্বিয়ার অধিপতি এলার অশুভদৃষ্টীতে পড়িয়া সরীসৃপ-সঙ্কুল এক ভয়াবহ গহ্বর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালে স্বীয় অদৃষ্টে দোষারোপ করিতে করিতে করুণস্বরে হৃদয়বিদারক একটী সঙ্গীত করিয়াছিলেন। এই সঙ্গীত ডেন্মার্কে এখনও প্রচলিত আছে। ইঁহার সম্বন্ধে আরও অনেক অনেক আখ্যায়িকাংশ সংশ্লিষ্ট আছে—যেমন কৃষক কন্যা আস্লগার (Aslauga) সহিত ইহার প্রণয় বৃত্তান্ত ইত্যাদি।

ইংরাজ জাতির সাধারণ বিশ্বাসের মধ্যেও এতদ্দেশীয় কতকগুলি কল্পনাময় কুসংস্কার প্রবেশ করিয়াছিল, যেমন মৎস্য নারী (mermaids) এবং পূর্ব্ব কথিত অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ পরী বা ভূতযোনি। শেষোক্ত শ্রেণীর আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সেক্ষপীয়রের "নিদাঘ নিশীথ স্বপ্নে" বহুল আভাস পাওয়া যায়। ইহারা এত ক্ষুদ্র যে ইহাদের পক্ষে তৃণ-প্রমাণ cowslip ও নিতান্ত উচ্চ; ইহারা ভয় পাইলে ওক্ গাছের ক্ষুদ্রকায় ফলের (acorn) মধ্যে লুকাইয়া আত্ম রক্ষা করে।

———"all their elves for fear
Creep into acorn cups and hide them there"

ঐ কাব্যে চিত্রিত পাক্—(Puck) এর প্রকৃতি তৎকালীন প্রচলিত ভূতযোনি সম্বন্ধে সাধারণ বিশ্বাসের প্রকৃত পরিচয় স্থল। এই চরিত্র অঙ্কনে এরিয়েল (Ariel) প্রভৃতির ন্যায় কবির সৌন্দর্য্য সৃষ্টির প্রয়াস নাই, কেবল তৎসম্বন্ধে সাময়িক প্রচলিত বিশ্বাস অবিকৃতভাবে চিত্রিত করিয়াই তিনি নিরস্ত। সুতরাং বহুপূর্ব্বে নর্সদিগের মধ্যে উহাদের সম্বন্ধে যেরূপ বিশ্বাস ছিল, সেক্ষপীয়র চিত্রিত পাকেও আমরা অনেকটা সেইরূপই দেখি। ইহারা অতিশয় সৌন্দর্য্যাভিলাসী, কুৎসিত মলিন কিছু দেখিলেই ইহারা অপ্রসন্ন হয়। ঐ কাব্যে উহাদের রাজ্ঞী টাইটানিয়ার (Titania) নিদ্রার প্রাক্কালে, তাঁহার সহচরীগণ অশুভ সরীসৃপ, শম্বুক, উর্ণনাভ প্রভৃতিকে অপসারিত করিয়া দিতেছে, আর কলকণ্ঠ বিহঙ্গ নাইটিঙ্গেলকে রাজ্ঞীর নিদ্রাকর্ষণার্থ মাথার উপর সঙ্গীত সুধা ঢালিতে অনুরোধ করিতেছে। এই Elves সম্বন্ধে কুসংস্কার চসরের (chaucer) কাল হইতে ইংরাজী সাহিত্যে প্রবর্ত্তিত। বিশেষতঃ স্পেন্সরের এল্‌কিন্ সম্রাজ্ঞী গ্লোরিয়ানার চিত্রের পর হইতেই ইংরাজী সাহিত্যে ঐ কল্পনার আদর বাড়ে। অবশেষে সেক্ষপীয়রের সময়ে সাধারণ গ্রীক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই সম্পূর্ণ বিভিন্ন গ্রীক কল্পনার সৃষ্টি, পূর্ব্বোক্ত Fauns, Satyrs দিগের সহিত উহারা মিশিয়া যায়! সেই অবধি ইংরাজী সাহিত্যে উহাদিগের আর নূতন প্রবর্ত্তন হয় নাই, কেবল উনবিংশ শতাব্দীতে গ্রিম্ সাহেবের পুরাতন জর্ম্মান উপকথাবলীর আবিষ্কারের পর হইতে গেটে, শিলার, আলাণ্ড, প্রভৃতির অনুকরণে, পুনরায় নর্স উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত ইংরাজি কাব্য দৃষ্ট হইতেছে। Arnold, Morris, Browning প্রভৃতি এ বিষয়ে অগ্রণী। নর্স পুরাতত্ত্ব আবিষ্কারের দিকে এখন আবার লোকের মন গিয়াছে; এডা প্রভৃতি গ্রন্থ পুনরায় পঠিত হইতেছে। ইংরাজী কাব্যে বিভিন্ন সময়ে উহাদের সাফল্য দেখিয়া বাঙ্গালা কাব্যে কেনই বা উহা প্রবর্ত্তিত হইবে না? Elves, mermaids, Normics ময় উপকথাগুলি আমার নিকট কাব্যের একান্ত উপযোগী বলিয়া বোধ হয়।

শ্রীনীহার রঞ্জন বন্দোপাধ্যায়।

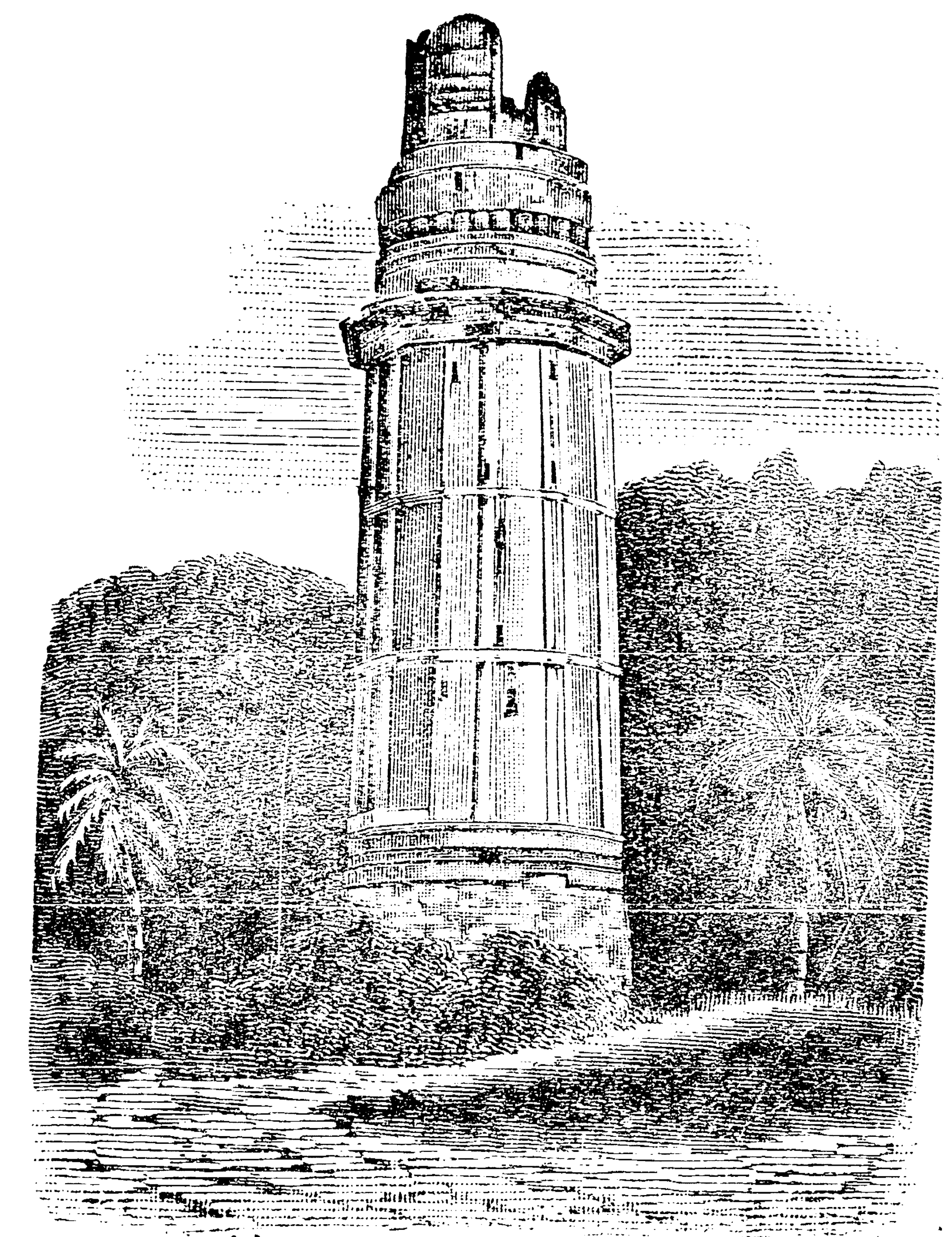

পাণ্ডুয়ার মেলা

বঙ্গদেশে পাণ্ডুয়া নামে দুটি স্থান আছে। একটী মালদহ জেলায় জঙ্গলাবৃত হইয়া আছে, অন্যটী হুগলী জেলায় রহিয়াছে। মালদহ জেলার পাণ্ডুয়ার প্রাচীন নাম পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। এখনও কোন কোন ঐতিহাসিকের বিশ্বাস, পাণ্ডুয়া ও প্রাচীন পুণ্ড্রবর্দ্ধন এক নহে। ঐতিহাসিক বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ বলেন, উত্তর বাঙ্গালায় ডিহি পুণ্ডরীয়া নামক যে স্থান জঙ্গলাবৃত হইয়া আছে তাহাই পুণ্ড্রবর্দ্ধন। কেহ কেহ বগুড়া জেলার মহাস্থানকে, কেহ কেহ বা বর্দ্ধনকোটকে প্রাচীন পুণ্ড্রবর্দ্ধন বলিয়া অনুমান করেন। এখনকার পাণ্ডুয়াই যে, প্রাচীন পুণ্ড্রবর্দ্ধনের ভগ্নাবশেষ ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বিশ্বাসের অনুকূল প্রমাণের অভাব নাই। অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বলিয়া এস্থলে তাহার উল্লেখ হইল না।

ছোট পাণ্ডুয়া, বড় পাণ্ডুয়ার নামানুসারে নির্ম্মিত হইয়াছে। পালবংশীয় রাজগণ পুণ্ড্রবর্দ্ধন অধিকার করিলে, শূরবংশীয় কোন রাজা দক্ষিণ বঙ্গে গমন করিয়া

পুণ্ড্রবর্দ্ধনের নামানুসারে যে নগর স্থাপন করেন, তাহারই বর্ত্তমান নাম ছোট পাণ্ডুয়া। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ রাজার সঙ্গে উত্তর বঙ্গ ত্যাগ করিয়া রাঢ় ও সুহ্মে যাইয়া বাস করে। এই সকল ব্রাহ্মণের রাঢ়ীয় সংজ্ঞা হয়। যে সকল ব্রাহ্মণ পাল রাজ্যে বাস করেন, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে তাঁহাদের আদান প্রদান রহিত হইয়া গেল। পুণ্ড্রবর্দ্ধন, বরেন্দ্র ভূমির অন্তর্গত বলিয়া এই ব্রাহ্মণেরা বারেন্দ্র নামে আখ্যাত হইতে লাগিলেন। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী রাজার প্রজা বলিয়া রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ চিরদিনের জন্য যেন দুটি স্বতন্ত্র জাতি হইয়া গেলেন। এখন বারেন্দ্রগণ প্রকৃত বরেন্দ্র ভূমি ত্যাগ করিয়া রাজসাহী পাবনা প্রভৃতি জেলায় স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। গৌড় ও পাণ্ডুয়া মুসলমানদের অধিকৃত হইলে, ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমানদের দৌরাত্ম্যে অনেকে স্থান ত্যাগ করিয়া যান, কেহ কেহ মসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। এখনও বরেন্দ্র ভূমিতে সেখ নাজির মহম্মদ ভট্টাচার্য্য ও সেখ গোলাম আলি চক্রবর্ত্তী ইত্যাকার নামের ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বহুসংখ্যক হিন্দু খানিত পুষ্করিণী বরেন্দ্র ভূমির পূর্ব্ব সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতেছে। পাণ্ডুয়া প্রায় লোকশূন্য হইয়াছে। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে পাণ্ডুয়ায় বিস্তর হিন্দু বাস করিত। সেই সময়ের লিখিত একখানি বঙ্গীয় ভাষার স্বর্গারোহণ পর্ব্বের সমাপ্তি স্থলে পাণ্ডুয়াকে পাণ্ডুগ্রাম বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

পাণ্ডুয়ার নাম স্মরণ হইলে, বাঙ্গালার অনেক প্রাচীন ঘটনার কথা মনে পড়ে। আমরা মানস চক্ষে, পাণ্ডুয়ার পার্শ্ব দিয়া প্রবল স্রোতস্বতী গঙ্গা নদীকে প্রবাহিত দেখিতে পাই; নগর মধ্যে বহুসংখ্যক হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন মন্দির দেখিতে পাই। বর্ত্তমান হোম দীঘী ও ধূম দীঘীর পার্শ্বে আদিশূরানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণকে যজ্ঞকার্য্যে ব্যাপৃত দেখিয়া পুলকিত হই; মহারাজ জয়াপীড়ের সঙ্গে কার্ত্তিকেয়ের মন্দিরে গমন পূর্ব্বক দেব নর্ত্তকী কমলার নৃত্য দেখিয়া মোহিত হই। এখন কতিপয় সাঁওতাল, ব্যাঘ্র ও বন্য শূকরের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া পাণ্ডুয়ায় বাস করিতেছে।

মুসলমানদের অধিকারের পূর্ব্ব হইতেই, কতকগুলি মুসলমান ফকির এ দেশে আগমন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ চরিত্র বলে এ দেশীয় রাজগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন, কেহ কেহ গুপ্তচরের কার্য্য করিয়া মুসলমান বিজয়ের সাহায্য করিয়াছিলেন। মোকদম সাজালাল গঞ্জামা তাব্রিজি. একজন প্রাচীন ফকির। সেখ শুভোদয়া গ্রন্থে লিখিত আছে, বাঙ্গালার শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেন তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন। লক্ষ্মণ সেন, তাঁহাকে উপাসনার জন্য পাণ্ডুয়া নগরের গোপ পল্লীতে যে স্থান প্রদান করেন, এখন সে স্থানে পাণ্ডুয়ার বড় দরগা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই দরগা সংক্রান্ত অতিথিশালার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বাইশ হাজার বিঘা জমিও লক্ষ্মণ সেন কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়। সেখ শুভোদয়ার এই বর্ণনাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয় না। বাস্তবিক মোকদম সা জালাল, মুসলমান বিজয়ের পরে বাঙ্গালা দেশে আগমন করেন।

পাণ্ডুয়ার অন্য এক বিখ্যাত ফকিরের নাম নূর কুতুব আলম। তিনি পাঠান রাজত্ব কালে মোকদম সা জালালের অনেক পরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার উপাসনা-মন্দির ও তৎসংলগ্ন অতিথিশালার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ছয় হাজার বিঘা ভূমি প্রদত্ত হইয়াছিল। অদ্যাপি এই বিষয় ষষ্ হাজারি নামে প্রসিদ্ধ আছে। মালদহ জেলার অনেক গ্রাম মোকদমপুর, কুতুবপুর, জালালপুর ও সাহাপুর নাম ধারণ করিয়া ঐ দুই প্রসিদ্ধ ফকিরের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।

মালদহ জেলায় অন্যূণ ষাটি সংখ্যক প্রসিদ্ধ ফকিরের আস্তানা আছে, তন্মধ্যে পাণ্ডুয়ার বড় দরগা অর্থাৎ মোকদম সাজালালের আস্তানা, ছোট দরগা অর্থাৎ কুতুব সাহের আস্তানা পিরোজপুরের নিয়ামৎ আলীর আস্তানা এবং সাহুল্লাপুরের পিরাণপীর বা আখিসেরাজের সমাধি স্থান সবিশেষ প্রসিদ্ধ। মোকদম সাহ, পারস্যের অন্তর্গত তাব্রিজ নগর হইতে এবং পিরাণপীর সিরাজনগর হইতে এ দেশে আগমন করেন। পাণ্ডুয়া নগরে প্রতি বৎসর মোকদম সাজালালের সম্মানার্থ উৎসব হইয়া থাকে। ইহারই নাম পাণ্ডুয়ার মেলা। এই মেলায় নানাস্থান হইতে মুসলমানগণ সমবেত হইয়া থাকেন। হিন্দু যাত্রীর সংখ্যা কম। হিন্দুদের বিশ্বাস, "এই সময়ে অনেক গোহত্যা হয়। হিন্দু দেওয়ান থাকিলে তাহার কপালে গো-রক্তের ফোটা দেওয়া হয়।" আমরা ফকিরদের মুখেই শুনিয়াছি, উহাদের প্রতি আর পূর্ব্বের ন্যায় সম্মান প্রদর্শিত হয় না। অর্থ প্রাপ্তি সম্বন্ধেও আর তেমন সুবিধা নাই। এই মেলা রজ্জব মাসের ৭ই তারিখ হইতে ২৮শে তারিখ পর্য্যন্ত থাকে।

একদল সম্ভ্রান্ত ফকির, প্রতি বৎসর মুর্শীদাবাদ জেলার সুতি নামক স্থানে রজ্জব মাসে সমবেত হন। তাঁহাদের মধ্যে মহম্মদীয় ধর্ম্ম ও বিবিধ শাস্ত্র বিষয়ে আলোচনা হয়। শাস্ত্রীয় বিচারে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হন ফকিরেরা তাঁহাকে আপনাদের বাদসাহ পদে নির্ব্বাচিত করেন। এই ব্যক্তিকে তাঁহারা সের গোরহ অর্থাৎ দলপতি নামে অভিহিত করেন। সেরগোরহের অধীনতায় আটজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন; সেই আট জন কর্ম্মচারীর দুই জন ভাণ্ডারী, দুই জন নকিব, দুই জন কোতয়াল ও দুই জন হিসাব রক্ষক, মণ্ডলীর জন্য সের গোরহ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয়। কোতয়ালদ্বয় মণ্ডলীর শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সাবধান থাকে। সের গোরহের কোন স্থানে গমন কালে নকিব উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার গমন সংবাদ প্রচার করিতে থাকে। ইহা সেই প্রাচীন বাদসাহী প্রথার একরূপ অনুকরণ। সের গোরহের প্রতি মুসলমানমাত্রের অসাধারণ ভক্তি। যাহাতে মণ্ডলীর মধ্যে কোন অসৎ লোকের প্রবেশ না ঘটে, তদ্বিষয়ে মণ্ডলীর সকলেই যত্নবান্। এই মণ্ডলীতে সময়ে সময়ে দুই শত পর্য্যন্ত ফকির প্রবেশ করেন।

সুতি হইতে এই ফকির দল, দুর্ল্লভপুরের জিয়ারুদ্দিন মণ্ডলের বাটীতে উপনীত হন। জিয়ারুদ্দিন মণ্ডলের বংশটী অতি প্রাচীন সম্মানিত বংশ। ফকিরমণ্ডলী সকলের বাটীতে গমন করেন না। অনেক ধনী মুসলমান. তাঁহাদিগকে আপনাদের আলয়ে লইয়া যাইতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ফকিরেরা দুল্লভপুরে বিশেষরূপে সম্মানিত হইয়া গৌড়ের দক্ষিণস্থ পিরোজপুরে সাহ নিয়ামৎ আলীর দরগায় উপস্থিত হন। শুনা যায়, সাহ নিয়ামৎ আলী, দিল্লীশ্বর আরাঙ্গীবের ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন। দরগায় নিয়ামৎ আলীর স্বহস্ত লিখিত একখানি কোরাণ ও গুধূড়ি ছিল। যাহারা দরবেশ বাউলদের গাত্রের বিচিত্রকন্থা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা গুধুড়িও দেখিয়াছেন। শুনা যায় কিছুদিন পূর্ব্বে একটী ফকির এই কোরাণখানি চুরি করিয়া লইয়া যায়। ফকির ইহাতে অসুস্থ হইয়া কোরাণখানি প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হয়।

ফকির মণ্ডলী, পিরিজপুর হইতে সাহুল্লাপুরের আখিসেরাজের দরগায় উপস্থিত হন। আখিসেরাজ বা পীরাণপীর গৌড়নগরের প্রাথমিক মুসলমান রাজগণের গুরু ছিলেন। এই দরগার অতি নিকটে প্রসিদ্ধ ঝনঝনিয়া মস্‌জিদ। আখিসেরাজ, মুসসমান গৌড়ের ঘনবসতিসম্পন্ন অংশের মধ্যস্থলে নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ সাগর দীঘির বিপুল কলেবর ইহার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। লক্ষ্মণ সেনের লক্ষ্মণাবতী, সাগর দীঘির পশ্চিমাংশে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখন এই অংশ দুর্ভেদ্য জঙ্গলে সমাকীর্ণ হইয়া আছে। সাহুল্লাপুরের প্রাচীন নাম গঙ্গাবাস। সাহুল্লাপুর একটী মহাশ্মশান ভূমি। এখানে কত নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইয়াছে, তাহার সীমা নাই। এখানে ভাগীরথীতীরে প্রতিদিন প্রিয়জনকে ভস্মীভূত করিয়া লোকে শোক ধ্বনিতে সংসারের অনিত্যতা জানাইয়া দিয়া থাকে।

মুসলমান রাজগণের মধ্যে অধিকাংশের, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ ছিল। তাঁহারা গৌড়নগরের মধ্যে হিন্দুদিগকে ধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করিতে দিতেন না। গঙ্গাতীরের একটী প্রশস্ত ভূমিতে হিন্দুগণ, আপনাদের ধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে পাইতেন। সাহুল্লাপুর, এই প্রশস্ত ভূমি খণ্ডের উত্তরাংশে অবস্থিত। ইহার সম্মুখ ভাগে, বড় গঙ্গা হইতে একটী জল-প্রবাহ আসিয়া মিলিত হইয়াছে। কোন সময়ে অদ্বৈত্য আচার্য্যের পত্নী সীতা ঠাকুরাণীর দুইজন শিষ্যা, নন্দিনী ও জঙ্গলী, আসিয়া এই জল স্রোতের ধারে টোটা নামক স্থানে বাস করেন। বোধ হয় তাঁহাদের সময় হইতে এই জল স্রোতের তুলসীগঙ্গা নাম হয়। এখানকার গোস্বামীদিগকে ঠাকুরণজী বলে। তাহারা স্ত্রীলোকের ন্যায় পোষাক পরেন। তাঁহাদের অনেক শিষ্য আছে। তুলসী গঙ্গার তীরে 'তুলসী বিহার' নামক মেলা হইয়া থাকে। তুলসী গঙ্গা, সাহুল্লাপুরের পুরাতন বান্ধাঘাটের সম্মুখে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হইয়া কিয়দ্দূরে ভাগীরথীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক মুসলমান গৌড়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভাতিয়ার বিলের দিকে চলিয়া গিয়াছে। এদেশের লোকে ভাগীরথী ও তুলসী গঙ্গার একত্র

প্রবাহের স্থানকে পবিত্র জ্ঞান করে। এখন সাহুল্লাপুর জঙ্গলে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু দেড় শত বৎসরের একখানা পুরাতন দলিল পাঠে জানা যায় যে সাহুল্লাপুরে বিস্তর ভদ্রলোকের বাস ছিল।

সাহুল্লাপুর হইতে ফকির মণ্ডলী, মালদহ নগরে উপস্থিত হন। মালদহ হইতে পাণ্ডুয়ায় উপনীত হন। স্তুতি হইতে পাণ্ডুয়ায় আসিতে ইঁহাদের পাঁচ দিন লাগে। সের গোরহ, পাণ্ডুয়ার বাইশ হাজারি তহবিল হইতে প্রতি বৎসর একশত টাকা নজর প্রাপ্ত হন। ফকির মণ্ডলী, মেলা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ পুরাতন মালদহে উপনীত হন। মালদহ হইতে মঙ্গলবাড়ী দিয়া ইংরেজ বাজারে নবিবকস মুনসীর বাটীতে আগমন করেন। সেখানে সংকৃত হইয়া আরাপুরের ছুঁড়ী মিঞার বাড়ীতে গমন করেন। সেখানে আতিথ্য গ্রহণ পূর্ব্বক, রাজমহলের দিকে যত অগ্রসর হইতে থাকেন, ততই তাঁহাদের দল ক্ষীণ হইতে থাকে। প্রতি বৎসর তাঁহাদের মধ্যে এই প্রণালীতে কার্য্য হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর স্তুতিতে সের গোরহ নির্ব্বাচিত হন। যে পর্য্যন্ত না উপযুক্ততর লোক পাওয়া যায়, সে পর্য্যন্ত অন্য সের গোরহ নিযুক্ত হন না। এখন যিনি সের গোরহ পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তিনি রাউলপিণ্ডীর লোক। তিনি সুবিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি। আমরা তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া মোহিত হইয়াছি। তিনি সিংহল পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছেন।

পাণ্ডুয়ার পীরোত্তর সম্পত্তি অনেক দিন যাবৎ হিন্দু দেওয়ানদের অধীন ছিল। দেওয়ানগণ, পুরুষানুক্রমে এই পদ ভোগ করিতেন। পীরের সম্পত্তির অপব্যবহার করিলে বিপদ ঘটিতে পারে, এই ভয় থাকায় তাঁহারা সম্পত্তির আয়, দান খয়রাৎ ও অতিথি সেবা প্রভৃতি সৎকার্য্যে ব্যয় করিতেন। রাজধানী মুর্শীদাবাদে স্থাপিত হইলে গৌড় ও পাণ্ডুয়ার প্রতি নবাবদিগের দৃষ্টি নিপতিত হয়। তাঁহারা গৌড় ও পাণ্ডুয়া ভাঙ্গিয়া মুর্শীদাবাদ সাজাইতে থাকেন। গৌড় নগরের ইট পাথর, মুর্শীদাবাদে লইয়া যাওয়ার জন্য নবাব সেরেস্তায় আট হাজার টাকা বার্ষিক ব্যয় নির্দ্ধারিত হয়। গৌড়ের কদম রসুলের দরগা হইতে মহম্মদের পদ চিহ্ন মুর্শীদাবাদে লইয়া যাওয়া হয়, কিন্তু অমঙ্গলের আশঙ্কায় যথাস্থানে পুনঃ স্থাপিত হয়।

পাণ্ডুয়ার সম্পত্তির দলিল অনুসন্ধানব্যপদেশে তাৎকালিক দেওয়ান পীতাম্বর ঘোষকে কারারুদ্ধ করা হয়। ঘোষ মহাশয়, 'পরে দলিল দেখাইব' বলিয়া আপাততঃ নিষ্কৃতি লাভ করেন। কিন্তু তিনি এই প্রাচীন সম্পত্তির দলিল দেখাইতে পারেন নাই। তিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া স্বদেশাভিমুখে গমন করেন। শুনা যায়, তাঁহার সঙ্গে পীরোত্তরের প্রচুর সম্পত্তি ছিল। তিনি পদ্মাগর্ভে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। কিছুকাল মণিবেগমের হস্তে এই সম্পত্তির ভার ছিল। মণিবেগম আপনার এক দাসকে এই সম্পত্তির রক্ষক করিয়া যান। এই ভৃত্য মাসিক এক টাকা বেতনে মণিবেগমের কার্য্য করিত।

পাণ্ডুয়ার পীরোত্তর সম্পত্তি সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত কিছু জানা যায় না। মোকদমসা ও কুতুবসার সম্বন্ধে অনেক গল্প এদেশীয় লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। মোকদমসা, নাকি বাঘের উপর চড়িয়া বেড়াইতেছেন। উক্ত দুই ফকির যে মহাপ্রভাবশালী ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

স্বর্গীয় দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়।

(দ্বিতীয় প্রবন্ধ)

The Royalty of Honesty
The Divinity of Purity.

ইংরাজদিগের যে সকল সদ্গুণ আছে, দেওয়ানজীর চরিত্রে তাহা ছিল। শ্রম, অধ্যবসায়, যথাসময় কার্য্যকারিতা, পরিষ্কৃতা, সাহস, পুষ্পোদ্যান ও উদ্যানপ্রিয়তা প্রভৃতি ইংরাজদিগের মত তাঁহার ছিল।

তিনি লিখিয়াছেন—"যে সকল ইংরাজ, মহারাজার সঙ্গে আমার বাটীতে কখন কখন আসিতেন, তাঁহারা আমার বাটীর অবস্থা দর্শনে যথেষ্ট আমোদ প্রকাশ করিতেন। একবার তৎকালীন কমিশনর সাহেবের স্ত্রী তাঁহাদের বাটীতে অনেক সাহেব ও মেমের সাক্ষাতে আমার বাটীর প্রশংসা করিয়া কহিলেন যে "ইঁহার (দেওয়ানের) বাটীটি ঠিক আমাদের বাটীর প্রণালীতে প্রস্তুত। আমি বাঙ্গালীর এ প্রকার বাটী অত্যল্প দেখিয়াছি।" সাহেবদিগের উদ্যানের

ভালভাল ফুলের গাছ তাঁহার গৃহোদ্যানে ছিল, অথচ বাঙ্গালীর নিত্যপ্রিয় বেল, মল্লিকা, জুই, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধ, মধুমালতী, মাধবীলতা ইত্যাদিও ছিল। তিনি কখনও ইংরাজি পরিচ্ছদ অনুকরণ করেন নাই এবং প্রয়োজন ব্যতীত ইংরাজী কথাও কহিতেন না। কিন্তু ইংরাজের ন্যায় বন্দুক ব্যবহার-প্রিয় ছিলেন। লোকালয় দূরস্থিত তাঁহার উদ্যানভবনে, একটা বন্দুক ও একটি রিভল্ভার রাখিয়া, প্রহরীর অপেক্ষা না করিয়া, দস্যু বা তস্কর ভয় করিতেন না। দূর পথে যাইতে হইলে বন্দুক বা রিভলভার সঙ্গে লইতেন। ইংরাজদিগের এবং স্বদেশের আচার ব্যবহারে যাহা ভাল, তিনি তাহার সমর্থন এবং যাহা মন্দ তাহার নিন্দা করিয়াছেন। আমাদিগের দেশের বিবাহপ্রণালী মূলে ইংরাজদিগের courtship অপেক্ষা ভাল বলিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের দেশে যে কঠোর অবরোধ প্রথা আছে তাহা স্বাভাবিক নহে ও সর্ব্বাঙ্গীন শুভপ্রদ নহে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ইংরাজদিগের পরিবারের মধ্যে যেরূপ সঙ্গীত চর্চ্চা হয়, আমাদিগের দেশেও সেইরূপ পরিবারের ভিতরে সঙ্গীত চর্চ্চা হইলে বিশুদ্ধ আনন্দের বৃদ্ধি হইতে পারে তাহাও বলিয়াছেন। আবার ইংরাজের দোষ ও পাপ অনুকরণ করিয়া দেশের অনেক লোক অধঃপাতে যাইতেছে তাহাও শিক্ষা দিয়াছেন।

৺কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়কে, কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক সকলে অসাধারণ ভাল বাসিতেন ও ভক্তি করিতেন। তিনি তাঁহার আত্মজীবনচরিতে লিখিয়াছেন যে, "বান্ধবগণ যে কি গুণ দেখিয়া আমাকে এত ভাল বাসিতেন তাহা আমি এক্ষণে স্থির করিতে পারি না। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই আমাকে সোদরের ন্যায় স্নেহ করিতেন। এবং গুরুজনের ন্যায় মান্য করিতেন। একই ব্যক্তিতে এতাদৃশ যুগপৎ স্নেহ ও ভক্তি প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। অতি অশান্ত ও সকলের অবাধ্য বালকেরাও আমার বশীভূত হইত। স্ত্রীলোকেরা আমাকে নিরতিশয় ভালবাসিতেন, এমন কি বালিকারাও আমার মত স্বামী হয় আপনাদের মধ্যে বলা কহা করিত।" আমি একটী গল্প শুনিয়াছি। দশ বা একাদশ বর্ষীয়া কোনও রাজকন্যার বিবাহ মণ্ডপে যুবা কার্ত্তিকেয়চন্দ্র ও বর উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। রাজা কন্যাকে আমোদচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ইহার মধ্যে কাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা কর।" সরলা রাজকন্যা অঙ্গুলি দিয়া কার্ত্তিকেয়চন্দ্রকে নির্দ্দেশ করিলেন।

রাণীর ও দেওয়ানজীর বয়স সমান ছিল। বৈষয়িক কারণে ভিন্নমত হইবার পূর্ব্বে রাণীও দেওয়ানকে অতিশয় ভালবাসিতেন। রাজা ও রাণীতে কলহ হইলে, রাজা অনেক সময়, "কলহ হইলে দেওয়ান এই স্থান হইতে চলিয়া যাইবেন" এই কথা বলিয়া রাণীকে ভয় দেখাইতেন। দেওয়ানজী তাঁহার জীবনচরিতে লিখিয়াছেন যে—"রাণীর বয়স যেরূপ, তাহাতে আমার প্রতি এতাদৃশ স্নেহ থাকায় রাজা পাছে ঈর্ষান্বিত হন আমার মনে আশঙ্কা হইত। কিন্তু সুখের বিষয় রাজার মনে কখন ঈর্ষা বা সন্দেহের ছায়া পড়ে নাই।" কুলকামিনীরা দেওয়ানজীকে এত ভাল বাসিতেন, তথাপি তাঁহার মনে কখন কোনও অপবিত্র ভাব আসে নাই। তিনি লিখিয়াছেন :—"যে কামিনীর মোহিনীমূর্ত্তি আমার হৃদয়মন্দিরে অধিষ্ঠিত ছিল, সেই মূর্ত্তি দর্শন ব্যতীত স্পর্শন করিতে বাঞ্ছাও হইত না। দৈবাৎ স্পর্শ হইলে কোনও অপবিত্র ভাবের আবির্ভাব হইত না।" ধন্য সাধু হৃদয়ের পবিত্রতা। তাঁহার হাসিমুখের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য যেমন নয়ন রঞ্জন করিত, তেমনি তাঁহার হাসির মধুর ধ্বনিতে কর্ণকুহরে সুধা বর্ষণ হইত। এই সুন্দরী একদা শৈবলিনীর ন্যায় মন প্রাণ ও জীবন সর্ব্বস্ব তাহার প্রণয়ীতে সমর্পণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। কিন্তু কার্ত্তিকেয়চন্দ্র প্রতাপের ন্যায় জিতেন্দ্রিয়, তাঁহার মন টলিল না। উপন্যাসে যে আদর্শ চরিত্র পড়িতে পাওয়া যায়, বাস্তবিক জীবনে যাহা এত বিরল যে, অসাধু ব্যক্তিগণ তাহা সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারেন না। কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের জীবনে তাহা বাস্তবিক ঘটনায় পরিণত হইয়াছিল। আর একটা ঘটনা বলিব। তাহাও উপন্যাসবৎ। একটী নবযৌবনা সুন্দরী মহারাজার সভায় নৃত্যগীত করিত। সে দেওয়ানজীকে প্রায়ই দেখিতে পাইত, হৃদয়মন্দিরে তাঁহাকে পূজা করিত। সে জানিত, তাহার আশা পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এই হতভাগিনীর হৃদয় কিছুতেই প্রবোধ মানিত না। কখন কখন সে ক্ষিপ্তপ্রায় হইত, কখনও বা কাঁদিত, কখন বা বলিত আমি জলে ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া মরিব। এক দিন দিবসে রাজপ্রাসাদে দেওয়ানজীকে একটী গৃহে উপবিষ্ট দেখিয়া, সহসা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া, দেওয়ানজীর

পদযুগল ধরিয়া অভাগিনী কাঁদিতে লাগিল। দেওয়ানজী তাহার দীনতা ও কাতরতা দেখিয়া তাহাকে কঠোর কথা বলিতে পারিলেন না, কিন্তু অন্য ঘরে উঠিয়া গেলেন। এবং তাঁহার নিকট এই ভাবে এই গায়িকা আর কখনও না আসিতে পারে তজ্জন্য চাকরদিগকে বলিয়া দিলেন। আর একটা ঘটনার বর্ণনা দেওয়ানজীর আত্মজীবন-চরিত হইতে উদ্ধৃত করিলাম :—"আর একবার এক পৌষ সংক্রান্তির রাত্রে আমাদের সকলের রাজবাটীতে নিমন্ত্রণ ছিল। সঙ্গীত সময় ঐ বালিকা উপস্থিত হইল। আহারের পর রাজা কয়েক জন আত্মীয়ের সহিত চড়কের পূজার যাত্রা গোপনে শুনিতে চলিলেন। পাছে ঐ বালিকা আমার সঙ্গ লয় এই কারণ আমি তাঁহাদের সঙ্গে না যাইয়া রাজবাটীর একগৃহে পূর্ণ বাবু ও আমি শয়ন করিলাম। ১০।১২ মিনিট পরে রাজা আমাকে আর এক কক্ষে ডাকাইয়া কোন কোন কথা বলিয়া গেলেন। আমি শয়ন গৃহে পুনর্গমন করিতেছি, এমন সময় ঐ বালিকা আমার নিকট আসিয়া পূর্ব্বেকার মত কাতরোক্তি করিতে লাগিল। আমি প্রথমে বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার কাতরোক্তিতে সে ভাব ভুলিয়া গেলাম। আমার আশা ত্যাগ করাইবার জন্য তাহাকে অনেকরূপে বুঝাইলাম। কিন্তু কোন ফলোদয় না হওয়ায় সেখান হইতে চলিয়া গিয়া পূর্ব্বোক্ত গৃহে শয়ন করিলাম। সেখানে পূর্ণ বাবু থাকাতে সে আর আমার নিকট যাইতে পারিল না। আমি তৎক্ষণাৎ নিদ্রিত হইলাম।" এই ঘটনাতে রাজার ও তাঁহার স্বজনের চক্রান্ত ছিল, দেওয়ানজির বোধ হইল। তিনি এই ঘটনা লক্ষ্য করিয়া রাজাকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিলেন যে, "আমি আপনাদের কোন দোষ দেখিলে তাহা সংশোধনের চেষ্টা করিয়া থাকি, কিন্তু কাহারও প্রতি ঘৃণা করি না, বরং স্নেহ করিয়া থাকি। আমাকে দুশ্চরিত্রান্বিত করিলে আপনাদের কি লাভ হইবে?" এই পত্র পাইয়া রাজা ও তাঁহার স্বজনগণ দেওয়ানজির উপর অতিশয় চটিলেন। কিন্তু ইহাতে একটা ফল হইল। রাজা আদেশ করিলেন যে, যে দিন মজলিশে দেওয়ানজি উপস্থিত থাকিবেন, সে দিন কোন গণিকা গায়িকা উপস্থিত থাকিবে না। সুতরাং রাজার স্বজনদের দল ও দেওয়ানজির দল পৃথক হইয়া গেল, এবং দেওয়ানজিকে কিছুকাল অশান্তি ও অনিষ্ট আশঙ্কার মধ্যে থাকিতে হইল। রাজ স্বজনেরা আশা করিতে লাগিলেন যে, এইবার রাজ সংসারে দেওয়ানজির কর্ত্তৃত্ব লোপ হইবে এবং তাঁহার পরাজয় হইবে, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় সাধুতারই আবার জয় হইল।

কামিনী কাঞ্চনে মনুষ্য চরিত্রের পরীক্ষা হয়। সংসারে এমন লোক অতি বিরল, যিনি অর্থের লোভে বা কোন কামিনী কুহকে পড়িয়া কোনও অবৈধ কার্য্য করেন নাই; যিনি লজ্জা না পাইয়া আপনার জীবন কাহিনী প্রকাশ করিতে পারেন। একটী সরল প্রকৃতি প্রাচীন শিক্ষক আমাকে বলিয়াছিলেন যে "হৃদয়ের অভ্যন্তরে গোপনে পাপের নরক আমরা পোষণ করিতেছি, তাহা কোনও প্রকারে আচ্ছাদন করিয়া ভদ্রলোক সাজিয়া কপট হাসি হাসিয়া সংসারে বিচরণ করি।" এই কথা সকলের পক্ষে সত্য না হউক, প্রায় সকল লোকের পক্ষেই সত্য তাহা স্বীকার করিতে হইবে। দুই একজন লোক জন্ম গ্রহণ করেন যাঁহাদিগের হৃদয়ে নরক নাই, কোন গুপ্ত পাপ নাই। যাঁহাদিগের অন্তরে ও বাহিরে সাধুতা ও সততা, তাঁহাদিগের জীবনের সমুদয় কার্য্য স্বর্গের জ্যোতি দ্বারা আলোকিত। অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে, দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় এই দুই একজন লোকের মধ্যে। তাঁহার শত্রুগণও তাঁহার নিষ্কলঙ্ক নামে কদাপি কোনও কলঙ্কের কথা সংযুক্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহার আত্ম-জীবন-চরিতে তিনি যে স্বকীয় চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা চিন্তাশীল চিত্তে পড়িলে বুঝা যায়, প্রতি পরীক্ষাতেই তিনি জয়ী হইয়াছিলেন। তিনি যে পদে ছিলেন ইচ্ছা করিলে প্রভূত ধনরাশি সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারিতেন। একটা রাজবংশের জমিদারী তিন পুরুষ তাঁহার হস্তে ন্যস্ত ছিল। মহারাজা সতীশচন্দ্র তাহাকে তাঁহার বিষয়ের কর্ত্তা করিয়া একটী উইল করিয়া দিবার জন্য দেওয়ানজির নিকট বারম্বার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। দেওয়ানজি তাহাতে সম্মত হন নাই।

রাজাদিগের অনেক বিষয় পত্তনি ও ইজারা বন্দোবস্ত তাঁহার হাত দিয়া হইয়াছিল। তিনি কখন স্বনামে বা বিনামে তাহার কোনটা বন্দোবস্ত করিয়া লন নাই। মহারাজারা তাহার একান্ত বাধ্য ছিলেন এবং এই রাজবংশ নিষ্কর জমি দান করিয়া বাঙ্গালা দেশে প্রসিদ্ধ, তথাপি স্বকীয় ভবন প্রস্তুত করিবার জন্য এক কাঠাও নিষ্কর জমি চাহিয়া

লন নাই। আমাদিগের দেশে অনেক স্থলে দেখা যায়, যে ব্যক্তি কোন বড় জমিদারের ঘরে চাকুরী করেন, তিনি একটা জমিদার হইয়া পড়েন, এবং একটা জমিদার বংশ স্থাপন করেন। দেওয়ানজি ইচ্ছা করিলে তাহা পারিতেন। কিন্তু মহারাজার ধন আত্মসাৎ করিয়া জমিদার হওয়ার নীচ বাসনা, সুবিধা সত্ত্বেও, তাঁহার মনে কখনই হয় নাই।

তিনি রাজবাটীতে যে চাকরী করিতেন, তাহার অপেক্ষা অধিক লাভজনক কার্য্যের প্রস্তাব বারম্বার পাইয়াছিলেন। যখন তিনি রাজবাটীতে মাসিক ১০০ এক শত মাত্র টাকা পাইতেন, তখন ইন্‌কম্ ট্যাক্সের স্থাপন হয়। দেওয়ানজীর আত্মজীবন চরিতে লিখিত আছে :—"সেই সময় এই জেলার তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টর হার্সেল সাহেব আমাকে কৃষ্ণনগর প্রদেশের আসেসরি কার্য্য দিবার জন্য রাজার নিকট আগ্রহ প্রকাশ করেন। রাজা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া তাঁহাকে কহেন যে, দেওয়ানকে আমি এক শত টাকা বেতন দিই, আসেসরীতে তাহার তিন শত টাকা বেতন হইতেছে। সুতরাং আমার কর্ম্মে থাকিলে তাঁহার অনেক ক্ষতি হইবে। কিন্তু তিনি যাইলে আমার অনেক অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। হার্সেল সাহেব কহিলেন "তোমার দেওয়ানের মত সকলের শ্রদ্ধাস্পদ লোক আমি আর পাইতেছি না। তোমার দেওয়ানকে এই কর্ম্ম দিতে সকলেই বলিতেছেন। এমন কি এখানকার সদর আলা (ব্যারিষ্টার ৺মনমোহন ঘোষ মহাশয়ের পিতা) যাহার মুখে কাহারও প্রশংসা শুনা যায় না, তিনিও দেওয়ানের প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার এ কর্ম্মও থাকে এবং ঐ কর্ম্মও হয়, তাহারই জন্য কমিশনারকে লিখিব।" কিন্তু ইহা গবর্ণমেণ্টের সাধারণ নিয়ম বিরুদ্ধ। সুতরাং কমিশনার কালেক্টরের অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। কমিশনার লিখিলেন যে "রাজার কর্ম্মত্যাগ না করিলে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম তাঁহাকে দেওয়া যাইতে পারে না।" দেওয়ানজী যাইলে রাজার বিস্তর অনিষ্টের সম্ভাবনা ছিল। দেওয়ানজী রাজার মঙ্গলের জন্য নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিলেন। ইহার পরে তাঁহার আত্মীয় ৺শ্যামাচরণ ভট্ট উকীল মহাশয় তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন "নবাব নাজিমের দেওয়ান রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেব বাহাদুর আপনাকে নায়েব দেওয়ানি পদ দিতে ইচ্ছা করেন।" এই প্রস্তাবেও কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় সম্মত হন নাই। তাহার পরে লালগোলার জমীদার তাঁহাকে এক বৎসরের মধ্যে পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত বেতন দিতে স্বীকৃত হইয়া, তাহাকে দেওয়ানী পদ দিবার জন্য, তাঁহার বন্ধু দ্বারা প্রস্তাব করেন। এইবার রাজা বলিলেন আপনাকে "অত বেতন দিতে সামর্থ্য নাই। কিন্তু আপনাকে বারম্বার আমার জন্য আর ক্ষতি স্বীকার করিতে কিরূপে বলি?" কিন্তু দেওয়ান আবার রাজার জন্য নিজের ক্ষতি স্বীকার করিলেন। দুই শত টাকা বেতনে তিনি রাজার নিকট থাকিতে স্বীকার করিলেন। এরূপ স্বার্থত্যাগ সংসারে কি বিরল নহে?

গুণগ্রাহী এডুকেশন গেজেট লিখিয়াছিলেন "দেওয়ান ৺কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয় যেরূপ কায়মনোবাক্যে স্বার্থচিন্তা ছাড়িয়া প্রভুর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতি করিয়াছিলেন, প্রভুর গৌরব প্রকাশ জন্য ব্যগ্র ছিলেন. তাহা তাহার সার্দ্ধ শতাব্দি পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয় পেশোয়াগণ এবং হোলকার সিন্ধিয়া প্রভৃতি সামন্তগণ দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলে, মহাত্মা শিবাজীর সিংহাসন অটুট থাকিয়া ভারতের ইতিহাস ভিন্নরূপ হইত।" সংসারে, বিশেষতঃ বৈষয়িক লোকদিগের মধ্যে এরূপ স্বার্থত্যাগ ও সাধুতা অতি দুর্ল্লভ। এরূপ সাধু ব্যক্তি কোন রাজ্যের অধিপতি না হইয়াও নরপতি তুল্য সম্মানার্হ।

দেওয়ানজীর জীবনে এই মহামূল্য শিক্ষা পাওয়া যায় যে, ধর্ম্ম পথে থাকিয়াও সুচারুরূপে জমিদারী পরিচালনা করা যায়, কেবলমাত্র জমিদারী চালান যায় তাহা নহে, জমিদারির উন্নতিও করা যায়। আমি এই কথা আমাদিগের দেশের জমিদারগণের নিকট বিশেষ করিয়া নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি। অনেক জমিদার বিশ্বাস করেন যে, কুকার্য্য না করিলে জমিদারীর রক্ষা বা উন্নতি হয় না। তাঁহারা অতি অল্প বেতনে অসৎ ব্যক্তিগণকে তাহাদিগের কর্ম্মকর্ত্তা করিয়া থাকেন। এই সকল ব্যক্তি জমিদারদিগকে এক দিকে তোষামোদ করিয়া নিত্য মনোরঞ্জন করে, অন্য দিকে ভিতরে ভিতরে সর্ব্বনাশ করে। এক দিন দেওয়ানজী দেশের একটী প্রধান জমিদারকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন।

দেওয়ানজি রাজনৈতিক বিষয়েও দূরদর্শী ছিলেন।

একবার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত একখানি ইংরাজী মাসিক পত্রে, দশশালা বন্দোবস্তের দোষ, অতি তেজস্বী ভাষায় ঘোষণা করেন। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দেওয়ানজী যাহা বলিয়াছিলেন, অনেক বর্ষের বহুদর্শিতার পর, শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয় এবং কংগ্রেস তাহাই অদ্য বলিতেছেন; দেওয়ানজী বলিয়াছিলেন যে, যেখানে দশশালার বন্দোবস্ত নাই, সে স্থানে রায়তদিগের অবস্থা আরও মন্দ ও শোচনীয়, এবং ভারতের সর্ব্বস্থানে দশশালা বন্দোবস্ত হইলে ক্ষতি না হইয়া বরঞ্চ প্রজার অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল হইতে পারে।

বিলাতে গিয়া রাজনৈতিক আন্দোলন করা সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল না। তিনি বলিতেন যে, সাহেবদিগের নিকট আমরা আবেদন করি, তাহাদিগেরই পুত্র, ভ্রাতা বা ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন এই দেশে কার্য্য করিতেছেন। সুতরাং বিলাতের সাহেবরা তাঁহাদিগের পুত্র প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে আমরা যে কথা বলি, তৎপ্রতি কর্ণপাত করিবেন তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প। এ কথা অদ্য কংগ্রেস নেতৃগণ স্বীকার না করিতে পারেন, কিন্তু আমার বোধ হয় এ কথা সত্য বলিয়া এক দিন অনুভব করিবেন।

দেওয়ানজি দেশের রাজনৈতিক মতামতের আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই। তিনি পরোক্ষে দেশের একটা অতি হিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন। তাহা তাহার ভাষায় বর্ণনা করিলাম। "(নদীয়া) জেলার প্রায় সমস্ত লাখেরাজ গবর্ণমেণ্টের বিচারে অসিদ্ধ স্থির হইয়া তাহার উপর রাজকর স্থাপিত হয় এবং লাখেরাজ ভোগীরা এই নিয়মে তাহার বন্দোবস্ত করিয়া লন যে ভূমির বাৎসরিক খাজনার অর্দ্ধাংশ গবর্ণমেণ্টকে দিবেন, অর্দ্ধাংশ আপনারা পাইবেন। কিন্তু রাজপুরুষেরা ঐ সকল ভূমির এত উচ্চ নিরিখে বন্দোবস্ত করিলেন যে লাখেরাজদারের নিজাংশ পাওয়া দূরে থাকুক, গবর্ণমেণ্টের রাজস্বেরও সংস্থান হইয়া উঠে না। সুতরাং অনেক নির্ধন বন্দোবস্তকারীরা বহুপুরুষের বৃত্তি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ক্রমে ক্রমে এইরূপে চারি শত নম্বর লাখেরাজ নিলাম হইয়া গেল। অন্য ক্রেতা উপস্থিত না হওয়াতে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ঐ সকল ক্রীত হইল। আর যাহারা বহু কষ্টে রাজস্ব দিয়া আপনাদের ভূমি এ পর্য্যন্ত রাখিয়াছিল তাঁহারা আর রাখিতে পারেন না এমনি হইয়া উঠিল। কত শত পরিবার মধ্যে হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল। এই সময় আমি কলিকাতার কোনও কোনও বিজ্ঞ আত্মীয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া এই সমস্ত দুঃখের বিবরণ গবর্ণমেণ্টকে বিদিত করা স্থির করিলাম এবং প্রত্যাগমন করিয়া এই সঙ্কল্প মহারাজকে জানাইলাম। তিনি অতি আগ্রহ সহকারে এই বিষয় সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুদিনের মধ্যেই বহু লাখেরাজ বন্দোবস্তকারীর স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র গবর্ণমেণ্ট সমীপে প্রেরিত হইল। পরিশেষে বহু আয়াসে কমিশনর কর্ত্তৃক অবধারিত কর কমিয়া গেল এবং পূর্ব্বগৃহীত অন্যায় কর বন্দোবস্তকারীদিগকে প্রত্যর্পণ করিবার আদেশ হইল। রাজার পুনর্বন্দোবস্ত পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত রাজস্বের তৃতীয়াংশ ন্যূন হইয়া গেল এবং প্রায় চল্লিশ সহস্র টাকা গবর্ণমেণ্ট হইতে ফেরত পাওয়া হইল। এই মহৎ কার্য্যে রাজার বিস্তর শ্রম ও ব্যয় হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি এই বিষয়ের উদ্দীপক ও উদ্যোগী না হইলে ইহা উত্থাপিত হইত কি না তাহা সন্দেহ স্থল ছিল, আমি এই কার্য্যের মূল স্থাপক ছিলাম ও কত ভরসা দিয়া তাঁহাকে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত করি ইহা কেবল তিনিই জানিতেন। এই কার্য্য যে সিদ্ধ হইবে ইহা তাঁহার মনে কখনও স্থান পায় নাই। আমি বৎসরাবধি রাজার সঙ্গে কলিকাতায় থাকিয়া মন্ত্রণা ও উৎসাহ দিয়াছিলাম এবং প্রায় সমস্ত কার্য্যই করিয়াছিলাম।"

এই সাধারণের হিতকর কার্য্যের জন্য ভুক্তভোগী ব্যক্তিগণ দেওয়ানজির নিকট ঋণি। কবি ভারত চন্দ্র অন্নদামঙ্গল লিখিয়া কবিতাতে কৃষ্ণনগরের রাজবংশকে চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র "ক্ষীতিশ বংশাবলী" গ্রন্থ লিখিয়া কৃষ্ণনগরের রাজবংশের পূর্ণ ইতিহাস এবং বাঙ্গালা দেশের আংশিক ইতিহাস সাহিত্য-পটে স্থায়ী ভাবে চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। এবংবিধ ইতিহাস লিখা সম্বন্ধে তিনি পথ প্রদর্শকরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। মহা পণ্ডিত কৃষ্ণদাস পালের সম্পাদিত হিন্দু পেট্রিয়ট এই গ্রন্থের দীর্ঘ সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছিলেন—

With glorious exception of Babu Rajendra Lala Mittra, the writers of our day, one in translations and competitions of historical works a chronicles of foreign writers, have

not up to this time turned their attention in this direction. If we would only look about us with our eyes and ear open; If we would store up the legends and traditions of times not long past, if we would but carefully study the songs and ballads of our ancestors, we might have sufficient materials for building up a rational and intelligible historical structure. We hail Babu Karticeya Chandra Roy as a pioneer in this unexplored but interesting field."

তাঁহার দেহ তাঁহার মানসিক অবস্থার প্রতিকৃতি স্বরূপ ছিল। তাঁহার চরিত্রে এক দিকে কবিত্বময় ছিল, তখন অন্য দিকে গাম্ভীর্য্য ও অনমনীয় দৃঢ়তা ছিল। যখন তিনি নিজের কুসুমিত কাননে, তাহার তানপুরার বা হারমোনিয়মের সহিত, রাগ রাগিনীর আলাপ করিয়া, স্বরচিত গীত সুস্বর ও উচ্ছাসের সহিত গান করিতেন, তখন তাঁহাকে মূর্ত্তিমান কবিত্বময় সঙ্গীত বলিয়া বোধ হইত।

আবার যখন বিষয় কার্য্য করিতেন, তখন তাহাতে এমনি গাম্ভীর্য্য লক্ষিত হইত যে, তাঁহার বয়ঃজ্যেষ্ঠ সম্মানিত ব্যক্তিগণও তাহার প্রতিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। তাঁহার চরিত্রে যেরূপ কোমলতা ও দৃঢ়তা সংমিশ্রণ হইয়াছিল তাঁহার দেহেও তদ্রূপ দেখা যাইত। সুন্দর সুঠাম আকৃতি স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় কোমল, কিন্তু শ্রমশীলতায়, ক্ষিপ্রতায়, ও কার্য্যক্ষমতায় সবল পুরুষদিগের ন্যায় কঠিন। তাঁহার ব্যবহারে উচ্চ বংশীয় ব্যক্তির ছাপ ছিল। এক দিন Oxford graduate, ইংরাজ শিক্ষক অস্‌ওয়েল সাহেব রাজকুমারকে Roman patrician এর চাল চলনের দৃষ্টান্ত স্থলে বলিয়াছিলেন Manager এর যেরূপ চাল চলন ও ব্যবহার দেখিতে পাও, patrician দিগের চাল চলন অনেকটা ঐরূপ ছিল। খোসামোদ না করিলে সাহেবদিগের নিকট উন্নতি হওয়া কঠিন তাহা সত্য, কিন্তু সাহেবেরা উচ্চপ্রকৃতি ব্যক্তিগণকে মান্য করিয়া থাকেন। যে সকল সাহেব দেওয়ানের সংশ্রবে আসিয়াছিলেন, সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিতেন। এই কথা অনেক সময় সাহেবেরা লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। খোসামোদ করিয়া অনেক বাঙ্গালী সাহেবের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু সকল সময়ই নির্ভয়ে সত্যকথা বলিয়া সাহেবদিগের সম্মানের ও শ্রদ্ধার পাত্র হন, এইরূপ লোক অতি বিরল।

আমি পূজনীয় দেওয়ানজির চরিত্র সংক্ষেপে যাহা বর্ণনা করিলাম, তাহাতে তাঁহার দেবচরিত্র সম্যকরূপে বিকাশ করিতে পারিয়াছি তাহা বোধ করি না। তিনি সামাজিক মহাবিপ্লবের সময় জন্ম গ্রহণ করিয়া কখনও উচ্ছৃঙ্খল হন নাই, ইন্দ্রিয়াসক্ত রাজ পরিচ্ছদে পরিবেষ্টিত হইয়াও সংযমি ছিলেন, মনমোহিনী সুন্দরীগণের ভালবাসা ও আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে অনুসরণ ও প্রার্থনা করিলেও তাঁহার জিতেন্দ্রিয় চিত্ত কখনও বিচলিত হয় নাই, তিনি অন্যের প্রচুর ধন অনায়াসেই আত্মসাৎ করিবার প্রলোভনের ভিতর নিয়ত থাকিয়াও কখনও মোহ প্রাপ্ত হন নাই, তিনি বৈষয়িক হইয়াও বিশুদ্ধ সত্যবাদী ও অপকট ছিলেন, এক দিনের জন্য কাহারও সহিত চাতুরী করেন নাই। তিনি ধর্ম্ম পথে থাকিয়া জমিদারী পরিচালনা করিয়া জমিদারীর উন্নতি করা যায়, সাধারণ লোকের পক্ষে এ কথা আশ্চর্য্য হইলেও, তাহা স্বকীয় কার্য্যের দ্বারা অসংসয়িত ভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। তিনি তিন পুরুষ নদীয়া জেলার প্রধান রাজ বংশের ভাগ্যের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়াও নিতান্ত বিনয়ী ছিলেন এবং তাঁহার চক্রান্তকারী শত্রুগণ পরাজিত হইলে, তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছিলেন, এবং সাধ্যমত তাহাদিগের উপজীবিকার উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। সংক্ষেপে কবিত্ব, সঙ্গীত, বৈষয়িক জ্ঞান, বিদ্যা, সাধুতা, কোমলতা, দৃঢ়তা, গাম্ভীর্য্য, অসাধারণ ন্যায়পরতা, সত্যবাদীতা, বিনয়, ক্ষমতা, ক্ষমা, এই মহাপুরুষ-চরিত্রে একাধারে সংমিশ্রিত হওয়ায় তাঁহার চরিত্র দেবচরিত্রে পরিণত হইয়াছিল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র লাল রায়।

রাম সিং।

রাম সিং।

সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, পরাঞ্জপে, অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবি বর্ম্মা, কাশীনাথ গণপৎ ত্র্যম্বক ও শশীকুমার হেস প্রমুখ মনস্বী ব্যক্তিগণ নানা বিষয়ে

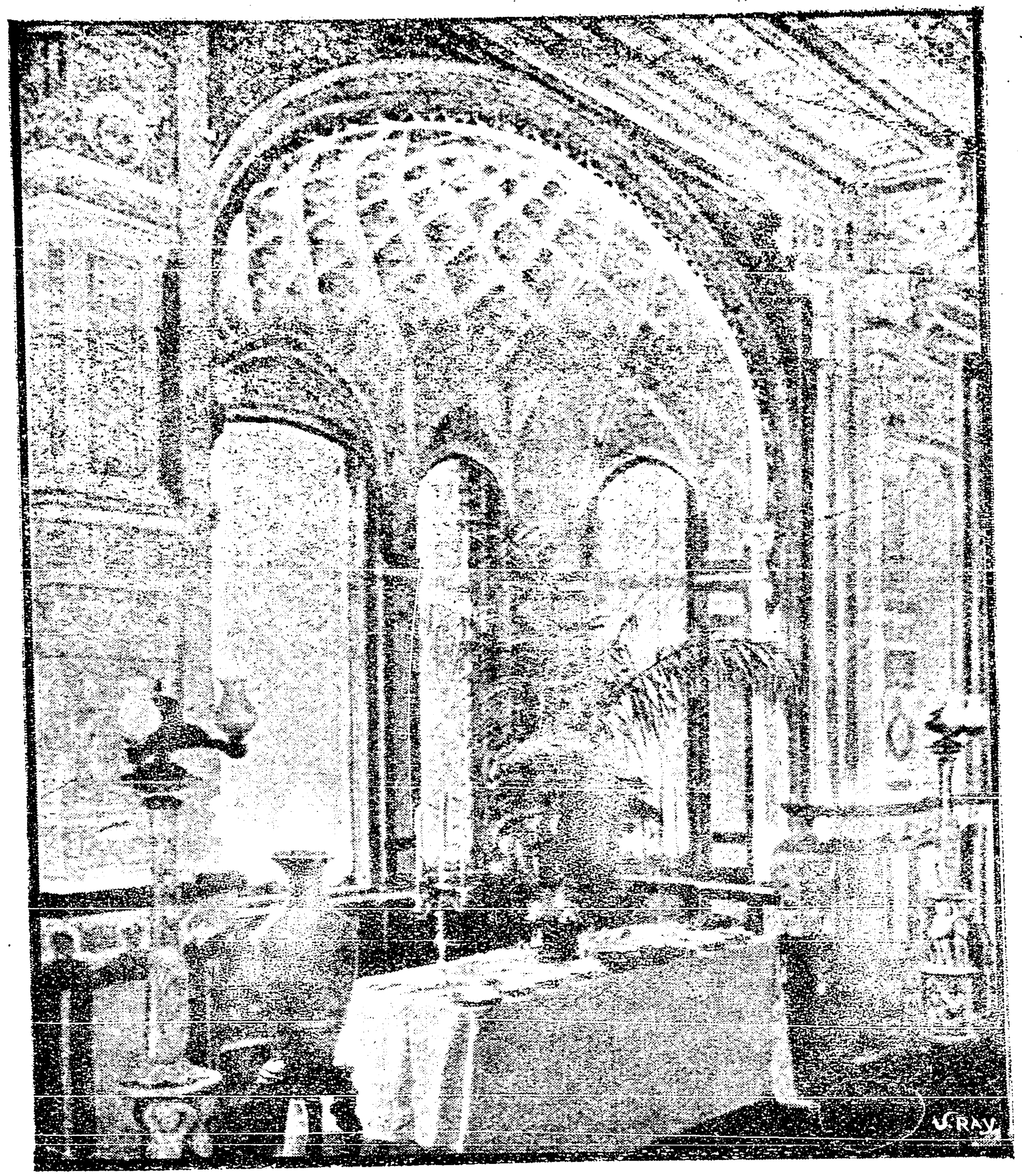

নূতন ভারতীয় দরবার গৃহের পার্শ্ব দৃশ্য।

অদ্ভুত প্রতিভা ও ক্ষমতার পরিচয় দিয়া ভারত মাতার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। শত দুঃখ দারিদ্র্য ও হীনতার মধ্যেও ইঁহাদের নাম স্মরণ করিলে জাতীয় গৌরবে বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠে! বিদেশীয়েরা ভারতবাসীকে যতই অকর্ম্মণ্য মনে করুন না কেন, সুযোগ ও ক্ষেত্র পাইলেই যে তাহারা প্রতিভার পরিচয় দিতে পারে, সে সম্বন্ধে উল্লিখিত প্রতিভান্বিত ব্যক্তিরা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন। আমরা আজ আর একজন প্রতিভান্বিত ব্যক্তির কথা বলিব। তাঁহার নাম রাম সিং। রাম সিং কে, তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কোন্ বিষয়ে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, এ সব কথা অধিকাংশ ভারতবাসীর নিকট অপরিজ্ঞাত থাকিলেও তিনি সুদূর ইংলণ্ডের যাবতীয় শিল্পীর নিকট, বিশেষতঃ আমাদের ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার নিকট, যথেষ্ট পরিমাণে যশোলাভ করিয়াছেন। আমরা এই স্থানে রাম সিংহের কাহিনী সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি।—

লণ্ডনের ওসবোর্ণ প্রাসাদে ভারতীয় দরবার নামে যে বিচিত্র কারুকার্য্যময় সুপ্রশস্ত গৃহ আছে, তাহার নক্সা (Design) এই রাম সিং প্রস্তুত করিয়াছেন। রাম সিং ১৮৫৭ সালে পঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত রসুলপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বয়োপ্রাপ্ত হইলে রাম সিং অমৃতসরের মিশন স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করেন। বাল্যকাল হইতেই সূত্রধরের কার্য্যে তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। মিশন স্কুলে পাঠ সম্পন্ন করিয়া তিনি সূত্রধরের কার্য্য শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুকাল পরে সূত্রধরের কার্য্যে যথেষ্ট পরিমাণে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তথাকার গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক হার্ভি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। হার্ভি সাহেব রাম সিংহের কাজ কর্ম্ম দেখিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীতিলাভ করেন এবং কর্ণেল হোলরোয়েড প্রমুখ অনেক বড় বড় ইয়ুরোপীয় কর্ম্মচারীর সহিত তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দেন। হার্ভি সাহেবের চেষ্টায় রাম সিং পঞ্জাবের বড় বড় সাহেব কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে যথেষ্ট কাজও পাইতে লাগিলেন। ইহারপর রাম সিং কিপ্লিং সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সময় কিপ্লিং সাহেবের চেষ্টায় তথায় মেওস্কুল নামে এক শিল্পবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। রাম সিং এই বিদ্যালয়ের কাঠের আসবাবসমূহ কিপ্লিং সাহেবের অনুরোধে প্রস্তুত করিয়া দেন। কিপ্লিং সাহেব তাঁহার কাজকর্ম্ম দেখিয়া যথেষ্ট সন্তোষ লাভ করেন এবং যাহাতে রাম সিং আরও উন্নতি লাভ করিতে পারেন, তৎপক্ষে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেন। কিছুদিনের মধ্যেই রাম সিংহের কার্য্যপ্রণালী উৎকৃষ্টতর হইয়া উঠিল। কিপ্লিং সাহেব তাঁহাকে অবিলম্বে শিল্পবিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেন।

ভারতীয় দরবার গৃহের সম্মুখ দৃশ্য।

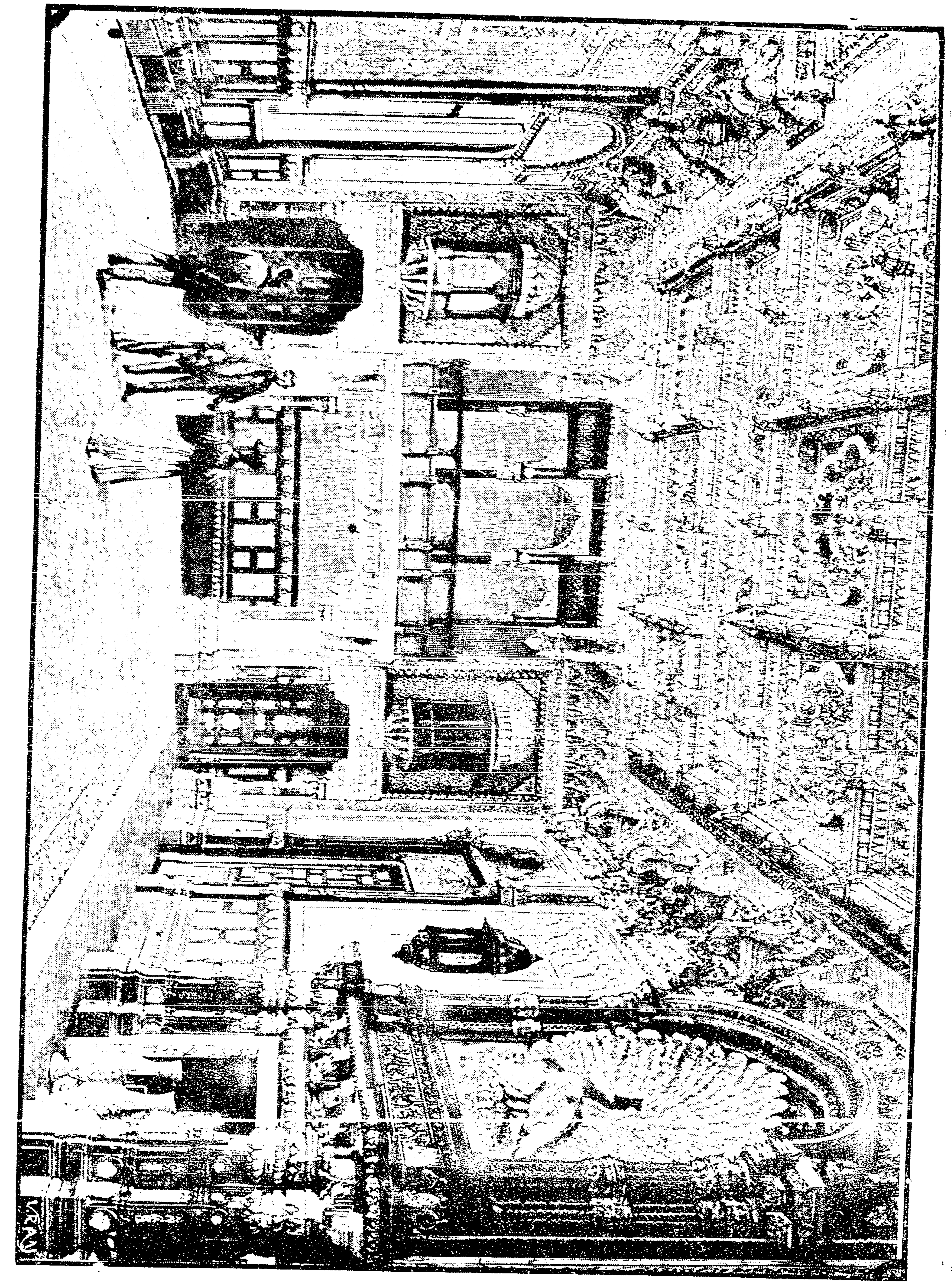

KUNTALINE PRESS.

প্রমাণ— "গোরক্ষ সহদেবশ্চ নকুলো হয় রক্ষকঃ।
বৈরাটে কুরু দায়াদৌ নরাণাং মাতুলক্রমঃ॥"

শুনিতে পাই জৈমিনী ভারতে আছে, কর্ণ শৈল্যকে বিদ্রূপ-চ্ছলে বলিয়াছিলেন, বিরাটভূমে পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাসকালে যদিও সকলেই সেবা ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াছিলেন, তথাপি যুধিষ্ঠিরাদি তিন জন মহৎ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু নকুল সহদেব কুরুবংশে জন্মিয়া গোরক্ষক ও হয় রক্ষকের কার্য্য করিয়াছিলেন। দোষ তাঁহাদের নহে—তোমারই, কেন না

"নরাণাং মাতুলক্রমঃ"।

পুরাকালে বোধ হয় শ্বশুরাত্মজ সম্বন্ধটা এতখানি মধুর রসাত্মক ছিল না, কিন্তু তাই বা কেমন করিয়া বলি— **'অসারং খলুসংসারং—'** এওত সেকালেরই কথা, তা, এর মূলটা জানেন?

অসারং খলু সংসারং সারং শ্বশুর মন্দিরং
হিমালয়ে হর শেতে হরি শেতে মহোদধৌ!

(পাঠান্তর)

অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুর মন্দিরম্
হরো হিমালয়ে শেতে, বিষ্ণু শেতে মহোদধৌ।

দেবাদিদেব মহাদেব শ্বশুরালয় হিমালয়ে এবং ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং মহোদোধিতে সুপ্ত। তবে আর—

"অন্য পরে কা কথা।"

'জাতঃ সূর্য্যকুলে পিতা, দশরথঃ ক্ষোণীভূজামগ্রণীঃ
সীতা সত্যপরায়ণা প্রণয়িণী যস্যানুজো লক্ষ্মণঃ।
দোর্দ্দণ্ডেন সমো নচাস্তি ভুবনে প্রত্যক্ষো বিষ্ণুঃ স্বয়ং
রামো যেন বিড়ম্বিতোঽপি বিধিনা চান্যে পরে কা কথা,

যাহার সূর্য্যকুলে জন্ম, নৃপতি শ্রেষ্ঠ দশরথ যাহার পিতা, সত্যপরায়ণা সীতা যাঁহার প্রণয়িণী, লক্ষ্মণ যাঁহার অনুজ, অদ্বিতীয় প্রতাপ প্রত্যক্ষ বিষ্ণু সেই রামচন্দ্রই যখন বিধি কর্ত্তৃক বিড়ম্বিত হইয়াছিলেন, তখন আর অন্যের কথায় কাজ কি? তাই লোকে বলে,

নিয়তি কেন বাধ্যতে।

মাতুলো যস্য গোবিন্দঃ পিতা যস্য ধনঞ্জয়ঃ
সোঽভিমন্যু রণে শেতে, নিয়তি কেন বাধ্যতে।

গোবিন্দ যাহার মাতুল, অর্জ্জুন যাহার পিতা, এ হেন অভিমন্যু রণক্ষেত্রে শায়িত! হায়, দশচক্রে ভগবান ভূত!

ভগবান ভূতানা গতঃ।

তা, এই ভূতের বৃত্তান্তটা শুনুন। ভগবান নামে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কোন রাজার বড়ই প্রিয়পাত্র ছিলেন, তিনি যাহা বলিতেন, ভাল মন্দ বিচার না করিয়া নিরীহ রাজাটী তৃতীয় পক্ষের গৃহিণীর আদেশের ন্যায় বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাই পালন করিতেন। ক্রমে ভগবান অপ্রতিহত ক্ষমতা প্রভাবে রাজসভাসদ ও রাজকীয় কর্ম্মচারিগণকে নিতান্তই জ্বালাতন করিয়া তুলিলেন। তখন সকলে মিলিয়া যুক্তি আঁটিয়া, ভগবানের রাজদরবারে প্রবেশের পথ বন্ধ করিয়া দিলেন,—আর ভগবান-সংবাদ-জিজ্ঞাসু রাজাকে রাজ বৈদ্য ও পারিষদবর্গ শুনাইলেন, ভগবান সহসা বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন! এ দিকে ভগবান রাজদরবারে প্রবেশ করিতে না পারিয়া দৌবারিকগণের তোষামদে প্রবৃত্ত হইলেন কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় কান দেয় না। যেন—**"কাকস্য পরিবেদনা"** (কাকের পরিবেদনা নাই) তা আগেই এই প্রবাদ বাক্যের মূলটা অনুধাবন করা যাক্।

(১) এক বৃক্ষ সমারূঢ়া নানা পক্ষি বিহঙ্গমাঃ
প্রভাতে তু দিশং যান্তি কাকস্য পরিবেদনা।
(২) কস্য মাতা কস্য পিতা, কস্য ভ্রাতা সহোদরা
কায়ে প্রাণেন সম্বন্ধঃ কাকস্য পরিবেদনা।
(৩) বনানাং বনকাষ্ঠানাং নদী স্রোত সুসঙ্গমঃ
সঙ্গমেপি পুনর্ভঙ্গ কাকস্য পরিবেদনা।
(৪) দুর্দূরান্তপথশ্রান্তাশ্চায়াং যান্তিচ শীতলাং,
শীতলাশ্চ পুনর্য্যান্তি কাকস্য পরিবেদনা।

ইহার বাংলা অনুবাদ অনাবশ্যক। ভগবান বেচারার অনুরোধে প্রসন্ন হওয়া দূরে থাক, সকলেই তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিল। কেহ বা ভাবিতে লাগিল—**"স্থানস্থিত কাপুরুষোঽপি সিংহ"** স্থান চ্যুত হইয়া এমনই হাস্যাস্পদ হয়। কাপুরুষ সিংহের কথাটা জানেন কি?

জানামিরে সর্প তব প্রভাবং
কণ্ঠস্থিতো গর্জ্জসি শঙ্করস্য।
স্থানং প্রধানং ন বলং প্রধানং
স্থানস্থিতঃ কাপুরুষোঽপি সিংহঃ॥

এক দিন মহাদেবের নিকট গরুড় পক্ষী উপস্থিত হইলে গরুড়কে দেখিয়া মহাদেবের কণ্ঠস্থিত সর্প গর্জ্জন করিতে লাগিল, তাহাতে গরুড় সর্পকে সম্বোধন করিয়া কহিল "আরে সর্প তোর প্রতাপ আমি বেশই জানি; এখন কেবল মহাদেবের কণ্ঠে আছিস বলিয়া তর্জ্জন করিতে সাহস করিতেছিস। হায়, স্থানই প্রধান, বল প্রধান নহে; কেননা স্থান বিশেষে আশ্রয় পাইলে কাপুরুষও সিংহ তুল্য হয়।"

আমরা কিন্তু কথায় কথায় ভগবানকে ছাড়িয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। ভগবান কিছুতেই রাজদরবারে প্রবেশ করিতে না পারিয়া রাজদর্শনের সুবিধা অন্বেষণে ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতে লাগিল। এইরূপে কিছু দিন যায়, ইতিমধ্যে রাজা এক দিন নগর ভ্রমণে বাহির হইলেন। ভগবানের শত্রুপক্ষ পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক ছিলেন, সুতরাং ভগবান প্রকাশ্য রাজপথে সে দিন স্থান পাইবেন না তাহা বুঝিয়াই পূর্ব্ব হইতে রাজপথস্থ কোন উচ্চ বৃক্ষে আশ্রয় লইয়াছিলেন। রাজা সেই বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র ভগবান উচ্চৈস্বরে সম্বোধন করিয়া আত্মদুঃখ কাহিনী কহিতে লাগিলেন। তখন রাজপারিষদবর্গ তত্ত্বজিজ্ঞাসু রাজাকে ভগবান লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়া ভূতযোনী আশ্রয় করিয়াছে, বুঝাইয়া সে স্থান হইতে চকিত রাজেন্দ্র সহ ত্বরিতপদে গমন করিলেন। তখন ভগবান মনদুঃখে আপনার মনে বলিতে লাগিলেন—

চক্রসেরং নৃপঃ সেবা
নসেব কেবলং নৃপঃ
অহো চক্রস্য মাহাত্ম্যাং
ভগবান ভূতত্বাং গতঃ।

দশে কি না করিতে পারে? দশের চক্রে মহাবীর অভিমন্যু শক্তি ও সহায় সত্ত্বেও ব্যূহচক্র হইতে নির্গমের পথ না পাইয়া সপ্তরথীর হাতে প্রাণ হারাইয়াছিলেন, তাইত লোকে বলে

ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র
ন বিদ্যা ন চ পৌরুষং।

হরি হর উভয়েই সমান, তবু সমুদ্রমন্থনে এক মাত্রায় পৃথক ফল হইল,

সমুদ্রমন্থনে লেভে হরিলক্ষ্মীং হরোবিষং
ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র নবিদ্যা নচ পৌরুষং।

কাজেই সাধারণে বিশ্বাস করে,—

কপালঃ কপালঃ মূলঃ
কিম্বা স্বয়ম্ভূঃ শিবশক্তি বিষ্ণুঃ
কপাল দুঃখং ন করোতি দূরং
অতঃ পরোজীব স্বকর্ম্মভোগঃ
কপালঃ কপালঃ কপালঃ মূলঃ।

আর এই সকল কঠিন তথ্য ভাবিতে ভাবিতে সত্যই প্রাণ কাঠ হইয়া আসে।

"দারু ভূতো মুরারি।"

"এক ভার্য্যা প্রকৃতি মুখরা, চঞ্চলাচ দ্বিতীয়া,
পুত্রোঽপ্যেকো ভুবনবিজয়ী মন্মথো দুর্নিবারঃ
শেষ শয্যা বসতি জলধৌ বাহনং পন্নগারিঃ
স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং দারুভূতো মুরারিঃ।"

পাঠক এই প্রবাদ প্রসঙ্গে অনুস্বর বিসর্গের মাত্রাটা কিছু অধিক দেখিয়া বোধ হয় বিরক্ত হইতেছেন, কিন্তু আমারও আর বেশী অবশিষ্ট নাই

"স্বল্পা তিষ্ঠতি শর্ব্বরী।"

"গতা বহুতরা কান্তে স্বল্পা তিষ্ঠতি শর্ব্বরী
ইতি চিত্তে সমাধায় কুরু সজ্জন রঞ্জনং।"

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

তিলে তাল।

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ছেলে বেলা হইতে শুনিয়া আসিতেছি ক্ষুদ্র জিনিসকে ক্ষুদ্র বলিয়া অবহেলা করিতে নাই, অনেকে অনেক দৃষ্টান্ত দ্বারা এ কথা সপ্রমাণ করেন। অতি ক্ষুদ্র অগ্নি কণায় একটি বৃহৎ নগর ভস্মীভূত হইতে পারে, সামান্য একটি ব্যাধি ক্রমে মৃত্যুর কারণ হইয়া উঠে, ক্ষুদ্র একটি মিথ্যা কথা দ্বারা কত লোকের সর্ব্বনাশ হইতে দেখা যায়। এইরূপে তিল হইতে তালের সৃষ্টি হয়। আমার হাত দিয়া এইরূপ এক তিল হইতে তালের সৃষ্টি হইয়াছিল, কথাটা আজও ভুলি নাই।

প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে কোন বিশেষ সরকারী কাজের

জন্য আমাদের সার্ব্বিশ বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট হইতে বোম্বে গবর্ণমেণ্টে "ট্রান্সফার" হইয়া যায়; বাঙ্গালী সহজে বাঙ্গালা-দেশ ছাড়িতে চাহে না, কিন্তু যৌবনের উদ্দীপনায় ও ভবিষ্যৎ গৌরব লাভের উজ্জ্বল আশায় মুগ্ধ হইয়া আমরা কয়েকজন বঙ্গ যুবক মাতৃভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বোম্বে অঞ্চলে ডিটেক্‌টিভগিরি করিতে সম্মত হইলাম। পুণা সহর আমার হেড্ কোয়ার্টার হইল, সরকারী কাজের জন্য আমাকে প্রায়ই মফঃস্বলে ঘুরিতে হইত। ভাল ডিটেক্‌টিভ বলিয়া অল্প দিনের মধ্যেই আমার কিছু নাম হইয়াছিল। সুনাম ভাগ্যের উপর নির্ভর করে, আমি সৌভাগ্যবান ছিলাম কি না জানি না; তবে আমাদের ডিপার্টমেণ্টে আমার অপেক্ষা দক্ষ লোকের অভাব ছিল না।

পৌষ মাসের সকাল বেলা একদিন বাসায় বসিয়া আছি, এমন সময় আমাদের বড় সাহেবের নিকট হইতে আমি এক পত্র পাইলাম, পত্রখানি তিন ছত্রে সম্পূর্ণ। সাহেব আদেশ করিয়াছেন, আমি যেন অবিলম্বে ডাক্তার শঙ্কর নারায়ণ পাঠকরের সহিত সাক্ষাৎ করি। ডাক্তার পাঠকরের সহিত আমার আলাপ ছিল না, কিন্তু পুণা অঞ্চলে কে তাঁহাকে না চিনিত? পুণা সহরে দেশীয় ডাক্তারদিগের মধ্যে আর কাহারো তাঁহার মত পসার প্রতিপত্তি ছিল না।

একখানা টাঙ্গা (এক রকম টমটম গাড়ী) ডাকাইয়া প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যে ডাক্তারের গৃহে উপস্থিত হইলাম। কার্ড পাঠাইতেই ডাক্তার স্বয়ং দ্বার প্রান্তে আসিয়া তাঁহার প্রাসাদ তুল্য প্রকাণ্ড অট্টালিকার একটি নিভৃত কক্ষে আমাকে লইয়া গেলেন।—আমি জানিতাম না আমি কি জন্য সেখানে আহুত হইয়াছি, কিন্তু ডাক্তারের সহিত কর কম্পনের সময় একবার তাঁহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিতেই বুঝিলাম, তাঁহার কোন গুরুতর বিপদ উপস্থিত। উদার ও প্রশান্ত মুখখানি সুগম্ভীর, হৃদয়ের অনন্ত চিন্তার উদ্বেলিত তরঙ্গ মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত; আমি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া একখানি চেয়ারে বসিলাম।

ডাক্তার আমার পাশ হইতে সম্মুখে চেয়ার টানিয়া তাহার উপর বসিয়া বলিলেন, "কাল রাত্রে একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, আমার বড় বিপদ, বিশ বৎসর ডাক্তারি করিতেছি, এমন বিপদে আর কখন পড়ি নাই।"

আমি ঔৎসুক্যভরে বলিলাম, "ব্যাপার কি খুলিয়া বলুন, আমার দ্বারা কোন প্রকার প্রতিবিধানের উপায় থাকিলে তাহার ত্রুটী হইবে না।"

ডাক্তার বলিতে লাগিলেন, "এই সহরের মধ্যে গোবিন্দ রাও সিন্ধে নামক একজন বড় জায়গীরদার ছিলেন, তিনি কিছুদিন হইতে জরে ভুগিতে ছিলেন, আমিই তাঁহার পারিবারিক চিকিৎসক; গতরাত্রে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে—অত্যন্ত শোচনীয় মৃত্যু! কালরাত্রে তাঁহার জর বিরামের জন্য একটা ঔষধ পাঠাই, সেই ঔষধ সেবনেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ঔষধ বিষ মিশ্রিত ছিল, এখন এরূপ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আমার কথা বুঝিয়াছেন?"

আমি বলিলাম, "বুঝিয়াছি, সেই ঔষধ আপনার স্বহস্তে প্রস্তুত করা?"

"হাঁ!"

"আপনি কি সকল ঔষধই স্বহস্তে প্রস্তুত করেন?"

"না, আমার কম্পাউণ্ডার কোন কারণে অনুপস্থিত থাকিলে সময়ে সময়ে আমিই ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিই। কাল রাত্রে যখন সিন্ধে সাহেবের সেই ঔষধটা প্রস্তুত করা আবশ্যক হইল, তখন কম্পাউণ্ডার এখানে ছিল না। ঔষধ তৈয়েরী করিয়া আমি আমার বিল কালেক্টর বাবাজীরাও যোশীর হাত দিয়া তাহা রোগীর গৃহে পাঠাইয়াছিলাম। সে ঔষধে বিষ কোথা হইতে আসিল আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, এই মৃত্যুর মধ্যে যে গুপ্ত রহস্য রহিয়া গিয়াছে, তাহা ভেদ করিয়া যদি আমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ পূর্ব্বক আমায় উদ্ধার করিতে পারেন ত আমি চিরজীবন আপনার নিকট বিক্রীত রহিব। আজ বেলা তিনটার সময় করোনার মৃত্যুর কারণানুসন্ধানে যাইবেন; খুব সম্ভব আমিই অপরাধী বলিয়া দাওরা সোপর্দ্দ হইব, বুড়া বয়সে মান সম্ভ্রম সমস্তই গেল, শেষে খুনের দায়ে পড়িলাম।" বৃদ্ধ ডাক্তারের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত উদ্বেগপূর্ণ ও কাতর।

আমি বলিলাম, "আপনি এতটা উৎকণ্ঠিত হইবেন না, বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন আবশ্যক এ কথা আপনাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া বাহুল্য মাত্র; প্রকৃত অবস্থাটা আপনি আর একটু খুলিয়া বলুন; বুঝিতেছি এই হত্যা ব্যাপার বড়ই বিস্ময়োৎপাদক।"

ডাক্তার বলিলেন, "সিন্ধে সাহেব কিছুদিন হইতে জরে ভুগিতেছিলেন, তিনি আমার একজন সম্ভ্রান্ত বন্ধু। কাল

সন্ধ্যার পর আমি তাঁহাকে দেখিতে যাই, তখনও জর ছিল। আমি তাঁহাকে বলিয়া আসিলাম, জর ত্যাগের একটা ঔষধ পাঠাইয়া দিব, তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করিবেন। রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া সেই ঔষধটা পাঠাইতে প্রায় দশটা বাজিয়াছিল।

"রাত্রি এগারোটার সময় আহারাদি করিয়া শুইয়াছি, হঠাৎ একজন সোয়ার আসিয়া খবর দিল, সিন্ধে সাহেবের পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, তিনি যন্ত্রনায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন, আমাকে অবিলম্বে যাইতে হইবে। আমি তৎক্ষণাৎ কোচোয়ানকে গাড়ী যুতিতে বলিলাম। মনে কিছু বিস্ময় জন্মিয়াছিল। রাত্রি আটটার সময় তাঁহার শরীর যেরূপ দেখিয়া আসিয়াছি, তাহাতে অকস্মাৎ রোগ বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা ছিল না,—মিনিট পনেরো পরে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার শয়নকক্ষে গিয়া দেখিলাম সিন্ধে সাহেব বিছানায় পড়িয়া ছটফট্ করিতেছেন; আমি তাঁহার শয্যা প্রান্তে বসিয়া তাঁহার বুকে হাত দিলাম, ললাট স্পর্শ করিলাম, সর্ব্বাঙ্গ শীতল, দেহ ঘর্ম্মাপ্লুত, নাড়ীর গতি যাহা দেখিলাম তাহাতে বিশ্বাস হইল না। বুঝিলাম রোগীর মৃত্যুর বিলম্ব নাই।"

"সিন্ধে সাহেবের তখনও জ্ঞান ছিল, আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "ডাক্তার আমিত ভাই আর বাঁচি না; বোধ হয় বিষ খাইয়াছি, তোমার ঔষধে বিষ? উঃ—কি জ্বালা, সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল।" —তাঁহাকে আর অধিক কথা বলিতে হইল না, অবসন্ন দেহ অসাড় হইয়া পড়িল, চক্ষুতারকা ঊর্দ্ধে উঠিল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁহার যন্ত্রণাকাতর দেহবিবর হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল।"

"কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে কয়েক মুহূর্ত্ত আমি নির্ব্বাক বসিয়া রহিলাম, আগাগোড়া সমস্ত কাণ্ডটা ভৌতিক বলিয়া মনে হইতে লাগিল।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"আমি সিন্ধে সাহেবের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়াই একটা বড় অপ্রীতিকর গন্ধ পাইয়াছিলাম, তাঁহার মৃত্যু লক্ষণ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, কোন প্রকার তীব্র এসিড সেবনই তাঁহার মৃত্যুর একমাত্র কারণ।"

"ভাবিয়া দেখিলাম আর বৃথা সময় নষ্ট করা উচিত নহে, প্রথমেই আমি যে ঔষধ দিয়াছিলাম তাহার শিশিটা পরীক্ষা করিলাম। তিনদাগ ঔষধ ছিল, সিন্ধে সাহেব একদাগ মাত্র সেবন করিয়াছিলেন অবশিষ্ট দুই দাগ শিশিতে ছিল। শিশির কাক খুলিয়া নাকের কাছে ঔষধটা ধরিলাম—কি সর্ব্বনাশ, জরের মিকশ্চারের সঙ্গে ভয়ঙ্কর বিষ, প্রুসিক এসিড সংমিশ্রিত!—ধীরে ধীরে আমি ঔষধের শিশি নামাইয়া রাখিয়া কক্ষের বাহিরে আসিলাম, আমার ললাট বহিয়া দর দর করিয়া ঘাম ছুটিতে লাগিল, একজন সোয়ারকে তৎক্ষণাৎ কোতোয়ালীতে খবর দিতে পাঠাইলাম। যে সব ইনেস্পেক্টর নাইট ডিউটিতে ছিল, সে প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যে আসিয়া সকল কথা লিখিয়া লইল, জেলার ডাক্তার সাহেব আসিয়াও মৃতদেহ পরীক্ষা করিলেন, তিনিও বলিলেন প্রুসিক এসিড পানই রোগীর মৃত্যুর একমাত্র কারণ।

"ডাক্তার সাহেব আমাকে বিশেষ কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া যে কিছু প্রয়োজনীয় নোট লিখিয়া লওয়া কর্ত্তব্য তাহা লইলেন, অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মৃত দেহ বলিয়া আর তাহা সরকারী হাঁসপাতালে অপসারিত করা হইল না। বাড়ীতে রীতিমত পুলিশ কনেষ্টবল মোতাইন করা হইল। মৃত দেহের এখনও সৎকার হয় নাই, আজ বেলা তিনটার সময় করোনারের পরীক্ষা হইবে, করোনার ও জুরীগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে তাহা কাহারও বুঝিতে বাকি নাই। ডাক্তারের বিশ্বাসও ত তাহাই। আমার এতদিনের মান সম্ভ্রম, পসার প্রতিপত্তি সমস্তই নষ্ট হইল"—ডাক্তার পাঠকর সহসা আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া আবেগভরে বলিলেন, "আমার এই মান সম্ভ্রম রক্ষা কর, আমার সর্ব্বস্ব লইয়া আমার সুনাম বজায় করিয়া দাও, না পার বল, কিরূপে মরিলে আমার মান সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ থাকে। মৃত্যুভয়ে আমি কাতর নহি—ব্রাহ্মণ বটে, কিন্তু আমরা মহারাষ্ট্র দেশবাসী।"

আমি বাঙ্গালী আর ডাক্তার দক্ষিণী ব্রাহ্মণ। ভিন্ন জাতীয় হইলেও ডাক্তারের সহিত সমবেদনায় আমার হৃদয় পূর্ণ হইল। মনে হইল ডাক্তার মানুষ, আমিও মানুষ; মানুষকে রক্ষা করা মানুষের অবশ্য কর্ত্তব্য, যদি সেই মানুষ বাস্তবিকই নির্দ্দোষী হয়; নির্দ্দোষীর প্রতি দণ্ডবিধানে আইনেরও অধিকার নাই। অনেক দিন হইতে ডিটেক্

টিভের কর্ম্ম করিতেছি, আজও কি মানুষ চিনিতে পারি না ? ডাক্তার যে নির্দ্দোষী তাহা তাঁহার চক্ষু দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম। স্থির করিলাম যেমন করিয়া হোক ডাক্তারকে বাঁচাইতে হইবে ; মুখে কোন কথা বলিলাম না, পথের সন্ধানে কেবল অন্ধকারের মধ্যে ঘুরিতে লাগিলাম।

আমার সময় সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছিল, আমি ডাক্তারকে বলিলাম, "আপনার ঔষধবাহক সেই বিল সরকারটিকে একবার দেখিতে চাই।"

ডাক্তার মহাশয় হাঁকিলেন—"রাঘোবা।"

মাথায় প্রকাণ্ড পাগ্‌ড়ী আঁটিয়া চাপকান পরা আরদালী রাঘোবা ধীরে ধীরে, সেই কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক ডাক্তারকে অভিবাদন করিল।

বিল সরকারকে ডাকিয়া আনিবার জন্য ডাক্তার আদেশ করিলেন।

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে অনুমান পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স্ক এক যুবক আমার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। তাহার মস্তকে লম্বা চুল, মুখে নিবিড় দাড়ী গোঁপ, আমার অভিজ্ঞতায় এরূপ কোনও দাড়ি গোঁপ সমন্বিত যুবক ও অঞ্চলে আর দ্বিতীয় দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না। দাড়ী গোঁফের জন্য যুবককে কিছু অধিক বয়স্ক বলিয়াই বোধ হইল। আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলাম, যদি এই হত্যা রহস্য সম্বন্ধীয় কোন চিহ্ন তাহার মুখে ভাবের অতর্কিত পরিবর্ত্তনের মধ্যে ধরিতে পারি ; দুই তিনবার তাহার আপাদ মস্তক বেশ ভাল করিয়া দেখিলাম, যুবক আমার সেই অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছু মাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া লম্বা দাঁড়াইয়া রহিল।

বিল সরকারকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলাম ; সে ভারি চট্‌ পট্‌ তাহার নাম, বাসস্থান ও জেলার পরিচয় দিল। বেশী কিছু কথা তাহার কাছে পাইলাম না। সে বলিল ঔষধ নিজে লইয়া গিয়া সিন্ধে সাহেবের দরোয়ান রঘুবীরের হস্তে প্রদান করিয়াছিল, তখন রাত্রি দশটার কিছু বেশী। সে এ কথাও প্রকাশ করিল যে, যখন সে তাহার মনিবের নিকট এই ঔষধের শিশি পায় তখন তিনি কোন প্রকার অধীরতা প্রকাশ করেন নাই। সেই শিশিতে কোন রকম মারাত্মক বিষ আছে এরূপ সন্দেহের কোন কারণই ঘটে নাই।

আমি আর একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক দেখিলাম, তাহার পর বলিলাম, "তুমি এখন যাইতে পার।" যুবক তৎক্ষণাৎ নমস্কার করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

আমাদের উভয়েরই বিশ্বাস জন্মিল, এই বিল সরকারের সিন্ধে সাহেবের প্রাণনাশ করিবার কোনই উদ্দেশ্য দেখা যায় না, সুতরাং বিল সরকারকে বিদায় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার কথা ভুলিয়া গেলাম।

একটু চিন্তার পর ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সিন্ধে সাহেবের চাকরেরা বিশ্বাসী ত ? পরিবারের মধ্যে কে কে আছে ?"

"চাকরেরা সকলেই সিন্ধে সাহেবকে নিজের বাপের মত ভক্তি শ্রদ্ধা করিত, এমন দয়ালু ভৃত্যবৎসল মনিব তাহারা আর কোথায় পাইবে ? পরিবারের মধ্যে এখন আর কেহই নাই। তাঁহার স্ত্রীর অনেক দিন নিঃসন্তান মৃত্যু হইয়াছে, তাহার পর আর বিবাহ করেন নাই ; রত্নগিরিতে শুনিয়াছি তাঁহার এক বিধবা পিসি আছেন, আর একটা অসচ্চরিত্র গোঁয়ার ভাই ছিল, তিন চারি বৎসর হইল, সেও নিরুদ্দেশ হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "এই ভাই-ই কি তাহা হইলে তাঁহার একমাত্র উত্তরাধিকারী ?"

ডাক্তার উত্তর দিলেন, "বাঁচিয়া থাকিলে বটে ; বাঁচিয়া থাকিলে এই দুর্ঘটনার পর নিশ্চয়ই সে এখানে আসিবে, সিন্ধে সাহেবের মৃত্যু সংবাদ গোপন রহিবে না, আর পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়ের জায়গীরও উপেক্ষা করিবার জিনিস নহে।"

"তা বটে," বলিয়া আমি উঠিলাম। বলিলাম, "করোনারের ইন্‌কোয়েষ্ট আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আমাকে একটু সংবাদ দিবেন, আর একটা কথা, আপনি কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা করিবেন না। গোয়েন্দা গিরি কর্ম্মে আমি শিশু নহি, অপরাধীকে ধরিবার উপায় শীঘ্রই হইবে, মানুষের যাহা সাধ্য আপনাকে রক্ষা করিতে আমি তাহা করিব।"

কৃতজ্ঞতাভরে ডাক্তার আমার কর কম্পন করিলেন ; আমি ভাবিতে ভাবিতে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যথাসময়ে আফিসে আসিলাম, কিন্তু চিন্তা সাগরে আমি ডুবিয়া রহিলাম। হত্যাকারীকে ধরিবার যেটুকু উপকরণ

সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে আমার পথ কিছুমাত্র পরিষ্কার দেখিলাম না : ডাক্তারের বিরুদ্ধেইত সকল প্রমাণ ; জুরী মহাশয়েরা এক বাক্যে বলিবেন, ডাক্তার ঔষধ প্রস্তুত করিবার সময় জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এই বিষ মিশাইয়া রোগীর প্রাণনাশের কারণ হইয়াছে—ডাক্তারের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

বেলা দুইটার সময় আফিসে বসিয়াই ডাক্তারের এক পত্র পাইলাম। তিনি বেলা তিনটার পূর্ব্বেই আমাকে সিন্ধে সাহেবের গৃহে উপস্থিত হইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। লিখিয়াছেন এই—বিপদ সমুদ্রে আমিই তাঁহার একমাত্র ভরসা ; পত্রের শেষে লিখিয়াছেন. "আর একটা অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব নূতন সংবাদ আছে, আমার বিল সরকার প্রাতঃকালে, আপনি সেই জবানবন্দী লওয়ার পরই, অন্তর্হিত হইয়াছে ; কোথায় পলাইয়াছে তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, আমার বাড়ীতে তাহার একটা ব্যাগ ছিল, তাহাও লইয়া গিয়াছে। তাহার অন্তর্ধানের সহিত এই হত্যারহস্যের কোন সম্বন্ধ আছে কি না জানি না, কিন্তু আমার বোধ হয় এই ঘটনার পর সকলেরই সন্দেহ হইবে যে আমিই নিজের কোন গুপ্ত অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্যই তাহাকে সরাইয়া দিয়াছি। তাহাকে ধরিবার কোন উপায় থাকিলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা করিবেন, দেখিতেছি বিধাতা আমার প্রতি একান্ত বিমুখ।"

পত্রখানি পড়িয়া বিল সরকারের পলায়নের কি কারণ থাকিতে পারে সেই কথা ভাবিতে লাগিলাম। তাহার সহিত এই হত্যাব্যাপারের সত্যই কি কোন সম্বন্ধ আছে, কাহারও স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া লোভের বশে কি সে এই ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে ? কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বেলা প্রায় আড়াইটার সময় অপ্রসন্ন মনে সিন্ধে সাহেবের বাড়ী উপস্থিত হইলাম।

ডাক্তার পাঠকর পূর্ব্বেই আসিয়াছিলেন, করোনার কিম্বা জুরীগণ তখনো সেখানে উপস্থিত হন নাই। ডাক্তারের শুষ্ক মুখ দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হইল, আমি তাঁহাকে বলিলাম, "এত অল্প সময়ের মধ্যে আমি বিল সরকারের কোন সন্ধান করিয়া উঠিতে পারি নাই।"

ডাক্তার বর্ষণোন্মুখ-মেঘের ন্যায় মুখকান্তি গম্ভীর করিয়া বলিলেন—"আমার যেটুকু আশা ছিল, তাহাও বিলুপ্ত হইল ; আমি স্পষ্ট বুঝিতেছি আর অব্যাহতি লাভের কোন উপায় নাই।"

ডাক্তারের কথার প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা-দানের কোন উপায় দেখিলাম না ; কি বলিব ভাবিতেছি, এমন সময় জুরীগণের সহিত করোনার ম্যাকার্থী সাহেব সেখানে প্রবেশ করিলেন। ডাক্তার ও আমি নীরবে করোনারের অনুসরণ করিলাম।

জুরীগণ যথারীতি প্রতিজ্ঞা করিয়া বিচারে বসিলেন ; সাক্ষীগণের জবানবন্দী আরম্ভ হইল। সাক্ষীর সংখ্যা অধিক নহে, ডাক্তার পাঠকর, একজন সোয়ার, একজন ভৃত্য, আর মৃত সিন্ধে সাহেবের নবাগত ভ্রাতা, জায়গীরের বর্ত্তমান অধিকারী ভিখাজীরাও সিন্ধে, এই কয়েক জন মাত্র সাক্ষী।

সোওয়ার ও ভৃত্যের জবান বন্দীতে বিশেষ কোন কথাই পাওয়া গেল না। তাহাদের জবানবন্দীর পর ডাক্তারের জবানবন্দী লওয়া হইল। করোনার ডাক্তারকে যেরূপ ভাবে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, তাহাতে আমার স্পষ্ট বোধ হইল ডাক্তারকেই তিনি অপরাধী বলিয়া সন্দেহ করিতেছেন। তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছে ইচ্ছা পূর্ব্বকই হোক, আর ভ্রম ক্রমেই হোক ঔষধের সহিত সুতীব্র বিষ মিশাইয়া তিনিই সিন্ধে সাহেবের মৃত্যুর কারণ হইয়াছেন। ডাক্তার করোনারের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন, জবানবন্দী শেষে তিনি অত্যন্ত অধীর ভাবে বসিয়া পড়িলেন, পরিত্রাণের আশা তাঁহার হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হইল। বেচারার জন্য আমি বড়ই ব্যাকুল হইলাম। শেষ সাক্ষী ভিখাজীরাও সিন্ধে।

ভিখাজীরাও পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসরের যুবক ; দাড়ী গোঁপ পরিষ্কার করিয়া কামানো, মস্তকের সম্মুখভাগও কামানো ; তাহার উপর সাচ্চার হাসিয়াদার একটি লাল পাগড়ী। গায়ে রেসমের লম্বা কোট, তাহার উপর অর্দ্ধ হস্ত চওড়া লাল পেড়ে দেশী চাদর, পরিধানে চওড়া পাড় বিশিষ্ট একখানি দেশী কাপড়, পায়ে এক জোড়া ঘোর লালবর্ণ মারাঠা চটি, সাপের ফণা উল্টাইলে যেমন দেখায়, তাহার অগ্রভাগটা সেই আকারের। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন মারাঠা মুলুকে আমাদের বাঙ্গলা দেশের মত বাবুগিরি প্রবেশ লাভ করে নাই ; এমন কি, এ বিষয়ে এখনও মহারাষ্ট্র দেশ বঙ্গভূমির বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে।

ভিখাজীরাও সাক্ষী দিতে উঠিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর কিছু চাপা, তিনি অল্প ইংরাজী জানেন, মারাঠা ভাষাতেই তাঁহার বক্তব্য বলিতে লাগিলেন। তিনি যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্ম এই যে, প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে তিনি গৃহ হইতে দেশান্তর যাত্রা করেন; এতদিন বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন, প্রায় দশ দিন পূর্ব্বে তিনি বোম্বে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাঁহাদের কয়েক জন সম্ভ্রান্ত আত্মীয়ের অতিথি রূপে সেখানে বাস করিতেছিলেন। সেই দিন প্রভাতে পুনা সহরে পৌছিয়াছেন, পৌছিয়াই ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদ শুনিতে পাইয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতার আত্মহত্যা করিবার কোন কারণ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। বর্ত্তমান দুর্ঘটনার অন্য কোন কারণ থাকিতে পারে, সে কারণ কি তাহার তিনি বিন্দু বিসর্গও অবগত নহেন। তাঁহার বিশ্বাস তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যুতে ডাক্তার পাঠকরের কোন স্বার্থ নাই।

এই পর্য্যন্ত বলা শেষ হইলে করোনার কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ভিখাজীরাও পুনর্ব্বার বলিলেন, দেশত্যাগ করিবার তাঁহার কোন বিশেষ কারণ ছিল না, বিদেশ ভ্রমণই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার ভ্রাতার সহিত তাঁহার কোন প্রকার বিবাদ কিম্বা অসদ্ভাব ছিল না, এই জায়গীর তাঁহাদের পৈত্রিক সম্পত্তি নহে, তাঁহার দাদা দানসূত্রে ইহা পাইয়াছিলেন, তাঁহার দাদাই একমাত্র অধিকারী ছিলেন। আর কোন প্রবল উত্তরাধিকারী না থাকায় এই সম্পত্তির স্বত্ব ও স্বামীত্ব তাঁহার উপরই বর্ত্তিয়াছে। পাঁচ বৎসর হইল তাঁহার দাদার স্ত্রীর নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার দাদার আর বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল কিনা তাহা তিনি অবগত নহেন। তিনি দত্তক গ্রহণের কোন ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিনা তাহাও তিনি জানেন না; কোন পুত্র বর্ত্তমান থাকিলে এই সম্পত্তি তাঁহার হাতে আসবার সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহার দাদা তাঁহাকে যেরূপ স্নেহ করিতেন তাহাতে পুত্র থাকিলেও উইল করিয়া তিনি তাঁহাকে বিষয়ের কিছু অংশ দিতে পারিতেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে কোন উইল করিয়া গিয়াছেন কি না সে সংবাদ তিনি রাখেন না; অর্থের প্রতি তাঁহার কিছু লোভ নাই। বিদেশে তাঁহার খরচ পত্রের টাকা তাঁহার দাদাই তাঁহাকে পাঠাইতেন, এ বিষয়ে তাঁহার কিছু মাত্র কৃপণতা ছিল না।

ভিখাজী রাওর জবানবন্দী শেষ হইল, করোনার জুরীগণকে সম্ভাষণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আমি সাক্ষীগণের জবানবন্দী বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিলাম। ভিখাজীরাওকে কি কোথাও দেখিয়াছি?—মনে হইল না, কিন্তু এ কণ্ঠস্বর ত আমার নিতান্ত অপরিচিত নহে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমি ভিখাজীর আপাদ মস্তক লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম। ভিখাজীরাও কক্ষত্যাগ করিবার উপক্রম করিলে আমি এক লম্ফে উঠিয়া দাঁড়াইলাম, দৃঢ় স্বরে বলিলাম—

"করোনার মহাশয়, এই ইন্‌কোয়েষ্ট মুলতুবী রাখিবার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, আমি নূতন সাক্ষী দিব।"

করোনার বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে. এই মোকদ্দমার মুলতুবী প্রার্থনায় আপনার কি অধিকার আছে?"

আমি গবর্ণমেণ্টের একজন ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারী। সিন্ধে সাহেব বিষ প্রয়োগে নিহত হইয়াছেন, এই হত্যারহস্যভেদের ভার আমি গ্রহণ করিয়াছি। সত্য এবং ন্যায়ের অনুরোধে আমি আজিকার এই তল্লাসী মুলতুবী রাখিবার প্রার্থনা করিতেছি, আমি হত্যাকারীর সন্ধান পাইয়াছি।"

ডাক্তারের মুখের দিকে সহসা আমার দৃষ্টি পড়িল। মেঘান্ধকার পূর্ণ বর্ষার অপরাহ্নে সহসা সৌরকর সম্পাতে প্রকৃতির মুখ যেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠে, ডাক্তারের মুখে তেমনি একটী প্রসন্ন ভাব বিকশিত হইতে দেখিলাম; ভিখাজীরাও বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

করোনার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নূতন সাক্ষী আছে বলিতেছেন, কোথায় সে সাক্ষী, তাহার দ্বারা কোন্ বিষয়ের প্রমাণ হইবে?"

আমি গম্ভীর স্বরে বলিলাম; "এই সাক্ষী স্বয়ং ভিখাজীরাও সিন্ধে। বিভিন্ন মূর্ত্তিতে তিনি তাঁহার ভ্রাতা গোবিন্দ রাও সিন্ধের হত্যাকারী। ভিকাজীরাও স্বেচ্ছাক্রমে বিষয়ের লোভে জ্ঞাতসারে নরহত্যা করিয়াছেন।"

গৃহে উপস্থিত ব্যক্তিগণ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন, সকলের দৃষ্টি ভিখাজীরাওর মুখের উপর যুগপৎ পতিত হইল। করোনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমার কথা তাঁহার নিকট নিতান্ত রহস্যময় বলিয়া বোধ হইল। ভিখাজীরাওর মুখ লোহিতাভ হইয়া ক্রমে তাহা পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, কিন্তু সহসা সে আত্ম সংযম করিয়া ভ্রুকুটি ভঙ্গিতে বলিল—

"বাঙ্গালী ডিটেক্‌টিভ! তুমি বাঙ্গলা মুলুক ছাড়িয়া বৃথা মহারাষ্ট্রে বাহাদুরী দেখাইতে আসিয়াছ। তুমি যে একজন সম্ভ্রান্ত লোকের উপর অতি কুৎসিৎ ও ভয়ানক অভিযোগ আরোপ করিতেছ তাহা প্রমাণ করিতে না পারিলে তোমাকে কি দণ্ডভোগ করিতে হইবে তাহা বোধ করি তোমার জানা নাই!"

"ছদ্মবেশে আমার চক্ষুকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা বৃথা, ছলনা দ্বারা নিষ্কৃতি লাভের কিছু মাত্র আশা নাই, বাঙ্গালী নির্ব্বোধ নহে।"—বলিয়াই আমি একটা কৃত্রিম দাড়ী গোঁফ ও পরচুলা ভিখাজীর মুখে ও মাথায় পরাইয়া দিলাম। একটা ব্রিফ ব্যাগে ছদ্মবেশ ধারণের জন্য আবশ্যকীয় অনেক জিনিস সর্ব্বদাই কাছে কাছে রাখা আমাদের অনেকের অভ্যাস, আমারও সে অভ্যাস ছিল।

ভিখাজী প্রথমে একটু আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ বিপদে পড়িয়া এত লোকের সম্মুখে সে মুহ্যমান্ হইয়া পড়িল। আমি সোৎসাহে বলিলাম "ডাক্তার পাঠকর আপনার বিশ্বাসী ভৃত্যকে চিনিয়াছেন কি?"

ডাক্তার এবার শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "কি ভয়ানক, বাবাজীরাও! বাবাজীরাও আমার বিল সরকার সাজিয়া সিন্ধে সাহেবকে প্রসিক এসিড খাওয়াইয়া হত্যা করিয়াছে? এমন ভয়ানক কথা আমি কল্পনাও করিতে পারি নাই।"

কিন্তু কল্পনার অতীত বিষয়ও অনেক সময় সত্য হইতে দেখা যায়; ভিখাজীর হাতে অবিলম্বে হাতকড়ি লাগান হইল। অবশেষে শেশনের বিচারে তাহার অপরাধ সহজেই প্রমাণিত হইল; পুণার শেশন জজ ভিখাজীরাওর প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন।

একদিন ডাক্তার আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভিখাজী যে ছদ্মবেশে তাঁহার বিল সরকারী করিয়াছে আমি তাহা কিরূপ বুঝিলাম, আমার অপেক্ষা তাঁহারই তাহা সহজে ধরা উচিত ছিল।

আমি বলিলাম, "আমাদের এ কাজে চারিদিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলা চাই; ভিখাজীর সহিত বাবাজীর যে কোন প্রকার ষড়যন্ত্র আছে তাহা আমার নিকট সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়াছিল, কিন্তু উভয়ে যে একই লোক সে ধারণা আমার ছিল না। ভিখাজীর বাম চক্ষের নীচে একটি ছোট তিল দেখিয়া আমার এই সন্দেহ প্রবল হইয়া উঠে, কারণ আমি প্রথম দিনই লক্ষ্য করিয়াছিলাম আপনার বিল সরকার বাবাজীর ঠিক সেই স্থানে সেই রকমের এক তিল চিহ্ন ছিল। ভিখাজীকে করোনারের সম্মুখে চাপা গলায় কথা কহিতে শুনিয়া আমার পূর্ব্বস্মৃতি সহসা জাগ্রত হইয়া উঠিল, আমি তাহাকে যেরূপ ভাবে ধরিয়াছিলাম, যে কোন সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভ তাহাকে সেই ভাবে ধরিতে পারিতেন। অবশ্য প্রথম হইতেই সে তাহার ভ্রাতার বিনাশের মতলব স্থির করিয়াছিল এবং দেশে আসিয়া আত্ম গোপন করিবার জন্যই লম্বা দাড়ি গোঁফ ও চুল রাখিয়াছিল। কারণ কৃত্রিম দাঁড়ি গোঁফ ও চুল লইয়া দীর্ঘকাল আত্ম গোপন করা অসম্ভব।

এই ঘটনার পর হইতে ডাক্তার ও ডাক্তার পত্নী আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন; স্বদেশের বাহিরে আর কখন এত স্নেহ পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীদীনেন্দ্র কুমার রায়।

হিমালয়।*

হিমালয়-লেখক শ্রীযুক্ত জলধর সেন বঙ্গসাহিত্য সমাজে সর্ব্বত্র সুপরিচিত। তিনি নিতান্ত সহজ উপায়ে পাঠক পাঠিকার হৃদয় স্পর্শ করিতে সিদ্ধ হস্ত বলিয়া হিমালয় ভ্রমণ কাহিনী বিবৃত করিতে গিয়া প্রসঙ্গক্রমে নানা কথার অবতারণায় পাঠকগণকে তাঁহার সুদীর্ঘ ভ্রমণপথের মন্ত্রবিমুগ্ধ সহযাত্রীর ন্যায় বহুবার "চড়াই উৎরাই" পার করাইয়া অবশেষে একেবারে হিমাচলের সমুচ্চ-শিখরসংলগ্ন চিরতুষার শোভার সমুজ্জল সৌভাগ্যের সম্মুখে সংস্থাপিত করিয়া স্বয়ং অলক্ষিত পদে স্বকার্য্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই ভ্রমণকাহিণী যখন ধারাবাহিকরূপে

* শ্রীজলধর সেন প্রণীত ও বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য—পাঁচসিকা।

"ভারতীতে" প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে, তখন বঙ্গ-সাহিত্যের এক নূতন দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছিল ;—এখন সে পথে বহুলোকে সগর্ব্বে অগ্রসর হইলেও জলধরকেই প্রথম পাণ্ডা বা পথপ্রদর্শক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। ইহাই তাঁহার একমাত্র বিশেষত্ব নহে। তিনি আড়ম্বরশূন্য সরল হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসে সে কথা যেরূপভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, অন্যযাত্রিগণ বহ্বাসেও তাহার অনুকরণ করিতে পারিতেছেন না। ভাষায় বিশেষত্ব আছে,—তাহা পুস্তকের ভাষা নহে, অথচ আদ্যন্ত মাধুর্য্যে ও গাম্ভীর্য্যে সুসংবদ্ধ ; ভাবে বিশেষত্ব আছে,—তাহা সাম্প্রদায়িক মতা-মতের ক্ষীণগণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নহে, অথচ সর্ব্বত্র সদ্ভাবে সুসংবৃত ; বিষয়বিন্যাসেও বিশেষত্ব আছে,—তাহা শুষ্ক কঠোর কঙ্কর বা পাষাণস্তূপের ন্যায় দুরধিগম্য নহে, অথচ নানা তত্ত্বকথায় সুসংযত। এরূপ সুলিখিত সুললিত ভ্রমণকাহিনীর কে না সমুচিত সমাদর করিবে ?

এই রচনাশক্তি যখন লোকলোচনের অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে বিকশিত হইতেছিল, তখন জলধরকে কেহ চিনিত না। তিনি তখন কাঙ্গাল হরিনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নীরবে সাহিত্যসেবায় দীক্ষিত হইবার জন্য "গ্রাম-বার্ত্তার" সম্পাদনভার বহন করিতেছিলেন। তখন সবে-মাত্র জীবনের প্রথম উন্মেষ—তাহার পর কত সুখ কত দুঃখ, কত আশা কত নৈরাশ্য, কত সম্পৎ কত বিপদ পর্য্যায়ক্রমে জীবনপথের সম্মুখীন হইয়াছে, আজ তাহা স্মরণ করিয়া ফল নাই। আজ 'হিমালয়' হাতে করিয়া যাঁহারা নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিতেন তাঁহারা আর ইহলোকে বর্ত্তমান নাই। আজ 'হিমালয়' হাতে করিয়া যাঁহারা স্নেহবিজড়িত অস্ফুট অভ্যর্থনার বিনা ধন্যবাদে গ্রন্থপাঠে নিযুক্ত হইবেন, তেমন শৈশব সুহৃদও বড় অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না ! তাই নিতান্ত অযোগ্য হইয়াও আমাকেই বাল্যবন্ধুর গ্রন্থসমালোচনায় অগ্রসর হইতে হইল।

আমি ইহার সমালোচনা করিবার অধিকারী নহি—তজ্জন্য যতটুকু সাহিত্য শক্তির প্রয়োজন তাহাতেও আমি নিঃসম্বল। সুতরাং সমালোচনার হিসাবে আমার ক্ষীণ উদ্যম নিতান্তই নিষ্ফল। তবে, লেখা বুঝিতে হইলে লেখককে বুঝিতে হয় বলিয়া আমি হিমালয় লেখকের সংকিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার পক্ষে নিতান্ত অপাত্র বলিয়া তিরস্কৃত হইব না। জলধর কুমারখালীর সম্ভ্রান্ত কায়স্থ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। নানা কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করা পর্যন্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করা ঘটিয়া না উঠিলেও জলধর সর্ব্বাংশেই সুশিক্ষিত এবং দীর্ঘকাল শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বহু ছাত্রের সুশিক্ষালাভের সহায়তা করিয়া এক্ষণে 'বসুমতী'র সম্পাদন কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। জলধর স্বগ্রামে চরিত্র গুণে সকলের কাছেই প্রিয়জনের ন্যায় সমাদৃত—ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে। জলধর বঙ্গ-সাহিত্য সমাজে সকলের কাছেই সুলেখক বলিয়া পরিচিত—ইহা অল্প সৌভাগ্যের কথা নহে।

কাঙ্গাল হরিনাথের নির্ভীক স্বদেশসেবা তাঁহার স্বগ্রাম-বাসিগণের মধ্যে বহুলোকের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল ;—সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন, অনেকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন, এবং কেহ কেহ তাঁহার আদর্শে চালিত হইতেন। জলধর আশৈশব সেই আদর্শের সম্মুখে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আবাল্য স্বদেশ সেবার জন্য লালায়িত। যৌবনোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সুকোমল হৃদয়ের সকল বৃত্তিই সময়োচিত চাপল্য পরিহার করিয়া মাতৃ সেবার জন্য শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল। হরিনাথ আজন্ম দুঃখ দারিদ্র্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন থাকিয়াও বীরের ন্যায় স্বদেশের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত ছিলেন,—কেহ বুঝিত না যে সাংসারিক দুঃখ ক্লেশ সৎকার্য্যের অন্তরায় হইতে পারে। জলধরও সেই শিক্ষায় সমুন্নত হইতেছিলেন। তিনি উদরান্নের জন্য বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিয়া অবসরকাল সর্ব্বপ্রকার সৎকার্য্যের আন্দোলনে অতিবাহিত করিতেন ! তখন স্নেহময়ী জননী ভগিনী ও সহোদর তাঁহাকে সংসারী করিবার আশায় উদ্বাহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিবার জন্য কত না নিষ্ফল প্রয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন। কালে বিবাহ হইয়াছিল—একটি মাত্র কন্যা প্রসব করিয়া—প্রথমে কন্যা ও পরে প্রসূতি অকালে কালগ্রাসে পতিত ও অল্পদিন পরেই জননী স্বর্গারূঢ় হইলেন। ইহাতে প্রাণের মধ্যে যে অশান্ত অতৃপ্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহাকেই জলধরের ভ্রমণ ও বঙ্গসাহিত্যে হিমালয়ের ন্যায় ভ্রমণ কাহিনী রচনার প্রবর্ত্তক বলিতে হইবে। ইহাকে বৈরাগ্য বলিতে পারি না, ইহা অনুরাগেরই নামান্তর ; "হিমালয়ের" ছত্রে ছত্রে তাহার পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে ;

কথিত ভাষারই ন্যায় সুখবোধ্য। রস্কিনের এক একটি বাক্য নিতান্ত সুদীর্ঘ। বোধ হয় ডি কুইন্‌সি (De Quincy) ছাড়া অপর কোন ইংরাজী গদ্য লেখক এমন যোজনব্যাপী বাক্যাবলী ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু উপরোক্ত নিয়মে গঠিত বলিয়া তাহাদের অর্থ সংগ্রহে কষ্ট পাইতে হয় না। ইংরাজীতে মেকলের (Macaulay) ভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাঞ্জল। তাহার এক কারণ তাহার বাক্য সকল নিতান্ত ক্ষুদ্র আয়তনের, এবং তিনি কোন জটিল বিষয়ের দার্শনিক বা বিজ্ঞানবিদের ন্যায় সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম আলোচনা করেন না। তিনি সকল বিষয়ই স্থূল দৃষ্টিতে দেখিয়া তাহার একটি মোটামুটি মীমাংসা করেন। 'আধুনিক চিত্রকর সম্প্রদায়' নামক গ্রন্থের প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ডের কোন কোন স্থান ব্যতিরেকে রস্কিনের বাক্যাবলীর অর্থ গ্রহণের নিমিত্ত একাধিকবার পাঠের প্রয়োজন হয় না। অথচ প্রাঞ্জলতাই মেকলের (Macaulay) বাক্যাবলীর প্রধান—এবং বোধ হয়—একমাত্র গুণ। কিন্তু রস্কিনের সুদীর্ঘ বাক্যাবলীর অনন্ত কুণ্ডলীর মধ্যে শব্দের কি ইন্দ্রজাল—কল্পনার কি লীলা—ভাবের কি আবর্ত্ত—রসের কি আভোগ—সৌন্দর্য্যের কি উচ্ছ্বাস। তাহাদের কি সুমিষ্ট ছন্দ—সুখপাঠ্য যতিবিচ্ছেদ—সমুদয়ে কি ঝঙ্কার। অর্থগ্রহণের নিমিত্ত যদি কখনও দুইবার পড়িতে হয়—সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া পিপাসু হৃদয়ে শতবার—সহস্রবার আবৃত্তি করিতে ইচ্ছা যায়।

শব্দ নির্ব্বাচনেও রস্কিনের অদ্ভুত ক্ষমতা। এ বিষয়ে তাঁহার দেব-দুর্লভ সৌভাগ্য। তিনি যেখানে যে কথাটি বসাইয়াছেন তাহা এমন সুন্দর বসিয়াছে ! হৃদ্গত ভাবের সকল দিক তাহাতে এমন ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাহার এমন স্বচ্ছ, সুন্দর এবং বর্ণ-বৈচিত্র্যময়—ভাব-গৌরবে এমনি উজ্জ্বল—যে পাঠকালে উপভোগাধিক্যে প্রতি মুহূর্ত্তে রোমাঞ্চিত হইতে হয়।

শব্দ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আমাদের বাঙ্গালার ন্যায় ইংরাজীতেও একটি পুরাতন তর্ক এবং মতবৈচিত্র্য আছে। আমাদের ভাষায় যেমন কেহ বাঙ্গলা শব্দ, এবং কেহ বা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী, ইংরাজী ভাষায়ও সেইরূপ কাহারও অনুরাগ লাটীন এবং গ্রীক্ ধাতুমূলক শব্দের দিকে এবং কাহারও বা স্যাক্সন্ (saxon) শব্দের দিকে। এ বিষয়ে—অপর সকল বিষয়েরই মত—যিনি একদেশদর্শী তিনিই ভ্রান্ত। বঙ্গভাষায় যেমন সংস্কৃত এবং বাঙ্গলা উভয় শ্রেণীর শব্দের তুল্য প্রয়োজন এবং একই মূল্য, ইংরাজী ভাষায়ও সেইরূপ একদিকে গ্রীক ও লাটীন শব্দের, অপর দিকে খাঁটি ইংরাজী শব্দের, তুল্য প্রয়োজন—একই মূল্য। তাহা হইলেও, ইংরাজী এবং বাঙ্গালা ভাষায় এমনও খেয়ালি লেখক আছেন, যাহার অনুরাগ কেবল এক শ্রেণীরই শব্দের প্রতি। আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে এমনও লেখক দেখিয়াছি, যিনি কেবল অসংযুক্ত বর্ণে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সাহিত্য দরবারে তাহা জাহির করিতে উৎসুক। সাহিত্যে কিন্তু এরূপ পালয়ানি কসৃলত বা কুস্তিগিরির স্থান নাই। ভাব প্রকাশে সর্ব্বাঙ্গীন পটুতাই পরিণত ভাষার লক্ষণ। যে শ্রেণীর শব্দ যে ভাব প্রকাশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী সেই ভাব প্রকাশের জন্য সেই শ্রেণীর শব্দই অবলম্বনীয়—সর্ব্বথা অবলম্বনীয় এবং নিঃসঙ্কোচে অবলম্বনীয়। তাহা না করিয়া লেখক যদি তাঁহার ঝোঁক বা খেয়ালের অনুগামী হন, তাহা হইলে রচনার বৈচিত্র্য এবং সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ অসম্ভব। ভাবের স্বর-গ্রামের সহিত ভাষার স্বর-গ্রামের মিলন বাঞ্ছনীয়। যাঁহার বাগর্থ প্রতিপত্তি আছে তিনি কি অভিধানিক কি চলিত সকল শ্রেণীর শব্দই ভাবের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া যথাস্থানে ব্যবহার করিতে সক্ষম। আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যের পদ্য-বিভাগে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এ বিষয়ে অসাধারণ ক্ষমতা। "স্বপ্ন প্রয়াণের" ন্যায় বাঙ্গালার অপর কোন পদ্য কাব্যের অভিধান এমন বিস্তৃত নয়।

বঙ্কিম বাবু শেষাশেষি বাঙ্গালা শব্দেরই পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। তাহাতে যে তাঁহার রচনার সৌন্দর্য্য বাড়িয়াছিল বলিতে পারা যায় না। যেখানে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিলে ভাব পরিস্ফুট হয়—পদসমষ্টি শ্রুতিমাধুর্য্য লাভ করে—রচনার সৌন্দর্য্য এবং গৌরব বর্দ্ধিত হয়—সেখানে সংস্কৃত শব্দই প্রযুক্ত হওয়া উচিত। সংস্কৃতের স্থানে বাঙ্গালা, বাঙ্গালার স্থানে সংস্কৃত শব্দের, ব্যবহার ভাষার অপব্যবহার বই আর কিছু নয়। পূর্ব্বে বঙ্কিম বাবু ইহা বেশ বুঝিতেন। তাঁহার মৃণালিনী উপন্যাসে মনোরমার যে রূপ-বর্ণনা আছে তাহা আমূল সুনির্ব্বাচিত সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগে তারকা খচিত নিশীথ আকাশের ন্যায় সমুজ্জ্বল

বৈচিত্র্যে গাম্ভীর্য্যে মাধুর্য্যে নূতনত্বে হিমালয় নিতান্তই বিস্ময়ের ব্যাপার, সুতরাং সৌন্দর্য্যের আগার। হিমালয়ের ভ্রমণ কাহিনীও তদনুরূপ সুন্দর হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে 'হিমালয়' যেন প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান হয়। সুতরাং ইহাকে একখানি গদ্য কাব্য বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আর ইহাকে যদি নিতান্ত উপন্যাসের হিসাবেই দেখিতে চাও, তাহা হইলেও এরূপ নির্দ্দোষ উপন্যাস কোথায় পাইবে? ইহাতে কাব্যের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে উপন্যাসের উপদেশ মিলিত হইয়াছে বলিয়া পুস্তকখানি বঙ্গ সাহিত্যে সমাদর লাভ করিতে সক্ষম হইবে।

উত্তরে স্ত্রীরাজ্য, দক্ষিণে কুরুজাঙ্গল, পূর্ব্বে ধর্ম্মারণ্য ও পশ্চিমে বাহ্লীক—এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন পার্ব্বত্যপ্রদেশ একদা "ব্রহ্মপুর" নামে পরিচিত ছিল;—ইহা উত্তরাখণ্ডের অন্তর্গত। বর্ত্তমান হরিদ্বার পুরাকালে "মায়াপুরী" নামে কথিত হইত। মায়াপুরী হইতেই উত্তরাখণ্ডে প্রবেশ করিতে হইত; কিন্তু সে দুর্গম পথ সকলের পক্ষে উন্মুক্ত ছিল না। সাধু সন্ন্যাসী ভিন্ন গৃহস্থ সে পথে সচরাচর পদার্পণ করিত না। শৈলের পর শৈলমালা দুরারোহ দুর্গ প্রাচীরের ন্যায় পথরোধ করিয়া দণ্ডায়মান; অনশন ও অনিদ্রা, পর্য্যটন ও পরিশ্রান্তি পথিকের পদানুসরণ করিতে ত্রুটি করে না;—এত ক্লেশে এত দীর্ঘ পথের "চড়াই উতরাই" অতিক্রম করিয়াও তুষারাচ্ছাদিত কেদার মন্দির দর্শন করিবার জন্য যাঁহাদের নিরতিশয় আগ্রহ, কেবল তাঁহারাই কায়ক্লেশে হিমালয় ভ্রমণ করিতেন। বদরী নারায়ণ এখন সুবিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র—ইংরাজের কল্যাণে অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসেই সেখানে উপনীত হওয়া যায়; সুতরাং জলধরের "হিমালয়" কোন অজ্ঞাত রাজ্যের ভ্রমণ কাহিনী বলিয়া পরিচিত হইবার দাবি রাখে না। যাঁহারা ইহাকে সে হিসাবে গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা লেখক ও পুস্তক উভয়কেই বুঝিতে পারিবেন না। "হিমালয়ে" যাহা কিছু ভ্রমণ কহিনী লিখিত হইয়াছে, তাহা যেন উপলক্ষ মাত্র; লেখক তাহাকে অবলম্বন করিয়া পাঠক সমাজকে জড়ের আবরণ ভেদ করিয়া হিমালয়ের সৌন্দর্য্যের সম্মুখে অগ্রসর হইবার পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। এই গুণে "হিমালয়" বঙ্গসাহিত্যে চিরদিন সমাদর লাভ করিবে।

জলধরের লিপি কৌশল কোথায়, তাহা সহসা স্থির করা কঠিন কথা। কখন তাঁহার ভাষা, কখন বা তাঁহার ভাব প্রকাশ কৌশলকেই লিপি চাতুর্য্যের মূল বলিয়া বোধ হয়। আজ কাল বঙ্গসাহিত্য সেবার জন্য অনেকে সাহিত্য-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন; আমি তাঁহাদের কানে কানে বলিতে পারি—জলধরের সমগ্র লিপি কৌশল তাঁহার হৃদয়ে। তিনি যাহা লেখেন, হৃদয় ঢালিয়া দিয়া লেখেন; পাঠকের নিকট তাহার কোন স্থান লুকাইয়া রাখিতে চাহেন না। সেই আন্তরিকতা গুণেই তাঁহার গ্রন্থ আদ্যন্ত পাঠ না করিয়া নিরস্ত হইতে ইচ্ছা করে না।

সাহিত্যে একটু সাহসের প্রয়োজন আছে;—জলধর সেই সাহসে নির্ভর করিয়া তাঁহার ভাষা, তাঁহার ভাব ও মত অবলীলা ক্রমে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। আমার সকল ভাব বা সকল মতের সঙ্গেই যে সকলের সহানুভূতি থাকিবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। তথাপি অনেকে অন্যের মত কি হইবে, তাহার দিকে চাহিয়া গ্রন্থ লিখিয়া বিড়ম্বিত হন। অন্যের মত, অন্যের ভাষা, ও অন্যের ভাবের অনুকরণ করিতে গিয়া বিড়ম্বিত হওয়া অপেক্ষা নিজের মত, ভাষা ও ভাব ব্যক্ত করিয়া তিরস্কৃত হওয়াও ভাল। ভাষা ভাল হইলেও ব্যাকরণ দোষে পরিপূর্ণ, ভাবে মোহ থাকিলেও সর্ব্বত্র সুন্দর নহে, মতের বাহুল্য থাকিলেও সকল মত ন্যায়শাস্ত্রানুমোদিত নহে—এরূপ ভাবে যাঁহারা "হিমালয়" সমালোচনা করিবেন, তাহাদের জন্য লেখক যথেষ্ট তৃণ কঙ্কর ও কর্কশ শিলাতল পুঞ্জীকৃত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদিগকে গ্রন্থের বাহ্য বেশের ন্যায় হিমালয়েরও বাহ্য বেশমাত্র দেখিয়াই প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবে।

শ্রীঅক্ষয় কুমার মৈত্রেয়।

রস্কিন

ললিতকলা ও রচনাশিল্প।

কলা-সৃষ্টি-কৌশলে বা কলাতত্ত্ব সমালোচনায় রস্কিন সার্ব্বজনীন্ প্রতিষ্ঠা লাভ না করিলেও, ইংরাজী সাহিত্য-সংসারে গদ্য-রচনা পটুত্বে তাঁহার আসন খুব উচ্চে। তিনি প্রথম শ্রেণীর চিত্রকর হউন বা না হউন, তাঁহার কলা-বিজ্ঞান নির্ভুল হউক বা ভ্রমাত্মক হউক, সমাজবিজ্ঞানে তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি কোন নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবন করুক বা না করুক, সকলেই স্বীকার করেন ইংরাজী গদ্যরচনায় তাঁহার সমকক্ষ নাই। যাঁহারা নিজে উৎকৃষ্ট গদ্য লিখিয়াছেন—যাহাদের গদ্য-রচনা-সৌন্দর্য্যে সকলেই মুগ্ধ, তাঁহারাও একমতে রস্কিনকে গদ্য-শিল্পের রাজসিংহাসন দিয়াছেন। আমরা বাঙ্গালী—আমাদের অনেকেই, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ইংরাজী ভাষার চর্চ্চা করিয়া থাকেন। আমাদের মধ্যে যাঁহারা রস্কিনের গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা, বোধ হয়, তাঁহার রচনার রসগ্রহণে বঞ্চিত হন নাই। কিন্তু শ্রীযুক্ত তারাচাঁদ মাষ্টার এখনও বঙ্গদেশের মায়া পরিত্যাগ করেন নাই। বরং ভয় হয়, এখন তিনি তাঁহার সেই আদিম গ্রাম্য-স্কুল-মাষ্টার মূর্ত্তি বহুধা বিভক্ত করিয়া নানারূপে দেশের হিতসাধন করিতেছেন। আগে তিনি ছিলেন কেবল স্কুল-মাষ্টার, এখন তিনি "প্যাট্রিয়ট," সম্পাদক এবং রিডিংরুমের তত্ত্বাবধারক। আদিম তারাচাঁদের বাহুমূলে Citizen of the world এবং Spectator বিরাজ করিত, এখন "ম্যাকলে" (Macaulay) এবং "বাইরণ" (Byron) সেই দিব্যস্থান বাসের সুখ এবং গৌরব উপভোগ করিতেছে।

স্মরণ হয়, যৌবন মুখে যখন রস্কিন এবং টেনিসনের প্রথম পরিচয় সৌভাগ্য লাভ করিয়া অপূর্ব্ব রসাস্বাদনজনিত আনন্দোপভোগ-চঞ্চল-হৃদয়ে বন্ধুবর্গকে তৎপ্রসঙ্গে ব্যস্ত করিতেছিলাম, ঠিক সেই সময়ে এক জন "তারাচাঁদের" জনান্তিক বিজ্ঞ মন্তব্য শ্রবণের সুখ আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। তিনি ক্ষুব্ধহৃদয়ে তৎপার্শ্ববর্ত্তী সহচরের নিকট আক্ষেপ করিতেছিলেন, কি গুণে যে লোকে রস্কিনের গদ্যের বা টেনিসনের পদ্যের প্রশংসা করে তাহা বুঝা যায় না—বোধ হয় ইহা একটি "ফ্যাসান" মাত্র। উহাদের গ্রন্থাবলীর মধ্যে আদরণীয় কিছুই তিনি দেখিতে পান না। সাহিত্য সম্বন্ধে এরূপ মতবাদ বিরল নহে। আমাদেরও মধ্যে এমনও বিজ্ঞ সাহিত্য-রসিক আছেন যাঁহারা বঙ্কিমের উপন্যাস সমূহকে জ্যাঠামি বলিয়া নিজেদের জ্যেষ্ঠতাতত্বের পরিচয় দেন—এবং রবি বাবুর অমরভোগ্য কবিতাকে নীরস ভাববিকৃতির ভাণ্ডার বলিয়া তাঁহাদের ক্লেদ-ক্লিন্ন নাসিকা কুঞ্চিত করেন। ফলতঃ "তারাচাঁদ" গোষ্ঠীর ধ্বংস নাই। এক হিসাবে ধ্বংস না হওয়াই ভাল। সংসারে অন্ততঃ তাহারা একটু বৈচিত্র রাখিয়াছে। রহস্য ছাড়িয়া রচনার যে উৎকর্ষ সাহিত্য-সেবকের পরম আদরের বস্তু, তাহার রসভোগ করা দীক্ষাহীনের সহজ আয়ত্ত নহে। শুধু কি তাই? প্রকৃত রসাস্বাদনের নিমিত্ত বোধ হয়, একটু স্বাভাবিক শক্তি—একটু প্রতিভার প্রয়োজন।

আমার বিশ্বাস যাহাকে ইংরাজীতে style বলে, রচনার সেই বিশেষত্ব সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক ধরিতে পারেন না। বাঙ্গালা সাহিত্যে আধুনিক পাঠ্য গ্রন্থও খুব কম। বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যত সে দিনকার। আমাদের মধ্যে এমনও লোক এখনও জীবিত আছেন, যিনি এই সাহিত্যকে জন্মিতে দেখিয়াছেন। পাঠ্য গদ্য পুস্তক এত কম, যে বোধ হয় এক হাতের অঙ্গুলি মধ্যেই তাহাদের গণনা নিঃশেষিত হয়। সাহিত্য চর্চ্চার এত স্বল্প পরিসরের মধ্যে রুচি শিক্ষা দুর্ঘট। যাঁহারা বিশাল ইংরাজী সাহিত্যের সহিত পরিচিত, তাঁহারা অনেক পুস্তক পাঠে এবং বিভিন্ন প্রকার রচনাশিল্পের নিয়ত চর্চ্চায়, ধীরে ধীরে সাহিত্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা এবং রসাস্বাদন শক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। আধুনিক বঙ্গসাহিত্য এই ইংরাজী শিক্ষা এবং ইংরাজী সাহিত্য চর্চ্চারই ফল। সেই জন্য এই নবজাত সাহিত্যে একটু ইংরাজী গন্ধ থাকিতে পারে, এবং বিদ্বেষীরা এই সাহিত্য সম্বন্ধে যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করেন, এই বিলাতী গন্ধই সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু এ দোষ অনিবার্য্য। যখন বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য—অন্ততঃ বঙ্গীয় গদ্য—ইংরাজী শিক্ষার নিকট এত ঋণী তখন তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনা দোষের হইবে না। যে কারণে শিশু লাটীন সাহিত্যে গ্রীক সাহিত্যের প্রভাব—যে কারণে শিশু ইংরাজী সাহিত্যে গ্রীক, লাটীন এমন কি প্রাচীন ফরাসী সাহিত্যেরও প্রভাব—এবং বহু দিনের কথা নয়, এদেশে ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বে আমাদের তদানীন্তন বাঙ্গালা রচনার ভিতর যে কারণে পারসিক সাহিত্যের প্রভাব দৃষ্ট হয়, সেই সকল অমোঘ-কারণ-সঙ্ঘাতে আমাদের আজিকার সাহিত্যেও এই বিলাতী গন্ধটুকু দেখিতে পাই। কিন্তু আমাদের গৌরবের কথা এই, যে এ সাহিত্যের জন্মকালেই দেশে এমন ক্ষমতাশালী এবং প্রতিভাসম্পন্ন লেখকবর্গের অভ্যুদয় হইয়াছিল, যে তাঁহাদের প্রভাবে ইহার মৌলিকতা এবং দেশীয় বিশেষত্ব আশ্চর্য্য-রূপে রক্ষিত হইয়াছে। মাইকেল খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেও সংস্কৃত এবং পূর্ব্বতন বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার এমন প্রগাঢ়

অনুরাগ ও বিস্তৃত পারদর্শীতা ছিল, হিন্দুভাবে তাঁহার হৃদয় এমন পরিপূর্ণ এবং আচ্ছন্ন ছিল, যে তাঁহার রচনাবলী বিলাতী কাব্যকলার বাহ্য সৌষ্ঠব সম্পদে উদ্ভিন্ন-শ্রী হইলেও, কোথায়ও দেশীয় ভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। বিলাত হইতে আনিত তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাঙ্গালা ভাবের সহিত বেশ মৈত্র্য স্থাপন করিয়াছে। বাগ্‌দেবীর এই বিচিত্র বসন বিলাতী তাঁতে প্রস্তুত হইলেও, এবং বিবিধ বিলাতী কারুকার্য্যে খচিত হইলেও, ইহা আমাদের দেশীয় ভাব সৌষ্ঠবের কোন হানি না করিয়া বরং তাহার গৌরব এবং সৌন্দর্য্য বাড়াইয়াছে। বঙ্কিমের উপন্যাসাদি সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই খাটে। এবং পরবর্ত্তী লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকদিগেরও ভিতর বিলাতী ভাবের আমদানী খুব কম। ফলতঃ, পরীক্ষায় দেখিতে পাইবে, এই বিদেশী ভাবের উৎপাৎ এবং উচ্ছৃঙ্খল ঘটা অযোগ্য লেখকবর্গের ভিতরই বেশী। মুখে তাঁহাদের জলন্ত দেশানুরাগের বহ্নি জ্বলিতে পারে—দেশীয় সকল বিষয়েই তাঁহাদের খুব উচ্চ-কণ্ঠ শ্রদ্ধা থাকিতে পারে—কিন্তু লিখিবার কালে তাঁহাদের স্পর্দ্ধিত দেশ-বাৎসল্য ক্ষুব্ধ হইয়া পড়ে, দেশীয় ভাবকে লেখনীর মুখে অক্ষুণ্ণ অক্ষত রাখা তাহাদের ক্ষমতায় কুলায় না। এদিকে প্রতিভার ত অসংখ্য দোষ ও ত্রুটি আছেই, কিন্তু তাই বলিয়া তাহার নাড়ীজ্ঞান কখন বিলুপ্ত হয় না। প্রতিভা কখন শিব গড়িতে বানর গড়ে না। যিনি এই দুঃসাধ্য সাধন করিতে পারেন, তাহার অশেষবিধ অমূল্য গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু যে পদার্থটাকে প্রতিভা বলা যায় তাহার ক্ষীণ ছায়া পর্য্যন্তও তাহাকে স্পর্শ করে নাই।

কথায় কথায় আলোচ্য বিষয় হইতে একটু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। রচনার যে বিশেষ উৎকর্ষকে style বলে তাহারই আলোচনা উত্থাপন করিয়াছিলাম।

রস্কিনের প্রতিপত্তি এই style লইয়া। ইহাতেই তাঁহার গৌরব এবং সাহিত্য কলায় শাশ্বতী প্রতিষ্ঠা। রস্কিনের styleই কলা বিশেষ। এই style কথাটির ঠিক প্রতিবাক্য আমাদের বাঙ্গালায় নাই। রচনা বলিলে composition বুঝায়। এদিকে আমরা বলিয়া থাকি অমুক লেখকের ভাষাটি বেশ, তখন আমরা ভাষা শব্দটি style অর্থেই অনেকটা ব্যবহার করি। কিন্তু ভাষা শব্দের অপর একটি অর্থ আছে—language। ইংরাজীতেও কখন কখন language, style অর্থেই ব্যবহার হয়, তথাপি style কথাটির ইংরাজীতে একটি স্বতন্ত্র এবং বিশেষ অর্থ আছে। বাঙ্গালায় তদনুরূপ বিশেষার্থ বোধক শব্দ নাই। নামাবধারণে যখন গোল, তখন ভাবাবধারণে একটু গোল থাকিবারই কথা। বাস্তবিক style অর্থে প্রতীচ্য সাহিত্য-রসিকেরা যাহা বুঝেন আমাদের পাঠক সাধারণের তাহার স্পষ্ট ধারনা নাই। বোধ হয় আমাদের লেখক সাধারণের লেখায় উক্ত পদার্থের অভাব আছে। সুতরাং style কাহাকে বলে আমরা তাহা এখন বুঝিতে এবং বুঝাইতে চেষ্টা পাইব।

মনোগত ভাব সকল যখন অর্থগর্ভ শব্দ সঙ্কেতে প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাই, তখন আমরা ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকি। প্রকাশের প্রাঞ্জলতার জন্য হৃদ্গত ভাবের সম্যক স্ফূর্ত্তীর প্রয়োজন—অর্থাৎ বক্তব্য কথা তোমার হৃদয় মধ্যে বেশ পরিস্ফুট হওয়া চাই। যাহা তোমার মনোমধ্যে অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণ—যাহার পরিষ্কার ধারণা তোমার নিজেরই নাই—তাহার স্পষ্ট প্রকাশ অসম্ভব। ভাব পরিস্ফুট হইলে তাহার একটি ক্রম থাকে; শব্দক্রম যখন সেই ভাবক্রমের অনুবর্ত্তী হয়, তখনই প্রকাশের প্রাঞ্জলতা লব্ধ হয় অর্থাৎ সমীচীন ভাষার উৎপত্তি হয়। কোন্ ভাবার্থক শব্দ কাহার পর বসিবে তাহার একটি প্রাকৃতিক নিয়ম আছে, এবং সেই নিয়ম অনুসারেই ভাষার স্বাভাবিক অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। বৈয়াকরণ সেই সকল নিয়ম, ভাষালোচনা দ্বারা নির্দ্ধারিত করিয়া, লিপিবদ্ধ করেন। তিনি নিয়ম গড়েন না—অনুসন্ধানে তাহাদের আবিষ্কার করেন মাত্র। এই সকল নিয়মই ভাব প্রকাশের মৌলিক সহায় এবং তদনুবর্ত্তী ভাষাই নির্দ্দোষ এবং প্রাঞ্জল। ইহাই রচনার প্রথম স্তর। কিন্তু ভাব নানা জাতীয়। যেখানে রসোদ্ভাবন করিতে হইবে, সেখানে শব্দ চয়ন, ছন্দ, ঝঙ্কার প্রভৃতি নানা অলঙ্কারের প্রয়োজন। কোন সত্য বা তথ্যের পরিষ্কার এবং যথাযথ প্রকটনে আবার অন্যবিধ শব্দ নির্ব্বাচন এবং বাক্য-বিন্যাসের প্রয়োজন। রচনার দ্বিতীয় স্তর এই। কিন্তু style এই দুটি হইতে আরও কিছু, অর্থাৎ styleএ এই দুইটিও আছে এবং এই দুটি হইতে অতিরিক্ত আর একটি পদার্থ আছে। এমন অনেক রচনা আছে যাহা বেশ প্রাঞ্জল—শব্দ নির্ব্বাচন ও বাক্য বিন্যাসে যাহা নির্দ্দোষ—

রসোদ্ভাবনে যাহার অমোঘ সন্ধান—কিন্তু যাহাকে style বলে তাহার কিছুই তাহাতে নাই। এই যে অতিরিক্ত পদার্থ উহা যেমন দুষ্প্রাপ্য তেমনি মনোহর। তাহাতেই লেখকের বিশেষত্ব। সেটি লেখকের নিজের বলিবার প্রথা—তাঁহার ভঙ্গী। এই বিশেষত্ব—লেখকের এই ভঙ্গী—ইউরোপীয় সাহিত্যে style বলিয়া অভিহিত। ইহা শিখিবার বা বাহির হইতে অর্জ্জন করিবার বিষয় নয়—স্বভাবসিদ্ধ গুণ, যাহার আছে তাহার রচনাতে প্রকাশ পাইবেই। কলা ব্যবসায়ীর গৌরব যেমন সৌন্দর্য্যের একটি বিশেষ বিকাশ সাধনে, তেমনই লেখকের গৌরব—রচনায়, তাঁহার নিজের বিশেষত্ব বা ভঙ্গী প্রকাশে।

কথাটি আর একটু বিশদ করিয়া বুঝাইতে হইলে, উপমান বিষয়টির আর একটু বিশেষ আলোচনা আবশ্যক। এবং যদিও উপস্থিত প্রসঙ্গের সহিত তাহার সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ নয়, সাহিত্য সমালোচনায় উহা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কলা-ব্যবসায়ীর কার্য্য সৌন্দর্য্য লইয়া—অর্থাৎ প্রত্যেক কলা-ব্যবসায়ীকে তাঁহার স্বকীয় ক্ষেত্রে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে বা সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখাইতে হইবে। তাহা না পারিলে কলা-জগতে তাহার স্থান নাই। কবির কথাই ধরা যাক্। তিনি ভাষা, ছন্দ, মিল ও ঝঙ্কার, প্রভৃতি উপাদান সংযোগে সৌন্দর্য্য রচনা করিয়া পাঠকের হৃদয়ে রস-তরঙ্গ তুলিতে অক্ষম, তিনি কবি নন। কিন্তু প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে, এই সৌন্দর্য্য বিকাশ এবং রসোল্লাসের সঙ্গে সঙ্গে কবির নিজের বিশেষত্ব দেখাইতে হইবে—অর্থাৎ তাঁহার সৌন্দর্য্য রচনার ভিতর এমন একটি সুস্পষ্ট বৈলক্ষণ্য থাকিবে, যাহা অপর কবিদিগের সৌন্দর্য্য রচনা হইতে তাহাকে বিভিন্ন এবং পৃথক করিয়া তুলিবে। এই বৈলক্ষণ্যই কবির স্বকীয় অভিব্যক্তি। ইহারই অভাবে পো (Poe) ছাড়া মার্কিন দেশীয় কোন কবিই সাহিত্য সমাজে আভিজাত্য গৌরব লাভ করিতে পারেন নাই। লঙ্‌ফেলো (Longfellow) এমার্‌সন্ (Emerson) ব্রায়ণ্ট (Bryant) প্রভৃতি সুন্দর কবি। উচ্চ প্রতিভা সম্পন্ন না হইলেও, তাঁহাদের অনেক কবিতা পাঠেই হৃদয় রসসিক্ত হইয়া উঠে। কিন্তু সে সকল কবিতা সাধারণ ইংরাজী কবিতা হইতে বিশেষরূপে বিভিন্ন নয়। তাঁহারা পরের ছাঁচে ঢালা। তাহাদের ছন্দ বা ঝঙ্কারে অভিনবত্ব নাই—স্বরভঙ্গীতে নূতন কণ্ঠের পরিচয় নাই। কিন্তু পোর (Poe) কবিতা পাঠে আমরা যেন একটি অদৃষ্টপূর্ব্ব জগতে যাই—নূতন রসের আস্বাদন পাই—অপরিচিত স্পর্শের পুলক-হর্ষ অনুভব করি। পাঠমাত্রেই বোধ হয় ইহার তুল্য বা অনুরূপ কিছুই ইতিপূর্ব্বে দেখি নাই। তাই মার্কিন সাহিত্যে, পদ্যে পো (Poe) এবং গদ্যে হথরন্ (Hawthorne)—কেবলমাত্র এই দুই জনই—মৌলিক গৌরবে গৌরবান্বিত। ইংরাজী সাহিত্যে ইহাদিগের অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর অনেক লেখক আছেন, কিন্তু ইঁহারা যেমন তেমনটি আর নাই। ইহাদের কাছে আমরা যাহা পাই, অপর কাহারও কাছে তাহা পাই না। তাহাতেই ইহাদের বিশেষত্ব, তাহাতেই ইহাদের এত আদর। কারণ যে কবিরই এই বিশেষত্ব আছে, তাহারই তজ্জনিত একটা চিরন্তন এবং অমোঘ আকর্ষণ আছে। তাহার সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির উন্নত আয়ত না হইলেও, অন্যত্র অপ্রাপ্য গোলাপের বর্ণ-গৌরব বা পরিমল-গর্ব্ব না রাখিলেও, মৃদু-বাস কামিনী তাহার জ্যোৎস্না-কোমল-মাধুর্য্যে হৃদয়কে মুগ্ধ করে। এই বিশেষত্ব বলেই—এই নিজস্ব গৌরবে—মাইকেল এবং হেমচন্দ্রের অনুকরণ প্লাবিত বঙ্গদেশে বঙ্গ সুন্দরীর কবি বিহারী লাল চক্রবর্ত্তী রসগ্রাহী উপযুক্ত পাঠক মাত্রেরই নিকট বিশেষ আদর ও পূজা পাইয়াছেন—এবং সে আদর সে পূজা ক্রমশই বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। তাই বলিতেছিলাম কলানুকূল উপাদান সমূহের বিশেষ সম্ভার সত্ত্বেও, সৌন্দর্য্য বিকাশে ব্যক্তিগত বৈলক্ষণ্য না থাকিলে যেমন কলা রচনার প্রকৃত গৌরব নাই, সেইরূপ শব্দ নির্ব্বাচন, পদবিন্যাস, বাক্যের প্রবাহ, ছন্দ ও ঝঙ্কারে বিশেষ সমৃদ্ধি থাকিলেও লেখকের বলিবার প্রথায় যদি ব্যক্তিগত বিশেষত্ব—নিজের ভঙ্গী না থাকে তাহা হইলে সে রচনার শিল্পেরও প্রকৃত গৌরব নাই। এই ব্যক্তিগত রচনাভঙ্গী প্রকার বিশেষে যে কেবলমাত্র মনোহর তাহা নহে, সময়ে সময়ে ইহার আবির্ভাব, ভাষা ও সাহিত্যের স্বাস্থ্য-পুষ্টির জন্য একান্ত আবশ্যক। একই রচনা-প্রণালীর মধ্যে বহুদিন বদ্ধ থাকিলে ভাষার জীবনীস্রোত ক্রমশ মন্দীভূত হইয়া লোপ পাইবার উপক্রম হয়। সেই সময়ে যে ব্যক্তিগত নূতন ভঙ্গী-বৈচিত্র্য আনিয়া ভাষাকে আবার জাগাইয়া তুলে। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ফরাসী গদ্য

ইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। কিয়ৎকাল ধরিয়া, ফরাসী গদ্য কই ছাঁচে গঠিত হইয়া বৈচিত্রহীন, সংকীর্ণ এবং নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছিল। এমন সময়ে জর্জ সাঁ (George Sand) এবং তদানীন্তন সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্ত্তক তিভাশালী তরুণ লেখকগণ তাঁহাদের নিজ নিজ নূতন ৎনা ভঙ্গী দ্বারা সাহিত্য ও ভাষায় নবপ্রাণ সঞ্চারিত রিলেন। ইহা হইতেই সহজেই বুঝা যায় রচনা ভঙ্গী—style—কি অমূল্য পদার্থ—ইহার প্রভাব কিরূপ সুদূরব্যাপী—প্রয়োজনীয়তা কিরূপ বিস্তৃত।

রচনাভঙ্গী—Style—ভাব প্রকাশে লেখকের ব্যক্তিগত বকাশ হইলেও এমনও রচনারসিক আছেন যাঁহারা তাঁহাদের রচনা শিল্পে আত্মগোপন করিতেই চান—রচনা-ভঙ্গীতে যাহাতে ব্যক্তি ব্যক্ত না হয়, ইহাই তাঁহাদের চেষ্টা এবং উদ্দেশ্য। এবং অনেক সাহিত্য-রসজ্ঞের মতে ইহাই নার শ্রেষ্ঠ আদর্শ। ললিত কলার মূল ধর্ম্মের দৃষ্টান্ত ইয়া রচনাভঙ্গী বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি—তাঁহার আর কটি ধর্ম্ম লইয়া রচনাভঙ্গীর এই আদর্শ বুঝাইতে চেষ্টা হিব।

যে কলা রচনায় কলাচেষ্টা একেবারে প্রচ্ছন্ন তাহাই প্রকৃত কলা। Art is to conceal art—অর্থাৎ তোমার লাসৃষ্টি আয়াস-সম্ভূতই হউক, বা অনায়াস লব্ধই হউক, পরের চক্ষে তাহা প্রকৃতির সহজ সঞ্জাত পদার্থের ন্যায় তীয়মান হওয়া চাই—তোমার ব্যক্তিগত চেষ্টা যেন াহার কোথাও কোন প্রকারে না বাহির হইয়া পড়ে। সইরূপ রচনাভঙ্গী ভাবপ্রকাশে ব্যক্তিগত প্রথার বিকাশ ইলেও তাহাতে ব্যক্তি বিশেষত্ব না প্রকাশ পায়। সুপ্রসিদ্ধ রাসী সমালোচক সেণ্ট ব্যুভ্ (St. Beuve) এই জাতীয় নার অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন :—"সে রচনাভঙ্গী কের নিজের, অথচ অপর সকলে প্রত্যেকেই তাহাকে তাঁহাদের আপন আপন রচনাভঙ্গী বলিয়া মনে করে—রা একাধারে আধুনিক এবং প্রাচীন এবং সকল যুগেরই প্রামরিক।" বিখ্যাত উপন্যাস লেখক এবং অসাধারণ co শিল্পী ফ্লোবের (Flaubert) এইরূপ রচনাভঙ্গীর গুণে আ ছিলেন এবং উহাকেই নিজের আদর্শ করিয়াছিলেন। st ধ হয়, রচনা যখন চরমোৎকর্ষ লাভ করে, তখন তাহার আ ক্তিগত বিশেষত্ব সৌন্দর্য্যের উদার বিশ্বজনীন অবারিত মাধুর্য্যে পরিণত হয়। তাহার ব্যক্তিগত ভাব সৌন্দর্য্যে আচ্ছন্ন—মগ্ন—লীন হইয়া যায়। লেখক যখন নিজে ভাববিভোর, সৌন্দর্য্য-মোহে আচ্ছন্ন, তখন তাঁহার আত্ম-বিলোপই সম্ভব। তখন তাঁহার জ্ঞাতসার চেষ্টা এবং জাগ্রত প্রকাশ-বেদনা আনন্দোপভোগে পরিণত হইয়া অতর্কিত-ভাবে সাফল্যসম্পদ আনিয়া দেয়। ভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠ উপকরণ সকল অজ্ঞাতসারে—যেন কোন অপূর্ব্বশক্তি ঐন্দ্রজালিকের মহীয়ান মন্ত্রবলে লেখনীমুখে আবির্ভূত হইতে থাকে। তখন রচনাভঙ্গী—যাহা মূলে ব্যক্তিগত বিশেষত্ব—সৌন্দর্য্যের দেশ-কাল পাত্রহীন অবিশেষত্ব লাভ করে।

এই ন-ব্যক্তিগত—impersonal—রচনা-ভঙ্গী পরিপূর্ণ সুগভীর রসভোগের উপর নির্ভর করে। ইহাতে লেখক আবেশে মগ্ন—রসেরই প্রাধান্য—রসই সর্ব্বত্র। তাই ইহা অনেকটা কবিতার কাছা কাছি যায়। ফরাসী সাহিত্যে জর্জ সাঁর (George Sand) এবং ইংরাজী সাহিত্যে নিউম্যানের (Newmanএর) গদ্য ন-ব্যক্তিগত রচনার উত্তম দৃষ্টান্ত। প্রথমোক্তের সম্বন্ধে জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল (John Stewart Mill) বলিয়াছেন, "ইহা পাঠককে সঙ্গীতের ন্যায় বিচলিত করে"—It stirs you like music—এবং শেষোক্তের রচনার ছন্দ-মাধুর্য্য ইংরাজীতে প্রবাদ বাক্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রস্কিনের রচনায় আমরা উভয়বিধ ভঙ্গীই দেখিতে পাই। কিন্তু সৌন্দর্য্যে তাঁহার ন-ব্যক্তিগত ভঙ্গীরই প্রাধান্য। ব্যক্তিগত ভঙ্গীতে তাঁহার চরিত্রগত অধৈর্য্য—একদেশদর্শীতা—তর্ক প্রিয়তা প্রভৃতি দোষ অনেক স্থলেই তাঁহার ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় প্রস্ফুটিত হইয়া পাঠককে মুগ্ধ না করিয়া হৃদয়ে আঘাত দেয়।

আমরা বলিয়াছি যে, রচনা-ভঙ্গীর উৎকর্ষের জন্য লেখকের শব্দ বিন্যাসে ও শব্দ নির্ব্বাচনে বিশেষ ক্ষমতা থাকা চাই। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে রচনার প্রাঞ্জলতার জন্য শব্দক্রম ভাবক্রমের অনুসরণ করিবে। প্রত্যেক জাতির, সুতরাং প্রত্যেক ভাষার, এক একটি ক্রম আছে; কথোপ-কথনের ভাষার শব্দক্রমই সর্ব্বাপেক্ষা সরল; সুতরাং ভাব প্রকাশে অধিকতর উপযোগী। রচনা-কুশলী তজ্জন্য সে ক্রমকে কখন লঙ্ঘন করেন না বা তাহা হইতে দূরে যান না। তাঁহার বাক্যাবলী যতই কেন দীর্ঘ—কুণ্ডলায়িত—বহুধা বিভক্ত হউক, কথিত ভাষার শব্দক্রমানুযায়ী বলিয়া,

কথিত ভাষারই ন্যায় সুখবোধ্য। রস্কিনের এক একটি বাক্য নিতান্ত সুদীর্ঘ। বোধ হয় ডি কুইন্সি (De Quincy) ছাড়া অপর কোন ইংরাজী গদ্য লেখক এমন যোজনব্যাপী বাক্যাবলী ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু উপরোক্ত নিয়মে গঠিত বলিয়া তাহাদের অর্থ সংগ্রহে কষ্ট পাইতে হয় না। ইংরাজীতে মেকলের (Macaulay) ভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাঞ্জল। তাহার এক কারণ তাহার বাক্য সকল নিতান্ত ক্ষুদ্র আয়তনের, এবং তিনি কোন জটিল বিষয়ের দার্শনিক বা বিজ্ঞানবিদের ন্যায় সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম আলোচনা করেন না। তিনি সকল বিষয়ই স্থূল দৃষ্টিতে দেখিয়া তাহার একটি মোটামুটি মীমাংসা করেন। 'আধুনিক চিত্রকর সম্প্রদায়' নামক গ্রন্থের প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ডের কোন কোন স্থান ব্যতিরেকে রস্কিনের বাক্যাবলীর অর্থ গ্রহণের নিমিত্ত একাধিকবার পাঠের প্রয়োজন হয় না। অথচ প্রাঞ্জলতাই মেকলের (Macaulay) বাক্যাবলীর প্রধান—এবং বোধ হয়—একমাত্র গুণ। কিন্তু রস্কিনের সুদীর্ঘ বাক্যাবলীর অনন্ত কুণ্ডলীর মধ্যে শব্দের কি ইন্দ্রজাল—কল্পনার কি লীলা—ভাবের কি আবর্ত্ত—রসের কি আভোগ—সৌন্দর্য্যের কি উচ্ছ্বাস। তাহাদের কি সুমিষ্ট ছন্দ—সুখপাঠ্য যতিবিচ্ছেদ—সমুদয়ে কি ঝঙ্কার। অর্থগ্রহণের নিমিত্ত যদি কখনও দুইবার পড়িতে হয়—সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া পিপাসু হৃদয়ে শতবার—সহস্রবার আবৃত্তি করিতে ইচ্ছা যায়।

শব্দ নির্ব্বাচনেও রস্কিনের অদ্ভুত ক্ষমতা। এ বিষয়ে তাঁহার দেব-দুর্লভ সৌভাগ্য। তিনি যেখানে যে কথাটি বসাইয়াছেন তাহা এমন সুন্দর বসিয়াছে! হৃদ্গত ভাবের সকল দিক তাহাতে এমন ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাহার এমন স্বচ্ছ, সুন্দর এবং বর্ণ-বৈচিত্র্যময়—ভাব-গৌরবে এমনি উজ্জ্বল—যে পাঠকালে উপভোগাধিক্যে প্রতি মুহূর্ত্তে রোমাঞ্চিত হইতে হয়।

শব্দ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আমাদের বাঙ্গালার ন্যায় ইংরাজীতেও একটি পুরাতন তর্ক এবং মতবৈচিত্র্য আছে। আমাদের ভাষায় যেমন কেহ বাঙ্গলা শব্দ, এবং কেহ বা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী, ইংরাজী ভাষায়ও সেইরূপ কাহারও অনুরাগ লাটীন এবং গ্রীক্ ধাতুমূলক শব্দের দিকে এবং কাহারও বা স্যাক্সন্ (saxon) শব্দের দিকে। এ বিষয়ে—অপর সকল বিষয়েরই মত—যিনি একদেশদর্শী তিনিই ভ্রান্ত। বঙ্গভাষায় যেমন সংস্কৃত এবং বাঙ্গলা উভয় শ্রেণীর শব্দের তুল্য প্রয়োজন এবং একই মূল্য, ইংরাজী ভাষায়ও সেইরূপ একদিকে গ্রীক ও লাটীন শব্দের, অপর দিকে খাঁটি ইংরাজী শব্দের, তুল্য প্রয়োজন—একই মূল্য। তাহা হইলেও, ইংরাজী এবং বাঙ্গালা ভাষায় এমনও খেয়ালি লেখক আছেন, যাহার অনুরাগ কেবল এক শ্রেণীরই শব্দের প্রতি। আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে এমনও লেখক দেখিয়াছি, যিনি কেবল অসংযুক্ত বর্ণে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সাহিত্য-দরবারে তাহা জাহির করিতে উৎসুক। সাহিত্যে কিন্তু এরূপ পালয়ানি কসরত বা কুস্তিগিরির স্থান নাই। ভাব প্রকাশে সর্ব্বাঙ্গীন পটুতাই পরিণত ভাষার লক্ষণ। যে শ্রেণীর শব্দ যে ভাব প্রকাশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী সেই ভাব প্রকাশের জন্য সেই শ্রেণীর শব্দই অবলম্বনীয়—সর্ব্বথা অবলম্বনীয় এবং নিঃসঙ্কোচে অবলম্বনীয়। তাহা না করিয়া লেখক যদি তাঁহার ঝোঁক বা খেয়ালের অনুগামী হন, তাহা হইলে রচনার বৈচিত্র্য এবং সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ অসম্ভব। ভাবের স্বর-গ্রামের সহিত ভাষার স্বর-গ্রামের মিলন বাঞ্ছনীয়। যাঁহার বাগর্থ প্রতিপত্তি আছে তিনি কি অভিধানিক কি চলিত সকল শ্রেণীর শব্দই ভাবের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া যথাস্থানে ব্যবহার করিতে সক্ষম। আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যের পদ্য-বিভাগে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এ বিষয়ে অসাধারণ ক্ষমতা। "স্বপ্ন প্রয়াণের" ন্যায় বাঙ্গালার অপর কোন পদ্য-কাব্যের অভিধান এমন বিস্তৃত নয়।

বঙ্কিম বাবু শেষাশেষি বাঙ্গালা শব্দেরই পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। তাহাতে যে তাঁহার রচনার সৌন্দর্য্য বাড়িয়াছিল বলিতে পারা যায় না। যেখানে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিলে ভাব পরিস্ফুট হয়—পদসমষ্টি শ্রুতিমাধুর্য্য লাভ করে—রচনার সৌন্দর্য্য এবং গৌরব বর্দ্ধিত হয়—সেখানে সংস্কৃত শব্দই প্রযুক্ত হওয়া উচিত। সংস্কৃতের স্থানে বাঙ্গালা, বাঙ্গালার স্থানে সংস্কৃত শব্দের, ব্যবহার ভাষার অপব্যবহার বই আর কিছু নয়। পূর্ব্বে বঙ্কিম বাবু ইহা বেশ বুঝিতেন। তাঁহার মৃণালিনী উপন্যাসে মনোরমার যে রূপ-বর্ণনা আছে তাহা আমূল সুনির্ব্বাচিত সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগে তারকা খচিত নিশীথ আকাশের ন্যায় সমুজ্জ্বল

এবং বিবিধ যন্ত্র মিলিত ঐকতান বাদনের ঝঙ্কার-বিশিষ্ট। মৃণালিনীর সেই অধ্যায়টি যেন উচ্ছ্বসিতহৃদয়-কবি-রচিত রমণী-সৌন্দর্য্যের স্তবগান। কিন্তু পরবর্ত্তী সংস্করণে স্থানে স্থানে সংস্কৃত শব্দের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা শব্দ যোজনায় সেই অনিন্দ্য রচনা হতশ্রী হইয়াছে। সেই সংস্কৃত শব্দের মর্ম্মর নির্ম্মিত অট্টালিকা স্থানে স্থানে ভগ্ন করিয়া তাহার ভিতর বাঙ্গালা শব্দের উলু খড় সংযোগে না তাহাতে রাজপ্রাসাদের গৌরব রক্ষিত হইয়াছে—না পর্ণশালার সহজ শিষ্ট শোভা প্রকাশ পাইয়াছে।

কিন্তু শব্দ নির্ব্বাচনে কেবলমাত্র ভাব প্রকাশ পটুত্বের উপর দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না। বাক্যের ছন্দ এবং শ্রুতি সুখের উপর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। উপরে ফ্লোবের (Flaubert) নামক যে ফরাসী লেখকের উল্লেখ আছে, তিনি বলিতেন, বাক্যাংশ বা পদ-সমষ্টি এমনরূপে গঠিত হওয়া চাই যে, পাঠকালে শ্বাস প্রশ্বাসের নিয়মের সঙ্গে তাহা যেন বেশ সুমিলিত হয়। পড়িবার সময় যে বাক্যাংশ বুক চাপিয়া ধরে—হৃদয়ের উত্থান পতনের তালে বতায় ঘটায়—তাহা সুগঠিত নয়। সুতরাং প্রতি কথার ভাব পটুতার সঙ্গে সঙ্গে, বাক্যের শ্রুতি সুখের প্রতি সে কথা কি পরিমাণে অনুকূল, তাহাও তুলারূপে দেখিতে হইবে। এইরূপ সর্ব্বাঙ্গীন উপযোগীতার প্রতি নজর রাখিয়া তিনি শব্দ চয়ন করিতেন। এবং একটি কথার অন্বেষণে দিন—মাস—কখন বা বর্ষ কাটিয়া যাইত। ফ্লোবের (Flaubert) বলেন, একটি বিষয় বলিবার জন্য একটিমাত্র নির্দ্দিষ্ট ভাষা আছে—নামকরণে একটিমাত্র বিশেষ্য—তাহার গুণ নির্দ্দেশে একটিমাত্র বিশেষণ—এবং তাহাকে জীবিত জাগ্রত করিয়া তুলিতে একটিমাত্র ক্রিয়া। ভাষা ছাড়া ভাব নাই—ভাব ছাড়া ভাষা নাই। সুতরাং কোন একটি ভাব প্রকাশ করিতে হইলে, সে ভাবের সঙ্গে যে ভাষার আজন্ম বন্ধন, সেই ভাষাই প্রয়োগ করিতে হইবে। তাহা হইলে শব্দ নির্ব্বাচনে লেখকের নিজের খেয়াল বা ঝোঁক চলিবে না। যে কথায় ভাবের প্রকৃত স্বরূপ পূর্ণ প্রতিভাত—ভাব প্রকাশে এবং রস বিকাশে যে শব্দের নৈসর্গিক উপযোগীতা, তাহাই ধরিতে হইবে। রচনাভঙ্গী তখন ব্যক্তি প্রধান না হইয়া রস প্রধান হইয়া উঠিবে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে রস্কিনের গদ্যে দুই প্রকার রচনা-ভঙ্গীই দেখা যায়। কিন্তু তাঁহার রসপ্রধান ভঙ্গীই ব্যক্তি-প্রধান ভঙ্গী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। শেষোক্ত ভঙ্গীর অনেক স্থানই তাঁহার চরিত্রের অসঙ্গতা দোষের ছায়াপাতে দুষ্ট—তৎসত্ত্বেও তাঁহার গদ্যের তুল্য সর্ব্বগুণোপেত গদ্য ইংরাজী সাহিত্যে নাই। অপরাপর ভাষাবিদ্ পণ্ডিতদিগের মতে অন্য সাহিত্যেও নাই। কেবল প্লেটোর (Plato) গদ্যের সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে। শব্দ সম্পদে তিনি রাজা। সকল প্রকার শব্দই তাঁহার লেখনীমুখে যথাস্থানে এবং সুসঙ্গতরূপে প্রযুক্ত। কথিত ভাষার অনলঙ্কার পরিচ্ছন্ন প্রাঞ্জলতা—তীরের ন্যায় তাহার "চুটকি" সন্ধান—এবং ভাবোচ্ছল—রসোচ্ছল গদ্যের ঝঙ্কার এবং রোল সকলই তাঁহার আয়ত্ব।

বাস্তবিক সে ভাষা—সে গদ্যের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা অসাধ্য। যেমন কোন সুদূর সাগর-সঙ্গম-বাহিনী স্রোতস্বিনী তুষার মণ্ডিত স্বীয় পর্ব্বত-গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া লীলাঞ্চিত গতিতে, ছায়ালোক-বিচিত্র ধরণী-পৃষ্ঠ অলঙ্কৃত করিয়া, উদ্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হয়—সে নদী যেমন কখন গিরি-সঙ্কট-মধ্যগতা—প্রখর—ফেনিল—আয়সবর্ণা; কখন বীচি-বিক্ষোভ সংক্ষুব্ধা—কখন বা অসীমকান্তার-মধ্যগতা—নিঃশব্দবাহিনী—কখন উপল-আস্তরণ মধ্যে বিস্তীর্ণ দেহা—কখন ছায়া-বহুল—পত্রমর্ম্মরসঙ্কুল-বিটপশ্রেণী-পাদদেশে কলনাদিনী—আবার কখন তরঙ্গ-ভঙ্গ-ভীষণা—সেইরূপ রস্কিনের গদ্যরচনা বিচিত্রকলাসৌষ্ঠবে প্রস্ফুটশ্রী, বিবিধরসে আপ্লুতা। সে রচনা কোথাও সৌন্দর্য্যোপভোগ-পুলকে রোমাঞ্চিতদেহা, কোথাও ঘৃণায় কুঞ্চিতাননা, কখন বা আশীর্ব্বাদে কুসুমিতকলেবরা, কখন বা অভিশাপে অনলময়ী, কোথাও বা হর্ষে গদ্‌গদভাষিণী, কোথাও ক্রোধে মেঘ-মন্দ্রিতা—ফলতঃ, সর্ব্বত্র প্রতিভার জ্বালাময় ফুৎকারে উদ্দীপ্ত-চেতনা, জীবনের হিল্লোল ও কল্লোলে স্পন্দমানা, এবং মানব-হৃদয়ের শোণিমায় রক্তিম-বর্ণা।

আচার্য্যের রসগ্রাহী পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, তাঁহার রচনার দুইটি বিভিন্ন যুগ আছে। প্রথম যুগ তাঁহার (Modern Painters) আধুনিক চিত্রকর সম্প্রদায় নামধেয় পুস্তকের ১ম খণ্ড প্রকাশের সময় হইতে অর্থাৎ ১৮৪৩ হইতে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে তিনি যে সকল পুস্তক প্রণয়ন করেন, সে সকল সৌন্দর্য্য ও কলাশ্রীর অভিব্যক্তির নিয়মাদি নিরূপণ ও ব্যাখ্যান সম্বন্ধে রচিত। এবং ইহাদেরই ভিতর আমরা তাঁহার অপূর্ব্ব রচনা-শক্তির পূর্ণ-বিকাশ ও চরম উৎকর্ষ দেখিতে পাই। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত ২য় যুগ। নীতি, সমাজ, ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্বন্ধে পুস্তক ও প্রবন্ধাদি ২য় যুগের রচনা। প্রথম যুগের গদ্যের বিশেষত্ব—ভাব ও ভাষার তীব্র-জ্বালাময়ী গতি ও উচ্ছ্বাসে—আবর্ত্ত ও উন্মাদনায়, কলাসৌন্দর্য্য-বিকাশে, ও নৈসর্গিক চিত্রাঙ্কণের মোহিনীতে। তাহার অন্তরে বাহিরে ভূমার ভাব। ভূমৈব সুখং। সেই ভূমার সুখ প্রতি কথায়—প্রতি ছত্রে—প্রতি চিত্রে। সুদূর প্রসারিত সূক্ষ্ম দৃষ্টি—অক্ষয় শব্দ-ভাণ্ডার, রস-সমুদ্র আলোড়িত করিয়া—কথার উপর কথার তরঙ্গ তুলিয়া—প্রতিভা-দৃপ্ত—বাক্য-বিভবে উন্মত্ত যুবালেখক ভাবপীড়িত, উপভোগবিহ্বল, উচ্ছল হৃদয়ের রুদ্ধ প্রকাশ-বেদনা উন্মাদিনী ভাষায় উন্মুক্ত করিয়াছেন। সুদীর্ঘ পদাবলী—দুইশত, চারিশত, কখনও বা তাহারও অধিক শব্দ যোজনায় গ্রথিত। কিন্তু দীর্ঘ হইলেও সূত্রভ্রষ্ট নহে—আবর্ত্তিত হইলেও জটিল নহে। শব্দ বহুল হইলেও প্রতি শব্দের পার্থক্য এবং সার্থকতা সুরক্ষিত এবং উপযুক্ত পাঠকের নিকট সুলভার্থ। কিন্তু মানব সংসারে ক্ষমতাশালী ব্যক্তির অনেক বিড়ম্বনা—ক্ষমতাশালী সুলেখকও সে বিড়ম্বনার অতীত নন। যাঁহার প্রচুর বাক্যসঙ্গতি আছে, সমালোচক অসঙ্কোচে তাঁহাকে বাক্যসর্ব্বস্ব বলিয়া বসিলেন। কত অক্ষম পাঠকের হস্তে ফরাসী সাহিত্যে Victor Hugoকে এবং ইংরাজী সাহিত্যে Swinburneকে এই নিগ্রহ ভুগিতে হইয়াছে। আমাদেরও বঙ্গসাহিত্যে পাঠক কখন কখন লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, রবীন্দ্রনাথ যখন অনুপম বাক্যছটার বর্ণবৈচিত্র্যে বসন্তের বিবিধ কুসুম সুষমাকে, ও অপূর্ব্ব স্বর লহরীতে বসন্তের বিচিত্র কূজন-কাকলীমর্ম্মরকে লাঞ্ছিত করিয়া মানব হৃদয়ের নিভৃত আকাঙ্ক্ষাকে মুখরিত করিয়া তুলেন, তখন কোন কোন বিজ্ঞ সমালোচক তাঁহার সেই অমর কবিতার গুঞ্জন ঝঙ্কারে কেবল কথারই লীলা চাতুর্য্য দেখিতে পান।

রস্কিনের রচনা প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের আলোচনা অনিবার্য্য—গদ্য কতদূর পদ্যের অনুসরণ করিবে। অনেক গদ্য আছে যাহা পদ্যাকারে প্রকাশ হইতে পারে। কিন্তু মূলে—গদ্য এবং পদ্যের অভিব্যক্তি একেবারে পৃথক। এ কথা স্মরণ রাখিলে রসাত্মক গদ্য লিখিতে গিয়া অক্ষম লেখক পদ্য লিখিয়া ফেলিবেন না। পদ্যপ্রকৃতিক বা পদ্যানুসারী গদ্য (Poetical Prose) ইংরাজী এবং বাঙ্গলাতে অনেকেই লিখিয়াছেন। কিন্তু কবিত্বময় এবং শ্রুতিমধুর হইলেও যে গদ্য নিজ প্রকৃতি এবং ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পদ্য-ছন্দের অনুকরণ করে এবং ভাবাতিসারের (Sentimentalism) শূন্যগর্ভ ফুৎকারে ফাঁপিয়া উঠে, অচিরেই তাহার জীবন বুদ্‌বুদ ফাটিয়া শূন্যে বিলীন হয়। গদ্যের ছন্দ পদ্যের ছন্দ হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। Dickensএর গদ্যে অনেক স্থানে এই পদ্য ছন্দের অযথা সমাবেশ আছে। তাঁহার Little Nellএর মৃত্যুবর্ণনায় পদ্য ছন্দের এত বাহুল্য, যে তাহাকে সহজেই পদ্যাকারে লেখা যায়। Ruskinএরও গদ্যে ক্বচিৎ এ ত্রুটি দেখা যায়। কিন্তু তবুও স্বীকার করিতে হইবে, গদ্য রচনায় রস্কিনের সমকক্ষ নাই। প্রবন্ধ শেষে, পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত, ও আনন্দবিধানকল্পে, এবং সমাপ্তিরও মধুরত্বের জন্য রস্কিনের গদ্যের নমুনা স্বরূপ, তাঁহার "Modern Painters" গ্রন্থ হইতে সামান্য একটা অংশ উদ্ধৃত হইল :—

Gather a single blade of grass, and examine for a minute, quietly, its narrow sword-shaped strip of fluted green. Nothing, as it seems there, of notable goodness or beauty. A very little strength and a very little tallness, and a few delicate long lines meeting in a point,—not a perfect point neither, but blunt and unfinished, by no means a creditable or apparently much cared for example of Nature's workmanship; made as it seems, only to be trodden on to-day, and tomorrow to be cast into the oven; and a little pale and hollow stalk feeble and flaccid, leading down to the dull brown fibres of roots. And yet, think of it well, and judge whether of all the gorgeous flowers that beam in summer air, and of all strong and goodly trees, pleasant to the eyes or good for food,—stately palm and pine, strong ash and oak, scented-citron, burdened vine—there be any by man so deeply loved, by God so highly graced, as that narrow point of feeble green. It seems to me not to have been without a peculiar significance, that our Lord, when about to work the miracle which, of all that He showed, appears to have been felt by the multitude as the most impressive,—the miracle of the loaves,—commanded the people to sit down by companies "upon the green grass." * *

Consider what we owe merely to the meadow grass, to the covering of the dark ground by that glorious enamel by the companies of those soft, and countless, and peaceful spears. The fields! follow but forth for a little time the thoughts of all that we ought to recognise in those words. All spring and summer is in them,—the walks by silent, scented paths,—the rests in noonday heat, the joy of herds and flocks,—the power of all shepherd life and meditation,—the life of sunlight upon the world falling in emerald streaks and failing in soft blue shadows, where else it would have struck upon the dark mould, or scorching dust pastures beside the pacing brooks,—soft banks and knolls of lowly hills,—thymy slopes of down overlooked by the blue line of lifted sea,—crisp lawns all dim with early dew or smooth in evening warmth of barred sunshine, dinted by happy feet, and softening in their fall the sound of loving voices; all these are summed in those simple words; and these are not all. Go out, in the spring time, among the meadows that slope from the shores of the Swiss lakes to the roots of their lower mountains. There mingled with the taller gentians and the white narcissus, the grass grows deep and free; and as you follow the winding mountain paths, beneath arching boughs all veiled and dim with blossom,—paths that for ever droop and rise over the green banks and mounds sweeping down in scented undulation, steep to the blue water, studded here and there with new mown heaps, filling all the air with fainter sweetness,—look up towards the higher hills, where the waves of everlasting green roll silently into their long inlets among the shadows of the pines; and we may, perhaps, at last know the meaning of those quiet words of the 147th Psalm "He maketh grass to grow upon the mountains."

সমাপ্ত।

প্রশ্ন।

মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রদীপ সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

মহাশয়,

প্রদীপের তৃতীয়ভাগ ১১শ সংখ্যার ৩৫১ পৃষ্ঠায় 'কুষ্মাণ্ড চিন্তা' নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন 'কাল রঙ্গের ফুল কই, কিম্বা সবুজ রঙ্গের ফুল কই?' যদিও ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গের ফুল দেখা যায়, কাল রঙ্গের ফুল কখনও দেখি নাই কিন্তু সবুজ রঙ্গের ফুলের অভাব নাই। আমি সবুজ রঙ্গের গোলাপ ফুল দেখিয়াছি। এরূপ ফুলের পাপড়িগুলি সাধারণ ফুলের পাপড়ির মত নহে, বরং ছোট ছোট গোলাপের পাতার আকারের ও ফুলে কোন প্রকার গন্ধ নাই। ফুলের পাপড়িগুলি হাতে চটকাইলে ঠিক গোলাপ বৃক্ষের পাতার মত গন্ধ পাওয়া যায়। এরূপ ফুলে বিশেষ সৌন্দর্য্য নাই, কেন না পাতার সহিত কোন ভেদ না থাকায় দূর হইতে ফুল আছে বলিয়া জানিতে পারা যায় না। এরূপ ফুল কেবল একটি আশ্চর্য্য পদার্থ বলিয়াই যত্নে রাখা হইয়াছে। আমার এ পত্রের উদ্দেশ্য কেবল জানান যে সবুজ রঙ্গের ফুল সম্ভবও আছে।

ইতি

মুঠিগঞ্জ—এলাহাবাদ।
২১।৭।১৩০৭।

শ্রীঅমৃতলাল শীল।

উত্তর।

উত্তরে বক্তব্য এই যে, উহা ফুল স্থানীয় হইলেও প্রকৃত ফুল নয়। বস্তুতঃ উহা "আশ্চর্য্য পদার্থ"। যেমন আনারসের উপরে পাতা জন্মিয়া থাকে, অথচ অন্যান্য ফুলের উপরে আর পাতা হয় না, তেমনি গোলাপের কদাচিৎ ফুলের স্থানে কেবল পাতা হয়, কদাচিৎ নীচের কতকগুলি পাপড়ি সবুজ পাতা হয় এবং তাহাদের উপরে নিজের বর্ণের পাপড়ি হয়। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে। উদ্ভিদ্ বিদ্যার ভাষায় ইহারা ফুলের বিকৃতি। যেমন আমাদের হাত পা ভিন্ন হইলেও মূল গঠনে এক, তেমনই গাছের পাতা ও ফুল ভিন্ন হইলেও মূল গঠনে এক। তাই এইরূপ বিকৃতি সম্ভব। এ সম্বন্ধে পরে একটি প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

প্রদীপের ৩৪৭ পৃষ্ঠায় একটা ভুল ছাপা হইয়াছে। উদ্ভিদ্ বিদ্যার ভাষায় বিলাতী কুমড়া আমেরিকাবাসী বলা যায়, "রাণী" নহে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।